বর্ষ ২৬ · সংখ্যা ১

শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৬

সম্পাদক

শ্রীসুশীল রায়

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৬ সংখ্যা ১ · শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৬ · ১৮৯১ শক

সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

মূল্য দেড় টাকা

দি ট্রি অব লাইফ

গুস্তাভ ভিগেল্যাণ্ড, নরওয়ে

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৬ সংখ্যা ১ · শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৬ · ১৮৯১ শক

চিঠিপত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

[জানুয়ারি ১৯১৪]

রথী— সুরেনকে দেখিয়ে এর জবাব ঠিক করিয়ে রেখে দিস্।[১]

ছেলেদের নিয়ে আমরা বুধবারে সকালের গাড়িতে যাত্রা করব— বেলা ১টা দেড়টার সময় পৌছব। বড় ও ছোট ছেলেদের আলাদা ভাগ করে রাখতে হবে। ওদের নাওয়া-খাওয়ার ব্যবস্থা কি রকম হতে পারে ভেবে রাখিস্। আমার একতলার স্নানের ঘরে ওরা স্নান করতে পারে। সেখানে ওদের বসবার বন্দোবস্ত রাখা মন্দ নয় কিন্তু শোওয়া চল্‌বে না।

[পোস্ট মার্ক : ২২ এপ্রিল ১৯২৪]

হংকং সামনে। কাল থেকে বিশ্রী বাদলা করেচে। বেশ একটু শীত। হংকঙে জাহাজ বেশিক্ষণ থাম্‌বেনা। অতএব এখান থেকে ক্যান্টনে যাওয়া চল্‌বে না। ফেরবার সময় দেখা যাবে। এখানে ডাঙ্গায় দুতিন জায়গা থেকে নিমন্ত্রণ তার মধ্যে হংকং য়ুনিবর্সিটি একটা— হর্ণেল তার কর্ত্তা। কোনো একটি দিশি লোকের বাড়িতেই ওঠবার ইচ্ছে আছে। জাহাজে প্রায় চারটে বক্তৃতা লিখেচি। আর দুটো বাকি।

ওঁ

[১৯২৪]

কল্যাণীয়েষু

Elmhirstএর Cablegram পাঠাই। এর থেকে সব জানতে পারবি। Elmhirst Tokyoতে আছে। অর্থাৎ Tokyo Imperial Hotel ওর address। তুই ওকে ওর বাড়ির ঠিকানায় cable করেচিস্। সে ও পাবেনা। যাহোক, South America সম্বন্ধে খবর পাকা। পথ খরচের টাকা কি

---

১ A. H. Fox Strangwaysএর পত্রের উল্টো দিকে লেখা।

রকম করে কোথা থেকে পাওয়া যাবে ঠিক বুঝতে পারলুমনা। বোম্বাইয়ের American Express এ Itinerary পাঠিয়েচে তার জবাবে লিখে দিস্ যে আমরা Haruna Maruতে ২২ সেপ্টেম্বরে Colombo ছেড়ে ১১ অক্টোবর মার্সেলিসে পৌঁছে স্পেনে ২ সপ্তাহ কাটাতে চাই। সপ্তাহখানেক বোধহয় প্যারিসে কাটাতে হবে। তার পরে কোনো স্টীমার যদি স্পেন অথবা ফ্রান্স অথবা হল্যাণ্ড থেকে direct South America যায় তার খবর চাই। New Yorkএ যেতে আদবেই ইচ্ছে নেই।

জিনিষগুলো এসে পৌঁছলে তার পরে সেগুলো খুলে দেখে তবে কলকাতায় যাওয়া ঠিক করব। এখানে শরীরটা ভাল ঠেকচেনা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঔঁ

[১৯২৪]

কল্যাণীয়েষু

আজ তোদের চিঠিতে সব খবর পেয়ে নিশ্চিন্ত হলুম। এখানে আসিস্ নি ভালই হয়েচে— বিশেষ দরকার ছিলনা— কেননা আমাকে সবাই ঘরের লোকের মত যত্ন করে। এল্ম্‌হর্স্ট বেশ আরামে আছে। ধীরেন এলে অসুবিধা হত। আমরা ডিসেম্বরের ২৯শে তারিখে ছেড়ে পেরুতে জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে পৌঁছব। সমুদ্রপথে অন্তরীপ ঘুরে যেতে হবে কেননা ডাক্তার আমাকে রেলপথে পাহাড়ের উপর দিয়ে যেতে নিষেধ করেচে। কিন্তু সমুদ্র পথে যতই দক্ষিণে যাব ততই দক্ষিণ মেরুর কাছ দিয়ে যেতে হবে— খুব কড়া শীত পাব— জাহাজে গরম হবার সব রকম বন্দোবস্ত আছে— তা ছাড়া ডিসেম্বরের শেষভাগে এখানকার গর্ম্মিকাল দেখা দেবে। এতদিনে গরম পড়া উচিত ছিল কিন্তু এবারে কি কারণে এখনো শীত গেল না। ডাক্তারের কৃপায় চুপচাপ করে আছি, এখনো পর্য্যন্ত কোনো রকম বক্তৃতা দিতে হয়নি। এ পর্য্যন্ত দেশের কোনো চিঠিপত্র পাওয়া যায়নি। কেবল কাল এণ্ড্রুজের একখানি চিঠি আর খবরের কাগজের টুকরো পাওয়া গেল। একটি সিন্ধি ছেলে বাঁধের জলে ডুবে মারা গেছে— শুনে বড় খারাপ লাগ্‌চে। আমাদের উচিত, প্রত্যেক ছেলেকে বাঁধে নিয়ে গিয়ে সাঁতার শেখানো। মনে করে নীতুকে দেখিস্, ভুলিস্‌নে।... Pedagogy শিখ্‌তে চায়,— এত বড় ব্যর্থ শিক্ষা আর কিছু নেই— ওতে কেবল Pedantryর চর্চ্চা করা হয়। ওর চেয়ে Sociology শিখ্‌লে কাজে লাগ্‌তে পারে। এ চিঠি যখন পাবি তার পর থেকে অন্তত দুটো mail পেরুতে পাঠিয়ে দিস্। পেরু থেকে আমরা মেক্সিকোয় যাবার ব্যবস্থা করব। ম্যাকমিলানরা রক্তকরবী আর চতুরঙ্গ সম্বন্ধে কি স্থির করলে জানাস। পোর্ট সৈয়েদ ও মার্সেল্‌স থেকে যে লেখাগুলো প্রশান্তকে পাঠিয়েছিলুম সেগুলো ঠিকমত পেয়েছে কিনা খবর দিস্। বোধ হয় সেপ্টেম্বর কিম্বা অগস্টের মডার্ণ রিভিয়ুতে আমার "ততঃ কিম্" লেখাটার ইংরেজি বেরিয়েছিল, যদি লণ্ডনে কোথাও পাস আমাকে পাঠিয়ে দিস্, দরকার আছে। প্রত্যেক লেখার জন্যে এরা আমাকে পাঁচশো টাকা দিচ্চে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

মোর্‌ভির রাজার দেয় কিস্তি ৫,০০০ টাকার একখানা চেক পাঠিয়ে মরিস কলাভবন সম্বন্ধে আমাদের ঔদাসীন্য নিয়ে খোঁটা দিয়ে আমাকে চিঠি লিখেচে। বলেচে এতে সাধারণের কাছে আমাদের বদনাম হচ্চে। লিখেচে, ৭০,০০০ হাজার টাকা আমাদের fundএ নগদ জমা হয়েচে কিন্তু কলাভবন পূর্ব্বাপর যেমন চলছিল তেমনিই চল্‌চে, তাই কারো কাছে এ সম্বন্ধে ও কোনো জবাবদিহী করতে পারচে না।

প্রশান্তকে বলিস্‌ যেন চিরকুমার সভার কপিটা ফিরিয়ে নিয়ে আমাকে দিতে না ভোলে। নতুন কবিতার বই ছাপাবার কি কোনো ব্যবস্থা হয়েচে?

আমার জন্যে একটা পা-ছড়ানো বেতের চৌকি পাঠিয়ে দিস্‌। দিনুদের কাছ থেকে যে-চৌকি নিয়েছি সেটা আমার সুবিধা বোধ হয় না। আগাগোড়া বেতের হলেই বোধ হয় আরামের হবে, হাল্কাও হবে।

মহাত্মাজিকে যে নিমন্ত্রণ চিঠি দিয়েছি সেটা এখনো তাঁর হাতে না পৌছনো ভালো হয় নি। কেননা তিনি স্বয়ং এখানে আসবার ইচ্ছা প্রকাশ করেচেন— অথচ এতদিন আমরা তাঁকে কিছুই বল্‌লুম না এটা ভালো হল না। শুনেছি তাঁর কাছে চিঠি নিয়ে যাবার ভার নেপালবাবুর উপর দেওয়া হয়েচে। আমার বোধ হয় তাতে বৃথা দেরী হবে। তার চেয়ে ডাকে দেওয়া ভালো। অশ্বিনীও চিঠি নিয়ে যেতে চেয়েছিল। যাই হোক্‌ আর একটুও দেরি করা উচিত হবে না।

এণ্ড্রুজের টেলিগ্রাম পেয়েচি আগামী বৃহস্পতিবারে আস্‌বে। ইতি ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

Santiniketan
Bengal.

কল্যাণীয়েষু

··· লিখেছে তার ভাবী ননদেরা আমাদের কাছ থেকে কোনো একটা জবর wedding present-প্রত্যাশায় আছে। ও খুব ভয় পেয়ে গেছে— লিখ্‌ছে, "আমি কিছুই চাই নে কিন্তু আপনাকে নিয়ে আমাকে যেন একটুও খোঁটা সইতে না হয়।" এখন ভাবচি ওকে যে বইগুলো দেব তার একটা ভালো আধার দিতে পারলে চোখ-ভরা গোছের চেহারা হত। বৌমার সঙ্গে পরামর্শ করে একটু ভেবে দেখিস্‌। একথা সত্য ওদের খুব একটা কৌতূহল আছে। বাংলা পদ্যগ্রন্থাবলীর মোটা কাগজের সংস্করণটাই যেন দেওয়া হয়— স্বরলিপি ও অন্যান্য সমস্ত ছোট বড় বই দিয়ে বোঝা ভারি করিস্‌। ম্যাকমিলানের সংস্করণ সমস্ত ইংরেজি বইও দিতে হবে— সেগুলো হয়ত বিশেষ করে না বাঁধালেও ক্ষতি হবে না। বাঁধাইয়ের কাপড় তোরাই পছন্দ করে দিস্‌, কিন্তু সময়মত যেন হয়ে যায়— ···আমি ডরাই।

মীরার বড় বেশি কলিক্‌ হয়েছিল। এখন ভালো আছে কিন্তু একটু বল পেলে ওকে কলকাতায় পাঠিয়ে পরীক্ষা করাতে হবে gall stone হয়েছে কি না।

আজ রিপোর্ট প্রভৃতি নিয়ে জগদানন্দ যাচ্চেন।

রাণু ও আশার চিঠি যথাস্থানে পাঠিয়ে দিস্। ভদ্র রকমের লেফাফা আমার ফুরিয়ে গেছে কিছু পাঠিয়ে দিতে ভুলিস্ নে।

সেই বিবাহসম্বন্ধীয় লেখাটা শীঘ্রই তর্জ্জমা করে Count Keyserlingকে পাঠাতে হবে। জগদানন্দর হাতে কপি দিলুম সুরেনকে একটু তাগিদ করে এই কাজটাতে লাগিয়ে দিস্। এখানে খুব ঝড় বৃষ্টি হয়ে গেছে, বেশ ঠাণ্ডা আছে— এখান থেকে নড়তে ইচ্ছা করচে না। যাবার জন্যে ··· খুব চেঁচামেচি করে চিঠি লিখেচে— চেষ্টা করব এড়াতে। যদি যাই একেবারে দুই একদিন আগে যাব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রসঙ্গ-পরিচয়

A. H. Fox Strangways : India Societyর সদস্য। বিলাতে রবীন্দ্রনাথের পুস্তক-প্রকাশনার সহায়তা করেন।

Count Keyserling (1880-1946) । জর্মন দার্শনিক

W. W. Hornell (1878-1950) : Director of Public Instruction, Bengal, 1913-24 ; first Vice-Chancellor of the Hongkong University, 1924

সুরেন। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

এলমহর্স্ট। শ্রীএল. কে. এলমহর্স্ট

ধীরেন। শ্রীধীরেন্দ্রমোহন সেন

এণ্ড্রুজ। সি. এফ. এণ্ড্রুজ

নীতু। নীতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দৌহিত্র

প্রশান্ত। শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

ততঃ কিম্। ইংরেজি অনুবাদ 'The Fourfold Ways of India' মডার্ন রিভিউতে আগস্ট ১৯২৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

মরিস। হীরজিভাই পেস্টনজি মরিস (পার্শী অধ্যাপক)

দিনু। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

নেপালবাবু। নেপালচন্দ্র রায়

মীরা। মীরা দেবী

জগদানন্দ। জগদানন্দ রায়

রাণু। রাণু অধিকারী (মুখোপাধ্যায়)

আশা। আশা অধিকারী (আর্যনায়কম)

বিবাহসম্বন্ধীয় লেখা। The Indian Ideal of Marriage, কাউন্ট কেসারলিঙের *Book of Marriage* গ্রন্থের জন্য লিখিত এবং *Visva-Bharati Quarterly* vol. iii No.2 (old series) সংখ্যায় প্রকাশিত

মনোমোহন ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

…এ সভার উদ্যোক্তারা যখন আমাকে সভাপতি করবার প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন তখন আমি তাতে দ্বিধা বোধ করেছিলাম। কিন্তু কয়েকটি বিশেষ কারণে আজ আমি এখানে এসেছি। প্রথমতঃ, কবি মনোমোহন ঘোষের মাতামহকে আমি আমার পরম আত্মীয় বলে জানতুম। শৈশব কালে তাঁর কাছ থেকেই প্রথম আমি ইংরাজী সাহিত্যের ব্যাখ্যান শুনেছিলাম। ইংরেজ কবিদের মধ্যে কে কোন্ শ্রেণীতে আসন পান, তাহা তিনিই আমাকে প্রথম বুঝিয়েছিলেন। যদিও আমাদের বয়সের যথেষ্ট অনৈক্য ছিল তথাপি তার পর অনেকদিন পর্যন্ত দুজনের মধ্যে একটা সম্বন্ধ ছিল। এক এক সময়ে তাঁর আশ্চর্য যৌবনের তেজ দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি।

মনোমোহন, অরবিন্দ ও ভাইদের সকলকে নিয়ে তাঁদের মা যখন ইংলণ্ডে পৌছলেন, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলুম। শিশুবয়সেই তাঁদের আমি দেখেছি। ইংলণ্ডে দুঃসহ দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতিত্ব লাভ করেছেন। সে কথা আপনারা সবাই জানেন। মনোমোহন যখন দেশে ফিরে এলেন তখন তাঁর সঙ্গে আমার পুনরায় পরিচয় হয়— সে পরিচয় আমার কাব্যসূত্রে। সেইদিন সেইক্ষণ আজ আমার মনে পড়ে। জোড়াসাঁকোয় আমাদের বাড়ির দক্ষিণের বারান্দায় 'সোনার তরী' পড়ছিলুম। মনোমোহন তখন সেই কাব্যের ছন্দ ও ভাব নিয়ে অতি সুন্দর আলোচনা করেছিলেন। বাংলা ভাষার সঙ্গে তাঁর পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও শুধু বোধশক্তি দ্বারা তিনি কাব্যের অন্তর্নিহিত ভাবটুকু গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। আজকে তাঁর স্মৃতিসভায় আমরা যারা সমবেত হয়েছি তাদের মধ্যে অধিকাংশই তাঁর যথার্থ স্বরূপ যেখানে— তার মধ্যে যা চিরকাল স্মরণযোগ্য— সে জায়গায় হয়তো তাঁকে দেখেন নি। এ সভায় তাঁর অনেক ছাত্র উপস্থিত আছেন। তিনি সুদীর্ঘকাল ঢাকা কলেজে, কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করেছেন। ছাত্র হিসাবে যে কেহ তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁর মধ্যেই তিনি সাহিত্যের রস সঞ্চার করেছিলেন। অধ্যাপনাকে অনেকে শব্দতত্ত্বের আলোচনা বলে ভ্রম করেন—তাঁরা অধ্যাপনার প্রকৃত অধিকারী নন। মনোমোহন ঘোষ তাঁর অসাধারণ কবিত্ব ও কল্পনা -শক্তির প্রভাবে সাহিত্যের নিগূঢ় মর্ম ও রসের ভাণ্ডারে ছাত্রদের চিত্তকে আমন্ত্রণ করেছিলেন। যে শিক্ষা এক চিত্ত হতে আরেক চিত্তে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়, ছাত্রদের চিত্তে আনন্দ সঞ্চার করে, তাহাই যথার্থ শিক্ষা। সাধারণ শিক্ষার চেয়ে এ ঢের বড় জিনিস। যে শক্তি নিয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে শক্তি ছিল গান গাবার জন্যে। অধ্যাপনার মধ্যে যে তিনি আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন তাতে নিঃসন্দেহ তাঁর গভীর ক্ষতি হয়েছিল। আমি যখন ঢাকায় কন্ফারেন্সে গিয়েছিলুম তখন তাঁর নিজের মুখে এ কথা শুনেছি। অধ্যাপনা যদি সত্যসত্যই এমন হত যে ছাত্রদের চিত্তের সঙ্গে অধ্যাপকের চিত্তের যথার্থ আনন্দ বিনিময় হতে পারে তবে অধ্যাপনায় ক্লান্তি বোধ হত না। কিন্তু আমাদের দেশে যথার্থভাবে অধ্যাপনার সুযোগ কেউ পান না। যে অধ্যাপক সাহিত্যের যথার্থ মর্ম উদ্ঘাটন ও ছাত্রদের চিত্তবৃত্তির উদবোধন করতে চেষ্টা করেন, তেমন অধ্যাপক উৎসাহ পান না। ছাত্রেরাই তাঁর অধ্যাপনার প্রণালীর বিরুদ্ধে

নালিশ করে। তারা বলে, 'আমরা পাস করবার জন্যে এসেছি। নীল পেন্‌সিল দিয়ে দাগ দিয়ে আমাদের এমনতর ধারা দেখিয়ে দিতে হবে যাতে আমরা পাস করবার গহ্বরে গিয়ে পড়তে পারি।' এইজন্যই অধ্যাপনা করতে গিয়ে ভালো অধ্যাপকেরা ব্যথিত হন। ফলে নিষ্ঠুর-শিক্ষা দিতে গিয়ে তাদের মন কলের মতো হয়ে যায়, তাদের রসও শুকিয়ে যায়। আমাদের দেশে পড়ানোটা বড়ো নীরস। এজন্য মনোমোহন বড়ো পীড়া অনুভব করতেন। এই অধ্যাপনার কাজে তাঁকে অত্যন্ত ক্ষতিস্বীকার করতে হয়েছিল।

অনেক স্থলে ত্যাগস্বীকারের একটা মহিমা আছে। বড়োর জন্য ছোটোকে ত্যাগ করা, ভাবের জন্য অর্থ ত্যাগ করা ও আত্মার জন্য দেহকে ত্যাগ করার মধ্যে একটা গৌরব আছে। কিন্তু যেখানে যার জন্যে আমরা মূল্য দিই তার চেয়ে মূল্যটা অনেক বেশি, সেখানে ত্যাগ দুঃখময়। এই কবি— বিধাতা যাঁর হাতে বাঁশি দিয়ে পাঠিয়েছিলেন— তিনি যখন অধ্যাপনার কাজে বদ্ধ হলেন তখন তা তাকে কোনো সাহায্য করে নি। আমি তাঁর সেই বেদনা অনুভব করেছি। আজকের দিনে তাঁর স্মৃতিসভায় আমি সেই বেদনার কথা নিয়ে এসেছি। যে পাখিকে বিধাতা বনে পাঠিয়েছিলেন তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের খাঁচায় বদ্ধ করা হয়েছিল, বিধাতার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে। আজ আমাদের সেই বেদনার অনুশোচনা করবার দিন। তাঁর কন্যা লতিকা যা বললেন সে কথা সত্য। তিনি নিভৃতে কাব্য রচনা করে গিয়েছেন, প্রকাশ করবার জন্যে কোনো দিন ব্যগ্রতা অনুভব করেন নি, নিজেকে সর্বদাই প্রচ্ছন্ন রেখেছেন। একদিকে সেটা খুব বড়ো কথা। এই যে নিজের ভিতরে নিজের সৃষ্টির আনন্দ উপলব্ধিতে নিমগ্ন থাকা, নিঃস্বার্থভাবে প্রতিপত্তি আকাঙ্ক্ষা দূরে রাখা, সৃষ্টিকে বিশুদ্ধ রাখা— এ খুবই বড়ো কথা। তিনি কর্মকাণ্ডের ভিতরে যোগ দেন নি। সংসারের রঙ্গভূমিতে তিনি দর্শক থাকবেন, তাতে ঝাঁপিয়ে পড়বেন না এই ছিল তাঁর আদর্শ। কেননা দূর থেকেই বিচার করা যায় ও ভালো করে বলা যায়। কর্মের জালে জড়িত হলে তাঁর যে কাজ— বিশ্বরঙ্গভূমির অভিনয় দেখে আনন্দের গান গেয়ে যাওয়া— তাতে ব্যাঘাত হত। যেমন কোনো পাখি নীড় ত্যাগ করে যত ঊর্ধ্বে উঠে ততই তার কণ্ঠ থেকে সুরের ধারা উৎসারিত হতে থাকে, তেমনি কবি সংসার থেকে যত ঊর্ধ্বে যান ততই বিশুদ্ধ রস ভোগ করতে পারেন ও কাব্যের ভিতর দিয়ে তা প্রকাশ করতে পারেন। মনোমোহন ছিলেন সেই শ্রেণীর কবি। তিনি কর্মজাল থেকে নিজেকে নির্মুক্ত রেখে আপনার অন্তরের আনন্দালোকে একলা গান করেছিলেন। কিন্তু এ কথা আমি বলব যে, যদিও সাধারণতঃ সংসার-রঙ্গভূমির সমস্ত কোলাহলে আবদ্ধ হওয়া কবির পক্ষে শ্রেয় নয়, তথাপি কাব্যের ভিতর দিয়ে সকলের সঙ্গে নিজের সংযোগ স্থাপন না হলে একটা অভাব থেকে যায়। যদিচ জনতার বাণী মহাকাল সব সময়ে সমর্থন করেন না, তাহলেও খ্যাতি-অখ্যাতির তরঙ্গদোলায় দোলায়মান জনসাধারণের চিত্তসমুদ্র যে কবির বিহারক্ষেত্র এ কথা অস্বীকার করা যায় না। একান্ত নিভৃত যে কাব্য তাতে একটা সঙ্গহীনতার বেদনা আছে। মনোমোহন যে তাঁর কাব্য প্রকাশ করতে ব্যগ্র হন নি তাঁর কারণ এই যে, তিনি যে ভাষায় তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন সেই ইংরেজী ভাষায় তাঁর এত সূক্ষ্ম অধিকার ছিল যে আমাদের দেশে আমরা, যারা ইংরেজী ঘনিষ্ঠভাবে জানি নে, ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় নেই, আমাদের পক্ষে তাঁর কাব্যের সূক্ষ্ম উৎকর্ষ উপভোগ করা দুরূহ। তিনি জানতেন যে এ দেশে তাঁর সঙ্গ সম্পূর্ণভাবে জুটতে পারে না। যে কোনো বিদেশী ভাষা খুব ভালো জানে না তার পক্ষে সেই ভাষার সাহিত্যের

মধ্যে একটা অন্তরাল থেকে যায়। যেমন কঠিন জেনানা যাঁরা রক্ষা করেন তাঁদের পক্ষে অন্তঃপুরিকাদের নাড়ী দেখানো কঠিন হয়, পর্দার আড়াল থেকে একজন নাড়ী দেখে ডাক্তারকে বলে দিতে হয়, আমাদের পক্ষে ইংরেজী সাহিত্যও তাই। অন্তঃপুরবাসিনী সাহিত্যলক্ষ্মী আমাদের কাছে সম্পূর্ণ দেখা দেন না, আমরা শুধু তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। মুখের ভঙ্গিমা— যাতে অর্থ সুস্পষ্ট বোঝা যায় সেগুলি— আমরা দেখতে পাই না। আমি যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পাই নি তথাপি ইংরেজী সাহিত্য কিছু কিছু পড়েছি। আমি যখন শেলি ইত্যাদি পড়ি তখন কোনো কোনো জায়গায় রসটি ঠিক না বুঝলেও মনে করি মেনে নেওয়াই ভালো। এ ছাড়া গতি নেই, বিশেষতঃ যখন তা না করলে পাস করা অসম্ভব। ইংরেজীতে মনোমোহন ঘোষের অসাধারণ কৃতিত্ব ছিল। তিনি ইংলণ্ডে মানুষ হয়েছিলেন ও অক্সফোর্ডের গুণীদের সংসর্গ লাভ করেছিলেন। কাজেই সে দেশের ভাষার সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট পরিচয় ছিল। কিন্তু যে ভাষায় তিনি কাব্য রচনা করেছিলেন তার সম্পূর্ণ মিল এ দেশবাসীর পক্ষে অসম্ভব। এই বেদনা ছিল তাঁর জীবনে। তিনি কবি থেকে ইস্কুল মাস্টার হয়েছিলেন। আবার অসামান্য অধিকার নিয়ে যে ভাষায় তিনি তাঁর বাঁশি বাজিয়েছিলেন সে ভাষার দেশ এ দেশ নয়। তিনি বুঝেছিলেন কবির দিক থেকে তাঁর ঠিক সঙ্গ আমাদের দেশে পাওনা কঠিন। তিনি যদি চিরদিন ইংলণ্ডে থাকতেন তবে যেসব কবির সঙ্গ বাল্যে পেয়েছিলেন তাদের মধ্যে থেকে তিনি এত একলা হয়ে পড়তেন না। পরস্পরের সঙ্গে তাঁর রসবিনিময় হতে পারত। এই রস বিনিময়ের প্রয়োজন যে নাই এ কথা কখনো স্বীকার করা যায় না। মানুষের সহিত মানুষের সঙ্গের ভিতর দিয়েই প্রাণশক্তির উদ্‌বোধন হয়। মানুষের চিত্ত অন্য চিত্তের অপেক্ষা রাখে। কেউ অহংকার করে বলতে পারেন না, আমি কবি হিসাবে অন্যের অপেক্ষা রাখি নে। কিন্তু এই সঙ্গ না পেয়েও মনোমোহন ঘোষ হাল ছাড়েন নি। আপনার ভিতর সমাহিত হয়ে তিনি কাব্যের আরাধনা করে গেছেন। সে কাব্যের জয়জয়কার হোক। মানুষের সঙ্গে চিত্তের সম্বন্ধ স্থাপন করবার মধ্যে একটা গৌরব আছে। বিশ্বজগতের মানুষের সঙ্গে একটা সত্যকার যোগ হবে, আমাদের অন্তরের মধ্যে সে ইচ্ছা কি নেই? যখন সে সঙ্গ না পাই তখন অভিমানে বলি, কাউকে আমরা চাই নে। মানুষের সঙ্গে যোগ স্থাপনের মানুষের স্বাভাবিক ইচ্ছা যখন ব্যর্থ হয় তখনই আমরা অভিমান করে বলি, আমি কারো সঙ্গ চাই নে।

কবি মনোমোহনের কাব্যের যখন প্রকাশ হবে তখন সমস্ত পাশ্চাত্য দেশের কাছে বাংলা দেশের আলোক কি উজ্জ্বল হবে না? তারা কি বলবে না, এদের সৃষ্টির আশ্চর্য শক্তি আছে? প্রকাশ মানেই হচ্ছে বিশ্বজগতের সর্বত্র প্রকাশ। যে জ্যোতিষ্কের আলো আছে তার কেবল এপারে প্রকাশ, ওপারে নয়, এ তো হয় না। 'সাহিত্য' শব্দের ধাতুগত অর্থ আমি জানি নে। একবার আমি বলেছিলাম, 'সহিত' অর্থাৎ সকলের সঙ্গে যে সঙ্গলাভ। কালিদাস, বেদব্যাস প্রভৃতি সকল মহাকবি সমস্ত পৃথিবীর মানুষের কাছে ভারতের চিত্ত-জ্যোতিষ্ককে প্রকাশ করেছেন। সকলেই বলেছেন, এ কবি আমাদেরও কবি। সে সমস্ত ঐশ্বর্য দ্বারাই সম-কক্ষতার যোগ স্থাপিত হয়। সাহিত্য মানে সমকক্ষতার যোগ। এই কবি মনোমোহন নিগূঢ় নিকেতন থেকে যা বের করেছেন তা আজও ঢাকা রয়েছে। এ যখন প্রকাশ পাবে তখন বাংলা দেশের একটি মহিমা সর্বত্র প্রকাশিত হবে। আমরা যদিও একটু বঞ্চিত হয়েছি, কিন্তু তাতে তাঁর দোষ নেই। আর কবি তো কেবল ইংরেজও নয়, কেবল বাঙালীও নয়— কবি সকল দেশেরই কবি। এই কবির কাব্য প্রকাশ হলে

পর সকলেই আনন্দের সঙ্গে তাকে অভ্যর্থনা করবে। আজ তাঁর স্মৃতিতে আমি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। তাঁর কাব্যের সঙ্গে আমার কিছু পরিচয় ছিল; তিনি প্রায়ই তাঁর কাব্য আমাকে শুনাতেন। আমি শুনে মুগ্ধ হতেম। তাঁর প্রত্যেক শব্দচয়নের মধ্যে একটা বিশেষ সৌন্দর্য ছিল— আশ্চর্য নৈপুণ্যের সহিত তিনি তাঁর কাব্যের রূপ দিয়েছিলেন। আমার আশা আছে এ সকল কাব্য হতে সকল দেশের লোক আনন্দ পাবে— কেবল 'গৌড়জন' নহে— সমস্ত বিশ্বজন তাহে 'আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি'।

মনোমোহন-স্মৃতিসভায় রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ। প্রেসিডেন্সি **কলেজ** ম্যাগাজিন, **মার্চ** ১৯২৪

উপবিষ্ট: ভগিনী সরোজিনী ক্রোড়ে মাতা স্বর্ণলতা, পাশে ভ্রাতা অরবিন্দ

দণ্ডায়মান: জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিনয়ভূষণ, পিতা কৃষ্ণধন ও মনোমোহন ঘোষ

মনোমোহন ঘোষ

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্র, উনবিংশ শতকীয় ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের অন্যতম প্রতিনিধি কৃষ্ণধন ঘোষের পুত্র, অরবিন্দ বারীন্দ্রের অগ্রজ— জন্মসূত্রে এতখানি কৌলীন্য সংসারে দুর্লভ। মনোমোহনের শিক্ষা-দীক্ষাও সেকালের সব চাইতে কুলীন পাড়ায়— শৈশবে দার্জিলিঙের লরেটো কনভেণ্টে, কৈশোরে লণ্ডনের সেণ্ট পল্‌স্ স্কুলে এবং যৌবনে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেকালে এর চেয়ে বেশি কেউ ভাবতে পারত না। উৎকট বিলিতিয়ানা সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসুর সাবধান-বাণীতে কৃষ্ণধন কর্ণপাত করেন নি। নিজে মনে প্রাণে সাহেব সেজেছিলেন আর অমিট্ রায়ের পিতার মতো ভেবেছিলেন ছেলেদের বিলেতে রেখে তাদের মনে বিলিতি রঙ এমন পাকা করে আনবেন যেন দেশে এসেও লোপ সয়। অদৃষ্টের এমনি পরিহাস যে কনিষ্ঠ দুই পুত্রের বেলায় সে রঙ দেশে এসে তেরাত্তিরও টেকে নি। বিদেশে লালিত অরবিন্দ হলেন স্বদেশাত্মার বাণীমূর্তি, বারীন্দ্র স্বদেশাত্মার অগ্নিমূর্তি।

অদৃষ্টের পরিহাস না বলে একে ইতিহাসের পরিহাস বলাই ভালো। ইংরেজ সাধ করে এ দেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন করেছিল, ভেবেছিল ইংরেজি শিক্ষিত সম্প্রদায়ই হবে তাদের সত্যিকারের আপনজন। এমন-কি তারাই হবে সাম্রাজ্যের ধারক এবং বাহক। কিন্তু ফল এমনি উলটো হল যে সাধারণভাবে ইংরেজি শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং বিশেষ ভাবে যাঁরা বিলেতে গিয়ে বিলিতি শিক্ষাকে পাকা করে এনেছিলেন তাঁরাই হলেন ইংরেজ বিতাড়নের প্রধান উদ্যোক্তা। বলা বাহুল্য, ইংরেজ চরিত্রের নানা গুণে তাঁরা আকৃষ্ট ছিলেন, বিশেষ করে ইংরেজি ভাষা এবং সাহিত্য তাঁদের কাছে এক পরম ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। কিন্তু এক দিকে ইংরেজের সাহিত্য সংস্কৃতি অপর দিকে ইংরেজ শাসনের শোষণনীতি— এ দুয়ের মধ্যে যে কিছুমাত্র সামঞ্জস্য নেই এ কথা ইংরেজি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে যতখানি স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছিল এমন আর কারো কাছে নয়। ইংরেজের এক হাতে অমৃত অপর হাতে বিষ। সেদিন ইংরেজি শিক্ষায় যাঁরা ছিলেন অগ্রগামী তাঁরাই অগ্রণী হয়ে বিষপাত্র কণ্ঠে গ্রহণ করেছেন। অরবিন্দ বারীন্দ্র স্বদেশী মন্থনের নীলকণ্ঠ। অগ্রজ মনোমোহনও অপর দুই ভ্রাতার ন্যায় স্বদেশবৎসল ছিলেন। বিষক্ষরণ তাঁর মনেও হয়েছে। ব্রিটিশ শোষণের কদর্যতা মনকে পীড়িত করেছে। স্বদেশে প্রত্যাগমনের পরে ইংরেজ বন্ধুকে লিখছেন— The system of government is rotten to the core। বলেছেন, তোমার স্বদেশবাসীরা এ দেশে কি অত্যাচার চালাচ্ছে ছ হাজার মাইল দূরে ওখানে থেকে তোমরা তা জান না বলেই লজ্জার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছ। অন্যত্র বলেছেন, ইংরেজ শাসনের সুযোগ সুবিধা তবু যৎকিঞ্চিৎ পাচ্ছেন মুষ্টিমেয় ইংরেজি শিক্ষিতের দল, এ ছাড়া দেশের কোটি কোটি মানুষ শুধু যে অনাদৃত এমন নয়, তারা নির্যাতিত। এ অবস্থায় লজ্জাটা আমরা যারা শিক্ষিত তাদেরই। অগণিত নগণ্যদের সঙ্গে তুলনা করে তিনি নিজেকে অপরাধী মনে করতেন। লক্ষ্য করবার বিষয় যে দেশ ছেড়ে গিয়েছেন সাত বছর বয়সে, ফিরেছেন পঁচিশ বছর বয়সে। দেশকে জানবার চিনবার সময় সামান্যই পেয়েছেন অথচ বুঝতে কিছুই ভুল হয় নি। দেশপ্রেম রক্তের মধ্যে সঞ্চারিত ছিল বলেই এটি সম্ভব হয়েছে।

দীর্ঘকাল বিদেশে থেকেও শৈশবে দেখ দেশকে ভুলতে পারেন নি। ওদেশে বসেই একটি কবিতায় বলেছেন—

While I recall you o'er deep parting seas,
Lonelier have grown these cliffs, this English grass.

অবশ্য দেশকে ভালোবেসেই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন, দেশোদ্ধারের ব্রত গ্রহণ করেন নি। ভ্রাতাদের ন্যায় সম্মুখ-সমরে অবতীর্ণ হন নি, বলা যেতে পারে বিশল্যকরণীর সন্ধান করেছেন। মনে মজ্জায় কবি, চিন্তা ভাবনা আলাদা। ভেবেছিলেন, শিক্ষা সংস্কৃতির মধ্য দিয়েই ক্রমে বোঝাপড়া বাড়বে, আদানপ্রদানের মধ্য দিয়ে ইংরেজ-ভারতবাসীতে সেতুবন্ধন হবে। ইংরেজের কাছ থেকে একটু বেশি আশা করেছিলেন— 'একদিন চিনে নেবে তারে··· অনাদরে যে রয়েছে কুণ্ঠিতা··· সরে যাবে নবারুণ আলোকে এই কালো অবগুণ্ঠন।' ভুল করেছিলেন, শ্বেত দ্বীপের অধিবাসীদের চোখে কালো অবগুণ্ঠন সহজে ঘোচে না। সাহিত্যের আসরে কোনো বিদেশীকে ইংরেজ সহজে আমল দেয় না (এত বড় ইংরেজি সাহিত্যে রসেটি এবং কনরাড ছাড়া আর কোনো বিদেশী লেখক প্রথমশ্রেণীতে আসন লাভ করেন নি)। আমাদের ইংরেজি শিক্ষিত সমাজে যে কবি সর্বপ্রথম বিদেশী সরস্বতীর জন্য বিদেশী ভাষায় নৈবেদ্য সাজিয়েছিলেন তিনি তা দিয়ে গৌড়জনদের মন ভোলাতে পারেন নি, পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে স্বদেশী ভাষায় গৌড়জনদের জন্যে মধুচক্র রচনা করেছিলেন।

তথাপি ইংরেজি ভাষায় কাব্য রচনা করেছেন এমন ভারতীয়ের সংখ্যা কিছু কম নয়। এঁদের মধ্যে অনেকে ও দেশের কবি-সাহিত্যিকদের কাছে ব্যক্তিগত প্রশংসা লাভ করেছেন, কিন্তু ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে কারোই স্থান হয় নি। মনোমোহন ঘোষ যেসব সাহিত্যরথীর স্তুতি লাভ করেছিলেন যে কোনো কবির পক্ষে তা শ্লাঘার বিষয়। তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত *Song of Love and Death* সম্পর্কে ইয়েটস্ বলেছিলেন— one of the most lovely works in the world। ওয়ালটার ডে লা মেয়ার তাঁর কবিতায় 'verbal music'এর প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু তারও আগে অধিকতর উল্লেখযোগ্য কথা বলেছেন ওসকার ওয়াইলড— how quick and subtle are the intellectual sympathies of the Oriental mind and suggest how close is the bond of union that may some day bind India to us by other methods than of commerce and military strength। অনাগত ভবিষ্যতের কথা ভেবে বলেছিলেন, বণিকের মানদণ্ডে এবং শাসকের রাজদণ্ডের জোরে আজ যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, বুদ্ধির ক্ষেত্রে ভাবের বিনিময়ে একদা সে সম্পর্ক নতুন করে নির্ধারিত হবে। আজ সে পরীক্ষার দিন এসেছে। যা হোক, এ কথা স্বীকার করতে হবে যে সাময়িকভাবে সাহিত্যরথীদের স্তুতি লাভ করা এক কথা আর কালের পরীক্ষায় ইতিহাসে স্থান করে নেওয়া অন্য কথা। ইংলণ্ডে দু-এক দশক অন্তর সমকালীন কবিদের কবিতা নিয়ে কাব্যসংকলন বা Anthology প্রকাশের রেওয়াজ আছে। Anthologyতে স্থান লাভ করলে কবিকৃতির স্বীকৃতি বলে গণ্য করা যেতে পারে। এরূপ কোনো সংকলনে মনোমোহন ঘোষের কবিতা স্থান পেয়েছে বলে আমার জানা নেই। উল্লেখ করা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ সে সম্মান লাভ করেছিলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও Cambridge History of English Literatureএর বিচারে তিনি minor poet বলে সাব্যস্ত হয়েছেন। কবিত্ব জিনিসটা কবিমনের ধর্ম, বিদেশী ভাষায়

প্রকাশ করতে গেলে সে ধর্ম বা quality যে অনেকখানি ঢাকা পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি কাব্য বিচারে সেই কথাটি প্রমাণিত হয়েছে। এই নিয়ে ইংরেজ পাঠকের সঙ্গে বিবাদ করা চলে না। এক দেশের মহৎ সাহিত্য অপর দেশ নিজের তাগিদে নিজেই অনুবাদ করে নেয়। কবি স্বয়ং বা কবির দেশবাসীরা করেন না। এটাই সাহিত্যজগতের নিয়ম, আমরা সে নিয়ম পালন করি নি। রবীন্দ্রনাথ নিজে অনুবাদ করেছিলেন বলেই তাঁকে ইংরেজি ভাষার একজন লেখক হিসাবে গ্রহণ করে minor poet আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অনুবাদ-কার্যটা ইংরেজের উপরে ছেড়ে দিলে ইংরেজি সাহিত্যের বিচারালয়ে তাঁকে প্রবেশ করতে হত না।

বলা বাহুল্য অনুবাদ প্রসঙ্গে যে কথা বলেছি মনোমোহন ঘোষের কবিতা সম্পর্কে সে কথা প্রযোজ্য নয়, কারণ বিদেশী ভাষায় লেখা হলেও সে কবিতা অনুবাদ নয় এবং সে ভাষায় যে তিনি কবিত্ব প্রকাশ করেছেন সেটাও তাঁর পক্ষে পরধর্ম নয়। মাতৃভাষা কথাটা একটা সংস্কার। যে ভাষায় যাঁর অধিকার জন্মেছে সে ভাষাই তাঁর আপন ভাষা। মাতৃভাষার উপরেও অধিকার কেউ জন্মসূত্রে লাভ করে না, চর্চার দ্বারা সে অধিকার অর্জন করতে হয়। মনোমোহন আশৈশব যে ইংরেজি ভাষার চর্চা করেছেন সে ভাষাই তাঁর আপন ভাষা। কবি-মানুষের কবিত্বশক্তিটি স্বভাবজাত, তার বাহন বা প্রকাশের মাধ্যম রুচি এবং চর্চা -নির্ভর। কাজেই ইংরেজি ভাষায় কাব্য রচনা করে মনোমোহন ভুল করেছিলেন এমন মনে করবার কোনো কারণ নেই। তাঁর পক্ষে যা স্বাভাবিক ছিল তাই তিনি করেছেন। বাদ সেধেছে তাঁর খণ্ডিত জীবন। জীবনের প্রথমার্ধ কেটেছে বিদেশে, দ্বিতীয়ার্ধ দেশে। দেশে এসে দেশের মন পান নি। অপর পক্ষে যে ইংল্যাণ্ড তাঁর মনকে গড়ে দিয়েছিল সে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গেও বিচ্ছেদ ঘটেছে। কালের পরিবর্তনে সাহিত্যের রুচিতে এবং মর্জিতে যে পরিবর্তন এসেছিল তার সঙ্গে পুরোপুরি যোগ রক্ষা করতে পারেন নি। যৌবনে যাঁরা ছিলেন তাঁর কবি-জীবনের সহচর— Lionel Johnson, Ernest Dowson, Laurence Binyon প্রভৃতি— তাঁরা চোখের সুমুখে ইয়ুরোপীয় জীবনের যে রূপান্তর লক্ষ্য করেছেন সে অনুযায়ী কাব্যের বিষয়-আশয়ের পরিবর্তন করেছেন। মনোমোহনের পক্ষে তা সম্ভব হয় নি। ভিক্টোরীয় ইংল্যাণ্ডকেই তিনি চিনতেন জানতেন। বিংশ শতকের ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎপরিচয় হয় নি। অবশ্য ভিক্টোরীয় কাব্যের চাইতে এলিজাবেথীয় গীতিকাব্যের প্রতিই তাঁর অনুরাগ বেশি ছিল। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তাঁর প্রেমের কবিতা স্থানে স্থানে এলিজাবেথীয় কাব্যের সৌগন্ধযুক্ত। এ কথা স্বীকার করতে হবে যে কাব্যরচনায় তিনি নতুনত্বের প্রয়াসী ছিলেন না। নিজেই বলেছেন— How we have sacrificed form and expression in our devotion for modern thought and for contemporary subject matter, and the idea that a poet should have something new to say। তিনি এতই আত্মনিমগ্ন মানুষ ছিলেন যে কবিকেও যে কালের দাবি পুরণ করতে হয় সে কথা বোধকরি তাঁর খেয়ালেই আসে নি। এমনও হতে পারে আমার এ অনুমান পুরোপুরি সত্য নয় কারণ তাঁর রচনার বৃহত্তর অংশই অপ্রকাশিত। সমগ্র রচনাবলী প্রকাশিত হলে হয়তো দেখা যাবে তিনি কালের বিচারে পিছিয়ে থাকেন নি।

সাহিত্যরসে মগ্ন ছিল তাঁর মন। দেশে এসে অধ্যাপনার কাজ গ্রহণ করেছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে যোগ্য কাজ বলে মনে হতে পারে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যোগ্য কাজ নয়। যে মানুষ কবি তিনি রসস্রষ্টা, তিনি

টীকাকার নন। যিনি কাব্যরচয়িতা তিনি কাব্যব্যাখ্যাতা নন। পরীক্ষা-ভারাক্রান্ত অধ্যাপনা-কার্যে রস পরিবেশনের অবকাশ অতিশয় সংকীর্ণ। যথার্থ রসিকজনের পক্ষে এ কাজের মত বিড়ম্বনা আর কিছু হতে পারে না। পরীক্ষার খেয়া পারাপারের কাজ তাঁর কাছে অসহনীয় মনে হয়েছে। বন্ধুজনের কাছে চিঠিপত্রে সেই মর্মবেদনাটি প্রকাশ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে যে স্মৃতিসভার আয়োজন হয়েছিল তাতে রবীন্দ্রনাথ ঐ দুঃখের কাহিনীটি বিশেষভাবে বর্ণনা করেছিলেন[১]। বলা বাহুল্য নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই মনোমোহন অধ্যাপনা-কার্য থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন।

কৈশোরে যৌবনে যাঁদের সঙ্গে মন মিলিয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে বিপুল পারাবারের ব্যবধান, এদিকে দেশে এসেও মনের মত সঙ্গী সাথী তিনি খুঁজে পান নি— যাঁদের সঙ্গে মনে আদানপ্রদান চলতে পারে। নিজের ত্রিশঙ্কু অবস্থার বর্ণনা করে বলেছেন এ দেশে ইংরেজ রাজকর্মচারীরা নেটিভ'দের সহজে আমল দেয়-না, অপর পক্ষে স্বদেশীয়রাও তাঁর English upbringing-এর দরুণ বিজাতীয় জ্ঞানে তাঁকে দূরে ঠেলে রেখেছে। বিলেতের স্কুলে অধ্যয়নকালে একদিন বালক মনোমোহন শেক্সপীয়ারের—

Mislike me not for my complexion,
The shadowed livery of the burnished sun !

পংক্তিটি উদ্ধৃত করে শিক্ষক ছাত্র সকলকে চমকিত করে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ঐ উক্তিটি তাঁর জীবনে irony হয়ে দেখা দিয়েছে। 'shadowed livery of the burnished sun'এর মর্যাদা দেশবাসীর কাছ থেকেও পান নি। বিদেশে যেমন বিদেশী ছিলেন, দেশে এসেও বিদেশী প্রতিপন্ন হলেন। বন্ধু লরেন্স বিনিয়ন্ একে বলেছেন— doubly exiled lot। বাংলা দেশের শ্যামলা রঙ গায়ে মেখে এবং বাঙালী সুলভ অতিশয় কোমল হৃদয়ের অধিকারী হয়েও স্বদেশের মন পান নি, এটি তাঁর জীবনের গভীরতম ট্র্যাজেডি। নিজ বাসভূমে পরবাসী হয়েই জীবন কাটাতে হয়েছে।

কবিমানুষ, কাব্য সাহিত্যের আলোচনাই সে মনের অন্নজল। মন সারাক্ষণ তৃষার্ত হয়ে থাকত। বলেছেন, 'I long insatiably for some intellectual excitement to have some one to talk about poetry with'। রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য যে কী ভাবে যাচ্ঞা করেছেন চিঠিপত্রে তার নিদর্শন আছে। দুজনের আবাল্য পরিচয়, সেই রবীন্দ্রনাথের প্রথম য়ুরোপ প্রবাসের কাল থেকে। পরবর্তীকালে কবি হিসাবে উভয়েই উভয়ের প্রতি গভীর ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু যোগাযোগ যতখানি হতে পারত ততখানি হয়ে ওঠে নি ; কারণ রবীন্দ্রনাথ তখন শিলাইদহে, মনোমোহন অধ্যাপনা-কার্যে ঢাকায় কিম্বা কলকাতায়। স্ত্রী, কন্যা এবং আপন কাব্যরচনা নিয়ে একটি সুখের নীড় গড়ে তুলেছিলেন, সে সুখও স্থায়ী হয় নি। স্ত্রী দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে শয্যা গ্রহণ করলেন, নিঃসঙ্গ জীবনে যাঁর মুখের বাক্য ছিল আনন্দের প্রধানতম উৎস, যাঁর সম্বন্ধে কবিতায় বলেছেন, 'you of song-birds the sweetest' তিনি বাক্‌শক্তি রহিত হলেন। মনোমোহনের জীবন আরো সংকুচিত হয়ে এল। একটা সময় গিয়েছে যখন বাইরে বিরস অধ্যাপনার কাজ আর ঘরে এসে রুগ্না স্ত্রীর পরিচর্যা ব্যতিরেকে অন্য কোনো কাজ ছিল না। সে জীবনের নিঃসঙ্গতা যে কী মর্মান্তিক একটি উক্তিতেই তা প্রকাশ পেয়েছে— 'For years not a friendly step has crossed my threshold'। চার্লস্ ল্যাম যখন তাঁর উন্মাদ ভগিনীর

১ বর্তমান সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ দ্রষ্টব্য, পৃ ৫-৮

পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিলেন তখন তাঁকেও আপিস আর বাড়ি— এই করে বছরের পর বছর কাটাতে হয়েছে। বলেছেন, বন্ধুপরিবৃত আনন্দলোক থেকে তিনি চিরদিনের জন্য নির্বাসিত হয়েছেন। এঁরা দুজনেই শহুরে প্রকৃতির মানুষ— মনুষ্যসংসর্গ বিশেষভাবে এঁদের কাম্য ছিল। ল্যাম ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রকৃতি কাব্যের বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন, তথাপি বলেছিলেন, সারা জীবনে কোনো শৈলচূড়া কিম্বা কোনো বনভূমি প্রত্যক্ষ না করেও তিনি দিব্য জীবন কাটিয়ে দিতে পারেন। মনোমোহন এমন সর্বান্তঃকরণে কবিমানুষ ছিলেন যে মনে করা যেতে পারত, মনুষ্যসংসর্গের চাইতে প্রকৃতির আত্মীয়তা তাঁর কাছে অধিকতর কাম্য কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। একটি কবিতায় বলেছেন—'O murmer of men more sweet than all the wood's caresses'। ল্যাম্‌এর ন্যায় সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতি-বিমুখ না হলেও দুজনের দৃষ্টিভঙ্গিতে বেশ খানিকটা মিল আছে। দুঃখের কথা যে একান্ত বাঞ্ছিত মানুষের সঙ্গলাভ মনোমোহনের জীবনে আর হয়ে ওঠে নি। স্ত্রীর মৃত্যুর পরে সেই নিঃসঙ্গতা আরোই বেড়েছে। স্ত্রীর প্রতি তাঁর গভীর প্রেম এবং পত্নীর মৃত্যু তাঁর জীবনে কী শূন্যতার সৃষ্টি করেছে Immortal Eve এবং Orphic Mysteries নামক কবিতাগুচ্ছে তা প্রকাশ পেয়েছে। প্রত্যেকটি কবিতা কবির প্রাণ থেকে উৎসারিত এবং সেই কারণেই পাঠকের কাছেও প্রাণস্পর্শী। এর কাব্যসৌন্দর্য অবিসংবাদিত।

জীবনের অধিকাংশ আশা-আকাঙ্ক্ষায় তিনি পরাভূত। ভগ্নহৃদয় ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে ভেবেছিলেন যে ইংল্যাণ্ড কৈশোরে যৌবনে তাঁর মনকে লালন করেছে, দেহমনের শুশ্রূষার জন্যে সেখানেই আবার ফিরে যাবেন। কিন্তু সে অভিলাষটিও পূর্ণ হয় নি। যাত্রার সমস্ত ব্যবস্থা যখন প্রস্তুত তখন অকস্মাৎ জীবন-প্রদীপ নির্বাপিত হল (৪ জানুয়ারি ১৯২৪)। বয়স পঞ্চান্নও পূর্ণ হয় নি। অনতিদীর্ঘ জীবনের যেটুকু আনন্দ তা তিনি কাব্যরচনার মধ্যেই পেয়েছেন, তাও যা রচনা করেছেন— তার সামান্য অংশই প্রকাশিত হয়েছে। জীবদ্দশায় দুখানা মাত্র কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল— *Primavera* এবং *Love Songs and Elegies* তাও প্রথমটি তাঁর একলার রচনা নয়, চার বন্ধুর কবিতা সমষ্টি। লরেন্স বিনিয়ান-কৃত ভূমিকা সম্বলিত *Songs of Love and Death* নামক কবিতাগ্রন্থ মৃত্যুর পরে প্রকাশিত। শুনেছি অপ্রকাশিত রচনা প্রকাশের ভার গ্রহণ করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত সমগ্র কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কাব্যামোদী সমাজের কৃতজ্ঞতা অর্জন করবেন। কবি হিসাবে তাঁর অসম্পূর্ণ পরিচয় খানিকটা পূর্ণতা লাভ করবে। এই সূত্রে বলে নেওয়া প্রয়োজন যে ইংরেজ পাঠক তাঁর কাব্যকে কতখানি মূল্য দিল না-দিল সেটাই তাঁর কাব্যের একমাত্র বিচার নয়। বিদেশী আচ্ছাদনে আবৃত হলেও এ কাব্যের ভারতীয় সত্তা সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন নয়। এজন্যে আশা করা যায় যে ভারতীয় পাঠকের কাছে এর আবেদন ব্যর্থ হবে না। দেশে আজ ইংরেজি শিক্ষিতের সংখ্যা খুব কম নয়। আর এ কথা বললে বোধ করি ভুল হবে না যে এককালে মনোমোহন ঘোষকে দেশবাসী যতখানি denationalised মনে করেছে আজকে ততখানি করবে না। কারণ আজকের দিনে আমরা শিক্ষিতেরা সকলেই অল্পবিস্তর denationalised। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে তাঁকে দেশবাসীর কাছে যতখানি বিজাতীয় মনে হয়েছে আজকে ততখানি মনে হবে না। তাছাড়া বাঙালী কবি যদি সংস্কৃত ভাষায় কাব্য রচনা করে বাঙালীর হৃদয় জয় করে থাকেন— ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত আছে— তাহলে ইংরেজি ভাষায় কাব্য রচনা করে বাঙালী তথা ভারতবাসীর মনকে স্পর্শ করা যাবে না, এমন কথা মনে করবার কোনো কারণ দেখি না। কারণ জয়দেবের

কালে বাঙালী সমাজে সংস্কৃতের চর্চা যতখানি ছিল, আমার তো মনে হয়, আজকের সমাজে ইংরেজির চর্চা তার চাইতে ঢের বেশি।

উপসংহারে আর-একটি কথাও উল্লেখযোগ্য। কাব্যরচনার মধ্যেই কবির একমাত্র পরিচয় নয়। কবি যে জীবন যাপন করেন তাও তাঁর কাব্যের অন্তর্গত। জনকোলাহল থেকে দূরে, কৌতূহলী দৃষ্টির অন্তরালে একান্ত নিভৃতে তাঁর কাব্যনিবেদন সলাজকুণ্ঠিত গোপন অভিসারের ন্যায় কাব্যগন্ধী। শিক্ষায় রুচিতে মননে বচনে— এমন কায়মনোবাক্যে কবিমানুষ সংসারে দুর্লভ। মনোমোহন ইয়ুরোপীয় ক্লাসিক্‌স্‌এর রসগ্রাহী ছাত্র ছিলেন। গ্রীক সাহিত্যে তাঁর প্রবেশ ছিল সুগভীর। একটু বিশ্লেষণ করে দেখলে স্পষ্টত প্রতীয়মান হবে যে তাঁর নিজের জীবনটি একটি যেন পূর্ণাঙ্গ গ্রীক ট্র্যাজেডি। জীবনে সিদ্ধিলাভে সমৃদ্ধিলাভে কোনোই বাধা ছিল না, সফলতা লাভের সমস্ত উপকরণ সজ্জিত ছিল কিন্তু কোনো বৈরী দেবতার অশুভ নিশ্বাসে সমস্তই যেন কীটদষ্ট পুষ্পের ন্যায় নিষ্ফল হয়ে গিয়েছে। কবিমন স্বভাবতই সমধর্মী মানুষের সঙ্গ এবং সহানুভূতির আকাঙ্ক্ষী। আশৈশব দীর্ঘ আঠারো বৎসর বিদেশে কাটিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তনের পরে দেশের প্রথম অভিজ্ঞতা তাঁর কাছে রীতিমত লোভনীয় মনে হয়েছিল। লিখেছেন, 'I have been staying at a beautiful country place called Baidyanath, in my grandfather's house, all among the mountains and green sugarcane fields and shallow rivers. My own people I found charming and cultivated folk, and spent an extremely pleasant time among them. This I think very fortunate indeed— to find at once friends, and that of one's own blood, so congenial and interesting as soon as I landed'। রাজনারায়ণ বসুর গৃহপরিবেশে তিনি যে আনন্দলোকের সন্ধান পেয়েছিলেন সে আনন্দ তিনি বেশি দিন ভোগ করতে পারেন নি। কার্যোপলক্ষে প্রথমে পাটনায়, পরে ঢাকায় চলে যেতে হয়েছে। বাংলা ভাষায় কথোপকথনে অভ্যস্ত ছিলেন না বলে ক্রমে স্বদেশীয় সমাজ থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন, মানসিক সজীবতার পরিপোষক বন্ধু সংসর্গ এবং সমধর্মী মানুষের সঙ্গে ভাববিনিময়ের সুযোগ থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছেন। পূর্বে যে খণ্ডিত জীবনের কথা বলেছি সেটিই দুর্দৈবের মূলে। বিদেশী চিন্তনে, বিদেশী ভাষণে আর স্বদেশী মননে ঠিক জোড়া লাগে নি, কোথাও অসংগতি থেকে গিয়েছে। জীবনের ছন্দে যখন অসংগতি বা disharmony দেখা দেয় তখনই ট্র্যাজেডির সূত্রপাত হয়। কবি মনোমোহনের জীবনে যে ট্র্যাজেডি ঘটেছে সেই ট্র্যাজেডীর প্রকৃত সংজ্ঞা মিলবে রবীন্দ্রনাথের ভাষায়— 'জড়িয়ে গেছে সরু মোটা দুটো তারে, জীবনবীণা ঠিক সুরে তাই বাজে না রে'।

চতুর্থ প্রস্থান এবং পঞ্চম পুরুষার্থ

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

প্রস্থান অর্থে গতি অর্থাৎ চলা। গতি থাকিলেই তাহার জন্য পথ চাই, চলিবার মানুষ চাই। যাহা হউক সংক্ষেপে আমরা প্রস্থান শব্দের গতি অর্থই গ্রহণ করিতেছি। যদিও তাহার মধ্যে পথ এবং পথের মানুষের কথা অনুস্যূত রহিয়াছে।

আচার্য শঙ্কর এই প্রস্থানের উপরেই হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা তথা স্থায়িত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ববর্তী আচার্যগণের উল্লেখ করিতে গিয়া জটিলতার সৃষ্টি করিতে চাহি না। আচার্য শঙ্করের মতে প্রস্থান তিনটি। তদবধি প্রস্থানত্রয়ের কথাই প্রচলিত রহিয়াছে। প্রথম শ্রুতিপ্রস্থান— উপনিষদ। আচার্য শঙ্কর কঠ কেন আদি দশটি উপনিষদকে প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এই দশ উপনিষদ-ভাষ্যে আপনার অদ্বৈত মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছিলেন। দ্বিতীয় ন্যায়-প্রস্থান অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শন। আপন বেদান্তভাষ্যের আলোকেও আচার্য স্বমতের সমর্থন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৃতীয় স্মৃতি-প্রস্থান অর্থাৎ শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা। গীতাভাষ্য প্রণয়নপূর্বক শঙ্করাচার্য অদ্বৈত মতেরই প্রতিষ্ঠা করেন।

অতঃপর স্বমতের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে সকলকেই এই প্রস্থানত্রয়ের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। অধুনা কেহ কেহ আচার্য নিম্বার্ক দেবকে আচার্য শঙ্করের পূর্ববর্তীরূপে প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।[১] শ্রীনিম্বার্কের বেদান্তভাষ্যে পরমত-খণ্ডনের কোনো প্রসঙ্গ নাই। আচার্য রামানুজ, আচার্য মধ্ব, আচার্য বিষ্ণুস্বামী এবং বল্লভ সকলেরই উপজীব্য এই প্রস্থানত্রয়। বাঙলার প্রেমের ঠাকুর মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যচন্দ্র বলিতেন বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ ভাগবত। এইজন্যই তাঁহার সমকালীন কিংবা অব্যবহিত পরবর্তী সুপণ্ডিত ভক্তমণ্ডলীর কেহ বেদান্তের অথবা অপর দুইটি প্রস্থানের ভাষ্য বা টীকা প্রণয়নে উদ্যোগ করেন নাই। কিন্তু এই অবস্থা বেশি দিন চলিল না। কোনো কোনো অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব আপত্তি উত্থাপন করিলেন— শ্রীচৈতন্য-মতানুবর্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ 'পন্থাই', ইঁহাদিগকে সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব বলা চলে না। যেহেতু প্রস্থানত্রয়ের উপর ইঁহাদের কোনো টীকা-ভাষ্য নাই। এই আপত্তির প্রত্যুত্তরে সুপণ্ডিত শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ বেদান্তের গোবিন্দভাষ্য প্রণয়ন করেন। পরে তিনি উপনিষদ ও গীতা-ভাষ্যেও শ্রীমহাপ্রভু-প্রবর্তিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ স্থাপন করিয়াছিলেন।

ধর্মজগতে এই প্রস্থানত্রয়ের পর শ্রীচৈতন্য চরণানুচর শ্রীপাদ্ রূপ গোস্বামী অপর-একটি প্রস্থানের প্রতিষ্ঠা করেন, ইহার নাম 'রসপ্রস্থান'। আমরা দার্শনিক বিচার সমর্থিত এই রসপ্রস্থানকেই 'চতুর্থ প্রস্থান' নামে অভিহিত করিতেছি। চতুর্থ প্রস্থানের কথা পরে বলিতেছি।

সাহিত্যজগতেও কয়েকটি প্রস্থানের কথা প্রসিদ্ধ। আচার্য ভরতের নাট্যসূত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত মতবাদ 'রসপ্রস্থান' নামে পরিচিত। পরবর্তী আলংকারিক ভামহ এবং উদ্ভট 'অলঙ্কার-প্রস্থানের' প্রবর্তক। আচার্য দণ্ডী 'গুণপ্রস্থানে'র, বামন 'রীতিপ্রস্থানে'র, আচার্য আনন্দ বর্ধন 'ধ্বনি বা রস প্রস্থানে'র এবং কুন্তক 'বক্রোক্তি প্রস্থানে'র আচার্য রূপে বিখ্যাত।

---

১ ডক্টর অমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য তাঁহার নিম্বার্কদর্শন গ্রন্থে এই মত উপস্থাপিত করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন শব্দ ও অর্থের এই লোক-বিলক্ষণ চারুত্ব শব্দ ও অর্থের কতকগুলি বিলক্ষণ ধর্মের উপর নির্ভর করে। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বহিরঙ্গ, কতকগুলি অন্তরঙ্গ। বহিরঙ্গ ধর্মগুলি অলঙ্কার— শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার। আর অন্তরঙ্গ ধর্মগুলি গুণ— শব্দগুণ ও অর্থগুণ রূপে প্রসিদ্ধ। অপর এক সম্প্রদায় বলেন— কাব্যের বিষয়ীভূত শব্দ ও অর্থের এমন কতকগুলি অসাধারণ ব্যাপার আছে যাহা লৌকিক শব্দ ও অর্থের অগোচর। এই শ্রেণীর আচার্যগণকে আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে; একদল বলেন ভণিতি বৈচিত্র্য বা লোক বিলক্ষণরূপে শব্দ ও অর্থের বিন্যাস বা প্রয়োগ রূপ ব্যাপারই কাব্যের চারুতার কারণ। আর-এক শ্রেণীর আচার্য বলেন যে কাব্যের অন্তর্গত শব্দ ও অর্থের একটি অলৌকিক শক্তি বা ব্যাপার আছে যাহা ভোগীকৃতি বা আস্বাদ জনকতা, যাহা ব্যবহারিক শব্দার্থ যুগলের ক্ষেত্রে দুর্লভ। ইহাই কাব্যের বৈলক্ষণ্য— কাব্যত্বের প্রযোজক। তৃতীয় সম্প্রদায় বলেন— গুণ বা অলঙ্কার বা ব্যাপার তাহা ভণিতি বৈচিত্র্যিই হউক বা ভোগীকৃতি হউক কোনোটিই কাব্যের সারভূত তত্ত্ব নহে। কাব্যের বৈলক্ষণ্যের প্রযোজক হইতেছে ব্যঙ্গার্থ বা প্রতীয়মান অর্থ যাহা শব্দের বাচ্যার্থ বা লক্ষ্যার্থ হইতে পৃথক। যে রচনায় এই ব্যাঙ্গ্যার্থের প্রতীতি ঘটিয়া থাকে তাহাই কাব্যপদবাচ্য, অন্যথা নহে। কাব্যের সহিত ব্যবহারিক শব্দার্থযুগলের পার্থক্য শুধু এই ব্যাঙ্গ্যার্থের সদ্ভাব ও অসদ্ভাব লইয়া।[২]

মানবদেহের সহিত আত্মার সম্পর্ক লইয়া যেমন বিভিন্ন দার্শনিকগণের মধ্যে মতভেদ প্রচলিত, সেইরূপ কাব্যদেহের (শব্দ ও অর্থের) সহিত কাব্যের সারভূত পদার্থ বা আত্মার সম্পর্ক লইয়াও কাব্যমীমাংসক-গণের মধ্যে চিরন্তন মতভেদ চলিয়া আসিতেছে।

আনন্দ বর্ধনের ধ্বন্যালোকের টীকাকার অভিনবগুপ্ত। অভিনব যেমন একমাত্র রসকেই কাব্যের তাৎপর্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তৎপূর্ববর্তী আর কেহই সেরূপ করেন নাই। তৎপরবর্তীদের মধ্যেও আবার অনেকে সম্পূর্ণ ভাবে অভিনবের মত গ্রহণ করেন নাই। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে ভামহ প্রভৃতিরা শব্দার্থের সাহিত্যকে কাব্য বলিয়াছেন। রুদ্রট বলিয়াছেন, 'নমু শব্দার্থৌ কাব্যং'। এই বলিয়া শব্দ ও অর্থকে কাব্য বলিয়াছেন। কুন্তক বক্রোক্তিযুক্ত শব্দার্থের সাহিত্যকে কাব্য বলিয়াছেন। মম্মট বলিয়াছেন স-গুণ ও দোষবর্জিত শব্দার্থই কাব্য। প্রতাপরুদ্র যশোভূষণ ও বিদ্যাধর মোটামুটি মম্মটকেই অনুসরণ করিয়া 'গুণালঙ্কার সহিতৌ শব্দার্থৌ দোষ বর্জিতৌ' এই লক্ষণ করিয়াছেন। বাগভট্টও তাঁহার কাব্যানুশাসনে প্রায় এইরূপই বলিয়াছেন, 'শব্দার্থৌ নির্দোষৌ সগুণৌ প্রায়ঃ সালঙ্কারৌ চ কাব্যম্'। বামন বলিয়াছেন যে রীতিই কাব্যের আত্মা। দণ্ডী কাব্যের শরীরভূত শব্দের উপরেই বিশেষ জোর দিয়াছেন। অগ্নিপুরাণও অনেকটা দণ্ডীর মতই অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু বিশ্বনাথ সাহিত্যদর্পণে এবং কেশব মিশ্র তাঁহার অলঙ্কার-শেখর গ্রন্থে অভিনবকেই অনুসরণ করিয়াছেন। বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে রসাত্মক বাক্যকেই কাব্য বলে। কেশব মিশ্রও বলিয়াছেন রসই কাব্যের আত্মা। 'অলঙ্কারস্তু শোভায়ৈ রস আত্মা পরে মনঃ'।

ভোজ বলিয়াছেন—

নির্দোষং গুণবৎ কাব্যমলঙ্কারৈরলঙ্কৃতম্।
রসান্বিতং কবিঃ কুর্বন কীর্তিং প্রীতিঞ্চ বিন্দতি॥

২ দ্র° শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, 'ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের ভূমিকা'

এখানেও মম্মটের দোষাভাব গুণ ও অলঙ্কারকেই তিনি প্রাধান্য দিয়াছেন, যদিও তিনি রসকে অস্বীকার করেন নাই এবং রস-মাধুর্যের দ্বারাই যে কাব্য প্রীতি বর্ধন করে তাহা স্বীকার করিয়া গৌণত রসকেই স্বীকার করিয়াছেন। ক্ষেমেন্দ্র তাঁহার ঔচিত্যবিচার চর্চায় রসকে প্রধান স্থান না দিয়া ঔচিত্যকে প্রধান স্থান দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, লোকে রসকে কাব্যের আত্মা কহে কিন্তু ঔচিত্যই কাব্যের প্রাণ। ঔচিত্যের অর্থ সদৃশতা, যাহার সহিত যাহা মেলে বা খাপ খায় তাহাকেই ঔচিত্য বলে।[৩]

এইসমস্ত বিতর্কের মূলে আছে ভরতের নাট্যসূত্রের 'বিভাবানুভাব ব্যভিচারী সংযোগাদ্ রস-নিষ্পত্তিঃ'। এই সূত্রের 'সংযোগ' আর 'রস-নিষ্পত্তি' লইয়াই পণ্ডিতে পণ্ডিতে মতভেদ ঘটিয়াছে। বিভাব অনুভাব এবং ব্যভিচারী ভাব লইয়াও কম আলোচনা হয় নাই। আলঙ্কারিকগণের মতে আমাদের অন্তরের স্থায়ী ভাবের সহিত বিভাব প্রভৃতির সংযোগ হওয়াতে রস উৎপন্ন হয়। রস কি? যাহা আস্বাদ্য তাহাই রস। জিহ্বায় যেমন লবণ তিক্ত কটু কষায় প্রভৃতি আস্বাদিত হয়, তেমনই শৃঙ্গার করুণ প্রভৃতি রস অন্তরে অনুভূত হয়। এই অনুভবকেই আস্বাদ বলে। কেহ বলেন বিভাব অনুভাব ও ব্যাভিচারী এই তিনের সম্মেলনেই রসনিষ্পত্তি হয়। কেহ বিভাবকেই রস বলেন। কেহ অনুভাবকে, কেহ ব্যাভিচারী ভাবকে রস বলিয়া থাকেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই ভরতের পূর্বকথিত 'রসনিষ্পত্তি' সূত্রের আপন আপন মতানুসারে ব্যাখ্যা করেন।

ভাব কি? কেহ বলেন 'নির্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাব প্রথম বিক্রিয়া'। নির্বিকার চিত্তের প্রথম বিক্রিয়া— বিশেষ তরঙ্গই ভাব। ভাবের দ্বারা যেমন রস প্রকটিত হয়, রসের দ্বারাও তেমনি ভাব প্রকাশিত হয়। 'ভাবা রসান্ ভাবয়ন্তি, নিষ্পাদয়ন্তি; রসাস্তু ভাবান্ ভাবয়ন্তি, ভাবান্ কুর্বন্তি, ভাবাদি ব্যাপদেশ্যান কুর্বন্তি।' ভাব হইতে রস হয়, কি রস হইতে ভাব হয়, কি উভয় হইতে উভয় হয়, ইহা নির্ণয় করিয়া বলা যায় না। এই ভাবকে একদিকে যেমন ইমোশন বলা যায়, তেমনই সংবিদ্ বা জ্ঞানও বলা যায়। কারণ জ্ঞান স্বরূপেই ইহার আবির্ভাব এবং জ্ঞান স্বরূপেই ইহার লয়। যদিও ভাবকে চিত্তবৃত্তি আখ্যা দেওয়া হয়, তথাপি 'ভবতি' ব্যুৎপত্তি হইতে ভাব শব্দ নিষ্পন্ন করার কারণ এই যে, ভাব বা ইমোশনগুলির পুন পুনঃ সংঘটনের দ্বারা স্থায়ীভাবটি ক্ষণ ক্ষণান্তরে গৃহীত হইয়া পরিমিত কালব্যাপী হইয়া আস্বাদনের যোগ্য হয়। আবার 'ভাবয়ন্তি' ব্যুৎপত্তি দ্বারাও ভাব শব্দ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ভরত বলিয়াছেন— 'বাগঙ্গ সত্ত্বোপেতান্ কাব্যার্থান্ ভাবয়ন্তিতী ভাবাঃ'।[৪]

কাব্যার্থ যে রস তাহাকে যাহা ভাবয়ন্তি অর্থাৎ নিষ্পাদন করে অর্থাৎ স্থায়ী ও ব্যভিচারী প্রভৃতি রূপে আস্বাদনযোগ্য করে, তাহাই ভাব। স্থায়ী ভাবটি হৃদ্গত হইয়া থাকিলেও তাহার ব্যক্তিগত রূপকে আচ্ছন্ন করিয়া তাহাকে সর্বসাধারণী রূপে যাহা আস্বাদনযোগ্য করে, তাহাকেই ভাব বলে। ভাবয়ন্তি শব্দের আর-একটি অর্থও ভরত লিখিয়াছেন। 'ভূ— ইতি করণে ধাতুঃ। তথা চ ভাবিতং বাসিতং কৃতং ইত্যর্থান্তরম্। লোকেঽপি চ প্রসিদ্ধং অহো হি অনেন গন্ধেন রসেন বা সর্বমেব ভাবিতম্ ইতি তচ্চ ব্যাপ্ত্যার্থম্। অভিনব গুপ্ত বলেন কস্তুরীর গন্ধ যখন বস্তুকে অনুবাসিত করে, সেখানে অনুবাসন অর্থে ব্যাপ্তি।

---

৩ দ্র° সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, কাব্যপ্রকাশ
৪ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, কাব্যপ্রকাশ

'যোঽর্থো হৃদয়সংবাদী তস্য ভাবো রসোদ্ভবঃ।'

ভাবগুলির আস্বাদ্যমানতাই রস। অনেক স্থলে স্থায়ীভাবকেই রস বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। আবার স্থায়ীভাবকেও ভাব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। স্থায়ীভাব যদি ভাবই হয় তবে অন্যভাব হইতে বিভিন্ন রূপে তাহার রসরূপতা কেমন করিয়া হইতে পারে। ইহার উত্তরে ভরত বলেন স্থায়ী ভাবের যদিও অন্যভাবের সমানরূপতা আছে, তথাপি তাহার এমন-একটি বিশিষ্টতা আছে যে কারণে অন্যান্য বিশিষ্ট আস্বাদও স্থায়ী ভাবেরই আস্বাদ বলা যাইতে পারে, যেমন— কুলশীলাদির বৈশিষ্ট্যে কেহ রাজা হয়, কুলশীলাদির হীনতায় অন্যে হয় তাহার অনুচর। ইহাও তদ্রূপ।

আবার সারদাতনয় বলিয়াছেন স্থায়ীভাব বা ব্যভিচারী ভাব উভয়ই কাব্যের বিষয়। কেবল রসই যে কাব্যার্থের বিষয় তাহা নহে। অলঙ্কার, বাক্যার্থ, ভাব, রস— এ সমস্তই কাব্যের বিষয়। ভারবি প্রভৃতি অনেকে ভাব এবং রসের তাদাত্ম্যও স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং সারদাতনয়ের মতে কেবল ভাবকেও রস বলা যাইতে পারে।

সাহিত্যদর্পণ-প্রণেতা শ্রীবিশ্বনাথ কবিরাজ সাহিত্যের রসের প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ড স্ব-প্রকাশানন্দ চিন্ময়।
বেদ্যান্তর স্পর্শশূন্য ব্রহ্মাস্বাদ সহোদরঃ॥

ইহা আনন্দ বর্ধন ও অভিনব গুপ্তেরই মতের সুস্পষ্ট সমর্থন। সত্ত্বোদ্রেককারী, অখণ্ড, স্বপ্রকাশ, আনন্দ-চিন্ময়, বেদ্যান্তর স্পর্শ শূন্য, ব্রহ্মস্বাদ সহোদর এই রস। এই রস ব্রহ্মাস্বাদ নহে, ইহা ব্রহ্মাস্বাদেরই সমতুল্য। সাহিত্যের রসের স্বরূপ নির্ণয়ে ইহাই বোধ হয় শেষ কথা। পূর্বোক্ত সমস্ত মতের সার সঙ্কলন করিয়া এখন বলিতে পারি— রস যাহার আত্মা, ভাব যাহার শক্তি, শব্দ ও অর্থ যাহার দেহ ও প্রাণ, রীতি যাহার প্রকৃতি, ছন্দ যাহার গতি, অলঙ্কার যাহার অঙ্গসৌষ্ঠব, আমি তাহাকেই সাহিত্য বলিব। শক্তি ও শক্তিমানে যেমন ভেদ নাই, ভাব এবং রসেও তেমনই ভেদ নাই।

এই রস ও ভাবকে আস্বাদনের প্রকারভেদ আছে। এই ভেদ অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা নামে পরিচিত। 'ঘোষ গঙ্গাবাস করিতেছেন।' অভিধার অর্থ সহজবোধ্য। লক্ষণা বলিয়া দেয় গঙ্গার তীরে কুটীর বান্ধিয়া কিংবা গঙ্গাবক্ষে নৌকার উপরেই ঘোষ বাস করিতেছেন। কারণ, জলের উপরে মানুষ বাস করে না। ব্যঞ্জনা ইহার গূঢ় অর্থ প্রকাশ করিয়া দেয়। ব্যঞ্জনা বলে— গঙ্গার পাবনী শক্তি ঘোষকে গঙ্গাবাসের প্রেরণা দিয়াছে; অথবা— ঘোষ স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যই গঙ্গাবাস করিতেছেন। এই অর্থ অভিধা ও লক্ষণার গোচরীভূত নহে।

ভরত হইতে বিশ্বনাথ কবিরাজ পর্যন্ত মহামহারথীগণের এই যে বিচার-বিশ্লেষণ ইহার মধ্যে ভক্তির স্থান হয় নাই। এই সমস্ত আলঙ্কারিকগণ কেহই ভক্তিকে রস বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। সর্বপ্রথম শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী আসিয়াই ভক্তিকে রস বলিয়া গ্রহণ করিলেন, ভক্তিকে রসরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। ভক্তির দার্শনিক ভিত্তি নির্মাণ করিয়া তাহার উপর গড়িয়া তুলিলেন— শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু, এবং শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি। ইহাই শ্রীপাদ রূপের 'চতুর্থ প্রস্থান'— 'অভিনব রসপ্রস্থান'।

মহর্ষি শাণ্ডিল্য ভক্তির স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া বলিয়াছেন 'সা কস্মৈ পরম প্রেমরূপা'।

নারদ পঞ্চরাত্র বলিতেছেন— সর্বেন্দ্রিয় দিয়া ইন্দ্রিয়গণের অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সেবাই ভক্তি। এই ভক্তি

সর্বোপাধিরহিত অর্থাৎ কৃষ্ণসেবা ভিন্ন সর্ববিধ বাসনাশূন্য হইবে। এবং তৎপরত্ব অর্থাৎ সেবাপরত্ব রূপে নির্মল হইবে। শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী বলিলেন—

অন্যাভিলাষিতা শূন্যং জ্ঞান কর্মদনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমাঃ॥

সর্ববিধ কামনা বাসনা পরিত্যাগ করিতে হইবে। জ্ঞান ও কর্মাদির আবরণ না রাখিয়া অনুকূলভাবে অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রীতির জন্যই কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণের উপাসনা করিতে হইবে। ইহারই নাম উত্তমা ভক্তি।

অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। শ্রুতি স্মৃতি বিহিত সমস্ত কর্ম পরিত্যাগপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের পরিচর্যাই জীবনের সম্বল করিতে হইবে। আর জ্ঞানকর্মাদি শব্দে বৈরাগ্য যোগাভ্যাসাদিও বর্জন করিতে হইবে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—

জ্ঞান বৈরাগ্যাদি কভু নহে ভক্তি অঙ্গ।
যম নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গ॥

এ রহস্যের মর্মোদ্‌ঘাটন সহজসাধ্য নহে, এবং অল্প কথায় সে রহস্য বুঝাইবার সামর্থ্যও আমার নাই।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেমন আচরণ করেন, সমাজের অন্যব্যক্তিও সেইরূপ আচরণ করিয়া থাকেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণভজন-তৎপর কামনাবাসনাহীন জাতানুরাগ ব্যক্তিও সমাজের কল্যাণের জন্যই শ্রুতি স্মৃতি বিহিত কর্ম পরিত্যাগ করেন না। এবং এই কর্ম তাঁহাদের বন্ধনের হেতুও হয় না। আর কৃষ্ণ-পরিচর্যাত্মক কর্ম যে পরিত্যজ্য নহে ইহাও শাস্ত্রসম্মত।

শাস্ত্রানুশাসনে নিয়ন্ত্রিত সেকালের মানবের বিশ্বাস ছিল— মানুষ দায়বদ্ধ জীব। তিনটি দায় তাহাকে অবশ্যই শোধ করিতে হইত। এই তিনটি ঋণই ত্রিবর্গ। প্রথম, ঋষিঋণ— ইহাই ধর্ম, ধর্মই শিক্ষা; ধর্মহীন শিক্ষা মৃত্যুকে আহ্বান করে। শিক্ষা এ দেশে বিক্রীত হইত না; শিক্ষাকে কেহ পণ্য মনে করিতেন না। অপরকে সুশিক্ষা দিয়া এই দেনা শোধ করিতে হইত। দ্বিতীয়, দেবঋণ— অপর নাম অর্থ, জীবিকা। সৎপথে থাকিয়া জীবিকার্জন এবং সাধ্যমত ইষ্টাপূর্তের অনুষ্ঠান, লোককল্যাণ-সাধন— এই ঋণ-পরিশোধের উপায়। তৃতীয়, পিতৃঋণ— ইহাই কাম, অপর নাম স্বাস্থ্য। এই দেহ দেবমন্দির, ইহাকে কলুষিত করিতে নাই; সকল কর্মসাধনের মূলে আছে দেহ। সুতরাং স্বাস্থ্যরক্ষা করিয়া সহধর্মিণী গ্রহণ করিতে হইবে। পরিমিত ভোগে সমাজকে যোগ্য উত্তরাধিকারী দান করিতে হইবে তোমার ভাবধারার ধারক ও বাহক। ভারতীয় ঐতিহ্যের ব্রহ্মকমণ্ডলু তাহার হস্তে ন্যস্ত করিয়া সংসার হইতে তুমি অবসর গ্রহণ করিবে— ইহাই ছিল সেকালের চতুর্বর্ণের অবশ্যপালনীয় কর্তব্য ত্রিবর্গসাধন।

কিন্তু চতুর্থ ঋণের কথা কেহ জানিত না।— আনন্দের ঋণ, ভালোবাসার ঋণ। আনন্দিত হইয়া এবং অপরকে আনন্দদান করিয়াই এই ঋণ শোধ করিতে হইবে। ইহাই রাধা-ঋণ। সর্বমানবের প্রতিনিধি শ্রীমহাপ্রভু বিশ্বের ঋণভার মাথায় তুলিয়া এই ঋণ পরিশোধ করিতে আসিয়াছিলেন।

স্বার্থগন্ধহীন ভালোবাসা দিয়া এই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। প্রিয়ার প্রিয় নাম ও প্রেম প্রচার করিয়া শ্রীমহাপ্রভু এই ঋণ পরিশোধে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু এই অপরিশোধ্য ঋণ পরিশোধিত হয় নাই। সেই দায় তিনি ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন সর্বমানবের উপর। ভালোবাসিয়া জগৎকে জয় করিতে হইবে। মানবহৃদয় হইতে মালিন্য হিংসা দ্বেষ দূরীভূত করিতে হইবে। ভক্তি তোমাকে সেই পথ দেখাইবে। ভালোবাসার মূলে আছে ভক্তি। যাহার বিবর্ত প্রেম।

ভালোবাসা জীবের সহজাত ধর্ম। জীব আনন্দেই উদ্ভূত হইয়াছে, সুতরাং আনন্দের প্রতি আকর্ষণ তাহার স্বাভাবিক। ভালোবাসিয়াই জীব আনন্দিত হয়। সে আনন্দের জন্যই ভালোবাসে। তাই আনন্দ পাইবে বলিয়া কেহ রূপ, কেহ শব্দ, কেহ স্পর্শ, কেহ রস, কেহ গন্ধ ভালোবাসে। এবং শব্দস্পর্শাদি পাইবার জন্যই অর্থের উপার্জনে প্রবৃত্ত হয়। অনেকেই অর্থের লালসায় হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হয়। এই ভালোবাসার পাত্র ক্ষণভঙ্গুর, এই ভালোবাসা নশ্বর, পরিণাম বিরস, মোহ-বশে জীব তাহা বুঝিতে পারে না। বৈষ্ণবাচার্যগণই প্রথম বলিলেন জীব কৃষ্ণ-নিত্যদাস। এইজন্য কৃষ্ণের প্রতি ভালোবাসাই জীবের সহজাত প্রবৃত্তি। কিন্তু বুঝিবার ভুলেই সে অর্থের প্রতি, কামের প্রতি ভালোবাসিবার ছলে ইতিউতি ঘুরিয়া বেড়ায়। যাহাকে ভালোবসিলে তোমার ভালোবাসা সার্থক হইবে, জীবনে সকলকেই ভালোবাসিবার সাধ হইবে যে, ভালোবাসা অবিনশ্বর অমৃত স্বরূপ, বৈষ্ণবাচার্যগণ জীবকে তাহারই সন্ধান দান করিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণদাসত্ব জীবনের চরম এবং পরম সার্থকতা। পিতা নন্দ, মাতা যশোমতি, ব্রজরাখালগণ, ব্রজবধূগণ সকলের মধ্যেই দাসবুদ্ধি ও দাসত্ব অভিমান অনুস্যূত রহিয়াছে— অন্তরের অন্তস্তলে ফল্গুধারার মত। সুতরাং জীবের কৃষ্ণদাসত্ব-বুদ্ধির জাগরণই 'পঞ্চম পুরুষার্থ'। সাধনমার্গে কিন্তু দাস্য অপেক্ষা সখ্য শ্রেষ্ঠ। সখ্য হইতে বাৎসল্য শ্রেষ্ঠ। বাৎসল্য অপেক্ষা মধুর ভজন শ্রেষ্ঠ। মধুর ভজনই সর্ব শ্রেষ্ঠ। মধুর ভজন প্রেমের ভজন। কবিরাজ গোস্বামী বলিলেন—

সাধন ভক্তি হইতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হইলে তারে প্রেম নাম কয়।

ইন্দ্রিয় ব্যাপার দ্বারা সাধ্য এবং ভাব ভক্তিতে সাধিত, সাধন ভক্তি—বৈধী ও রাগানুরাগা ভাবে দ্বিবিধ। আচার্য ভরত বলিলেন 'একৈব হ্যসৌ তাবতি রতির্যত্র অন্যোন্য সংবিদৈক বিয়োগো ন ভবতি'। যে সংবিদাত্মতায় বিয়োগবিহীন রসের প্রকাশ হয় তাহাই রতি। অন্তরের অবিচ্ছিন্ন পবিত্র স্নিগ্ধতাই রতি। শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী এই রতিকেও ভাব বলিয়াছেন—

শুদ্ধসত্ত্ব বিশেষাত্মা প্রেম সূর্যাংশু সাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্ত মাসৃণ্য কৃদসৌ ভাব উচ্যতে।

শুদ্ধসত্ত্ব যাহার স্বরূপ, প্রেম-সূর্য-কিরণের সঙ্গে যাহার সাম্য আছে, ভগবদনুশীলনে রুচি বৃদ্ধি করিয়া যাহা চিত্তের মসৃণতা অর্থাৎ স্নিগ্ধতা সম্পাদন করে, তাহাকেই রতি বা ভাব বলে।

আর, প্রেমের স্বরূপ বর্ণনায় বলিতেছেন—

সম্যক্ মসৃণিত স্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥

যাহা হইতে চিত্ত সম্যক্ স্নিগ্ধ হয়, শ্রীকৃষ্ণে নিরতিশয় মমত্ব বুদ্ধি কারক যে ভাবে প্রগাঢ় তন্ময়তা আনিয়া দেয়, তাহারই নাম প্রেম। এই প্রেম ও মহাভাবে পরিণতি প্রাপ্ত হয়। এখানে ভাবের সংজ্ঞা—

অনুরাগঃ স্বসংবেদ্য দশাংপ্রাপ্য প্রকাশিতঃ।
যাবদাশ্রয় বৃত্তিশ্চেদ্ ভাব ইত্যভিধীয়তে॥

অনুরাগ যদি স্বসংবেদ্য দশা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ মহাভাবের উন্মুখে ধাবিত হয়, যাবদাশ্রয়-বৃত্তি সেই অনুরাগের নাম ভাব।

সেই একই কথা, রস এবং ভাবের পার্থক্য নির্ণয় অসম্ভব। রস স্বপ্রকাশ, ভাব তাহার প্রকাশের সহায়ক হয়। ভাবের শক্তিতেই শক্তিমান রস প্রকাশিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ রস স্বরূপ, মহাভাবস্ব রূপিণী শ্রীরাধা তাঁহার হ্লাদিনী শক্তি। তিনিই স্থায়ীভাব। বিভাব অনুভাব ব্যভিচারী ও সাত্ত্বিক ভাব শ্রীরাধারই কায়ব্যূহ অর্থাৎ ইহারা ব্রজগোপীসমূহ। বৈষ্ণবাচার্য বিভাব, অনুভাবের পর সাত্ত্বিক ভাবকে স্থান দিয়াছেন। তাহার পর ব্যভিচারী ভাব। আচার্যগণ এই বিভাবাদির ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। বাহুল্যবোধে সে সমস্ত উল্লেখ করিলাম না।

উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী ভক্তিরসকে রসরাট বলিয়াছেন। কিন্তু কেবলমাত্র কৃষ্ণরতিকেই রস বলা হয় নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন— মধ্যলীলা—

প্রেমাদিক স্থায়ীভাব সামগ্রী মিলনে।
কৃষ্ণভক্তি রসরূপে পায় পরিণামে॥
বিভাব অনুভাব সাত্ত্বিক ব্যভিচারী।
স্থায়ীভাব রস হয় মিলি এই চারি॥

এখানে 'রস হয়' অর্থে রস আস্বাদ্যতা প্রাপ্ত হয়। নিত্যসিদ্ধা শ্রুতিপূর্বা, ঋষিপূর্বা এবং দেবীপূর্বা এই চারি শ্রেণীর গোপীগণের সঙ্গে স্থায়ীভাব রূপিণী শ্রীরাধারানীকে লইয়া রস-স্বরূপ স্বয়ং ভগবান শ্রীশ্রীরাসলীলায় যে করুণা ও রস বিস্তার করিয়াছেন, এখানে তাহারই ইঙ্গিত রহিয়াছে। শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীও শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক রতিরূপা স্থায়ী ভাবকে—

'রতিঃ স্বভাবজৈব স্যাৎ প্রায়ো গোকুল সুভ্রুবাম্ সাধারণী নিগদিতা সমঞ্জসা চাসৌ সমর্থাচ'— এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। মথুরাবাসিনী কুব্জাদি সাধারণী, দ্বারকায় মহিষীগণ সমঞ্জসা এবং শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাদি সমর্থা। এই সমর্থারতিই সর্বশ্রেণীর রতির মধ্যে সর্বোত্তমা।

শ্রীপাদ কবি কর্ণপুর অলঙ্কারকৌস্তভে বলিয়াছেন 'বাহ্য এবং আভ্যন্তর ব্যাপারের প্রতিরোধক স্ব-কারণাদি সংশ্লেষি অর্থাৎ আনন্দ চমৎকৃতিতে কেন্দ্রীভূত সুখই রস।' সেই বেদ্যান্তর স্পর্শশূন্য সান্দ্রতা। এই চমৎকৃতি রসের সার। চমৎকারিতা না থাকিলে রসকে রস বলিব না।

সাহিত্যের রসাস্বাদনে যে অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনার কথা বলিয়াছি, এখানে তাহাই ব্যাখ্যা করিতেছি। অভিধা হইল সাধারণী। লক্ষণা হইল সমঞ্জসা, আর সমর্থাই ব্যঞ্জনা। এই ব্যঞ্জনাই রসের পরকীয়া। অভিধা, লক্ষণার যাহা স্বপ্নেরও অগোচর, এই ব্যঞ্জনাই তাহা প্রকাশে সামর্থ্য রাখেন, এইজন্যই তিনি সমর্থা। অরসিক যাঁহারা, যাঁহারা রসের কোনো সংবাদই রাখেন না, তাঁহারাই পরকীয়ার

নামে নাসিকা কুঞ্চন করেন। এই ব্যঞ্জনাই রসের হ্লাদিনী শক্তি। এই জন্যই ভাবকে রসের শক্তি বলিয়াছি। বিশ্বনাথ কবিরাজ রসকে স্বপ্রকাশানন্দ চিন্ময় বলিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী প্রেমকে বলিয়াছেন— 'আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান'। সাহিত্যের রস অচিরস্থায়ী, লৌকিক। আর ভক্তিরস চিরস্থায়ী লোকোত্তর। ভক্তির সান্দ্রতা প্রেমই অমৃত। প্রেম— 'পঞ্চম পুরুষার্থ'। কোনো কামনা-বাসনা নাই। মনের অবচেতনেও আত্মসুখের স্পৃহার লেশ মাত্র নাই, সংসার নাই, সমাজ নাই। লজ্জা ধৈর্যাদি দেহধর্মও নাই, শুধু তোমার জন্যই তোমাকে ভালোবাসি, গোপীপদাঙ্ক অনুসরণে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই তদাত্মতাই প্রেম। দেশকে ভালোবাস, জাতিকে ভালোবাস, ব্যক্তিকে ভালোবাস— সেই ভালোবাসা যদি সম্পূর্ণ স্বার্থগন্ধহীন হয়, তাহাকে ভগবদ্ প্রেমেরই বর্ণপরিচয় বলিতে পারি। বৈষ্ণবগণ এই জগতকে মিথ্যা বলেন নাই। তাঁহারা জগদীশ্বরকে ভালোবাসিয়া তাহারই আলোকে জগতের সর্বত্র জগদীশ্বরের প্রকাশ অনুভব করিয়া জগৎকেও ভালোবাসিয়াছেন। আবার, সংসারে এমন ভক্তেরও অভাব নাই যাঁহারা জগৎকে ভালোবাসিয়া সেই ভালোবাসার সোপান বহিয়াই জগদীশ্বরের পদপ্রান্তে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। যে দিক্ দিয়াই দেখি এই নিঃস্বার্থপর ভালোবাসা— এই প্রেমই 'পঞ্চম পুরুষার্থ'। পূর্বেই বলিয়াছি, ভক্তিরই পরমপরিণতি প্রেম। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥

ভালোবাসার কথা বলিয়া ইহারই ইঙ্গিত দিতে চেষ্টা করিয়াছি। ভালোবাসাই মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি, ভালোবাসিয়াই মানুষ আনন্দ পায়। কবিরাজ গোস্বামী জীবকে কৃষ্ণের নিত্যদাস বলিয়াও ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন— কৃষ্ণের দাস যে, কৃষ্ণকে ভালোবাসাই তাহার স্বাভাবিক ধর্ম। সুতরাং এই ভালোবাসা অহৈতুকী ভালোবাসা। শ্রবণকীর্তনাদি নববিধা ভক্তির সাধনে এই ভালোবাসা ভক্তহৃদয়ে উদ্ভূত হয় না, উদ্‌বুদ্ধ হয়, প্রকাশিত হয়। তখন তাঁহারা স্বভাবতই শ্রীবৃন্দাবনের পথে অগ্রসর হন, এবং আপন আপন রুচি অনুসারে কেহ বা দাস কেহ বা সখা কেহ বা জনকজননী কেহ বা কান্তাভাবে শ্রীকৃষ্ণভজনে তৎপর হন।

শ্রীভগবান রসস্বরূপ। তিনিই রসের আদি— আদিরস। কবি জয়দেব শ্রীকৃষ্ণকে মূর্তিমান্ শৃঙ্গার বলিয়াছেন। কবি বিল্বমঙ্গল বলিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ 'শৃঙ্গার রসসর্বস্ব', আলঙ্কারিকগণ শৃঙ্গারকে শুচি ও উজ্জ্বল রস বলিয়াছেন। বৈষ্ণবগণ শৃঙ্গারকে মধুর রস বলেন এবং বলেন মধুর রসের ভজনেই শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্যের সম্যক্ উপলব্ধি ঘটে। পরকীয়া ভাবের মাধ্যমেই এই রস সবিশেষরূপে আস্বাদিত হন। সাহিত্যের রসের আস্বাদনের মাধ্যম যেমন পরকীয়া ব্যঞ্জনা, এই শ্রুতি প্রতিপাদিত যোগী জ্ঞানী ও ভক্ত সম্প্রদায়ের অন্বেষণীয় রসও আস্বাদিত হন তেমনই ব্যঞ্জনারূপিণী সমর্থার আনুগত্যে। কবি কর্ণপুর স্বপ্রণীত অলঙ্কারকৌস্তভের মঙ্গলাচরণে ইহার ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন।

স জয়তি যেন প্রভবতি
দৃশি সুদৃশাং ব্যঞ্জনা বৃত্তিঃ।
অতিশয়িত পদপদার্থো
ধ্বনিরিব মুরলীধ্বনির্মুরারাতেঃ॥

পদ ও পদার্থের অতিরিক্ত ধ্বনি নামক বস্তু যেমন সাহিত্যজগতে সর্বোৎকর্ষ ব্যঞ্জক, তেমনই বৈকুণ্ঠাদি পদ এবং ব্রহ্মানন্দাদি পদার্থ হইতেও সর্বোৎকর্ষশালী যে ধ্বনি, যাহার প্রভাবে সুদর্শনা-গোপতনয়াগণের নয়নে আনন্দাশ্রু বহিয়া যায়, এবং তজ্জন্য অঞ্জনরেখার বিলোপে ব্যঞ্জনাবৃত্তি ('বিগতাঞ্জনা বৃত্তি') সম্পাদিত হয়, মুরারির সেই মুরলিধ্বনির জয় হউক। এই শ্লোকেই ব্যঞ্জনার ইঙ্গিত রহিয়াছে। 'দৃশি সুদৃশাং ব্যঞ্জনা-বৃত্তি'— সুনয়না গোপতনয়াগণই ব্যঞ্জনাবৃত্তির পথপ্রদর্শিকা। তাঁহাদের দৃষ্টিই জগতের কল্যাণ বিধান করিতেছেন। তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণই 'পঞ্চম পুরুষার্থ'।

পত্র-পত্রিকায় বিভূতিভূষণ

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

আজ উনিশ বছর হল বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় গত হয়েছেন। সম্প্রতি সাহিত্য অকাদেমীর দ্বারা তাঁর গ্রন্থ বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে, বিদেশে তাঁর পরিচয়ের জন্যে ইউনেস্‌কো থেকে 'পথের পাঁচালী'র ইংরেজি[১] ও ফরাসি অনুবাদ বার হয়েছে, দেশি-বিদেশি পত্র-পত্রিকায় তাঁর সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত তাঁকে নিয়ে সাধারণের উৎসাহের অন্ত নেই। বাঙলাদেশে বোধ হয় লেখাপড়া-জানা এমন কোনো মানুষ নেই যিনি পথের পাঁচালী পড়েন নি এবং পড়ে অভিভূত হন নি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বইটি পড়ে বলেছিলেন, 'সাহিত্যে একটা নতুন জিনিস পাওয়া গেল অথচ পুরাতন পরিচিত জিনিসের মত সে সুস্পষ্ট।' ১৯৩৩ সালে (যে বছর ইভান বুনিন নোবেল প্রাইজ পান) গুজব রটেছিল, বিভূতিভূষণ নোবেল প্রাইজ পাচ্ছেন। তবে খবরটা নেহাৎই গুজব। কেন না, তখনও পর্যন্ত 'পথের পাঁচালী'র ইংরেজি কোনো অনুবাদ প্রকাশিত হয় নি। তবু গুজবটা একান্তই অহেতুক ছিল না। এডওঅর্ড টমসন এর কিছুদিন আগে 'পথের পাঁচালী'র সপ্রশংস উল্লেখ করে অ্যালবার্ট হলের এক সভাতে বলেছিলেন—'পথের পাঁচালী'র মত বই যে লেখা হয়েছে এ কথা পৃথিবীর সবাইকে জানানো উচিত। সেই সঙ্গে তিনি প্রস্তাব করেছিলেন, বিশিষ্ট ভারতীয় সাহিত্যিক যাঁরা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন তাঁদের নোবেল প্রাইজ জাতীয় পুরস্কার দেওয়া হোক।

বর্তমানে বিভূতিভূষণের রচনা যথাসম্ভব সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। যদিও তার বাইরে অনেক রচনা অসংকলিত ও অপ্রকাশিত থেকে গেছে। আশা করা যায়, কালক্রমে সেগুলিও সংকলিত ও প্রকাশিত হবে। কিন্তু অধুনা দুষ্প্রাপ্য দেশি-বিদেশি পত্র-পত্রিকায় তাঁর সম্বন্ধে কত যে আলোচনা ছড়িয়ে আছে তা ভাবতে বিস্ময় লাগে। এই আলোচনাগুলির অতি সামান্য অংশই গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়েছে। বাকি লেখাগুলি সংগ্রহ ও মূল্যায়নের কোনো চেষ্টা আজ পর্যন্ত করা হয় নি। বর্তমান প্রবন্ধে এই দুষ্প্রাপ্য লেখাগুলি বিষয় ও কাল অনুযায়ী গুছিয়ে আলোচনা করা হল।

পরিচয় পত্রিকায় ১৩৩৮ সালের মাঘ-কার্ত্তিক সংখ্যায় দিলীপকুমার রায় 'পথের পাঁচালী' নামে পত্রাকারে একটি প্রবন্ধ লেখেন। পত্রটি লেখা সোমনাথ মৈত্রকে। এই প্রবন্ধটি প্রধানত: 'পথের পাঁচালী' সম্বন্ধে প্রথম বিস্তৃত আলোচনা। দিলীপ রায় তাঁর আলোচনার ভূমিকায় লেখেন, যাকে সচরাচর আমরা চমকপ্রদ ও ওরিজিনাল উপন্যাস বলি, যাতে সাময়িকতার উত্তেজনা থাকে যথেষ্ট, 'পথের পাঁচালী' সে রকম নয়। এই প্রসঙ্গে বোদলেআরের একটি উক্তি তাঁর খুব ভালো লেগেছে। সে উক্তি এই, সুন্দর বিস্ময়োদ্দীপক বলে এ কথা বলা হাস্যকর যে, বিস্ময়োদ্দীপক মাত্রই সুন্দর। রূপকার যখন শুধু বাস্তবকে, শুধু দৃশ্যমানকে রূপ দিতে চান তখন তিনি ভুল করেন। আমাদের স্বপ্নলোকে যে 'আনন্দপরম' রয়েছে তাকে মূর্তি দিলেই শিল্পীর কীর্তি নিরুপম হয়ে ওঠে। দিলীপ রায় বলেছেন, 'পথের পাঁচালী' শিল্পী বিভূতিভূষণের এমনই এক নিরুপম কীর্তি। ভূমিকায় আর-একটি

---

১ বর্তমান সংখ্যার গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য।

কথা তিনি বলেছেন, তা হচ্ছে, 'পথের পাঁচালী'র 'soul of rhythm'। বইটি পড়তে গিয়ে সর্বাগ্রে যে গুণে মন মুগ্ধ হয় তা এর অনবদ্য গদ্যচ্ছন্দ। নিপুণ গায়কের মত তিনি জানেন, ভাষার এই ছন্দকে কোথায় কীভাবে প্রয়োগ করতে হবে। তাই অপু-দুর্গার ছেলেমানুষির কথা শুনতে শুনতে চোখের সামনে ফুটে ওঠে শিশু-হৃদয়ের সৌন্দর্য, সর্বজয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষার ও সোহাগ-শাসনের কথা শুনতে শুনতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মমতাময়ী মায়ের স্নেহদুর্বলতার ছবি, ইন্দির ঠাকরুনের কাতর মিনতি শুনতে শুনতে ভেসে ওঠে পল্লীবিধবার অসহায় রূপ এবং এই সব কিছুর সঙ্গে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে নদীর ঘাট, মাঠ-ঝোপ, ফুলফল, ঝড়বৃষ্টি প্রভৃতির ছবি। বস্তুতঃ, 'পথের পাঁচালী' 'আদ্যন্ত সুরেলা, এতটুকু বেসুর কোথাও কানকে প্রতিহত করে না'। এই সুরকে, সরল দীপ্তভাষার জেরকে তিনি আগাগোড়া টেনে নিয়ে গেছেন। সার্থক রচয়িতার লেখায় অবশ্য এই দীপ্তি বা ঔজ্জ্বল্য থাকে, কিন্তু তাকে সমান তালে বজায় রাখা একমাত্র উঁচুদরের শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। 'পথের পাঁচালী'র আদ্যোপান্ত মনোজ্ঞ বর্ণনার মণি দিয়ে গাঁথা। 'সে মণিমালা মৃদুহাস্যে মধুর, কখনও অশ্রুতে সজল, কখনও প্রশান্তিতে স্তব্ধ, কখনও উদাস দীর্ঘশ্বাসে নিষিক্ত।' 'পথের পাঁচালী'র এই 'দীপ্তভাষা অপরাজিত'তে, বিশেষ করে মধ্যভারতের বনশ্রীর বর্ণনায়, আরও উদাত্ত ও অপরূপ হয়েছে।

মূল প্রবন্ধে দিলীপ রায় বলেছেন, আধুনিক সাহিত্যে যে ক'খানি গ্রন্থে স্থায়ী রসের প্রকাশ ঘটেছে তাদের মধ্যে 'পথের পাঁচালী'র স্থান খুব উঁচুতে। গ্রন্থের মূল প্রেরণার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, এ গ্রন্থের উদ্ভব 'সত্য রসানুভূতি' থেকে। সে সত্য রসানুভূতির জগতে দ্রষ্টব্যের অফুরন্ত মেলা বসিয়ে প্রকৃতি কোন্ অনাদ্যন্ত কাল থেকে আমাদের ডাকছে। এই সমস্ত দ্রষ্টব্য এবং অকিঞ্চিৎকর ঘটনা নিত্য আমাদের চোখে পড়েও চির অচেনাই থেকে যায়। 'পথের পাঁচালী'র কবি তাদের নিকট পরিচয়ের আনন্দেই আত্মহারা।' সত্য রসানুভূতি বা জীবনের অকৃত্রিমতা যা বিভূতিভূষণের সাহিত্যের আসল উপাদান তার কথায় একদা তিনি দিলীপ রায়কে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, 'আমি কোনো বড় ঘটনায় বিশ্বাসবান্ নই। দৈনন্দিন ছোটোখাটো সুখদুঃখের মধ্যে দিয়ে যে জীবনধারা ক্ষুদ্র গ্রাম্য নদীর মত মন্থর বেগে অথচ পরিপূর্ণ বিশ্বাসের ও আনন্দের সঙ্গে চলেচে আসল জিনিসটা সেখানে। কোনো কৃত্রিম প্লট সাজানো, প্যাঁচ কসা, কৃত্রিম 'সিটুয়েশন' তৈরী করা—আমি মানি না। নভেল কেন কৃত্রিম হবে? প্রতিদিনের অমূল্য দানকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কৃত্রিমতার মালা গাঁথা ও তারই বেসাতি শুধু টেকনিকের বেসাতি হয়ে দাঁড়ায়। কোনো সুস্থ সতর্ক ও অনলস মনের বিভিন্নমুখী কৌতূহল তাতে চারিতার্থ হয় না।' বিভূতিভূষণের দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও স্পষ্ট করার জন্যে তিনি নিজেকেই পূর্বপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়ে প্রশ্ন করেছেন—বড় ঘটনা বড় বলেই কি কৃত্রিম হবে? জীবনটা তো শুধু ছোটখাটো সুখদুঃখের ধারা নয়, শুধু প্রতিদিনের অমূল্য দানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। জীবনধারায় যেমন গ্রাম্য নদীর মন্থর বেগ, তেমনি কলস্বনার দুর্বার আবেগও আছে। জীবনে যেমন প্রতিদিনের অমূল্য দান, তেমনি দূরাভিসারের ও অসীমের আনন্দও আছে। বিভূতিভূষণ তবু যে 'দৈনন্দিন ছোটোখাটো সুখদুঃখের' উপর এত জোর দিয়েছেন তার কারণ, জীবনে তুচ্ছতমের মধ্যেও তিনি সেই 'মাধ্বীধারা'র সন্ধান পেয়েছেন। এ তাঁর অলীক কবিকল্পনা নয়, সত্যানুভূতি। বলেছেন, থ্যাকারে যেমন তাঁর অপূর্ব উপন্যাস '*Pendennis*'-এর ভূমিকায় লিখেছেন, তিনি যা জানেন গ্রন্থে তারই বর্ণনা করেছেন, অভাবনীয়ের যোগাযোগে

পাঁচজনকে তাক লাগাতে চান নি। বিভূতিভূষণও তেমনি 'পথের পাঁচালী'র ভূমিকায় তাঁর অনাড়ম্বর প্রকাশের কথা লিখতে পারতেন। যে বাস্তবতা একপ্রকার শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি ও যা মানুষের আদর্শকে হেয় প্রতিপন্ন ও দৈনন্দিন ক্ষুদ্রতায় অবনমিত করে সে বাস্তবতাকে তিনি প্রশ্রয় দেন নি। 'পথের পাঁচালী-অপরাজিত'র অপুর আনন্দবেদনা, আশা ও স্বপ্নভঙ্গ, জীবনের ভাঙাগড়া দেখতে দেখতে মনে হয়— তিনি যাকে মানুষের আদর্শ বলে জেনেছেন তা হচ্ছে উত্তরণের অভীপ্সা। ভাগ্‌নারের কথা তুলে বলেছেন, 'আর্টে আমরা সেই স্বপ্নই খুঁজি— যা জীবনে পদে পদে ভঙ্গ হয়— ব্যর্থ হয়।' আমি না পারলেও আমি যা হতে চেয়েছি, ঈশ্বরের কাছে আমার অর্থ তাই। তাঁর এই প্রথম বক্তব্যের শেষে কিন্তু তিনি 'পথের পাঁচালী'কে বলেছেন, ওরিজিনাল, কারণ ওরিজিন্যালিটির ভূত এর ঘাড়ে চাপে নি। 'বইখানি পড়তে পড়তে একটা কথা স্বতঃই মনে হয়। সেটা এই যে, ওরিজিন্যালিটির ভূত যাদের ঘাড়ে না চাপে তারাই সত্য ওরিজিন্যাল হতে জানে। ওরিজিন্যালিটি বস্তুটি মিষ্টি হাসির মতন, আপনা থেকে ফুটে উঠলে তবে সে প্রাণ কাড়ে, চেষ্টা করে যারা মিষ্টি হাসে তাদেরই বলে ককেট।' দিলীপ রায়ের আলোচনায় প্রথম বক্তব্যের গোড়ার কথা হল, 'পথের পাঁচালী'র প্রেরণা 'সত্য রসানুভূতি' থেকে। পরের কথা হল, যেসব দ্রষ্টব্য ও অকিঞ্চিৎকর ঘটনা নিত্য আমাদের চোখে পড়েও চির অচেনা, বিভূতিভূষণ তাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের আনন্দে আত্মহারা। দিলীপ রায়ের বক্তব্যের এই দুটি দিকের সঙ্গে 'পথের পাঁচালী' সম্বন্ধে পরবর্তীকালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের আশ্চর্য রকমের মিল আছে। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য দিলীপ রায়ের প্রবন্ধের বৎসরাধিক কাল পরে পরিচয় পত্রিকায় ১৩৪০ সালের বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সম্পূর্ণ পাঠ নিয়ে এই প্রবন্ধে যথাস্থানে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে দিলীপ রায়ের বক্তব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের মিলের অংশমাত্র আলোচনা করা গেল। 'পথের পাঁচালী' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'বইখানি দাঁড়িয়ে আছে আপন সত্যের জোরে।' আর বলেছিলেন, 'কাছের জিনিসেরও অনেক পরিচয় বাকি থাকে। যেখানে আজন্মকাল আছি সেখানেও সব মানুষের সব জায়গায় প্রবেশ ঘটে না।' রবীন্দ্রনাথের আলোচনা দিলীপ রায়ের প্রবন্ধের পরে প্রকাশিত হয়েছে বটে, কিন্তু দিলীপ রায়ের প্রবন্ধের এক জায়গায় আছে—'সাধে কি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মতন গুণী পথের পাঁচালীর উচ্ছ্বসিত সুখ্যাতি করেছেন।' পরিচয়-এর উল্লিখিত সংখ্যার পূর্বে 'পথের পাঁচালী' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কোনো লেখা প্রকাশিত হয়েছে ব'লে জানা যায় না। দিলীপ রায়ের মন্তব্য থেকে জানা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ 'পথের পাঁচালী' সম্বন্ধে লেখার আগেই তাঁর মতামত আলাপ-আলোচনায় জানিয়েছিলেন। দিলীপ রায়ের প্রবন্ধের বক্তব্যের সঙ্গে পরবর্তীকালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের মিল রয়েছে, আবার দিলীপ রায় তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে রবীন্দ্রনাথের সপ্রশংস মনোভাবের উল্লেখ করেছেন। এতেই বোঝা যাচ্ছে, এ প্রবন্ধ লেখার সময় রবীন্দ্রনাথের অভিমত দিলীপ রায়ের মনে ছিল।

'পথের পাঁচালী' সম্বন্ধে দিলীপ রায়ের দ্বিতীয় বক্তব্য, যে কারণে বইটি তাঁকে সবচেয়ে বেশি স্পর্শ করেছে সে কারণ হচ্ছে এই—'পথের পাঁচালী' আসক্তির নয় অনাসক্তির, ঘরের নয় পথের, অচলায়তনের নয় চলার গান। 'জীবন যে চলচঞ্চল, গতি উচ্ছল, আনন্দ বেদনা হাসি অশ্রু ছলছল মায়ারসে অভিষিক্ত সেই রসই কবির পথের একমাত্র পাথেয়।' তিনি বলেছেন, বিভূতিভূষণ সাময়িককে

উচ্ছ্বাস-উত্তেজনার ধোঁয়াটে ভাবপরিমণ্ডলে চিরন্তন করে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেন নি, যা অনিবার্য তাকে বিজ্ঞ সিনিকের দৃষ্টিতে তুচ্ছ করার চেষ্টা করেন নি, অথবা যা রুদ্র ও ভয়ানক তাকে নিয়ে হাহাকার করে সহানুভূতি জোগাড়ের প্রয়াস পান নি। একদিকে কারুণ্য, অনুকম্পা, ব্যথা, দরদ; অপরদিকে হৃদয়হীনতা, মৃত্যু, দুরাভিসার, জীবনের পরিবর্তনশীলতা— দুইকেই তিনি মূর্ত করে তুলেছেন। দিলীপ রায় যখন এই প্রবন্ধ লেখেন তখন প্রবাসীতে 'অপরাজিত' সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর এই প্রবন্ধ যদিও শিরনামা অনুযায়ী 'পথের পাঁচালী' নিয়ে, তবু একান্তভাবে 'পথের পাঁচালী' নিয়ে নয়। কারণ, প্রবন্ধের মধ্যে একাধিকবার তিনি 'অপরাজিত'র উল্লেখ করেছেন, যা সত্যিই খুব স্বাভাবিক। 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' আসলে একটি বই। প্রবন্ধের এক জায়গায় দিলীপ রায় বলেছেন, 'পথের পাঁচালী ও অপরাজিততে অপুর আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা, আকাশকুসুম স্বপ্নভঙ্গ, ভাঙাগড়া কল্পনাকুহক দেখতে দেখতে মনে হয় যে লেখক জানেন' আদর্শের অস্তিত্ব অপ্রাপ্তিতে নয়, অভীপ্সায়। হ্বাগনারের কথা তুলে তিনি বলেছেন, জীবনে যে স্বপ্ন পদে পদে ব্যর্থ, ভঙ্গ ও লুণ্ঠিত হচ্ছে আর্টে আমরা তাকে খুঁজি। দিলীপ রায় এখানে সংগতি-বৈষম্যের আলো-অন্ধকারে মেশানো যে বিরাট জীবনের কথা ভেবেছেন— যার কথায় অপুর মনে হয়েছে, 'যুগে যুগে এ জন্মমৃত্যুচক্র কোন্ বিশাল-আত্মা দেবশিল্পীর হাতে আবর্তিত' হচ্ছে—সে জীবনবোধ 'পথের পাঁচালীর' নয়, 'অপরাজিত'র ফলশ্রুতি। বর্তমানে বিভূতিভূষণের সমালোচকদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন, গতিচেতনাই এই গ্রন্থের মূলস্বর। এমনকি স্বয়ং বিভূতিভূষণও একদা 'পথের পাঁচালী' সম্বন্ধে মোহিতলালকে বলেছিলেন, এই উপন্যাসের প্রেরণায় কোনো বিশেষ স্থানকালপাত্রের প্রতি পক্ষপাত নেই; সমস্ত বিবৃতি ও বর্ণনার মধ্যে দিয়ে যে ধারণাটিকে তিনি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন তা হচ্ছে 'vastness of space and passing time'।[২] দিগন্তবিস্তৃত সোনাডাঙার বিশাল মাঠ অথবা গৃহত্যাগী উদাসী বাউলের মত পথের ছবিতে 'vastness of space'এর পরিচয় থাকলেও 'পথের পাঁচালী'তে 'vastness of time'এর পরিচয় কোথায়? যেটুকু আছে সেটুকুতো গ্রন্থের নেপথ্যে। সত্যিই কি 'পথের পাঁচালী'তে দিশাহারা দেশকালের বা গতিচেতনার স্বপ্ন প্রধান হয়ে উঠেছে? খুব সহজ কথায়, 'পথের পাঁচালী' পড়তে পড়তে এবং পড়ার শেষে আমাদের মন কি স্মৃতিভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে না, যাকে আটপৌরে ভাষায় বলি মন-কেমন-করা? ইংরেজিতে যাকে নস্ট্যালজিয়া বলে, 'পথের পাঁচালী'র মূল স্বর কি তাই নয়? 'বল্লালী-বালাই'এ সন্ধ্যালোকে ইন্দির ঠাকরুনের মুখে দুর্গার রূপকথা শোনা, 'আম-আঁটির ভেঁপু'তে বালক অপুর প্রকৃতিমুগ্ধতা ও দুর্গা-পটু-গুলকীর সঙ্গে খেলা এবং সবশেষে 'অক্রূরসংবাদ'এ উদ্বাস্তু ও বিপন্ন অপুর নিশ্চিন্দিপুরে প্রত্যাবর্তনের আকুলতা— শৈশব-কৈশোরের এইসব মায়াময় ছবি কি আমাদের বিহ্বল ও স্মৃতিবিধুর করে তোলে না? 'পথের পাঁচালী'র যথার্থ শেষ কি অপুর এক বিচিত্র অনুভূতি, যাকে নস্ট্যালজিয়া বলা যায় তাতে নয়? তা 'দুঃখ নয়, শোক নয়, বিরহ নয়, তাহা কি সে জানে না। কত কি মনে আসিল অল্প এক মুহূর্তের মধ্যে···আতুরী ডাইনী···নদীর ঘাট···তাহাদের কোঠাবাড়ীটা···চাল্‌তেতলার পথ···রাণুদি···কত বৈকাল, কত দুপুর···কতদিনের কত হাসি-খেলা···পটু···দিদির মুখ···দিদির কত না-মেটা সাধ···'।[৩] পাঁচালীর

---

২ মোহিতলাল মজুমদার, সাহিত্য বিতান, দুইখানি উপন্যাস

৩ পথের পাঁচালী (৮ম সং), অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ, পৃ. ২৭৯

যে গ্রাম্য, মেঠো অথচ মন-ভোলানো সুর তা কি 'আম-আঁটির ভেঁপু'তেই শেষ হয়ে যায় নি ? যে প্রশান্তিতে ও তিক্ততায়, মাধুর্যে ও বিষাদে জীবনের পূর্ণ পরিচয় তার তিক্ত স্বাদ অপু 'অক্রূরসংবাদ'এ প্রথম পেয়েছে। কিন্তু সে পরিচয় তো 'অপরাজিত'র পরিচয়। তাই সূক্ষ্ম বিচারে 'অক্রূরসংবাদ'এর যথার্থস্থান পথের পাঁচালী'তে নয়, 'অপরাজিত'তে। এমনকি 'অক্রূরসংবাদ' রেখে দিলেও 'পথের পাঁচালী'র গানকে অনাসক্তির বা পথের গান বলা চলে না, কারণ অক্রূরসংবাদ-এ নিশ্চিন্দিপুরের জন্যে অপুর অসপত্ন আসক্তি প্রকাশিত হয়েছে। গ্রাম্য প্রকৃতি ও নরনারী নিয়ে নিশ্চিন্দিপুর তো তার নিজের বাড়ি। কাশীতে মেজবাবুর প্রহারে জর্জরিত হয়েও অপুর চোখের জল পড়ে নি, কিন্তু দূর নিশ্চিন্দিপুরের মায়াময় স্মৃতিতে 'উচ্ছ্বসিত চোখের জল ঝরঝর করিয়া পড়িয়া তাহার সুন্দর কপোল ভাসাইয়া দিতেই চোখ মুছিতে হাত উঠাইয়া আকুল সুরে মনে মনে বলিল—আমাদের যেন নিশ্চিন্দিপুর ফেরা হয়—ভগবান তুমি এই কোরো, ঠিক যেন নিশ্চিন্দিপুর যাওয়া হয়—নৈলে বাঁচবো না—পায়ে পড়ি তোমার।'[৪]

গতিচেতনা বা অনাসক্তির গান যে 'পথের পাঁচালী'র নয় তার কারণ খুব সহজ ও স্বাভাবিক। 'পথের পাঁচালী' যার চোখে দেখা ও দেখানো সে অপু শিশু ও কিশোর। একজন শিশুর ও কিশোরের পক্ষে সৃষ্টির অন্তরালবর্তী গতিচেতনাকে উপলব্ধি করা বা অনাসক্তির গান শোনা স্বাভাবিক নয়। 'পথের পাঁচালী'র যে অংশ গতি বা অনাসক্তির বিভ্রম আনে সে অংশ একেবারে গ্রন্থের শেষাংশ, যেখানে বিভূতিভূষণ লিখেছেন, 'পথের দেবতা প্রসন্ন হাসিয়া বলেন—মূর্খ বালক, পথ তো আমার শেষ হয় নি তোমাদের গ্রামের বাঁশের বনে, ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়ের বটতলায়, কি ধলচিতের খেয়াঘাটের সীমানায়! তোমাদের সোনাডাঙা মাঠ ছাড়িয়ে, ইছামতী পার হয়ে, পদ্মফুলে ভরা মধুখালি বিলের পাশ কাটিয়ে, বেত্রবতীর খেয়ায় পাড়ি দিয়ে পথ আমার চলে গেল সামনে, সামনে, শুধুই সামনে···দেশ ছেড়ে দেশান্তরের দিকে, সূর্যোদয় ছেড়ে সূর্যাস্তের দিকে, জানার গণ্ডী এড়িয়ে অপরিচয়ের উদ্দেশ্যে···দিনরাত্রি পার হয়ে, জন্ম মরণ-পার হয়ে, মাস বর্ষ, মন্বন্তর, মহাযুগ পার হয়ে চলে যায়···তোমাদের মর্মর জীবনস্বপ্ন শেওলা-ছাতার দলে ভ'রে আসে, পথ আমার তখনও ফুরায় না···চলে···চলে···এগিয়েই চলে···অনির্বাণ তার বীণা শোনে শুধু অনন্তকাল আর অনন্ত আকাশ···সে পথের বিচিত্র আনন্দ-যাত্রার অদৃশ্য তিলক তোমার ললাটে পরিয়েই তো তোমায় ঘরছাড়া করে এনেছি···'।[৫] আসলে এই অংশটা না থাকলে বোধ হয় 'পথের পাঁচালী' সম্বন্ধে গতি বা অনাসক্তির এত কথা উঠত না। এই অংশটি এত কাব্যগুণসমৃদ্ধ, পড়তে এত ভালো লাগে যে এটিকে আমরা আমাদের গ্রন্থপাঠের সমগ্র ধারণায় অকিঞ্চিৎকর ভাবতে পারি না। কিন্তু নস্‌ট্যালজিয়া যেখানে 'পথের পাঁচালী'র ফলশ্রুতি সেখানে এই অংশ মনোরম হলেও কি অপরিহার্য? পড়তে ভালো লাগে বলে একে রাখলে কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু রেখে তাৎপর্য খুঁজতে গেলে অসুবিধা আছে। দ্বিতীয়তঃ, 'পথের পাঁচালী'র এই অংশের উক্তি কার? অপুর তো নয়, অপুর রচয়িতার। এবং এ উক্তি গ্রন্থমধ্যে নয়, গ্রন্থনেপথ্যে, যে নেপথ্যে তিনি 'অপরাজিত'র পরিকল্পনা করেছেন। অপুকে অপরাজিত জীবন-রহস্যের সন্ধান দেবেন বলেই তিনি তাকে পথের তিলক ললাটে দিয়ে ঘরছাড়া করেছেন। কিন্তু সে কথা তো 'অপরাজিত'র বা 'পথের পাঁচালী'র পরের কথা। 'পথের পাঁচালী' প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণ

৪ পথের পাঁচালী (৮ম সং), চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ, পৃ ৩৫০

৫ তদেব

মোহিতলালকে যে দিশাহারা দেশকালের কথা বলেছেন অথবা দিলীপ রায় যে অনাসক্তির গানের কথা লিখেছেন তা তাঁরা 'অপরাজিত'র কথা মনে রেখেই সম্ভবতঃ করেছেন। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের মতটি বড়ো দ্বিধাহীন। 'পথের পাঁচালী'কে তিনি বলেছেন বাঙলা পাড়াগাঁয়ের কথা যাকে অজানা রাস্তায় নতুন করে দেখতে হয়। রবীন্দ্রনাথ 'পথের পাঁচালী'র মধ্যে কোনো দার্শনিকতার সন্ধান পান নি। দিলীপ রায় তাঁর প্রবন্ধের এক জায়গায় গ্রন্থের শেষাংশকে— যেখানে দার্শনিকতা রয়েছে— 'পথের পাঁচালী'র দুর্বলতম স্থান বলেছেন। 'বস্তুতঃ পথের পাঁচালীর সবচেয়ে দুর্বল স্থান বোধ হয় তার শেষ কয়টি ছত্র— যেখানে কবি তাঁর দৃষ্টির সম্বল ছেড়ে দার্শনিকের চিন্তায় সান্ত্বনা পেতে গিয়েছেন।' আর দিলীপ রায়ের প্রবন্ধের সবচেয়ে দুর্বলস্থান বোধ হয় সেই অংশ যেখানে স্ববিরোধী হয়ে তিনি একবার বলেছেন 'পথের পাঁচালী'র পাতায় পাতায় নভোপিপাসা…এ গান আসক্তির গান নয় অনাসক্তির গান'; আবার বলেছেন, 'পথের পাঁচালীর মধ্যে কোনো বৃহৎ দিগ্বলয়ের পরিচয় নেই।' অথচ শেষের কথাটি কত যথার্থ। সত্যিই তো, 'পথের পাঁচালী'তে জীবনের পরিপূর্ণতা কোথায় যে তাতে বৃহত্তর জীবনের দিগ্বলয় দেখা যাবে? সে দিগ্বলয়ের পরিচয় বিভূতিভূষণ 'অপরাজিত'র অপুর জন্যে রেখে দিয়েছেন।

দিলীপ রায়ের তৃতীয় বক্তব্য, বাঙলা সাহিত্যে 'পথের পাঁচালী' এক অভিনব সৃষ্টি। শিশুর চোখ দিয়ে জগৎকে দেখা এর আগে কোনো বাঙলা বইয়ে হয় নি। তবে তিনি বলেছেন, বাঙলায় এ ধরণের বই নতুন হলেও, ধরণটা বিভূতিভূষণের তৈরি নয়। কারণ তাঁর আগেই রলাঁ *'Jean Christophe'* গ্রন্থে এই ধরণের দৃষ্টির আমদানি করেছেন। সুতরাং ওরিজিনালিটির দাবি বিভূতিভূষণ করতে পারেন না। তাছাড়া রলাঁর শিশু জাঁ ক্রিস্তফের বিশ্লেষণ আরও নিপুণ ও সমৃদ্ধ। তবু রলাঁর দ্বারা প্রভাবিত হলেও বিভূতিভূষণ যেভাবে অপু-দুর্গার চোখ দিয়ে জীবনকে দেখিয়েছেন তাতে তাঁর বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। শুধু 'পথের পাঁচালী' গ্রন্থখানির মূলে যে দুটি শিশু চরিত্র রয়েছে তা নয়, বিভূতিভূষণের কল্পনার মূলেই রয়েছে এক শিশুহৃদয়। এ বিষয়ে তাঁকে লেখা মোহিতলালের এক পত্রের তিনি উল্লেখ করেছেন। মোহিতলাল লেখেন, 'বিভূতিভূষণের কল্পনার মূলে আছে সৃষ্টির প্রাণলীলার অসীম রহস্যে আত্মহারা শিশুমানবের সুস্থ অনুভূতি, দারিদ্র্য শোক তাপ এমন-কি মৃত্যুবিভীষিকাও যে জীবনানন্দকে দমন করতে পারে না— সেই অপরাজিত হৃদয়ের দুর্দমনীয় বস্তুর সচেতনা, অসীম কৌতূহলযাপ্য রূপপিপাসা। জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর যেন শক্তি পরীক্ষা চলেছে— বন্ধনের সঙ্গে মুক্তির, দুঃখের সঙ্গে আনন্দের। একটি আত্মনির্লিপ্ত বা আত্মহারা রসচৈতন্য নিয়তির ওপরেও জয়ী হচ্ছে। সর্বস্ব হারিয়েও চিত্তগহনের কোনখান থেকে নিরন্তর সান্ত্বনা কিছুতেই ফুরোতে চাচ্ছে না।'

'পথের পাঁচালী'তে বিভূতিভূষণের কবিহৃদয়ের নিবিড় গ্রামপ্রীতি ফুটে উঠেছে। নিশ্চিন্দিপুরের গাছপালা, লতাপাতা, ঝোপঝাড়, ঋতুতে ঋতুতে পরিবর্তনশীল বনশ্রী প্রভৃতির রূপ তাঁর চোখে যেমন পরিচিত তেমনি আবার চিরনতুন। এত দেখেও বিভূতিভূষণ যেন বলতে চান, 'বড় বিস্ময় লাগে'। দিলীপ রায় বলেছেন, এর কারণ তাঁর প্রকৃতিই হচ্ছে বিস্মিত হওয়া। 'এ সম্ভব হয়েছে শুধু এইজন্যে যে, স্রষ্টার তৃতীয় নয়ন বিভূতিভূষণের সহজাত।' তাই তাঁর কাছে তৃণাঙ্কিত মাঠও যেমন নগণ্য নয়, তেমনি অতি সামান্য ঘটনাও তুচ্ছ নয়। দুই-ই রহস্যময়।

বিভূতিভূষণের প্রকৃতিচিত্রণের কথা আলোচনা করতে গিয়ে দিলীপ রায় বলেছেন, আমাদের সাহিত্যে

বিভূতিভূষণ এ ব্যাপারে অতুলনীয় নন। কারণ তাঁর আগে রবীন্দ্রনাথ 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থের অন্তর্গত চিঠিপত্রে প্রকৃতির ভাবমূর্তি দেখিয়েছেন, শরৎচন্দ্র 'শ্রীকান্ত' গ্রন্থে নিশীথ-অভিযান ও শ্মশানচিত্রে প্রকৃতির এক গরীয়ান্ রূপ দেখিয়েছেন। তবু বিভূতিভূষণ গ্রাম্য জীবনের প্রতি এক অসাধারণ মমতায় অনন্য। রবীন্দ্রনাথ গ্রাম বাঙলার প্রকৃতি ও মানুষকে ভালোবেসেছেন তাঁর কবিকল্পনায়, শরৎচন্দ্র ভালোবেসেছেন তাঁর গভীর-বেদনায় (গ্রাম্য প্রকৃতিকে নয়, নিপীড়িত মানুষকে), আর বিভূতিভূষণ সব জড়িয়ে গ্রামকে ভালোবেসেছেন তাদেরই একজন হয়ে। তাই বলে তিনি যে গ্রামের মানুষের ঈর্ষা দৈন্য হৃদয়হীনতা সম্বন্ধে উদাসীন তা নয়। তাঁর গ্রামপ্রীতি ঠিক গ্রাম্যজীবনের জন্যে প্রীতি নয়, তাঁর প্রকৃতিপূজা ঠিক প্রকৃতির চিররম্যোৎসবের ঐকান্তিক পূজা নয়—তাঁর ভালোবাসা হল মাটির টান, যাকে আমরা বলি আজন্মসংস্কার। 'অপু মাটি দেখিতে না পাইলে থাকিতে পারে না।' দিলীপ রায় বলেছেন, এইখানে তিনি অদ্বিতীয়। সোঁদালিফুলের ঝাড়, সাঁইবাবলা ও বাঁশবন, উদাসী বাউলের মতো কাঁচামাটির পথ, ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ, কলরবরত খেয়ানৌকোর যাত্রিদল— এইসব নিয়ে অপু গ্রামের মাটি ভালোবাসে। এ মাটি তার কাছে শুধু মৃন্ময়ী মৃত্তিকা নয়, নিগূঢ় বন্ধনে বাঁধা চিন্ময়ী লীলাসঙ্গিনী।

দিলীপ রায় সবশেষে বলেছেন, বিভূতিভূষণের উদ্দিষ্ট না হলেও 'পথের পাঁচালী'তে স্বাভাবিকভাবে একটি প্রশ্ন ফুটে উঠেছে। সে প্রশ্ন, গ্রামের সঙ্গে শহরের সম্পর্ক রক্ষার। 'পথের পাঁচালী'র শেষে হরিহর যেখানে নিশ্চিন্দিপুরের বাস উঠিয়ে কাশীতে গেল ও সেখানে মারা গেল এবং জীবনধারণের ও অপুকে মানুষ করার জন্যে সর্বজয়াকে রাঁধুনিবৃত্তি অবলম্বন করতে হল সেখানে আপনা-আপনিই এই প্রশ্ন জেগেছে, 'গ্রাম্যজীবনের বিসর্জনী কি এখন মানুষকে গাইতেই হবে? বরণ করে নিতেই হবে এই অর্থহীন ইটকাঠের বোঝা, ঠোকাঠুকির চকমকি, উত্তেজনার হররা, কর্মযজ্ঞের ধূম? লীলার চরম সার্থকতা নিহিত কি এই শ্রীহীন বৈচিত্র্যে, অর্থহীন জটিলতায়, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির যে নাড়ীর টান, হৃদয়ের রসের সঙ্গে নীরবতার যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, মনের কুঞ্জে ফুলফোটানোর সঙ্গে শিশিরবর্ষী অবসরস্নিগ্ধ সমাহিত জীবনের যে অপরিহার্য যোগসূত্র সে সবকে কি নির্দয় হয়ে ছিন্ন না করলেই চলবে না? এই কি এখনকার নিষ্করুণ যুগধর্ম? শান্তির সঙ্গে গতির কি কোনো সন্ধি, কোনো সামঞ্জস্যই সম্ভব হবে না, হতে পারে না?' দিলীপ রায় বলেছেন, বিভূতিভূষণ এ সমস্যার কোনো সমাধান করেন নি, অপুকে তিনি ঘরছাড়া করে পথে বার করেছেন। কিন্তু অপু যদি পুনরায় নিশ্চিন্দিপুরে ফিরে আসতে চায় তাহলে তার কি অবস্থা হবে সে সম্বন্ধে তিনি কোনো উচ্চবাচ্য করেন নি। 'তবে ইঙ্গিতে জানিয়েছেন যে, তাহলে গতিকটা বড় সুবিধের হবে না।' হরিহরের মৃত্যুর পর সর্বজয়ার অবশ্য নিশ্চিন্দিপুরে ফেরার কথা একবার মনে হয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হয়েছে, দেশে তো ভিটে ছাড়া আর কিছুই নেই। তাছাড়া, গ্রামের যে ঝি-বৌদের কাছে ভবিষ্যৎ জীবনের সুখের ছবি এঁকে সে চলে এসেছে তাদের কাছে সহায়সম্বলহীন বিধবার বেশে সে কিভাবে ফিরে যাবে?

'পথের পাঁচালী' শুধু বাঙালির কাছে নয়, বাঙলা-জানা বিদেশির কাছেও যে কি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় ১৯৩২ সালের ৮ই মার্চ তারিখে অ্যালবার্ট হলে অনুষ্ঠিত এক বিরাট সভায়। পরদিনের *Liberty* পত্রিকায় এই সভার বিস্তৃত বিবরণ বার হয়। এই সভায় বক্তা ছিলেন এডওআর্ড টমসন এবং সভাপতি ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। ভারতীয় সাহিত্য যাতে বিশ্বের দরবারে পরিচিত ও

পরীক্ষিত হয় সেজন্যে টমসন কতকগুলি প্রস্তাব পেশ করেন। এই সভাতেই তিনি *Oxford Book of Bengali Verse* এবং ভারতীয় সহিত্যের *Year Book* প্রকাশের কথা বলেছিলেন। সেই সঙ্গে বলেছিলেন, পৃথিবীতে 'পথের পাঁচালী'র মত বই যে লেখা হয়েছে অথবা পরিচয়-এর মত পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে এ কথা সবার জানা দরকার। তাঁর অপর প্রস্তাব ছিল, যে বিশিষ্ট ভারতীয় সাহিত্য সৃষ্টি সারা পৃথিবীতে সাড়া আনবে তার জন্যে স্বতন্ত্রভাবে নোবেল প্রাইজ জাতীয় কোনো পুরস্কার দেওয়া উচিত। টমসনের দ্বিতীয় প্রস্তাব খুব সাধু হলেও, সুচিন্তিত নয়। কারণ যে বই পৃথিবীতে সাড়া আনবে সে বইকে তো নোবেল প্রাইজই দেওয়া উচিত। বছর কয়েক আগে সঞ্জয় ভট্টাচার্য পূর্বাশায় লিখেছিলেন, 'বাজারে তখন গুজব ছিল, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যের নোবেল প্রাইজ পাবেন। মধ্য কলকাতায় তাঁর মেসের ঘরে গিয়েও তাঁর মুখে সেই গুজবের কথা শুনলাম। কিন্তু নোবেল প্রাইজ পেলেন সে বছর (১৯৩৩) আই. এ. বুনিন।'[৬] টমসনের 'পথের পাঁচালী' সম্বন্ধে প্রশংসা এবং ভারতীয় সাহিত্যের জন্যে নোবেল প্রাইজ জাতীয় পুরস্কারের প্রস্তাব এই দুটি বিষয় মিলে সম্ভবতঃ সাধারণ মানুষের মনে ধারণা হয়েছিল, বিভূতিভূষণ সে বছর নোবেল প্রাইজ পাচ্ছেন।

পরিচয় পত্রিকায় ১৩৪০ সালের বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যায় পুস্তক-পরিচয় বিভাগে চারুচন্দ্র দত্তের 'কৃষ্ণ রাও' গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'পথের পাঁচালী' সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান্ মন্তব্য প্রকাশ করেন। এমন গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা আগেই তাঁর করা উচিত ছিল সে কথা স্বীকার করে তিনি লেখেন, 'আধুনিক অনেক ভালো গল্প সম্বন্ধে আজও কোনো মত দিই নি— সেই অপরাধ হল নিবিড়— যথা বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'।' 'পথের পাঁচালী'র আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, এর আখ্যানটা অত্যন্ত দেশি, কিন্তু তাই বলে কম আকর্ষণীয় নয়। কারণ কাছের জিনিসেরও অনেক পরিচয় আমাদের কাছে বাকি থাকে। আমরা আজন্মকাল যেখানে আছি সেখানে আছি বলেই যে তার সব জায়গায় প্রবেশ করতে পেরেছি, সব জানতে পেরেছি তা নয়। 'পথের পাঁচালী যে পাড়াগাঁয়ের কথা সেও অজানা রাস্তায় নতুন করে দেখতে হয়।' রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন বিষয়গত নতুনত্বের কথা বলেছেন অপরদিকে তার রচনার কথায় বলেছেন, বিভূতিভূষণ এই নতুনকে রচনার অক্ষমতায় ঝাপসা অথবা মনোহরণের জন্যে সস্তা করে ফেলেন নি। 'পথের পাঁচালী' খুব খাঁটি, খুব উঁচুদরের কথা এবং এই সত্যের জোরে সে দাঁড়িয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'পথের পাঁচালী'তে আমরা নতুন কিছু পেলাম, যা নতুন হয়েও চিরন্তন— সারস্বত ভাষায় যাকে আমরা বলি চিরায়ত। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দিলীপ রায়ের বক্তব্যের আশ্চর্যরকম মিলের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এমন-কি উভয়ের প্রকাশভঙ্গিরও আশ্চর্যরকম মিল লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'পথের পাঁচালীর আখ্যানটা অত্যন্ত দেশি। কিন্তু কাছের জিনিসেরও অনেক পরিচয় বাকি থাকে। যেখানে আজন্মকাল আছি সেখানেও সব মানুষের সব জায়গায় প্রবেশ ঘটে না। পথের পাঁচালী যে বাংলা পাড়াগাঁয়ের কথা সেও অজানা রাস্তায় নতুন করে দেখতে হয়।' দিলীপ রায় বলেছেন, 'যেসব অকিঞ্চিৎকর ঘটনা নিত্য আমাদের চোখে পড়ে অথচ চির অচেনাই থেকে যায় পথের পাঁচালীর কবি তাদের নিকট-পরিচয়ের আনন্দেই আত্মহারা, সমীপ-স্পর্শেই বিভোর।'

শুধু বাংলাদেশে নয়, বিদেশেও যে 'পথের পাঁচালী' নিয়ে আলোচনা ও বিদেশি পাঠকের সঙ্গে তার

---

৬ মাঘ ১৩৭০, সম্পাদকীয়

যথাসম্ভব পরিচয়ের চেষ্টা হয়েছিল তার সংবাদ লণ্ডন থেকে প্রকাশিত INDIAN ART AND LETTERS পত্রিকা মারফত জানা যায়। এই পত্রিকার এবং London School of Oriental and African Studies-এর তরফ থেকে অনুষ্ঠিত এক যুক্ত সাহিত্যসভায় শিশিরকুমার মুখোপাধ্যায় 'আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের ধারা' সম্বন্ধে ১৯৪৩ সালের ৮ই জুলাই এক বক্তৃতা দেন। এই সভার সভাপতি ছিলেন এডওআর্ড টমসন। বক্তৃতাটি উপরিউক্ত পত্রিকায় এই বছরেই প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত প্রবন্ধে শিশিরকুমার বিশেষ করে 'পথের পাঁচালী' সম্বন্ধে একটি অনতিদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। লেখক 'পথের পাঁচালী' (The Wayfarer's Song) এবং 'অপরাজিত'কে (The Undefeated) রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যের সবচেয়ে স্মরণীয় গ্রন্থ বলে উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, 'The most interesting and perhaps the most original work of the period has been done by Bibhutibhusan Banddopadhyay··· after the main body of Tagore's poetry, this is the most significant achievement in Bengali literature'। বিদেশি পাঠকের সঙ্গে 'পথের পাঁচালী'র বিষয়বস্তুর পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে তিনি বলেছেন, এই গ্রন্থে বাঙলাদেশের অজ পাড়াগাঁয়ের প্রকৃতির মাঝখানে অপুর মতো এক দরিদ্র শিশুর অনুভূতি ও কল্পনাপ্রবণ মনের কিভাবে বিকাশ হল তাই দেখানো হয়েছে। বিভূতিভূষণ তাঁর অন্তর্দৃষ্টি এবং সহানুভূতি দিয়ে এই শিশু-নায়কের হর্ষ-বেদনা এবং আশা-নিরাশার ছবি এঁকেছেন। তাঁর ভাষায়, 'The Wayfarer's Song tells the story of a little boy born of poor middle class parents in a remote Bengali village, how he grows up in a perfect harmony with his surroundings, how every sight, smell or sound speaks to his sensitive nature and excites imagination. Bibhutibhusan has described the joys and sorrows, the disappointments and ambitions of his hero with insight and sympathy.'

গ্রন্থটির অভিনবত্বের প্রসঙ্গে উক্ত লেখক বলেন, এমন করে গ্রাম বাঙলার শান্ত সৌন্দর্য বাঙলা সাহিত্যে এর আগে কেউ দেখান নি। এই উপন্যাসে প্রকৃতি শুধু পশ্চাৎপট নয়, এক সজীব সত্তা। সে অপরের ভালোবাসায় সাড়া দেয়। 'He has seen the quiet beauty of a Bengali village as none has seen it before. His gift for revealing the spirit of a landscape is unique. For, in his novel Nature is not a mere decorative background but a living person capable of being loved and responding to love.'

শিশিরকুমার বলেছেন, 'পথের পাঁচালী'র অপর গুণ এর ভাষার অপূর্বতা। বিভূতিভূষণ মনের সূক্ষ্ম, দুর্লভ অথচ স্বাভাবিক অনুভূতিগুলি অতি সুন্দর ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন। 'পথের পাঁচালী'র বর্ষান্ধকার রাত্রির ছবি, ঝড়ের শব্দ, ভেজা গায়ে মায়ের হাতের স্পর্শানুভূতি প্রভৃতির কথা উত্তর জীবনে অপুর মনে পড়েছিল যেমন পড়েছিল প্রুস্তের *'A la Recherche du Temfis Perdu'*র নায়কের। এইসব নিবিড় অনুভূতির প্রকাশে বিভূতিভূষণ বাঙলা সাহিত্যে অতুলনীয়। 'The other interesting feature of the Wayfarers Song is that Bibhutibhusan has found words to describe the most subtle shades of feeling, the most rare and yet perfectly

পথের পাঁচালী'র মূল পাণ্ডুলিপির প্রথম পাতা।

লক্ষণীয় : এতে দুর্গা চরিত্র নেই

INDIA

POST CARD

WRITING SPACE ADDRESS ONLY

Bibhuti Bhusan Babu
B. A
H. E. School
Harinabhi
(24 Parganas

বিভূতিভূষণের প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা' প্রসঙ্গে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

natural sensations; how little Apu wakes up in the middle of night in the thatched hut in darkness, finds his mother fast asleep and hears the pattering of rain on all sides, and what a strange effect the confusion of the sound of wind and rain, the surrounding darkness, the touch of his sleeping mother had on his mind and how he remembered it afterwards Readers of *A la Recherche du Temfis Perdu* will remember how the very taste of a cup of tea evoked a train of association in the mind of Proust's hero, till a long vista of his past life flashed before his eyes as if in a mirror. In Bengali literature Bibhutibhusan is without a rival in the expression of these significant moments.'

সবশেষে প্রবন্ধকার বলেছেন, 'পথের পাঁচালী'র উৎসসন্ধান এক দুষ্কর কাজ। অথচ বাইরে থেকে তাকে খুব সহজ বলে মনে হয়। বিভূতিভূষণ শরৎচন্দ্রের মত পল্লীকেন্দ্রিক ঔপন্যাসিক। কিন্তু এ মিল একান্তই বহিরঙ্গের। কারণ বিভূতিভূষণের উপন্যাসে প্রকৃতি যেখানে অন্যান্য চরিত্রের মত প্রাধান্য পেয়েছে, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে প্রকৃতি সেখানে পটভূমিমাত্র। আবার, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে পল্লীসমাজের যে প্রাধান্য, বিভূতিভূষণের উপন্যাসে তা অনুপস্থিত। ভাষার উপর রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের প্রভাব থাকলেও 'পথের পাঁচালী' তার পায়ের নীচের মাটি থেকে রস সংগ্রহ করে আধুনিক উপন্যাস সাহিত্যে আপন স্বকীয়তায় এক স্বতন্ত্র সৃষ্টি হয়ে আছে। তাঁর ভাষায় 'It is a spontaneous growth of the soil and stands apart from all contemporary novels in splendid isolation.'

২

বিভূতিভূষণের সাহিত্যের সবচেয়ে বিতর্কিত গ্রন্থ 'অপরাজিত'। একদা এই গ্রন্থের সার্থকতা ও ব্যর্থতা নিয়ে বিচিত্রা ও পরিচয় পত্রিকাতে একাধিক আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩৩৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসের বিচিত্রায় মহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য 'পথের পাঁচালী ও অপরাজিত' এই নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। দিলীপ রায়ের আলোচনা যেমন প্রধানতঃ 'পথের পাঁচালী' সম্বন্ধে প্রথম বিস্তৃত আলোচনা, মহিমারঞ্জনের আলোচনা তেমনি প্রধানতঃ 'অপরাজিত' এবং বিভূতিভূষণের সাহিত্য সম্বন্ধে প্রথম বিস্তৃত আলোচনা। মহিমারঞ্জনের এই প্রবন্ধের পূর্বে 'পথের পাঁচালী' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রবাসীতে 'অপরাজিত'র প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়েছে। 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত'কে মহিমারঞ্জন আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলে উল্লেখ করেছেন। বিভূতিভূষণের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে তাঁর প্রথম বক্তব্য, লেখকের আশ্চর্য প্রকৃতিপ্রীতি। উভয় গ্রন্থে তাঁর প্রকৃতিপ্রীতির প্রাথমিক ও সাধারণ পরিচয় উল্লেখ করে তিনি দেখিয়েছেন, 'অপরাজিত'তে বিভূতিভূষণের প্রকৃতিবোধের বিবর্তন ঘটেছে। 'পথের পাঁচালী'র অপু মাঠঘাট, নদীবন, ফুলফল সব নিয়ে নিশ্চিন্দিপুরকে ভালোবেসেছে এবং ভালোবাসার নিবিড়তায় প্রকৃতির সৌন্দর্যের অঙ্গ হয়ে গেছে। মহিমারঞ্জনের ভাষায় 'বিশেষ প্রকৃতিরই একটা সৌন্দর্য অপুতে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল।' পরবর্তীকালে প্রমথনাথ বিশী অপুর সম্পর্কে বলেছিলেন, 'অর্ধেক মানব তুমি অর্ধেক প্রকৃতি।' 'অপরাজিত'তে সেই অপুর

প্রকৃতিবোধের বিবর্তন হয়েছে। তার মনে হয়েছে, প্রকৃতির সৌন্দর্যের মাঝখানে অসীম রহস্যময় এক প্রকৃত সৌন্দর্য লুকিয়ে রয়েছে। 'পথের পাঁচালী'তে যে অপু ভিজে মাটির গন্ধ, বনকুসুমের সৌরভ নিয়ে নিশ্চিন্দিপুরের পল্লীপ্রকৃতির সৌন্দর্যে আত্মহারা, 'অপরাজিত'তে সেই অপু এই দৃশ্যমান প্রকৃতির মায়া-যবনিকা সরিয়ে তার অসীম রহস্যময় মর্মস্থলে আসীন। অপুর প্রকৃতিবোধের বিবর্তনের কথা লিখতে গিয়ে মহিমারঞ্জনের সম্ভবতঃ মনে পড়েছে 'অপরাজিত'র সেই স্মরণীয় জায়গা, 'এই পৃথিবীর একটা আধ্যাত্মিক রূপ আছে, এর ফুলফল, আলোছায়ার মধ্যে জন্মগ্রহণ করার দরুন এবং শৈশব হইতে এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের বন্ধনে আবদ্ধ থাকার দরুন এর প্রকৃত রূপটি আমাদের চোখে পড়ে না। এ আমাদের দর্শন ও শ্রবণ-গ্রাহ্য জিনিসে গড়া হইলেও আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও ঘোর রহস্যময়, এর প্রতি রেণু···অসীম জটিলতায় আচ্ছন্ন···।'[৭] মহিমারঞ্জন যথার্থই বলেছেন, 'অপরাজিত'তে অপুর মন বিস্তৃত ও গভীর হয়েছে। 'পথের পাঁচালী'র অপু শুধু নিশ্চিন্দিপুরের পল্লীপ্রকৃতিকে ভালোবেসেছে, কারণ তার বাইরে সে প্রকৃতির অন্যরূপকে তখনও দেখে নি। 'অপরাজিত'র অপু তার সঙ্গে মধ্যপ্রদেশের আরণ্যপ্রকৃতি এবং প্রকৃতির অন্তরশায়ী এক সজীব সত্তাকে ভালোবেসেছে। লেখক অপুর প্রকৃতিবোধের বিবর্তনের কথাই শুধু বলেছেন, জীবনবোধের বিবর্তনের কথা উল্লেখ করেন নি। অথচ তার এই দুই বোধই এক মৌলিক উপলব্ধি থেকে। প্রকৃতির এই দৃশ্যমান রূপের মাঝখানে সে যেমন অরূপের সন্ধান পেয়েছে, তেমনি দুর্গা-সর্বজয়া-অপর্ণার মৃত্যুর মাঝখানে অমরতার আভাস পেয়েছে, বিভূতিভূষণের ভাষায় 'সে এক শাশ্বত রহস্যভরা গহন গভীর জীবন-মন্দাকিনী'।

প্রকৃতিপ্রীতির পথ ধরে মহিমারঞ্জন অপুর সম্বন্ধে পক্ষপাতিত্বের এক অভিযোগ এনেছেন। বলেছেন, অপুর ভালোবাসা সীমাবদ্ধ। তার ভালোবাসা শুধু গ্রাম-বাঙলার প্রতি, শহর-বাঙলার প্রতি নয়। এমন কি কল্পনায়ও সে শহরকে সহ্য করতে পারে না। তাই বিলেতকে দেখে জুনিপারের বনে, প্রাচীন নর্মান দুর্গের মাঝখানে, গ্রীসকে দেখে অলিভ-মার্টল কুঞ্জে, মিশরকে দেখে নলখাগড়ার বনে, নীলনদের ধারে। এ তো গেল তার স্বপ্নের কথা, জাগরণে সে কলকাতাকে একেবারে সহ্য করতে পারে না, বরাবরই তাকে ঘৃণা করে। অপুর নিবিড় পল্লীপ্রীতির কথা ভাবতে ভাবতে মনে হয়— অপুর পক্ষে এমন হওয়াই বোধ হয় স্বাভাবিক। কারণ যে প্রকৃতিকে ভালোবাসে সে শহরে তার অভাব দেখে বলেই শহরকে ভালোবাসতে পারে না, সহ্য করতে পারে না। কিন্তু সত্যিই কি অপু কলকাতা ভালোবাসে না? প্রকৃতিপ্রীতি তার মনের অনেকটা অংশ জুড়ে আছে বটে, কিন্তু তাই কি অপুর সব? তা হলে কলকাতা থাকাকালে সে তার কলেজ-জীবনকে, শীলেদের অফিসের অসহায় টাইপিস্ট নৃপেনকে, তার ও অপর্ণার প্রতিবেশিনী পিণ্টুর মাকে, দরিদ্র কবিরাজ-বন্ধু ও তার স্ত্রীকে কি করে ভালোবাসল? অপুর জীবনের বিবর্তন কি তার বৃহত্তর জীবনবোধে নয়, যে বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সে উপন্যাসের শেষে বলেছে, 'সুখ ও দুঃখ দুইই অপূর্ব। জীবন খুব বড় একটা রোমান্স, বেঁচে থেকে একে ভোগ করাই রোমান্স— অতি তুচ্ছতম, হীনতম, একঘেয়ে জীবনও রোমান্স।'[৮] জীবনের এই রোমান্সরাজ্যে প্রবেশের অন্যতম সদর দরজা প্রকৃতি, তাই সে প্রকৃতিকে এত ভালোবাসে। বিভূতিভূষণ এই গ্রন্থের সমকালীন তাঁর এক দিনলিপিতে বলেছেন, 'প্রকৃতির নিরাবরণ মুক্ত রূপের স্পর্শে এই (অনন্তের) অনুভূতি খোলে। সুপ্ত আত্মা জাগ্রত হয় চৈত্র-দুপুরের অলস নিমফুলের গন্ধে,

৭ অপরাজিত, (৬ষ্ঠ মুদ্রণ), ছাব্বিশ পরিচ্ছেদ, পৃ. ৩৯৬

৮ অপরাজিত (৬ষ্ঠ), মুদ্রণপঁচিশ পরিচ্ছেদ, পৃ. ৩৯০

জ্যোৎস্না-ভরা মাঠে, আকন্দফুলের বনে, পাখীর বেলা-যাওয়া উদাস গানে, মাঠের দূর পারে সূর্যাস্তের ছবিতে, ঝরাপাতার রাশির সোঁদা সোঁদা শুকনা শুকনা সুবাসে'।[৯] অপুর বিরুদ্ধে শহর-বিদ্বেষের অভিযোগ যথার্থ নয়। বরং এই কথাই কি ঠিক নয়, সে যখন স্কুলের পড়া শেষ করল তখন দেওয়ানপুরের হেডমাস্টারমশাই তাকে বলেছিলেন, 'পাড়াগাঁয়ের কলেজে খরচ কম পড়ে বটে কিন্তু সেখানে মন বড় হয় না, চোখ ফোটে না, আমি কলকাতাকেই ভালো বলি।' এবং অপুও সেই বৃহত্তর জীবনবোধের সন্ধানে বিপদের ঝুঁকি নিয়েও কলকাতা এসেছিল। এই কলকাতাতেই সে অনিল-প্রণব-লীলার ভালোবাসা, অপরদিকে প্রীতি-সুরেশদা-উড়েঠাকুরের অপমান পেয়েছে, দুঃখসুখের তিক্ত-মধুর রসে জীবনের রোমান্সকে উপলব্ধি করতে শিখেছে। যে কলকাতায় থাকার ফলে তার সঙ্গে জীবনের রোমান্সের পরিচয় সেই কলকাতাকে সে ঘৃণা করবে কেমন করে? আসলে অপু যাকে অপছন্দ করেছে সে শহর নয়, মানুষের হৃদয়হীনতা। এ ব্যাপারে শহর বা গ্রাম বলে বিভূতিভূষণের কোনো পক্ষপাত নেই। তাই 'পথের পাঁচালী'তে তিনি সুনীলের মা (সেজ বৌ), অন্নদা রায় এবং পরবর্তীকালে 'আরণ্যক'-এ রাসবিহারী সিং, নন্দলাল প্রভৃতির মত হৃদয়হীন মানুষের চিত্র আঁকতে দ্বিধান্বিত হন নি।

মহিমারঞ্জন প্রবন্ধের শেষাংশে 'পথের পাঁচালী-অপরাজিত'র গুটিকয়েক অপ্রধান চরিত্রের আলোচনা করেছেন। কাজলের কথায় লেখক যথার্থই বলেছেন, সে তার পিতা অপুর মত গঙ্গানন্দপুরের বা কলকাতার আবেষ্টনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশে যেতে পারে নি। এখানকার দৃশ্য ছায়াছবির মত তার চোখের সামনে আসা-যাওয়া করেছে, মনের মধ্যে কোনো ছাপ রাখতে পারে নি। তার কারণ কাজল যেখানে মানুষ হয়েছে তার চারপাশে নিশ্চিন্দিপুরের মত নয়ন-ভোলানো প্রকৃতি নেই। দ্বিতীয়তঃ, কাজল একান্তই একা, তার জীবনে দুর্গার মত দিদি বা পটুর মত সাথী নেই। মহিমারঞ্জন বলেছেন, 'পথের পাঁচালী'র উপেক্ষিত চরিত্র গুলকী, গোকুলের বৌ এবং বোষ্টমদাদু। এই চরিত্রগুলি অপ্রধান হয়েও অবিস্মরণীয়। 'অপরাজিত'তে অপু তার পুরনো সঙ্গীসাথী-সতুদা, দেবব্রত, সত্যেন, সুরেশ্বর, সবারে দেখা পেয়েছে, কিন্তু এরা চিরতরে বিদায় নিয়েছে। অথচ পাঠকের মনে এইসব ক্ষণস্থায়ী চরিত্রগুলি এত গভীরভাবে তাদের ছাপ রেখে গেছে যে তাদের উত্তরজীবনের পরিণতি সম্বন্ধে বরাবর একটা কৌতূহল থেকে যায়। পরবর্তীকালে নীহাররঞ্জন রায়ও তাঁর প্রবন্ধে এই কথা বলেছিলেন। মহিমারঞ্জন সবশেষে এনেছেন লীলার কথা। তিনি লীলা চরিত্রের সমালোচনার চেয়ে পরিচয় দিয়েছেন বেশি। এবং সে পরিচয় একান্তভাবে তাঁর সহানুভূতি-মিশ্রিত। বলেছেন, লীলার মত এমন তেজস্বিনী মেয়ের শোচনীয় পরিণাম পাঠককে অত্যন্ত ব্যথিত করে তোলে। পরবর্তীকালে নীহাররঞ্জন এই প্রসঙ্গে লীলার জীবনের শুধু বিপুল ব্যর্থতার নয়, তার ঔপন্যাসিক সম্ভাবনার সুন্দর ইঙ্গিত করেন। বর্তমান প্রবন্ধের যথাস্থানে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পরিচয় পত্রিকায় ১৩৩৯ সালের শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যার পুস্তক-পরিচয় বিভাগে নীরেন্দ্রনাথ রায় 'অপরাজিত'র সমালোচনা করেন। বিভূতিভূষণের মৃত্যুর পর এই প্রবন্ধটি ১৩৫৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসের পরিচয়-এ সম্পাদকের মন্তব্য-সহ 'অপরাজিত ও বিভূতিভূষণ' এই নামে পুনর্মুদ্রিত হয়। নীরেন্দ্রনাথ 'অপরাজিত'র পরিচয় প্রসঙ্গে প্রথমে 'পথের পাঁচালী'র আলোচনা করেছেন। কারণ তাঁর মতে

৯ তৃণাঙ্কুর (৪র্থ মুদ্রণ), পৃ. ৫৩-৪

'অপরাজিত' কোনো স্বতন্ত্র উপন্যাস নয়, তা 'পথের পাঁচালী'র সম্প্রসারণ। 'পথের পাঁচালী' নিয়ে সারস্বত আলোচনার আগে তিনি গ্রন্থটির অনন্য সৌভাগ্যের উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, 'পথের পাঁচালী' বিভূতিভূষণের প্রথম উপন্যাস হওয়া সত্ত্বেও তার ভাগ্যে যে খ্যাতি ও স্তুতি জুটেছিল তা বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের প্রথম রচনার ভাগ্যে জোটে নি। কথাটি বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের এবং সাধারণভবে অধিকাংশ গ্রন্থকারের ক্ষেত্রে সত্য হলেও শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রে সত্য নয়। ১৩১৪ সালের বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যার ভারতীতে অপরিণত বয়সের প্রথম লেখা 'বড়দিদি' বাদ দিলে শরৎচন্দ্রের যথার্থ আবির্ভাব ১৯১৩ সালে ফণীন্দ্রনাথ পাল সম্পাদিত যমুনা পত্রিকায়। শরৎচন্দ্রের কথায়, 'আমার সত্যিকারের সাহিত্যিক জীবন বলতে যা বুঝায় তা ১৯১৩ সাল থেকেই আরম্ভ হয়েছে। তখন ফণী পালের 'যমুনা' মাসিক পত্রিকাখানা মর-মর— আমিও সবেমাত্র রেঙ্গুন থেকে ফিরে এসেছি—ফণীবাবু আমাকে তাঁর কাগজের জন্য কিছু লিখতে অনুরোধ করেন।' এই অনুরোধের ফলেই 'রামের সুমতি' (ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩১৯), 'পথনির্দেশ' (বৈশাখ, ১৩২০) এবং 'বিন্দুর ছেলে' (শ্রাবণ, ১৩২০) গল্প তিনটির সৃষ্টি এবং শরৎচন্দ্রকে নিয়ে বাঙলা সাহিত্যে সাড়া। ইংরেজিতে অনূদিত 'শ্রীকান্ত'র ভূমিকায় টমসন এ ব্যাপারে শরৎচন্দ্রের স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করেছেন— 'This became at once extremely popular, and made me famous in one day. In Bengal perhaps I am the only fortunate writer who has not had to struggle।' পথের পাঁচালী'র খ্যাতির কথা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নীরেন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সাহিত্যের ইতিহাসে সমসাময়িক প্রতিভার ভিত্তি অনেক স্থানেই কতকগুলি সাময়িক কারণের সমাবেশ' এবং 'পথের পাঁচালী'ও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। গ্রন্থটির খ্যাতির সাময়িক কারণ-যুগোপযোগিতা। 'পথের পাঁচালী' যখন বেরিয়েছে তখনও পর্যন্ত বাঙলার সামাজিক জীবন প্রধানতঃ পল্লীকেন্দ্রিক। বাঙালির ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা হৃদয়াবেগ শুধু নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গল্প পল্লীজীবনকে কেন্দ্র করে। সেই পল্লীশ্রীর স্বপ্ন শরৎচন্দ্রের লেখা পড়ে আমাদের ভাঙল এবং সেই থেকে বাঙলা সাহিত্যের টান অতিরিক্তমাত্রায় শহরমুখী হয়ে পড়ল। একদিকে পল্লীবিদ্বেষের মাত্রাধিক্যে, অপর দিকে বাঙলা সাহিত্যকে আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের শ্রেণীতে তোলার জন্যে একদল পশ্চিমানুরাগী বাঙালি সাহিত্যিকের উৎকট প্রচেষ্টায় সাধারণ পাঠকের শ্বাসরোধের উপক্রম হল। এমন এক সংকট মুহূর্তে মুক্তির বার্তা আনলেন বিভূতিভূষণ এবং সেই সাময়িক সুযোগের সদ্ব্যবহারে 'পথের পাঁচালী'র সুখ্যাতি হল। সাময়িকতার কারণ দেখানোর পর নীরেন্দ্রনাথ এইবার খুঁজেছেন 'পথের পাঁচালী'র সার্থকতার স্থায়ী কারণ। বলেছেন, শরৎচন্দ্র এবং বিভূতিভূষণ উভয়ের সাহিত্যের বিষয় গ্রাম-বাঙলা, কিন্তু দুজনের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিভূতিভূষণ নিপুণভাবে শরৎচন্দ্রের এলাকার পাশ কাটিয়ে গেছেন। বিভূতিভূষণের পল্লীচিত্র শরৎচন্দ্রের পল্লীচিত্রকে সমর্থনও করে না, আবার অস্বীকারও করে না। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বিভূতিভূষণের তুলনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, শরৎচন্দ্র যেখানে এঁকেছেন পল্লীসমাজ, বিভূতিভূষণ সেখানে এঁকেছেন পল্লীগৃহ। এবং সে গৃহও সম্পূর্ণ নয়। সর্বজয়া-ইন্দির ঠাকরুনের সংসারে হরিহরের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। নীরেন্দ্রনাথ পল্লীচিত্রের বাস্তবতা বিচার করতে গিয়ে ইন্দির ঠাকরুনের মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর মতে, ইন্দির ঠাকরুনের মৃত্যুর যে করুণ চিত্র বিভূতিভূষণ এঁকেছেন তা কোনো পল্লীগ্রামে ঘটা সম্ভব নয়। তিনি বিশ্বাস করেন, বাঙলার পল্লীসমাজ যতই

পাপদুষ্ট হোক, অসহায় মুমূর্ষুকে সেবাশুশ্রূষা করার মত হিতবুদ্ধি তার আছে। লেখক যার উপর নির্ভর করে ইন্দির ঠাকরুনের মৃত্যুর অস্বাভাবিকতা নির্ণয় করেছেন তা আর্ট নয়, ব্যক্তিগত বিশ্বাসের তথা বাস্তবতার নিকষ। সর্বজয়ার দরিদ্র সংসারে ইন্দির ঠাকরুনের স্থানাভাব, বিতাড়ন এবং তাকে রাখার ব্যাপারে প্রথমে গ্রামবাসীদের উৎসাহ ও পরে উদাসীনতা, ফলে ইন্দির ঠাকরুনের মৃত্যু— এগুলি উপন্যাসে স্বাভাবিকভাবেই এসেছে বলে মনে হয়। আর ইন্দির ঠাকরুন তো দীর্ঘকাল রোগ ভোগের ফলে মারা যায় নি, বার্ধক্যে ও পরিচর্যার অভাবে সহসা মারা গেছে। সুতরাং দীর্ঘকাল রোগভোগের প্রসঙ্গ থাকলে গ্রামবাসীর সেবাযত্নের কথা উঠতে পারত। যাই হোক, পূর্বপ্রসঙ্গের জের টেনে বলা চলে 'পথের পাঁচালী'র পল্লীগৃহচিত্র সম্পূর্ণ নয় এবং বিভূতিভূষণও পল্লীর অবিকৃত চিত্র অঙ্কন করতে চান নি। পল্লী-পরিবেশ অপু-দুর্গার মত দুটি শিশুহৃদয়ে কি প্রভাব ফেলে তাই তিনি দেখতে চেয়েছেন। গ্রন্থকার ও গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, বিভূতিভূষণ বিস্ময়বোধের কবি এবং 'পথের পাঁচালী' বিস্ময়বোধের কাব্য। এই গ্রন্থের বিপুল আয়তনকে লেখক শিশুচিত্তবিকাশের অবকাশে ভরে দিয়েছেন। নিশ্চিন্দিপুরকে তিনি অপু-দুর্গার বিস্ময়দৃষ্টি দিয়ে দেখিয়েছেন এবং বাংলা সাহিত্যে এইখানেই 'পথের পাঁচালী'র অভিনবত্ব ও সার্থকতা। নীরেন্দ্রনাথের এই বিশ্লেষণের সঙ্গে দিলীপ রায়ের মতের মিল আছে। তিনিও বলেছিলেন, এর আগে বাঙলা সাহিত্যে শিশুর চোখ দিয়ে জগৎকে এমনভাবে দেখানো হয় নি। নীরেন্দ্রনাথ এ ব্যাপারে যা বলেন নি তা কিন্তু দিলীপ রায় বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এ দেখা বাঙলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণে প্রথম হলেও সাহিত্যে প্রথম নয়। কারণ তাঁর আগে '*Jean Christophe*' গ্রন্থে রলাঁ এই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। সেই সঙ্গে বলেছিলেন, রলাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েও বিভূতিভূষণের বৈশিষ্ট্য কিন্তু নষ্ট হয় নি। নীরেন্দ্রনাথ 'পথের পাঁচালী' সম্বন্ধে তাঁর আলোচনার শেষে বলেছেন, বহিঃপ্রকৃতির সানুরাগ পর্যবেক্ষণ -শক্তিতে বিভূতিভূষণের আসন ডবলু. এইচ. হাডসনের শ্রেণীতে। অবশ্য এ কথা পূর্বেই বিভূতিভূষণের সংবর্ধনা-সভায় নীরদচন্দ্র চৌধুরী উল্লেখ করেছিলেন।

নীরেন্দ্রনাথ তাঁর মূল আলোচনায় বলেছেন, অপুর নিশ্চিন্দিপুরে ফেরার উন্মুখতা থেকে শুরু করে চব্বিশ বছর বাদে নিশ্চিন্দিপুরে ফেরা পর্যন্ত— এই দীর্ঘ চব্বিশ বছরের অপু চরিত্রের বঙ্কিম ইতিহাসই 'অপরাজিত'। এই ইতিহাস 'পথের পাঁচালী' থেকে শুরু হলেও 'অপরাজিত'তে তার প্রকৃতি বদলেছে। লেখক এই দুই গ্রন্থের পার্থক্য প্রসঙ্গে বলেছেন, 'পথের পাঁচালী'র প্রধান চরিত্র নিশ্চিন্দিপুর আর 'অপরাজিত'র অপু। অবশ্য নিশ্চিন্দিপুর 'অপরাজিত'র অপুর চোখের আড়ালে গেলেও তার মনের গভীরে ঠাঁই পেয়েছে। তাই 'অপরাজিত'র অপু একদিকে যেমন নিশ্চিন্দিপুরের প্রকৃতির স্মৃতি রোমন্থন করেছে অপর দিকে তেমনি এই গ্রাম্যপ্রকৃতির উন্মুক্ত পাঠশালার পাঠ নিয়ে মধ্যপ্রদেশের আরণ্যপ্রকৃতিকে উপভোগ করতে শিখেছে। 'অপরাজিত'তে চব্বিশ বছরের জীবনের চড়াই-উৎড়াই ভেঙে অপু বৃহত্তর জীবনবোধের অধিকারী হতে চেয়েছে। কিন্তু নীরেন্দ্রনাথ বলেছেন, জীবন দীর্ঘ হলেও অভিজ্ঞতার স্বল্পতা এবং দৃষ্টির অগভীরতায় অপুর জীবনবোধ প্রগাঢ় হয় নি। তার কারণ, অপু ভূলোকের সামান্য তৃণগুচ্ছ থেকে দ্যুলোকের বিরাট নীহারিকা ও নক্ষত্রমণ্ডল পর্যন্ত নিজেকে যতখানি বিস্তৃত করতে পেরেছে মানবজগতের ক্ষেত্রে ততখানি সে পারে নি। লেখক অভিযোগ করেছেন, বিভূতিভূষণ বিপুল জীবনানন্দের ও রোমান্স-প্রিয়তার দোহাই দিয়ে অপুকে সর্বপ্রকার প্রলোভন এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে দূরে রেখেছেন। অপুর জীবনে যেটুকু সংঘর্ষ আছে তা শুধু দারিদ্র্যের

সঙ্গে, অথচ দারিদ্র্যই তো জীবনের সব নয়। অপুকে লেখক 'সর্ববিধ অন্তর্দ্বন্দ্ব, প্রলোভন প্রেমাবেগ, ভাববিপ্লব আদর্শবিভ্রাট' থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। অথচ জীবনের এই জটিলতাকে জানলে তবেই তো জীবনকে জয় করা সার্থক। যে তা জানল না সে অপরাজিত কোথায়? সে তো অপরিণত। নীরেন্দ্রনাথের ভাষায় 'গভীরতার ও জটিলতার অভাবে কেন্দ্রীয় চরিত্রের পরম দুর্বলতাই উপন্যাসখানির প্রধান ব্যর্থতা।' কেন্দ্রীয় চরিত্র ছাড়া অন্যান্য চরিত্র— এমনকি লীলাও, যার মধ্যে জটিলতার অবকাশ ছিল— একান্তই মামুলি। অপু চরিত্র সম্বন্ধে নীরেন্দ্রনাথের যে অভিযোগ তা যথার্থ। চরিত্র হিসেবে অপু যে একেবারেই জটিল নয় এবং সে অর্থে অপরাজিত নয়, অপরিণত এ কথা ঠিক।

নীরেন্দ্রনাথের এই অভিযোগের যথার্থতা মেনে নিয়ে এবার তার প্রাসঙ্গিকতায় আসা যাক। 'অপরাজিত' গ্রন্থে বিভূতিভূষণ অপরাজিত বলেছেন কাকে—অপুকে না অন্যকিছুকে? এই ব্যাপারে গোপাল হালদারের একটি স্মৃতিকথার উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রবাসী অফিসে 'অপরাজিত'র নাম নিয়ে একদিন বিভূতিভূষণের সঙ্গে নীরদচন্দ্র চৌধুরীর ঘোর তর্ক, গোপাল হালদারও সেই আলোচনায় উপস্থিত। উভয়ের আলোচনা শুনে গোপাল হালদার বলেছিলেন, 'অপরাজিত মানে Life Force— এই কি আপনার কথা? তা হলে ঠিকই তো এ নাম।'[১০] বিভূতিভূষণ শুনে খুশি হয়েছিলেন। 'অপরাজিত' গ্রন্থে বিভূতিভূষণ জীবনরহস্যকেই কি অপরাজিত বলতে চান নি? বিষ্ণুরাম রায়—বীরু রায়— ইন্দির ঠাকরুন—হরিহর— সর্বজয়া—অপুর মধ্য দিয়ে যে জীবনের ধারা আজ কাজলে এসে পৌচেছে তাকে উপলক্ষ করে কি তিনি বলেন নি 'যুগে যুগে অপরাজিত জীবনরহস্য কি অপূর্ব মহিমাতেই আবার আত্মপ্রকাশ করে!' সেই রহস্যের সন্ধানে অপুর মনে হয়েছে' 'সে দীন নয়, তুচ্ছ নয়— এটুকু শেষ নয়, এখানে আরম্ভও নয়। সে জন্মজন্মান্তরের পথিক আত্মা।' 'অপরাজিত'তে বিভূতিভূষণ বলতে চেয়েছেন' এই সবটা নিয়েই হচ্ছে বৃহত্তর জীবন, পৃথিবীর জীবনটুকু তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। বৃহত্তর জীবনসংজ্ঞার লক্ষণটি স্থির করে নিয়ে তিনি অপুকে ক্রমশঃই পরিণতির পথে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এই জীবনসংজ্ঞার লক্ষণ নিয়ে মতান্তর থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু বিভূতিভূষণের লক্ষণ অনুযায়ী অপু কোথায় অপরিণত? 'পথের পাঁচালী'র যে অপু, 'অপরাজিত'র পূর্বার্দ্ধের যে অপু প্রিয়জন-বিরহের বেদনায় কাতর ও জীবনের অর্থহীনতায় বিভ্রান্ত, 'অপরাজিত'র শেষার্দ্ধের সেই অপু মহাজীবনের অস্তিত্বের বিশ্বাসে শান্ত ও তন্ময়। এ কি তার অপরিণতির লক্ষণ? হর্ষ-বিষাদে, সঙ্গতি-বৈষম্যে যার মনে হয়েছে 'সবটা মিলিয়ে অপূর্ব রসসৃষ্টি— বৃহত্তর জীবনসৃষ্টির আর্ট', তাকে কি অগভীর বলা চলে? এইবার অপুর চরিত্র প্রসঙ্গে যে জটিলতার অভাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল তার যৌক্তিকতা বিচার করে দেখা যাক। নীরেন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন, পৃথিবীর সামান্য তৃণগুচ্ছ থেকে আকাশের নীহারিকা ও নক্ষত্রমণ্ডল পর্যন্ত তার দৃষ্টি বিস্তৃত। এই উদার বিশালতার ফলেই তার চরিত্রের জটিলতা এত কম। জীবনকে এত বড় করে জানার বাসনা যার মধ্যে, যার দৃষ্টি জন্মজন্মান্তরের বীথিপথে দূরবিস্তৃত, এই জীবনকে যে বৃহত্তর জীবনের ক্ষুদ্রভগ্নাংশ বলে মনে করে তার পক্ষে জীবনের সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি নিয়ে জটিল হওয়ার অবকাশ কি খুব বেশি? কিন্তু খুব বেশি না থাক, জটিলতার অপেক্ষাকৃত স্বল্প উপস্থিতি যে অপু চরিত্রের উৎকর্ষ কমিয়েছে এ কথা অস্বীকার করা যায় না। অপুর চরিত্রে যদি স্বাভাবিক মানুষের মত জটিলতা

১০ শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ, ১৩৭৫, পথের পাঁচালী, গোপাল হালদার

থাকত তাহলে আমরা তাকে আরো নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করতে পারতাম। তার জটিলতার সিঁড়ি বেয়ে মহাজীবনের মুক্তাঙ্গনে আরো স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতে পারতাম। তা হয় নি বলেই যে 'অপরাজিত' সার্থক রচনা হয় নি অথবা অপু চরিত্র ব্যর্থ হয়ে গেছে এ কথা বোধ হয় ঠিক নয়। তাছাড়া অপু চরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ্ব বা আদর্শবিভ্রাট একেবারেই নেই এ অভিযোগ নীহাররঞ্জন রায় খণ্ডন করেন। সে আলোচনা যথাস্থানে বিস্তৃতভাবে করা হয়েছে। আসলে 'অপরাজিত' এত ভালো লাগে বলেই তার সামান্য ত্রুটি আমাদের অত্যন্ত পীড়িত করে।

নীরেন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধের শেষে 'অপরাজিত'র খুঁটিনাটি বিবরণে যে ভুল রয়েছে তার উল্লেখ করেছেন। যেমন, মাঘ মাসের কয়েক মাস পরে সরস্বতী পুজো, পুজোর ছুটির পূর্বে হকি খেলার সৌজন ইত্যাদি।

নীরেন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটি প্রকাশের পরে ১৩৩৯ সালের কার্তিক সংখ্যার বিচিত্রায় 'অপরাজিত' নামে নীহাররঞ্জন রায়ের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। নীহাররঞ্জনের প্রবন্ধ মৌলিক হলেও এর কিছুটা অংশ নীরেন্দ্রনাথের অভিযোগের জবাব। নীরেন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে 'অপরাজিত' সম্বন্ধে যে-সমস্ত অভিযোগ এনেছেন লেখক সেগুলি খণ্ডনের চেষ্টা করেছেন, পরে গ্রন্থটি সম্পর্কে তাঁর নিজের অভিযোগ পেশ করেছেন এবং অবশেষে 'পথের পাঁচালী-অপরাজিত'র আলোচনা করেছেন। নীহাররঞ্জন প্রথমে তুলেছেন অপুর বিরুদ্ধে আনীত বৈচিত্র্যহীনতার অভিযোগ। 'তাঁহার চিত্রিত চরিত্রগুলি হয় মামুলি ধরণের প্রাণহীন জড় পদার্থ' নীরেন্দ্রনাথের এই উক্তি নীহাররঞ্জনের সম্ভবতঃ স্মরণে ছিল। যাই হোক, বৈচিত্র্যহীনতার অভিযোগের জবাবে লেখক বলেছেন, নিশ্চিন্দিপুরের বাল্যজীবন থেকে শুরু করে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত অপু কি বহু বিচিত্র অবস্থা ও ঘটনার মধ্য দিয়ে যায় নি? অবশ্য মনে প্রশ্ন উঠবে, তার যৌবনকালে তার 'Sex Life'এর পরিচয় তো আমরা পেলাম না। তার কারণ হিসেবে নীহাররঞ্জন বলেছেন, স্বভাবের দিক থেকে অপু বড় মুখচোরা ও লাজুক, আদর্শপ্রবণ ও কল্পনাবিলাসী। নীহাররঞ্জন এখানে অবশ্য মূল প্রশ্নের ঠিক জবাব দেন নি, ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ অপু মুখচোরা ও লাজুক হতে পারে কিন্তু বয়সের এই প্রবল ধর্মের সঙ্গে তার স্বভাব রফা করল কি করে, কি করে সে শুধল সেই 'আদিপঙ্কের ঋণ'? বিভূতিভূষণ তার উত্তরণ বা অবদমন কি গভীর অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে দেখিয়েছেন? 'Sex Life'এর অনস্তিত্বের কারণ হিসেবে তিনি দেখিয়েছেন— অপুর আবেষ্টন। অপু ছেলেবেলা থেকে যে আবেষ্টনে বড় হয়ে উঠেছে সে আবেষ্টন 'Conscious Sex Life'কে বর্ধিত করার পক্ষে অনুকূল নয়। তৃতীয়তঃ, অপুর সঙ্গে যে সব মেয়ের পরিচয় হয়েছে তারা এক বিশেষ জাতের মেয়ে, সে জাত 'মঙ্গলরূপিণী' মায়ের জাত।

নীহাররঞ্জনের দ্বিতীয় আপত্তি, অপুর বিরুদ্ধে আনীত অপরিণতির অভিযোগ সম্বন্ধে। নীরেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'জীবনের জটিলতাকে জানিলে তবেই জীবনকে জয় করা সার্থক—যে তাহা জানল না সে কিসে অপরাজিত? তাহার সারা জীবনই তো অপরিণত।' এই অভিযোগের উত্তরে লেখক বলেছেন, এ অপরিণতি তার প্রাণের, এই তার স্বভাব। অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন, অপু স্বভাবের দিক থেকে শিশু এবং যেহেতু শিশুকে আমরা অপরিণত বলি তাই অপুকেও অপরিণত বলা চলে। কিন্তু নীহাররঞ্জন বলেছেন, এ নেহাৎই আনুষ্ঠানিক বিচার, কারণ প্রকৃতির সামান্য ইঙ্গিতে যে মন সাড়া দেয় সে শুধু আমাদের শিশুমন নয়, চিরন্তন মন। দ্বিতীয়তঃ, তিনি উল্লেখ করেছেন, 'অপরাজিত'র শেষাংশে অপুর গভীর জীবনবোধের।

অপু অপরিণত হলে তা কি কখনো আসতে পারত? তৃতীয়তঃ বলেছেন, অপু যদি অপরিণত হত তাহলে সে আর দশজনের মত নিশ্চিন্দিপুরে জমিজমা দেখে, নয় মনসাপোতায় পুরুতগিরি করে জীবন কাটিয়ে দিত। যে অপরিণত 'সে এত বড় স্বপ্ন দেখতে পারে না, এত বড় আদর্শের পেছনে পাগল হয়ে ছুটতে পারে না।' অবশেষে নীহাররঞ্জন পরিণতির মানদণ্ডের কথা তুলেছেন। বলেছেন, আমরা পরিণতির বিচার সাধারণতঃ নিজেদের দৃষ্টি অনুযায়ী করি। এ বিচার ঠিক নয়, 'অপুর জীবনকে দেখার ভঙ্গি দিয়ে অপুর বিচার করতে হবে।' তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে তার পরিণতি ঠিক হয়েছে কি না দেখতে হবে। তা করলে দেখা যাবে 'তার মন, তার দৃষ্টি কোথাও নিশ্চল হয়ে নেই—তার পরিধি দিনের পর দিন বড় হয়ে সমস্ত পৃথিবীকে বেষ্টন করেছে'। লেখক বলেছেন, এই তো তার মত পরিণতি। তবে স্বীকার করেছেন, এ পরিণতি অবশ্য একটু একঘেয়ে।

নীহাররঞ্জনের শেষ আপত্তি, অপুর বিরুদ্ধে আনীত অন্তর্দ্বন্দ্ব-আদর্শ বিভ্রাটের অনুপস্থিতির অভিযোগ নিয়ে। অপুর চরিত্রে যে সেগুলির অভাব নেই তার উদাহরণ হিসেবে অপর্ণার মৃত্যুর পর চাঁপদানিতে অপুর ইতরভাবে জীবনযাপন, কোনো এক কোম্পানীর ধর্মঘটের সময় সেখানে চাকরি গ্রহণের চেষ্টা—এই সমস্ত ঘটনার তিনি উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া তিনি বলেছেন, অপুর অন্তর্দ্বন্দ্বের সবচেয়ে বড় পরিচয় তার অন্তরাত্মার একাকিত্বে। অপুর আপন বলতে কেউ নেই, বন্ধুবান্ধব বলতে কেউ নেই— নিঃসঙ্গতার এই দুঃখ দারিদ্র্যের চেয়েও ভীষণ। অবশ্য নীহাররঞ্জনের অনুমান সত্য হওয়া সত্ত্বেও আমাদের মনে কি এই প্রশ্ন থেকে যায় না, 'অপরাজিত'তে এই দ্বন্দ্বের তেমন প্রকট পরিচয় কোথায়? 'অপরাজিত' উপন্যাস বলেই তার স্পষ্ট পরিচয়ের প্রত্যাশাও আমাদের বেশি।

'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' সম্বন্ধে নীহাররঞ্জন এইবার তাঁর নিজের দু-একটি আপত্তির কথা তুলেছেন। তাঁর প্রথম আপত্তি, এই দুটি গ্রন্থে প্রাকৃতিক বর্ণনার পুনরুক্তি ঘটেছে। বিভূতিভূষণ এই দুই গ্রন্থে যথাক্রমে গ্রাম্য এবং আরণ্য প্রকৃতির বর্ণনা করেছেন। উভয় ক্ষেত্রেই বর্ণনায় বৈচিত্র্য কম। বিশেষ করে গ্রাম্য প্রকৃতির বর্ণনার ক্ষেত্রে ভাষা ও রূপকল্প অধিকাংশই একধরণের। সেই সঙ্গে স্বীকার করেছেন, অমরকণ্টকের আরণ্য প্রকৃতির বর্ণনা কিন্তু অতুলনীয়। প্রাকৃতিক বর্ণনার মত আর-একটি বিষয়ে তাঁর পুনরুক্তিদোষ ধরা পড়েছে, সে বিষয় দূর-ভবিষ্যতের বর্ণনা।

'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' প্রসঙ্গে লেখকের দ্বিতীয় আপত্তি— বিভূতিভূষণ কেন্দ্রীয় চরিত্র অপুকে ফোটাতে গিয়ে অন্যান্য চরিত্রের প্রতি অবহেলা প্রকাশ করেছেন। কথাসাহিত্যে চরিত্রের ঐক্যসূত্র সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থেকেও লেখক বলেছেন, গৌণ চরিত্রের প্রতি অবহেলায় কেন্দ্রীয় চরিত্র অপুর 'interest' কতকটা নষ্ট হয়ে গেছে। অর্থাৎ নীহাররঞ্জনের আপত্তি শুধু এরা বিভূতিভূষণের উপেক্ষিত বলে নয়, আরও মৌলিক কারণে। তাঁর যুক্তি, গৌণ চরিত্রগুলিকে বাড়তে দিয়ে তাদের সঙ্গে অপুকে জড়িয়ে দিলে অপু চরিত্রের 'interest' আরও নিবিড় হত। উদাহরণ হিসেবে তিনি লীলার চরিত্র নিয়েছেন। বলেছেন, লীলা অপুর জীবনে খুব বড় একটা স্থান জুড়ে আছে, কিন্তু বিভূতিভূষণ তাকে গ্রন্থমধ্যে বেশি জায়গা জুড়ে রাখেন নি। লীলা চরিত্রের সম্ভাব্যতা বিভূতিভূষণ যদি আরও তলিয়ে দেখতেন তাহলে গল্পের 'interest' বাড়ত এবং অপুর জন্যে তার প্রয়োজনও ছিল। এর আগে মহিমারঞ্জনের প্রবন্ধে লীলার মর্মান্তিক পরিণতি নিয়ে লেখকের আক্ষেপই মাত্র প্রকাশিত হয়েছিল, লীলাচরিত্রকে কিভাবে ফোটালে গ্রন্থের উৎকর্ষ

বাড়তো তার আলোচনা ছিল না। সে আলোচনা নীহাররঞ্জনই করেন। তবে, আলোচনার চিন্তাসূত্র হয়তো তিনি পূর্ববর্তী লেখকের কাছে পেয়ে থাকবেন।

নীহাররঞ্জনের শেষ আপত্তি, গ্রন্থ-দুটিতে মৃত্যুর আধিক্য নিয়ে। তাঁর মতে অপুর পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছরের জীবনে এতগুলি মৃত্যু অবাস্তব না হলেও এটা বিভূতিভূষণের উদ্দেশ্য প্রণোদিত বা 'bidout plot'। লেখক বলেছেন, এতগুলি মৃত্যু না হলে অপুর আদর্শের জয় যেন ঘোষিত হত না। প্রতিটি মৃত্যুতে একে-একে বন্ধন না খুললে অপু যেন অপরাজিত হত না। তাই লেখকের মনে প্রশ্ন জেগেছে, অপর্ণা, লীলা এদের বাঁচিয়ে রেখে, লীলার সঙ্গে তার সম্পর্ককে এতটা নিরাসক্ত না করে অপুকে কি অপরাজিত রাখা যেত না? লেখক বলেছেন, 'এক-একটা জীবনে যেন তার আদর্শের চাপ বাধা, এক-একটা মৃত্যুতে যেন সহজ হল, সুগম হল।' উদাহরণ হিসেবে তিনি সর্বজয়া, অপর্ণা, লীলা এদের কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ নীহাররঞ্জন বলতে চেয়েছেন, এরা সবাই অপুকে ভালোবাসার বাঁধনে বেঁধেছে, তবু এ বাঁধন সোনার শেকলের বাঁধন। এদের মৃত্যুতে সে বাঁধন কেটেছে, অপু মুক্ত হয়েছে। মৃত্যুতে সর্বজয়া, অপর্ণা, লীলা এদের বাঁধন কেটেছে—এ কথা সত্য হলে কাজল সম্বন্ধে তিনি কি বলবেন? তার বাঁধন যে আরও নিবিড়, সে যে আসলের সুদ। কাজলের প্রতি তার মমতা যে কত অধিক সে পরিচয় তো তাকে গঙ্গানন্দকাটি থেকে কলকাতায় নিজের কাছে নিয়ে আসার এবং শেষে তার আদিজননী নিশ্চিন্দিপুরের ক্রোড়ে রেখে যাওয়ার ঘটনায় ফুটে উঠেছে। শুধু মৃত্যুতেই জীবনের বাঁধন কাটে, এ কথা সত্য হলে কাজল বেঁচে আছে বলে অপুর বন্ধন কাটে নি এবং তদনুযায়ী অপু অপরাজিত হয়নি এ কথা কি বলা যাবে? আসলে ভালো করে লক্ষ করলে দেখা যাবে, অপুর স্বভাবের মধ্যেই আসক্তি-অনাসক্তির বিরোধী অথচ সহজাত এক যুগ্ম প্রবৃত্তি আছে। সে সংসারীর মত একান্ত আসক্ত নয়, আবার সন্ন্যাসীর মত সম্পূর্ণ উদাসীনও নয়। আসলে অপু বাঙলাদেশের এক গৃহী বাউল আর এই কারণেই সে বোধ হয় আমাদের এত প্রিয়। নিশ্চিন্দিপুরের প্রতি তার মমতাও যত বেশি, নিশ্চিন্দিপুরের সীমানার ওপারের জগৎকে জানার জন্যে তার উৎকণ্ঠাও ততোধিক। দুর্গা, সর্বজয়া, অপর্ণা, লীলা এদের নিয়ে কাছের প্রতি ভালোবাসাও তার যত বেশি, দূর মধ্যপ্রদেশের অরণ্যশীর্ষের হাতছানিও তার কাছে তত লোভনীয়। মৃত্যু দিয়ে বিভূতিভূষণ কাজলকে অপুর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেন নি। অপু কাজলকে ভালোবেসেই দূরে গেছে। সে জন্যে অপর্ণা বা লীলাকে বাঁচিয়ে রাখলে অপুকে যে অপরাজিত রাখা যেত না, তা বোধ হয় সত্য নয়। অপুর জীবনে এদের মৃত্যুর দাম আছে এবং সেই দাম দিয়ে সে জীবনকে চিনেছে। তবে তার জন্যে বিভূতিভূষণ এতগুলি মৃত্যু না ঘটালেও পারতেন।

নীহাররঞ্জন তাঁর প্রবন্ধের শেষাংশে গ্রন্থ-দুটির সার্থকতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ আলোচনা তাঁর মূল প্রবন্ধের এক তৃতীয়াংশ এবং সেদিক থেকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, কিন্তু অত্যন্ত মূল্যবান্। নীরেন্দ্রনাথ 'অপরাজিত' প্রসঙ্গে বলেছিলেন, বিভূতিভূষণ বড় বই লিখলেও বড় লেখক নন। নীহাররঞ্জন কিন্তু তা মনে করেন না। তাঁর মতে বিভূতিভূষণ বড় বই লিখেছিলেন এ কথা নিতান্তই অবান্তর, তিনি বড় স্রষ্টা। অর্থাৎ 'অপরাজিত' শুধু বড় বই নয়, অপরাজিত 'great art'। নীহাররঞ্জন বলেছিলেন, 'কি দেশের কি বিদেশের আজকাল এই যুগের গল্প উপন্যাস যখন পড়ি, তার চতুরতা লিপিকৌশলে মানবচরিত্রের সূক্ষ্ম জটিল বিশ্লেষণে আমরা মুগ্ধ হই…কিন্তু যতক্ষণ এ সব বই পড়ি, সর্বক্ষণই যেন মনে হয় চাপা বদ্ধ গলি, lanes and alleysএর মধ্যে নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে, মুক্তির আলো কোনো দিক দিয়েই যেন দেখা যায় না।' কিন্তু

বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী-অপরাজিত' পড়ে পাঠক উদার উন্মুক্ত বিশালতার মধ্যে, 'creative freedom'-এর মধ্যে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। মানবজীবনের সূক্ষ্মজটিলতার বিশ্লেষণ এ গ্রন্থে নেই এবং বিভূতিভূষণ তার চেষ্টাও করেন নি। তিনি মানুষকে 'বুঝেছেন ও জেনেছেন যেখানে মানুষ সহজ ও স্বচ্ছন্দ, যেখানে সে একটা সুবৃহৎ পরিসরের মধ্যে নিজেকে মুক্ত করে দিয়েছে, যেখানে সে অসীম বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত, সীমাহীন প্রকৃতির সে আত্মীয় এবং আদিঅন্তহীন শাশ্বত কালের সঙ্গে সে নিজেকে এক করে অনুভব করেছে।' যে লিপিকৌশলের সাহায্যে এ বিশালতার আভাস সৃষ্ট হয়েছে তার কথায় লেখক বলেছেন, 'বিভূতিভূষণ জানেন স্মৃতির সাহায্যে কল্পনার সাহায্যে কি করে বর্তমানকে অতীত-ভবিষ্যতের মধ্যে বিসর্পিত করে আদিঅন্তহীন কালের সঙ্গে যুক্ত করে চিরন্তনের বিশালতার আভাস সৃষ্ট করা যায়।' নীহাররঞ্জন বলেছেন, 'পথের পাঁচালী-অপরাজিত' অপুর জীবনকাব্য এবং বিভূতিভূষণ বিশালতার ভাবনার মাঝখানে অপুর জীবনকে সমগ্রভাবে দেখতে চেয়েছেন। এই সমগ্রভাবে দেখা সত্যদৃষ্টি এবং এই দৃষ্টিতেই মানুষ মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করে। এই দৃষ্টিতেই মানুষ এপিক লিখেছে, সুবিশাল কক্ষের দেয়াল জুড়ে বড় বড় ফ্রেসকো এঁকেছে। বিভূতিভূষণ এঁদেরই আত্মীয়। 'পথের পাঁচালী-অপরাজিত'র বিপুল পরিসরে অপুর ক্রমবর্ধমান জীবনের ছবি দেখতে দেখতে তাঁর মনে পড়েছে নরওয়ের ভাস্কর গুস্তাভ ভিগেলাণ্ডের অতিকায় ভাস্কর্য 'Tree of Life'এর কথা, যা আজও মানুষের কাছে 'epic in sculpture' হয়ে আছে।

৩

পরিচয় পত্রিকায় ১৩৩৮ সালের কার্তিক-পৌষ সংখ্যার পুস্তক-পরিচয় বিভাগে পশুপতি ভট্টাচার্য বিভূতিভূষণের প্রথম ছোটগল্প-সংকলন 'মেঘমল্লার'এর আলোচনা করেন। এই গ্রন্থটির মাধ্যমে বিভূতিভূষণের লেখার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়। তার পরে তিনি 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' পড়েন। 'এঁর লেখা এই প্রথম পড়লাম এবং একবার পড়েই চমৎকৃত হতে হয়েছে। উঁচুদরের গল্পলেখকের যে প্রতিভা যা আমাদের দেশে দুর্লভ— এই বইখানির মধ্যে তারই সন্ধান পাওয়া গেল।' গ্রন্থটির উৎসর্গপত্রে যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বিভূতিভূষণ তাঁর মেজমামা বলে উল্লেখ করেছেন পশুপতি ভট্টাচার্য তাঁকে কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র বলে মনে করেছেন। আসলে ইনি বিভূতিভূষণের মাতুল, এঁর পিতা বর্ধমান শহরের খোশবাগানপাড়া-নিবাসী গুরুচরণ চট্টোপাধ্যায়। সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের পিতার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায়। লেখক শরৎচন্দ্র বিভূতিভূষণের মাতুল— এই ধারণায় অথবা সাধারণভাবে বাঙলা সাহিত্যের ধারার কথা ভেবে পশুপতি ভট্টাচার্য বলেছেন, শরৎচন্দ্রের 'ভাষাসম্পদ উত্তরাধিকারসূত্রে হয়তো ইনি পেয়ে থাকবেন।' সেই সঙ্গে আরও বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের ভাবধারার প্রভাব এবং প্রভাতবাবুর ঘটনাবিন্যাসের পারিপাট্যও হয়তো গল্পগুলির মধ্যে দেখা যায়।' কিন্তু তৎসত্ত্বেও 'এঁর ভাষায়, ভাবে এবং ধরণধারণে এমন-একটি উচ্চ অঙ্গের বৈশিষ্ট্য আছে যা একেবারে নূতন, স্বতন্ত্র এবং অননুকরণীয়।' এই উচ্চাঙ্গের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে তিনি প্রথমে বলেছেন গ্রন্থটির ভাষার কথা। ভাষার উপর 'মেঘমল্লার'এর রচয়িতার দখল অনায়াস। গল্পগুলি পড়ে মনে হয়, তিনি যেখানে যেরকম আবহাওয়া ও সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে চান সেখানে সেই রকম উচিত কথা জোগাতে পারেন। 'প্রয়োজনমত ভাষা কোথাও সমুদ্রের গর্জনের মত গম্ভীর; কোথাও তটিনীর মত মৃদুগুঞ্জী; কোথাও মহান্‌ কল্পনার সঙ্গে তুচ্ছ কথার পাশাপাশি অপূর্ব সমাবেশ। ভাষার

উপর এমন অধিকার রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং দৈবাৎ হয়তো আরও এক-আধজন ছাড়া আর কারো নেই।'

'মেঘমল্লার'এর লেখকের দ্বিতীয় গুণ, অপূর্ব প্রকৃতিচিত্রণ-দক্ষতা। প্রকৃতির ছবি ফোটাতে গ্রন্থকারের দু-চার লাইনের বেশি বর্ণনার দরকার হয় নি। 'অল্প কথায়, অল্প উপকরণে এমন-সব মনোরম ছবি স্থানে স্থানে খাপ খাইয়ে বসানো যে পড়তে পড়তে শতবার বাহবা দিতে হয়। গ্রাম্য ঝোপঝাড়, বনবাদাড়, নদীর ধার এঁর বড় প্রিয়।' লেখক বলেছেন, বিভূতিভূষণ যে চোখ দিয়ে পল্লীর সৌন্দর্য দেখেছেন সে চোখ দিয়ে আমরা আগে কখনও দেখি নি। পল্লীপ্রকৃতির স্বাদ ও গন্ধ তিনি ভাষার মধ্য দিয়ে নিপুণভাবে পরিবেশন করেছেন।

সাম্প্রতিক সাহিত্যে যেখানে নরনারীর যৌনসম্পর্ক না থাকলে লেখা হয় না এবং হলেও জমে না সেখানে 'মেঘমল্লার' 'নিরামিষ রচনা' হয়েও চমৎকার। বিভূতিভূষণ এই গ্রন্থে যে নারীমূর্তি এঁকেছেন সে নারী স্নেহে ও মমতায় করুণাময়ী এবং মঙ্গলরূপিণী। আধুনিক সাহিত্যে প্রেম বলতে হৃদয়ের যে বিশেষ ধরণের বৃত্তিকে বোঝায় এখানে তার অভাব সত্ত্বেও গল্পগুলিতে রোমান্সের কোনো অভাব ঘটে নি। তিনি বলেছেন, 'রূপক হিসাবে এই কথাটারই আভাস দিয়েছে প্রথম গল্প 'মেঘমল্লার'।··কেউ চায় বাঁধতে, কেউ চায় মুক্তি দিতে। তাতে যদি পাষাণই হতে হয়— তবু পাষাণের বুক থেকে কত যে নির্ঝরিণীর ধারা ঝরে, তার প্রমাণ এই বইয়ের মধ্যে পাওয়া যায়।'

অন্যান্য গল্পের মধ্যে তিনি নাম করেছেন 'উমারানী' 'পুঁইমাচা' 'খুকীর কাণ্ড'— এই তিনটি গল্পের। এইসব গল্পের চরিত্র আমাদের কাছে খুব চেনা হয়েও অবিস্মরণীয়। এই গল্পসংকলনের যে গল্পটি দিয়ে বিভূতিভূষণের সাহিত্যিকজীবনের শুরু সেই 'উপেক্ষিতা' গল্পটির কথায় তিনি বলেছেন, 'আমার মতে রসসৃষ্টি-হিসাবে এইটাই শ্রেষ্ঠ রচনা। এ তো গল্প নয়, একখানা ছবি।···যেন সেই Impressionist Schoolএর ছবি। কয়েকটি মাত্র রেখা, মাঝে অনেকটা ফাঁকা।' প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা গেল, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এই গল্পটি পড়ে সেদিনের অখ্যাত লেখককে লিখেছিলেন, 'তোমার গল্পটি বড় মনোরম হইয়াছে! রচনা যেমন সুললিত তেমনি প্রাঞ্জল। পড়িতে আরম্ভ করিলে আর ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। দুঃখ হয় যে শীঘ্র ফুরাইয়া গেল। রুচিও সুমার্জিত। তুমি চেষ্টা করিলে এ বিষয়ে সুনাম অর্জন করিতে পারিবে।'

উপরি উক্ত পত্রিকায় ১৩৩৯ সালের মাঘ-চৈত্র সংখ্যার পুস্তক-পরিচয় বিভাগে গিরিজাপতি ভট্টাচার্য বিভূতিভূষণের ছোটগল্প-সংকলন 'মৌরীফুল'এর সমালোচনা করেন। লেখক তাঁর আলোচনার প্রারম্ভে বলেছেন, বিভূতিভূষণের প্রথম দুখানি উপন্যাস নিয়ে তখন এত অনুকূল ও প্রতিকূল সমালোচনা হচ্ছিল যে সাধারণ পাঠক প্রায় ভুলতে বসেছিল বিভূতিভূষণের গল্পের দাবি কম নয়। প্রমাণ হিসেবে তিনি বলেছেন, প্রবাসীতে 'উমারানী' যখন প্রকাশিত হয় (শ্রাবণ, ১৩২৯) তখন প্রায় এমন কোনো বাঙালি পাঠক ছিল না যে এই গল্প পড়ে মুগ্ধ হয় নি। অথচ সেই 'উমারানী' ও আরও এমন কয়েকটি গল্প নিয়ে যখন 'মেঘমল্লার' প্রকাশিত হল তখন পাঠকের দৃষ্টি আর তেমন আকৃষ্ট হল না। কিন্তু 'মৌরীফুল' প্রকাশের সময় সে অবস্থার পরিবর্তন হয়। 'এখন বিভূতিবাবুর উপন্যাস সংক্রান্ত তর্কবিতর্ক স্তিমিত হয়েছে, এই অবসরে তাঁর দ্বিতীয় গল্পের বই মৌরীফুল প্রকাশিত হওয়ায় তাঁর গল্পের পরিচয় নেওয়ার সহজ অবকাশ উপস্থিত হবার কথা।' তিনি বলেছেন, বিভূতিভূষণ এই গল্পগ্রন্থের উপাদান

সংগ্রহ করেছেন পল্লীগ্রাম এবং আমাদের জীবনের একান্ত অনাড়ম্বর ঘটনা থেকে। অবশ্য তাতে মাঝে মাঝে একটু বেশি করেই আড়ম্বর এসে পড়েছে। 'মৌরীফুল'এর পল্লীগ্রাম বিভূতিভূষণের তৈরি। তার একদিকে যেমন মানুষের গ্রাম্যতা অজ্ঞতা, নির্মমতা, সরলতা, আতিথ্য ও সৌহার্দ্য অপরদিকে তেমনি প্রকৃতির অকৃপণ দান। গিরিজাপতির বিচারে এই সংকলনের মাত্র তিনটি গল্প— 'মৌরীফুল', 'রোমান্স' ও 'রাক্ষসগণ'— উল্লেখযোগ্য। বাকি গল্পগুলি নিরর্থক পণ্ডশ্রম, তাই তার আলোচনা তিনি করেন নি। প্রথম তিনটি গল্পের মধ্যে আবার 'মৌরীফুল' গল্পটির মাত্র বিস্তৃত আলোচনা তিনি করেছেন। গল্পটিতে সুশীলার চরিত্রগত দ্বন্দ্ব উজ্জ্বল হয়েছে। 'এই করুণাবঞ্চিত, অত্যাচারিত, অন্তর্বেদনা-পূর্ণ গ্রাম্য বধূটির জন্য সকল পাঠকের হৃদয় আর্দ্র হয়ে উঠবে।' এই গল্পে সুশীলার অপমৃত্যু—যাকে তিনি দায়ে পড়ে খুন করা বলেছেন—অত্যন্ত অস্বাভাবিক। সুশীলার মৃত্যু সম্বন্ধে লেখকের এ অভিযোগ যথার্থ। সুশীলার মৃত্যুতে করুণরসের আধিক্য রয়েছে এ কথা না ভেবে পারা যায় না। তার অবাঞ্ছিত অখ্যাতি এবং শাস্তিস্বরূপ নির্বাসনের দণ্ডই তো পাঠকের সহানুভূতি সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট। 'রোমান্স' গল্পটি প্রসঙ্গে লেখক শুধু বলেছেন, 'দুই বোনের বালিকা-মনের ঈষৎ প্রেমের ইশারা ও তারতম্য এই গল্পটিকে রঙীন ও সুষমামণ্ডিত করেছে।' তৃতীয় গল্পটি সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, 'রাক্ষসগণ'-এ সেবাপরায়ণ রেণুর নিঃস্বার্থ রমণীসুলভ অন্তরঙ্গতার চিত্র পাঠককে অন্যমনা করবে। এই গল্পটি সম্বন্ধে তাঁর অভিযোগ, রেণুর অকালবৈধব্যফল থেকে নিজে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যে নায়কের যে উল্লাস তা সার্থক নয়, রূঢ়। কারণ লেখক নায়ককে গল্পের মধ্যে ইতর বা হৃদয়হীন করে সৃষ্টি করে নি, বরং রেণুর অন্তরঙ্গতায় মুগ্ধ করে দেখিয়েছেন। গিরিজাপতি এই গল্পের সূক্ষ্ম কটাক্ষটিকে বোধ হয় নজর করেন নি। রেণুর অকাল-বৈধব্যাবস্থা দর্শনে সুরেশের যে উল্লাস সে তো মনুষ্যমাত্রেরই আত্মরক্ষার জৈব উল্লাস। তার মধ্যে অস্বাভাবিকতা কোথায়? তবু স্বাভাবিক হয়েও মনুষ্যত্বের আদর্শে সুরেশ যে অপরিপূর্ণ তার জন্যে বিভূতিভূষণ কটাক্ষ করতে ছাড়েন নি; কিন্তু এটাই কি সুরেশের সব? সুরেশ তো শুধু আত্মরক্ষার জৈব উল্লাসে মনুষ্যজীব নয়, সে যে চরিত্রগত দ্বন্দ্বে মানুষ। তাই একবার তার যেমন মনে হয়েছে, 'কি বেঁচেই গিয়েছি! রাক্ষুসীর ফাঁদই তো বটে!' আবার সেই সঙ্গে 'সুরেশের মনে দূর সম্পর্কিত সহানুভূতিশূন্য এক আত্মীয়ের দ্বারস্থ এই পিতৃমাতৃহীনা নিরপরাধা অভাগিনী বালিকার ছবিটি সম্পূর্ণ অন্যভাবে ফিরে এল। কার অপরাধে এই প্রস্ফুট-মুকুল প্রথম বসন্তের দিনে তার জীবনের আনন্দদীপটি নির্বাপিত হয়ে গেল চিরদিনের মত?' 'গ্রহের ফের' সম্বন্ধে লেখক যথার্থই বলেছেন, এই গল্পের নায়ক রাজচন্দ্রবাবুর তন্ময়তা ও মস্তিষ্কবিকৃতি মনকে খুব স্পর্শ করলেও, লেখার বিষয়টি সিদ্ধসত্যবিরোধী হওয়ায় শেষ পর্যন্ত গল্পটি ব্যর্থ হয়ে গেছে। রাজচন্দ্রের প্রতিভার উৎকর্ষ দেখানোর জন্য তাকে এক ধূমকেতুর ভবিষ্যদ্বক্তা করা হয়েছে। কিন্তু ধূমকেতুর আবিষ্কর্তাদের নাম নিয়ে কল্পনা করা হাস্যকর।

বিভূতিভূষণের প্রদর্শিত পল্লীজীবন সম্বন্ধে লেখকের অভিযোগ, তা 'রমণীয় কিন্তু অনতিগভীর।...যদি শরৎবাবুর লেখার সঙ্গে তুলনা...হয় তবে বলা চলে যেখানে বিভূতিবাবু নম্র সুষমাময় ও অনতিগভীর সেখানে শরৎবাবু কত সতেজ কত জীবন্ত কত বিশিষ্ট কত গভীর হতেও গভীরতর।' গিরিজাপতি এখানে গভীরতার একটি বিশেষ দিকের কথাই ভেবেছেন। সে বিশেষ দিক জটিলতা। শরৎচন্দ্র এবং বিভূতিভূষণ উভয়ের লেখার বিষয় পল্লীজীবন হলেও উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সজাতীয় ভিন্নতা রয়েছে। নীরেন্দ্রনাথ যার

জন্যে বলেছিলেন, শরৎচন্দ্র যেখানে এঁকেছেন পল্লীসমাজ, সেখানে বিভূতিভূষণ এঁকেছেন পল্লীগৃহ। সুতরাং দুটি ভিন্ন বিষয়কে নিয়ে কি এভাবে গভীরতার বা উৎকর্ষের পরিমাপ চলে? আরও সহজভাবে জিজ্ঞাসা করা চলে, 'পথের পাঁচালী-অপরাজিত'র অপু, 'মেঘমল্লার'এর প্রদ্যুম্ন, 'নাস্তিক'এর লোকনাথ— এরা কি অনতিগভীর?

'মৌরীফুল' গল্পসংকলনটি থেকে গিরিজাপতি মাত্র তিনটি সার্থক গল্পের যে তালিকা প্রস্তুত করেছেন তা অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়। 'জলসত্র'র মত গল্প যাতে সেই গ্রাম্যবালিকাটি অসহ্য পিপাসায় বুনো কচুর ডাঁটা মুখে মারা গিয়েছিল 'আজ তারই স্নেহ করুণা এই বিরাট বটগাছটার নিবিড় ডালপালায় বেড়ে উঠে এই জলকষ্টপীড়িত পল্লীপ্রান্তরের একধারে পিপাসার্ত পথিকদের আশ্রয় তৈরি করেছে।— এরই তলায় আজ বিশ বছর ধরে সে মঙ্গলরূপিণী জগদ্ধাত্রীর মত দশ হাত বাড়িয়ে প্রতি নিদাঘমধ্যাহ্নে কত পিপাসাতুর পল্লী-পথিককে জল জোগাচ্ছে' অথবা 'দাতার স্বর্গ'র মত গল্প যাতে দাতা শ্রেষ্ঠী কর্ণসেন আত্মবিস্মৃত হয়ে জীবনে একবার মাত্র যথার্থ দান করার ভাগ্য করেছিলেন— এগুলি জীবনের গভীরতর তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে কি সার্থক গল্প হয় নি? গিরিজাপতি এদের কেন 'নিরর্থক পণ্ডশ্রমে'র পর্যায়ে ফেলেছেন জানি না।

পূর্বোল্লিখিত পত্রিকায় ১৩৩১ সালের মাঘ-চৈত্র সংখ্যার পুস্তক-পরিচয় বিভাগে বিভূতিভূষণের 'যাত্রাবদল' গল্পগ্রন্থের সমালোচনা করেন গিরিজাপতি ভট্টাচার্য। এর আগের গল্পগ্রন্থটি সম্পর্কে তাঁর প্রশংসা যেমন কুণ্ঠিত, এটির সম্পর্কে তাঁর প্রশংসা তেমনি অকৃপণ। 'যাত্রাবদল' বিভূতিবাবুর হাতের একটি অপূর্ব গল্প-গ্রন্থরূপে পরিগণিত হবে নিশ্চয়। এর গল্পগুলোতে গল্পরচনার যে স্তরে তিনি পৌঁছেছেন তাকে ছাড়িয়ে তাঁর আরও ঊর্ধ্ব স্তরে যাওয়া সম্ভব কিনা তা আপাততঃ ধারণা করা শক্ত।' পূর্বগ্রন্থের পল্লীজীবন সম্বন্ধে তিনি যে অনতিগভীরতার অভিযোগ এনেছিলেন এখানে তা আনেন নি। বরং বলেছেন, 'যাত্রাবদল'এ ব্যাপকতর পল্লীজীবন রূপায়িত হয়েছে। বাঙলা সাহিত্যে পল্লীজীবনের রূপায়ণের পারম্পর্য বিচার করে তিনি বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের গল্পে আমরা পল্লীর স্নিগ্ধতা, শ্যামলতা ও রম্যতার প্রথম স্পর্শ পেলাম। এর পর শরৎচন্দ্রের লেখায় এই জীবনের উপর পীড়ন-নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ পাওয়া গেল। সবশেষে 'বিভূতিবাবুর গল্প আজ অন্য সুরে ক্ষমণীয় রেশ তুলে বলছে ব্যর্থ, অকৃতিময়, মূল্যহীন, দরিদ্র পল্লীজীবন আজও দরদী ও কবির কাছে সুধাভাণ্ডরূপেই বিরাজ করছে।' এই ব্যর্থজীবনের উদাহরণ হিসেবে তিনি 'ভণ্ডুলমামার বাড়ি' গল্পটির উল্লেখ করেছেন। এই গল্পে ভণ্ডুলমামার বাড়ি যেমন অসমাপ্ত, তার জীবনও তেমনি ব্যর্থ। 'কিন্তু তবু যেন এই বাড়ি বিশাল অরণ্যের গ্রাসে লুপ্ত হবার জন্যই 'অনন্তকাল অনন্তযুগ ধরে তৈরী হয়' ও তারই মাথায় ভণ্ডুলমামা ঠিক তারই মত জীবনজীর্ণ হয়ে 'উদ্দেশ্যহীন, অর্থহীন, কায়াহীন রূপে' গল্পের মধ্যে সঞ্জীবিত হয়ে বিরাজ করেন।' সমালোচক বোধ হয় নজর করেন নি, এই গল্পে ভণ্ডুলমামার জীবনের ব্যর্থতা পাঠকচিত্তকে স্পর্শ করলেও গল্পটির আবেদন আরও গভীরে মনের এক মায়ারাজ্যে। ভণ্ডুলমামার বাড়ি তারই ছায়ামূর্তি। সে ছায়া শৈশবের কোনদিনটি থেকে যে পড়তে শুরু করে এবং কবে তার শেষ হয় তা মানুষের অজানা। আমাদের মনের এই ছায়াময় মায়ারাজ্যকে গল্পটিতে এমন উপযুক্ত ধূসরতা বা অস্পষ্টতার রঙে আঁকা হয়েছে যে মনে হয় এ যেন একটা হাল্কা জলরঙের ছবি। 'ভণ্ডুলমামার বাড়ি উঠছে আজ থেকে নয়, জীবনের পিছন ফিরে চেয়ে দেখলে যতদূর দৃষ্টি চলে ততকাল ধ'রে···যেন অনন্ত কাল, অনন্ত যুগ ধ'রে ভণ্ডুলমামার বাড়ির ইট একখানির পর

আর একখানি উঠছে···শিশু থেকে কবে বালক হয়েছিলুম, বালক থেকে কিশোর, কৈশোর কেটে গিয়ে এখন প্রথম যৌবনের উন্মেষ, আমার মনে এই অনাদ্যন্ত মহাকাশ বেয়ে কত শত জন্মমৃত্যু, সৃষ্টি ও পরিবর্তনের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে ভণ্ডুলমামার বাড়ি হয়েই চলেছে···ওরও বুঝি আদিও নেই, অন্তও নেই।' এই গল্পসংকলনের অন্যতম গল্প 'সার্থকতা' সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, বিভূতিভূষণের একটি প্রিয় বিষয় হচ্ছে— পল্লীবালকের বিদেশে গিয়ে উন্নতিলাভ ও তারপর একদিন নিজের গ্রামে ফিরে এই তথাকথিত সার্থকতার মূল্যবিচার করা। এসব গল্পের নায়করা যাকে সাফল্য ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করে তার সম্বন্ধেই পরে ভাবে, জীবনে এইসবের মূল্য কি? লেখক সম্ভবতঃ এই গল্পের প্রসঙ্গে 'উপেক্ষিতা'র কথা ভেবেছেন। গিরিজাপতির মতে 'ভণ্ডুলমামার বাড়ি'র মত এই সংকলনের অন্যতম সেরা গল্প 'যাত্রাবদল'। গল্পের বিষয়বস্তুর পরিচয় দিয়ে বিভূতিভূষণের কৃতিত্বের কথায় তিনি বলেছেন, 'এর টিকিটবাবু ও নেশাখোর শ্মশানযাত্রীদের প্রতি গ্রন্থকারের লেখনীর মৃদুকোমল স্পর্শ বাংলা গল্পসাহিত্যে দুর্লভ। তেমনি অভ্রান্ত নিপুণতায় তিনি এরই সঙ্গে গেঁথেছেন এই অভাগিনী পল্লীবধূটির অকালমৃত্যুর জন্য একটি দীর্ঘশ্বাস।' ভাষার বৈশিষ্ট্যের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'যাত্রাবদল'এর ভাষা বিশেষণবর্জিত ও নাতি-অলংকারবহুল।

পরিচয় পত্রিকায় ১৩৪২ সালের মাঘ-চৈত্র সংখ্যার পুস্তক-পরিচয় বিভাগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র বিভূতিভূষণের অন্যতম উপন্যাস 'দৃষ্টিপ্রদীপ'এর আলোচনা করেন। এই গ্রন্থটি প্রথমে প্রবাসীতে (ফাল্গুন ১৩৪০-চৈত্র ১৩৪১) প্রকাশিত হয়, পরে ১৩৪২ সালের ভাদ্র মাসে গ্রন্থাকারে বার হয়। এর দু বছর বাদে প্রবাসীতে (কার্তিক ১৩৪৪-ফাল্গুন ১৩৪৫) 'আরণ্যক' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'দৃষ্টিপ্রদীপ'কে 'আরণ্যক পর্বের আধুনিক অবদান' বলেছেন। এখানে আরণ্যক পর্ব বলতে তিনি 'আরণ্যক' গ্রন্থের নয়, 'অপরাজিত'র আরণ্যক পর্বের কথাই বোধ হয় বুঝিয়েছেন। 'দৃষ্টিপ্রদীপ' বিভূতিভূষণের তৃতীয় উপন্যাস। তাঁর কথাসাহিত্যের ধারার পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন, 'মেঘমল্লার'এর যুগ থেকে তাঁর কাছে আমরা একটা বিশেষ রসের আস্বাদ পেয়ে আসছি। সে রস মধুর স্বচ্ছ গ্রাম্য রস। বিভূতিভূষণ তাঁর অনুভূতি-মাহাত্ম্যে এবং মর্মস্পর্শী অনাড়ম্বর ভঙ্গিতে তাকে রূপায়িত করেছেন। 'পথের পাঁচালীতে পেলাম বাংলার পল্লীর অন্তর্লীন রূপ অপুর দৃষ্টি দিয়ে। তার আরণ্যকতা, গ্রাম্য জীবনযাত্রা অদ্ভুত সুসঙ্গতি পেল পারিপার্শ্বিক সহানুভূতিতে। প্রথম বোঝা গেল, মেঠো সুর ধরবার এক বিশেষ ভঙ্গিতে তাকে সুধীসমাজের কাছে উপাদেয় করে তোলা যায়। এজন্যে লেখককে সাম্প্রতিকদের আসরে প্রাথম্য না দিই প্রাধান্য দিতে বাধল না।' কিন্তু লেখক বলেছেন, 'অপরাজিত'তে এসে বাধল। 'অপরাজিত'তে অপুর জীবন শহরে আর সেই রসসংগতি পেল না, শহরের চলিষ্ণু রূপ ফোটাতে গিয়ে তাঁর হাতের তুলি কেঁপে গেল। আর এই ব্যাপারটা 'একটা লজ্জার মত সমস্ত বইটাকে সংকুচিত করে রাখে। মনে হল পথের পাঁচালীর এ অনুবৃত্তিটুকু না এলেই ভালো হত। মোটের ওপর বিভূতিবাবুর সৃজনী-প্রতিভার সীমানা পাওয়া গেল।' কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কি সত্যিই সীমানা পেলেন? 'পথের পাঁচালী'র সীমানা কি 'অপরাজিত'রও সীমানা? তার মেঠো সুর কি 'অপরাজিত'রও? 'পথের পাঁচালী'র সীমানা কি নিশ্চিন্দিপুরের পল্লীজীবন নয়? কিন্তু 'অপরাজিত'র সীমানাও কি তাই, না জন্মমৃত্যুতে গাঁথা 'বৃহত্তর জীবন'? 'পথের পাঁচালী'র মেঠো গান কি 'অপরাজিত'তে এসে উচ্চাঙ্গের মহাসংগীত হয়ে বাজে নি? পরিচয়-এ কিছুদিন আগে নীরেন্দ্রনাথ উভয়গ্রন্থের পার্থক্য প্রসঙ্গে কি বলেন নি— 'একই অপুর জীবনকাহিনী

হইলেও অপরাজিত ঠিক পথের পাঁচালীর সমধর্মী রচনা নহে।' 'বিভূতিভূষণ এই উপন্যাসে পাঠকের দৃষ্টির সম্মুখে একটা নতুন জগৎ খুলে দিয়েছেন'— 'দৃষ্টিপ্রদীপ'এর প্রচ্ছদপত্রের এই নির্দেশ পড়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আশা করেছিলেন, বিভূতিভূষণ এইবার নতুন কিছু পরিবেশন করবেন। কিন্তু 'দৃষ্টিপ্রদীপ' তাঁকে হতাশ করেছে। 'দৃষ্টিপ্রদীপ' সাধারণ পাঠককে যে নিরুৎসাহ করে তার সব চেয়ে বড় কারণ, এই জগতের সঙ্গে তার পরিচয়ের অভাব। দৃষ্টিপ্রদীপ'এর জগৎ অতীন্দ্রিয়তার জগৎ। অথচ আমাদের সংসার এই ইন্দ্রিয়জগৎকে নিয়ে, যে জগতে জিতুর অন্তর্দৃষ্টির কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারা যায় না। গ্রন্থটির সামগ্রিক ব্যর্থতা সম্বন্ধে লেখকের যে অভিযোগ তা যথার্থ। তিনি আরও বলেছেন, গ্রন্থটি জিতুর জবানীতে প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে রচিত না হয়ে যদি ডায়েরি-মাধ্যমে রচিত হত তাহলে 'তর্ক বা মন্তব্যের ধারা ভিন্ন দিকে বইত। সে ক্ষেত্রে নায়ক হতেন একক, পারিপার্শ্বিক গৌণ।' জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে গ্রন্থের যে কি উৎকর্ষ বাড়ত তা বোঝা যায় না। ডায়েরি-মাধ্যমে রচিত হলে সাধারণের কাছে 'দৃষ্টিপ্রদীপ'-এর জগতের কি অতিরিক্ত পরিচর প্রকাশিত হত তা তিনি বলেন নি। আসলে এ গ্রন্থ একান্তভাবেই আমাদের সাহিত্যের এলাকার বাইরে, কারণ সাহিত্য যে লৌকিক জগতের উপর নির্ভর করে এখানে সে জগৎ প্রায় নেই বললেই চলে।

গ্রন্থের আখ্যানবস্তু বিচার করতে গিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছেন, জিতুর অশরীরী উড়োজীবন লোচনদাসের আখড়ায় মালতীর প্রেমে আমাদের ধরাছোঁয়ার মধ্যে এসেছে। এই ঘটনার উপর শরৎচন্দ্রের কমললতার কাহিনীর প্রভাব স্বীকার না করে পারা যায় না এবং তুলনামূলকভাবে এ কথাও বলতে হয়, শরৎচন্দ্রের কাহিনীটি কত উৎকৃষ্ট। হিরণ্ময়ীকে নিয়ে জিতুর দ্বিতীয় প্রেমে রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ'র প্রভাব পড়েছে বলে লেখক উল্লেখ করেছেন। এখানে সম্ভবত: 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পটির কথা তাঁর মনে ছিল। সবশেষে তিনি বিভূতিভূষণ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'এ যাবৎ যে নৈহারিকতার চূড়ায় লেখক আশ্রয় নিয়েছেন সেটা ত্যাগ না করলে, ভাবোচ্ছ্বাসের বাষ্পে পাঠকদের উৎপীড়িত করেই তুলবেন। এবার তাঁর cerebral cortexএর দিকে নজর দেবার সময় হয়েছে।' কিন্তু 'পথের পাঁচালী-অপরাজিত' এবং তাঁর গল্পগ্রন্থগুলি পড়ে সত্যিই কি তাঁর মনে হয়েছে ভাবোচ্ছ্বাসের বাষ্পে বিভূতিভূষণ পাঠকদের উৎপীড়িত করে তুলেছেন? যে বিরাট জীবনচ্ছবি অপুর দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়েছে, তাতে কি তাঁর মননশীলতার পরিচয় নেই, তাঁর ভাষায় 'cerebral cortex'এর দিকে নজরের নজির নেই? মহাজীবনের সন্ধান কি ভাবোচ্ছ্বাসের বাষ্পে পাওয়া যায়?

বিভূতিভূষণের মৃত্যুর পর বিশ্বভারতী পত্রিকায় ১৩৫৭ সালের মাঘ-চৈত্র সংখ্যায় আর্যকুমার সেন 'বিভূতিভূষণের ছোটগল্প' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে লেখক বলেন, বাঙালি পাঠকের কাছে ছোটগল্পের চেয়ে উপন্যাস বেশি প্রিয় বলে তারা 'পথের পাঁচালী' 'অপরাজিত' 'দৃষ্টিপ্রদীপ'কে যত বেশি জানে 'মেঘমল্লার' 'মৌরীফুল'কে তত জানে না। এর আগে গিরিজাপতিও অবশ্য অনুরূপ কথা বলেছিলেন। তবে তার কারণ ছিল ভিন্ন। তিনি বলেছিলেন, 'পথের পাঁচালী-অপরাজিত'র বিতর্কে তাঁর গল্পগুলি আড়ালে পড়ে গিয়েছিল।

আর্যকুমার বিভূতিভূষণের ছোটগল্পের উৎস খুঁজতে গিয়ে বলেছেন, তাঁর গল্পের উৎস হচ্ছে যশোরের অখ্যাত পল্লী এবং সেখানকার মানুষ। বাঙালি যতই শহুরে হোক-না কেন পল্লীর প্রতি তার মমতা অন্তরে থেকেই যায়। সুতরাং সেই বাঙালি পাঠকের কাছে গ্রামের কথা সহৃদয়তার সঙ্গে বলতে পারলে তা

আদরের হবেই। তাঁর মতে বিভূতিভূষণের সাফল্যের এটি অন্যতম কারণ। নীরেন্দ্রনাথও তাঁর সাফল্যের পিছনে সাময়িকতার এই কারণকে দেখিয়েছিলেন। আর্যকুমার বলেছেন, বিভূতিভূষণ ছাড়া অন্যান্য লেখকরা গ্রামবাঙলা নিয়ে সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে যে অনুরূপ কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি তার কারণ, বিভূতিভূষণ গ্রামবাঙলাকে যেভাবে চিনেছিলেন এবং নিজেকে যেভাবে তার সঙ্গে একাত্ম করেছিলেন অন্যান্যরা তা পারেন নি। 'বিভূতিভূষণের রচনার রসোপলব্ধি করিতে হইলে এই মানুষগুলি ও তাহাদের পারিপার্শ্বিকের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ এই অতিসাধারণ নগণ্য প্রাণীগুলির জন্মমৃত্যু-আনন্দ-বেদনার কাহিনীই তাঁহার ছোটগল্পের অন্যতম উপজীবিকা।'

আলোচ্য প্রবন্ধটি বিভূতিভূষণের গল্পসাহিত্যের সামগ্রিক নয়, আংশিক আলোচনা। সে অংশ বিভূতিভূষণের গল্পসম্ভারের পূর্বাংশমাত্র। তাঁর উত্তরজীবনের গল্পের আলোচনা এতে নেই। এই জীবনে তিনি 'হিঙের কচুরি' 'কুশলপাহাড়ী' প্রভৃতির মত বহু সার্থক গল্প লিখেছিলেন। এইসব গল্প আলোচনা থেকে বাদ পড়ায় প্রবন্ধটি আলোচনা হিসেবে সম্পূর্ণ নয়, যদিও সাধারণ ভাবে বিভূতিভূষণের ছোটগল্পের মেজাজটি তাতে ধরা পড়েছে। লেখক বলেছেন, 'মেঘমল্লার' গল্পটি শুধু বিভূতিভূষণের নয়, সমগ্র বাঙলা গল্পসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। পরিকল্পনার শ্রেষ্ঠত্বের সঙ্গে সঙ্গে তিনি এর অতুলনীয় ভাষার প্রশংসা করেছেন। বলেছেন, ঐতিহাসিক গল্পের আবহাওয়া সাধারণতঃ সাধু ভাষার সাহায্যে সৃষ্ট হয়, কিন্তু বিভূতিভূষণ 'একান্ত পরিচিত সহজ ভাষায় প্রাচীন বৌদ্ধ যুগের মায়া রচনা' করেছেন।

বিভূতিভূষণের অলৌকিক গল্প হিসেবে যে দুটি গল্প তিনি উল্লেখযোগ্য বিবেচনা করেছেন তাদের নাম 'হাসি' ও 'প্রত্নতত্ত্ব'। প্রথম গল্পে শীতের অন্ধকার রাত্রিতে পশ্চিমাঞ্চলের এক স্টেশনে স্টেশনমাস্টারের ভীতিশিহরণকর অভিজ্ঞতার বর্ণনা একটা 'uncanny sensation'এর সৃষ্টি করেছে। 'প্রত্নতত্ত্ব' গল্পে ভীতিশিহরণকর কোনো অনুভূতির নয়, প্রত্নতাত্ত্বিক এক মূর্তিকে অবলম্বন করে অতিপ্রাকৃতের অবতারণা।

পল্লীকন্যাকে নিয়ে উল্লেখযোগ্য গল্প 'মৌরীফুল' ও 'পুঁইমাচা'। শেষের গল্পটির অভিনবত্ব সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, দরিদ্র পল্লীনারীর বহুতর দুঃখবেদনা নিয়ে এর আগে অনেক গল্প লেখা হয়েছে, তার লোভকে নিয়ে এমন বেদনাদায়ক গল্প এর আগে আর কখনও লেখা হয় নি।

রবীন্দ্রনাথের গানে বিলাতি সংগীতের প্রভাব

শান্তিদেব ঘোষ

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের গানে ইয়োরোপীয় সংগীতের প্রভাব নিয়ে আলোচনার পূর্বে আমাদের ভালো করে দেখে নিতে হবে যে, এই সংগীতের চর্চা বা তার প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাঁর মধ্যে কতখানি ছিল এবং কিভাবে তা তিনি লাভ করেছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর নিজের উক্তি এবং আত্মীয়স্বজনদের স্মৃতিকথাই হল আমাদের একমাত্র অবলম্বন। ইয়োরোপীয় সংগীতের প্রথম-পরিচয় প্রসঙ্গে তিনি জানাচ্ছেন—

"At seventeen, when I first came to Europe, I came to know it intimately, but even before that time I had heard European music in our own household. I had heard the music of Chopin and others at an early age."

অন্যত্র বলেছেন—

"As a young boy I heard European music being played on the piano; much of it I found attractive, but I could not enter fully into the spirit of the thing."

এই দুটি উক্তি থেকে এটুকু বোঝা যাচ্ছে যে, রবীন্দ্রনাথের জন্মকালে তাঁর পরিবারে ইয়োরোপীয় সংগীতের চর্চা ছিল। এবং সেই সাংগীতিক পরিবেশ তাঁর বাল্যজীবনকে যথেষ্ট আকৃষ্টও করেছিল। প্রথম ভালো গান শোনার বিষয়ে তিনি লিখছেন—

"I first heard European songs when I was 17-year old, during my first visit to London. The artist was Madame Nilsson, who used to have a great reputation in those days."

১৭ বৎসর বয়সে তিনি প্রথমবার ইংলণ্ডে যান ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। সেখানে সবসমেত মোট ১ বৎসর ৫ মাস ছিলেন। এই সময়ে ইংলণ্ডে তিনি কেবল পড়াশোনাই করেন নি, ইয়োরোপীয় সংগীত শুনেছেন নানা উপলক্ষে এবং কণ্ঠসংগীতেরও চর্চা করেছিলেন উৎসাহের সঙ্গে। তাঁর তখনকার চিঠিপত্রে জানা যায় যে, প্রায়ই তিনি Evening Party, ফ্যান্সিবল ও অন্যান্য নাচগানের নিমন্ত্রণে পিয়ানো বাঁশি বেহালা ইত্যাদি যন্ত্রের সংগতে 'Gallop' এবং 'Lancers' নাচ নেচেছেন। ব্রাইটনে কোথাও আমোদ-উৎসব হলে মিস্ K. গুরুদেবদের সকলকে খবর দিতেন, সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন, অবসর পেলে তাঁদের সঙ্গে গল্প করতেন এবং ছেলেদের গান শেখাতেন। জীবনস্মৃতিতেও তিনি সে কথা লিখেছেন,

"ব্রাইটনে থাকিতে সেখানকার সংগীতশালায় একবার একজন বিখ্যাত গায়িকার গান শুনিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার নামটা ভুলিতেছি—মাডাম নীলসন্ অথবা মাডাম আলবানী হইবেন। কণ্ঠস্বরের এমন আশ্চর্য শক্তি পূর্বে কখনো দেখি নাই।"

এইখানেই Dr. M.-এর বাড়িতে সন্ধ্যার নিমন্ত্রণে গিয়েছিলেন গানবাজনা আমোদপ্রমোদে

যোগদানের জন্যে। তাঁদের অনেকের অনুরোধে 'প্রেমের কথা আর বোলো না' এবং আরো দুটি বাংলা গান তিনি গেয়েছিলেন। গানবাজনা আহারাদিতে সেই সন্ধ্যা তাঁর আনন্দেই কেটেছিল। পরে লণ্ডনে Mr. K.-র পরিবারে এসে উঠলেন। সেখানে দেখলেন তাঁর তৃতীয়া কন্যা Miss A. প্রায়ই গানবাজনা করেন, গানের চর্চাও আছে। এখানকার কথা বলতে গিয়ে লিখছেন,

"এই পরিবারে আমি বেশ সুখে আছি। সন্ধেবেলা বেশ আমোদে কেটে যায়,—গানবাজনা, বই পড়া।" অন্যত্র লিখেছেন—

"এক একদিন আমাদের গানবাজনা হয়। আমি ইতিমধ্যে অনেক ইংরাজি গান শিখেছি। জাঁক করতে চাই না কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি এখানকার লোকে আমার গলার বেশ প্রশংসা করে। আমি গান করি। Miss A. বাজান। Miss A. আমাকে অনেকগুলি গান শিখিয়েছেন।"

জীবনস্মৃতিতে তাঁর সে-দিনের এই সংগীত-জীবনের আরো কিছু বর্ণনা আমরা পাই। যেমন—

"ডাক্তার স্কট নামে এক ভদ্রগৃহস্থের ঘরে আমার আশ্রয় জুটিল। [মিসেস্ স্কট] গৃহস্থালির সমস্ত কাজ সারিয়া সন্ধ্যার সময় আমাদের পড়াশুনা গানবাজনায় তিনি সম্পূর্ণ যোগ দিতেন।"

"আইরিশ মেলডীজ্ আমি সুরে শুনিব, শিখিব এবং শিখিয়া আসিয়া অক্ষয়বাবুকে শুনাইব, ইহাই আমার বড়ো ইচ্ছা ছিল।... আইরিশ মেলডীজ্ বিলাতে গিয়া কতকগুলি শুনিলাম ও শিখিলাম কিন্তু আগাগোড়া সব গানগুলি সম্পূর্ণ করিবার ইচ্ছা আর রহিল না।"...

"দেশে ফিরিয়া আসিয়া এই সকল এবং অন্যান্য বিলাতি গান স্বজনসমাজে গাহিয়া শুনাইলাম। সকলেই বলিলেন, রবির গলা এমন বদল হইল কেন, কেমন যেন বিদেশী রকমের, মজার রকমের হইয়াছে।"

শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরা দেবী গুরুদেবের প্রথম বিলাত-বাস -কালীন সংগীত-জীবনের কথা স্মরণ করে বলছেন—

"আমরা মায়ের সঙ্গে অনুমান ১৮৭৭ খৃস্টাব্দে গিয়ে পৌঁছই [বিলাতে], পরে বাবা ও রবিকাকা ১৮৭৮ খৃস্টাব্দে আসেন। সেই সময় থেকেই বিলিতী সংগীতের সঙ্গে তাঁর [রবীন্দ্রনাথের] পরিচয় হয়, এবং শুনেছি তাঁর সুরেলা, জোড়ালো তারসপ্তকের চড়াগলা, যাকে ও দেশে বলে 'টেনর্'—শুনে ওরা মুগ্ধ হত।... মনে আছে যে,

"Won't you tell me, Molly darling,"
"Darling, you are growing old,"
"Good-bye, sweet heart, Good-bye."

প্রভৃতি তখনকার জনপ্রিয় গানগুলি তিনি গাইতেন।"

১৮৮০ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে রবীন্দ্রনাথ বিলেত থেকে ফিরে এলেন বিলাতি সংগীতের গভীর প্রভাব নিয়ে। দেশে ফেরার কিছুকাল পরেই দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎসাহে তাঁকে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' গীতিনাট্যটি রচনা করতে হল "বিদ্বজ্জন সমাগম সভা" নামে বাড়িতে প্রচলিত একটি বাৎসরিক অনুষ্ঠানে, নিমন্ত্রিত খ্যাতনামা সাহিত্যিক অতিথিদের নাটকের অভিনয়ের দ্বারা চিত্তবিনোদনের ইচ্ছায়। ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' প্রথম অভিনীত হয়। এই ঘটনার কথা স্মরণ করে তিনি লিখছেন—

"…দেশী ও বিলাতি সুরের চর্চার মধ্যে 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র জন্ম হইল। ইহার সুরগুলি অধিকাংশই দিশি, কিন্তু এই গীতিনাট্যে তাহাকে তাহার বৈঠকি মর্যাদা হইতে অন্যক্ষেত্রে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে; উড়িয়া চলা যাহার ব্যবসায় তাহাকে মাটিতে দৌড় করাইবার কাজে লাগানো গিয়াছে।… সংগীতকে এইরূপ নাট্যকার্যে নিযুক্ত করাটা অসংগত বা নিষ্ফল হয় নাই। বাল্মীকিপ্রতিভা গীতি-নাট্যের ইহাই বিশেষত্ব। সংগীতের এইরূপ বন্ধনমোচন ও তাহাকে নিঃসংকোচে সকল প্রকার ব্যবহারে লাগাইবার আনন্দ আমার মনকে বিশেষভাবে অধিকার করিয়াছিল।… গুটিতিনেক গান বিলাতি সুর হইতে লওয়া।… বিলাতি সুরের মধ্যে দুইটিকে ডাকাতদের মত্ততার গানে লাগানো হইয়াছে এবং একটি আইরিশ সুর বনদেবীর বিলাপগানে বসাইয়াছি। বস্তুত, বাল্মীকিপ্রতিভা পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নহে, উহা সংগীতের একটি নূতন পরীক্ষা; অভিনয়ের সঙ্গে কানে না শুনিলে ইহার কোনো স্বাদগ্রহণ সম্ভবপর নহে।—য়ুরোপীয় ভাষায় যাহাকে অপেরা বলে, বাল্মীকিপ্রতিভা তাহা নহে, ইহা সুরে নাটিকা;… ইহার নাট্যবিষয়টাকে সুর করিয়া অভিনয় করা হয় মাত্র, স্বতন্ত্র সংগীতের মাধুর্য ইহার অতি অল্পস্থলেই আছে।"

ভারতীয় সংগীতে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' যে নূতন পরীক্ষা তা স্বীকার করতেই হবে। আমাদের দেশে প্রাচীন ধারার নানাপ্রকার পূর্ণাঙ্গ গীতিনাট্য আজও সুপ্রচলিত। ইতালীয় অপেরার অনুসরণে কলকাতার ন্যাশানাল থিয়েটারে অভিনীত 'কামিনীকুঞ্জ' বা রবীন্দ্রনাথের গৃহে 'বসন্ত-উৎসব' নামে গীতিনাট্য ইতিপূর্বে অভিনীত হয়েছে। এসবের চরিত্রগুলির কথোপকথন গানের সুরে তালে লয়ে নিখুঁতভাবে বাঁধা বলে অভিনয়ের ঢংএ অভিনেতারা তা গান নি। গাওয়া হয়েছিল প্রচলিত গানের ঢংএ, রাগিণী এবং তালের সম, ফাঁক ও মাত্রার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে। বাল্মীকি-প্রতিভার জন্যে গুরুদেব হিন্দী ও প্রচলিত নানাপ্রকার বাংলা ঢংএর গান রচনা করলেন কিন্তু তার গাইবার রীতি, অর্থাৎ তালের সম, ফাঁকের নিয়ম লঙ্ঘন না করে রাগরাগিণীর বিস্তার দ্বারা গান গাইবার যে প্রচলিত রীতি আছে তাকে সম্পূর্ণ অবহেলা করলেন। এই নাটকের অভিনয়ের সময়ে বিভিন্ন চরিত্রগুলি সাধারণ কথার ছন্দে বা কথা বলার ঢংএ রাগরাগিণী যুক্ত গানকে নতুন ভাবে প্রকাশ করলেন। এখানে প্রশ্ন উঠবে যে, এইপ্রকার গীতপদ্ধতির চিন্তা গুরুদেবের মনে এল কী করে? এর উত্তর পাব তাঁর নিজেরই লেখা থেকে। জীবনস্মৃতিতে তিনি লিখেছেন—

"হার্বার্ট স্পেন্সরের একটা লেখার মধ্যে পড়িয়াছিলাম যে, সচরাচর কথার মধ্যে যেখানে একটু হৃদয়াবেগের সঞ্চার হয় সেখানে আপনিই কিছু না কিছু সুর লাগিয়া যায়। বস্তুতঃ, রাগ দুঃখ আনন্দ বিস্ময় আমরা কেবলমাত্র কথা দিয়া প্রকাশ করি না, কথার সঙ্গে সুর থাকে। এই কথাবার্তার আনুষঙ্গিক সুরটারই উৎকর্ষসাধন করিয়া মানুষ সংগীত পাইয়াছে। স্পেন্সরের এই কথাটা মনে লাগিয়া-ছিল। ভাবিয়াছিলাম এই মত অনুসারে আগাগোড়া সুর করিয়া নানা ভাবকে গানের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া অভিনয় করিয়া গেলে চলিবে না কেন। আমাদের দেশে কথকতায় কতকটা এই চেষ্টা আছে; তাহাতে বাক্য মাঝে মাঝে সুরকে আশ্রয় করে, অথচ তাহা তালমানসংগত রীতিমত সংগীত নহে। ছন্দ হিসাবে অমিত্রাক্ষর ছন্দ যেমন, গান হিসাবে এও সেইরূপ; ইহাতে তালের কড়াক্কড় বাঁধন নাই, একটা লয়ের মাত্রা আছে; ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য, কথার ভিতরকার ভাবাবেগকে পরিস্ফুট করিয়া

তোলা, কোনো বিশেষ রাগিণী বা তালকে বিশুদ্ধ করিয়া প্রকাশ করা নহে। বাল্মীকিপ্রতিভায় গানের বাঁধন সম্পূর্ণ ছিন্ন করা হয় নাই, তবু ভাবের অনুগমন করিতে গিয়া তালটাকে খাটো করিতে হইয়াছে। অভিনয়টাই মুখ্য হওয়াতে এই তালের ব্যতিক্রম শ্রোতাদিগকে দুঃখ দেয় না।"

১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'য় বিলাতি সুরের অনুকরণে দস্যুদলের মত্ততার যে দুটি গান রচনা করেছিলেন তার একটি হল, 'কালী কালী বলো রে আজ', অপরটি হলো 'তবে আয় সবে আয়'। আইরিশ সুরে রচিত বনদেবীর বিলাপের গানটি হল 'মরি ও কাহার বাছা'। এ গানটি প্রথমবারে ছিল না। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে নাটকটির পুনরাভিনয় কালে এটি রচিত।

বাল্মীকি-প্রতিভায় দেশী ও বিদেশী সুরের চর্চায় অভিজ্ঞতার ফলে সংগীতরচনা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে তখন যে সব চিন্তার উদয় হয়েছিল তার থেকে সমগ্রভাবে রবীন্দ্রসংগীতের বিচারের সঠিক পথ পাওয়া যেতে পারে বলেই আমাদের ধারণা। সেই সময়কার তাঁর ঐ সংগীতচিন্তাকে তিনি প্রকাশ করেছিলেন বিস্তারিত ভাবে একই বছরে পর পর প্রকাশিত তিনটি প্রবন্ধে। প্রবন্ধ-কটির উপর এখনো পর্যন্ত আমরা তেমন দৃষ্টি দিই নি বা তা নিয়ে বিস্তারিত ভাবে তেমন কোনো আলোচনাও আমরা করি নি। অথচ এই তিনটি প্রবন্ধের মধ্যেই গুরুদেবের সমগ্রজীবনের নানা প্রকার সংগীতসৃষ্টির মূল রহস্যটি লুকিয়ে আছে। একথা চিন্তা করে, পাঠকদের সুবিধার্থে, প্রবন্ধ কটির বক্তব্য বিষয় একটু বিস্তারিত ভাবেই উদ্ধৃত করব।

বাল্মীকি-প্রতিভার অভিনয়ের প্রায় মাস-দুই পরে, অর্থাৎ এপ্রিল মাসে, কলিকাতার বেথুন সোসাইটির এক অধিবেশনে তিনি সংগীত বিষয়ে একটি বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাটি 'সংগীত ও ভাব'[১] নামে ভারতী পত্রিকার ১২৮৮ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। গানের উদাহরণ সহ বক্তৃতাটিতে তিনি যা বলেছিলেন তার অংশ বিশেষ প্রকাশিত প্রবন্ধটি থেকে তুলে দিচ্ছি।

"অল্পদিন হইল বঙ্গসমাজের নিদ্রা ভাঙিয়াছে, এখন তাহার শরীরে একটা নব উদ্যমের সঞ্চার হইয়াছে।...

"আমাদের বঙ্গসমাজে একটা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, এমন-কি সে আন্দোলনের এক-একটা তরঙ্গ য়ুরোপের উপকূলে গিয়া পৌঁছাইতেছে। এখন হাজার চেষ্টা করো-না, হাজার কোলাহল করো-না কেন, এ তরঙ্গ রোধ করে কাহার সাধ্য! এই নূতন আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে সংগীতের নব অভ্যুদয় হইয়াছে। সংগীত সবে জাগিয়া উঠিয়াছে মাত্র, কাজ ভালো করিয়া আরম্ভ হয় নাই। এখনো সংগীত লইয়া নানাপ্রকার আলোচনা আরম্ভ হয় নাই; নানা নূতন মতামত উত্থিত হইয়া আমাদের দেশের সংগীত শাস্ত্রের বদ্ধ জলে একটা জীবন্ত তরঙ্গিত স্রোতের সৃষ্টি করে নাই।

"আমাদের সঙ্গীতশাস্ত্র... মৃতশাস্ত্র।...বিবিধ বিচিত্র ভাবের লীলাময়, ছায়ালোকময়, পরিবর্তনশীল মুখশ্রী দেখিতে পাই না।...

"আমার ইচ্ছা যে, কবিতার সহচর সংগীতকেও শাস্ত্রের লৌহকারা হইতে মুক্ত করিয়া উভয়ের মধ্যে বিবাহ দেওয়া হউক।...

"রাগরাগিণীর উদ্দেশ্য কী ছিল? ভাব প্রকাশ করা ব্যতীত আর তো কিছু নয়। আমরা যখন

১ দ্র° সংগীত-চিন্তা (বৈশাখ ১৩৭৩)

কথা কহি তখনও সুরের উচ্চনীচতা ও কণ্ঠস্বরের বিচিত্র তরঙ্গলীলা থাকে।... সেই সুরের উচ্চনীচতা ও তরঙ্গলীলা সংগীতে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সংগীত মনোভাব প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম উপায় মাত্র।... সংগীত আর কিছু নয়— সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে কবিতা পাঠ করা।... কথা কহিয়া যে ভাব অসম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করি, রাগ-রাগিণীতে সেই ভাব সম্পূর্ণতররূপে প্রকাশ করি। অতএব রাগ-রাগিণীর উদ্দেশ্য ভাব প্রকাশ করা মাত্র।... এখন রাগরাগিণীই উদ্দেশ্য হইয়া দাড়াইয়াছে।... আজ গান শুনিলেই সকলে দেখিতে চান, জয়জয়ন্তী, বেহাগ বা কানাড়া বজায় আছে কিনা।... বৈয়াকরণে ও কবিতে যে প্রভেদ, উপরিউক্ত ওস্তাদের সহিত আর-একজন ভাবুক গায়কের সেই প্রভেদ।...

"এখন সংগীতবেত্তারা যদি বিশেষ মনোযোগ-সহকারে আমাদের কী কী রাগিণীতে কী কী ভাব আছে তাহাই আবিষ্কার করিতে আরম্ভ করেন, তবেই সংগীতের যথার্থ উপকার করেন। আমাদের রাগরাগিণীর মধ্যে একটা ভাব আছে, তাহা যাইবে কোথা বলো।...

"সংগীতবেত্তারা সেই ভাবের প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করুন। কেন বিশেষ-বিশেষ এক-এক রাগিণীতে বিশেষ-বিশেষ এক-একটা ভাবের উৎপত্তি হয় তাহার কারণ বাহির করুন। এই মনে করুন— পূরবীতেই বা কেন সন্ধ্যাকাল মনে আসে আর ভৈঁরোতেই বা কেন প্রভাত মনে আসে?...

"কোন্ সুরগুলি দুঃখের ও কোন্ সুরগুলি সুখের হওয়া উচিত দেখা যাক।... আমরা যখন রোদন করি তখন দুইটি পাশাপাশি সুরের মধ্যে ব্যবধান অতি অল্পই থাকে, রোদনের স্বর প্রত্যেক কোমল সুরের উপর দিয়া গড়াইয়া যায়, সুর অত্যন্ত টানা হয়। আমরা যখন হাসি— হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, কোমল সুর একটিও লাগে না, টানা সুর একটিও নাই, পাশাপাশি সুরের মধ্যে দূর ব্যবধান, আর তালের ঝোঁকে ঝোঁকে সুর লাগে। দুঃখের রাগিণী দুঃখের রজনীর ন্যায় অতি ধীরে ধীরে চলে, তাহাকে প্রতি কোমল সুরের উপর দিয়া যাইতে হয়। আর সুখের রাগিণী সুখের দিবসের ন্যায় অতিদ্রুত পদক্ষেপে চলে, দুই-তিনটা করিয়া সুর ডিঙাইয়া যায়। আমাদের রাগরাগিণীর মধ্যে উল্লাসের সুর নাই।... সহসা উত্থান বা সহসা পতন নাই। উচ্ছ্বাসময় উল্লাসের সুরই অত্যন্ত সহসা।... ঘোরতর উল্লাসের সুর ইংরাজি রাগিণীতে আছে, আমাদের রাগিণীতে নাই বলিলেও হয়। তবে আমাদের দেশের সংগীতে রোদনের সুরের অভাব নাই। সকল রাগিণীতেই প্রায় কাঁদা যায়। একেবারে আর্তনাদ হইতে প্রশান্ত দুঃখ, সকল প্রকার ভাবই আমাদের রাগিণীতে প্রকাশ করা যায়।...

"আমাদের যাহা কিছু সুখের রাগিণী আছে তাহা বিলাসময় সুখের রাগিণী, গদগদ সুখের রাগিণী। অনেক সময়ে আমরা উল্লাসের গান রচনা করিতে হইলে রাগিণী যে ভাবেরই হউক তাহাকে দ্রুত তালে বসাইয়া লই, দ্রুত তাল সুখের ভাব-প্রকাশের একটা অঙ্গ বটে।...

"তালও ভাবপ্রকাশের একটা অঙ্গ।... ভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তালও দ্রুত ও বিলম্বিত করা আবশ্যক— সর্বত্রই যে তাল সমান রাখিতেই হইবে তাহা নয়। ভাবপ্রকাশকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া, সুর ও তালকে গৌণ উদ্দেশ্য করিলেই ভালো হয়।... আমাদের সংগীতে যে নিয়ম আছে যে, যেমন-তেমন করিয়া ঠিক একই স্থানে সমে আসিয়া পড়িতেই হয়, সেটা উঠাইয়া দিলে ভালো হয়। তালের সমমাত্রা থাকিলেই যথেষ্ট, তাহার উপরে আরও কড়াক্কড় করা ভালো বোধ হয় না। তাহাতে স্বাভাবিকতার অতিরিক্ত হানি করা হয়।... যেমন তাল আছে তেমনি থাকুক, মাত্রা-বিভাগ যেমন আছে তেমনি থাকুক,

কেবল একটা নির্দিষ্ট স্থানে সমে ফিরিয়া আসিতেই হইবে এমন বাঁধাবাঁধি না থাকিলে সুবিধা বই অসুবিধা কিছুই দেখিতেছি না। এমন-কি, গীতিনাট্যে, যাহা আদ্যোপান্ত সুরে অভিনয় করিতে হয় তাহাতে স্থানবিশেষে তাল না থাকা বিশেষ আবশ্যক। নহিলে অভিনয়ের স্ফূর্তি হওয়া অসম্ভব।…

"রাগরাগিণী-আলাপ ভাষাহীন সংগীত।… আলাপেও… কেবল কতকগুলি সুর কণ্ঠ হইতে বিক্ষেপ করিলেই হইবে না, যে-সকল সুরবিন্যাস-দ্বারা ভাব প্রকাশ হয় তাহাই আবশ্যক। গায়কেরা সংগীতকে যে আসন দেন, আমি সংগীতকে তদপেক্ষা উচ্চ আসন দিই ;… তাঁহারা গানের কথার উপরে সুরকে দাঁড় করাইতে চান, আমি গানের কথাগুলিকে সুরের উপরে দাঁড় করাইতে চাই। তাঁহারা কথা বসাইয়া যান সুর বাহির করিবার জন্য, আমি সুর বসাইয়া যাই কথা বাহির করিবার জন্য।… সাধারণ কবিতা পড়িবার জন্য ও সংগীতের কবিতা শুনিবার জন্য।… গানের কবিতা পড়া যায় না, গানের কবিতা শুনা যায়।

"…সংগীতেবেত্তাদিগের প্রতি আমার এই নিবেদন যে, কী কী সুর কিরূপে বিন্যাস করিলে কী কী ভাব প্রকাশ করে, আর কেনই বা তাহা প্রকাশ করে, তাহার বিজ্ঞান অনুসন্ধান করুন।… দুঃখ সুখ রোষ বা বিস্ময়ের রাগিণীতে কী কী সুর বাদী ও কী কী সুর বিসম্বাদী তাহাই আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হউন।… বিভিন্ন ভাবের নাম অনুসারে আমাদের রাগরাগিণীর বিভিন্ন নামকরণ করা হউক। আমাদের সংগীতবিদ্যালয়ে সুর-অভ্যাস ও রাগরাগিণী শিক্ষার শ্রেণী আছে, সেখানে রাগরাগিণীর ভাব-শিক্ষারও শ্রেণী স্থাপিত হউক।"

এই প্রবন্ধটি প্রকৃতপক্ষে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র প্রকৃতি বিশ্লেষণ। বাল্মীকি-প্রতিভার নূতনভাবে পরীক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলি হল, এর প্রায় সব গানই নাটক থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বতন্ত্র গান হিসেবে গাওয়া যায় না— কাব্য হিসেবে গানগুলি পড়ে উপভোগ করবার মতো জিনিসও এ নয়। এই কারণেই তিনি বলেছেন, এই নাটকটি 'গানের সূত্রে নাট্যের মালা'। নাটকে সুখ দুঃখ কান্না ভয় হাসি ঠাট্টা আনন্দ উল্লাস বিস্ময় ইত্যাদি নিয়ে নানা রকমের বাস্তব কথোপকথনকে অতি সহজেই নানাপ্রকার ভারতীয় সুরে ও রাগরাগিণীতে বেঁধে কথোপকথনের ঢং-এ গেয়েছিলেন। এতে রাগিণীগুলির রূপান্তর ঘটেছিল। প্রচলিত রূপের সঙ্গে তা মেলে নি। ঘোরতর উল্লাসের সুরের বেলায় বিলাতি সুর ও ঢং গ্রহণ করলেন যেহেতু আমাদের গানে দস্যুদলের উপযোগী উল্লাস বা মত্ততার গান প্রচলিত ছিল না। অধিকাংশ গানই সাধারণ কথাবার্তার ছন্দে গাওয়া হয়েছিল বলে তবলা, বা পাখোয়াজের তালের বাঁধন নেই। যে কারণে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' গীতিনাট্যটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ থেকে দেখা যায় যে, তার গানের মাথায় একমাত্র রাগরাগিণীর উল্লেখ ছাড়া তালের কোনো উল্লেখ নেই। অথচ সে-যুগে ও তার পরবর্তী বহু বৎসর পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সব সংগীত গ্রন্থের অন্যান্য গানের সঙ্গে রাগ ও তালের উল্লেখ করা হত। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়ের ভিত্তি ছিল উপরোক্ত এই বিষয়গুলি।

বাল্মীকি-প্রতিভার নূতন পরীক্ষায় হাত দিয়ে তাঁকে পূর্ব-প্রচলিত গীতিনাটকের পথ থেকে অনেকখানি সরে যেতে হয়েছিল বলেই তিনি 'সংগীত ও ভাব' নামে বক্তৃতা ও প্রবন্ধটির দ্বারা এই নূতনত্বের সমর্থনে যুক্তি খাড়া করে বোঝাতে চাইলেন যে, সে যুগে ভারতীয় সংগীতে এইরূপ নূতনত্বের প্রয়োজন খুবই দেখা দিয়েছে।

'সংগীত ও ভাব' বক্তৃতা ও প্রবন্ধটির জের হিসেবে গুরুদেব পরবর্তী আষাঢ় সংখ্যায় 'ভারতী'তে প্রকাশ করলেন 'সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা'[২] নামে আর-একটি প্রবন্ধ। প্রকৃতপক্ষে এই রচনাটি

২ দ্র° সংগীত-চিন্তা

হল হার্বার্ট স্পেন্সরের 'The Origin and Function of Music' নামে একটি প্রবন্ধের ব্যাখ্যা। 'সংগীত ও ভাব' প্রবন্ধটির যেখানে তিনি বলেছেন, "আমরা যখন কথা কহি তখনও সুরের উচ্চনীচতা ও কণ্ঠস্বরের বিচিত্র তরঙ্গলীলা থাকে। কিন্তু তাহাতেও ভাবপ্রকাশ অনেকটা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সেই সুরের উচ্চনীচতা ও তরঙ্গলীলা সংগীতে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়।" এই মতকে, হার্বার্ট স্পেন্সরের যুক্তি সমেত বিস্তারিতভাবে বিচারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে। 'সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা'র মূল বক্তব্য বিষয় হল—

"আনন্দে বা বিষাদে বা অন্যান্য মনোবৃত্তির উদয়ে সকল প্রাণীরই মাংসপেশীতে ও অনুভবজনক স্নায়ুতে উত্তেজনার লক্ষণ প্রকাশিত হয়।··· মনোভাবের বিশেষত্ব ও পরিমাণ অনুসারে কণ্ঠস্থিত মাংসপেশীসমূহ সংকুচিত হয়; তাহাদের বিভিন্ন প্রকারের সংকোচন অনুসারে আমাদের শব্দযন্ত্র বিভিন্ন আকার ধারণ করে; এবং সেই বিভিন্ন আকার অনুসারে শব্দের বিভিন্নতা সম্পাদিত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, আমাদের কণ্ঠনিঃসৃত বিভিন্ন স্বর বিভিন্ন মনোবৃত্তির শরীরগত বিকাশ।···

"মনোভাবের বিশেষ উত্তেজনা হইলেই তবে আমরা আমাদের স্বাভাবিক মাঝামাঝি সুর ছাড়াইয়া উঠি অথবা নামি।··· বেগবান মনোবৃত্তির প্রভাবে আমরা আমাদের স্বাভাবিক কথাবার্তার সুরের বাহিরে যাই।···

"···সচরাচর কথাবার্তার সহিত মনোবৃত্তির উত্তেজিত অবস্থার কথাবার্তার ধারা স্বতন্ত্র।··· উত্তেজিত অবস্থার কথাবার্তার যে-সকল লক্ষণ, সংগীতেরও তাহাই লক্ষণ। সুখ দুঃখ প্রভৃতির উত্তেজনায় আমাদের কণ্ঠস্বরে যে-সকল পরিবর্তন হয়, সংগীতে তাহারই চূড়ান্ত হয় মাত্র।··· গানের স্বরও উচ্চ, গানের সমস্তই সুর; গানের সুর সচরাচর কথোপকথনের সুর হইতে অনেকটা উঁচু অথবা নিচু হইয়া থাকে এবং গানের সুরে উঁচু নিচু ক্রমাগত খেলাইতে থাকে।··· উত্তেজিত মনোবৃত্তির সুর সংগীতে যথাসম্ভব পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। তীব্র সুখ দুঃখ কণ্ঠে প্রকাশের যে লক্ষণ, সংগীতেরও সেই লক্ষণ।···

"সকল প্রকার কথোপকথনে দুইটি উপকরণ বিদ্যমান আছে। কথা ও যে-ধরণে সেই কথা উচ্চারিত হয়। কথা ভাবের চিহ্ন (signs of ideas) আর ধরণ অনুভাবের চিহ্ন (signs of feeling)। কতকগুলি বিশেষ শব্দ আমাদের ভাবকে বাহিরে প্রকাশ করে এবং সেই ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হৃদয়ে যে সুখ বা দুঃখ উদয় হয়, সুরে তাহাই প্রকাশ করে। ···আমরা একসঙ্গে দুই প্রকারের কথা কহিয়া থাকি, ভাবের ও অনুভাবের।···

"সংগীত আমাদিগকে অব্যবহিত যে সুখ দেয়, তৎসঙ্গে সঙ্গে আমাদের আবেগের ভাষার (Language of the emotions) পরিস্ফুটতা সাধন করিতে থাকে। আবেগের ভাষাই সংগীতের মূল।···

"···এমন একদিন আসিতেছে যখন আমরা সংগীতেই কথাবার্তা কহিব।···

"আমাদের দেশে সংগীত···স্বাভাবিকতা হইতে এত দূরে চলিয়া গিয়াছে যে, অনুভাবের সহিত সংগীতের বিচ্ছেদ হইয়াছে, কেবল কতকগুলা সুরসমষ্টির কর্দম এবং রাগরাগিণীর ছাঁচ ও কাঠামো অবশিষ্ট রহিয়াছে; সংগীত একটি মৃত্তিকাময়ী প্রতিমা হইয়া পড়িয়াছে— তাহাতে হৃদয় নাই, প্রাণ নাই।···

"···আমাদের দেশীয় অনুভাবশূন্য সংগীত নিকৃষ্ট শ্রেণীর।··· যতক্ষণ আমরা তাহার মধ্যে অনুভাব না আনিতে পারিব, ততক্ষণে আমরা উচ্চশ্রেণীর সংগীতবিৎ বলিয়া গর্ব করিতে পারিব না।"

বাল্মীকি-প্রতিভায় ব্যবহৃত হাসিকান্না ক্রোধবিস্ময়-মিশ্রিত নানারূপ কথোপকথনগুলি গানের সুরে বলবার সময়েও অনুভাবের সাহায্য নিয়েছিলেন। অর্থাৎ নাটকের হাসিকান্না ক্রোধ ইত্যাদি নানাভাবের কথা স্বাভাবিক অবস্থায় অভিনেতারা কণ্ঠে যেভাবে প্রকাশ করেন, কণ্ঠস্বরের সেই স্বাভাবিকতা এই নাটকে বজায় ছিল রাগিণী মিশ্রিত গানগুলি গেয়ে অভিনয় করার সময়। এইরূপ অনুভাব যুক্ত গীত পদ্ধতির অভাবে আমাদের ভারতীয় সংগীতকে নিকৃষ্ট শ্রেণীর বলে সে যুগে গুরুদেব মনে করতেন।

পরবর্তী মাঘ মাসের 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হল 'সংগীত ও কবিতা' নামে গুরুদেবের তৃতীয় প্রবন্ধটি। এটিতে বলছেন—

"আমাদের ভাবপ্রকাশের দুটি উপকরণ আছে— কথা ও সুর। কথাও যতখানি ভাব প্রকাশ করে, সুরও প্রায় ততখানি ভাব প্রকাশ করে। এমন-কি, সুরের উপরেই কথার ভাব নির্ভর করে। একই কথা নানা সুরে নানা অর্থ প্রকাশ করে। অতএব ভাবপ্রকাশের অঙ্গের মধ্যে কথা ও সুর উভয়কেই পাশাপাশি ধরা যাইতে পারে। সুরের ভাষা ও কথার ভাষা উভয় ভাষায় মিশিয়া আমাদের ভাবের ভাষা নির্মাণ করে। কবিতায় আমরা কথার ভাষাকে প্রাধান্য দিই ও সংগীতে সুরের ভাষাকে প্রাধান্য দিই।··· কথোপকথনে আমরা যে-সকল সুর যেরূপ নিয়মে ব্যবহার করি, সংগীতে সে-সকল সুর সেরূপ নিয়মে ব্যবহার করি না, সুর বাছিয়া বাছিয়া লই, সুন্দর করিয়া বিন্যাস করি। কবিতায় যেমন বাছা বাছা সুন্দর কথায় ভাব প্রকাশ করে, সংগীতেও তেমনি বাছা-বাছা সুন্দর সুরে ভাব প্রকাশ করে। যুক্তির ভাষায় প্রচলিত কথোপকথনের সুর ব্যতীত আর কিছু আবশ্যক করে না, কিন্তু যুক্তির অতীত আবেগের ভাষায় সংগীতের সুর আবশ্যক করে। এ বিষয়েও সংগীত অবিকল কবিতার ন্যায়। সংগীতেও ছন্দ আছে। তালে তালে তাহার সুরের লীলা নিয়মিত হইতেছে।···কথোপকথনের সুরে সুশৃঙ্খল তাল নাই, সংগীতে তাল আছে। সংগীত ও কবিতা উভয়ে ভাবপ্রকাশের দুইটি অঙ্গ ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছে। তবে, কবিতা ভাবপ্রকাশ সম্বন্ধে যতখানি উন্নতি লাভ করিয়াছে, সংগীত ততখানি করে নাই। তাহার একটি প্রধান কারণ আছে। শূন্যগর্ভ কথার কোনো আকর্ষণ নাই, না তাহার অর্থ আছে, না তাহা কানে তেমন মিঠা লাগে। কিন্তু ভাবশূন্য সুরের একটা আকর্ষণ আছে, তাহা কানে মিষ্ট শুনায়। এইজন্য ভাবের অভাব হইলেও একটা ইন্দ্রিয়সুখ তাহা হইতে পাওয়া যায়। এই নিমিত্ত সংগীতে ভাবের প্রতি তেমন মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। উত্তরোত্তর আস্কারা পাইয়া সুর বিদ্রোহী হইয়া ভাবের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে।··· সংগীতের ভূমি উর্বরা হওয়াতেই সংগীতের এমন দুর্দশা। মিষ্টসুর শুনিবামাত্রই ভালো লাগে, সেই নিমিত্ত সংগীতকে আর পরিশ্রম করিয়া ভাব কর্ষণ করিতে হয় নাই— কিন্তু শুদ্ধ মাত্র কথার যথেষ্ট মিষ্টতা নাই বলিয়া কবিতাকে প্রাণের দায়ে ভাবের চর্চা করিতে হইয়াছে। সেই নিমিত্তই কবিতার এমন উন্নতি ও সংগীতের এমন অবনতি।···

"কবিতা উচ্চ শ্রেণীতে উঠিয়াছে ও সংগীত নিম্নশ্রেণীতে পড়িয়া রহিয়াছে; কবিতায় বায়ুর ন্যায় সূক্ষ্ম ও প্রস্তরের ন্যায় স্থূল সমুদয় ভাবই প্রকাশ করা যায়, কিন্তু সংগীতে এখনো তাহা করা যায় না।···

Matthew Arnold বলেন— "মনের একটি মাত্র স্থায়ীভাব বাছিয়া লওয়া, ভাব-শৃঙ্খলের একটি মাত্র অংশের উপর অবস্থান করিয়া থাকা সংগীতের কাজ।···কবিতার কাজ আরো বিস্তৃত। চিত্রকরের ন্যায় মুহূর্তের বাহশ্রীও তাঁহার বর্ণনীয়, গায়কের ন্যায় ক্ষণকালের ভাবোচ্ছ্বাসও তাঁহার গেয়। তাহা ছাড়া

জীবনের গতিস্রোত তাঁহার বর্ণনীয় বিষয়। ভাব হইতে ভাবান্তরে, অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে তাঁহাকে গমন করিতে হয়।...কেবলমাত্র স্থির দণ্ডায়মান আকৃতি তিনি চিত্র করেন না— এক সময়ের স্থায়ী ভাব মাত্র তিনি বর্ণনা করেন না, গম্যমান শরীর, প্রবহমান ভাব, পরিবর্তমান তাঁহার কবিতার বিষয়।... চলনশীল ভাবের প্রত্যেক ছায়ালোক সংগীতে প্রতিবিম্বিত হইতে পারে না। সংগীত একটি স্থায়ী স্থির ভাবের ব্যাখ্যা করে মাত্র। কিন্তু আমরা এই বলি যে, গতিশীল ভাব যে সংগীতের পক্ষে একবারে অননুসরণীয় তাহা নহে, তবে এখনো সংগীতের সে বয়স হয় নাই। সংগীত ও কবিতায় আমরা আর-কিছু প্রভেদ দেখি না, কেবল উন্নতির তারতম্য।"

'সংগীত ও ভাব' নামে প্রথম প্রবন্ধের যেখানে তিনি বলেছেন, ভারতীয় সংগীত শাস্ত্র স্থির অচঞ্চল-বিবিধ বিচিত্র ভাবের লীলাময় ছায়ালোকময় পরিবর্তনশীল মুখশ্রী দেখতে পাওয়া যায় না এটি মূলত তারই বিস্তারিত ব্যাখ্যা। এখানে তিনি বললেন কবিতায় বায়ুর ন্যায় সূক্ষ্ম ও প্রস্তরের ন্যায় স্থূল সমুদয় ভাব প্রকাশ করায় যে সুবিধা আছে সংগীতে তা নেই। কবিতার মতো গতিশীল ভাব প্রকাশ করা সংগীতের পক্ষে এখনো সম্ভব হয় নি। ভাব প্রকাশে কবিতা যতখানি উন্নতিলাভে সমর্থ হয়েছে সংগীতে ততখানি হয় নি।

এই তিনটি প্রবন্ধ থেকে এটুকু বোঝা যায় যে, 'গুরুদেব ইয়োরোপীয় সংগীত চিন্তাকে আদর্শরূপে সামনে রেখে বাল্মীকি প্রতিভায় সংগীতের নূতন পরীক্ষায় হাত দিয়েছিলেন এবং এ যুগে তাঁর মনে এমন বিশ্বাসও জন্মেছিল যে, কতগুলি দিকে ভারতীয় সংগীত ইয়োরোপীয় সংগীতের তুলনায় অনেকখানি অনগ্রসর।

যৌবনের প্রারম্ভে সমগ্রভাবে ইয়োরোপের সংস্কৃতির প্রতি গুরুদেব যে গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন তা জানা যায় সে যুগে প্রকাশিত তাঁরই "য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র" নামক বইটির বিভিন্ন পত্রে। বইটির ভূমিকায় তিনি কোনো প্রকার দ্বিধা না করে বলেছিলেন—

"বিদেশীয় সমাজ প্রথম দেখিয়াই যাহা মনে হইয়াছে তাহাই ব্যক্ত করা গিয়াছে। কিন্তু ইহাতে আর কোনো উপকার হউক বা না হউক, একজন বাঙালি ইংলণ্ডে গেলে কিরূপে তাহার মত গঠিত ও পরিবর্তিত হয় তাহার একটা ইতিহাস পাওয়া যায়।"

সংগীতেও যে রবীন্দ্রনাথের মত ইয়োরোপীয় ভাবধারায় অনেকখানি গঠিত ও পরিবর্তিত হয়েছিল তার পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি।

'বাল্মীকি-প্রতিভা'র অভিনয় ও এই প্রবন্ধ কটি প্রকাশের পরে, ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর তারিখে অভিনীত হল দ্বিতীয় গীতনাট্য 'কালমৃগয়া'। এর কথা স্মরণ করে 'জীবনস্মৃতি'তে গুরুদেব লিখছেন— "বাল্মীকি-প্রতিভা'র গান সম্বন্ধে এই নূতন পন্থায় উৎসাহ বোধ করিয়া এই শ্রেণীর আরো একটি গীতনাট্য লিখিয়াছিলাম।"

'কালমৃগয়া'তে বিলাতি গানের সুরে ও ছন্দে রচিত, বা যাকে বলে ভাঙা গান; তা ছিল মাত্র ছয়টি। যেমন—

১ ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে

২ সকলি ফুরালো

৩ মানা না মানিলি
৪ তুই আয়রে কাছে আয় (ও ভাই দেখে যা)
৫ ও দেখনি যে ভাই
৬ এসেছি মোরা, এসেছি মোরা

বাকি গানগুলি রচিত হল নানা ঢঙের ভারতীয় গানের সাহায্যে।

এ যুগে, গীতনাটকের জন্য নয় এমন বিলাতি গান-ভাঙা বাংলা গান সংখ্যায় বেশি পাওয়া যায় না। জানা যায়, প্রথমবারের বিলাতবাস থেকে পরবর্তী ছয় বছর, অর্থার ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে এই রূপ ইংরাজি গান-ভাঙা বাংলা গান রচনা করেছিলেন মাত্র তিনটি। যেমন—'ওহে দয়াময় নিখিল আশ্রয়' ব্রহ্মসংগীতটি আর 'পুরানো সেই দিনের কথা' এবং 'কতবার ভেবেছিনু' বিবিধ পর্যায়ের গান দুটি। ভাঙা-গানের সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য করে দেখা যাচ্ছে যে, বিলাতি সংগীতের প্রতি প্রবল আকর্ষণ থাকলেও ভাঙাগান রচনার প্রতি গুরুদেবের তেমন আগ্রহ নেই।

১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র পুনরাভিনয় কালে 'মরি ও কাহার বাছা' গানটি বনদেবীর বিলাপের গান হিসেবে নতুন করে যুক্ত হল। 'কালমৃগয়া'-র 'মানা না মানিলি' গানটির সুরে। এবারের অভিনয়ে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' বহুপরিমাণে বর্ধিত হল। তাই গীতনাটকটির পুনর্মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় তিনি বলেছিলেন—

"অনেকগুলি নাম পরিবর্তিত আকারে অথবা বিশুদ্ধ আকারে 'কালমৃগয়া' গীতিনাট্য হইতে গৃহীত।" 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন ('কালমৃগয়া') "গীতিনাট্যের অনেকটা অংশ 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছিলাম …।"

এই গীতিনাট্যের এবারের অভিনয়ে বিলাতি সুরের গান রেখেছিলেন মাত্র চারটি। যেমন—

১ কালী কালী বলরে আজ
২ তবে আয় সবে আয়
৩ এসেছি মোরা, এসেছি মোরা
৪ মরি ও কাহার বাছা

নাটকটির জন্যে প্রায় ২০টি দেশী ঢঙের গান রচনা করলেন নতুন করে আর 'কালমৃগয়া'র মোট ৯টি গান যুক্ত হল এর সঙ্গে।

পর পর গীতিনাট্য দুটি রচনার সময়ে নতুন পরীক্ষার প্রতি তাঁর মনে যে উৎসাহ জেগেছিল তার বর্ণনা করতে গিয়ে 'জীবনস্মৃতি'তে লিখলেন—

"বাল্মীকি-প্রতিভা ও কালমৃগয়া যে-উৎসাহে লিখিয়াছিলাম সে-উৎসাহে আর-কিছু রচনা করি নাই। ওই দুটি গ্রন্থে আমাদের সেই সময়কার একটা সংগীতের উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছে। জ্যোতিদাদা তখন প্রত্যহই প্রায় সমস্ত দিন ওস্তাদি গানগুলাকে পিয়ানো যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া তাহাদিগকে যথেচ্ছা মন্থন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে রাগিণীগুলির এক-একটি অপূর্ব মূর্তি ও ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ পাইত। যে-সকল সুরে বাঁধা নিয়মের মধ্যে মন্দগতিতে দস্তুর রাখিয়া চলে তাহাদিগকে প্রথাবিরুদ্ধ বিপর্যস্তভাবে দৌড় করাইবামাত্র সেই বিপ্লবে তাহাদের প্রকৃতিতে নূতন নূতন অভাবনীয় শক্তি দেখা দিত এবং তাহাতে

আমাদের চিত্তকে সর্বদা বিচলিত করিয়া তুলিত। সুরগুলা যেন নানা প্রকার কথা কহিতেছে, এইরূপ আমরা স্পষ্ট শুনিতে পাইতাম।"

"এইরূপ একটা দস্তুর ভাঙা গীতবিপ্লবের প্রলয়ানন্দে এই দুটি নাট্য লেখা। এইজন্য উহাদের মধ্যে তাল-বেতালের নৃত্য আছে এবং ইংরেজি-বাংলার বাছবিচার নাই।... আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সংগীত সম্বন্ধে উক্ত দুই গীতনাট্যে যে দুঃসাহসিকতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে কেহই কোনো ক্ষোভ প্রকাশ করেন নাই এবং সকলেই খুশি হইয়া ঘরে ফিরিয়াছেন।"

জীবনস্মৃতির এই উক্তি কটি তাঁর ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দের বক্তৃতা ও প্রবন্ধ কটির কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অভিনীত হল তৃতীয় গীতিনাট্য 'মায়ার খেলা'। প্রায় বছর খানেক আগে থেকেই এর গান রচনা তিনি শুরু করেছিলেন। বেথুন কলেজে মহিলারা অভিনয় করলেন, দর্শকও ছিলেন কেবলমাত্র মহিলারা। এই নাটকটি বিষয়ে গুরুদেব লিখছেন— 'বাল্মীকি-প্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া' রচনার "অনেককাল পরে 'মায়ার খেলা' বলিয়া আর-একটি গীতনাট্য লিখিয়াছিলাম কিন্তু সেটা ভিন্নমতের জিনিস। তাহাতে নাট্য মুখ্য নহে, গীতই মুখ্য। বাল্মীকি-প্রতিভা ও কালমৃগয়া যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, মায়ার খেলা তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। ঘটনার স্রোতের 'পরে তাহার নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ। বস্তুত, 'মায়ার খেলা' যখন লিখিয়াছিলাম তখন গানের রসেই সমস্ত মন অভিষিক্ত হইয়াছিল।"

এই গীতিনাট্যটির সঙ্গে পূর্বের দুটি গীতিনাট্যের প্রধান পার্থক্য হল এই যে, এর বহু গানেই নাটক থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বতন্ত্র গান হিসেবে গেয়ে উপভোগ করা যায়। এছাড়া তবলার তালের ছন্দও এর বহু গানে রক্ষিত হয়েছে। যার জন্যে এ-নাটকের গানগুলির রাগিণীর উল্লেখের সঙ্গে তালেরও উল্লেখ দেখি। তা সত্ত্বেও, এটি পুরোপুরি গীতিনাট্য। এবং এর অভিনয়ের সময় অধিকাংশ গানই গাওয়া হয়েছিল পুরোপুরি কথোপকথনের ছন্দে তালের বাঁধাছন্দের নিয়ম লঙ্ঘন করে। এই গীতিনাটকে বিলাতি সুরের ভাঙা-গান আছে মাত্র একটি। গানটি হল 'আহা আজি এ বসন্তে'। পূর্বের 'মানা না মানিলি' গানটির সুরে এটি রচিত। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই সাতটি বছরে গীতিনাটক রচনা এবং একই প্রথায় তার গান গেয়ে অভিনয় করার প্রতিই ছিল তাঁর ও তাঁর পরিবারের সকলের একমাত্র ঝোঁক। এ ছাড়া, বিলাতি গান-ভাঙা বাংলা গান মোট যে-কটির সন্ধান পাওয়া গেছে তা এই সময়ের মধ্যেই তিনি লিখেছিলেন। 'মায়ার খেলা' রচনার পর গীতিনাট্য রচনার প্রতি উৎসাহ আর যেমন দেখা গেল না, তেমনি দেখা গেল না বিলাতি ভাঙা বাংলা গান রচনার প্রতি আগ্রহ।

১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে ঘটল রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বারের বিলাত যাত্রা। তখন তাঁর বয়স ২৯ বৎসর। খুবই উৎসাহ নিয়ে তিনি রওনা হয়েছিলেন, পৌছলেন সেপ্টেম্বর মাসে, কিন্তু দেশ ও বাড়ির জন্য মন খারাপ হওয়াতে মাত্র একমাস সে দেশে থাকার পর নভেম্বর মাসে দেশে ফিরে এলেন। যে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি বিলেতে গিয়েছিলেন তা আর সফল হল না, কিন্তু এই একমাস সে দেশের সংগীতের চর্চায় তাঁর সময় যে কী ভাবে কেটেছিল তার সুন্দর একটি পরিচয় পাই তাঁরই লেখা 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি' গ্রন্থে। এক মাসের বিলাত বাস এবং জাহাজে ফেরার দিনলিপিতে সংগীত চর্চার উল্লেখ করে তিনি জানাচ্ছেন—

"সন্ধের সময় আর একবার গানবাজনা নিয়ে বসা গেল। Walter Mull বেশ Piano বাজায়। Miss Mull-এ আমায় মিলে অনেকগুলো গান গেয়েছি। এরা আমার গলার অনেক তারিফ করছে। Mull বলছিল, আমি যদি গলার চর্চা করি তাহলে St. James Hall Concert-এ গাইতে পারি—আমার রীতিমত উচ্চশ্রেণীয় গলা আছে।…

"…সমস্ত দিন প্রায় গানবাজনায় কেটেছে।… Miss Mull গান শেখালে।… কতকগুলো নতুন গান (গানের স্বরলিপি) কিনে এনেছি সেগুলো গেয়ে দেখা গেল।…

"Tennis খেলে Oswalds-এর ওখানে গান গেয়ে এবং গানবাজনা শুনে বাড়ি এসে খেয়ে পুনশ্চ গানবাজনা করে শোবার ঘরে এসেছি।

"…Miss Mull আমাকে সব গানগুলো গাওয়ালে। 'Remember me' বলে একটা গানের পর সে আস্তে আস্তে আমাকে বললে Mr. T, I shall remember you।

"Miss Mull-এর কাছে একটু গান শিখলুম।… concert-এ আমাকে গান গাওয়ালে। বিস্তর বাহবা পাওয়া গেল।… একটি অত্যন্ত মোটা মেয়ে চমৎকার গান করলে। সেই আমার গানের accompaniment বাজিয়েছিল। Gounod-এর *Serenade* এবং *If* গেয়েছিলুম। আজকাল আমি অনেকটা সাহসপূর্বক গলা ছেড়ে গান গাই।…

"এখন অভ্যাসক্রমে য়ুরোপীয় সংগীতের এতটুকু আস্বাদ পাওয়া গেছে যার থেকে নিদেন এইটুকু বোঝা গেছে যে, যদি চর্চা করা যায় তাহলে য়ুরোপীয় সংগীতের মধ্যে থেকে পরিপূর্ণ রস পাওয়া যেতে পারে।

"আজ রাত্তিরেও আমাকে অনেক গান গাইতে হল। তার পর নিরালায় অন্ধকারে জাহাজের কাঠরা ধরে সমুদ্রের দিকে চেয়ে যখন গুন্ গুন্ করে একটা দিশি রাগিণী ভাঁজ ছিলুম ভারি মিষ্টি লাগল। ইংরিজি গান গেয়ে গেয়ে শ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলুম, হঠাৎ দিশি গানে প্রাণ আকুল হয়ে গেল।

"Mrs. Moeller আমাকে গান গাইতে অনুরোধ করলে, সে আমার সঙ্গে পিয়ানো বাজালে। Mrs. Moeller বললে : It is a treat to hear you sing। Webb এসে বললে What would we do without you Tagore—there's nobody on board who sings so well। যা হোক, জাহাজে এসে আমার গান বেশ appreciated হচ্ছে। আসল কথা হচ্ছে এর আগে আমি যে ইংরিজি গানগুলো গাইতুম কোনোটাই tenor pitchএ ছিল না তাই আমার গলা খুলত না। এবারে সমস্ত উঁচু pitchএর music কিনেছি, তাই এত প্রশংসা পাওয়া যাচ্ছে।

"Schiller একজন জর্মান সহযাত্রী আমাকে বলছিল তুমি যদি তোমার গলার রীতিমত চর্চা কর তাহলে আশ্চর্য উন্নতি হতে পারে : 'you have a mine of wealth in your voice'।"

এই উদ্ধৃতিগুলি থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, ১৭।১৮ বৎসর বয়সে, প্রথমবার বিলাত-ভ্রমণে গিয়ে সেদেশের কণ্ঠসংগীতের যে চর্চা গুরুদেব করেছিলেন, প্রায় দশ বছরের ব্যবধানেও তা তিনি ভোলেন নি। তাই, এবারের এই অল্পদিনের চর্চায় তাঁর গান গাইবার শক্তির প্রভূত উন্নতি হয়েছে এবং গাইয়ে হিসেবে প্রসংশাও পাচ্ছেন। কিন্তু এবারে দেশে ফিরে আসার পর প্রথমবারের মতো বিদেশী সংগীতের উত্তেজনার কোনো পরিচয় পেলাম না। নতুন কোনো গীতনাট্য বা বিলাতি গান-ভাঙা বাংলা গান রচনারও কোনো খবর নেই। তবে, এটুকু জানা যায় যে, ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের কোনো

•এক সময়ে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র অভিনয় আর একবার খুবই জাঁকজমকের সঙ্গে করেছিলেন। এবারেও বাল্মীকির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন তিনি স্বয়ং, দস্যুদলে ছিলেন গগনেন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতি ঠাকুর-পরিবারের অনেকে। সরস্বতীর ভূমিকা নিয়েছিলেন ইন্দিরা দেবী, আর বালিকার ভূমিকায় ছিলেন অভিজ্ঞা দেবী। ভারতের তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড ল্যান্সডাউন-পত্নীর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে নিমন্ত্রণ উপলক্ষে এই অভিনয়ের আয়োজন হয়েছিল। ইন্দিরা দেবী তাঁর 'রবীন্দ্রস্মৃতি' পুস্তকে এর একটু বিবরণ রেখে গেছেন—

"বাবা [সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর] একবার বিলেত থেকে আসবার সময়ে তাঁর সহযাত্রী তখনকার লাটপত্নী লেডী ল্যান্সডাউনকে জোড়াসাঁকোর বাড়ি আসবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।··· কলকাতায় আসবার পর লাটপত্নী এই নিমন্ত্রণ রক্ষার অভিপ্রায় জানালে তাঁর জন্য 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র একটি বিশেষ অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। লেডী ল্যান্সডাউনের সঙ্গে তখনকার ছোট-লাটপত্নী লেডী এলিয়ট প্রভৃতি আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ইংরেজ ছিলেন।"

বাল্মীকির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের যে ছবিটির সঙ্গে আমরা আজ পরিচত সেটি তোলা হয়েছিল এইবারে, ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে। শোনা যায় যে, গুরুদেব বাল্মীকির সাজে যে গাউনটি কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত পিছনে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন সেটি ঐ সময়ে প্রথম ব্যবহৃত হয়, আগে নাকি তা ছিল না। গভর্নর জেনারেল-পত্নী ও অন্যান্য বিশিষ্ট ইংরেজ অতিথিদের কথা চিন্তা করে নাকি দস্যুদলের রাজার চিহ্ন হিসেবে এবারের সাজের সঙ্গে এটি যুক্ত হয়। দস্যুদলের শরীর যথাসম্ভব জামা, পাজামা ও পাগড়িতে ঢাকা হয়েছিল, কাবুলিদের অনুকরণে, যাতে তাঁদের শরীরের কোনো অংশ বিশিষ্ট মহিলা অতিথিদের চোখে না পড়ে।

এই গীতনাট্য প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয়ে বিশেষ করে বলার প্রয়োজন আছে। সে যুগের কলকাতা থিয়েটারগুলিতে বিলাতি আদর্শে সীন এঁকে এবং অন্য উপায়ে যেভাবে মঞ্চকে রিয়েলিস্টিক সাজে সাজানোর চেষ্টা করা হত তাঁদের বাড়ির মঞ্চসজ্জাতেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের বাল্মীকি-প্রতিভার মঞ্চসজ্জায় যে বর্ণনা রেখে গেছেন শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'ঘরোয়া' গ্রন্থে তাতে তার সাক্ষ্য মেলে। দুটো তুলোর বক, খড়ভরা একটা মরা হরিণ, সীনে আঁকা কচুবনে বরাহ ও বটের ডালপালা লাগানো হয়েছিল মঞ্চে। টিনের নল দিয়ে বর্ষার গানের সময় মঞ্চে জল ছাড়া, আয়না দিয়ে বিদ্যুতের আলো, টিন বাজিয়ে কড়্ কড়্ শব্দ, দোতলার ছাদ থেকে দুটো দম্বল গড়গড় করে এধার ওধার গড়ানো, টাট্টুঘোড়ার পিঠে লুঠের মাল নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ এবং ঘোড়াকে মঞ্চে ঘাসটাস খাওয়ানোর দৃশ্যে নিমন্ত্রিত মেম ও সাহেবেরা মহাখুশী হয়েছিলেন। এর থেকে বোঝা যায় যে গুরুদেবের ৩২ বৎসর বয়স পর্যন্ত অভিনয়ে, সংগীতে ও সাজ-সজ্জায় বিলেতের প্রভাব কতখানি প্রবল। বিলাতি সংগীতের প্রতি সে বয়সেও তাঁর ভালোবাসা কতখানি গভীর ছিল তা জানা যায় তাঁর সে যুগের কয়েকটি চিঠি থেকে। ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে লেখা একটি চিঠি থেকে জানা যায়—

"এবারে চলে আসবার আগে যেদিন একদিন দুপুর বেলায় স পার্ক স্ট্রীটে এসেছিলেন, তুই পিয়ানোয় বসেছিলি, আমি গান গাবার উদ্যোগ করেছিলুম··· ।"

আর-একটি চিঠিতে লিখছেন—"বেলি [প্রথম কন্যা] যদি দেশী এবং ইংরাজি সংগীতে বেশ ওস্তাদ হয়ে ওঠে তাহলে আমার অনেকটা সাধ মিট্‌বে।

"আমার ভারি ইচ্ছা করছিল আমি এই রকম করে শুয়ে থাকি আর পাশের ঘর থেকে কেউ আপন ইচ্ছামত পিয়ানোতে একটার পর একটা বাজনা বাজিয়ে যায়। তার মধ্যে আমার সেই Chopinটাও থাকে। মনের ভিতর এই রকম যে-ইচ্ছা জন্মায়, সেই ইচ্ছাটা অপরিতৃপ্ত থাকলেও তার ভিতরে একরকমের সুখ আছে।"

গুরুদেবের বিলাতি সংগীতানুরাগের কথা উল্লেখ করে ইন্দিরা দেবী লিখেছেন—

"আমি অবশ্য রবিকাকার অনেক বিলিতি গানের সঙ্গে পিয়ানো বাজিয়েছি, সে-সব এখনও সেদিনের মূক সাক্ষী -স্বরূপ আমার গানের বাঁধানো বইয়ে পড়ে আছে, যথা,

'In the gloaming',

'Then you will remember me',

'Good night, good night, beloved',

সুইন্‌বার্নের *'If'* ইত্যাদি। এছাড়া বেন্ জন্সনের বিখ্যাত গান

'Drink to me only with thine eyes' ভেঙে লিখেছিলেন 'কতবার ভেবেছিনু'। আর একটা গান, রোমান ক্যাথলিকদের বিখ্যাত স্তব 'আভেমারিয়া', রবিকাকা পিয়ানো ও বেহালার যুগল সংগতে গাইতেন, সেটি আমার বড় ভালো লাগত।…'Darling you are growing old' প্রভৃতি ইংরিজি গানের সুরও মজা করে টেনে টেনে গাইতেন।"[৩]

এই ভাবে, ১৭।১৮ বৎসর বয়স থেকে ৩৩ বৎসর বয়স পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বিলাতি কণ্ঠসংগীতের সার্থক চর্চার সুস্পষ্ট পরিচয় আমরা পাই। এবং ইয়োরোপীয় সংগীত বিষয়ে তাঁর জ্ঞান যে বিলাতপ্রত্যাগত অন্যান্য শিক্ষিত ভারতীয়দের মতো শৌখিন ছিল না, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তাই ইয়োরোপীয় সংগীতবিষয়ে তাঁর মতামতের মূল্য যথেষ্ট আছে বলেই মনে করি।

প্রথম-যৌবনে ইয়োরোপীয় সংগীতে পূর্ণ সমর্থনে ভারতীয় সংগীতের উদ্দেশ্যে বিরূপ মতামত তিনি প্রকাশ করেন, কিন্তু দেখা যায়, তিরিশ বছরের কাছাকাছি বয়সে তিনি প্রথম অনুভব করছেন যে, উভয় দেশের সংগীতের প্রকৃতি এক নয়, দুয়ের মধ্যে প্রচুর প্রভেদ বর্তমান। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি' থেকেই তা প্রথম জানতে পাই। সেই সময় থেকে তিনি উভয় দেশের সংগীতের প্রকৃত স্বরূপটি যে কী এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে কিনা তা নিয়ে ভাবতে শুরু করেছেন। ডায়ারি বা দিনলিপির ১০ অক্টোবর তারিখে লিখছেন—

"…এখন অভ্যাসক্রমে য়ুরোপীয় সংগীতের এতটুকু আস্বাদ পাওয়া গেছে যার থেকে নিদেন এইটুকু বোঝা গেছে যে, যদি চর্চা করা যায় তাহলে য়ুরোপীয় সংগীতের মধ্যে থেকে পরিপূর্ণ রস পাওয়া যেতে পারে। আমাদের দেশী সংগীত যে আমার ভালো লাগে সে কথার বিশেষ উল্লেখ করা বাহুল্য। অথচ দুয়ের মধ্যে যে সম্পূর্ণ জাতিভেদ আছে তার আর সন্দেহ নেই।"

এরই দিন ছয় পরে আবার লিখলেন—

"…আমার কাছে ইংরাজি গানের সঙ্গে আমাদের গানের এই প্রধান প্রভেদ ঠেকে যে, ইংরাজি সংগীত লোকালয়ের সংগীত, আর আমাদের সংগীত প্রকাণ্ড নির্জন প্রকৃতির অনির্দিষ্ট অনির্বচনীয় বিষাদের সংগীত।"

---

৩ রবীন্দ্রস্মৃতি

দুই দেশের সংগীতের তুলনামূলক গুরুদেবের এই চিন্তা প্রায় বছর চার পরে, ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের এক চিঠিতে আরো বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হল। তিনি লিখলেন—

"আমার মনে হয় দিনের জগৎটা য়ুরোপীয় সংগীত, সুরে-বেসুরে খণ্ডে-অংশে মিলে একটা গতিশীল প্রকাণ্ড হার্মনির জটলা— আর, রাত্রের জগৎটা আমাদের ভারতবর্ষীয় সংগীত, একটি বিশুদ্ধ করুণ গম্ভীর অমিশ্র রাগিণী। দুটোই আমাদের বিচলিত করে, অথচ দুটোই পরস্পর বিরোধী।…কী করা যাবে।… আমরা ভারতবর্ষীয়েরা সেই রাত্রির রাজত্বে থাকি— আমরা অখণ্ড অনাদি দ্বারা অভিভূত। আমাদের নির্জন এককের গান, য়ুরোপের সজন লোকালয়ের সংগীত। আমাদের গান শ্রোতাকে মনুষ্যের প্রতিদিনের সুখ দুঃখের সীমা থেকে বের করে নিয়ে নিখিলের মূলে একটি সঙ্গীবিহীন বৈরাগ্যের দেশ আছে সেইখানে নিয়ে যায়— আর য়ুরোপের সংগীত মনুষ্যের সুখদুঃখের অনন্ত উত্থান-পতনের বিচিত্রভাবে নৃত্য করিয়ে নিয়ে চলে।"

ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় সংগীতের স্বরূপ বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তা এর পর থেকে একই খাতে জীবনের শেষ পর্যন্ত বয়ে গেছে। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর জীবনস্মৃতি-র 'বিলাতি সংগীত' নামে পরিচ্ছেদে দুই দেশের সংগীতের এই পার্থক্যের পুনরালোচনা করে বললেন—

"য়ুরোপের সংগীত যেন মানুষের বাস্তবজীবনের সঙ্গে বিচিত্রভাবে জড়িত। তাই দেখিতে পাই, সকল রকমেরই ঘটনা ও বর্ণনা আশ্রয় করিয়া য়ুরোপে গানের সুর খাটানো চলে; আমাদের দিশি সুরে যদি সেরূপ করিতে যাই তবে অদ্ভুত হইয়া পড়ে, তাহাতে রস থাকে না। আমাদের গান যেন জীবনের প্রতিদিনের বেষ্টন অতিক্রম করিয়া যায়, এই জন্য তাহার মধ্যে এত করুণা এবং বৈরাগ্য;…

…য়ুরোপের গান আমার হৃদয়কে একদিক দিয়া খুবই আকর্ষণ করিত। আমার মনে হইত, এ সংগীত রোমান্টিক।… ইহা মানব জীবনের বিচিত্রতাকে গানের সুরে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছে। আমাদের সংগীতে কোথাও কোথাও সে-চেষ্টা নাই যে তাহা নহে, কিন্তু সে-চেষ্টা প্রবল ও সফল হইতে পারে নাই।"

এ ছাড়া তার প্রথম-যৌবনের যে বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, গায়কেরা "গানের কথার সুরকে দাঁড় করাইতে চান, আমি গানের কথাগুলিকে সুরের উপর দাঁড় করাইতে চাই। তাঁহারা কথা বসাইয়া যান সুর বাহির করিবার জন্য, আমি সুর বসাইয়া যাই কথা বাহির করিবার জন্য।" তখনকার তাঁর এই মতটি যে ভ্রান্ত, এবারেই প্রথম বিনা দ্বিধায় তিনি তা স্বীকার করছেন, এবং বলছেন—

"যে মতটিকে [১৮৮১ খ্রীস্টাব্দের বক্তৃতা] তখন এত স্পর্ধার সঙ্গে ব্যক্ত করিয়াছিলাম সে-মতটি যে সত্য নয়, সে-কথা আজ স্বীকার করিব। গীতিকলার নিজেরই একটি বিশেষ প্রকৃতি ও বিশেষ কাজ আছে। গানে যখন কথা থাকে তখন কথার উচিত হয় না সেই সুযোগে গানকে ছাড়াইয়া যাওয়া, সেখানে সে গানেরই বাহন মাত্র। গান নিজের ঐশ্বর্যেই বড়ো; বাক্যের দাসত্ব সে কেন করিতে যাইবে? বাক্য যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানেই গানের আরম্ভ। যেখানে অনির্বচনীয় সেইখানেই গানের প্রভাব। বাক্য যাহা বলিতে পারে না গান তাহাই বলে। এইজন্য গানের কথাগুলিতে কথার উপদ্রব যতই কম থাকে ততই ভালো। হিন্দুস্থানি গানের কথা সাধারণতঃ এতই অকিঞ্চিৎকর যে, তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া সুর আপনার আবেদন অনায়াসে প্রচার করিতে পারে। এইরূপে রাগিণী যেখানে শুদ্ধমাত্র স্বররূপেই আমাদের চিত্তকে অপরূপ ভাবে জাগ্রত করিতে পারে সেইখানেই সংগীতের উৎকর্ষ। কিন্তু বাংলাদেশে

বহুকাল হইতে কথারই আধিপত্য এত বেশি যে এখানে বিশুদ্ধ সংগীত নিজের স্বাধীন অধিকারটি লাভ করিতে পারে নাই। সেই জন্য এ দেশে তাহাকে ভগিনী কাব্যকলার আশ্রয়েই বাস করিতে হয়। বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী হইতে নিধুবাবুর গান পর্যন্ত সকলেরই অধীন থাকিয়া সে আপনার মাধুর্য বিকাশের চেষ্টা করিয়াছে।... গান রচনা করিবার সময় এইটে বার বার অনুভব করা গিয়াছে।"

পরবর্তী বাকি জীবন, সংগীত বিষয়ক বহু লেখায়, উভয় দেশের সংগীতের আলোচনার সময় তিনি একই অভিমতের পুনরুক্তি করে গেছেন নানা ভাবে। পূর্ণরূপে সুগঠিত এই মত। তাই এর কোনো পরিবর্তন আর ঘটে নি।

প্রভাবের এই আলোচনা থেকে যে কটি মূল তথ্য আমরা পেলাম, তা হচ্ছে—

১৮৮১ থেকে ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ইয়োরোপের সংগীতচিন্তার প্রভাবে গীতিনাটক রচনা ও তার অভিনয়ের প্রতি অত্যধিক আগ্রহ।

গীতিনাটকের গানগুলি, অভিনয়কালে গাইবার যে পদ্ধতি গৃহীত হয়েছিল তা প্রাচীন বা প্রচলিত কোনো প্রকার ভারতীয় গীতি নাটকের আদর্শ অনুযায়ী নয়।

গীতিনাটকের ভারতীয় সুরের গানগুলি ইয়োরোপীয় সংগীতচিন্তার প্রভাবে যে ভাবে রচিত এবং গীত হয়েছিল তাকে আমরা বলব সমন্বয়ধর্মী প্রভাবের ফল।

বিলাতি গান-ভাঙা যাবতীয় বাংলা গান গীতিনাটকের যুগেই রচিত হয়। সংখ্যায় বেশির ভাগ রচিত হয়েছিল গীতিনাটককে অবলম্বন করে।

অনেকে, ইংরাজি ভাঙা বাংলা গানকেই প্রভাবের একমাত্র লক্ষণ বলে মনে করেন। আমাদের মতে তা ঠিক নয়। এ গানের সংখ্যার স্বল্পতায় এবং রবীন্দ্রনাথের ৩৭ বৎসর বয়েসের পর থেকে ভাঙা-গান আর রচিত না হওয়াতে, স্বভাবতই বলা যেতে পারে যে, আজীবন প্রেরণা যোগাবার মতো সুরের ঐশ্বর্যের সন্ধান তিনি এর মধ্যে আর পান নি। এ ছাড়া, ভাঙা-গানগুলি সুরের দিক থেকে হুবহু অনুকরণজাত বলেই গুরুদেবের মনে এভাবে গান রচনায় আর উৎসাহ জাগে নি। তাই ইয়োরোপীয় সংগীতের প্রকৃত প্রভাব যে কোথায় তা খুঁজতে হবে অন্যত্র। গীতিনাটকের গান রচনার সময় তার সূত্রপাত এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত সেই প্রভাব রবীন্দ্রসংগীতে নানারূপে প্রকাশ পেয়েছে। একে বলা চলে উভয় ধারায় সমন্বয়ধর্মী প্রভাব।

রবীন্দ্রপ্রয়োগে শব্দের অর্থান্তর

শব্দের প্রচলিত অর্থের বাচকতা সীমাবদ্ধ। তাই শব্দার্থকে কখনো প্রসারিত কখনো সংকোচিত কখনো বা সম্পূর্ণ পরিবর্তিতরূপে কবিসাহিত্যিকেরা প্রয়োগ করেন। শব্দের অর্থান্তর রবীন্দ্রসাহিত্যে বিচিত্র ভাবে সাধিত হয়েছে। তার কথঞ্চিৎ আভাস এই রচনায় দিতে চেষ্টা করছি।

দু-একটি প্রচলিত শব্দ যেগুলি একটি অর্থেই বর্তমানে সমধিক প্রচলিত সেগুলি অতীতের কোনো সুপ্রচলিত অর্থেও রবীন্দ্রসাহিত্যে দেখা যায়। প্রাচীন সাহিত্যে সেই অর্থেই সমধিক প্রযুক্ত। এই-জাতীয় শব্দ হল অসদ্ভাব ও মন্দির। অভাব অর্থে অসদ্‌ভাব এবং গৃহ অর্থে মন্দির শব্দের প্রয়োগদৃষ্টান্ত :

অ স দ্ভা ব। 'ইতিহাসে সে প্রমাণেরও কিছুমাত্র অসদ্‌ভাব নাই।' পঞ্চভূত ২।৬০৪পৃ.; 'সেখানে উপযুক্ত পরিমাণে আহার্যদ্রব্যের অসদ্‌ভাব ঘটিতে পারে।' লোকসাহিত্য ৬।৬০৪ পৃ.

ম ন্দি র। 'তাই উঠে বেদমন্ত্রসম ভাষা / নিরন্তর প্রশান্ত অম্বরে, মহেন্দ্রমন্দিরপানে / অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা,…' সোনার তরী ৩।৫৫ পৃ.; 'তার পরদিনে— আবার রুধিল দ্বার / শয়নমন্দিরে।' সোনার তরী ৩।১০ পৃ.; 'স্বপ্নচালিতের মতো রাজীব মহামায়ার শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিল।' গল্পগুচ্ছ ১৭।২৫০ পৃ.

—এই দুই শব্দের প্রয়োগদৃষ্টান্ত আরও আছে।

আবার প্রচলিত শব্দ অপ্রচলিত অর্থেও প্রযুক্ত দেখা যায়। নীচের উদ্ধৃতিসমূহে আক্ষেপ 'খেঁচুনি', উন্নতি 'উচ্চতা', ক্ষোভ 'আলোড়ন', চক্র 'ষড়যন্ত্র', ভীষ্ম 'ভীষণ', মুষ্টিমেয় 'মুঠোয় মাপার মতো', হাঁপানি 'শ্বাসবেগ'— প্রভৃতি অপ্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত।

আ ক্ষে প। 'কণ্ঠাগত অন্তরিন্দ্রিয়ের আক্ষেপ উত্তরোত্তর অবাধ্য হয়ে উঠছে। য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি ১।৫৮৮ পৃ.; 'বক্ষের মধ্যে ভয়ের আক্ষেপ…' বিচিত্র প্রবন্ধ ৫।৪৪পৃ.

উ ন্ন তি। 'মংপুতে এলুম, উন্নতি হোলো প্রায় পাঁচ হাজার ফুট।' চিঠিপত্র ৪।২৩৩ পৃ.

ক্ষো ভ। 'মুহূর্তে ইন্দ্রিয় ক্ষোভ করিয়া দমন', রূপান্তর ৫৫ পৃ.; 'এই জন্যে মাঝে মাঝে যে চিত্তক্ষোভ উপস্থিত হয় তাতে কল্যাণের পথ থেকে আমাদের ভ্রষ্ট করে।' বিশ্বভারতী ২৭।৩৩৭ পৃ.

চ ক্র। 'এখানে কেবল ঋতুপর্যায়ে তরু মুঞ্জরিত হইতেছে; এবং সম্মুখের নীলা নদী বর্ষায় স্ফীত, শরতে স্বচ্ছ এবং গ্রীষ্মে ক্ষীণ হইতেছে; পাখির উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বরে সমালোচনার লেশমাত্র নাই; এবং দক্ষিণ বায়ু মাঝে মাঝে পরপারের গ্রাম হইতে মানবচক্রের গুঞ্জনধ্বনি বহিয়া আনে, কিন্তু কানাকানি আনে না। গল্পগুচ্ছ ১৬।৩১৭ পৃ.

ভী ষ্ম। 'কী ভীষ্ম অদৃশ্য নৃত্যে মাতি উঠে মধ্যাহ্ন আকাশে / নিঃশব্দ প্রখর / ছায়ামূর্তি তব অনুচর!' কল্পনা ৭।১৯৭ পৃ.

মু ষ্টি মে য়। 'তাহার মুখখানি ছোটোখাটো, মুষ্টিমেয়, চোখদুটি উজ্জ্বল।' নৌকাডুবি ৫।২৭৭ পৃ.

হাঁ পা নি। মাঠে মাঠে শুকনো পাতার ঘূর্ণিপাকে / হাওয়ার হাঁপানি।' জন্মদিনে ২৫।৯৬ পৃ.

অপ্রচলিত অর্থে বিরলপ্রচলিত শব্দেরও প্রয়োগ দেখা যায়। অবরোহী, আলাপচারি ও জৃম্ভিত শব্দ

তিনটি এই শ্রেণীর। 'একবার বৃথা আশায় বগুলা স্টেশনেও রমেশ ব্যগ্র হইয়া মুখ বাড়াইল— অ ব রো হী দে র মধ্যে অক্ষয়ের চিহ্ন নাই।' নৌকাডুবি ৫।২৩১ পৃ., 'ভিজিটরদের সঙ্গে আ লা প চা রি করে…' য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র ১।৫৪২ পৃ., 'তখনও যে-সব স্কুলের রাস্তা ছিল কলকাতা য়ুনিভার্সিটির প্রবেশদ্বারের দিকে জ় স্তি ত', শিক্ষা ২৪১ পৃ.; 'যে নামে', 'আলাপসালাপ, ও 'খোলা' অর্থে শব্দত্রয় ব্যবহৃত।

অপ্রচলিত অর্থে যেমন প্রচলিত বিরলপ্রচলিত ও অপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় তেমনি নূতন অর্থেও এই-সকল শব্দের প্রয়োগ কম নয়। রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনে আদি থেকে অন্ত্য অবধি এমন অনেক শব্দের অর্থপরিবর্তন ঘটেছে। শব্দের নবার্থ পরিগ্রহ সকল সময়েই আছে। প্রথম দিকের রচনায় একস্থলে কবি সজ্ঞানেই ভ দ্র শব্দ পরিবর্তিত অর্থে ব্যবহার করেছেন।—'অনেক সময় ভদ্র লোকদের (ভদ্র কথা সাধারণ অর্থে যেরূপ ব্যবহৃত) যত ভয় হয় তত কাহাদেরও নয়।' 'করুণা', গল্পগুচ্ছ ২৭।১৬২ পৃ. রচনাকাল: আশ্বিন ১২৮৪ - ভাদ্র ১২৮৫। কিন্তু বলাবাহুল্য সব সময় কবি এমন সজ্ঞানে নূতন অর্থে শব্দপ্রয়োগ করেন নি। নূতন অর্থে ব্যবহৃত কবির শব্দ নিয়ে পাঠক বা পণ্ডিত -মহলে আপত্তি উঠেছে। ফলে কখনো কখনো সেই-সব শব্দের অপসারণ ঘটেছে সম্ভাব্যস্থলে। তবু সর্বত্র বা সকল শব্দের ক্ষেত্রে এই বর্জননীতি অনুসৃত হয় নি। এই পাঠক বা পণ্ডিত -ভীতি কবি শেষের দিকে কাটিয়ে উঠেছিলেন। 'প্র দো ষ' শব্দে নূতন অর্থে প্রয়োগ সম্পর্কে কবির কৈফিয়তই তার লিখিত সাক্ষ্য।—'প্রদোষ শব্দের প্রয়োগ নিয়ে তুমি আমার বক্তব্যটি ঠিক হয়তো বোঝো নি।

'প্রত্যুষ শব্দটি কালব্যঞ্জক— অর্থাৎ, দিন রাত্রির বিশেষ একটি সময়াংশকে বলে প্রত্যুষ। বাংলাভাষায় 'সন্ধ্যা' শব্দটিও তেমনি। আলো-অন্ধকারের সমবায়ে যে একটি সাধারণ ভাবরূপ আছে, যেটা ইংরেজি twilight শব্দে পাওয়া যায়, সাহিত্যে অনেক সময় সেইটেরই বিশেষ প্রয়োজন হয়। প্রদোষ শব্দকে আমি সেই অর্থেই ইচ্ছাপূর্বক ব্যবহার করি।'—গ্রন্থপরিচয় ২২।৫২৯ পৃ.। এ সম্পর্কীয় অপর পত্রের জন্য গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য।

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন মহাশয়ের মুখে শোনা আছে—Visva-Bharati Publishing Department-এর বাংলা বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ করাতে গ্র স্থ ন শব্দটিতে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের আপত্তি ছিল। তৎসত্ত্বেও নূতন অর্থে গ্রন্থন রয়ে গেছে। বে ত স শব্দ বেণু অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে 'আবির্ভাব' কবিতায়।—'এই ক্ষণিকের পাতার কুটিরে / প্রদীপ-আলোকে এসো ধীরে ধীরে, / এই বেতসের বাঁশিতে পড়ুক / তব নয়নের পরসাদ— / ক্ষমা করো যত অপরাধ।'—ক্ষণিকা ৭।৩২৭ পৃ.। এই প্রয়োগ সম্পর্কে রবিরশ্মি দ্বিতীয় খণ্ড থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্‌ধৃত করছি—"বেতস মানে বেত, তাহা নিরেট, তাহাতে বাঁশি হইতে পারে না।…এই কথা কবির গোচর করিলে তিনি আমাকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন— 'কোনো ভালো অভিধান দেখো তো, বেতস বলতে বাঁশও হয় এমন সাক্ষ্য পেয়েছি। কবিতা যখন লিখেছিলেম তখন খাগড়ার কথা ভেবেছি— শরেতে যে ভদ্ররকম বাঁশি হয় তা নয়, কিন্তু ওর মর্মস্থানের ফাঁকটুকুতে নিঃশ্বাস সঞ্চার ক'রে সুর বের করা যায় ব'লে বিশ্বাস করি। কিন্তু যখন দেখা গেল বেতস বলতে শর বোঝায় না এবং অর্থমালার সর্বপ্রান্তে বেণু কথাটা পাওয়া গেল তখন বাগর্থের দ্বন্দ্ব মিটল দেখে নিশ্চিন্ত হয়েছি। তুমি কোন কৃপণ অভিধানের দোহাই দিয়ে আবার বাগড়া তুলতে চাও!"

"ইহার উত্তরে আমি তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম যে— অভিধানে বেতস মানে বেণু বা বাঁশ নাই। না থাকুক। ইহার পরে যত অভিধান রচিত হইবে তাহাতে বেতস মানে বেণু বা বাঁশ লিখিতে হইবে।…" কোনো কোনো সংস্কৃত অভিধানে বেতসের অর্থ নলই আছে। বেণুর অর্থও নল পাওয়া যায়। শব্দার্থের এই কচকচির কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।— 'কালিদাসের মতো কবির কাব্যেও শাব্দিক ত্রুটি ধরা পড়েছে। কিন্তু ভাবিক ত্রুটি নয় ব'লেই তার সংশোধনও হয় নি, মার্জনাও হয়েছে। য়ুরোপীয় সাহিত্যে এবং চিত্রকলায় এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বৈষ্ণব-পুরাণে কথিত আছে, রাধিকার ঘটে ছিদ্র ছিল, কিন্তু নিন্দুকেরাও সেটা লক্ষ্য করলে না যখন দেখা গেল তৎসত্ত্বেও জল আনা হয়েছে।'— গ্রন্থপরিচয় ২২।৫২৯ পৃ.। এই রকম আরও অনেক দৃষ্টান্ত যাঁরা রবীন্দ্রনাথের সাহচর্যে এসেছিলেন তাঁদের জানা থাকা সম্ভব।

বিষাণ অর্থে পি না ক শব্দ রবীন্দ্ররচনায় প্রযুক্ত আছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পিনাক শব্দের পরিবর্তে বিষাণ শব্দ প্রতিষ্ঠিত হলেও সর্বত্র এই পরিবর্তনসাধন সম্ভব হয় নি। যে-সব ক্ষেত্রে বর্জিত হয়েছে তার দু-একটি দৃষ্টান্ত: 'পিনাকেতে পুরিলা নিশ্বাস', প্রভাতসঙ্গীত (১৮০৫)। 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়' কবিতার 'প্রলয়' অংশ। বর্তমানে 'বিষাণেতে পুরিলা নিশ্বাস', প্রভাতসঙ্গীত ১।৯১পৃ.। 'মুখে তুলি পিনাক করাল'— বৈশাখ, 'কল্পনা' (বৈশাখ ১৩০৭)। কিন্তু 'মুখে তুলি বিষাণ ভয়াল'— কল্পনা ৭।১৯৬ পৃ.।

পিনাক শব্দের এরূপ অর্থান্তর গ্রহণের অন্যতম কারণ বাদ্যযন্ত্র অর্থে এটি বৈষ্ণবপদাবলীতে আছে। বস্তুত অর্থটি প্রাচীন। Monier Williams 'a kind of stringed instrument' অর্থ দিয়েছেন পিনাক শব্দটির।

পিনাক শব্দের জ্ঞানেন্দ্রমোহন এরূপ অর্থনির্দেশ করেছেন:

'কোদণ্ডাকৃতি বাদ্যযন্ত্র ইহা মহাদেব যুদ্ধকালে ধনু এবং আনন্দসময়ে বাদ্যযন্ত্ররূপে ব্যবহার করিতেন।'— এই বিবৃতি যথার্থ হলে বিষাণ অর্থে পিনাক শব্দের রবীন্দ্রপ্রয়োগের বিপক্ষে কিছুই বলার নেই।

রবীন্দ্ররচনায় যে-সব স্থলে পিনাক শব্দ বর্জিত হয় নি তার দৃষ্টান্ত:

'আমার এই ক্ষীণহস্তে কি ভৈরবের সেই পিনাক আছে। প্রবন্ধ লিখিয়া আমি ভারতবর্ষ একাকার করিব।' আত্মশক্তি ৩।৫৫৭ পৃ.; 'পিনাক বাজিয়া উঠে, বিধিবিহিত যজ্ঞ নষ্ট হইয়া যায়'। বিচিত্র প্রবন্ধ ৫।৪৪৬ পৃ.; 'প্রলয় পিনাকের স্থলে সেখানে বাঁশির ধ্বনি'। পরিচয় ১৮।৪৪৬ পৃ.; 'মহেশ্বর যখন তাঁর পিনাকে রুদ্রনিশ্বাস ভরেছেন তখন মাকে কেঁদে বলতে হয়েছে 'যাও'।' শান্তিনিকেতন ১৬।৫০৩ পৃ.; প্রলয়পিনাক তুলি করে ধরিলেন শূলী…' সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, প্রভাতসঙ্গীত— সঞ্চয়িতা ৭ পৃ.। রচনাবলীতে প্রলয়পিনাক স্থলে প্রলয়বিষাণ করা হয়েছে।

প্রচলিত কয়েকটি শব্দের নূতন অর্থে প্রয়োগের দৃষ্টান্ত উদ্ধার করছি:

উ প ক ণ্ঠ। কণ্ঠসমীপ প্রচলিত অর্থ। রবীন্দ্রপ্রয়োগ আকণ্ঠ অর্থে: 'মুহূর্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা / উপকণ্ঠ ভরি…' কথা ৭।১৮৭ পৃ.

উ ষ সী। সন্ধ্যাকাল। কিন্তু উষা অর্থে রবীন্দ্রপ্রয়োগ: 'স্বর্গের উদয়াচলে মূর্তিমতী তুমি হে উষসী…' চিত্রা ৪।৮৩ পৃ.

কা কু ধ্ব নি। রবীন্দ্রপ্রয়োগে 'ক্যাচ্‌ক্যাচ্‌ আওয়াজ'। 'বুড়ো নিমগাছের তলায় ইঁদারা / গোরু

দিয়ে জল টেনে টেনে তোলে মালী, / তার কাকুধ্বনিতে মধ্যাহ্ন সকরুণ।' পুনশ্চ ১৬।৩৮ পৃ.। তুলনীয়— 'কখনো গাজিপুরের বৃদ্ধ নিমগাছের তলায় বসে ইঁদারার জলে বাগান সেঁচ দেবার করুণধ্বনি শুনতে শুনতে···।' রচনাবলী ১।অবতরণিকা ১।৵০; 'অদূরে ইঁদারা থেকে যন্ত্রযোগে গোরুদের জল তোলবার সকরুণ কঁ্যা কোঁ শব্দ শুনতে পেতুম।' ছিন্নপত্রাবলী ৪০১ পৃ.

খ ণ্ডি তা। নায়িকাভেদ। রবীন্দ্রপ্রয়োগার্থ 'অংশীভূতা'। 'একে তপোবনের বাহিরে তাহাতে খণ্ডিতা শকুন্তলা, চেনা কঠিন হইতে পারে।' প্রাচীন সাহিত্য ৫।৫৫২ পৃ.

পা ণি পী ড় ন। বিবাহ। পাণির দ্বারা পীড়ন, করাঘাত। 'আর ওর মুষ্টিযোগ ছিল অমোঘ, সহপাঠীরা যারা কদাচিৎ এর পাণিপীড়ন সহ্য করেছে তারা একে শত হস্ত দূরে বর্জনীয় ব'লে গণ্য করত।' গল্পগুচ্ছ ২৫।২২৩ পৃ.— এই উদ্ধৃতিতে মু ষ্টি যো গ শব্দও 'মুষ্ট্যাঘাত' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অথচ শব্দটির প্রচলিত অর্থ 'টোট্‌কা ওষুধ'।

ব লা কা। স্ত্রীবক। রবীন্দ্রার্থ বকের শ্রেণী, শ্রেণী, হাঁসের পাঁতি। 'কদম্ব ফুটিবে, জম্বুকুঞ্জ ভরিয়া উঠিবে, বলাকা উড়িয়া চলিবে, ভরা নদীর জল ছল্‌ ছল্‌ করিয়া তাহার কূলের বেত্রবনে আসিয়া ঠেকিবে এবং জনপদবধূর ভ্রূবিলাসহীন প্রীতিস্নিগ্ধ লোচনের দৃষ্টিপাতে আষাঢ়ের আকাশ যেন আরও জুড়াইয়া যাইবে।' সাহিত্য ৮।৩৬৭ পৃ.; 'যে পথ বাহি বলাকা যায় ফিরে / সৈকতিনী নদীর তীরে তীরে'। নটরাজ ১৮।২২৩ পৃ.; 'সমুৎসুক বলাকার ডানার আনন্দ চঞ্চলতা / তারি সাথে উড়ে চলে বিরহীর আগ্রহবারতা / চিরদূর স্বর্গপুরে,'। সানাই ২৪।১০৪ পৃ.; বসন্তে কোকিল ডালপালার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থেকে বনচ্ছায়াকে সকরুণ করে তোলে— আর বর্ষায় বলাকাই বল, হংসশ্রেণী বল, উধাও হয়ে মুক্ত পথে চলে শূন্যে— কৈলাসশিখর থেকে বেরিয়ে পড়ে অকূল সমুদ্রতটের দিকে।' শ্রাবণগাথা ২৫।১১০পৃ.; 'রবি ঐ অস্তে নামে শৈলতলে, / বলাকা কোন্‌ গগনে উড়ে চলে'। গীতবিতান ১।১১ পৃ.; 'স্বপনবলাকা মেলেছে ওই পাখা, / আমায় বেঁধেছে কে সোনার পিঞ্জরে ঘরে।' গীতবিতান ২।৩৫৬ পৃ.; 'এই চঞ্চল সজল পবন-বেগে উদ্‌ভ্রান্ত মেঘে মন চায় / মন চায় ওই বলাকার পথখানি নিতে চিনে।' গীতবিতান ৪৭৭ পৃ.। তু. বকের পাঁতি— শ্রাবণগাথা ২৫।১১৭ পৃ.; বকপাঁতি— গীতবিতান ২।৩৮২ পৃ.। 'শ্রেণী' অর্থে প্রয়োগের উদাহরণ।

'রাজহংসদল / আকাশে বলাকা বাঁধি সত্বর-চঞ্চল / ত্যজি কোন্‌ দূর সৈকত-বিহার / উড়িয়া চলিতেছিল গলিত-নীহার / কৈলাসের পানে।' চিত্রা ৪।৯৭ পৃ.; 'হে হংসবলাকা', বলাকা ১২।৫৮ পৃ.; 'সন্ধেবেলায় বন্ধ আসা-যাওয়া, / হাঁস-বলাকার পাখার ঘায়ে চমকেছিল হাওয়া।' সেঁজুতি ২২।৪৬ পৃ., 'মন মোর হংস-বলাকার পাখায় যায় উড়ে / কচিত কচিত চকিত তড়িত-আলোকে।' গীতবিতান ২।৪৭৩ পৃ.; 'আমার গানে হংসবলাকাপাঁতি / বাদলদিনের তোমার মনের সাথি।' গীতবিতান ৪৭৫ পৃ.। 'হাঁসের দল' অর্থে প্রয়োগ: 'কেন তোর সপ্তস্বর সপ্তস্বর্গ পানে / ছুটিয়া গেল না ঊর্ধ্বে উদ্দাম পরানে / বসন্তে মানস যাত্রী বলাকার মতো।' উৎসর্গ ১০।৮৬ পৃ.; বলাকা ১২।১ পৃ. কাব্যের নাম; মাটির আঁধার-নীচে কে জানে ঠিকানা / মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা / লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।' বলাকা ১২।৫৯ পৃ.।

বা লু চ র। বালুকাময় চর। রবীন্দ্রপ্রয়োগে 'বালুতে চরে যে।' 'আমি কতখানি একা মাসের পর মাস বুনো হাঁসের পাড়ায় জীবনযাপন করেছি। এই বালুচরদের সঙ্গে জীবনযাপনকালে প্রকৃতির

যা-কিছু দান তা আমি যতই অঞ্জলি ভরে গ্রহণ করেছি ততই আমি পেয়েছি, আমার চিত্ত ভরপুর হয়ে গেছে।' বিশ্বভারতী ২৭।৩৮১ পৃ.।

বি মা ন। দেবরথ। রবীন্দ্রপ্রয়োগে 'আকাশ'। 'যাক্ তবে, যাক্ চ'লে— যে যায় যেখানে— শুকপাখী উড়ে যাক্ সুদূর বিমানে!' বনফুল, অচলিত সংগ্রহ ১।১১১ পৃ.— 'আধুনিক বঙ্গীয় কবিগণ আকাশার্থে বিমান শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন।'— জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

অপ্রচলিত শব্দের রবীন্দ্রপ্রয়োগে নবার্থগ্রহণের উদাহরণ। অ নু ভা ব রঘুবংশে তেজ, মহিমা অর্থে প্রয়োগ আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অনুভব অর্থে ব্যবহার করেছেন। অনেক সময়ই ইংরাজি emotion, feeling শব্দ দুটির সঙ্গে একার্থক। 'এইজন্য আমাদের অধিকাংশ অনুভাব কাজ করিবার জন্য ব্যাকুল', আলোচনা, অচলিত সংগ্রহ ২।৪১ পৃ.; 'মনের মধ্যে যখন একটা বেগবান অনুভাবের উদয় হয় তখন কবিরা তাহা গীতিকাব্যে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন না।' সমালোচনা, অচলিত সংগ্রহ ২।৭৭ পৃ.; 'তুমি আমার অনুভাবে / কোথাও নাহি বাধা পাবে, / পূর্ণ একা দেবে দেখা / সরিয়ে দিয়ে মায়াকে।' গীতাঞ্জলি ১১।১১১ পৃ.; 'সকল প্রকার কথোপকথনে দুইটি উপকরণ বিদ্যমান। কথা, ও যে ধরনে সেই কথা উচ্চারিত হয়, কথা ভাবের চিহ্ন (signs of ideas), আর ধরন অনুভাবের চিহ্ন (signs of feeling)। রবীন্দ্র-রচনাবলী (পশ্চিমবঙ্গ সরকার) ১৪।৮৮৩ পৃ.।

বি লো চ ন। বিকৃতচক্ষু। রবীন্দ্রার্থ শিব। 'বস্তুতই তখনকার অন্যান্য আর্যদেবতার সহিত এই বিলোচনের অত্যন্ত প্রভেদ।' সাহিত্য ৮।৪৩৪ পৃ.; 'যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন / ওগো মরণ, হে মোর মরণ,'। উৎসর্গ ১০।৭২ পৃ.।

সম্পূর্ণ অপ্রচলিত শব্দও নূতন অর্থে রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় প্রয়োগ করেছেন। এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদাহৃত হল :

অ ভু গ্ন। ঋজু। রবীন্দ্রার্থ অভুক্ত, অনশনক্লিষ্ট। 'বিশীর্ণ গোলকচাঁপা-গাছে / পাতাশূন্য ডাল / অভুগ্নের ক্লিষ্ট ইশারার মতো।' আকাশপ্রদীপ ২৩।৮১ পৃ.; তুলনীয়— 'ফুলের অর্ঘ্য আকাশের দিকে তুলে ধরে দাঁড়িয়ে আছে পাতাহীন গোলকচাঁপার আঁকাবাঁকা ডালের গাছ', পথে ও পথের প্রান্তে ১২৬ পৃ.; 'বলি-পড়া বাকলওয়ালা বিদেশী ঐ গাছে / গন্ধবিহীন মুকুল ধরে আছে / আঁকাবাঁকা ডালের ডগা ধূসর রঙে ছেয়ে—' প্রহাসিনী ২৩।৩৬ পৃ.।

ক্র ন্দ সী। দ্যাবাপৃথিবী, ক্রন্দনরতা মানুষী ও দৈবী সেনা। র[১]-১. স্বর্গমর্ত্য। 'ওই শুন দিশে দিকে তোমা লাগি কাঁদিছে ক্রন্দসী— / হে নিষ্ঠুরা বধিরা উর্বশী।' চিত্রা ৪।৮৪ পৃ.; ২. আকাশ। 'ক্রন্দসী কাঁদিয়া ওঠে বহ্নিভরা মেঘে'। বলাকা ১২।২০ পৃ., 'যে প্রার্থনার যুগযুগান্তরব্যাপী ক্রন্দন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে বেদে এই অন্তরীক্ষকে ক্রন্দসী রোদসী বলেছে', শান্তিনিকেতন ১৪।৩৮৬ পৃ.।

চ ণ্ডা লি কা। চণ্ডালবীণা। র[১]-চণ্ডালের মেয়ে। রচনাবলী ২৩।১৩৩ পৃ., কাব্যের নাম। নরদেব। রাজা। নরশ্রেষ্ঠ। 'যার লাগি নরদেব চিররাত্রিদিন / তপোমগ্ন', নমস্কার— সঞ্চয়িতা ৪৫২ পৃ.।

রু দ্র বী ণা। বীণাভেদ। র[১]-রুদ্রের বীণা। 'হে রুদ্রবীণা, বাজো, বাজো, বাজো', গীতাঞ্জলি ১১।৮২ পৃ.; 'হে বিধাতা, আমারে রেখো না বাক্যহীনা, / রক্তে মোর জাগে রুদ্রবীণা।' মহুয়া ১৫।৪২ পৃ.;

১ র—রবীন্দ্রার্থ

'ভৈরব, তুমি কী বেশে এসেছ, / ললাটে ফুঁসিছে নাগিনী ; / রুদ্রবীণায় এই কি বাজিল / সুপ্রভাতের রাগিণী।' সুপ্রভাত— সঞ্চয়িতা ৪৫৫ পৃ.।

সং শ্র ব। অঙ্গীকার। র[১]-সংস্পর্শ। 'এই বিদেশী রাজাদের কীর্তিকাহিনীর সংশ্রবে মারাঠা ও শিখের যেটুকু আমাদের ছাত্ররা পড়িতে পায় তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর', ইতিহাস ৫৮ পৃ. ; 'আমার মনে হয় যেন তোমার ওঘরের সঙ্গে কলকাতার Municipality-র কোন সংশ্রব নেই।' চিঠিপত্র ৮।১৮ পৃ. ; 'এ সম্বন্ধে আমাদের কোন প্রকার সংশ্রব না থাকলেই হল।' চিঠিপত্র ৮।২২৪ পৃ.।— সম্পর্ক, যোগ অর্থে সংশ্রব শব্দের ব্যবহার কবে থেকে বলা দুষ্কর। সংস্কৃত অভিধানে— শব্দকল্পদ্রুম, আপ্তে, মনিয়েরে— 'সংশ্রব' নেই, 'সংশ্রব' আছে। এটির অর্থ অঙ্গীকার। সম্পর্ক অর্থে 'সংশ্রব' রামকমল বিদ্যালংকারের সচিত্র প্রকৃতিবাদ অভিধানে (প্রকাশকাল সংবৎ ১৯২৩) আছে।

সৈ ক তি নী। সৈকতবান। র[১]-নদী। 'দেখেছি অম্লান তীরে তীব্র রৌদ্রদাহে / শুষ্কশীর্ণ দৈন্য দিনে বহি যায় অক্লান্ত প্রবাহে সৈকতিনী', বনবাণী ১৫।১৫০ পৃ. ; 'আমি যখন এসেছি আমাদের পরিবারে তখন আমাদের অর্থসম্বল হয়ে এসেছে রিক্তজলা সৈকতিনী।' পল্লীপ্রকৃতি ২৭।৫৯৭ পৃ.।

ইংরাজির অনুবাদ সূত্রেও এই অর্থপরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। যেমন—

ক ণ্ঠ। মতামত অর্থে voice-এর অনুবাদ 'যত প্রকার অনুষ্ঠানের কোলাহল আছে, সমুদয়ের মধ্যে তাহাদের কণ্ঠ আছে,'। য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র ১।৫৪২ পৃ.।

জ ল য ন্ত্র। ফোয়ারা। অনু. watermill। 'নদী চলেছে ছুটে, জলযন্ত্রের চাকা আঁধারকে মারছে চাপড়।' পুনশ্চ ১৬।৯৬ পৃ.। তু. 'With a running stream and a watermill beating the darkness', Journey of the Magi.

দ্বৈ পা য় ন। ব্যাসদেব। র[১]-অনু. Islander। 'আমাদের দেশের বিক্রমশালী বাগ্মী, যাঁহারা বিলাতী সিংহনাদে শ্বেত দ্বৈপায়নগণের চিত্তেও সহসা বিভ্রম উৎপাদন করিতে পারেন'। রাজাপ্রজা ১০।৪২৪ পৃ. ; 'দ্বৈপায়ন পণ্ডিতের দল ঘাসের থেকে সবুজ সার বের করে নিয়ে সূর্যের বেগনি-পেরোনো আলোয় শুকিয়ে মুঠো মুঠো নাকে ঠুসছেন।' সে ২৬।১৯১ পৃ. ; 'ও অঞ্চলের শ্বেত দ্বৈপায়নেরাও বিস্ময়-বিমুগ্ধ।' চিঠিপত্র ৯।৩১৪ পৃ.।

ধ র্ম। প্রচলিত অর্থ religion-এর সমার্থক ; কিন্তু এক স্থলে রবীন্দ্রনাথ culture অর্থে প্রয়োগ করেছেন।— 'আমাদের দেশে সমাজের মূলপ্রকৃতি সাম্প্রদায়িক অর্থাৎ শ্রেণীবিশেষের আচারধারাকে রক্ষা করার দ্বারা তার ধর্মকে (culture) বিশুদ্ধ রাখার ব্যবস্থাতন্ত্র।' রবীন্দ্র-রচনাবলী (পশ্চিমবঙ্গ সরকার) ১৩।১১ পৃ.।

বা গ্ দ ত্তা। যে কন্যা সম্প্রদান করার জন্য পাত্রপক্ষীয় কাউকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। যে কাউকে কথা দিয়েছে এই অর্থে engaged শব্দটির অনুবাদ। 'আপনি কি অমুক নৃত্যে বাগ্দত্তা হয়ে আছেন?' য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র ১।৫৪৬ পৃ.।

শি ঙে। শৃঙ্গ বা ধাতুনির্মিত সুষির বাদ্য যন্ত্র। অনু. whistle, horn। 'শিঙে বাজিয়ে রেলগাড়ি...' বিশ্বপরিচয় ২৫।৩৭৯ পৃ. ; 'মোটর গাড়িটার শিঙের...' সে ২৬।২১১ পৃ.।

---

১. র—রবীন্দ্রার্থ

• সা র থি। রথচালক। অনু. Pilot, Coachman। 'বায়ুরথের সারথি…' অনুবাদচর্চা, অচলিত-সংগ্রহ ২।৫৫৩ পৃ.; 'সারথির সঙ্গে গাড়িঘোড়ার এমন অসামঞ্জস্য…' য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র ১।৫৩৮ পৃ.।

সে ব ক। ভৃত্য। অনু. Steward। 'আমাদের যে ষ্টুঅর্ড (যাত্রীদের সেবক)—' য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র ১।৫৩২ পৃ.।

প্রচলিত শব্দের মতো বিরলদৃষ্ট শব্দের ক্ষেত্রে অনুবাদের কারণে অর্থান্তর ঘটেছে।

উ ত্ত র কা ল। ভাবীকাল। অনু. Posterity। 'পস্টারিটি অর্থাৎ কোনো একটি অনির্দিষ্ট উত্তরকাল…' শিক্ষা ১২।২৯৭ পৃ.।

ব্যো ম যা ন। দেবরথ। অনু. Aeroplane। 'ব্যোমযানে চ'ড়ে…' গ্রন্থপরিচয় ১৬।৫১৩ পৃ.।
এই একই কারণে বহু অপ্রচলিত শব্দও অর্থান্তর পরিগ্রহ করেছে। যেমন—

অ প্সু দী ক্ষা। Monierএ অর্থ consecration in water। রবীন্দ্রপ্রয়োগ baptism অর্থে। 'অপ্সুদীক্ষা বা ব্যাপ্‌টিজ্‌ম্ হবার পূর্বে কোনো শিশুর মৃত্যু হলে যে সাম্প্রদায়িক শাস্ত্রমতে তার অনন্ত নরকবাস বিহিত হতে পারে সেই শাস্ত্রমতে দেবচরিত্রে যে অপরিসীম নির্দয়তার আরোপ করা হয় তার তুলনা কোথায় আছে।' মানুষের ধর্ম ২০।৩৯৮ পৃ.।

ঔ প দে শি ক। শিক্ষা-উপজীবী। অনু. didactive। 'আপনি কোনো রকম ঐতিহাসিক বা ঔপদেশিক বিড়ম্বনায় যাবেন না…' ছিন্নপত্র ১৫ পৃ.।

ক্রী ড়া শৈ ল। বিহারশৈল। অনু. miniature hill। 'গুণদাদার বাগানের ক্রীড়াশৈল হইতে পাথর চুরি করিয়া আনিয়া আমাদের পড়িবার ঘরের এককোণে আমরা নকল পাহাড় তৈরি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম'— জীবনস্মৃতি ১৭।২৭৫ পৃ.।

প্র তি ষ্ঠা ন। অবস্থান। অনু. institution। 'প্রতিষ্ঠান কথাটা আমাকে বানাইতে হইল। ইংরেজি কথাটা institution। ইহার কোনো বাংলা প্রচলিত প্রতিশব্দ পাইলাম না। যে প্রথা কোনো একটা বিশেষ ব্যবস্থাকে অবলম্বন করিয়া দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া যায়, তাহাকে প্রতিষ্ঠান বলিতে দোষ দেখি না। Ceremony শব্দের বাংলা অনুষ্ঠান এবং institution শব্দের বাংলা প্রতিষ্ঠান করা যাইতে পারে।' শব্দতত্ত্ব ১২।৫৮৪ পৃ.। বস্তুত শব্দটি প্রাচীন।

প্রা য়ো প বে শ ন। মরণার্থ অনশনে অবস্থান। অনু. hungerstrike। 'ইন্দু। হাঁ গো, তার হৃদয় তো পাষাণ নয়, সে যে বড়ো কোমল, কী জানি, আজ থেকে যদি হাঙ্গারস্ট্রাইক্ শুরু করে?/ ক্ষান্তমণি। সে আবার কী।/ ইন্দু। যাকে সংস্কৃত ভাষার বলে প্রায়োপবেশন।' শেষরক্ষা ১৯।১৫১ পৃ.।

প্রৈ তি। প্রকৃষ্টরূপে এতি যায়। ধাতুরূপ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এটিকে বিশেষ্যরূপে energy ও impulseএর প্রতিশব্দ ধরেছেন। 'কেন প্রাণ: প্রথম: প্রৈতিযুক্ত:? প্রাণ কাহার দ্বারা তার প্রথম প্রৈতি (energy) লাভ করেছে?' শান্তিনিকেতন ১৪।৪২৫ পৃ.; 'ভারতবর্ষ সভ্যতার যে প্রৈতি (energy) লাভ করেছিল…' শান্তিনিকেতন ১৪।৪৫৮ পৃ.; 'যেখানে বেগপ্রাপ্তি বুঝাইতে ইংরেজিতে impulse শব্দের ব্যবহার হয় আমাদের বিবেচনায় বাংলায় সেইস্থলে প্রৈতি শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে।' গ্রন্থপরিচয় ১২।৬৩৯ পৃ.; 'সেই প্রৈতি সেই বেগ থামতে চায় না,…' বনবাণী ১৫।১১৪ পৃ.; 'সেই প্রথম প্রাণ প্রৈতির…'। বনবাণী; 'প্রথম-প্রৈতির…'। বনবাণী।

বৈ দ্যু ত। শব্দটি বিশেষণ। অর্থ বিদ্যুৎ সম্বন্ধীয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ electricityর প্রতিশব্দ ও বিশেষ্যরূপে ব্যবহার করেছেন। 'ইলেক্‌ট্রিসিটি শব্দটাকে আমরা বাংলায় বলব বৈদ্যুত।' বিশ্বপরিচয় ২৫।৩৬২ পৃ.; 'একই মুহূর্তে বৈদ্যুত দ্বারা এই সমস্ত কামান ছোঁড়া যাইত।' অনুবাদচর্চা, অচলিত-সংগ্রহ ২।৫৪৬ পৃ.; 'টিকিটা যে রাখা, ওতে আছে ঢাকা / ম্যাগ্নেটিজ্‌ম্ শক্তি— / তিলকরেখায় বৈদ্যুত ধায়, / তাই জেগে ওঠে ভক্তি।'— কল্পনা ৭।১৭৭ পৃ.।

রবীন্দ্ররচনায় রূপান্তরিত শব্দ

অর্থ, ভাব, প্রসঙ্গ, বৈচিত্র্যসাধন প্রভৃতি স্থূল প্রয়োজন ব্যতীত ছন্দ, অনুপ্রাস ও অন্ত্যমিলের কারণে রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় গদ্য ও পদ্যে শব্দের রূপান্তরসাধন করেছেন।

এই রূপান্তরিত শব্দগুলির এইভাবে শ্রেণীবিভাগ করা যেতে পারে: প্রচলিত শব্দের সংক্ষিপ্ত বা কাটছাঁট রূপ, প্রচলিত শব্দের বিকল্প রূপ, প্রচলিত শব্দের সমার্থক শব্দ ও 'সংস্কৃতায়িত' শব্দ (গ্রন্থপরিচয় ৩।৬৪৫ পৃ.)।

ছন্দের খাতিরে, কখনো অন্ত্যমিল ও বৈচিত্র্যসাধনের কারণে রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ প্রয়োগ করেছেন অনেক ক্ষেত্রে। যেমন অন্ত্যমিলের জন্য ব্যবহৃত দেশান্ত, পোমাটো, বনান্ত, বৈতালি ও মৃত্তি।

দে শা ন্ত < দে শা ন্ত র:

ওগো সেই সুগন্ধে ফিরায় উদাসিয়া
আমায় দেশে দেশান্তে।
যেন সন্ধানে তার উঠে নিশ্বাসিয়া
ভুবন নবীন বসন্তে।—গীতিমাল্য ১১।১৪৮ পৃ.

পো মা টো < P o m a t u m: চোখ দুটো রাঙা যেন টোমাটো,
আলুথালু চুলে নাই পোমাটো।—প্রহাসিনী ২৩।৬৬ পৃ.

ব না ন্ত < ব না ন্ত র:

আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে
তখন কে তুমি তা কে জানত।…
হেসে তোমার সাথে ফিরেছিলেম ছুটে
সেদিন কত না বন-বনান্ত।—গীতাঞ্জলি ১১।৫৬ পৃ.

বৈ তা লি < বৈ তা লি ক:

কেটে গেছে বেলা শুধু চেয়ে-থাকা মধুর মৈতালিতে,
নীল আকাশের তলায় ওদের সবুজ বৈতালিতে।—সেঁজুতি ২২।৩৩ পৃ.

মৃ ত্তি < মৃ ত্তি কা:

শিকড়ের মুষ্টি দিয়া আঁকড়িয়া যে-বক্ষ পৃথ্বীর
প্রাণরস কর তুমি পান,
ওগো আম্রবন,
সেথা আমি গেঁথে আছি দুর্দিনের কুটির মৃত্তির।—বনবাণী ১৫।১২৪পৃ.

অন্ত্যমিল ছাড়া অন্য কারণে ব্যবহৃত সংক্ষিপ্ত শব্দ :

অচেত<অচেতন :
জ্বালো তব দীপ এ অন্তর তিমিরে,
বার বার ডাকো মম অচেত চিতে।—গীতবিতান ১।১২০ পৃ.

অনাবশ্য<অনাবশ্যক :
অসম্ভব, আশাতীত,
অনাবশ্য, অনাদৃত,
এনে দাও অযাচিত
যতকিছু অনাসৃষ্টি।—চিত্রা ৪।৭১ পৃ.

অহেতু<অহেতুক :
অকস্মাৎ কোমলের কমলমালার স্পর্শ লেগে
শান্তের চিত্তের প্রান্ত অহেতু উদ্‌বেগে
ভ্রূকুটিয়া ওঠে কালো মেঘে ;—নটরাজ ১৮।২০৮ পৃ.

উত্তরী<উত্তরীয় :
সুরের বিচিত্র বর্ণে আপনার দৃশ্যহীন তনু
রঞ্জিত করিয়া নিল, অঙ্কিল গানের ইন্দ্রধনু
উত্তরীয় প্রান্তে প্রান্তে। —বনবাণী ১৫।১১৬ পৃ.
বাঁশরি বাজাই ললিত-বসন্তে, সুদূর দিগন্তে
সোনার আভায় কাঁপে তব উত্তরী
গানের তানের সে উন্মাদনে॥—গীতবিতান ২।৩৬০ পৃ.

জাজ্বল্য<জাজ্বল্যমান :
আশীর্বাদ করো মোরে
যে-বিদ্যা শিখিনু তাহা চিরদিন ধরে
অন্তরে জাজ্বল্য থাকে উজ্জ্বল রতন।—বিদায় অভিশাপ ৪।১২৩ পৃ.

আমরা আমাদের হৃদয়াবেগ অতি জাজ্বল্যরূপে ও সম্পূর্ণরূপে অন্যের হৃদয়ে মুদ্রিত করিতে পারিব। —রবীন্দ্র-রচনাবলী (পশ্চিমবঙ্গ সরকার) ১৪।৮৮৪ পৃ.

দোদুল্য<দোদুল্যমান :
ঐ দেখো ভরা খেতে
পাকা ফসলের দোদুল্য অঞ্চলে
নিঃশেষে তার সোনার অর্ঘ্য রেখে গেছে ধরাতলে।—সেঁজুতি ২২।৫৫ পৃ.

নিমীল<নিমীলিত :
তুমি ঘুমাইছ নিমীল নয়নে,
কাঁপিয়া উঠিছ বিরহস্বপনে।—কল্পনা ৭।১৬০ পৃ.

নিরন্ত<নিরন্তর :
নাই সময়ের পদধ্বনি—
নিরন্ত মুহূর্ত স্থির, দণ্ড পল কিছুই না গণি।—বীথিকা ১৯।১৩ পৃ.
সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছে অপার তিমির-তেপান্তরে
অসংখ্য নক্ষত্র হতে রশ্মিপ্লাবী নিরন্ত নির্ঝরে
সর্বত্যাগী অপব্যয়, —নবজাতক ২৪।১৩ পৃ.

পিপীলি<পিপীলিকা :

মধুপাত্রে হতপ্রাণ পিপীলির মতো
ভোগসুখে জীর্ণ হয়ে থাকা,
ঝুলে থাকা বাদুড়ের মতো শির নত
আঁকড়িয়া সংসারের শাখা।—কড়ি ও কোমল ২।৫৮ পৃ.

পৈশাচী<পৈশাচিক :

নারীর শিশুর যত কাটা-ছেঁড়া অঙ্গ
জাগাবে অট্টহাসে পৈশাচী রঙ্গ, —নবজাতক ২৪।১২ পৃ.

বিভীষা<বিভীষিকা :

ভয়মোচনের মন্ত্রে
আপনারে দিতেছিল বিভীষার প্রচণ্ড মহিমা
তাণ্ডবের দুন্দুভি বাজায়ে।—গ্রন্থপরিচয় ২০।৪৩৪ পৃ.

'পত্রপুট' গ্রন্থের ষোলো সংখ্যক কবিতার পাঠে 'বিভীষিকা' আছে।

ভবিষ্য<ভবিষ্যৎ :

রুদ্ধ অগ্নিতেজের উচ্ছ্বাস
উদ্‌ঘাটন করি দিল ভবিষ্যের ইতিহাস।—বীথিকা ১৯।৬০ পৃ.

চিরধাবমান নিখিলবিশ্ব,
এ পলায়নের বিপুল দৃশ্য,
এই পলায়নে ভূত ভবিষ্য
দীক্ষিছে ধরণীরে।—সেঁজুতি ২২।৩৫ পৃ.

দীর্ঘপথের শেষ গিরিশিরে
উঠে গেছে আজ কবি
সেথা হতে তার ভূতভবিষ্য
সব দেখে যেন ছবি।—আকাশপ্রদীপ ২৩।৯৪ পৃ.

নির্মম ভবিষ্য, জানি, অতর্কিতে দস্যুবৃত্তি করে
কীর্তির সঞ্চয়ে— —রোগশয্যায় ২৫।৫ পৃ.

মরীচি<মরীচিকা :

পাহাড়ি লয়ে কয়েক শত
পাহাড়ে বনে ফিরিতে রত
মরুভূমির মরীচি-মতো
স্বাধীন ছিল রাজপুত।—কথা ৭।৫৯ পৃ.

সম্পদসমারোহ
গগনে গগনে ব্যাপিয়া চলেছে
স্বর্ণমরীচিমোহ।—পরিশেষ ১৫।২৪৬ পৃ.

যবনি<যবনিকা :

ধরণীর অন্তঃপুরে
রবিরশ্মি নামে যবে, তৃণে তৃণে অঙ্কুরে অঙ্কুরে

যে-নিঃশব্দ হুলুধ্বনি দূরে দূরে যায় বিস্তারিয়া
ধূসর যবনি-অন্তরালে, —পরিশেষ ১৫।১৬১ পৃ.

লে লি হ<লে লি হা ন : মসৃণ চিক্কণ কৃষ্ণ কুটিল নিষ্ঠুর,
লোলুপ লেলিহজিহ্ব সর্পসম ক্রূর •
খল জল ছলভরা, —কাহিনী ৭।১০৩ পৃ.
ও কি কোনো অনাদি ক্ষুধার লেলিহ লোল জিহ্বা।—পুনশ্চ ১৬।১২৫ পৃ.

লোকলোকান্ত<লোকলোকান্তর: অসীম জগতে মোরা কে কোথায় থাকি,
মাঝে লোকলোকান্তের ব্যবধান পড়ে।—প্রকৃতির প্রতিশোধ ১।১৯২ পৃ.
তোমায় আমায় যত দিনের মেলা
লোকলোকান্তে যতকালের খেলা··· —উৎসর্গ ১০।৫০ পৃ.

শ্রু তি ম ধু<শ্রু তি ম ধু র : কত শ্রুতিমধু নাম কত দেশ কত গ্রাম
দেখে যাই চাহিয়া চাহিয়া।—সোনার তরী ৩।২৮ পৃ.

প্রচলিত শব্দের বিকল্প রূপও ছন্দের, বৈচিত্র্যের, ও অন্ত্যমিলের কারণে ব্যবহার করেছেন।

উ ত ল<উ ত লা : তাই যে কালো চোখের কোণে
চাউনি তাহার উতল হল অকারণে ;—পলাতক ১৩।৪ পৃ.

হেরিনু রাতে উতল উৎসবে
তরল কলরবে
আলোর নাচ নাচায় চাঁদ সাগরজলে যবে, —মহুয়া ১৫।৪৯ পৃ.

কালো রাতের কালি-ঢালা ভয়ের বিষম বিষে
আকাশ যেন মূর্ছি পড়ে সাগরসাথে মিশে,
উতল ঢেউয়ের দল খেপেছে, না পায় তারা দিশে, —বলাকা ১২।৯ পৃ.

দুবাহু বাড়ায়ে পরান উতল
কবিরে লইলা বুকে।—সোনার তরী ৩।১২৮ পৃ.

উ তা লা<উ ত লা : নিভৃত ঘরে পরাণ-মন
একান্ত উতালা।—সোনার তরী ৩।২২ পৃ.

গোঁ জা মি ল ন<গোঁ জা মি ল : গোঁজামিলন দিয়া না লইলে যেন হিসাব মিলে না।—আলোচনা অচলিত সংগ্রহ—২।১১০ পৃ. ; ওটা দেখতেই বাহাদুরি কিন্তু আসলে দুর্বলতার গোঁজামিলন।—ঘরে-বাইরে ৮।১৫৫ পৃ.

ভুঁ ই ফোঁ ড়া<ভুঁ ই ফোঁ ড় : ভুঁইফোঁড়া তত্ত্ব যেন ভূমিতলে খোঁজে,
মনে যেন বসে গেছে নিরাকার ভোজে।—সোনার তরী ৩।৩২ পৃ.

রাঁধুনে<রাঁধুনী :

হোথায় রান্নাঘর ;
রাঁধুনেরা সার বেঁধেছে পৃথুল-কলেবর।—আকাশপ্রদীপ ২৩।১০৫ পৃ.

লিখক<লেখক :

কিন্তু যমের পত্রলিখককে তো সরানো যায় না।—ফাল্গুনী ১২।৮৮ পৃ.
ভাগিনা তখন পুঁথিলিখকদের তলব করিলেন।—লিপিকা ২৬।১৩২ পৃ.

সার্থবাহী<স্বার্থবাহ :

যখন কেবল আপনার সম্পদের বোঝাটি আপনার মাথায় তুলে নিয়ে গৃহত্যাগী সার্থবাহী সংসারপথ দিয়ে একলা চলে তখনই সন্ধ্যাবেলায় এই শ্বাপদগুলো এক লম্ফে স্কন্ধে এসে পড়বার সুযোগ অন্বেষণ করে।
—সমাজ ১২।২৪৫ পৃ.

স্থগিদ<স্থগিত :

উদ্‌বৃত্ত সময়ের ছোটোবড়ো কাজগুলি সব স্থগিদ আছে।
—চিঠিপত্র ৯।৩৬৯ পৃ.

কাঁচল<কাঁচুলি :

মাজিয়া তনু যতন ক'রে
পরিবে নব বাস।
কাঁচল পরি আঁচল টানি
আঁটিয়া লয়ে কাঁকনখানি
নিপুণ করে রচিয়া বেণী
বাঁধিবে কেশপাশ।—মানসী ২।১৯৫ পৃ.
ময়ূরকণ্ঠী পরেছি কাঁচলখানি
দূর্বাশ্যামল আঁচল বক্ষে টানি, —কল্পনা ৭।১৩৯ পৃ.
কাঁচল যদি শিথিল থাকে
নাইকো তাহে লাজ।—ক্ষণিকা ৭।৩২৩ পৃ.

চড়োয়া<চড়াও :

নিধু বলে আড়চোখে, 'কুছ্ নেই পরোয়া।'···
পুলিস যখন করে ঘরে এসে চড়োয়া।—খাপছাড়া ২১।১২ পৃ.

ডঙ্ক<ডঙ্কা :

উড়িল গগনে বিজয় পতাকা,
ধ্বনিল শতেক শঙ্খ।···
রহিয়া রহিয়া প্রলয়-আরবে
বাজে ভৈরব ডঙ্ক।—কথা ৭।৮৪ পৃ.
বাজিল শঙ্খ, বাজিল ডঙ্ক,
সেনানী ধাইল ক্ষিপ্র।—কথা ৭।৮৬ পৃ.
বক্ষে আমার দুঃখে তব
বাজবে জয়ডঙ্ক।
দেব সকল শক্তি, লব
অভয় তব শঙ্খ।—বলাকা ১২।৮ পৃ.

স্বরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ,
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক, —সভ্যতার সংকট ২৬।৬৪১ পৃ.

ধূম্রকেতু: ধরিব ধূম্রকেতুর পুচ্ছ —চিত্রা ৪।৭৪ পৃ.

প্রধানত বৈচিত্র্যসাধন ও ছন্দের জন্য প্রচলিত শব্দের সমার্থক রূপও রবীন্দ্ররচনায় পাওয়া যায়। কখনো কখনো অন্ত্যমিল সাধনে এরূপ শব্দের প্রয়োগ হয়েছে।

ইন্দুমল্লী (চন্দ্রমল্লী): বিজনে বিরলে
হেথা তব দক্ষিণের বাতায়নতলে
মঞ্জরিত ইন্দুমল্লী বল্লরীবিতানে, —চিত্রা ৪।৭৯ পৃ.

কর্ণকটু (শ্রুতিকটু): হিপ্ হিপ্ হুররে ধ্বনিতে স্বদেশী মান্য ব্যক্তিকে উৎসাহ জানাইয়া থাকি, তখন সেই কর্ণকটু বিজাতীয় বর্বরতায়··· —সাহিত্য ৮।৫০২ পৃ.

শ্রুতিপরুষ (শ্রুতিকটু): শ্রুতিপরুষ অথচ বাৎসল্যগর্ভ উপদেশ শুনিয়া···
—মন্ত্রি-অভিষেক, অচলিতসংগ্রহ ২।১৭৫ পৃ.

কৃপালু (দয়ালু): কেমন করিয়া এক কৃপালু ছাত্র গোপনে একজোড়া জুতা তাঁহার দরজার কাছে রাখিয়া দিল, —চারিত্রপূজা ৪।৫১০ পৃ.

ছাড়চিঠি (ছাড়পত্র): তাঁর আপন হাতের ছাড়-চিঠি সেই যে,
আমার মনের ভিতর রয়েছে এই যে, —মুক্তধারা ১৪।২১৯ পৃ.

দুইমত (দ্বিমত): প্রাচীন গ্রীস রোম এবং আধুনিক সকল সভ্য দেশেই ইতিহাসের প্রতি পক্ষপাত যেরূপ প্রকাশ পাইয়াছে ভারতবর্ষে কখনো তেমন ছিল না। ইহাতে বোধ করি দুইমত হইবে না। —আধুনিক সাহিত্য ৯।৫০৬ পৃ.

দৃষ্টিমান (চক্ষুষ্মান): সে রকম কোনো কোনো দৃষ্টিমান লোক পারস্যে নিশ্চয়ই আছে;
—পারস্যে ২২।৪৫০ পৃ.
দৃষ্টিমান অনেক ছাত্র ও কর্মী নিশ্চয়ই আছেন, —বিশ্বভারতী ২৭।৪১২ পৃ.

শ্বেতভুজা (সরস্বতী): শ্বেতভুজার বিলিতী কুঠরিতে ঢোকবার বেলা··· চিঠিপত্র ৫।৮৩ পৃ.

অসংস্কৃত ও অভব্য শব্দেরও অনেক সময় সংস্কৃতীকৃতরূপ রবীন্দ্ররচনায় দেখা যায়। ছন্দ, অনুপ্রাস, অন্ত্যমিল, বৈচিত্র্যসাধন, রোমান্টিকতা, শুচিবায়ুগ্রস্ততা, কৌতুকপরতা প্রভৃতি কারণে এই সংস্কৃতীকৃত রূপের ব্যবহার হয়েছে।

অষ্টকুষ্ঠী: কোথা হইতে এক চক্ষুখাদিকা, ভর্তার পরমায়ুহন্ত্রী, অষ্টকুষ্ঠীর পুত্রী উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিবে, ইহা কোন্ সৎকুলপ্রদীপ কনকচন্দ্র সন্তান সহ্য করিতে পারে। যদি-বা মরণকালে এবং ডাকিনীর মন্ত্রগুণে কোনো-এক

মূঢ়মতি জ্যেষ্ঠতাতের বুদ্ধিভ্রম হইয়া থাকে, তবে স্বর্ণময় ভ্রাতুষ্পুত্র সে-ভ্রম নিজ হস্তে সংশোধন করিয়া লইলে এমন কী অন্যায় কার্য হয়।

—গল্পগুচ্ছ ১৫।৪২৪ পৃ.

উদ্ধৃতাংশে চক্ষুখাদিকা (চোখখাকী), ভর্তার পরমায়ুহন্ত্রী (ভাতারখাকী), অষ্টকুষ্ঠীর পুত্রী (আঁটকুড়ীর বেটি), সৎকুলপ্রদীপ (সদ্‌বংশের বাতি), কনকচন্দ্র সন্তান (সোনার চাঁদ ছেলে), স্বর্ণময় ভ্রাতুষ্পুত্র (সোনার ভাইপো)— সংস্কৃতীকৃত শব্দ।

ভ র্তৃ খা দি কা (ভাতারখাগী): এই রোরুদ্যমানা বালিকাটি ইতিপূর্বে কলহকালে তাহার সহোদরাকে ভর্তৃখাদিকা বলিয়া অপমান করিয়াছেন।— লোকসাহিত্য ৬।৬০০ পৃ.।

স্বা মী পু ত্র খা দ ন (ভাতারপুতখাওয়া):

ও পাড়ার বোসগিন্নি ; চোখা চোখা বচন বানায়ে
স্বামীপুত্রখাদনের আশা তার যায় সে জানায়ে।—প্রহাসিনী ২৩।৫৬ পৃ.

চ তু শ্চ র ণ (চার পা):

বটু কহে, এ কী অকরণ,
ধরি তব চতুশ্চরণ —সে ২৬।২৩২ পৃ.

হ স্তী অ শ্ব (হাতি ঘোড়া):

গাঁথিছ ছন্দ দীর্ঘ হ্রস্ব—
মাথা ও মুণ্ড, ছাই ও ভস্ম ;
মিলিবে কি তাহে হস্তী অশ্ব,
না মিলে শস্যকণা। —সোনার তরী ৩।১০৯ পৃ.

আবার ছন্দের খাতিরে এই রীতির উল্টোটাও দেখতে পাই। যেমন—

আরে রেখে দাও খৃষ্ট!
এখনি দেখাও পৃষ্ঠ! —মানসী ২।২৩৯ পৃ.

'পৃষ্ঠ প্রদর্শন' করাই প্রচলিত।

এ বিষাদ ঘোর, এ আঁধার মুখ,
হতাশ নিশাস, এই ভাঙা বুক,
ভাঙা বাদ্য-সম বাজিবে কেবল
সাথে সাথে দিবানিশি। —ছবি ও গান ১।১৪০ পৃ.

এখানে সম্ভবত পূর্বের 'ভাঙা বুক'-এর সঙ্গে অনুপ্রাসানুরোধে এবং ছন্দের জন্য 'ভগ্ন বাদ্যসম' না করে 'ভাঙা বাদ্যসম' করা হয়েছে।

রবীন্দ্রকাব্যে অন্ত্যমিল ও শব্দপ্রয়োগ

রবীন্দ্রপাঠকের এটা অবিদিত নয় যে রবীন্দ্রকাব্যে অন্ত্যমিলই প্রধান। মুক্ত ছন্দের নিদর্শনের অভাব নেই। তবুও এ কথা সত্য যে আদি মধ্য ও শেষ পর্বে অন্ত্যমিলের অপ্রতুল নেই।

রবীন্দ্রনাথের মতো মহাকবির পক্ষে অন্ত্যমিল অনায়াসলব্ধ। কিন্তু সেই অন্ত্যমিল সাধনে শব্দের প্রয়োগ-বৈচিত্র্যের আলোচনা চিত্তহারী। নানা উপায়ে কৌশলে চাতুর্যে এই অন্ত্যমিল সাধন দেখা যায়; অথচ বিস্ময়ের বিষয়, কোথাও সেই শিল্পকর্ম বেখাপ হয় নি। জোর ক'রে মিল ব'লে মনে হয় না— মিলের জন্যই মিল নয়। অর্থ, ব্যঞ্জনা, প্রসঙ্গ, অনুষঙ্গ— সমস্তের সমবায়ে তা রক্তমাংসের সামিল হয়ে গেছে।

অপ্রচলিত, বিরলপ্রচলিত, প্রাচীন, সম্পূর্ণ নূতন— কোনো শব্দই কবিতাতে অচল নয়। মিলের খাতিরে প্রাচীন অধুনা অপ্রচলিত শব্দও রবীন্দ্রকাব্যে দেখা যায়। যেমন—

অ নু ম ত:

এমনি কাটিয়ে যায় সনাতনী দিনগুলি যত
চাটুয্যে মশা'র অনুমত—। —প্রহাসিনী ২৩।৫৬ পৃ.

আ ভা ষ ণ:

আমার হৃদয়ে যে-কথা লুকানো, তার আভাষণ
ফেলে কভু ছায়া তোমার হৃদয়তলে?
দুয়ারে এঁকেছি রক্ত রেখায় পদ্ম-আসন,
সে তোমারে কিছু বলে? —মহুয়া ১৫।১৮ পৃ.

আ শ য়:

সতত বহুতর সংশয়ে,
বিবিধ পথে যেন না ফিরি বহুল-সংগ্রহ-আশয়ে। —গীতবিতান ১।৫৩ পৃ.

ঘু র ণ:

জনমে মরণে আলোকে আঁধারে
চলেছি হরণে পূরণে
ঘুরিয়া চলেছি ঘুরণে। —উৎসর্গ ১৩।৩০ পৃ.

পা স রা:

জগতের আনন্দ যে তোরা,
জগতের বিষাদ-পাসরা।

বা ছ নি:

কিসের সুখে সহাস মুখে
নাচিছ বাছনি,
দুয়ার-পাশে জননী হাসে
হেরিয়া নাচনি। —শিশু ৯।৯ পৃ.

বলছে, 'তোমার মরণ হয় না, কাহার বাছনি ও,
পাপের বোঝা বাড়িয়ো না আর, ঘরে ফেরৎ দিয়ো।
—ছড়ার ছবি ২১।৮১ পৃ.

রে ণু কা:

দখিন-হাওয়ায় ছড়িয়ে গেল গোপন রেণুকা।
গন্ধে তারি ছন্দে মাতে কবির বেণুকা। —গীতবিতান ২।৫০৩ পৃ.

ল লা টি কা:

'এস শান্তি, বিধাতার কন্যা ললাটিকা,
নিশাচর পিশাচের রক্তদীপশিখা
করিয়া লজ্জিত।' —নৈবেদ্য ৮।৫৪ পৃ.

বুদ্ধি তার ললাটিকা,
চক্ষুর তারায় বুদ্ধি জ্বলে দীপশিখা ; —মহুয়া ১৫।৭০ পৃ'

স র্ব না শি য়া : দেখি সে মুরতি সর্বনাশিয়া
কবির পরাণ উঠিল ত্রাসিয়া,
পরিহাস ছলে ঈষৎ হাসিয়া··· —সোনার তরী ৩।১০৯ পৃ'

স্ত ব ন : নীরব স্তবনে
সূর্যের বন্দনাগান গাহিয়াছে প্রভাত পবনে··· —বনবাণী ১৫।১১৮ পৃ'
দিনে দিনে কঠিন স্তবনে
কখনো মধ্যাহ্ন রৌদ্রে কখনো-বা ঝঞ্ঝার পবনে।—পরিশেষ ১৫।১৬৬ পৃ.

অধুনা অপ্রচলিত কিন্তু অতীতে সাহিত্যে প্রচলিত ছিল এমন কিছু শব্দও কবি অন্ত্যমিলের খাতিরে ব্যবহার করেছেন। তাতে ভাবানুষঙ্গ উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে, কেবল অন্ত্যমিল সাধনই হয় নি।

আ লা : কনক-হার অব পহিরলি কণ্ঠে,
কথি ফেকলি বনমালা ?
হৃদিকমলাসন শূন্য করলি রে,
কনকাসন কর আলা ! —ভানুসিংহের পদাবলী ২।৮ পৃ'
দুগ্ধফেনশয়ন করি আলা
স্বপ্ন দেখে ঘুমায়ে রাজবালা। —সোনার তরী ৩।১৭ পৃ'
কত-না কুসুম ফুটেছে তোমার
মালঞ্চ করি আলা।
আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা।—কল্পনা ৭।১৬৬ পৃ.
আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা
গেঁথেছি শেফালিমালা।···
সোনা হয়ে যাবে সকল ভাবনা,
আঁধার হইবে আলা।—গীতাঞ্জলি ১১।১৩ পৃ.
আমার অভিমানের বদলে আজ নেব তোমার মালা।···
তোমার প্রেম এল যে আগুন হয়ে করল তারে আলা।
—গীতবিতান ১।৩১ পৃ.

'আঁধার হইবে আলা' এই বাক্যাংশটিতে চণ্ডীদাসের পদাংশের মিল আছে— 'তোরা নিপরা আয়লো সজনি আঁধার পেরিয়ে আলা'।

ঝা ট : যে যার ঘরে চলে আয় ঝাট,
আঁধার হয়ে এল পথঘাট।—ছবি ও গান ১।১১৮ পৃ.

ঝা রি : নয় এ মালা, নয় এ থালা,
গন্ধজলের ঝারি,
এ যে ভীষণ তরবারি।—খেয়া ১০।১১১ পৃ.

সে-ডাকে তোমারি
সহসা নবীন উষা আসে হাতে আলোকের ঝারি,
—নটীর পূজা ১৮।১৬২ পৃ.

চিহ্নহীন পথ দিয়ে লয়ে স্বর্ণঝারি
পশ্চিম সমুদ্র হতে ভরি শান্তিবারি।—নৈবেদ্য ৮।৬৩ পৃ.

এস সুন্দরী নারী,
শিরে লয়ে হেমঝারি।—উৎসর্গ ১০।৬৭ পৃ.

নি ছ নি : আমার মন মানে না— দিনরজনী।···
আমি এ কথা, এ ব্যথা, সুখ-ব্যাকুলতা কাহার চরণতলে
দিব নিছনি॥—গীতবিতান ২।২৯৫ পৃ.

অন্ধকারে বন্ধ-করা খাঁচায়।···
লাগবে লড়াই মিথ্যা এবং সাঁচায়।—বলাকা ১২।২ পৃ.

অনেক সময় প্রচলিত শব্দের অপ্রচলিত প্রাচীন রূপও দেখা যায়।

একালা>একেলা>একলা : তাহা কি বুঝিতে তুই পেয়েছিস বালা ?
তাই হেথা প্রতিদিন আসিস্ একালা!—ভগ্নহৃদয় অ-১।১৩৩ পৃ.

খি লা প>খে লা প : ভিড় ক'রে ঘটা-করা ধরা-বাঁধা বিলাপে
পাছে কোনো অপরাধ প্রথা খিলাপে,—প্রহাসিনী ২৩।৯ পৃ.

পু ত্ত ল>পু তু ল : সেই বৃদ্ধ শিশুদল
সমস্ত বিশ্বের আজি খেলার পুত্তল।—নৈবেদ্য ৮।৪৩ পৃ.

হোঁ শ>হুঁ শ : ধার নিয়ে ফিরিয়ো না, তাতে নাহি দোষ রয়।···
'স্ত্রী স্বামীর ছায়া সম' মনে যেন হোঁশ রয়।—প্রহাসিনী ২৩।১৩ পৃ.

মিলের জন্য হিন্দি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়—

আঁ খি য়া : অধরের কোণে হাসিটি
আধখানি মুখ ঢাকিয়া,
কাননের পানে চেয়ে আছে
আধামুকুলিত আঁখিয়া।—ছবি ও গান ১।১০৬ পৃ.

তু র ন্ত : জটিল কুটিল চলেছে পন্থ,
নাহি তার আদি, নাহিকো অন্ত,
উদ্দাম বেগে ধাই তুরন্ত
সিন্ধু শৈল সরিতে।—চিত্রা ৪।৭৫ পৃ.

বাঁ শু রী : মনোরথের পথে পথে বাজল বাঁশুরী,
রূপের কোলে ঐ-যে দোলে অরূপ মাধুরী।—গৃহপ্রবেশ ১৭।১২৭ পৃ.

একটি আসামী শব্দেরও প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়—

ভু খা রি : গোধূলিবেলায় বনের ছায়ায় চিরউপবাসী ভুখারি
ভাঙা মন্দিরে আসে ফিরে ফিরে পূজাহীন তব পূজারি।
—কল্পনা ৭।১৯৬ পৃ.

তোমার শ্মশানকিঙ্করদল / দীর্ঘনিশায় ভুখারি
শুষ্ক অধর লেহিয়া লেহিয়া
উঠিছে ফুকারি ফুকারি। 'সুপ্রভাত', সঞ্চয়িতা ৪৫৬ পৃ.

মিলের খাতিরে প্রচলিত শব্দের অপ্রচলিত অর্থে প্রয়োগও দেখা যায়—

উ ধা ও (ঊর্ধ্বগত অর্থে) :
দুবাহু তাঁর তুলিয়া উধাও
কহিলেন ডাকি, 'রঘুনাথ রাও', —কথা ৭।৮৫ পৃ.

কূ ট (কক্ষ অর্থে) : দিল্লিপ্রাসাদ কূটে
হোথা বারবার বাদশাজাদার
তন্দ্রা যেতেছে ছুটে। —কথা ৭।৫৫ পৃ.

পা তি (ঠিকানা অর্থে) : কোন্ ঘাটে যে ঠেকবে এসে কে জানে তার পাতি,
পথহারা কোন্ পথ দিয়ে সে আসবে রাতারাতি,
কোন্ অচেনা আঙিনাতে তারি পূজার বাতি
রয়েছে পথ চেয়ে। —বলাকা ১২।৯ পৃ.

বা হি নী (নদী অর্থে) : হায়, অতৃপ্ত যত মহৎ বাসনা
গোপন মর্মদাহিনী,
এই আপনা মাঝারে শুষ্ক জীবন—
বাহিনী! —মানসী ২।২৩২ পৃ.

কত কী যে আসে কত কী যে যায়
বাহিয়া চেতনা বাহিনী,…

ছিন্ন সূত্র বাছি শত শত
তুমি গাঁথ বসে কাহিনী। —কাহিনী ৭।৯১ পৃ.
বিজন নদীপুলিনে আজো ডাকিছে চখা চখীরে,
মাঝেতে বহে বিরহবাহিনী।
গোপন-ব্যথা-কাতরা বালা বিরলে ডাকি সখীরে
কাঁদিয়া কহে করুণ কাহিনী। —কল্পনা ৭।১৩০ পৃ.
প্রতি নিমেষের কাহিনী
আজি বসে বসে গাঁথিস নে আর,
বাঁধিস নে স্মৃতিবাহিনী। —ক্ষণিকা ৭।২০৭ পৃ.

এই পর্যায়েরই শব্দ—

ত ম সা : এমন দিনে তারে বলা যায়,…
এমন মেঘস্বরে বাদল-ঝরঝরে
তপনহীন ঘন তমসায়। —মানসী ২।২৪৯ পৃ.

বি জ য়া : তাই তোমাদের পাব দয়া—
প্রভু-আজ্ঞা হইবে বিজয়া। —কথা ৭।৪৮ পৃ.

অন্ত্য মিলের জন্য শব্দের শেষে বিভিন্ন প্রত্যয়েরও ব্যবহার দেখা যায়। কখনো প্রচলিত শব্দে প্রত্যয় যোগ ও বর্জনে শব্দের ঈষৎ পরিবর্তন ঘটেছে। কখনো বা সম্পূর্ণ নূতন শব্দের জন্ম হয়েছে। প্রাচীন কাব্যধারার অনুবর্তনও লক্ষ্য করা যায় এই ব্যাপারে।

আ ভা স ন : ওগো মোর না-পাওয়া গো, ভোরের অরুণ আভাসনে
ঘুমে ছুঁয়ে যাও মোর পাওয়ার পাখিরে ক্ষণে ক্ষণে।
—পূরবী ১৪।১৩৭ পৃ.

ত্রা স ন : সভায় তোমার থাকি সবার শাসনে।
আমার কণ্ঠে সেথায় সুর কেঁপে যায় ত্রাসনে। —গীতিমাল্য ১১।১৭৬ পৃ.

ধ্ব ং স ন : গুপ্তিপাড়ায় জন্ম তাহার ;
নিন্দাবাদের দংশনে…
দু হাত দিয়ে লেগে গেল
কোফ্‌তা-কাবাব-ধ্বংসনে। —খাপছাড়া ২১।২৩ পৃ.
চাকাগুলো ধেয়ে করে ধানখেত-ধ্বংসন,
বাঁশি ডাকে কেঁদে কেঁদে 'কোথা কানু জংশন' —খাপছাড়া ২১।৬০ পৃ.

ক র বি কা : সে-মন্ত্রে উঠিল মাতি সেঁউতি কাঞ্চন করবিকা,

সে-মন্ত্রে নবীনপত্রে জ্বালি দিল অরণ্য বীথিকা
শ্যাম বহ্নিশিখা। —পূরবী ১৪।২২ পৃ.

থা লি কা : জ্বালি' জোনাকি-প্রদীপ-মালিকা,
ভরি' নিশীথ-তিমির-থালিকা,··· —গীতিমাল্য ১১।১২৯ পৃ.

দী পা লি কা : নিত্যকালের উৎসব তব বিশ্বের দীপালিকা—
আমি শুধু তারি মাটির প্রদীপ, জালাও তাহার শিখা···
—গীতবিতান ১।৯ পৃ.

প ত্রা লি কা : কুঞ্জদ্বারে বনমল্লিকা
সেজেছে পরিয়া নব পত্রালিকা,
সারা দিন-রজনী অনিমিখা
কার পথ চেয়ে জাগে। —নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা ২৫।১৩৭ পৃ.

ভি ম্নি ত : আরো ক্যাবিন সারিসারি
নম্বরে চিহ্নিত,
একই রকম খোপ সেগুলোর দেয়ালে ভিম্নিত।
—আকাশপ্রদীপ ২৩।১০৪ পৃ.

শব্দের শেষে স্বার্থে ই, ঈ প্রত্যয়ও যুক্ত দেখা যায় অন্ত্যমিল সাধনে। প্রাচীন কাব্যেও এই রীতি লক্ষ্য করা যায়। গরজনি, রনরনি এ-দুটি বৈষ্ণবপদাবলীর শব্দ।

অ ব গা হ নি : এ কী নীরব চাহনি,···
এ কী ঘন গহন মায়া,
এ কী স্নিগ্ধ শ্যামল ছায়া
নয়ন-অবগাহনি। —গীতিমাল্য ১১।১৩৭ পৃ.

খা রা পি : এমন যে ঘোর মনখারাপি
বুকের মধ্যে ছিল চাপি··· —শিশু ভোলানাথ ১৩।১১৫ পৃ.

গ র জ নি : নিশীথরাতে শোনা গেল
কিসের যেন ধ্বনি।
ঘুমের ঘোরে ভেবেছিলেম
মেঘের গরজনি। —খেয়া ১০।১০৪ পৃ.

গা হ নি : দেখো তো, সখী দিয়েছে ও কি
সুখের কাঁদা দুখের হাসি,
দুরাশা ভরা চাহনি ?
দিয়েছে কি না ভোরের বীণা,

দিয়েছে কি সে রাতের বাঁশি
গহন-গান গাহনি? —পূরবী ১৪।৩৩ পৃ.

র ণ র ণি: তুমি এমনি কি ধীরে দিবে দোল
মোর অবশ বক্ষশোণিতে।
কানে বাজাবে ঘুমের কলরোল
তব কিঙ্কিণী-রণরণিতে? —উৎসর্গ ১০।৭১ পৃ.

সা ধ নি: দুই হাত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দে রে
নিজ হাতে বাঁধা বাঁধনি।...
আজিকার মতো যাক যাক চুকে
যত অসাধ্য-সাধনি। —ক্ষণিকা ৭।২০৮ পৃ.

খৃ স্টা নী: অহরহ আহ্বান প্রচারিত শুনি তব উদার বাণী
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খৃস্টানী।
—'ভারতবিধাতা', সঞ্চয়িতা ৬৯৭ পৃ.

অন্ত্যমিলের জন্য রকমারি স্ত্রীপ্রত্যয়েরও প্রয়োগের দৃষ্টান্তও আছে—

অ ত লা: বসন্তে আজ ধরার চিত্ত
হল উতলা।...
দুলিয়ে দিল সুখের রাশি
লুকিয়ে ছিল যতেক হাসি
দুলিয়ে দিল জনমভরা
ব্যথা-অতলা। —গীতিমাল্য ১১।১৭৬ পৃ.

নি রু দ্দে শা: সেথায় আমি যাব যখন চৈত্ররজনীতে
বনের বাণী হাওয়ায় নিরুদ্দেশা,
চাঁদের আলোয় ঘুম-হারানো পাখির কলগীতে
পথ-হারানো ফুলের রেণু মেশা। —মহুয়া ১৫।৮১ পৃ.

বা ঞ্ছ না: কপালে হানিয়া কর বসে পড়ে ভূমি 'পর
নিজেরে করিতে চাহে নির্দয় লাঞ্ছনা;
পাগলের মতো চায়— কোথা গেল হায় হায়,
ধরা দিয়ে পলাইল সফল বাঞ্ছনা। —সোনার তরী ৩।৩৯ পৃ.

বি শ্ব প্লা বি না: মা গো একবার ঝংকারো বীণা,
ধরহ রাগিণী বিশ্বপ্লাবিনা
অমৃত উৎস ধারা— —সোনার তরী ৩।১১৮ পৃ.

রোদনা:

না মানে রোধ অতি অবোধ
রোদনা!
অমন দীননয়নে তুমি
চেয়ো না। —সোনার তরী ৩।১০৫ পৃ.

ভাষাহারা মম বিজন রোদনা
প্রকাশের লাগি করেছে সাধনা,
চির জীবনেরি বাণীর বেদনা
মিটিল দোঁহার নয়নে।
—নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা ২৫।১৪৭ পৃ.

অশঙ্কিনী:

যাব না বাসরকক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী,—
আমারে প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিনী। —মহুয়া ১৫।৪২ পৃ.

বিদ্যুৎবাহনী:

কিংবা যদি সুতীব্র চাহনি
বিদ্যুৎবাহনী
কটাক্ষে হানিত মুখে
রক্ত মোর আলোড়িয়া বুকে, —সানাই ২৪।১৩৭ পৃ.

আবার এই অন্ত্যমিলের জন্য যে-সকল শব্দ সাধারণত আপ্-প্রত্যয়ান্ত রূপেই প্রচলিত সেগুলির প্রত্যয়হীন রূপের প্রয়োগও দেখতে পাই—

ঘোষণ:

চৌদিকে করে যুদ্ধঘোষণ,
দুর্গম হয় পন্থা,
চিন্তায় করে রক্ত শোষণ
প্রখর-নখরদন্তা, —পরিশেষ ১৫।১৯৫ পৃ.

বন্দন:

শাল তাল সপ্তপর্ণ অশ্বত্থের সাথে
প্রথম প্রভাতে
সূর্য-অভিনন্দনের তুলেছিল গম্ভীর বন্দন। —মহুয়া ১৫।৬০ পৃ.

নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন।
পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাঁধা, সংগীত না মানিল বন্ধন।
—পরিশেষ ১৫।১৯৪ পৃ.

রচন:

মহাকাব্য করিলা রচন,
জগতের ফুলরাশি লয়ে
গাঁথি মালা মনের মতন··· —প্রভাত সংগীত ১।৮৬ পৃ.

আমার প্রকাশ নতুন বচন ধ'রে,
আপনাকে আজ নতুন রচন ক'রে,
—মহুয়া ১৫।১৬ পৃ.

আদেশ করিলা মোরে কবিতারচনে
মিছা দিন না যাপিয়া প্রলাপবচনে। —রূপান্তর ১১৩ পৃ.

তিনি কবি বিশ্বরচনের,
তিনি পতি মানবমনের, —রূপান্তর ১৭ পৃ.

সা ন্ত্ব ন :
…এই সাগরের
বিপুল ক্রন্দন।…
চিরপ্রাণের আলয়-মাঝে
বিপুল সান্ত্বন। —গীতালি ১১।৩০১ পৃ.

অন্ত্যমিলের জন্য প্রচলিত শব্দের অপ্রচলিত বা নূতন রূপও দেখা যায়—

বা ক্য ন বা ব :
কথার কখনো ঘটে নি অভাব,
যখনি বলেছি পেয়েছি জবাব ;
একবার ওগো বাক্য-নবাব
চলো দেখি কথা শুনে। —সোনার তরী ৩।১১১ পৃ.

রা জ্যা ধি রা জ :
প্রিয়ার পুণ্যে হলেম রে আজ
একটা রাতের রাজ্যাধিরাজ,
ভাণ্ডারে আজ করছে বিরাজ
সকল প্রকার অজস্রত্ব। —ক্ষণিকা ৭।২১৭ পৃ.

প্রচলিত শব্দকে কাটছাঁট ক'রেও প্রয়োগ করতে দেখি—

দে শা ন্ত :
ওগো সেই সুগন্ধে ফিরায় উদাসিয়া
আমায় দেশে দেশান্তে।
যেন সন্ধানে তার উঠে নিশ্বাসিয়া
ভুবন নবীন বসন্তে। —গীতিমাল্য ১১।১৪৮ পৃ.

ব না ন্ত :
তখন ছিল না ভয় ছিল না লাজ মনে
জীবন বহে যেত অশান্ত।…
হেসে তোমার সাথে ফিরেছিলেম ছুটে
সেদিন কত না বন-বনান্ত। —গীতাঞ্জলি ১১।৫৬ পৃ.

মু ষ্টি :
শিকড়ের মুষ্টি দিয়া আঁকড়িয়া যে-বক্ষ পৃথ্বীর

প্রাণরস কর তুমি পান,
ওগো আম্রবন,
সেথা আমি গেঁথে আছি দুদিনের কুটির মৃত্তির, —বনবাণী ১৫।১২৪ পৃ.

বৈ তা লী : কেটে গেছে বেলা শুধু চেয়ে-থাকা মধুর মৈতালীতে,
নীল আকাশের তলায় ওদের সবুজ বৈতালীতে। — সেঁজুতি ২২।৩৩পৃ.

মৈতালী মিতালী শব্দেরই রূপান্তর। এইরকম সন্দ (<সন্দেহ) শব্দের রূপান্তর সন্ধ।

ভুর্ভুর্ করে পদ্মগন্ধ—
মনে কত কথা হতেছে সন্ধ। —কাহিনী ৫।১৩১ পৃ.
কহিল রাজা, 'সে কথা বড়ো খাঁটি,
কিন্তু মোর হতেছে মনে সন্ধ
মাটির ভয়ে রাজ্য হবে মাটি
দিবস রাতি রহিলে আমি বন্ধ।' —কল্পনা ৭।১৫৫পৃ.

যেখানে পরিহাসসৃষ্টিই মুখ্য উদ্দেশ্য সেই-সব ক্ষেত্রে এইরকম রূপান্তর বেশি দেখা যায়—

কৃ শ্য : '…শোভন করিতে চাও হেঁশেলের দৃশ্য ?'
সে কহিল 'বরিষার
এই ঋতু ; সরিষার
তেলে ক'ষে যায় ধাত, বেড়ে যায় কৃশ্য।' —খাপছাড়া ২১।৩৪পৃ.

খি ট্ কি নি : শেষে দেখি জানলায় লাগে নাকো ছিট্‌কিনি।
দিনরাত দুড়্‌দাড়্ কী বিষম শব্দ যে,
তিনটে পাড়ার লোক হয়ে গেল জব্দ যে,
ঘরের মানুষ করে খিট্ খিট্ খিট্‌কিনি। —খাপছাড়া ২১।৫৭পৃ.

চে হো : খোকা বলে, 'আপনার
পানে তুমি চেহো,
মা যে কেন ভালোবাসে
বোঝে না তা কেহ।' — খাপছাড়া ২১।৪৬ পৃ.

রা খ্য : ঐ দেখ ওটা বুঝি হল শ্লেষবাক্য।
এ রকম বাঁকা কথা ঢাকা দিয়ে রাখ্য। —প্রহাসিনী ২৩।৬পৃ.

শি ক্ষ : ওরে মূর্খ, ইহা দেখি শিক্ষ—
ফল দিয়ে রক্ষা পায় বৃক্ষ। —ফাল্গুনী ১২।১১৯পৃ.

সিঁ চে : তাকিয়ে দেখি পিছে…

সংশয়ে আজ তলিয়ে গেল কোথা,
পাব কি তায় দুঃখসাগর সিঁচে। —পরিশেষ ১৫।২৩৭ পৃ.

কখনো কখনো অপ্রচলিত ধাতুরূপও পাওয়া যায়—

চা হ (হো):

এ নিঃশব্দ দাহ
নিঃসহ নৈরাশ্যতাপ। চাহো নাথ চাহো··· —নৈবেদ্য ৮।৬৬ পৃ.

সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ,
হে ভৈরব, শক্তি দাও, ভক্তপানে চাহ। —তপতী ২১।১১৯ পৃ.

দ ং শ য় :

নিদারুণ সংশয়
মনটারে দংশয় —প্রহাসিনী ২৩।১৫ পৃ.

রোঁয়াতে সে ইরানী যে নাহি তাহে সংশয়,
দাঁতে তার এসীরিয়া যখনি সে দংশয়। —ছড়া ২৬।১৫ পৃ.

সচরাচর সমাসের উত্তর পদরূপে প্রচলিত এমন শব্দেরও এককভাবে প্রয়োগ আছে।

দা ও য়া :

কিছু নাহি করি দাওয়া, ছাতে বসে খাই হাওয়া
যতটুকু পড়ে-পাওয়া ততটুকু ভালো —মানসী ২।১৫৫ পৃ.

"থাকো তুমি" মনে নিয়ে এইটুকু চাওয়া
কে তারে জানাতে পারে তার প্রতি নিখিলের দাওয়া
শুধু বেঁচে থাকিবার। —আরোগ্য ২৫।৫৬ পৃ.

প ন্থী :

পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি,
আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী। —শেষের কবিতা ১০।২৮৭ পৃ.

দুর্যোগ আসি টানে যবে ফাঁসি
কর্মে জড়ায় গ্রন্থি,
মন্থর দিন পাথেয়বিহীন
দীর্ঘ পথের পন্থী, —পরিশেষ ১৫।১৯৪ পৃ.

পরিহাসচ্ছলে কিছু উদ্‌ভট শব্দেরও উদ্‌ভব হয়েছে।

কাঁদুনিক :

মন উড়ু উড়ু, চোখ ঢুলু ঢুলু,
ম্লান মুখখানি কাঁদুনিক—
আলু থালু ভাষা, ভাব এলোমেলো,
ছন্দটা নির্বাধুনিক। —খাপছাড়া ২১।১৮ পৃ.

দ ম্ভি কা : নারীসমাজের তিনি তোরণের স্তম্ভিকা
সয় নাকো তাঁর দ্বিতীয় কাহারো দম্ভিকা।
—খাপছাড়া ২১।৬১ পৃ.

রাঁ ধু নি ক : শুঁটকি মাছের যারা রাঁধুনিক
হয়তো সে দলে তুমি আধুনিক। —প্রহাসিনী ২৩।৬৫ পৃ.

ল ম্ফি ত : মোর ঠিকানায় পত্র দিয়ে হয় নি কলম কম্পিত,
কবিতাতে লিখতে চিঠি হুকুম এল লম্ফিত —পূরবী ১৪।১৮ পৃ.
ধরাতল কম্পিত,
পশুপ্রাণী লম্ফিত, —খাপছাড়া ২১।৯ পৃ.

ল ণ্ডি ত ভ ণ্ডি ত : ক্লাসে যত কান ছিল
সব হল খণ্ডিত,
বেঞ্চিটেঞ্চি গুলো
লণ্ডিত ভণ্ডিত। —খাপছাড়া ২১।৫৪ পৃ.

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

PATHER PANCHALI, by Bibhutibhushan Banerji, English translation by T. W. Clark and Tarapada Mukherji, published for the UNESCO Collection of Representative Works— Indian Series, by George Allen & Unwin Ltd., London, 35 sh., and by the Indiana University Press, Bloomington, Indiana, U. S. A., $ 6. 95.

পথের পাঁচালী এমন-একটি বই যাকে বাংলাদেশের পাঠকসমাজ ভালোবেসেছেন প্রথম দর্শনেই এবং সে ভালোবাসা আজও অম্লান আছে বলা যেতে পারে। এর কারণ প্রথমত নিশ্চয়ই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্প-কৃতিত্ব। কিন্তু শুধুই কি তাই? পথের পাঁচালীর আগে বা পরে আরো কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে যা শিল্পগুণের ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর। যেমন প্রমথ চৌধুরীর চার ইয়ারী কথা।

পথের পাঁচালীর অনেক আগে বাঙালীর প্রিয় ছিল দাশুরায়ের পাঁচালী। তার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> দাশুরায়ের পাঁচালী দাশরথীর ঠিক একলার নহে: যে সমাজ সেই পাঁচালী শুনিতেছে তাহার সঙ্গে যোগে এই পাঁচালী রচিত।… ইহাতে একটি বিশেষ কালের বিশেষ মণ্ডলীর অনুরাগ-বিরাগ শ্রদ্ধা-বিশ্বাস-রুচি আপনি প্রকাশ পাইয়াছে।… এমনি করিয়া সাহিত্য কেবল লেখকের নহে যাহাদের জন্য লিখিত তাহাদেরও পরিচয় বহন করে।
>
> বস্তুজগতেও ঠিক জিনিসটি ঠিক জায়গায় যখন আসর জমাইয়া বসে তখন চারিদিকের আনুকূল্য পাইয়া টিকিয়া যায়— এও ঠিক তেমনি।… সে কেবল নিজের গুণে নহে, চারিদিকের গুণে টিকিয়া থাকে।

উপরোক্ত সূত্র অনুসরণ ক'রে বোধ হয় বলা যায় যে পথের পাঁচালী প্রকাশের সঙ্গেসঙ্গেই যে প্রীতির আসন লাভ করেছিল তার কারণ পাঠকসমাজের সঙ্গে তার একটা আত্মিক যোগ ঘটেছিল—যে যোগ আজও অটুট। আর এই যোগ সাধিত হয়েছিল সম্ভবত এই জন্য যে প্রকৃতিলালিত গ্রামীণ অতীতের প্রতি যার টান কাটে নি এবং অর্ধশিল্পায়িত শহুরে বর্তমানে যে ধাতস্থ হয় নি সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালীরা এই পাঁচালীতে তাঁদের জীবন-মন প্রতিফলিত দেখেছিলেন। বলা বাহুল্য, কেবল প্রতিফলনই নয়, বিভূতিভূষণ আশ্চর্য প্রতিভাবলে উক্ত প্রতিফলনকে সুস্পষ্ট সত্য রূপ দিয়েছেন। প্রথমেই যে শিল্পকৃতিত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাতে কোথাও কিছু ত্রুটি থাকলে পথের পাঁচালী নিশ্চয়ই এত মূল্য পেত না।

উপন্যাসটির ইংরেজি অনুবাদ প্রসঙ্গে বাংলাদেশে তার মূল্যায়নের একটি বিশেষত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্য এই দিকে জোর দেওয়া যে, পথের পাঁচালী *Song of the Road* (*Ballad of the Road* নামটি আরো সঠিক হত, balladএর দ্বারা পাঁচালীর অন্তর্নিহিত সাংগীতিক এবং কাহিনী বা আখ্যান-মূলক উভয় উপাদানের সংগতিই রক্ষা পেত; অনুবাদকরা অবশ্য ছড়ার প্রতিরূপে song ব্যবহার করছেন) রূপ নিয়ে আজ যখন জগৎসমক্ষে আবির্ভূত তখন সে বাংলাদেশে প্রাপ্ত

'চারিদিকের আনুকূল্য'এর উপর কিছুমাত্র নির্ভর করতে পারবে না, তাকে 'কেবল নিজের গুণে' বিদেশে নিজের স্থান করে নিতে হবে। 'নিজের গুণ' মানে অবশ্যই শিল্পগুণ। অতএব যাঁরা পথের পাঁচালীর এই ভাষান্তর ঘটিয়েছেন বিভূতিভূষণের শিল্পকৃতিত্ব বজায় রাখার গুরুত্ব কত বিরাট তা এর থেকে বোঝা যাবে।

অনুবাদে মূলের শিল্পগুণের প্রতি সুবিচার করা অত্যন্ত দুরূহ। উপরন্তু, অনুবাদে নানা term বা প্রসঙ্গকে ভাষান্তরিত করার সময় যখন তাদের পরিচয়ও দান করতে হয় তখন অবশ্যই সাহিত্য-কর্মের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় অনুবাদকের ভাষ্য এবং তা মূলের রসকে অবিকৃত রাখে না। অথচ এক-সমাজের কাছে অপরিজ্ঞাত বিভিন্ন বস্তুকে অন্য-এক সমাজের সামনে তুলে ধরতে হলে মূল শিল্প-কর্মের বিকৃতি পরিহার করা কিন্তু অসম্ভব। পথের পাঁচালীর অনুবাদক ভূমিকাতে এই সমস্যার সম্বন্ধে বলেছেন। সত্যিই, একাদশী বললে যে শুক্লপক্ষের একাদশ দিনে বাঙালী বিধবার উপবাসের কথা বোঝায় তা ইংরেজ পাঠকের জানা থাকতে পারে না। সুতরাং পথের পাঁচালীতে প্রতিবিম্বিত বাংলাদেশের স্বপ্ন-বিশ্বাস-আচার-বিচারের ছবিটি তুলে ধরার সময়ে অনুবাদকেরা বিবেচনা এবং নিষ্ঠার গভীরতার প্রশংসনীয় পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও মূলের রস অনিবার্যভাবেই ফিকে হয়ে যায়।

তবে সাহিত্য-শিল্পের মাধ্যম যেহেতু ভাষা, অতএব তার ব্যবহারেই অনুবাদকের সাফল্যের প্রধান পরিমাপ হবে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল— যা যে-কোনো সাহিত্যকর্মের ভাষান্তরের বেলাতেই প্রযোজ্য— চল্লিশ বছর আগে বাংলা-সাহিত্যে এবং লেখকের সেই সময়কার মানসের প্রকাশক যে ভাষা তাকে ইংরেজিতে অনুবাদ করতে হলে কী রকম ইংরেজিতে করতে হবে। সেই বাংলা আজকের ইংরেজি— এমনকি বাংলাও— তো এক নয়। একালের কোনো বইকে ভিক্টোরীয় ইংরেজিতে অথবা নরম্যান মেইলারকে শেষের কবিতা-পূর্ব বাংলায় অনুবাদ অবশ্যই বিসদৃশ হবে। *Song of the Road*এর অনুবাদকদের ধন্যবাদ যে তাঁরা এদিকে কিছুটা সচেতনতা দেখিয়েছেন এবং বিভূতিভূষণের সুর সাধারণভাবে অটুট রাখতে প্রয়াস পেয়েছেন। মূলের ভাষার কথকতাসুলভ স্বচ্ছন্দ-স্নিগ্ধ-প্রবহমানতা ইংরেজিতেও খানিকটা পাওয়া যাবে। তবে কিছু-কিছু অতিসরলীকরণ এবং স্বাধীনতা গ্রহণের অভিযোগ অনুবাদকদের বিরুদ্ধে করা যেতে পারে। প্রথমতঃ ইংরেজিতে—

> They did what they could. …There was weeping and deep lamentation. A year ago at this same evening hour an incident had occured in the open country near the Thakurjhi Lake. Bisu Ray had been a fool; but he knew now by bitter experience that the unseen arbiter of right and wrong is not cheated of his retribution because the deed lies buried under the dark grass of a lake. His way is light even in darkness.

এর মূল

তাহার পর অবশ্য যাহা হয় হইল।… তাহার পর কান্নাকাটি হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি। গতবৎসর দেশের ঠাকুরঝি পুকুরের মাঠে প্রায় এই সময়ে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল যেন এক অদৃশ্য বিচারক এ বৎসর ইছামতীর নির্জন চরে তাহার বিচার নিষ্পন্ন করিলেন। মূর্খ বীরু রায় ঠেকিয়া শিখিলেন যে অদৃশ্য

ধর্মাধিকরণের দণ্ডকে ঠাকুরঝি পুকুরের শ্যামা ঘাসের দামে প্রতারিত করিতে পারে না, অন্ধকারেও তাহা আপন পথ চিনিয়া লয়। বাড়ি আসিয়া বীরু রায় আর বেশীদিন বাঁচেন নাই।

এই অনুচ্ছেদে ইংরেজি ও বাংলার তফাতটা একটু বেশি চোখে পড়ে। ইংরেজিতে বাংলার প্রথম বাক্যটি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত, দ্বিতীয়টি খণ্ডিত এবং দুর্বল, তৃতীয়টি অংশত অনূদিত হয়ে কিছুটা দুর্বোধ্য, চতুর্থটি আবার দ্বিতীয়টির মতো। শেষের ছোট অথচ গাঢ় বাক্যটি ইংরেজিতে ভেঙে ফেলা হয়েছে। ভাষান্তরের অনিবার্য প্রয়োজনেই অনুবাদক এ কাজ করেছেন এ যুক্তি এখানে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য। কারণ এর ফলে অনুবাদ একেবারেই মূলানুসারী হয় নি— না ভাষার দিক দিয়ে, না ভাবের দিক দিয়ে। বিভূতিভূষণের মুনশিয়ানা, সুপরিণত মনের নির্মম ব্যঙ্গময় ইঙ্গিত— অনুবাদে যেন ততটা নেই।

দ্বিতীয়তঃ, মূলে আছে :

সত্যই সে ভুলে নাই।

উত্তরজীবনে নীলকুন্তলা সাগরমেখলা ধরণীর সঙ্গে তাহার খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিয়াছিল। কিন্তু যখনই গতির পুলকে তাহার সারা দেহ শিহরিয়া উঠিতে থাকিত, সমুদ্রগামী জাহাজের ডেক হইতে প্রতি মুহূর্তে নীল আকাশের নব নব মায়ারূপ চোখে পড়িত, হয়তো দ্রাক্ষাকুঞ্জবেষ্টিত কোনো নীল পর্বতসানু সমুদ্রের বিলীন চক্রবাল-সীমায় দূর হইতে দূরে ক্ষীণ হইয়া পড়িত, দূরের অস্পষ্ট আবছায়া-দেখিতে-পাওয়া বেলাভূমি এক প্রতিভাশালী সুরস্রষ্টার প্রতিভার দানের মত মহামধুর কুহকের সৃষ্টি করিত তাহার ভাবময় মনে— এই সব সময়েই, তাহার মনে পড়িত এক ঘনবর্ষার রাতে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির শব্দের মধ্যে এক পুরানো কঠোর অন্ধকার ঘরে, রোগশয্যাগ্রস্ত এক পাড়াগাঁয়ের গরীব ঘরের মেয়ের কথা— অপু সেরে উঠলে আমায় একদিন রেলগাড়ি দেখাবি?

একটি বৃহৎ বাক্যে স্বচ্ছ ভাষাপ্রবাহের মধ্যে সমৃদ্ধ চিত্রকল্পসম্ভার এবং তৎসম শব্দের ধ্বনিগাম্ভীর্য যুক্ত করা হয়েছে সুবিরাট দূরজগতের ঐশ্বর্যময় এবং নৈর্ব্যক্তিক মহিমাকে প্রকাশ করতে এবং তার পটভূমিকায় রিক্ত ক্লিষ্ট সংকীর্ণ গ্রামজীবনের করুণ রূপ আর সেই সঙ্গেসঙ্গে বালক-মনের যে বেদনা ব্যক্ত হয়েছে সাদা দেশী শব্দের মাধ্যমে তার তীব্রতাকে পরিস্ফুট করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু এর ইংরেজি রূপের ছাঁদ হয়েছে কাটা-কাটা, গাম্ভীর্য এবং প্রকরণ -বিহীন, যার ফলে তুলনার জন্য ব্যবহৃত বিভূতিভূষণের ভাষাকৌশল প্রায় লুপ্ত।

আর-একটি কথা ওঠে বিভূতিভূষণের উপন্যাসের গঠন পরিবর্তন সম্পর্কে। *Song of the Road* -এর সমাপ্তি পথের পাঁচালীর মতো নয় : অপুর নিশ্চিন্দিপুর-ত্যাগে, অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদে, তার শেষ। অন্যতম অনুবাদক টি. ডব্লিউ. ক্লার্ক ভূমিকায় নিবেদন করেছেন যে পথের পাঁচালীর এই সমাপ্তিই শিল্পসম্মত। কারণ উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র চারটি, বিশেষত অপু, দুর্গা আর তারপর হরিহর, সর্বজয়া এবং এ ছাড়া নানা মানুষ, নানা অনুষঙ্গ, গাছপালা-ফল-ফুল এবং তাদের ভিটেবাড়ি সমন্বিত নিশ্চিন্দিপুর গ্রাম। তাই যখন দুর্গার মৃত্যুর পর অপুরা এই গ্রাম ছেড়ে চলল তখনই এই কাহিনী নাটকীয় climaxএ পৌঁছেছে এবং সেইজন্য এইখানেই এর শেষ হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেছেন। শ্রীযুক্ত ক্লার্ক আরো মনে করেছেন যে বিভূতিভূষণের প্রতিভা ছিল naive, সুতরাং তিনি নিজের অজ্ঞাতসারেই তাঁর কাহিনীর নাটকীয় ঐক্যটি সৃষ্টি করেছেন অথচ তার প্রতি সচেতন ছিলেন না বলে তা ক্ষুণ্ণ করে কাহিনীটি অযথা দীর্ঘায়িত করেছেন।

বিভূতিভূষণ যে উনত্রিশটি পরিচ্ছেদ সচেতনভাবেই লিখেছিলেন তার প্রমাণ পরিচ্ছেদের নাম— অক্রূর সংবাদ। শ্রীযুক্ত ক্লার্কের ধারণা যথার্থ, নিশ্চিন্দিপুর এই বইএর প্রধান অঙ্গ। কিন্তু সেইজন্যই কি বহির্জগতের বিভিন্ন অজানা অকরুণ পথের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, পিতৃহীন হয়ে অপুর নিশ্চিন্দিপুরে প্রত্যাবর্তন শমে ফেরার মতো শিল্পের দাবী পূরক নয়? দৃষ্টান্তস্বরূপ, সর্বজয়ার ক্ষুদ্রতা-নিষ্ঠুরতা, হরিহরের অসামর্থ্য, দুর্গার লোভ, দুর্বলতা— সব চরিত্রের সাদা-কালো সব-কিছুই অবাধে আশ্চর্য নৈর্ব্যক্তিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং অপুর চোখের জলে নিশ্চিন্দিপুর ত্যাগকে সবচেয়ে নাটকীয় মুহূর্ত জ্ঞান করে সেইখানেই পথের পাঁচালীর সেন্টিমেণ্টাল সমাপ্তি ঘটানো বিভূতিভূষণের পক্ষে সম্ভব হয় নি। সজনীকান্ত দাস -কৃত পথের পাঁচালীর শিশু-সংস্করণের সংক্ষেপিকরণ এখানে গণ্য হতে পারে না, যেমন পারে না সম্পূর্ণ ভিন্ন মাধ্যম চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে সত্যজিৎ রায় -গৃহীত স্বাধীনতা।

অনুবাদকরা নিঃসন্দেহে যত্নশীল। তার একাধিক প্রশংসনীয় প্রমাণের অন্যতম আছে অনুবাদ-গ্রন্থের শেষে সংযুক্ত নির্ঘণ্টে। কিন্তু শিল্পী বিভূতিভূষণের প্রতি তাঁদের বিচার হয়তো অজানিতেই কোনো কোনো স্থানে বিজ্ঞজনোচিত হয় নি, যেমন হয় নি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ভূমিকাকারের এই উক্তি:

> Village life had been painted···romantically by Tagore, who presents village life nostalgically as an ideal condition which the modern age is fast losing.

বিশ্বজিৎ রায়

স্বী কৃ তি

মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের একক ও গ্রুপ ছবি তাঁর কন্যা শ্রীলতিকা ঘোষের সৌজন্যে প্রাপ্ত;
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' গ্রন্থের মূল পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা এবং প্রফুল্লচন্দ্র রায় কর্তৃক বিভূতিভূষণকে লিখিত পত্র বিভূতিভূষণের সহধর্মিণী শ্রীকল্যাণী দেবীর সৌজন্যে প্রাপ্ত;
গুস্তাফ ভিগেল্যাণ্ড কর্তৃক অঙ্কিত 'দি ট্রি অব লাইফ' চিত্র শ্রীচিন্তামণি করের সৌজন্যে প্রাপ্ত;
বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৬ সংখ্যায় মুদ্রিত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের চিত্র শ্রীপরিমল গোস্বামী -কর্তৃক গৃহীত।

দৈবে তুমি কখন নেশায় পেয়ে
আপন মনে যাও তুমি গান গেয়ে ॥
যে আকাশে সুরের লেখা লেখো
তার পানে রই চেয়ে চেয়ে ॥
হৃদয় আমার অদৃশ্যে যায় চলে, চেনা দিনের ঠিক-ঠিকানা ভোলে,
মৌমাছিরা আপনা হারায় যেন গন্ধের পথ বেয়ে বেয়ে ॥
গানের টানা জালে
নিমেষ-ঘেরা গহন থেকে তোলে অসীমকালে।
মাটির আড়াল করি ভেদন স্বরলোকের আনে বেদন,
মর্তলোকের বীণার তারে রাগিণী দেয় ছেয়ে ॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর   স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

[ঋা -া ঋা]
II ঋা -পা মা । -জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা I ঋা জ্ঞা -া । ঋা জ্ঞা -া I
দৈ • বে • তু মি ক খ ন্ নে শা য়্

I ঋা সা -া । -া -া -া I মা পা -া । পা পধা -ণা I
পে য়ে ◦ • ◦ ◦ আ প ন্ ম নে◦ ◦

I ণধা -পা -া । -া -া -া I গা -মা -পা । -ধা -ণা -র্সা I
যা◦ ◦ ◦ ◦ • ও যা • • • • •

I -ণা -র্সা -ণা । ধা ণা -া I ধা -া -ণা । ধা পা -মা I
• • ও তু মি ◦ গা • ন্ গে য়ে •

I পর্সা মা -জ্ঞা । -া -া -া I [ ] I
গে• য়ে • • ◦ •

II মা মা -পা । পা পা -া I পা পা -া । পা পা -া I
যে আ ০ কা শে ০ সু রে র্ লে খা ০

I পা পা -া । -া -া -ণা I ণা -া ণা । ধা ণা -া I
লে খো ০ ০ ০ ০ তা র্ পা নে র ই

I ধা ণা -া । ধা ণা -া I ণধা -পা -া । -া -া -া I
চে য়ে ০ চে য়ে ০ যা০ ০ ০ ০ ০ ও

I গা -মা -পা । -ধা -ণা -র্সা I -ণা -র্সা -ণা । ধা ণা -া I
যা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ও তু মি ০

I ধা -া -ণা । ধা পা -মা I পর্সা মা -জ্ঞা । -া -া -া I [ ] I
গা ০ ন্ গে য়ে ০ গে০ য়ে ০ ০ ০ ০

II { মা পা -া । না -া -া I না -া -া । -া -পা -া I
হৃ দ য়্ আ ০ ০ মা ০ ০ ০ ০ র্

I পা না -া । র্সা র্সর্রা -র্সর্র:র্স: I না র্সা -া । -া -া -া I
অ দৃ ০ শ্যে যা০ ০০র্ চ লে ০ ০ ০ ০

I র্সর্রা র্রর্সণা -া । ধা ণা -া I ণধা -র্সা ণা । ধা পধা -ণা I
চে০ না০ ০ দি নে র্ ঠি০ ক্ ঠি কা না০ ০

I ধা পা -া । -া -া -া } I মা -া পা । পধা -ণা ধা I
ভো লে ০ ০ ০ ০ ম ০ উ মা০ ০ ছি

পা -া -া । -া -া -া I মা -া -পা । পধা -ণা ধা I
রা ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ আ ॰ প্ না॰ ॰ হা

পা -া -া । পা ধা -া I ণা -র্সা ণা । ধা ণা -া I
রা ॰ য়্ যে ন ॰ গ ন্ ধে র প থ্

ধা ণা -া । ধা পা -া I মা -পা -মা । -জ্ঞা -া -া I
বে য়ে ॰ বে য়ে ॰ যা ॰ ॰ ॰ ॰ ও

জ্ঞা -মা -পা । -ধা -ণা -র্সা I -ণা -র্সা -ণা । ধা ণা -া I
যা ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ও তু মি ॰

ধা -া -ণা । ধা পা -মা I পর্সা মা -জ্ঞা । -া -া -া I [ ] I
গা ॰ ন্ গে য়ে ॰ গে॰ য়ে ॰ ॰ ॰ ॰

{মা পা -া । পা পধা -ণা I ধা পা -া । -া -া -া I
গা নে র্ টা না॰ ॰ জা লে ॰ ॰ ॰ ॰

পণা ণা -া । ধা ণা -া I ধা ণা -া । ধা ণা -া I
নি॰ মে ষ্ ঘে রা ॰ গ হ ন্ থে কে ॰

ধর্সা র্সণা -া । ধা পধা -ণা I ধা পা -া । -া -া -া} I
তো॰ লে॰ ॰ অ সী॰ ম্ কা লে ॰ ॰ ॰ ॰

মা পা -া । পা -না -া I না -া -া । -া -পা -া I
মা টি র্ আ ॰ ॰ ড়া ॰ ॰ ॰ ॰ ল্

I পা না -া । না -র্সা -র্র্সনা I র্সা -া -া । -া -া -া I

ক রি ০ ভে ০ ০০০ দ ০ ০ ০ ০ ন্

I র্সা র্সা -ণা । ধা -া -া I র্সণা -া -া । ধা ণা -ধপা I

সু র ০ লো ০ ০ কে ০ র্ আ নে ০০

I পা -ধণা -পধা । পা -া -া I মা -া পা । পধা -ণা -পধা I

বে ০০ ০ দ ০ ন্ ম র্ ত লো০ ০ ০

I পা -া -া । -া -া -ণা I ণধা র্সণা -ধপা । পা -ধণধা -পধা I

কে ০ ০ ০ ০ র্ বী০ ণা ০র্ তা ০০০ ০

I পা -া -া । -া -া -া I পর্সা র্সা -ণা । ণধা ণা -া I

রে ০ ০ ০ ০ ০ রা০ গি ০ ণী০ দে য়

I ধা পা -া । -া -া -ধা I মা -পা -মা । -জ্ঞা -া -া I

ছে য়ে ০ ০ ০ ০ যা ০ ০ ০ ০ ও

I জ্ঞা -মা -পা । -ধা -ণা -র্সা I -ণা -র্সা -ণা । ধা ণা -া I

যা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ও তু মি ০

I ধা -া -ণা । ধা পা -মা I পর্সা মা -জ্ঞা । -া -া -া II [ ] II

গা ০ ন্ গে য়ে ০ গে০ য়ে ০ ০ ০ ০

বিশ্বভারতী পত্রিকা

সূচীপত্র

বর্ষ ১ - বর্ষ ২৫

শ্রাবণ ১৩৪৯ - বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৬

১৩৪৯ সালের ২২ শ্রাবণ বিশ্বভারতী পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়; ১৩৭৬ সালের বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যায় উহার পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে।[১] প্রথম বর্ষে বিশ্বভারতী পত্রিকা প্রতি মাসে প্রকাশিত হইত; দ্বিতীয় বর্ষে ইহা ত্রৈমাসিকে পরিণত হয়।

প্রথম বর্ষে এই পত্রিকা সম্পাদন করেন প্রমথ চৌধুরী, কান্তিচন্দ্র ঘোষ তাঁহার সহকারী ছিলেন; দ্বিতীয় বর্ষ হইতে একাদশ বর্ষ পর্যন্ত সম্পাদক ছিলেন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সহকারী সম্পাদক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী; দ্বাদশ বর্ষ হইতে শ্রীপুলিনবিহারী সেন সম্পাদক নিযুক্ত হন, ষোড়শ বর্ষ পর্যন্ত তিনি ইহার সম্পাদনা করেন; সপ্তদশ বর্ষে শ্রীসুধীরঞ্জন দাস সম্পাদনাভার গ্রহণ করেন, শ্রীসুশীল রায় সহকারী সম্পাদক ছিলেন — দ্বাবিংশ বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা হইতে তিনি সম্পাদক নিযুক্ত হন।

বিভিন্ন সময়ে পরিচালনা-সমিতি বা সম্পাদনা-সমিতির সদস্য থাকিয়া আনুকূল্য করেন শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়, ক্ষিতিমোহন সেন, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, নন্দলাল বসু, শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন ও শ্রীপ্রমথনাথ বিশী।

বিশ্বভারতী পত্রিকার প্রথম বর্ষ হইতে পঞ্চবিংশ বর্ষ — এই পঁচিশ বর্ষের লেখক ও তাঁহাদের রচনার সূচী সংকলিত হইল, এই কাজে শ্রীসুবিমল লাহিড়ীর সাহায্য পাওয়া গিয়াছে।

মানবেন্দ্র পাল

১ ১৩৬০-৬১ ও ১৩৬১-৬২ সালে বিশ্বভারতী পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ ছিল।

১ কতকগুলি সংখ্যা শকাব্দ-চিহ্নিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এইসকল ক্ষেত্রে সাম্য রক্ষার জন্য বঙ্গাব্দও শকাব্দের প: উল্লিখিত হইল।

১ প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবিতা ও গান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবিতা ও গান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩ 'দাদামহাশয়ের নিকট হইতে কবিতায় চিঠি পাইয়া বিপন্ন নাতিনী অন্য দাদামহাশয়ের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন—কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের নামেই, সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত তাঁহার চিঠির অন্তর্গত হইয়া ১৩৫৮ আষাঢ় সংখ্যা কথাসাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।'

সরোজকুমার বসু

রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থসংখ্যা কত	আষাঢ় ১৩৫০	৭৮১-৭৮৯

সরোজিনী নাইডু

কবিতাগুচ্ছ। অনুবাদ		
একাকী : Alone		
একান্তে : Solitude		
গাঁয়ের গান : Village Song		
ঘুমপাড়ানী গান : Cradle-Song		
চারণ : Wandering Lingers		
জোবেদীর প্রতি হুমায়ুন : Humayun to Zobeida		
পালকি-বেহারার গান : Palanquin-Bearers		
প্রেমগাথা : Indian Love-Song		
বাসন্তী ইন্দ্রজাল : The Magic of Spring		
বৃন্দাবনের বাঁশরিয়া : The flute-player of Brindabon		
মৃতস্বপ্ন : My Dead Dream		
হয়দ্রাবাদ-নগরে সন্ধ্যা : Nightfall in the City of Hyderabad	কার্তিক-পৌষ ১৩৫৬	৮৭-৯৫

সুকুমার বসু

গ্রন্থপরিচয়	বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬০	২৪৮-২৪৯
বিচিত্রা-পর্ব : স্মৃতিকথা	বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৯	৪৩৭-৪৪৬

সুকুমার সেন

'অভিধান বনাম অন্বয়'	বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৩	৩০৩
আমাদের সাহিত্যে ভূতের-গল্প	শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৩	৩৩-৪০
আশুতোষ ও রবীন্দ্রনাথ	কার্তিক-পৌষ ১৩৭১	১১৮-১২১
কর্তাভজার কথা ও গান	শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৮	১১-১৮
চূড়ামণি দাসের গৌরাঙ্গবিজয়	বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬০	২২৮-২৩৪
ছাপা বাংলা রচনায় যতিচিহ্ন	মাঘ-চৈত্র ১৩৭০	২৮৪-২৯৬
দু হাজার বছরের একটি ক্ষুদ্র পুরানো গল্প	শ্রাবণ-আশ্বিন ১৮৮০। ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ	২১-২৭
পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত একটি গাথা-কবিতা	কার্তিক-পৌষ ১৩৫২	১০০-১১৪
বটতলার বেসাতি	শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৫	১৬-২৫
বাঙলা সাহিত্যের প্রাক-ইতিহাস	কার্তিক-পৌষ ১৩৫১	১২৭-১৩৬

Spencers
ICECREAM

বর্ষ ২৬ · সংখ্যা ২

কার্তিক-পৌষ ১৩৭৬

সম্পাদক

শ্রীসুশীল রায়

কারিগরি
ব্যক্তিগত সততা

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৬ সংখ্যা ২ · কার্তিক-পৌষ ১৩৭৬ · ১৮৯১ শক

সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

মূল্য দেড় টাকা

মহাত্মা গান্ধী । ১৯৪৭

রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী - কৃত পেন্সিল স্কেচ হইতে

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৬ সংখ্যা ২ · কার্তিক-পৌষ ১৩৭৬ · ১৮৯১ শক

মহাত্মা গান্ধী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতবর্ষের একটি সম্পূর্ণ ভৌগোলিক মূর্তি আছে। এর পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত এবং উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত যে-একটি সম্পূর্ণতা বিদ্যমান, প্রাচীনকালে তার ছবি অন্তরে গ্রহণ করার ইচ্ছে দেশে ছিল, দেখতে পাই। একসময়, দেশের মনে নানা কালে নানা স্থানে যা বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল তা সংগ্রহ করে, এক করে দেখবার চেষ্টা, মহাভারতে খুব সুস্পষ্টভাবে জাগ্রত দেখি। তেমনি ভারতবর্ষের ভৌগোলিক স্বরূপকে অন্তরে উপলব্ধি করবার একটি অনুষ্ঠান ছিল, সে তীর্থভ্রমণ। দেশের পূর্বতম অঞ্চল থেকে পশ্চিমতম অঞ্চল এবং হিমালয় থেকে সমুদ্র পর্যন্ত সর্বত্র এর পবিত্র পীঠস্থান রয়েছে, সেখানে তীর্থ স্থাপিত হয়ে একটি ভক্তির ঐক্যজালে সমস্ত ভারতবর্ষকে মনের ভিতরে আনবার সহজ উপায় সৃষ্টি করেছে।

ভারতবর্ষ একটি বৃহৎ দেশ। একে সম্পূর্ণভাবে মনের ভিতর গ্রহণ করা প্রাচীনকালে সম্ভবপর ছিল না। আজ সার্ভে করে, মানচিত্র এঁকে, ভূগোলবিবরণ গ্রথিত করে ভারতবর্ষের যে ধারণা মনে আনা সহজ হয়েছে, প্রাচীনকালে তা ছিল না। এক হিসাবে সেটা ভালোই ছিল। সহজভাবে যা পাওয়া যায় মনের ভিতরে তা গভীরভাবে মুদ্রিত হয় না। সেইজন্য কৃচ্ছ্রসাধন করে ভারত-পরিক্রমা দ্বারা যে অভিজ্ঞতা লাভ হত তা সুগভীর, এবং মন থেকে সহজে দূর হত না।

মহাভারতের মাঝখানে গীতা প্রাচীনের সেই সমন্বয়তত্ত্বকে উজ্জ্বল করে। কুরুক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে এই-যে খানিকটা দার্শনিক ভাবে আলোচনা, এটাকে কাব্যের দিক থেকে অসংগত বলা যেতে পারে; এমনও বলা যেতে পারে যে, মূল মহাভারতে এটা ছিল না। পরে যিনি বসিয়েছেন তিনি জানতেন যে, উদার কাব্যপরিধির মধ্যে, ভারতের চিত্তভূমির মাঝখানে এই তত্ত্বকথার অবতারণা করার প্রয়োজন ছিল। সমস্ত ভারতবর্ষকে অন্তরে বাহিরে উপলব্ধি করবার প্রয়াস ছিল ধর্মানুষ্ঠানেরই অন্তর্গত। মহাভারতপাঠ যে আমাদের দেশে ধর্মকর্মের মধ্যে গণ্য হয়েছিল তা কেবল তত্ত্বের দিক থেকে নয়, দেশকে উপলব্ধি করার জন্যও এর কর্তব্যতা আছে। আর, তীর্থযাত্রীরাও ক্রমাগত ঘুরে ঘুরে দেশকে স্পর্শ করতে করতে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভাবে ক্রমশ এর ঐক্যরূপ মনের ভিতরে গ্রহণ করবার চেষ্টা করেছেন।

এ হল পুরাতন কালের কথা।

পুরাতন কালের পরিবর্তন হয়েছে। আজকাল দেশের মানুষ আপনার প্রাদেশিক কোণের ভিতর সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকে। সংস্কার ও লোকাচারের জালে আমরা জড়িত, কিন্তু মহাভারতের প্রশস্ত ক্ষেত্রে একটা মুক্তির হাওয়া আছে। এই মহাকাব্যের বিরাট প্রাঙ্গণে মনস্তত্ত্বের কত পরীক্ষা।

যাকে আমরা সাধারণত নিন্দনীয় বলি, সেও এখানে স্থান পেয়েছে। যদি আমাদের মন প্রস্তুত থাকে, তবে অপরাধ দোষ সমস্ত অতিক্রম করে মহাভারতের বাণী উপলব্ধি করতে পারা যেতে পারে। মহাভারতে একটা উদাত্ত শিক্ষা আছে; সেটা নঙর্থক নয়, সদর্থক, অর্থাৎ তার মধ্যে একটা হাঁ আছে। বড়ো বড়ো সব বীরপুরুষ আপন মাহাত্ম্যের গৌরবে উন্নতশির, তাঁদেরও দোষত্রুটি রয়েছে, কিন্তু সেই-সমস্ত দোষ-ত্রুটিকে আত্মসাৎ করেই তাঁরা বড়ো হয়ে উঠেছেন। মানুষকে যথার্থ ভাবে বিচার করবার এই প্রকাণ্ড শিক্ষা আমরা মহাভারত থেকে পাই।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের যোগ হবার পর থেকে আরও কিছু চিন্তনীয় বিষয় এসে পড়েছে যেটা আগে ছিল না। পুরাকালের ভারতে দেখি স্বভাবত বা কার্যত যারা পৃথক তাদের আলাদা শ্রেণীতে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। তবু খণ্ডিত করেও একটা ঐক্যসাধনের প্রচেষ্টা ছিল। সহসা পশ্চিমের সিংহদ্বার ভেদ করে শত্রুর আগমন হল। আর্যরা ওই পথেই এসে একদিন পঞ্চনদীর তীরে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন, এবং তার পরে বিন্ধ্যাচল অতিক্রম করে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভারতবর্ষে নিজেদের পরিব্যাপ্ত করেছিলেন। ভারত তখন গান্ধার প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক প্রদেশ-সুদ্ধ একটি সমগ্র সংস্কৃতিতে পরিবেষ্টিত থাকায়, বাইরের আঘাত লাগে নি। তার পরে একদিন এল বাইরের থেকে সংঘাত। সে সংঘাত বিদেশীয়; তাদের সংস্কৃতি পৃথক। যখন তারা এল তখন দেখা গেল যে, আমরা একত্র ছিলুম, অথচ এক হই নি। তাই সমস্ত ভারতবর্ষে বিদেশী আক্রমণের একটা প্লাবন বয়ে গেল। তার পর থেকে আমাদের দিন কাটছে দুঃখ ও অপমানের গ্লানিতে। বিদেশী আক্রমণের সুযোগ নিয়ে একে অন্যের সঙ্গে যোগ দিয়ে নিজের প্রভাব বিস্তার করেছে কেউ, কেউ-বা খণ্ড খণ্ড জায়গায় বিশৃঙ্খল ভাবে বিদেশীদের বাধা দেবার চেষ্টা করেছে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার জন্যে। কিছুতেই তো সফলকাম হওয়া গেল না। রাজপুতনায়, মারাঠায়, বাংলাদেশে, যুদ্ধবিগ্রহ অনেক কাল শান্ত হয় নি। এর কারণ এই যে, যত বড়ো দেশ ঠিক তত বড়ো ঐক্য হল না; দুর্ভাগ্যের ভিতর দিয়ে আমরা অভিজ্ঞতা লাভ করলেম বহু শতাব্দী পরে। বিদেশী আক্রমণের পথ প্রশস্ত হল এই অনৈক্যের সুবিধা নিয়ে। নিকটের শত্রুর পর হুড়্‌মুড়্‌ করে এসে পড়ল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বিদেশী শত্রু তাদের বাণিজ্যতরী নিয়ে; এল পর্টুগীজ, এল ওলন্দাজ, এল ফ্রেঞ্চ্‌, এল ইংরেজ। সকলে এসে সবলে ধাক্কা মারলে; দেখতে পেল যে, এমন কোনো বেড়া নেই যেটা দুর্লঙ্ঘ্য। আমাদের সম্পদ সম্বল সব দিতে লাগলুম, আমাদের বিদ্যাবুদ্ধির ক্ষীণতা এল, চিত্তের দিক দিয়ে সম্বলহীন রিক্ত হয়ে পড়লুম। এমনি করেই বাইরের নিঃস্বতা ভিতরেও নিঃস্বতা আনে।

এইরকম দুঃসময়ে আমাদের সাধক পুরুষদের মনে যে চিন্তার উদয় হয়েছিল সেটা হচ্ছে, পরমার্থের প্রতি লক্ষ রেখে ভারতের স্বাতন্ত্র্য উদ্‌বোধিত করার একটা আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা। তখন থেকে আমাদের সমস্ত মন গেছে পরমার্থিক পুণ্য-উপার্জনের দিকে। আমাদের পার্থিব সম্পদ পৌঁছয় নি সেখানে যেখানে যথার্থ দৈন্য ও শিক্ষার অভাব। পারমার্থিক সম্বলটুকুর লোভে যে পার্থিব সম্বল খরচ করি সেটা যায় মোহান্ত ও পাণ্ডাদের গর্বস্ফীত জঠরের মধ্যে। এতে ভারতের ক্ষয় ছাড়া বৃদ্ধি হচ্ছে না।

বিপুল ভারতবর্ষের বিরাট জনসমাজের মধ্যে আর-এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁরা জপ তপ ধ্যান ধারণা করার জন্যে মানুষকে পরিত্যাগ করে দারিদ্র্য ও দুঃখের হাতে সংসারকে ছেড়ে দিয়ে চলে যান। এই অসংখ্য উদাসীনমণ্ডলীর এই মুক্তিকামীদের অন্ন জুটিয়েছে তারা যারা এঁদের মতে মোহগ্রস্ত সংসারাসক্ত।

একবার কোনো গ্রামের মধ্যে এই রকম এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁকে বলেছিলুম, 'গ্রামের মধ্যে দুষ্কৃতিকারী, দুঃখী, পীড়াগ্রস্ত যারা আছে, এদের জন্য আপনারা কিছু করবেন না কেন।' আমার এই প্রশ্ন শুনে তিনি বিস্মিত ও বিরক্ত হয়েছিলেন ; বললেন, 'কী। যারা সাংসারিক মোহগ্রস্ত লোক, তাদের জন্য ভাবতে হবে আমায়! আমি একজনা সাধক, বিশুদ্ধ আনন্দের জন্যে ওই সংসার ছেড়ে এসেছি, আবার ওর মধ্যে নিজেকে জড়াব!' এই কথাটি যিনি বলেছিলেন তাঁকে এবং তাঁরই মতো অন্য সকল সংসারে-বীতস্পৃহ উদাসীনদের ডেকে জিগ্‌গেস করতে ইচ্ছে হয় যে, তাঁদের তৈলচিক্কণ নধর কান্তির পরিপুষ্টি সাধন করল কে। যাদেরকে ওঁরা পাপী ও হেয় বলে ত্যাগ করে এসেছেন সেই সংসারী লোকই ওঁদের অন্ন জুটিয়েছে। পরলোকের দিকে ক্রমাগত দৃষ্টি দিয়ে কতখানি শক্তির অপচয় হয়েছে তা বলা যায় না। বহু শতাব্দী ধরে ভারতের এই দুর্বলতা চলে আসছে। এর যা শাস্তি, ইহলোকের বিধাতা সে শাস্তি আমাদের দিয়েছেন। তিনি আমাদের হুকুম দিয়ে পাঠিয়েছেন সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, এই সংসারের উপযোগী হতে হবে। সে হুকুমের অবমাননা করেছি, সুতরাং শাস্তি পেতেই হবে।

সম্প্রতি ইউরোপে স্বাতন্ত্র্যপ্রতিষ্ঠার একটা চেষ্টা চলেছে। ইতালি এক সময়ে বিদেশীর কবলে ধিক্‌কৃত জীবন যাপন করেছিল ; তার পরে ইতালির ত্যাগী যাঁরা, যাঁরা বীর, ম্যাজিনি ও গ্যারিবল্ডি, বিদেশীর অধীনতা-জাল থেকে মুক্তিদান করে নিজেদের দেশকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেও দেখেছি এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করবার জন্যে কত দুঃখ, কত চেষ্টা, কত সংগ্রাম হয়েছে। মানুষকে মনুষ্যোচিত অধিকার দেবার জন্যে পাশ্চাত্যদেশে কত লোক আপনাদের বলি দিয়েছে। বিভাগ সৃষ্টি করে পরস্পরকে যে অপমান করা হয়, সেটার বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যে আজও বিদ্রোহ চলছে। ও দেশের কাছে জনসাধারণ, সর্বসাধারণ, মানবগৌরবের আধকারী ; কাজেই রাষ্ট্রতন্ত্রের যাবতীয় অধিকার সর্বসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। ও দেশের আইনের কাছে ধনী দরিদ্র ব্রাহ্মণ শূদ্রের প্রভেদ নেই। একতাবদ্ধ হয়ে স্বাতন্ত্র্যপ্রতিষ্ঠার শিক্ষা আমরা পাশ্চাত্যের ইতিহাস থেকে পেয়েছি। সমস্ত ভারতবাসী যাতে আপন দেশকে আপনি নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার পায়, এই যে ইচ্ছে এটা আমরা পশ্চিম থেকে পেয়েছি। এতদিন ধরে আমরা নিজেদের গ্রাম ও প্রতিবাসীদের নিয়ে খণ্ড খণ্ড ভাবে ছোটোখাটো ক্ষুদ্র পরিধির ভিতর কাজ করেছি ও চিন্তা করেছি। গ্রামে জলাশয় ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের সার্থক মনে করেছি, এবং এই গ্রামকেই আমরা জন্মভূমি বা মাতৃভূমি বলেছি। ভারতকে মাতৃভূমি বলে স্বীকার করার অবকাশ হয় নি। প্রাদেশিকতার জালে জড়িত ও দুর্বলতায় অনুভূত হয়ে আমরা যখন পড়েছিলুম তখন রানাডে, সুরেন্দ্রনাথ, গোখলে প্রমুখ মহদাশয় লোকেরা এলেন জনসাধারণকে গৌরব দান করার জন্যে। তাঁদের আরব্ধ সাধনাকে যিনি প্রবল শক্তিতে দ্রুতবেগে আশ্চর্য সিদ্ধির পথে নিয়ে গেছেন সেই মহাত্মার কথা স্মরণ করতে আমরা আজ এখানে সমবেত হয়েছি— তিনি হচ্ছেন মহাত্মা গান্ধী।···

শান্তিনিকেতন। ১৬ আশ্বিন ১৩৪৩

'মহাত্মা গান্ধী' গ্রন্থ থেকে উদ্‌ধৃত

গুরুদেব ও মহাত্মা

অমিয়কুমার সেন

যে-সকল মহাপুরুষের ধ্যান এবং কর্মকে সাধারণ অনুভবের সীমার মধ্যে পুরোপুরি আয়ত্ত করা যায় না, তাঁদের স্বভাবতই আমরা একটি প্রতীকচিহ্নের সঙ্গে যুক্ত করে নিই। এতে তাঁদের চিন্তা এবং কার্যধারার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বোঝবার সহায়তা হয়। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নরওয়ের নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রখ্যাত সাহিত্যিক জন বয়ার (Johan Bojer) বলেছেন, রবীন্দ্রনাথই ভারতবর্ষ, তিনি নূতন একটি প্রতীকচিহ্ন নিয়ে ইউরোপের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন—সে প্রতীক ক্রুশ-চিহ্ন নয়, সে হল শতদল পদ্ম।[১] প্রায় দু হাজার বছর আগে যীশুখ্রীষ্টকে অবলম্বন করে ক্রুশ-চিহ্নটি নির্মম-দুঃখবরণ, চরম-আত্মত্যাগ এবং অমর-মরণের প্রতীকরূপে সারা পৃথিবীতে গৃহীত হয়েছিল। আর, শতদল পদ্ম হল বিশ্ব-সৌন্দর্যের প্রতীক, মহৎ-কল্যাণ এবং অশেষ-জীবনশ্রীর প্রতীক। দু হাজার বছর আগে প্রবর্তিত ক্রুশ-চিহ্নের প্রতীকটি এ-যুগে যাঁর হাতে মানাত তিনি হলেন মহাত্মা গান্ধী। আমাদের যুগের এ পরম গৌরব যে, শতদল পদ্মের প্রতীকরূপী রবীন্দ্রনাথ এবং ক্রুশচিহ্নধারী মহাত্মা গান্ধীকে আমরা একই কালে, একই দেশে এবং একই কর্মক্ষেত্রে যুগপৎ আবির্ভূত হতে দেখেছি। একজন দেখিয়েছেন আমাদের জীবনধারণ কত শ্রীমণ্ডিত হতে পারে, অন্যজন প্রমাণ করেছেন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমরা কত মহীয়ান্ হয়ে উঠতে পারি। দুজনের জীবনযাপনপ্রণালী ও কর্মপন্থা বিভিন্ন হলেও উভয়ের লক্ষ্য ছিল এক। তাই সাময়িক মতভেদ সত্ত্বেও দুজনের প্রতি দুজনের শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। এই দুই মহামনীষীর সংযোগের ইতিহাস বর্তমান যুগের অন্তরতম ইতিহাস। যুদ্ধের দামামার ধ্বনি, মতবাদের বিক্ষুব্ধ কলরব, এমনকি বিজ্ঞানের নভোশ্চারণের গৌরবের ঊর্ধ্বে দারিদ্র্য ও ত্যাগের সঙ্গে কল্যাণ ও সৌন্দর্যের মহামিলনই এ যুগের অন্যতম ঘটনা, এ ঐতিহাসিক সত্যটি আজও আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। কিন্তু জাতিবৈর এবং মতবাদের সংঘাত যতই প্রবল হয়ে উঠতে থাকবে ততই এ সত্যটি ধীরে ধীরে আমাদের কাছে উন্মোচিত হবে।

১৯৪৫ সনের ১৮ ডিসেম্বর মহাত্মা গান্ধী শেষবার শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। গুরুদেবের মৃত্যুর পর তখন শান্তিনিকেতনের কর্মকর্তাগণ বিশ্বভারতীর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ণয়ের প্রয়াসে উদ্বিগ্ন। রবীন্দ্রনাথের শেষ ইচ্ছা অনুসারে গান্ধীজি বিশ্বভারতীর দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হয়েছিলেন। এবারে তিনি তাই কর্মপন্থা নির্ণয়ের জন্য বিশ্বভারতীর কর্মীদের সঙ্গে একটি আলোচনা-সভায় মিলিত হয়েছিলেন। সভায় নানা প্রশ্নের মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে একজন অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির আপাতবিরোধী আদর্শের কথা উল্লেখ করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী উত্তরে বলেছিলেন, এ প্রশ্নে শুধু যে গুরুদেবকে কটাক্ষ করা হয়েছে তাই নয়, আমিও এতে ক্ষুণ্ণ হয়েছি। আমাদের মধ্যে প্রকৃত কোনো বিরোধ নেই এ কথা আমি উপলব্ধি করেছি। গুরুদেব ও আমার মধ্যে বিরোধ আবিষ্কারের মনোভাব নিয়েই আমি যাত্রা করেছিলাম, কিন্তু

---

১ "He [Rabindranath] is India bringing to Europe a new divine symbol, not the Cross, but the Lotus." *Golden Book of Tagore,* 1931

যাত্রাশেষে এই গৌরবময় অনুভূতি লাভ করেছি যে আমাদের মধ্যে প্রকৃত কোনো বিরোধ নেই।[২] গুরুদেব ও মহাত্মার চিন্তা ও মর্মপন্থার তাৎপর্য গ্রহণের পক্ষে এ উক্তিটির বিশেষ মূল্য আছে। দুজনের যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল দীর্ঘকাল ধরে। এই যোগাযোগের ইতিহাসও কৌতূহলপূর্ণ। এ ইতিহাস অনুসরণ করলে চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে দুজনের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের পরিচয় পাওয়া যাবে। দুজনের আদর্শকে মহাত্মা গান্ধী পরিপূরক বলেও অভিহিত করেছিলেন।

গুরুদেব ও মহাত্মার সাক্ষাৎ-যোগাযোগ ঘটেছিল ১৯১৫ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে। কিন্তু যোগাযোগের ক্ষেত্র রচিত হয়েছিল তার বহু পূর্ব থেকেই। কবিরা ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতেও মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব সূচিত হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় যখন গান্ধীজির কার্যকলাপ সম্বন্ধে দেশের লোক অবহিত হয় নি তখন রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধে ভারতবর্ষের আদর্শের কথা বলতে গিয়ে লিখেছিলেন, "তাহা নদীতীরে রুদ্র রৌদ্রবিকীর্ণ বিস্তীর্ণ ধূসর প্রান্তরের মধ্যে কৌপীন বস্ত্র পরিয়া একাকী মৌন বসিয়া আছে। তাহা বলিষ্ঠ ভীষণ, তাহা দারুণ সহিষ্ণু, উপবাস ব্রতধারী— তাহার কৃশ পঞ্জরের অভ্যন্তরে প্রাচীন তপোবনের অমৃত অশোক অভয় হোমাগ্নি এখনও জ্বলিতেছে।"[৩] পরবর্তী যুগে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ভারত-আত্মার এই স্বরূপটি মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও কর্মের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উদ্ধৃতিটি ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার অমোঘ বাণীরূপে স্মরণীয়। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ 'প্রায়শ্চিত্ত' নামে একটি নাটক রচনা করেন। সে নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্রে পরবর্তীকালে গান্ধীজি-প্রবর্তিত সত্যাগ্রহের মূল আদর্শের পূর্বাভাস আছে। নাটকের একটি দৃশ্যে ধনঞ্জয় এবং মাধবপুরের একদল প্রজার সংলাপের থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি।[৪]

একজন প্রজা : বাবা রাজা একথা শুনবে না।

ধনঞ্জয় : তবু শোনাতে হবে। রাজা হয়েছে বলে সে কি এমনি হতভাগ্য যে ভগবান্ তাকে সত্য কথাও শুনতে দেবেন না? ওরে, জোর করে শুনিয়ে আসব।

অন্যপ্রজা : ও ঠাকুর, তাঁর জোর যে আমাদের চেয়ে বেশি— তাঁরই জিত হবে।

ধনঞ্জয় : দূর বাঁদর, এই বুঝি তোদের বুদ্ধি! যে হারে তার বুঝি জোর নেই! তার জোর যে বৈকুণ্ঠ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছয় তা জানিস।

প্রতিপক্ষের সঙ্গে শুধু যে ঘৃণার সম্পর্ক নয়, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার সম্পর্কও থাকতে পারে ধনঞ্জয়-চরিত্রের মধ্য দিয়ে এই দুর্লভ মানসিকতা রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর স্বাধীনতা আন্দোলনেরও এটাই ছিল অভূতপূর্ব বিশেষত্ব। এই আন্দোলন ব্রিটিশ-রাজের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হলেও ইংরেজ জাতির প্রতি বিদ্বেষে পরিণত হয় নি। স্বাধীনতা-সংগ্রামের এই বিশিষ্টতা রবীন্দ্রনাথের চিন্তার দ্বারা বহুল পরিমাণে

---

২ ". . . it is a reflection both on Gurudev and myself. I have found no real conflict between us. I started with a disposition to detect a conflict between Gurudev and myself but ended with the glorious discovery that there was none." *Visva-Bharati News,* February 1946

৩ নববর্ষ, ভারতবর্ষ, ১৯০৫-৬

৪ প্রায়শ্চিত্ত ২য় অঙ্ক ২য় দৃশ্য। এই নাটকের ঘটনাবস্তু পূর্ববর্তী উপন্যাস বউঠাকুরানীর হাট থেকে গৃহীত।

প্রভাবিত হয়েছিল। রবীন্দ্রসাহিত্যে গান্ধীজি-প্রবর্তিত আদর্শের পূর্বাভাস ভারতবাসীর মনকে গান্ধী-আবাহনের জন্য প্রস্তুত করে তুলেছিল সন্দেহ নেই।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান্ধীজির সাক্ষাৎ-যোগাযোগের সূত্র রচিত হয় ১৯১৩ সনে প্রধানত দীনবন্ধু এণ্ডরুজের মধ্যস্থতায়। নোবেল পুরস্কার পাবার কিছু আগে ১৯১২ সনে ইংলণ্ডে রবীন্দ্রানুরাগী ভারতবন্ধু এণ্ডরুজ ও পিয়রসনের সঙ্গে কবির দেখা হয় ইংলণ্ডে। কবি দুজনকেই শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দেবার জন্য আহ্বান করেন। পিয়রসন ১৯১২ সনের শেষদিকে প্রথম শান্তিনিকেতনে আসেন, এণ্ডরুজ আসেন ১৯১৩ সনের ফেব্রুআরি মাসে। প্রথম-দর্শনে দুই বন্ধুরই আশ্রমের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আশ্রমের কাজে যোগ দেবার আগে গান্ধীজি-প্রবর্তিত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য দুই বন্ধু দক্ষিণ-আফ্রিকায় যান। যাত্রার পূর্বে তাঁরা শান্তিনিকেতনে এসে কবির আশীর্বাদ গ্রহণ করেন (১৯১৩ নবেম্বর)। বিদায়-অনুষ্ঠানে ভাষণ প্রসঙ্গে পিয়রসন মন্তব্য করেন, শান্তিনিকেতন আশ্রম থেকে আমরা যে শান্তি নিয়ে যাচ্ছি তা আমাদের দক্ষিণ-আফ্রিকার কাজে সহায় হবে।—[৫] অনুমান করা কঠিন নয় যে এ সময়েই গান্ধীজি-প্রবর্তিত আন্দোলন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কৌতূহল ও শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়েছিল। ১৯১৪ সনের ফেব্রুআরি মাসে রবীন্দ্রনাথ এণ্ডরুজকে লিখিত একটি পত্রে গান্ধীজির এবং তাঁর সত্যাগ্রহ আন্দোলন সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ মন্তব্য করেন। তিনি লিখেছিলেন, আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আপনি যখন গান্ধীজি এবং অন্যান্যদের পাশে দাঁড়িয়ে আফ্রিকায় আমাদের মঙ্গলের জন্যই সংগ্রাম করছিলেন তখন আমাদের পরম শুভেচ্ছা আপনাকে ঘিরে রেখেছিল।[৬] —রবীন্দ্রনাথের লেখায় গান্ধীজি সম্বন্ধে এটাই হয়তো প্রথম উল্লেখ।

১৯১৪ সনে কয়েকদিনের ব্যবধানে এণ্ডরুজ ও পিয়রসন শন্তিনিকেতনের কাজে যোগ দেন। ওই বৎসরের গোড়ার দিকে দক্ষিণ-আফ্রিকায় গান্ধীজি ও জেনারেল স্মাটসের মধ্যে এক আলোচনার ফলে গান্ধীজি ইংলণ্ডে রওনা হয়ে যান। কিন্তু তাঁর প্রতিষ্ঠিত ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এই বিদ্যালয়টি পরবর্তীকালে গান্ধীজি-প্রবর্তিত বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের আদিতম রূপ। শারীরিক পরিশ্রম এবং ধর্ম ও নীতি -শিক্ষাকে ভিত্তি করে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পাঠক্রম রচিত হয়েছিল। এর মধ্যে পরীক্ষা পাসের কোনো তাগিদ ছিল না। বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং অধ্যাপকদের ভারতবর্ষে প্রথম হরিদ্বার গুরুকুল আশ্রমে পাঠানো হয়। পরে এণ্ডরুজ সাহেবের মধ্যস্থতায় তাঁরা শান্তিনিকেতনে আসেন। এঁদের মধ্যে গান্ধীজির দুই পুত্রও ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে অনেক পার্থক্য কিন্তু শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে দুজনেরই মত সমধর্মী, সুতরাং এক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পক্ষে অন্যকে গ্রহণ করা কঠিন হয় নি। রবীন্দ্রনাথ এ-সময়ে গান্ধীজিকে একটি পত্র লেখেন। তাতে তিনি এই দুই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পরস্পর পস্পরের পরিপূরক বলে উল্লেখ করেন। তিনি লিখেছিলেন— আপনি যে ভারতবর্ষে আমার বিদ্যালয়কেই ফিনিক্সের ছাত্রদের পক্ষে উপযুক্ত আশ্রয় বলে মনে করেছেন তাতে আমি আনন্দিত হয়েছি। এই প্রিয় ছাত্রদের এ স্থানে

---

৫ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৩৫ শকাব্দ পৃ. ১৯১

৬ "You know our best love was with you, while you were fighting our cause in Africa along with Mr. Gandhi and others." *Letters to a Friend,* February 1914

দেখে আমার আনন্দ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা সকলে এ কথা উপলব্ধি করছি যে আমাদের ছাত্রদের উপর তাদের প্রভাব বিশেষ কার্যকরী হবে, অপরপক্ষে আমাদের ছাত্রেরাও তাদের এমন-কিছু দিতে পারবে যাতে তাদের শান্তিনিকেতনে বাস সফল হবে। আপনি যে আপনার ছাত্রদের আমার ছাত্র বলে গ্রহণ করার সুযোগ দিয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতেই এই চিঠি লিখছি। এর ফলে আমাদের দুজনের জীবনের সাধনার মধ্যে জীবন্ত যোগসূত্র রচিত হল।[৭]

গান্ধীজি ও কস্তুরবা শান্তিনিকেতনে প্রথম পদার্পণ করেন ১৯১৫ সনের ১৭ ফেব্রুআরি। রবীন্দ্রনাথ তখন স্থানান্তরে ছিলেন। কিন্তু সেজন্য মহামান্য অতিথিদের অভ্যর্থনার কোনো ত্রুটি হয় নি। গান্ধীজি আত্মজীবনীতে লিখেছেন, রাজকোট থেকে আমি গেলাম শান্তিনিকেতনে। শিক্ষক ও ছাত্রদের স্নেহে আমি অভিভূত হয়েছিলাম; আমার অভ্যর্থনা-অনুষ্ঠান অনাড়ম্বর সৌন্দর্য ও ভালোবাসার একটি সুন্দর সমন্বয় বলে মনে হয়েছিল।[৮]

গান্ধীজির অভ্যর্থনার জন্য আশ্রমের প্রবেশপথ থেকে নূতন রাস্তার পত্তন হয়। রাস্তাটি তদানীন্তন অধ্যাপক নেপাল রায়ের তত্ত্বাবধানে ছাত্রেরা সংস্কার করে। সেজন্য আজও সেটি নেপাল রোড নামে পরিচিত। আশ্রমে দুদিন থাকার পরই গান্ধীজি মহামতি গোখলের মৃত্যুসংবাদ পান। তাঁকে তিনি রাজনীতির গুরুস্থানীয় মনে করতেন। শান্তিনিকেতনে আসার অব্যবহিত পূর্বেই তিনি তাঁর সঙ্গে দেখাও করে এসেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পেয়েই তিনি পুণা রওনা হয়ে যান। এদিকে গান্ধীজির আশ্রমে পৌঁছনোর সংবাদ পেয়েই রবীন্দ্রনাথ দ্রুত শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে দেখেন গান্ধীজি চলে গিয়েছেন। গান্ধীজি আবার ফিরে আসেন ১৯১৫ সনের ৬ই মার্চ। রবীন্দ্রনাথ তখন সুরুলের কুঠি-বাড়িতে ছিলেন। সেদিনই দুই মহাপুরুষের প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে।

আশ্রমে এসে প্রথমেই কতগুলি প্রথার প্রতি গান্ধীজির দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তার মধ্যে প্রথম এবং প্রধান হল ছাত্রদের পৃথক্ পংক্তিতে বসে আহার। সে সময় বিশেষভাবে ব্রাহ্মণ ছাত্রেরা আলাদা পংক্তিতে বসে আহার করতেন। রবীন্দ্রনাথ এই প্রথার বিরোধী ছিলেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনো অনুশাসন প্রচার করেন নি। অভিভাবকদের অভিপ্রায়েই নৈষ্ঠিক পরিবারের ছাত্রেরা নিজেদের পংক্তি-বিচার মেনে চলতেন। রবীন্দ্রনাথ বাইরে থেকে নৈতিক চাপের পক্ষপাতী ছিলেন না। এই প্রথা তুলে দেবার জন্য গান্ধীজি চেষ্টিত হন। তা ছাড়া আশ্রমের ছাত্রেরা স্বাবলম্বী হবে এবং পাচক ও ভৃত্যের সেবা গ্রহণের কোনো প্রয়োজন তাদের থাকবে না এটাও গান্ধীজির আদর্শ ছিল। রবীন্দ্রনাথও

---

৭ "That you could think of my school as the right and likely place where your Phœnix boys could take shelter when they are in India has given me real pleasure—and that pleasure has been greatly enhanced when I saw those dear boys in that place. We all feel that their influence will be of great value to our boys and I hope that they in their turn will gain something which will make their stay in Shantiniketan fruitful. I write this letter to thank you for allowing your boys to become our boys as well and thus form a living link in *Sadhana*, of both of our lives."—January-February 1915?

৮ "From Rajkot I proceeded to Shantiniketan. The teachers and students overwhelmed me with affection; the reception was a beautiful combination of simplicity, art and love." *My Experiment with Truth*, Part V, Chapter IV

ছাত্র এবং অধ্যাপকদের কর্মে এবং মননে স্বাবলম্বনের আদর্শ সৃষ্টির প্রয়াসী ছিলেন। তাঁর মতে নিজের সমস্ত কাজ নিজের হাতে করার দীক্ষা প্রত্যেক মানুষেরই গ্রহণ করতে হবে, তবে ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে প্রতিদিন সকলের পক্ষে নিজের সম্পূর্ণ কাজ নিজে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়, বৃহত্তর সমাজের স্বার্থের জন্যও তাকে কোনো বিষয়ে অপরের সাহায্য গ্রহণ করতেই হয়। গান্ধীজি অবশ্য এই আপসের পক্ষপাতী ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা করে গান্ধীজি আশ্রমে পংক্তিভোজন এবং পূর্ণ স্বাবলম্বন প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেন। তাঁর আত্মজীবনীতে আছে।— আমার স্বভাবের নিয়মেই আমি শিক্ষার্থী এবং অধ্যাপকদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলাম। আমি তাঁদের সঙ্গে স্বাবলম্বন সম্বন্ধে আলোচনা করতে আরম্ভ করলাম। বেতন দিয়ে রান্না করার জন্য লোক না রেখে যদি ছাত্র এবং অধ্যাপকেরা নিজের হাতেই রান্নার কাজ করেন তবে রান্নাঘরের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ের দায়িত্ব পুরোপুরি তাঁদেরই হাতে আসে, ছাত্রেরা আত্মনির্ভরতার শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রান্না করার ব্যাবহারিক শিক্ষাও পায়। এসকল বিষয়ে আমি অধ্যাপকদের সঙ্গে আলোচনা করলাম। তাঁদের কেউ কেউ অসম্মতি জানালেন, কারও বা এই পরীক্ষা যুক্তিযুক্ত মনে হল। ছাত্রেরা এই পরীক্ষার অভিনবত্বেই স্বাভাবিকভাবে আকৃষ্ট হল। এ কথা রবীন্দ্রনাথকে জানালে তিনি বললেন, অধ্যাপকেরা যদি সম্মত থাকেন তবে এ ধরণের পরীক্ষায় তাঁরও পূর্ণ সম্মতি আছে। ছাত্রদের তিনি বললেন, 'এর মধ্যেই স্বরাজের চাবিকাঠি আছে'।[১]

রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন লাভ করে পরদিন থেকে (১০ মার্চ ১৯১৫) আশ্রমের ছাত্রেরা আশ্রমের সমস্ত কায়িক পরিশ্রমের দায়িত্ব নিজেরাই গ্রহণ করেন। অধ্যাপকগণ তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। এই ব্যবস্থা অবশ্য বেশিদিন চলে নি। পংক্তিভোজন-ব্যবস্থারও আশু সংস্কার হয় নি। তবু আশ্রমবাসী ১০ মার্চ দিনটিকে 'গান্ধী-পুণ্যাহ' রূপে চিহ্নিত করে রেখেছিল। আজও ১০ মার্চ তারিখে বৎসরে অন্তত একটি দিন অধ্যাপক এবং ছাত্রেরা আশ্রমের সব কাজ স্বহস্তে করার প্রচেষ্টা করেন। সেদিন পাচক ভৃত্য জমাদার সকলেরই ছুটির দিন। পৃথক্ পংক্তিভোজনের ব্যবস্থাও অধ্যাপক ও ছাত্রদের নিজেদের ইচ্ছায়ই ধীরে-ধীরে আশ্রমের সীমানা থেকে নির্বাসিত হয়েছিল।

আত্মনির্ভরতার নীতি প্রবর্তিত হবার পরদিনই গান্ধীজিকে রেঙ্গুনে চলে যেতে হয়। তার অল্পকাল পরেই ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্রেরাও শান্তিনিকেতন থেকে চলে যান গান্ধীজির নবনির্মিত সাবরমতী আশ্রমে।

---

১ "As is my wont, I quickly mixed with the teachers and students, and engaged them in a discussion on self-help. I put it to the teachers that, if they and the boys dispensed with the services of paid cooks and cooked their food themselves, it would enable the teachers to control he kitchen from the point of view of the boys' physical and moral health, and it would afford to the students an object-lesson in self-help. One or two of them were inclined to shake their heads. Some of them strongly approved of the proposal. The boys welcomed it, if only because of their instinctive taste for novelty. So we launched the experiment. When I invited the Poet to express his opinion, he said that he did not mind it provided the teachers were favourable. To the boys he said, "The experiment contains the key to Swaraj." *My Experiment with Truth*, Part V, Chapter IV

রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক গান্ধীজীকে শান্তিনিকেতনে অভ্যর্থনা। ১৯৪০

গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথ : শান্তিনিকেতন

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান্ধীজির প্রথম-সাক্ষাতেই যেমন দুজনের মধ্যে আজীবন প্রীতি এবং শ্রদ্ধার সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল, তেমনি দুজনের আদর্শগত ঐক্য এবং কর্মপন্থার বিরোধও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। জাতিভেদের অভিশাপ দূরীকরণ এবং আত্মনির্ভরতার দীক্ষা সম্বন্ধে দুজনের ভাবনা পৃথক্ ছিল সে কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। শিক্ষার বৃহত্তর ক্ষেত্রেও দুজনের দৃষ্টিতে অনেক পরিমাণে পার্থক্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের মধ্যে বাইরে থেকে জোর করে নিয়মানুবর্তিতা চাপিয়ে দেবার বিরোধী ছিলেন। আনন্দময় জীবন যাপনের মধ্য থেকে একটি শৃঙ্খলাবোধ আপনিই তাদের জীবনে বিকশিত হয়ে উঠবে একথা তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন। ফিনিক্স স্কুলের ছাত্রদের সম্বন্ধে দীনবন্ধু এণ্ডরুজকে একটি পত্রে তিনি লিখেছিলেন,—ফিনিক্স স্কুলের ছাত্রদের আমি অল্পই দেখেছি। যতটুকু দেখেছি তাতেই বুঝেছি তারা অত্যন্ত ভালো, কিন্তু এত সম্পূর্ণরূপে ভালো হওয়া অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। তাদের জীবনে আদর্শের জায়গা জুড়ে বসেছে নিয়মানুবর্তিতা। তারা একান্তভাবেই আদেশ পালন করার শিক্ষা পেয়েছে কিন্তু নিছক আদেশ পালন মানবতার পরিপন্থী; কারণ আদেশ পালনের মহত্ত্ব আদেশ পালনেই সীমাবদ্ধ নয়, এরা একদিন ইচ্ছে করতেই ভুলে যাবে, আর ইচ্ছে করাই পূর্ণতার বৃহত্তম অংশের প্রাপ্তি। ওরা অবিশ্যি সুখী বলেই মনে হয় কিন্তু সুখী হবার অধিকার কি ওদের আছে![১০]

বহুদিন পর 'রাশিয়ার চিঠি'তে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রসঙ্গ স্মরণ করে লিখেছিলেন, "আমার মনে আছে শান্তিনিকেতনে যখন দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে মহাত্মাজির ছাত্রেরা ছিল তখন একদিন তাদের মধ্যে একজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, আমাদের ছেলেদের সঙ্গে পারুলবনে বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করে কি? সে বললে, জানি নে। এ সম্বন্ধে সে তার দলপতিকে জিজ্ঞাসা করতে চাইলে। আমি বললুম, জিজ্ঞাসা পরে করো, কিন্তু বেড়াতে যেতে তোমার ইচ্ছে আছে কিনা আমাকে বলো। সে বললে, আমি জানি নে। অর্থাৎ, এ ছাত্র স্বয়ং কোনো বিষয়ে কিছু ইচ্ছা করবার চর্চাই করে না—তাকে চালনা করা হয়, সে চলে, আপনা থেকে তাকে কিছু ভাবতে হয় না।"[১১]

গান্ধীজির দৃষ্টিতে শান্তিনিকেতন আশ্রমের ছাত্রদের ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে পরনির্ভর এবং নিয়মানুবর্তিতায় হীন বলে মনে হয়েছিল, আর রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা আনন্দের অধিকারে বঞ্চিত এবং ইচ্ছার ক্ষেত্রে পরনির্ভর। কিন্তু উভয়ের মনে ছাত্রদের জন্য যে পরিপূর্ণতার আদর্শ ছিল তাতে ভেদ প্রায় ছিল না বললেই চলে। দুজনের আপাত বিরোধ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষারীতিতে আনন্দের অধিকার সম্বন্ধেও গান্ধীজির শ্রদ্ধা ছিল, তেমনি গান্ধীজির শিক্ষাপদ্ধতিতে নিষ্ঠার দিক্‌টিকেও রবীন্দ্রনাথ উপেক্ষা করেন নি। অচলায়তন নাটক রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বেই

১০ "What little I have seen of the Phoenix boys they are very nice, but it is a pity to be so completely nice. They have discipline where they should have ideals. They are trained to obey which is mad for human being, for obedience is good because it is good in itself but it is a sacrifice. These boys are in danger of forgetting to wish for anything and wishing is the best part of attainment. However, they are happy, though they have no business to be happy." (15 November 1914)

১১ রাশিয়ার চিঠি, ৬নং পত্র, ২ অক্টোবর ১৯৩০

(১৯১১ : ১৫ আষাঢ় ১৩১৮) লিখেছিলেন। তবু মনে হয় ইচ্ছার অধিকারে বঞ্চিত ফিনিক্স বিদ্যালয়ের যে ছাত্রটির কথা আগে বলা হয়েছে তার পূর্বাভাস যেন এই নাটকটির কোনো কোনো চরিত্রের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। ইচ্ছাশক্তির আনন্দরূপী পঞ্চক। তাঁর গুরু যেদিন কঠিন নিয়মের অচলায়তন ভেঙে আবির্ভূত হলেন সেদিন নৈষ্ঠিক মহাপঞ্চকের সর্ব-বিষয়ে পরাজয় ঘটলেও তাঁর অবিচলিত নিষ্ঠাকে স্বয়ং গুরুও প্রণাম জানিয়েছিলেন। গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের মতবিরোধের মধ্যে 'অচলায়তন' নাটকের এই তত্ত্বটিও বিধৃত হয়ে আছে।

২

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর রবীন্দ্রনাথ সক্রিয়ভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তবু রাজনৈতিক আন্দোলনের যে-কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের সঙ্গে তাঁর ভাবনা যুক্ত হয়ে ছিল। ১৯১৭ সনের কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি পদ গ্রহণেও তিনি সম্মত হয়েছিলেন। অ্যানি বেসান্তকে কংগ্রেসের অধিবেশনের সভানেত্রী করা নিয়ে যে বিতর্ক উপস্থিত হয়েছিল তার সমাধানের জন্য তিনি এ প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলেন। পরে বিতর্কের অবসান হওয়াতে তিনি স্বেচ্ছায়ই সরে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু অধিবেশনের প্রথম দিনে তিনি তাঁর বিখ্যাত India's Prayer কবিতাটি পাঠ করেন। (২৭ ডিসেম্বর ১৯১৭)। সেদিন তাঁর 'দেশ দেশ নন্দিত করি' গানটিও গাওয়া হয়। তৃতীয় দিনের উদ্‌বোধন হয় (২৯ ডিসেম্বর ১৯১৭) 'জনগণমন' গানটি দিয়ে। এই গানটি অবশ্য তার আগে ১৯১১ সনের কলকাতা কংগ্রেসে প্রথম গাওয়া হয়েছিল (২৭ ডিসেম্বর ১৯১১)। এ সব ঘটনার বিবরণ অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন রচিত 'ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত' গ্রন্থে আছে।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ জাপান হয়ে আমেরিকায় যান। তখন প্রথম-মহাযুদ্ধের কাল, কিন্তু আমেরিকা তখনও যুদ্ধে যোগ দেয় নি। জাপানে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ জাপানের মধ্যে ভারতবর্ষের আত্মিক যোগ এবং জাপানীদের চরিত্রের বিশিষ্টতার কথা যেমন একদিকে স্মরণ করেছেন, তেমনি আধুনিক জাপানী চরিত্রে পাশ্চাত্ত্যদেশের আগ্রাসী প্রভাবের কথাও দৃঢ়কণ্ঠে ব্যক্ত করেছিলেন। কানাডা ও আমেরিকায় তাঁর বক্তৃতার মধ্যেও পাশ্চাত্ত্য জীবনের অনিত্য উপাদান বিশেষ করে একদেশ-স্বাজাত্যবোধের প্রতি রবীন্দ্রনাথ বিরূপ মন্তব্য করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহযোগিতার কথাও তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল। নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে তাঁর মনে এ বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়ে উঠেছিল যে ভারতবর্ষ শুধু এশিয়ার নয় সমস্ত পৃথিবীর মিলনকেন্দ্র হয়ে উঠবে। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা এ-সময়েই তাঁর মনে স্পষ্ট রূপ নিতে আরম্ভ করে। আমেরিকার শিকাগো শহর থেকে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে তিনি যে পত্র লিখেছিলেন তাতে এর পরিচয় আছে। তিনি লিখেছিলেন।—

"শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগের সূত্র করে তুলতে হবে— ওইখানে সর্বজাতিক মনুষ্যত্ব চর্চার কেন্দ্রস্থাপন করতে হবে— স্বাজাতিক সংকীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আসছে— ভবিষ্যতের জন্যে যে বিশ্বজাতিক মহামিলন-যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তার প্রথম আয়োজন বোলপুরের প্রান্তরেই হবে" (২৮ অকটোবর ১৯১৬)।

মহাযুদ্ধের সময় রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী উভয়েরই মিত্রপক্ষের প্রতি সহানুভূতি ছিল এবং উভয়েই আশা

করেছিলেন যে যুদ্ধের অবসানে ইংরেজ সদিচ্ছা-প্রণোদিত হয়েই ভারতবর্ষের স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু যুদ্ধের ফলাফল মিত্রশক্তির অনুকূলে যাওয়া মাত্রই ইংরেজ সরকারের দৃষ্টির পরিবর্তন ঘটল। ১৯১৭ সনের শেষ ভাগে ভারতীয় বিপ্লবীদের ইংরেজবিরুদ্ধ কার্যকলাপ অনুসন্ধানের জন্য সিডিশন কমিটি (Sedition Committee) বা রৌলট কমিটি (Rowlatt Committee) গঠিত হয়। এর পূর্বে ভারতসচিব মণ্টেগু এবং ভারতের বড়োলাট চেমস্‌ফোর্ডের সম্পাদনায় ভারতবর্ষের শাসন সংস্কারের একটি পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল কিন্তু রৌলট কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯১৯ সনের মার্চ মাসে (২৩ মার্চ) ভারতে বিপ্লব দমনের একটি বিল গৃহীত হলে সারা ভারতে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। গান্ধীজি ঘোষণা করলেন যে, এই আইন ভারতবাসীর ন্যায়সঙ্গত এবং মানুষের জন্মগত অধিকারের পরিপন্থী। সুতরাং এই আইন প্রত্যাহারের দাবীতে তিনি সারা ভারতবর্ষে এক অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলন (Passive Resistance) গড়ে তুলবেন। বিল গৃহীত হবার সপ্তাহখানেক পরে সারা ভারতে গান্ধীজির নির্দেশে হরতাল পালিত হল। কিন্তু ভারতের বিপুল জনতাকে গান্ধীজির আদর্শ অনুযায়ী সর্বত্র অহিংস রাখা সম্ভব হল না। বিক্ষোভের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতাও দেখা গেল। গান্ধীজির গ্রেপ্তারের অসমর্থিত সংবাদে ধূমায়িত বিক্ষোভ প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়ল। পঞ্জাব প্রদেশে কিছু কিছু হিংসাত্মক কার্য-কলাপের ফলে সেখানে ১০ এপ্রিল তারিখে ফৌজী আইন বা Martial Law প্রবর্তিত হল। রবীন্দ্রনাথ রৌলট অ্যাক্ট এবং ফৌজী আইনের যেমন পুরোপুরি বিরোধিতা করেছিলেন, গান্ধী-প্রবর্তিত সত্যাগ্রহের পরিণতি সম্বন্ধেও তেমনি আশঙ্কান্বিত ছিলেন। ১৬ এপ্রিল তারিখে মহাত্মা গান্ধীর প্রতি তাঁর একটি খোলা চিঠিতে এই আশঙ্কা প্রতিফলিত। তিনি লিখেছিলেন,—শক্তির মত্ততা যে-কোনো রূপেই আসুক সে যুক্তিহীনতার নামান্তর। এ যেন অন্ধ ঘোড়ার গাড়ি টেনে নিয়ে যাবার মতো। এর মধ্যে নীতির যে উপাদানটুকু আছে তার একমাত্র প্রতিনিধি হচ্ছে সে মানুষটি যিনি ঘোড়াকে চালিত করেন। অহিংস প্রতিরোধের শক্তি স্বভাবতই নীতিসম্মত হবে সে কথা বলা যায় না। এই প্রতিরোধ সত্যের জন্যও যেমন প্রযুক্ত হতে পারে সত্যের বিরুদ্ধেও তেমনি প্রযুক্ত হতে পারে। সর্বপ্রকার শক্তির অন্তর্নিহিত এই বিপদ, সাফল্যের সম্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে কারণ শক্তি তখন লোভে পরিণত হয়। আমি জানি অনিষ্টকে ইষ্ট দ্বারা জয়ের শিক্ষাই আপনি দিয়েছেন। কিন্তু এই সংগ্রাম বীরের জন্য। যারা ক্ষণিকের উন্মাদনায় মত্ত তাঁদের জন্য নয়।—[১২]

চিঠির পূর্ণ বয়ানের এই অংশটুকু পাঠ করলেই রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কার স্বরূপটুকু বোঝা যাবে। পঞ্জাবে ইংরেজ অত্যাচার এবং ভারতীয় প্রতিরোধের বিকৃতি কতদূর তীব্র হয়ে উঠেছিল তার খবর ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের কাছে গোপন রাখা হয়েছিল। কিন্তু সে বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় (১৩ এপ্রিল ১৯১৯) অমৃতসহরের জালিয়ানওয়ালাবাগে সমবেত তীর্থযাত্রীদের উপর জঙ্গী শাসক জেনারেল ডায়ারের

---

১২ "Power in all its forms is irrational, it is like the horse that drags the carriage blindfolded. The moral element in it is only represented in the man who drives the horse. Passive resistance is a force which is not necessarily moral in itself; it can be used against truth as well as for it. The danger inherent in all force grows stronger when it is likely to gain success, for there it becomes temptation. I know your teaching it to fight against evil by the help of good. But such fight is for heroes and not for men led by impulses of the moment." *Indian Daily News*, 16 April 1919

অমানুষিক নির্যাতনের ফলে কয়েক শত লোক নিহত হয়। আহতের সংখ্যার কোনো হিসাব ছিল না। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পরও পঞ্জাবের সর্বত্র পুরুষনারী নির্বিশেষে পাশবিক অপমানের সম্মুখীন হল। মানুষকে উলঙ্গ করে পথের চৌমাথায় বেত মারা হল, পশুর মতো তাকে চার হাত পায়ে চলতে বাধ্য করা হল। রবীন্দ্রনাথ পূর্বের অত্যাচারের অল্পস্বল্প খবরেই বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর আশঙ্কাও সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল। তিনি শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় এসে পঞ্জাবের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-সভারও প্রস্তাব করেন কিন্তু সে প্রস্তাবে খুব সাড়া জাগে নি। অবশেষে তিনি ২৯ মে রাত্রি-বেলায় ইংরেজ সরকারের কাছে পত্র লিখে ইংরেজ সরকার -প্রদত্ত সম্মানসূচক খেতাব 'সার' উপাধি ত্যাগ করেন। সে পত্রের ভাষা ও গভীর ভর্ৎসনার সুর ভারতবাসীর মর্মমূলে চিরজাগ্রত হয়ে আছে। পঞ্জাবে ইংরেজ সরকারের নৃশংসতা কবিকে কি পরিমাণে বিচলিত করেছিল তার প্রমাণ সমসময়ে লেখা বহু চিঠি পত্রাদিতে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কয়েকটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তার মধ্যে অন্যতম হল ভানুসিংহের পত্রাবলীর দুটি পত্র। একটিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "আকাশের এই প্রতাপ আমি একরকম করে সইতে পারি কিন্তু মর্ত্যের প্রতাপ আর সহ্য হয় না। তোমরা তো পঞ্জাবে আছ, পঞ্জাবের দুঃখের খবর বোধহয় পাও। এই দুঃখের তাপ আমার বুকের পাঁজর পুড়িয়ে দিলে। ভারতবর্ষে অনেক পাপ জমেছিল তাই অনেক মার খেতে হচ্চে। মানুষের অপমান ভারতবর্ষে অভ্রভেদী হয়ে উঠেচে। তাই কতশত বৎসর ধরে মানুষের কাছ থেকে ভারতবর্ষ এত অপমান সইচে কিন্তু আজও শিক্ষা শেষ হয় নি। ইতি ৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬।"[১৩] তার পরের পত্রেই আছে "…কলকাতায় এসেচি। কেন এসেচি, হয়তো খবরের কাগজ থেকে ইতিমধ্যে জানতে পারবে। তবু একটু খোলসা করে বলি। তোমার লেফাফায় তুমি যখন আমার ঠিকানা লেখ, আমি ভাবলুম ঐ পদবীটা তোমার পছন্দ নয়। তাই কলকাতায় এসে বড়োলাটকে চিঠি লিখেচি— আমার ওই ছার পদবীটা ফিরিয়ে নিতে।…আমি বলেছি, বুকের মধ্যে অনেক ব্যথা জমে উঠেছিল, তারই ভার আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেচে— তাই ভারের উপরে আমার ঐ উপাধির ভার আর বহন করতে পারচি নে; তাই ওটা মাথার উপর থেকে নামিয়ে দেবার চেষ্টা করচি।…১লা জুন ১৯১৯।"[১৪] রবীন্দ্রনাথের 'সার' উপাধি ত্যাগের কিছুকাল পর (আগস্ট ১৯২০) গান্ধীজিও ইংরেজ সরকার -প্রদত্ত কাইজার-ই-হিন্দ স্বর্ণপদক এবং বুয়র যুদ্ধের স্বর্ণপদক ত্যাগ করেন।

জালিওয়ালানাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদের ঝঞ্ঝা কিছু স্তিমিত হয়ে এলে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে শান্তিনিকেতনের সাধনাক্ষেত্রে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার কাজে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন। অপর পক্ষে গান্ধীজি ভারতবর্ষের জনগণকে উজ্জীবিত করে তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯২০ সনের এপ্রিল মাসে মহাত্মা গান্ধীর আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ গুজরাট সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতিত্ব করেন (২ এপ্রিল ১৯২০)। সম্মিলনের শেষে তিনি একদিনের জন্য সাবরমতী আশ্রমে গিয়েছিলেন।

---

১৩ ভানুসিংহের পত্রাবলী, ৩৩নং পত্র

১৪ ভানুসিংহের পত্রাবলী, ৩৪ নং পত্র

এইবার ভ্রমণের সময় রবীন্দ্রনাথ আমেদাবাদ, ভবনগর, লিমডি (দেশীয় রাজ্য)[১৫] বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে অভূতপূর্ব সম্বর্ধনালাভ করেন। বিশ্বভারতীর এবং ভারতবর্ষের আদর্শ ব্যাখ্যা করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ এবং কর্মী সংগ্রহের চেষ্টায়ও ব্রতী হয়েছিলেন। "ভাবনগরের বৈষ্ণব সমাজের ভজনগান বিখ্যাত। ভক্ত নারীদের মন্দিরা বাজাইয়া মীরার ভজন ও সর্বদেহের ছন্দে ছন্দে প্রণিপাতন কবির ভক্ত হৃদয়ে অপরূপ আনন্দ দিয়াছিল। কবি একজন মন্দিরা-ভজনকারীকে সপরিবারে কিছুকালের জন্য শান্তিনিকেতনে আনেন ; সেই সূত্রে আশ্রমবাসীদের সুদূর কাথিবারের লোকসংগীত শুনিবার সুযোগ হইয়াছিল।"[১৬]

রবীন্দ্রনাথ এ-সময়ে ভারতবর্ষের ঐতিহ্য এবং বিশ্বভারতীর শিক্ষার আদর্শের প্রতিই সারা ভারতবর্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার সাধনায় রত ছিলেন। বিশ্বভারতীর সর্বভারতীয় ভিত্তিকে সম্পূর্ণতা দেবার এই প্রয়াসে তিনি সর্বজাগতিক সহযোগিতার কথাও চিন্তা করেছিলেন। সেজন্য ১৯২০ সনের মে মাসে তিনি ইউরোপ-ভ্রমণের জন্য প্রস্তুত হলেন। তাঁর মনে মনে আরও একটি আশা ছিল যে, মহাযুদ্ধের নিদারুণ ক্ষয়ক্ষতি ইউরোপের সাধারণ মানুষ এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিদের নিশ্চয়ই যুদ্ধের প্রতি বিমুখ করে তুলেছে। ভারতের মৈত্রীর আদর্শ প্রচারের ওটাই সর্বোত্তম সুযোগ। কিন্তু এক বৎসরের ঊর্ধ্বকাল ইউরোপের নানা দেশ এবং আমেরিকায় ভ্রমণ করে কবির এই অভিজ্ঞতা হল যে পশ্চিমের রাজনীতিজ্ঞরা একটি যুদ্ধের ক্ষত শুকিয়ে যাবার আগেই পরবর্তী যুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব শুরু করে দিয়েছে। এখানে-ওখানে আশার আলো তিনি যে দেখতে পান নি তা নয়, কিন্তু সমগ্র চিত্রটি তাঁর মনে আশঙ্কার ছায়াপাত করেছিল। বিশ্বভারতীর সূচনা তখন হয়ে গিয়েছে। বিশ্বভারতীর আদর্শ কবির ভাষায়— বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের মনের উপলব্ধিতে সত্যের বিচিত্র রূপ প্রত্যক্ষ করা।—[১৭] পাশ্চাত্ত্য দেশের জ্ঞান এবং প্রাচ্যের বিজ্ঞতার সমন্বয়ে গঠিত শান্তিনিকেতনের নীড়ে তিনি সমগ্র বিশ্ববাসীকে আহ্বান করছিলেন। কিন্তু মহাযুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইউরোপের প্রাঙ্গণে নূতনতর যুদ্ধের উদ্যম দেখে তাঁর হৃদয় ব্যথিত হয়েছিল। শান্তিনিকেতনে একটি ছাত্রকে[১৮] তিনি ইউরোপ থেকে এই চিঠি লিখেছিলেন, "ভারতের একটা জায়গা থেকে ভূগোল বিভাগের মায়াগণ্ডি সম্পূর্ণ মুছে যাক— সেইখানে সমস্ত পৃথিবীর পূর্ণ অধিষ্ঠান হোক— সেই জায়গা হোক আমাদের শান্তিনিকেতন। আমাদের জন্য একটি মাত্র দেশ আছে, সে হচ্ছে বসুন্ধরা ; একটি মাত্র নেশন আছে, সে হচ্ছে মানুষ। আমাদের শান্তিনিকেতন পৃথিবীর উদয়গিরির কাছে, সেখান থেকে অস্তগিরির লোকদের নিমন্ত্রণ করছি। তাঁরা আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবে। তাদের বরণ করে নেবার জন্য তোরা তোদের ঘরকে প্রশস্ত কর— হৃদয়কে উন্মুক্ত কর।"

১৯২০-২১ সনে ইউরোপ ও আমেরিকা -ভ্রমণের সময় রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষে খিলাফৎ এবং অসহযোগ আন্দোলনের খবরে উদ্বিগ্ন বোধ করছিলেন। তাঁর মতে খিলাফতের সঙ্গে ভারতের মুক্তিযুদ্ধ জড়িত হওয়া

১৫ লিমডিতে রবীন্দ্রনাথ হিন্দিতে ভাষণ দিয়েছিলেন

১৬ শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, তৃতীয় খণ্ড ; গুজরাট ভ্রমণ

১৭ "To study the mind of man in its realization of different aspects of truth from diverse point of view."

১৮ শ্রীসুহৃদকুমার মুখোপাধ্যায়

সংগত হয় নি। তিনি তখন ভারতবর্ষের বাইরে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহযোগিতার কথা প্রচার করছিলেন। ভারতবর্ষে ইংরেজের সঙ্গে অসহযোগের আন্দোলনও তাঁর অনুমোদন লাভ করে নি। তাঁর আশঙ্কা ছিল যে ইংরেজ সরকারের প্রতি অসহযোগের পথ ধরে ইংরেজ-বিদ্বেষ ভারতে সংক্রামিত হবে। ১৯২০ সনের ৪ সেপ্টেম্বর কলকাতার কনগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ-তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন। অধিবেশন শেষে মহাত্মা গান্ধী শান্তিনিকেতনে আসেন এবং শান্তিনিকেতনও অসহযোগ আন্দোলনের একটি কেন্দ্র হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় বসে বিচলিত হয়ে ওঠেন। দীনবন্ধু এণ্ডরুজের নিকট বিভিন্ন পত্রে এবং কয়েকটি প্রবন্ধে তিনি তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, অসহযোগের ঘোষণার মধ্যে যেন অনভিজাত কিছু আমি দেখতে পাই। এতেই আমি সারাক্ষণ ব্যথিত হয়ে আছি।... 'অসহযোগ' কথাটিতে এখনও আমার দম বন্ধ হয়ে আসে।[১৯] কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের ক্রমপ্রসার ঘটতে থাকে। কনগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মহাত্মা গান্ধী এ সময়েই তাঁর পদক এবং সম্মান প্রত্যর্পণ করেন। জুন মাসের ইয়ং ইণ্ডিয়া কাগজে গান্ধীজি রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কার উত্তর দেন।[২০] ভারতবর্ষে ফিরে এসে জুলাই মাসে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি ওই প্রবন্ধগুলির উপর নিবদ্ধ হয় এবং আগস্ট মাসে শিক্ষার মিলন (Union of Cultures) এবং সত্যের আহ্বান (Call of Truth) বলে দুটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধগুলিতে তিনি অসহযোগ, চরকা, বিদেশী বস্ত্রে অগ্নিসংযোগ এবং পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা বর্জন সম্বন্ধে তাঁর মতামত প্রকাশ করেন। প্রবন্ধগুলির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় কিছু পরে এবং মহাত্মা-গান্ধী Young India কাগজে রবীন্দ্রনাথের অভিমতের উত্তরও দেন। কিন্তু তার আগে কলকাতায় এসে ১৯২১ সনের ৬ সেপ্টেম্বর তারিখে গান্ধীজি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন। এক রুদ্ধদ্বার কক্ষে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজি এবং এণ্ডরুজের মধ্যে এক আলোচনা হয়। আলোচনা আপাতদৃষ্টিতে ফলপ্রসূ হয় নি। কারণ উভয়েই তাঁদের নিজস্ব মতে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। বুদ্ধির জগতে যদিও দুজনের মিল হল না তবু আধ্যাত্মিক জগতে বন্ধুত্বের বন্ধন কিন্তু শিথিল হল না। 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধের অনুবাদ ১৯২১ সনের অক্টোবর মাসের Modern Reviewতে প্রকাশিত হয়। বাংলা প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত করলেই রবীন্দ্রনাথের মনোভাব উপলব্ধি করা সহজ হবে। "আজ বিশ্বচিত্ত-উদ্‌বোধের প্রভাতে আমাদের দেশে জাতীয় কোনো প্রচেষ্টার মধ্যে যদি বিশ্বের সর্বজনীন কোনো বাণী না থাকে তা হলে তাতে আমাদের দীনতা প্রকাশ করবে। আমি বলছি নে, আমাদের আশু প্রয়োজনের যা-কিছু কাজ আছে তা আমরা ছেড়ে দেব। সকাল বেলায় পাখি যখন জাগে তখন কেবলমাত্র আহার অন্বেষণে তার সমস্ত জাগরণ নিযুক্ত থাকে না, আকাশের আহ্বানে তার দুই পাখা সায় দেয় এবং আলোকের আনন্দে তার কণ্ঠে গান জেগে ওঠে। আজ সর্বমানবের চিত্ত আমাদের চিত্তে তার ডাক পাঠিয়েছে; আমাদের চিত্ত আমাদের ভাষায় তার সাড়া দিক, কেননা ডাকের যোগ্য সাড়া দেওয়ার ক্ষমতাই হচ্ছে প্রাণশক্তির লক্ষণ।"[২১] "সত্যের আহ্বান" বা Call of Truthএর উত্তরে গান্ধীজি Young Indiaতে ১৩ অক্টোবর তারিখে "The Great Sentinel" বলে একটি প্রবন্ধ লেখেন। বিরুদ্ধ মতবাদ সত্ত্বেও পরস্পরের প্রতি কি পরিমাণ শ্রদ্ধা পোষণ করা যায় এই দুটি প্রবন্ধ তার

---

১৯ *Letters to a Friend,* 7 January 1921

২০ "The Poet's Anxiety" এবং "English Learning" *Young India,* 1 June 1921

২১ সত্যের আহ্বান : কালান্তর

আদর্শরূপে পরিগণিত হতে পারে। গান্ধীজি রবীন্দ্রনাথকে 'মহাপ্রহরী' আখ্যা দিয়ে বলেছিলেন যে, এ আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আমাদের ত্রুটিবিচ্যুতি এবং পদস্খলনের থেকে সাবধান করার জন্য ভারতবর্ষের প্রবীণ এক জননায়ক এখনও আমাদের মধ্যে বর্তমান আছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতের সঙ্গে তাঁর পার্থক্যও তিনি এই প্রবন্ধেই ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, ক্ষুধার্ত এবং অলস জনগণের কাছে ভগবানও যে গ্রহণযোগ্য মূর্তিতে আবির্ভূত হতে সাহসী হন তা হল 'কাজ' এবং খাদ্য ও পারিশ্রমিকের প্রতিশ্রুতি।—[২২] মহাত্মা গান্ধী গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, স্বাধীনতা লাভই আমাদের জনগণের সর্বাঙ্গীণ শক্তির প্রথমতম সোপান আর রবীন্দ্রনাথের ধ্যানে এ সত্য প্রকাশিত হয়েছিল মানবমনের মুক্তিই রাজনৈতিক স্বাধীনতার উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করতে পারে। প্রকাশ্য বাদানুবাদ অবশ্য এখানেই শেষ হয়ে গেল এবং মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে তাঁর সর্বশক্তি নিয়োজিত করলেন। আর রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর সংগঠনে আত্মনিয়োগ করলেন। ১৯২১ সনের ডিসেম্বর মাসে অসহযোগ আন্দোলনের অপ্রত্যাশিত দুর্দিন ঘনিয়ে এল। উত্তর-প্রদেশের চৌরীচর নামক গ্রামের জনগণ হিংসাত্মক কার্যকলাপের ফলে একুশ জন চৌকিদারের জীবনান্ত হল। ১৯২২ সনের ফেব্রুআরি মাসে কনগ্রেস নূতনতম গঠনমূলক কার্যপন্থা গ্রহণ করেন। একই মাসে বিশ্বভারতীর পল্লীসংগঠন কার্যক্রমের প্রবর্তন হয় শ্রীনিকেতনে। ভারতবর্ষের ব্যাপক ক্ষেত্রে গান্ধী-প্রদর্শিত এই গঠনমূলক কার্যক্রম যুগান্তরের সূচনা করেছিল সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথের গঠনমূলক কার্যক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু স্বাধীন ভারতবর্ষের গ্রামীণ সংগঠনে তাঁর প্রবর্তিত বহু পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, সে কথা আজও প্রত্যক্ষভাবে অনেকের গোচরে আসে নি।

১৯২২ সনের ৪ ডিসেম্বর তারিখে সিংহল থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় বার সাবরমতী আশ্রমে যান। তখন মহাত্মা গান্ধী কারারুদ্ধ। অসহযোগ আন্দোলনের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ সমালোচনা করেছিলেন কিন্তু তাঁর সাবরমতী আশ্রমের ভাষণে গান্ধীজির প্রতি যে-শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছিল তার তুলনা বিরল। তাঁকে তিনি 'বিশ্বকর্মা' আখ্যা দেন এবং ত্যাগের দ্বারা মহাত্মাজির হৃদয়ের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে আশ্রমবাসীকে তাঁর মহৎকার্যের অংশীদার হতে বলেন।

১৯২৫ সনের মে মাসে চরকা ও খদ্দরের প্রচারকল্পে মহাত্মা গান্ধী কলকাতায় আসেন। ২৯ মে তারিখে তিনি শান্তিনিকেতনে পদার্পণ করেন। চরকা ও খদ্দর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর বড়োদাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি দীর্ঘ আলোচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ পূর্বাপরই চরকার বিরোধী ছিলেন, কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর অনুরোধে চরকা সম্বন্ধে মন্তব্য করে দীর্ঘ একটি প্রবন্ধ লেখেন 'সবুজ পত্রে' (১৩৩২ ভাদ্র)। পরের মাসেই 'স্বরাজ সাধন' প্রবন্ধে (সবুজ পত্র ১৩৩২ আশ্বিন) তাঁর মতামতকে আরও স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন। এই প্রবন্ধগুলির সারমর্ম 'The Cult of the Charka' নামে ১৯২৫ সনের ডিসেম্বর মাসে Modern Reviewতে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের মতে চরকা কাটা একটি বাহ্যিক ক্রিয়া, তাকে স্বরাজের সঙ্গে জড়িত করা যায় না। মহাত্মা গান্ধী Young India পত্রিকায় The Poet and the Charka নামে একটি প্রতিবাদ মুদ্রিত করে চরকা সম্বন্ধে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। এক্ষেত্রেও দুজনের মতপার্থক্য দূরীভূত হয় নি। দ্বিজেন্দ্রনাথ অবশ্য গান্ধীর মতাবলম্বী ছিলেন।

---

২২ "To a people famishing and idle the only acceptable form in which God can dare to appear is Work and promise of food as wages"

১৯২৪ থেকে আরম্ভ করে ১৯৩১ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর অনেক দেশ পর্যটন করেছিলেন। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল ১৯২৪ সনের মার্চ থেকে মে মাসে চীন-ভ্রমণ, ১৯২৪-২৫ সনে দক্ষিণ আমেরিকা, ১৯২৭ সনের জুলাই থেকে অক্টোবর পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং ১৯৩০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে রাশিয়া ভ্রমণ। এই ভ্রমণের ফলে একদিকে যেমন পূর্ব-এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে ভারতবর্ষের যুগব্যাপী সাংস্কৃতিক ঐক্যের প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়, তেমনি পাশ্চাত্ত্যখণ্ডে রাশিয়ার নূতনতম মতবাদ এবং পরীক্ষানিরীক্ষার প্রতিও তিনি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠেন। ১৯৩০ সনে গান্ধীজি যখন আইন-অমান্য আন্দোলনের সূচনা করেন এবং বিখ্যাত ডাণ্ডি অভিযান আরম্ভ করেন তখন রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে Religion of Man বক্তৃতায় যদিও সর্বজাগতিক মানুষের বিশেষত্বের কথা বলেছিলেন, তবু ভারতবর্ষের বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁকে সর্বদাই পীড়া দিচ্ছিল। চট্টগ্রামে হিংসাশ্রয়ী বীর যুবক দলের কীর্তিকাহিনীও তাঁর মনকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল। বিলাতের সংবাদপত্রে তিনি ইংরেজ সরকারের দমননীতিরও ঘোরতর প্রতিবাদও করেছিলেন। ইংরেজ-সরকারের পক্ষ থেকে যখন গোল টেবিল বৈঠকের আহ্বান এল তখন রবীন্দ্রনাথ বিবৃতি প্রচার করে গান্ধীজিকে এই আলোচনায় যোগ দেবার জন্যও অনুরোধ করেন। অনেক বিতণ্ডা এবং আলোচনার পর গান্ধীজি ১৯৩১এর সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য ইংলণ্ডে যান। এ সময়ের কাছাকাছি মেদিনীপুরের হিজলী জেলে নিরস্ত্র অন্তরীণ বন্দীদের উপর গুলি চালনায় দুজন যুবক নিহত এবং অনেকে আহত হন। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত মন্টুমেন্টের পাদদেশে একটি বিরাট সভায় রবীন্দ্রনাথ ভাষণ দেন। সে ভাষণে মৃত্যুঞ্জয়ী বীর যুবকদের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন এবং সরকারী শাসনযন্ত্রের প্রতি কঠোর ধিক্কার ধ্বনিত হয়েছিল। অন্তহীন চক্রপথে হিংসা ও প্রতিহিংসার যুগল তাণ্ডবনৃত্য বন্ধ করার জন্যও আবেদন ছিল।

১৯৩১ সনের ডিসেম্বর মাসে গান্ধীজি ব্যর্থমনোরথ হয়ে গোল টেবিল বৈঠক থেকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং নূতনতম আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। ৩রা জানুয়ারি তারিখ ভোর চারটের সময় রবীন্দ্রনাথের কাছে বোম্বাই থেকে একটি চিঠি লেখেন। সে চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর পরম শ্রদ্ধা ও নির্ভরতা প্রকাশ পেয়েছিল। চিঠির তারিখ বোম্বাই ৩. ১. ৩২। তিনি লিখেছিলেন—

প্রিয় গুরুদেব

আমার ক্লান্ত দেহটি এইমাত্র বিছানায় মেলে দিয়েছি। ঘুমের চেষ্টা করতে করতে আপনার কথাই আমি ভাবছি। আমার ইচ্ছে ত্যাগের যে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হবে তাতে আপনার শ্রেষ্ঠ আহুতি আপনি দান করবেন।

ভালোবাসা জানবেন।[২৩]

এই চিঠি উনি ভোর চারটের সময় মুখে মুখে তাঁর একান্ত-সচিবকে বলে দিয়েছিলেন কিন্তু চিঠি সই করার আগেই পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেন। পরে মহাদেব দেশাই এ চিঠি রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে

---

২৩ "Dear Gurudev,

I am just stretching my tired limbs on the mattress and as I try to wink a sleep I think of you. I want you to give your best to the sacrificial fire that is being lighted.

With love."

দেন। এ সময় গান্ধীজি আলোচনার জন্য বড়োলাটের কাছে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। সে প্রার্থনা পূর্ণ না করে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হল। রবীন্দ্রনাথ সংবাদপত্রে একটি প্রতিবাদ-পত্র প্রেরণ করেন। গান্ধীজির পরবর্তী পরিকল্পনা প্রকাশিত হল না, তাঁর হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হবার আগেই তাঁকে কারারুদ্ধ হতে হল। এ সময় রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবের সপ্তাহব্যাপী-অনুষ্ঠানের আয়োজন চলছিল। গান্ধীজির কারাবরণের সংবাদ পাবার পর উৎসব-অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হল। মহাত্মাজির পর জওহরলাল প্রমুখ আরও অনেক নেতা কারারুদ্ধ হন। কবি এতে বিচলিত হয়ে পড়েন। প্রধান মন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডকে তিনি একটি তারবার্তা প্রেরণ করেন।[২৪] তাতে তিনি বলেছিলেন যে ব্রিটিশ সরকারের দমননীতি ভারতবাসীর সঙ্গে ইংরেজের প্রচণ্ড বিভেদ সৃষ্টি করছে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে।

দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার পথ ধরেই ব্যর্থ হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনালড্‌এর উপর একটি সর্বজনগ্রাহ্য সমাধান রচনার ভার দেওয়া হল। তাঁর রচিত ব্যবস্থায় ভাবী ব্যবস্থাপক সভায় হিন্দু-মুসলমানের ভেদ তো রইলই, তার উপর বর্ণহিন্দু এবং তপশিলী হিন্দুর মধ্যে নূতন ভেদ সৃষ্টির প্রয়াস করা হল। এটি কুখ্যাত Communal Award বা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নামে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছে। এই কূটনৈতিক চালের বিরুদ্ধে দেশময় বিক্ষোভ দেখা দিল। রবীন্দ্রনাথ সংবাদপত্রে বিবৃতি দান করে এই নীতির বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সংহত হতে উপদেশ দিলেন। সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার প্রতিবাদে মহাত্মাজি আমৃত্যু অনশনের সংকল্প গ্রহণ করলেন। বর্ণহিন্দু এবং অনুন্নত হিন্দু প্রতিনিধিরা নিজেদের মধ্যে আপস-রফা করে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীকে তার করেন, কিন্তু তার জবাব না আসায় মহাত্মাজির অনশনের সংকল্প অটুট থাকে। অনশন আরম্ভের তারিখ ছিল ৪ঠা আশ্বিন (২০ সেপ্টেম্বর)। তার আগের দিন রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজিকে একটি তারবার্তা পাঠান। তাতে তিনি বলেন, ভারতবর্ষের ঐক্য এবং তার সামাজিক সংহতির জন্য অমূল্য প্রাণ ত্যাগ করার গৌরব আছে। যদিও আমাদের শাসকগোষ্ঠীর উপর এর কি প্রভাব হবে অনুমান করা কঠিন। তারা হয়তো আমাদের জাতীয় চিত্তে এর অপরিমেয় প্রাধান্যের পরিমাপই করতে পারবে না। কিন্তু আমাদের মনে হয় আত্মত্যাগের এই পরম আবেদন জাতির বিবেকের দ্বারে নিষ্ফল হয়ে ফিরবে না। আমার নিশ্চিত আশা যে আমরা নিষ্ক্রিয়তার দ্বারা আমাদের জাতির এই চরম বিপদকে তার শেষ সীমায় পৌঁছতে দেব না। আমাদের বেদনার্ত অন্তর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় আপনার মহত্তম কৃচ্ছ্রসাধনের অনুসরণ করবে।[২৫] এই

২৪ "The sensational policy of indiscriminate repression being followed by Indian Government starting with imprisonment of Mahatmaji is most unfortunate in causing permanent alienation of your people from yours making it extremely difficult for us to co-operate with your representations for peaceful political adjustment."

২৫ "It is worth sacrificing precious life for the sake of India's unity and her social integrity (stop). Though we cannot anticipate what effect it may have upon our rulers who may not understand its immense importance for our people we feel certain that the supreme appeal of such a self-offering to the conscience of our own countrymen will not go in vain (stop). I fervently hope that we will not callously allow such national tragedy to reach its extreme length (stop). Our sorrowing hearts will follow your sublime penance with reverence and love."

তারবার্তা সরকারী সেনসর ব্যবস্থার কবলে পড়ে বিলম্বিত হয়। গান্ধীজি তাঁর অনশনের দিন প্রভাতে রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন চেয়ে একটি বার্তা পাঠান কিন্তু বার্তাটি ডাকে পাঠাবার আগেই রবীন্দ্রনাথের বার্তা তাঁর হস্তগত হয়। রবীন্দ্রনাথের তারবার্তাটি যেমন অনুনকরণীয় ভাষায় রচিত, মহাত্মা গান্ধীর বার্তাটিও তেমনি অমূল্য। দুজনের প্রতি দুজনের শ্রদ্ধা ও প্রীতির এর থেকে মহত্তম নিদর্শন দুর্লভ। গান্ধীজি লিখেছিলেন, আজ মঙ্গলবার, এখন ভোর তিনটে। আজই দ্বিপ্রহরে আমি অগ্নিগর্ভ দ্বারপথে প্রবেশ করব। এই প্রয়াসকে যদি আপনি আশীর্বাদ করতে পারেন তবে আমি তা যাচ্ঞা করি। আপনি প্রকৃত বন্ধু কারণ আপনি অকপট বন্ধু, আপনার মনোভাব আপনি কখনও গোপন করেন নি। আপনার কাছ থেকে সপক্ষে বা বিপক্ষে দৃঢ় মতামত আশা করেছিলাম। কিন্তু আপনি সমালোচনা থেকে বিরত হয়ে আছেন। যদিও এখন অনশনের সময়ই আমাকে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হবে তবুও যদি আমার পন্থা আপনি অনুমোদন না করেন, আপনার সমালোচনার গুরুত্ব আমার কাছে অপরিসীম।…যদি আমার কার্য আপনার অন্তরের অনুমোদন লাভ করে তবে আমি আপনার আশীর্বাদ চাই। এই আশীর্বাদ আমাকে শক্তি দেবে।…বেলা সাড়ে দশটা। এই পত্র আমি জেল-সুপারিনটেনডেনটের হাতে দিতে যাচ্ছি, তখুনি আপনার অনবদ্য প্রীতিপূর্ণ তারবার্তা আমি পেলাম। ঝঞ্ঝার মধ্যে প্রবেশ করতে যাচ্ছি, আপনার বার্তা আমাকে শক্তি দেবে।[২৬]

সেদিনই মহাত্মা গান্ধী আবার একটি তারবার্তা পাঠিয়ে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ গ্রহণ করেছিলেন। সে বার্তার ভাষাও অনবদ্য।— ভগবানের দয়া সর্বদাই লাভ করেছি। আজ অতি প্রত্যুষে আপনাকে পত্র লিখেছি, যদি আমার কাজ অনুমোদন করেন তবে আমাকে আশীর্বাদ করুন। কি আশ্চর্য, এই মাত্র পাওয়া আপনার বার্তায় আপনার অকৃপণ আশীর্বাদ আমাকে অভিষিক্ত করেছে। ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।[২৭]

রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির আত্মাহুতির সংকল্পে অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মোৎসবে তাঁর সভাপতিত্ব করার কথা ছিল। এই ঘটনার জন্য শেষ মুহূর্তে তিনি অনিচ্ছা প্রকাশ করে চিঠি পাঠান। ৪ঠা আশ্বিন সকালে তিনি মন্দিরে গান্ধীজির কল্যাণে উপাসনা করেন। তাঁর পঠিত ভাষণ '৪ঠা আশ্বিন' নামে পরে প্রকাশিত হয়েছিল। নিকটবর্তী গ্রামের অধিবাসীদের নিকট তিনি মহাত্মাজির এই অনশনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন এবং দেশবাসীর উদ্দেশ্যে অস্পৃশ্যতা বর্জনের আবেদন করেন। কিন্তু হৃদয়ের অশান্তি প্রশমিত হয় নি। শেষ পর্যন্ত তিনি পুনা যাত্রার সংকল্প করেন। তাঁর পুনা পৌছনোর

---

২৬ "This is early morning 3 O'clock of Tuesday. I enter the fiery gate at noon—if you can bless the effort, I want it. You have been to me a true friend because you have been a candid friend often speaking your thoughts aloud. I had looked forward to a firm opinion from you one way or the other. But you have refused to criticise. Though it can now only be during my fast, I will yet prize your criticism, if your heart condemns my action . . . If your heart aapproves of the action, want your blessing. It will sustain me . . . 10-30 A.M. Just as I was handing this to the Superintendent, I got your loving magnificent wire. It will sustain me in the midst of the storm I am about to enter . . . ."

২৭ "Have always experienced God's mercy, very early this morning I wrote seeking your blessing if you could approve action, and behold I have it in abundance in your message just received. Thank you."

অব্যবহিত পরেই রাজনৈতিক ব্যাপারের মোটামুটি সমাধান হয়ে যায় এবং বিকেল চারটায় (২৬ সেপ্টেম্বর) রবীন্দ্রনাথের সমক্ষেই গান্ধীজি অনশন ভঙ্গ করেন।[২৮] তাঁর অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ 'জীবন যখন শুকায়ে যায়' এই গানটি করেন। সে গান আজীবন মহাত্মাজির পরম প্রিয় ছিল। এর পর যখনই শান্তিনিকেতনে এসেছেন বলেছেন, Give me that song— সে গানটি আবার গাও।

এই ঘটনার পরবর্তী-কালে মহাত্মাজির অস্পৃশ্যতা বর্জন এবং অন্যান্য গঠনমূলক কাজের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একাত্মতা ছিল। কিন্তু তবু মতান্তর ঘটে নি তা নয়। ১৯৩৪ সনে ১৫ জানুয়ারিতে বিহারে নিদারুণ ভূমিকম্প হয়। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে মহাত্মাজি ভগবানের ক্রোধের প্রকাশ বলে বর্ণনা করে এক বিবৃতি দেন। তাঁর মতে অস্পৃশ্যতার পাপে ভারতবর্ষের এক অংশকে এই শাস্তি পেতে হল। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির এই উক্তির দৃঢ় প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, অস্পৃশ্যতা পাপ কিন্তু ভূমিকম্পকে এই পাপের ফল বর্ণনা করাও তেমনি পাপ। জওহরলাল তাঁর আত্মজীবনীতে মহাত্মা গান্ধীর এই বিবৃতিকে 'বিভ্রান্তিজনক' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদকে তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার মীমাংসা Poona Pact নামে পরিচিত। এই Pactকে অবলম্বন করে মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধে বাংলা দেশের জনমত কিছু পরিমাণে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। বিহার ভূমিকম্পের অব্যবহিত পরে বাংলা দেশে মহাত্মাজির সম্ভাব্য আগমন উপলক্ষে কোনো কোনো মহল থেকে বিক্ষোভ প্রদর্শনের প্রস্তাব করা হয়। রবীন্দ্রনাথ দৃঢ় ভাষায় এই কাপুরুষ প্রস্তাবের নিন্দা করেন। (৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪)। ১৯৩৪ এর জুলাই মাসে গান্ধীজি যখন কলকাতায় আসেন তখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর একবার দেখা হয়েছিল।

১৯৩৬ সনে রবীন্দ্রনাথ 'নৃত্যনাট্য' নামে অভিনয়ের একটি নূতন আঙ্গিকে 'চিত্রাঙ্গদা'র কাহিনীর নূতনতর রূপ দান করেন। শান্তিনিকেতনের কলাচর্চার প্রচার এবং বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহ এই দুই উদ্দেশ্যে 'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা' নিয়ে রবীন্দ্রনাথ উত্তর-ভারতের বিভিন্ন শহর পরিভ্রমণের কার্যসূচি গ্রহণ করেন। পাটনা এলাহাবাদ লাহোর ইত্যাদি স্থান ভ্রমণ করে ২৫ মার্চ তারিখে রবীন্দ্রনাথ সদলে দিল্লী পৌছান। সেদিনই সন্ধ্যায় গান্ধীজি এবং কস্তুরবার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। গান্ধীজি কবির পরিণতবয়সে বিশ্বভারতীর ঋণশোধের জন্য এই পরিশ্রমের প্রয়াস দেখে ব্যথিত হন এবং কোনো একটি অজ্ঞাতপরিচয় গুণগ্রাহীর কাছ থেকে ষাট হাজার টাকার একটি চেক সংগ্রহ করে কবির হাতে দেন। তাঁর অনুরোধে অন্যান্য শহরের কার্য-সূচি (কেবল মিরাট ছাড়া) বাতিল হয়ে যায়। গান্ধীজির এই শ্রদ্ধার দান শান্তিনিকেতনের অধিবাসী আজও গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন।

১৯৩৭ সনের সেপ্টেম্বরের ১০ তারিখে রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে অচৈতন্য হয়ে যান। এই খবর প্রকাশিত হলে দেশ এবং বিদেশের নানা স্থান থেকে কবির সংবাদ জানতে চেয়ে বহু উদ্বিগ্ন গুণগ্রাহীর পত্র এবং তারবার্তা আসতে থাকে। দুদিন সম্পূর্ণ অচৈতন্য থেকে এক সপ্তাহের মধ্যেই তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। এই অচৈতন্য অবস্থার অনুভূতি 'প্রান্তিক' নামক কাব্যগ্রন্থে বিধৃত হয়ে আছে। চৈতন্যলাভের পর তিনি প্রথমে দুটি শিশুর পত্রের জবাব দেন, তার পরই গান্ধীজিকে লেখেন।— কিছুকাল অচৈতন্য অবস্থার পর

---

২৮ এই ঘটনার পূর্ণ বিবরণ "Mahatmaji and the Depressed Humanity" গ্রন্থে আছে

আপনার সস্নেহ উদ্বেগই আমাকে প্রাণের জগতে প্রথম অভ্যর্থনা করে নিয়েছিল।[২৯] কবির এই অসুস্থতার পর তিনি যখন কলকাতায় ছিলেন, তখন মহাত্মাজি কনগ্রেসের কার্য উপলক্ষে কলকাতায় এলেন। রাজবন্দী সমস্যার সমাধান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা এবং কবির কঠিন রোগভোগের পর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎও মহাত্মাজির কলকাতা আগমনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু কঠিন পরিশ্রমে তিনি ক্লান্ত ছিলেন। কবির সঙ্গে দেখা করার জন্য মোটরে উঠতে গিয়ে তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। শরৎচন্দ্র বসুর কাছ থেকে টেলিফোনে এই খবর পেয়ে রবীন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ গান্ধীজির শয্যাপার্শ্বে গিয়ে উপস্থিত হন। গান্ধীজির সঙ্গে নানা বিষয়ে তাঁর আলোচনা হয়। কনগ্রেসের আলোচ্য 'বন্দেমাতরম' গানটির জাতীয়-সংগীতরূপে গৃহীত হবার প্রস্তাবের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মতামতও প্রকাশ করেন।

গান্ধীজির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রকাশ্যে সর্বশেষ মতান্তর ঘটে ১৯৩৭ সনের ডিসেম্বর মাসে বুনিয়াদি শিক্ষা-পদ্ধতি প্রচলন সম্পর্কে। এই মতান্তর যে অনিবার্য তা এই প্রবন্ধের সূচনায় গান্ধীজির শান্তিনিকেতনে প্রথম পদার্পণ উপলক্ষ্যেই বর্ণিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে যে শিক্ষাদর্শের পরিকল্পনা করেছিলেন তার মধ্যেও বিচিত্র কর্মের প্রবর্তনা ছিল। কিন্তু সে কর্ম সৃষ্টিমূলক, তা জীবনের আদর্শকে উন্নয়নের সহায়ক। গান্ধীজি ১৯৩৭ সনের ডিসেম্বর মাসে যে বুনিয়াদি শিক্ষার প্রবর্তন করেন তা ব্যাবহারিক জীবনের বিশেষ কয়েকটি কর্মকে কেন্দ্র করে পরিকল্পিত। তা ছাড়া এই শিক্ষার ব্যয় ছাত্রদের পরিশ্রমলব্ধ উপার্জনেই নির্বাহ হবার কথা। রবীন্দ্রনাথ সেজন্য এ শিক্ষাদর্শকে বস্তুবাদী এবং বিশেষভাবে ব্যাবহারিক বলে উল্লেখ করেন। তাঁর মতে এই পদ্ধতি ছাত্রদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক হতে পারে না। জীবনের থেকে জীবিকাকে সেখানে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ১৯৩৭ সনের শেষ ভাগে কলকাতায় অনুষ্ঠিত National Educational Fellowshipএর সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ এই মতামত ব্যক্ত করেন। দুজনের শিক্ষাদর্শনের তুলনামূলক আলোচনার আজও অবসান হয় নি। তবে বোধ হয় সংক্ষেপে এ কথা বলা চলে যে অত্যন্ত সংগত কারণেই গান্ধীজির আদর্শ তাৎক্ষণিক প্রয়োজনকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের আদর্শ কালের সীমাকে অতিক্রম করে বিরাজিত।[৩০]

১৯৩৮ সনের ২২ মার্চ তারিখে কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান্ধীজির সাক্ষাৎ হয়। দুজনে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির বিষয় আলোচনা করেন। ১৯৩৯ সনের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কনগ্রেসের অন্যান্য নেতার মতবিরোধ ঘটে। কনগ্রেসের মধ্যে ভাঙন দেখা দেয়। রবীন্দ্রনাথ এই মতবিরোধ অতিক্রম করে কনগ্রেসের ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য গান্ধীজিকে এক তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু কনগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি সে অনুরোধ রক্ষা করতে অসমর্থ হন।

রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে গান্ধীজি শেষবারের মতো সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে আসেন ১৯৪০ সনের ১৭ ফেব্রুয়ারি। সেদিন অপরাহ্ণে আম্রকুঞ্জে গান্ধীদম্পতির সংবর্ধনা হয়। ১৮ ফেব্রুয়ারি গান্ধীজি বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করেন। সন্ধ্যায় তিনি 'চণ্ডালিকা' নাটকের অভিনয় দেখেন। ১৯ ফেব্রুয়ারি তাঁর শান্তিনিকেতন ত্যাগে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে হাতে-হাতে একটি পত্র দেন। সে পত্র যেমন করুণ তেমনি

---

২৯ "The first thing which welcomed me into the world of life after the period of stupor I passed through was your affectionate anxiety . . ."

৩০ এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত 'রবীন্দ্রজীবনী' চতুর্থ খণ্ডে দ্রষ্টব্য

গান্ধীজির প্রতি গভীর বিশ্বাসে পরিপূর্ণ। তিনি লিখেছিলেন।— আপনার নিরাপদ আশ্রয়ে আপনি এই প্রতিষ্ঠানটিকে গ্রহণ করুন, যদি একে আপনি জাতীয় সম্পদ্ বলে স্বীকার করেন তবে একে স্থায়িত্বের প্রতিশ্রুতি দিন। বিশ্বভারতীর তরণী আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সঞ্চয়ে ভরে দিয়েছি। আমার আশা, আমার দেশবাসীর বিশেষ যত্নে এটি রক্ষিত হবে।[৩১] গান্ধীজি বিশ্বভারতী রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন যে মহামনীষীর এই সৃষ্টিকে ভগবান স্বয়ংই রক্ষা করবেন। ২ মার্চ তারিখের 'হরিজন' পত্রিকায় তাঁর এই ভাবনাটি প্রকাশিত হয়েছিল।— এই প্রতিষ্ঠানটির রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করার ক্ষমতা কি আমার আছে? এটি ভগবানেরই প্রতিশ্রুতি বহন করছে কারণ এটি একটি তদগত আত্মার সৃষ্টি।[৩২]

১৯৪০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে কবি কালিমপংএ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ২৯ সেপ্টেম্বর তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। এই অসুস্থতার সময় গান্ধীজি তাঁকে একটি অপূর্ব আবেগময় চিঠি লিখেছিলেন। তাতে ছিল, প্রিয় গুরুদেব, আপনাকে যে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করে যেতেই হবে। সমগ্র মানবসমাজের আপনাকে প্রয়োজন।[৩৩]

রবীন্দ্রনাথের শেষ জন্মদিনে (১৯৪১ মে) গান্ধীজি তারবার্তায় বলেছিলেন, চারকুড়ি বছর আমি যথেষ্ট মনে করি নে, পাঁচকুড়ি পূর্ণ করুন এই কামনা।[৩৪] রবীন্দ্রনাথ উত্তরে লিখেছিলেন, চারকুড়িই স্পর্ধার মতো, পাঁচকুড়ি হলে অসহনীয় হবে।[৩৫]

প্রয়াণের কিছুদিন পূর্বে (৪ জুন ১৯৪১) রবীন্দ্রনাথ মিস র‍্যাথবোর্নের ভারতীয় নেতৃবৃন্দ এবং ভারতবর্ষের প্রতি বিদ্বেষের জবাব দিয়েছিলেন। সেটিও ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের শেষ পর্বের স্মরণীয় দলিল হিসেবে জাতির স্মৃতিতে রক্ষিত হবে। সে উত্তর মহাত্মা গান্ধী জওহরলাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দেরও পক্ষ থেকেই লেখা। তখন স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃবৃন্দ সকলেই কারারুদ্ধ।

গান্ধীজির প্রচেষ্টায় লব্ধ রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা এবং গান্ধীজি গুরুদেব উভয়ের ধ্যানের মানবমুক্তির স্বপ্ন সফল হবার আগেই রবীন্দ্রনাথ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতালাভের পর মহাত্মা গান্ধী একাকী সে-স্বপ্ন রূপায়িত করার চেষ্টায় শহীদের মৃত্যু বরণ করেছেন। দুজনেরই উত্তরাধিকার ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের হয়তো সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসকেই পথনির্দেশ করবে।

৩

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীর দীর্ঘদিনের সম্পর্ক বিভিন্ন বিষয়ে মতান্তর এবং আদর্শগত ঐক্যের মধ্য দিয়ে পরস্পরের প্রতি দুজনের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পরিচয় পাওয়া যাবে। তবুও ব্যক্তিগত সম্পর্কে কয়েকটি

৩১ "Accept the institution under your protection, giving it an assurance of permanance if you consider it to be a national asset. Visva-Bharati is like a vessel which is carrying the cargo of my life's best treasure, and I hope it may claim special care from my countrymen for its preservation."

৩২ "Who can I to take the institution under my care? It carries God's protection because it is the creation of an earnest soul."

৩৩ "Dear Gurudev, you *must* stay yet a while, Humanity needs you."

৩৪ "Four score not enough, may you finish five."

৩৫ "Four score is impertinence, five score intolerable."

ঘটনার উল্লেখ করলে এই পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি যে কত গভীর ছিল তা উপলব্ধি করা সহজ হবে।

রবীন্দ্রনাথকে আশ্রমের ছাত্রেরা 'গুরুদেব' বলে ডাকতেন। গান্ধীজি এই নামটি বাংলাদেশের এবং ভারতবর্ষে বাইরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অপর পক্ষে গান্ধীজির 'মহাত্মা' নামটি রবীন্দ্রনাথের ব্যবহারের ফলেই সর্বজনীন হয়েছে।

উভয়েই উভয়কে ভারতবর্ষের বাণীমূর্তি বলে মনে করতেন। গান্ধীজি রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে যে শোকবাণী পাঠিয়েছিলেন তাতে লিখেছিলেন।— ...যদিও বড়োদাদা চলে গিয়েছেন, আমাদের সান্ত্বনা আছে তাঁর আত্মা চিরকাল ধরে আমাদের সঙ্গ দান করবে। এ শিক্ষা আমরা ঋষিদের কাছ থেকে এবং সর্বোপরি আপনার কাছ থেকে পেয়েছি।[৩৬] গান্ধীজি সম্বন্ধে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, কৃশকায় এবং জাগতিক সম্পদ্ বিরহিত মহাত্মা গান্ধী যে ভারতের দরিদ্র এবং অপমানিত জনগণের হৃদয়ের নম্রতার অপরিমেয় শক্তিকে আহ্বান করেছেন তা সংগতই হয়েছে। ভারতের ভাগ্য নারায়ণকে বেছে নিয়েছে, নারায়ণী সেনাকে নয়, আত্মার শক্তিকে সে বরণ করেছে, দেশের শৌর্যকে নয়।[৩৭]

দুজনের শারীরিক কুশলের প্রতি দুজনের কি পরিমাণ উদ্বেগ ছিল সেটা পূর্ববর্তী অংশে আলোচিত হয়েছে। একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করছি। ১৯৩৭ সনে রবীন্দ্রনাথের অসুস্থতার পর গান্ধীজি কলকাতায় এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রবীন্দ্রনাথ জীবনে কখনও দিবানিদ্রা অভ্যাস করেন নি। প্রকৃতপক্ষে তিনি দুপুরে বিশ্রাম করতেন না। প্রচণ্ড গরমের সময়ও নিজের লেখার কাজ নিয়ে একান্তে থেকেছেন। ছেলেবেলায় একদিন যাত্রাগান শুনে রাত্রিবেলা ঘুমোতে দেরি হওয়ায় পরদিন সূর্যোদয়ের আগে জাগতে পারেন নি। সে কথা অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে 'ছেলেবেলা'য় বর্ণিত হয়েছে। বলেছেন, সূর্যোদয় হয়েছে অথচ আমি শয্যাত্যাগ করি নি এ ঘটনা জীবনে আর ঘটে নি। কিন্তু এবার অসুস্থতার পর চিকিৎসকগণ পরামর্শ দেন যে, তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে দুপুরের বিশ্রাম এমনকি নিদ্রা প্রয়োজন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এতে রাজি হচ্ছিলেন না। মহাত্মাজিকে কাছে পেয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীরা সকলে তাঁকে ধরে পড়লেন, আপনি যদি গুরুদেবকে রাজি করিয়ে দিতে পারেন। গান্ধীজি সম্মত হলেন। গুরুদেবের কাছে গিয়ে তিনি বললেন, গুরুদেব, আপনার কাছে আমার একটি ভিক্ষে আছে। কথা দিন সেটি পূরণ করবেন। গুরুদেব পরিহাস করে বললেন, আপনি তো নিজেকে 'বেনে' বলেন, আপনাকে আগে ভিক্ষাপূরণের প্রতিশ্রুতি দিতে পারি না।— এ নিয়ে কিছুক্ষণ কপট বিতণ্ডার পর গুরুদেব বললেন, ঠিক আছে আপনি যখন নাছোড়বান্দা তখন কথাই দিলাম। গান্ধীজি বললেন, চিকিৎসকরা বলেছেন, আপনার বিশ্রামের

৩৬ ". . . if Barodada has passed away, we have the consolation which *your* teaching, no less than that of the sages, has given us, of feeling that his spirit will ever even be with us . . ." Sabarmati 23 January 1926

৩৭ "It is in the fitness of things, that mahatma Gandhi, frail in body and devoid of material resources, should call upon the immense power of meek, that has been lying waiting in the heart of the destitute and insulted humanity of India. The destiny of India has chosen for it ally Narayan and not Narayani sena— the power of the soul and not that of muscle." *Letters from Abroad,* March 2, 1921.

(rest-cure) প্রয়োজন। আপনি দুপুরের এক ঘণ্টা সময় আমাকে ভিক্ষে দিন। সে সময়টা আমাকে দেওয়া সময়, সে-সময় আপনি ঘুমিয়ে বিশ্রাম করবেন।— গুরুদেব কপট কোপে বললেন, আপনাকে আবার জেলে পাঠিয়ে সংশোধন দরকার। (you need arrest-cure. গান্ধীজির rest-cure কথাটির উপর শ্লেষ লক্ষণীয়)। তাকে তিনি দুষ্টু ছেলেও (naughty boy) বলেছিলেন। কিন্তু তাঁর আগ্রহাতিশয্যে দুপুরের একঘণ্টা সময় গান্ধীজিকে দিয়েছিলেন। ঘুমুতে তিনি পারতেন না কিন্তু গান্ধীজির অনুরোধ স্মরণ করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি দুপুরে একঘণ্টা করে বিশ্রাম করেছেন।[৩৮]

১৯৪০ সনে গান্ধীজির শান্তিনিকেতন-ভ্রমণের সময় গুরুদেবের সঙ্গে তাঁর নানা অন্তরঙ্গ বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। সেগুলি কোথাও লিপিবদ্ধ নেই, কিন্তু একটি আলোচনার মর্ম পাঠককে উপহার দিচ্ছি। এ সময় ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের আর দেরি নেই এ কথা বোঝা গিয়েছিল। হয়তো রাজনৈতিক কোনো সমস্যার আলোচনার সময় গুরুদেব মহাত্মাকে বলেছিলেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এলে আপনি তো প্রধানমন্ত্রী হবেন তখন আমাকে আপনার শিক্ষামন্ত্রী করে নেবেন।[৩৯] রবীন্দ্রনাথ স্বাধীনতা দেখে যেতে পারেন নি, স্বাধীনতার পর মহাত্মাজিও সমস্ত, রাজনৈতিক উচ্চপদ থেকে দূরে ছিলেন। তবুও ইচ্ছে হয় ভারতবর্ষে মাটিতে যদি এই যোগাযোগ ঘটত, তবে পৃথিবীর ইতিহাসে তা অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা হিসেবে লিপিবদ্ধ থাকত।

৪

গুরুদেবের প্রয়াণের পর ১৯৪৫ সনের ডিসেম্বর মাসে গান্ধীজি শান্তিনিকেতনে আসেন। এটাই শান্তিনিকেতনের মাটিতে গান্ধীজির শেষ পদক্ষেপ। ক্ষুদ্র মানুষের পক্ষে গান্ধীজিকে যতটা কাছাকাছি থেকে দেখা সম্ভব বর্তমান লেখকের সে সৌভাগ্য হয়েছিল। তার স্মৃতি এ জীবনের পরমতম সঞ্চয়।

১৮ ডিসেম্বর অপরাহ্ণে গান্ধীজি একটি বিশেষ ট্রেনে করে বোলপুরে পৌঁছেছিলেন। স্টেশনেই তাঁকে শান্তিনিকেতনীরীতিতে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল। এদিকে শান্তিনিকেতনের গৌর-প্রাঙ্গণে তাঁর প্রার্থনা-সভার জন্য কয়েক হাজার দর্শনার্থী অপেক্ষা করছিলেন। গান্ধীজির গাড়ি কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ চালিয়ে আনছিলেন। ভুবনডাঙা পার হয়ে শান্তিনিকেতনের উপান্তে পৌঁছতেই গান্ধীজি গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়লেন। বললেন, শান্তিনিকেতনকে তিনি তীর্থস্থান বলে মনে করেন, তীর্থস্থানে পদব্রজেই প্রবেশ করতে হয়। বাকি পথটুকু হেঁটেই তিনি প্রার্থনাসভায় উপস্থিত হলেন।

গান্ধীজি সে সময়ে হরিজনকল্যাণ তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহ করছিলেন। শান্তিনিকেতন কর্তৃপক্ষ গান্ধীজি প্রার্থনাসভায় পৌঁছবার আগেই সম্মিলিত দর্শনার্থীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। একটি বড়ো তাম্রথালায় সংগৃহীত মুদ্রাগুলি সাজিয়ে একটি মেয়ে গান্ধীজিকে প্রণাম করে সেটি তাঁর হাতে তুলে দিল। গান্ধীজি অনুচ্চ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, এই কি সব? তার পর মেয়েটিকে বললেন, তুমি থালাটি নিয়ে আবার সকলের মধ্যে ঘুরে এসো। হয়তো আরও কেউ কিছু দেবে। দর্শনার্থীদের কাছ থেকে দ্বিতীয়বার প্রায় তিনগুণ অর্থ সংগৃহীত হয়েছিল।

---

৩৮ এ ঘটনাটি আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের কাছে শোনা।

৩৯ আলোচনাকালে উপস্থিত ডক্টর ধীরেন্দ্রমোহন সেনের কাছ থেকে ঘটনাটি শোনা।

প্রার্থনাসভায় গান্ধীজির প্রিয় কতকগুলি রবীন্দ্রসংগীত গীত হয়েছিল। প্রার্থনান্তিক ভাষণে গুরুদেবের গানের মহান্ প্রভাবের উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, বাংলা দেশ তাঁর গানে ভরে আছে। তিনি সমস্ত পৃথিবীতে ভারতবর্ষকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, শুধু তাঁর গান দিয়েই নয়, তাঁর লেখনী দিয়ে, তাঁর তুলিকা দিয়ে। আমরা সকলে তাঁর উদার পক্ষপুটের নির্ভয় আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হয়েছি। তবু আমরা দুঃখ করব না। পরবর্তী সমাধান আমাদের হাতেই আছে।[৪০]

প্রার্থনা শেষে তাঁকে কবির 'শেষ বেলাকার ঘর' শ্যামলীতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তিনি তিন দিন ছিলেন। পরদিন বুধবার। শান্তিনিকেতনের সাপ্তাহিক উপাসনার দিন। গান্ধীজি সেদিন মন্দিরের উপাসনায় পৌরোহিত্য করেন। পূর্বদিনের প্রার্থনার ভাষণের জের টেনে তিনি গুরুদেবের মহান্ আদর্শের কথা বললেন। সমস্ত পৃথিবীর যুদ্ধান্তিক পরিস্থিতির আলোচনা করে এই সমস্যায় ভারতবাসীর কর্তব্যের পথও নির্দেশ করলেন।

সেদিনই তিনি এণ্ডরুজের স্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত দীনবন্ধুস্মৃতি আরোগ্য নিকেতনের শিলান্যাস-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। অনুষ্ঠানে 'যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন' গানটি গীত হয়েছিল। সেটির উল্লেখ করে তিনি দীনবন্ধু এণ্ডরুজের স্মৃতিচারণ করেন। উপসংহারে তিনি বলেন।— জীবনের যেমনি, মৃত্যুতেও তেমন দীনবন্ধু মহিমময় হয়ে আছেন। তাঁর মতো লোকের মৃত্যুতে শোকসভা করার প্রয়োজন নেই। আমার নিজের কথা বলতে পারি, আমি প্রিয়জন এবং বন্ধুর মৃত্যুতে শোক করার কথা বিস্মৃত হয়েছি, আপনারাও আমার পথ অনুসরণ করুন, এই আমার ইচ্ছে।[৪১]

গুরুদেবের তিরোধানের পর পরিচালনা নিয়ে কর্তৃপক্ষের মনে কিন্তু দ্বিধাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল। সংকটও দেখা দিয়েছিল। সে সম্বন্ধে আলোচনা এবং মহাত্মাজির উপদেশ গ্রহণের জন্য বিভিন্ন বিভাগের অধ্যক্ষরা ১৯শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় গান্ধীজির সঙ্গে মিলিত হন। প্রসঙ্গক্রমে আর্থিক-সংকটের কথাও আলোচিত হয়। গান্ধীজি বলেছিলেন— আমার দৃঢ় বিশ্বাস কর্মনিষ্ঠ সেবকের কাছে অর্থ-সংকট কোনো বাধাই নয়। আপনারা যদি সত্যপথের সেবক হন তবে অর্থ প্রভুভক্ত কুকুরের মতো আপনাদের অনুসরণ করবে।[৪২] আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন এবং নন্দলাল বসুর দুটি প্রশ্নের উত্তর অবলম্বন করে গান্ধীজি 'তপশ্চর্যা'র কথা বলেন। তিনি বলেন তপশ্চর্যার দ্বারা যে-কোনো কঠিন সংকট উত্তীর্ণ হওয়া যায় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এ সত্য তিনি উপলব্ধি করেছেন। তুলসীদাসের 'রামায়ণ' থেকেও তিনি একটি উদ্ধৃতি দেন।

---

৪০ "Bengal is full of his songs. He has glorified the name of India throughout the world not by his songs only but also by his pen and brush. We all miss the warmth of his protecting wings. But we must not grieve. The remedy lies in our own hand" (The Santiniketan Pilgrimage—Payarelel. *Visva-Bharati News,* February 1946).

৪১ "Deenabandhu is blessed in death as he was is life. Death of people like him cannot be an occasion for sorrow. Speaking for myself, I may say that I have almost forgotten to mourn the death of friends and dear ones and I want you to learn to do likewise." (The Santiniketan Pilgrimage—Payarelal. *Visva-Bharati News,* February 1946).

৪২ "I am convinced that lack of finance never represented a real difficulty to a sincere worker. Finances follow—they dog your footsteps if you represent a real cause." (The Santiniketan Pilgrimage—Payarelal. *Visva-Bharati News,* February 1946)

রথীন্দ্রনাথের একটি অনুরোধের উত্তরে বলেন, আমি শান্তিনিকেতনেরই একজন। এবং আরও দীর্ঘদিন এখানে এসে থাকা দরকার কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ কর্মসূচী ভগবানের হাতে।

পরদিন সকাল ১১টায় তিনি আবার এক সভায় শান্তিনিকেতনের কর্মীদের সঙ্গে মিলিত হন। বিশ্বভারতীর বিভিন্ন সমস্যা এবং তার সমাধানের বিষয় আলোচিত হয়। বিশ্বভারতী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে জড়িত হবে কিনা তার উত্তরে তিনি বলেন, শান্তিনিকেতন-জীবনের কোনো রাজনৈতিক আদর্শ থাকবে না এ কথা বলি নে কিন্তু রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে বিশ্বভারতীর দূরে থাকা উচিত। ত্রিশ বৎসর আগেও আমাকে এ প্রশ্ন করা হয়েছিল। আমি একই উত্তর দিয়েছিলাম। আজ এই উত্তরের গুরুত্ব আরও অনেক বেড়ে গিয়েছে।

বিজ্ঞানের দানে মানুষের জীবনধারণের ব্যাবহারিক উপাদানগুলি বৃদ্ধি ঘটেছে। বিশ্বভারতীর জীবনে এই সকল উপাদান গ্রহণ করা উচিত কি না এ প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজি বলেন, এইসব ব্যাবহারিক উপাদানকে তিনি জীবনে পরিহার করে এসেছেন। এগুলি হয়তো আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে অনুপ্রবেশ করবেই। তবু এগুলি দিয়ে ভুলিয়ে কাউকে বিশ্বভারতীর কাজে ডেকে আনা উচিত হবে না। কারণ বিশ্বভারতীর আদর্শ আত্মিক, জাগতিক নয়।

আরও একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি রাজনৈতিক স্বাধীনতার থেকে সামাজিক পুনরুজ্জীবনকে বেশি মূল্যবান বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। সমাজসংস্কারের কাজে আমরা যদি সাড়া না পাই তবে এ কথা যেন আমরা না ভাবি যে, সামাজিক অন্ধতায়-বদ্ধ মানুষগুলি 'কোনো কাজের নয়'। আমাদের ভাবা উচিত আমরা বা আমাদের পদ্ধতিই কোনো কাজের নয়।

এই সমগ্র আলোচনায় গুরুদেবের প্রতি তাঁর যে শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছিল সেটা অননুকরণীয়। একটি উক্তির উল্লেখ প্রবন্ধের সূচনায়ই করা হয়েছে।

সেদিনই (২০ ডিসেম্বর) বারোটায় গান্ধীজির চলে যাবার কথা। বারোটার এক মিনিট আগে কোনো ঘড়ির দিকে না তাকিয়ে বললেন, আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে। শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরা দেবীর একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বাকি আছে। সেটি লিখে জানাব। যে-কেউ আমাকে বিশ্বভারতী সম্পর্কে আমার মতামত চেয়ে চিঠি লিখতে পারেন। যদি সে প্রশ্নের মূল্য কিছু থাকে তবে ফিরতি ডাকেই উত্তর পাবেন।

ইন্দিরা দেবীর অনুত্তরিত প্রশ্নটি ছিল, মহাত্মাজির মতে শান্তিনিকেতনের জীবনে গান এবং নাচের অতিপ্রাচুর্য আছে কি না। পরে তিনি লিখে জানিয়েছিলেন, সংগীতের মাধুর্য শান্তিনিকেতনকে ছেয়ে আছে কিন্তু আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে কণ্ঠের সংগীত যেন জীবনের সংগীতকে অতিক্রম না করে যায়।

অন্য একটি লিখিত প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানিয়েছিলেন, বিশ্বভারতী যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-পদ্ধতির জটিল জালের মধ্যে জড়িয়ে না পড়ে। তাতে জীবনধারণের যে উচ্চমানের কথা গুরুদেব বলেছিলেন সেটি এবং গুরুদেবের সমগ্র আদর্শ অপমানিত হবে।

গান্ধীজি চলে গেলেন। উত্তরায়ণের প্রাঙ্গণ থেকে আরম্ভ করে শান্তিনিকেতনের সীমানা পর্যন্ত সমস্ত রাস্তায় ছাত্রছাত্রীরা নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁকে শেষ বিদায় জানাল।

তাঁর শান্তিনিকেতন-পরিক্রমার দিনগুলির স্মৃতি শান্তিনিকেতনের আকাশ-বাতাস থেকে মিলিয়ে

যাবার আগেই একদিন সন্ধ্যায় সেই নিদারুণ সংবাদটি পৃথিবীর অন্য অংশের সঙ্গে শান্তিনিকেতনেও এসে পৌঁছল। আমাদের যুগসঞ্চিত অন্যায়, হিংসা, একের প্রতি অন্যের ব্যবহারে অধৈর্য এবং অক্ষমা পুঞ্জীভূত হয়ে একটি উন্মত্ত যুবকের রূপ ধরে তাঁকে হত্যা করল। কিন্তু এ দায়িত্ব শুধু ব্যক্তিবিশেষের নয়। 'এ আমার এ তোমার পাপ'। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজি সম্বন্ধে লিখেছিলেন, "আজকের দিনে দুঃখের অন্ত নেই; কত পীড়ন কত দৈন্য, কত রোগ শোক তাপ আমরা নিত্য ভোগ করছি; দুঃখ জমে উঠেছে রাশি রাশি। তবু সব দুঃখকে ছাড়িয়ে গেছে এক আনন্দ। যে মাটিতে আমরা বেঁচে আছি, সঞ্চরণ করছি, সেই মাটিতেই একজন মহাপুরুষ, যাঁর তুলনা নেই, তিনি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছেন।"[৪৩] ভারতবর্ষের মাটিতে এই যুগে মহাত্মাজি জন্মেছিলেন এই পরম গৌরবের ভাগ যেমন আমরা পেয়েছি, আমাদের হাতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে এই বেদনাও আমাদের নিত্যকাল বহন করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ ধ্যানদৃষ্টিতে মহাত্মার আগমন প্রত্যক্ষ করেছিলেন, ভবিষ্যৎপ্রবক্তার রূপে গান্ধীজির মহামরণের পর আমাদের কর্তব্যনির্দেশও করে গিয়েছেন।—

…সংশয়ে আমরা তাঁকে অস্বীকার করেছি,
ক্রোধে আমরা হনন করেছি,
প্রেমে এখন আমরা তাঁকে গ্রহণ করব—
কেননা, মৃত্যুর দ্বারা সে আমাদের সকলের জীবনের মধ্যে সঞ্জীবিত
সেই মহামৃত্যুঞ্জয়।

রবীন্দ্রনাথের এই বাণী আমাদের গান্ধীশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের মূলমন্ত্র হোক।

এই প্রবন্ধ রচনায় শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত রবীন্দ্রজীবনী এবং শ্রীমোহিতকুমার মজুমদার সংগৃহীত এবং রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ পত্রাবলীর থেকে প্রচুর সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে।

৪৩ "মহাত্মাজির পুণ্যব্রত": মহাত্মা গান্ধী: বিশ্বভারতী।

শিবনাথ শাস্ত্রী

বিনয় ঘোষ

"আমি শৈশবাবধি বিদ্যাসাগরের চেলা।" এ কথা শিবনাথ শাস্ত্রী বলতেন। তাঁর পিতা পণ্ডিত হরানন্দ ভট্টাচার্য এবং মাতুল পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ উভয়েই ছিলেন বিদ্যাসাগরের অন্তরঙ্গ বন্ধু। কাজেই বাল্যকাল থেকে বিদ্যাসাগর শিবনাথকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। শিবনাথের কৈশোর বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কারকর্মের দ্বিপ্রহর। যৌবনে জীবনের সকল রকমের সমস্যা ও সংকটের মধ্যে বিদ্যাসাগরের সাহচর্য ও পরামর্শ শিবনাথের কাছে সহজলভ্য ছিল। অনেক ক্ষেত্রে শিবনাথ বাস্তবিকই বিদ্যাসাগরের চেলা ছিলেন, কেবল একটি ক্ষেত্র ছাড়া, যে ক্ষেত্রে শিবনাথের ব্যক্তিত্বের সমগ্ররূপ অভিব্যক্ত। সেই ক্ষেত্রটি হল 'ধর্ম'। বিদ্যাসাগরের কাছে ধর্মের কোনো স্বতন্ত্র সত্তা ছিল না, তাঁর মানববোধ ও সমাজবোধের মধ্যে ধর্মবোধ বিলীন হয়ে গিয়েছিল। তাই পৃথক প্রার্থনা ও উপাসনার ভিতর দিয়ে কোনো অধ্যাত্মলোকে তিনি কখনও শান্তি বা মুক্তি কামনা করেন নি। শিবনাথের কাছে ধর্মজীবনই ছিল মুখ্য, জীবনের মূল ভিত্। ধর্মের এই ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তাঁর মানববোধ ও সমাজবোধ। তাঁর সমগ্র সত্তা ও ব্যক্তিত্ব ধর্মভাবের অলৌকিক রাগে রঞ্জিত। চলিত অর্থে 'ধার্মিক' নয়, দার্শনিক অর্থে শিবনাথ ছিলেন প্রকৃত ধর্মপ্রাণ পুরুষ। তাঁর বিচিত্র কর্মবহুল জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এই ধর্মপ্রাণতা প্রাত্যহিক জীবনের যাবতীয় মালিন্যের উর্ধ্বে তাঁকে এক ইন্দ্রিয়াতীত স্থৈর্যের রাজ্যে সমাহিত করে রাখত। তাঁর কর্মজীবনেরও সমস্ত শক্তির উৎস ছিল এই ধর্মবোধ। গুরু বিদ্যাসাগর ও চেলা শিবনাথের চরিত্রের মধ্যে পার্থক্য ছিল এইখানে।

পার্থক্য সত্ত্বেও উভয়ের চরিত্রের মধ্যে মিলও ছিল অনেক। বিদ্যাসাগরের শিষ্যত্ব দাবি করার অধিকার ছিল শিবনাথের। চারিত্রিক দৃঢ়তা নিষ্ঠা সমাজচিন্তা উদারতা ও আত্মবিশ্বাস, সবদিক দিয়েই শিবনাথ ছিলেন বিদ্যাসাগরের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী। বালিকাবধূ প্রসন্নময়ীর সঙ্গে যখন পিতার মেজাজের জন্য তাঁর বিচ্ছেদ ঘটল এবং পিতারই আদেশে যখন আঠার-উনিশ বছর বয়সে তিনি দ্বিতীয় বার বিবাহ (বিরাজমোহিনীকে) করতে বাধ্য হলেন তখন তিনি লিখেছেন, "আত্মনিন্দাতে আমার মন অধীর হইয়া উঠিল।" "এই অবস্থাতে আমি ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলাম।" এই সময় ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর সংযোগ হল। পিতা ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে তিরস্কার করেন। শিবনাথ পিতাকে বলেন, "আপনার সকল আজ্ঞা পালন করিতে রাজি আছি, কিন্তু আমার ধর্মজীবনে হাত দিবেন না।" তখন শিবনাথের ছাত্রজীবন, তিনি দক্ষিণ-কলিকাতায় থাকতেন। পুত্রের এই কথাবার্তা শুনে পিতা যখন গ্রামে ফিরে গেলেন, তখন তাঁর বিষণ্ণ মুখ দেখে মা জিজ্ঞাসা করলেন, ছেলে কেমন আছে। পিতা অধিকতর গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলেন 'সে মরেছে।' শিবনাথ লিখেছেন, "অমনি আমার মা 'কি বল গো, ওগো কি বল গো' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহার ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া পাশের বাড়ির মেয়েরা ছুটিয়া আসিলেন। তখন বাবা গম্ভীরস্বরে বলিলেন, সে মরার মধ্যে। সে ব্রাহ্মসমাজে যেতে আরম্ভ করেছে, আমি বারণ করলেও শুনবে না।"

ব্রাহ্মসমাজের এই নতুন ধর্মচেতনার মধ্যে শিবনাথ এক আশ্চর্য প্রাণশক্তির উৎস আবিষ্কার করেছিলেন,

এবং সেই শক্তি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, বারংবার মৃত্যু ঘটায় নি। এই বয়সেই তাঁর নতুন ধর্মবিশ্বাস অনুসারে চলবার জন্য তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। তিনি যখন গ্রামের বাড়িতে উপস্থিত থাকতেন তখন কুলদেবতাদের প্রতিমাগুলিকে তিনি নিজেই পুজো করতেন। এবারে তিনি স্থির করে গেলেন 'ঠাকুরপুজো' আর করবেন না। "গিয়াই মাকে সে সংকল্প জানাইলাম।" তার পর কি হল?

> মা ভয়ে অবশ হইয়া পড়িলেন। বুঝিলেন একটা মহা সংগ্রাম আসিতেছে। আমাকে অনেক অনুরোধ করিলেন। আমি কোনও মতেই প্রস্তুত হইতে পারিলাম না। ধর্মে প্রবঞ্চনা রাখিতে পারিব না বলিয়া করযোড়ে মার্জনা ভিক্ষা করিলাম। অবশেষে সেই সংকল্প যখন বাবার গোচর করা হইল, তখন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্‌গমের ন্যায় তাঁহার ক্রোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। তিনি কুপিত হইয়া আমাকে প্রহার করিয়া ঠাকুরঘরের দিকে লইয়া যাইবার জন্য লাঠি হস্তে ধাবিত হইয়া আসিলেন। আমি ধীরভাবে বলিলাম, 'কেন বৃথা আমাকে প্রহার করিবেন? আমি অকাতরে আপনার প্রহার সহ্য করিব। আমার দেহ হইতে এক একখানা হাড় খুলিয়া লইলেও আর আমাকে ওখানে লইতে পারিবেন না।' এই কথা শুনিয়া ও আমার দৃঢ়তা দেখিয়া তিনি হঠাৎ দাঁড়াইয়া গেলেন এবং প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল কুপিত ফণীর ন্যায় ফুলিতে লাগিলেন। অবশেষে আমাকে পূজার কাজ হইতে নিষ্কৃতি দিয়া নিজে পূজা করিতে বসিলেন। সেই দিন হইতে আমার মূর্তিপূজা রহিত হইল।

লাঠি হস্তে ধাবিত অগ্নিমূর্তি পণ্ডিত পিতা চিরাচরিত বাহ্যানুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্মবিশ্বাসের উগ্র প্রতিমূর্তি, এবং তাঁর সামনে দণ্ডায়মান অটল আত্মবিশ্বাস ও বিনয়ের প্রতিমূর্তি নবীন তরুণ ব্রহ্মোপাসক পুত্র শিবনাথ। পিতার আত্মসমর্পণের মানে হল অন্তরের অনাড়ম্বর অকৃত্রিম সরল ঈশ্বর-উপাসনার কাছে ঢাকঢোল-কাঁসরঘণ্টা-নিনাদিত মূর্তিপ্রান্তে আবদ্ধ দেবতার পূজার পরাজয়। যেমন প্রসন্নময়ীর ক্ষেত্রে রামচন্দ্রের মতো তিনি পিতৃ-আজ্ঞা পালন করেছিলেন, ধর্মের ক্ষেত্রে তা করেন নি, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। তাঁর এই বিদ্রোহ যে আদর্শ-সংঘাতের সাময়িক উত্তেজনাসম্ভূত নয়, সততা ও গভীর সত্যবিশ্বাসে প্রোথিত, ব্রাহ্মসমাজের বিভেদ-বিচ্ছেদের ইতিহাসে তাঁর সত্যনিষ্ঠ বিদ্রোহীর ভূমিকা বিচার করলে তা বোঝা যায়।

১৮৪৭ সালে শিবনাথ শাস্ত্রীর জন্ম এবং ১৮৭২ সালে সংস্কৃত কলেজ থেকে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর ছাত্রজীবনের শেষ। কিন্তু ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর কর্মজীবনের আরম্ভ। ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কারের কাজে এইসময় থেকে তিনি একাগ্রচিত্তে অগ্রসর হন। বিদ্যাসাগরের চেলা তিনি, কাজেই ১৮৬৭ সালে তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে একটি বিধবাবিবাহ দেন। বিবাহ উপলক্ষে বিদ্যাসাগরের কাছে যান এবং বিদ্যাসাগর বিবাহের সমস্ত খরচ ও কন্যার গহনা দেন। ১৮৬৯ সাল থেকেই ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ হয়। তখন তিনি এফ. এ. পাস করেছেন। তার আগে থেকেই তিনি ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করতেন এবং ব্রাহ্মধর্মের অন্তর্নিহিত সত্য উপলব্ধি করে মূর্তিপূজা পরিহারও করেছিলেন। এই সময় ব্রাহ্মসমাজের পরিবর্তনের ইতিহাসে প্রথম সংকট দেখা দেয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং কেশবচন্দ্র সেনের মনোভঙ্গির পার্থক্য ব্রাহ্মসমাজে বিচ্ছেদ ঘটায়। ১৮৬৭ সাল পর্যন্ত দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর আদি ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি শিবনাথের আকর্ষণ ছিল, কিন্তু তরুণদলের নেতা ছিলেন তখন কেশবচন্দ্র। দেবেন্দ্রনাথের দল রক্ষণশীল এবং কেশবচন্দ্রের দল প্রগতিশীল বলে পরিচিত ছিল, যেমন ইতিহাসে প্রবীণ ও নবীনের দল চিরদিন অভিহিত হয়ে থাকে তেমনি। শিবনাথ স্বভাবতঃই কেশবচন্দ্রের উন্নতিশীল দলের প্রতি আকৃষ্ট

শিবনাথ শাস্ত্রী
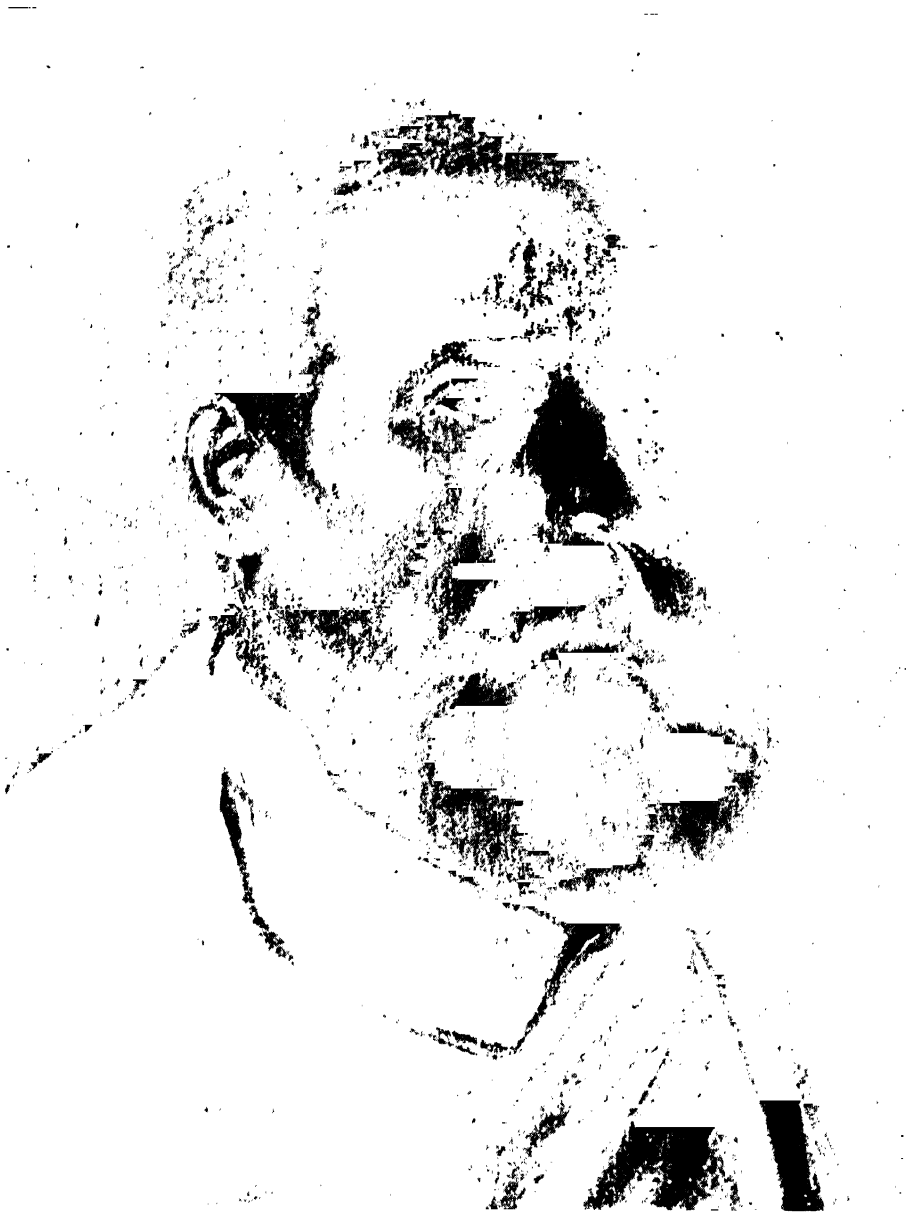
শশিভূষণ দেস -অঙ্কিত

পরিমল গোস্বামী -গৃহীত চিত্র হইতে

হন। ১৮৬৯, ২২ অগস্ট উন্নতিশীল দল ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের দ্বার উদ্ঘাটন করেন। এইদিন কেশবচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন, আনন্দমোহন বসু, রজনীনাথ রায়, শ্রীনাথ দত্ত প্রমুখ কুড়িজন যুবকের সঙ্গে শিবনাথ প্রকাশ্যে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এর ছাব্বিশ বছর আগে, ২১ ডিসেম্বর ১৮৪৩ (৭ পৌষ ১৭৬৫ শক) দেবেন্দ্রনাথও কুড়িজন সহকর্মীর সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৪৩ সালে দেবেন্দ্রনাথ-সহ একুশজনের এবং ১৮৬৯ সালে শিবনাথ-সহ একুশজনের ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ, ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্মের ইতিহাসে দুটি ঐতিহাসিক বাঁক পরিবর্তন।

ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণের পর দেবেন্দ্রনাথ বলেন, "ব্রাহ্মসমাজের এ একটা নূতন ব্যাপার। পূর্বে ব্রাহ্মসমাজ ছিল, এখন ব্রাহ্মধর্ম হইল··· ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়া আমরা ব্রাহ্ম হইলাম এবং ব্রাহ্মসমাজের পার্থক্য সম্পাদন করিলাম।" দেবেন্দ্রনাথের দীক্ষাকালে ব্রাহ্মধর্মের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা হয়, শিবনাথের দীক্ষাকালে হয় ব্রাহ্মধর্মের পর্বান্তর। শিবনাথ লিখেছেন, "আমি উন্নতিশীল দলের সঙ্গে হাড়ে হাড়ে বাঁধা পড়িলাম। অথচ শুনিয়া অনেকে আশ্চর্য বোধ করিবেন যে ইহার পরও আমি তাঁহাদিগের সঙ্গ হইতে লজ্জাবশতঃ দূরে থাকিতাম, তখন আমি প্রতিদিন ব্রহ্মোপাসনা করিতাম (যদিও উপবীতটা তখন ছিল), কিন্তু ব্রাহ্মদের সঙ্গে বড় মিশিতাম না। মধ্যে মধ্যে রবিবারে প্রাতে কেশববাবুর কলুটোলার বাড়িতে উপাসনাতে যোগ দিতে যাইতাম, কিন্তু কীর্তনের সময় ব্রাহ্মদিগের অনেকে গড়াগড়ি দিতেন, নানাপ্রকার চীৎকার করিতেন, ও পরস্পরের পা ধরাধরি করিতেন, কেশববাবুর পায়ে পড়িতেন, এজন্য ভাল করিয়া উপাসনাতে যোগ দিবার ব্যাঘাত হইত। সেই কারণে সর্বদা যাইতাম না।"

শিবনাথ শাক্তবংশের সন্তান, কাজেই বৈষ্ণবদের ভাবোন্মত্ত কীর্তন ও ঢলাঢলি তাঁর কোনোদিনই ভালো লাগত না। তিনি শুধু ব্রাহ্ম ছিলেন না, শক্তিবাদে বিশ্বাসী ব্রাহ্ম ছিলেন। ব্রাহ্মরা যখন কেশবচন্দ্রকে 'প্রভু ত্রাণকর্তা' বলে সম্বোধন করে তাঁর চরণ ধরে গড়াগড়ি দিতেন এবং ভাবাচ্ছন্ন হয়ে তাঁর চারি দিকে ঢলাঢলি করতেন, তখন শিবনাথের কাছে তা যে শুধু বুদ্ধিভ্রম বা চিত্তবিকার বলে মনে হত তা নয়, ব্রাহ্ম হিসাবে নৈতিক বিচ্যুতি বলেও মনে হত। আদর্শ ও নীতির ক্ষেত্রে মুখে বলা ও কাজে করার মধ্যে কোনো পার্থক্য শিবনাথ কল্পনা করতে পারতেন না। তাই ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেবার কিছুদিন পরে তিনি পারিবারিক নিগ্রহ ও বিচ্ছেদবেদনা সহ্য করেও ব্রাহ্মণের উপবীত ত্যাগ করেছিলেন। তার জন্য তাঁর পিতা আঠার-উনিশ বছর তাঁর মুখদর্শন করেন নি এবং তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপও করেন নি।

কেশবভক্তদের বৈষ্ণব আচরণ লক্ষ্য করে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছেন, কিন্তু কেশবচন্দ্র নিজে যে ভক্তিবাদ ও অবতারবাদের মোহজালে জড়িয়ে পড়েছেন বা পড়তে পারেন, এ কথা সহজে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন নি। তিনি কেশবচন্দ্রের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন বলে তাঁর প্রতি আকর্ষণও সহজে ছিন্ন হয় নি। কেশবচন্দ্রের কাছে তিনি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভরতা এবং সমাজসেবার বিভিন্ন দিকে শিক্ষালাভ করেছেন। অনেক দিক থেকে কেশব ছিলেন শিবনাথের গুরু। দেবেন্দ্রনাথ-কেশবের মতো শেষ পর্যন্ত কেশব-শিবনাথের মধ্যেও ব্রাহ্ম মতাদর্শের ব্যাপারে বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। অবতারবাদের গহ্বরে কেশব ক্রমে তলিয়ে যেতে থাকেন, এবং তাঁর এমন অবস্থা হয় যে নিজেকে 'জননী' ও ভক্তদের 'সন্তান' ছাড়া তিনি আর কিছুই ভাবতে পারতেন না। কেশবভক্তদের মুখে পাপ-পুণ্য ভক্তি-মুক্তি ঈশ্বর-অবতার ইত্যাদি কথা অবিরাম উচ্চারিত হত। ১৮৭৫-৭৬ সালের কথা। এই সময়কার কথা মনে করে বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন—

They were almost always talking of sin and salvation, of prayer and divine worship. All these unrealities of the current ideals and practices of Samaj seriously influenced the generation of youthful students to which I belonged. I had, therefore, not only no attraction for the Brahmo Samaj when I first came to Calcutta, but even felt an increasing repulsion towards it.

শিবনাথের নিজের উক্তিতেও বিপিনচন্দ্রের এই অভিমতের সমর্থন পাওয়া যায়। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসগ্রন্থে (ইংরেজি) শিবনাথ লিখেছেন যে কেশবচন্দ্রের অভ্যুদয়কালে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি দেশের তরুণদের যে আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা ছিল, ১৮৭৬ সালের আগেই তা প্রায় শেষ হয়ে যায় ("wellneigh ceased before 1876")। ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণের আগ্রহও তরুণদের মধ্যে যথেষ্ট কমে যায়। কেশবচন্দ্রের নৈতিক বিভ্রান্তির প্রভাব থেকে ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করার জন্য শিবনাথ এই সময় 'সমদর্শী' নামে একটি গোষ্ঠী স্থাপন করে এই নামে একটি দ্বিভাষী পত্রিকা প্রকাশ করেন। আনন্দমোহন বসু, দুর্গামোহন দাস, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়— এঁরা ছিলেন গোষ্ঠীভুক্ত, শিবনাথ ছিলেন গোষ্ঠীনেতা ও পত্রিকা-সম্পাদক। ১৮৭৭ সালে শিবনাথ আর-একটি ব্রাহ্ম-চক্র ('inner circle') গঠন করেন এবং তাতে বিপিনচন্দ্র পাল, সুন্দরীমোহন দাস, আনন্দচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি যোগ দেন। ১৮৭৮ সালের গোড়াতেই বিখ্যাত কুচবিহার-বিবাহের গুজব কলকাতা শহরে রাষ্ট্র হয়ে যায়। কেশবচন্দ্র নিজেই ১৮৭২ সালের তিন আইন বিবাহের বিধিবদ্ধতার জন্য আন্দোলন করেন, এবং শেষকালে সেই আইন ভঙ্গ করে কুচবিহার রাজপরিবারে নিজ কন্যার বিবাহ দিতে প্রস্তুত হন। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর দিনপঞ্জীতে লিখেছেন (৩১ জানুয়ারি ১৮৭৮):

> কেশববাবু যে কেন এরূপ অবিবেচনার কার্য করিতেছেন, দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইতেছি। তাঁহাকে Principled Man বলিয়া শ্রদ্ধা ছিল, সে শ্রদ্ধাও আর থাকে না। তাঁহার এরূপ কার্যে সমাজের বিশেষ অমঙ্গল হইবে। অতএব ইহা লইয়া ঘোরতর আন্দোলন করা আবশ্যক, কারণ তাহা হইলে সমাজের মুখ রক্ষা হইবে।

আন্দোলন চালাবার জন্য 'সমালোচক' নামে একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করা হয়, শিবনাথ তার সম্পাদক হন। কিন্তু আন্দোলন ও প্রতিবাদে কেশবচন্দ্রকে বিরত করা সম্ভব হয় নি। কেশবচন্দ্র নিজে কুচবিহার গিয়ে, অনেকটা হিন্দুমতে, রাজপরিবারে নাবালিকা কন্যার বিবাহ দেন (৬ মার্চ ১৮৭৮)। তার ফলে ব্রাহ্মসমাজের বাদপ্রতিবাদের পরিণতি হয় বিচ্ছেদ। বিদ্রোহী ব্রাহ্মরা কেশবচন্দ্রের দল ছেড়ে এসে ১৫ মে ১৮৭৮ সালে টাউনহলে সভা ডেকে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৮৭৯ সালে মাঘোৎসবের সময় কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের বর্তমান স্থানে তার ভিত্ স্থাপন করা হয়। ব্রাহ্মসমাজের এই দ্বিতীয় ও শেষ বিদ্রোহের প্রধান নায়ক শিবনাথ শাস্ত্রী। জীবনের বাকি দিনগুলি তিনি এই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কাজেই উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি বলেছেন: "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংস্রবে যাহা কিছু করিয়াছি, তাহাই আমার জীবনের প্রধান কাজ।" সমাজের বাংলা মুখপত্র 'তত্ত্বকৌমুদী' ও ইংরেজি 'ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার' পত্রিকা সম্পাদন করতেন শিবনাথ।

বিপিনচন্দ্র তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে শিবনাথের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল এবং শিবনাথের

ব্রাহ্মধর্মাদর্শের প্রতি তাঁর অনুরাগও ছিল আন্তরিক। এই অনুরাগ ও আকর্ষণের কারণ হল, শিবনাথের ব্রাহ্ম আদর্শের মধ্যে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের সুর উচ্চগ্রামে ধ্বনিত হত। বিপিনচন্দ্রের ভাষায় বলা যায়, "Social freedom and national emancipation were both organic elements of Shivanath's religion and piety." শিবনাথ ছিলেন আজন্ম 'ডেমোক্রোট,' আদর্শের নামে স্বেচ্ছাচারিতা অথবা ব্যক্তিগত প্রভুত্বের ঘোরতর বিরোধী। কেশবচন্দ্রের গুরুবাদ ও একনায়কত্বের কোনো স্থান নেই সাধারণ ব্রহ্মসমাজে এবং সাধারণ কথার সামাজিক তাৎপর্য যে 'সাধারণ' ছাড়া অন্য কিছু নয়, এ কথা সমাজ-কর্মীদের কাছে তিনি প্রথমেই ঘোষণা করেছিলেন। তার চেয়েও বড় কথা হল, ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপূর্ণ প্রকাশ ও চরিতার্থতা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার মধ্যে। ধর্ম ও দেশপ্রেম তাই শিবনাথের ব্রাহ্ম আদর্শের মধ্যে একাত্ম হয়ে মিশে গিয়েছিল।

'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠার আগে শিবনাথ যে ব্রাহ্ম-চক্র গঠন করেন তার জন্য একটি প্রতিজ্ঞাপত্র রচিত হয়। রচনা করেন শিবনাথ। তার মূল কথাগুলি এই—

> প্রতিমা পূজা করব না। কথায় ও কাজে জাতিভেদ মানব না। পরিবারে ও সমাজে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার স্বীকার করব। নিজেরা একুশ বছরের আগে বিবাহ করব না এবং কোন বালিকাকে ষোল বছরের আগে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করব না। স্ত্রীলোক ও জনসাধারণের মধ্যে যথাসাধ্য শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করব। দেশের লোকের শক্তি শৌর্য বৃদ্ধির জন্য ব্যায়ামচর্চা, অশ্বারোহণ, বন্দুক-চালনা অভ্যাসের কথা প্রচার করব। স্বায়ত্তশাসনই শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা, দুঃখ দারিদ্র্য দুর্দশায় নিপীড়িত হলেও বিদেশী গবর্ণমেণ্টের অধীনে কখনই দাসত্ব স্বীকার করব না।

জাতীয়-কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আগে বাংলার ও ভারতের প্রথম মধ্যবিত্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 'ভারত-সভা' (ইণ্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েশন) স্থাপিত হয় ২৬ জুলাই ১৮৭৬। শিবনাথ তাঁর বন্ধু আনন্দমোহন বসুর সঙ্গে এই রাজনৈতিক সভা স্থাপনের পরিকল্পনা সম্পর্কে পরামর্শ করার জন্য বিদ্যাসাগরের কাছে যান। বিদ্যাসাগর প্রথম সভাপতি হন, এই তাঁদের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁদের উৎসাহ দিলেও সভাপতি হতে সম্মত হন নি। মধ্যবিত্ত রাজনীতির আবেদন-নিবেদন ও নেতৃত্বের দলাদলির কথা মনে করেই বোধ হয় বিদ্যাসাগর দূরে থাকতে চেয়েছিলেন। কংগ্রেস-পর্বের উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত রাজনীতির পথপ্রদর্শকদের মধ্যে ছিলেন শিবনাথ, আনন্দমোহন ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু শিবনাথের পূর্বোক্ত ব্রাহ্মচক্রের প্রতিজ্ঞাপত্রের মধ্যে— 'দেশের লোকের শক্তি ও শৌর্য বৃদ্ধির জন্য ব্যায়ামচর্চা অশ্বারোহণ বন্দুকচালনা অভ্যাসের কথা প্রচার করব'— এই প্রতিজ্ঞাটি থেকে মনে হয় 'বিদ্যাসাগরের চেলা' শিবনাথও হয়তো তাঁর গুরুর মতো মধ্যবিত্তের নিবেদনপ্রধান রাজনীতির অসারতা বুঝতে পেরে, কতকটা হতাশায়, প্রধানত ধর্মকর্ম ও সমাজকল্যাণকর্মে আত্মোৎসর্গ করেছেন।

বাংলা বানান ধ্বনি ও বর্ণমালা

সুধাংশু তুঙ্গ

সাম্প্রতিক কালে বাংলা বানান ধ্বনি ও বর্ণমালা লইয়া আমাদের মধ্যে অনেক ভ্রান্ত ধারণার উৎপত্তি হইয়াছে। যথা

১. বাংলা বানানে অতিরিক্ত অনিয়ম
২. ধ্বনি ও বানানের মধ্যে সর্বত্র সমতার অভাব
৩. যুক্তাক্ষরের বাড়াবাড়ি
৪. বাংলা বানানের প্রবণতা যুক্তাক্ষর বর্জনের দিকে
৫. বাংলা লিপির অপ্রতুলতা
৬. বিদেশী শিক্ষার্থীর নিকট বাংলা একটি বিভীষিকা
৭. বাংলা লিপির তুলনায় রোমক লিপির সুবিধা
৮. বাংলা লিপি ও বানান লইয়া ছাপাখানাকর্মীদের অসুবিধা
৯. বাংলা বানান ধ্বনি ও বর্ণমালায় বৈজ্ঞানিকতার অভাব

ইহা ছাড়া আরও অনেক অল্প গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে, এখানে সেগুলি উল্লেখ করা হইল না, তাহার প্রয়োজনও নাই। এই নয়টি বিষয়ের আলোচনা করিলেই যথেষ্ট হইবে। বিষয়গুলি ভাষাবিজ্ঞানের, ইহাদের সম্যক আলোচনা করিতে গেলে ভাষাবিজ্ঞানের অনেক কথাই আসিয়া পড়ে। কেবল গোড়ার কথাগুলি লইয়াই আলোচনা করা যাক। এই মর্মে সাধারণ ধ্বনিতত্ত্ব ও লিপিতত্ত্ব এবং পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাবর্গের ধ্বনিতত্ত্ব ও লিপিতত্ত্ব -গত তুলনামূলক আলোচনার যথেষ্ট প্রয়োজন হইবে। প্রথমে ধ্বনিতত্ত্ব লইয়া আলোচনা করি।

ধ্ব নি মা লা

ধ্বনি গঠনরীতি শব্দরূপ ও ধাতুরূপের বিচারে ইন্দো-ইউরোপীয় পরিবারের দশটি শাখার ভিতর বহু মিল রহিয়াছে, বহু গরমিলও রহিয়াছে। ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষায় মোট ধ্বনি ছিল ৫৭টি, স্বরবর্ণ ২৭ ও ব্যঞ্জনবর্ণ ৩০। এই ধ্বনিগুলির সবগুলি বজায় নাই, অনেকগুলি লোপ পাইয়াছে; যেগুলি বজায় আছে সেগুলি সব ভাষাতেও সমানভাবে বজায় নাই, দুই-একটি ভাষাতেই কেবল আছে। ইন্দো-ইউরোপীয় মূলভাষার সবচাইতে বেশি সংখ্যক ধ্বনি কেবল সংস্কৃতে বজায় আছে। সংস্কৃতে যে সব ধ্বনি আছে সেগুলি নিম্নরূপ :

স্বরবর্ণ: ১৪টি মৌলিক স্বর অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ, ৪টি যৌগিক স্বর এই এই[১] ওই ওই[১], ৪টি অর্ধস্বর য় র ল এবং ব (অন্তঃস্থ);

ব্যঞ্জনবর্ণ: ২৫টি স্পর্শবর্ণ ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ্ চ্ ছ্ জ্ ঝ্ ঞ্ ট্ ঠ্ ড্ ঢ্ ণ্ ত্ থ্ দ্ ধ্ ন্ প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্, ৩টি উষ্মবর্ণ শ্ ষ্ স্, ১টি মহাপ্রাণ হ্ এবং ১টি মৃদু মহাপ্রাণ ঃ ও আনুনাসিক ং।

১ Jacob Grimm ইহাকেই বলিয়াছেন lautverschbung, ইহার অর্থ law of permutation and combination.

ইহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ কতখানি কয়েকটি ধ্বনি সহযোগে তাহাও বোঝানো যাইতে পারে। মূল ভাষায় চ ও ট বর্গীয় ধ্বনি ছিল না, অথচ দেখিতেছি চ-বর্গীয় ধ্বনি সংস্কৃত ও ইতালীয় এবং জার্মানীয় শাখায় আছে; ট-বর্গীয় ধ্বনি বৈদিকে ছিল না, সংস্কৃতে পাইতেছি, জার্মানীয় শাখায়ও রহিয়াছে। খাঁটি পশ্চাৎকণ্ঠ ক-বর্গীয় ধ্বনি জার্মানীয় গ্রীক ইতালীয় ও কেলতীয়তে রহিয়াছে, কিন্তু সংস্কৃত ও বাল্টো-শ্লাভীয়তে নাই। যে ধ্বনি ই.-ই. মূলভাষায় ছিল না কয়েকটি শাখা ভাষায় সেই ধ্বনির উপস্থিতি দেখিয়া সহজেই প্রতিপন্ন করা যায় যে শাখাভাষাগুলির পরস্পরের প্রভাবে এক শাখার ধ্বনি অন্য শাখাতেও প্রসারিত হইয়াছে। মূলভাষায় ছিল না এমন ধ্বনির উৎস খুঁজিতে গিয়া পণ্ডিতগণ অনেক কথাই বলিয়াছেন, সর্বত্র তাঁহাদের যুক্তিকে মানিয়া লইতে হইবে এমন আইন নাই।

শব্দগঠন রীতি

যে ধ্বনিগুলির উল্লেখ করা হইল ইহারা মৌলিক ধ্বনি; এই মৌলিক ধ্বনিগুলির পারস্পরিক যোগাযোগে বহু যুক্তধ্বনির সৃষ্টি হইয়াছে।[১] কখনো দুইটি মৌলিক ধ্বনি, কখনো তিনটি মৌলিক ধ্বনি মিলিত হইয়া একটি যুক্তধ্বনির সৃষ্টি হয়। এইরূপ যুক্তধ্বনির সংখ্যা যে কত তাহা নিরূপণ করা সহজ নয়। সংস্কৃতে যুক্তধ্বনির বাহুল্য সবচাইতে বেশি, গ্রীক জার্মানীয় ও বাল্টো-শ্লাভীয়তেও যুক্তধ্বনির যথেষ্ট ব্যবহার আছে। ই.-ই. মূলভাষাতেও যুক্তধ্বনির ব্যবহার ছিল।

শব্দের আদিরূপ পাওয়া যায় শব্দমূল ও ক্রিয়ামূল বা ধাতুর মধ্যে। ই.-ই. মূলভাষাতে এইরূপ বহু শব্দমূল ও ক্রিয়ামূলের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার কোনো শাখাতেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। দৃষ্টান্ত হিসাবে কেবল সংস্কৃত এবং অন্য দুই-একটি শাখার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

দুইটি, তিনটি, কখনো তাহারও অধিক ধ্বনির সহযোগে ধাতুর উৎপত্তি হয়। সংস্কৃতে এইরূপ ধাতুর সংখ্যা বহু, কেবল মৌলিক ধাতুই হইল ২,০০০। ইহারা নানাবিধ বিভক্তি প্রত্যয় অনুসর্গ উপসর্গ বচন-কাল ইত্যাদি জ্ঞাপক রূপের সহায়তায় নিষ্পন্ন পদে পরিণত হয়। *St Petersberg Dictionary of Sanskrit*-এর তালিকা অনুযায়ী সংস্কৃত ভাষায় নিষ্পন্ন পদের সংখ্যা ৬ লক্ষাধিক হইবে। কখনো কখনো আবার ধাতুর মধ্যেই যুক্তধ্বনির ব্যবহার পাই, অর্থাৎ যুক্তধ্বনির সহায়তায়ও ধাতু গঠিত হয়। এইরূপ অল্প কয়েকটি যুক্তধ্বনিবিশিষ্ট বহু-প্রচলিত ধাতুর উল্লেখ করা হইল: অঙ্ক্ (to count), অঞ্চ্ (to go), ইন্ধ্ (to kindle), উঞ্ছ্ (to glean), কর্ন্ (to pierce), কীর্ত্ত্ (to narrate), কৃ (to do), ক্রন্দ্ (to cry), ক্রম্ (to walk), ক্রীড়্ (to play), ক্লিশ্ (to harass), ক্ষর্ (to flow), ক্ষিপ্ (to throw), খণ্ড্ (to break), গর্জ্জ্ (to roar), গ্রন্থ্ (to tie), ঘ্রা (to smell), চক্ষ্ (to speak), চর্চ্চ্ (to discuss), জাগৃ (to awake), জৃম্ভ্ (to yawn), জ্ঞা (to know), তক্ষ্ (to cut), ত্রৈ (to save), দণ্ড্ (to punish), দ্বিষ্ (to hate), ধৃষ্ (to dare), ধ্মা (to blow the conch), ধ্বন্স্ (to fall down), নৃত্ (to dance), প্রচ্ছ্ (to ask), প্রী (to be pleased), ফুল্ল্ (to bloom), বন্ধ্ (to bind), বর্ণ্ (to colour), ব্রূ (to tell), ভক্ষ্ (to eat), মন্থ্

১ Jacob Grimm ইহাকেই বলিয়াছেন lautverschbung, ইহার অর্থ law of permutation and combination.

(to destroy), মূর্চ্ছ্ (to faint), মৃ (to die), ম্না (to learn by note), লম্ফ্ (to jump), লম্ব্ (to hang), লস্জ্ (to be ashamed), লুণ্ঠ্ (to rob), শিক্ষ্ (to learn), শ্চুৎ (to scatter), শ্লিষ্ (to embrace), শ্বস্ (to breathe), ষ্ঠিব্ (to spit), স্ব (to go), স্তব্ (to sound), স্তু (to praise), স্তৃ (to spread), স্থা (to stand), স্পৃশ্ (to touch), স্ফুর্ (to shine), স্বঞ্জ্ (to embrace), স্বপ্ (to sleep), স্বিদ্ (to sweat), স্মি (to smile), স্মৃ (to remember), হিন্স্ (to kill), হ্লাদ্ (to be glad), হ্বে (to call) ইত্যাদি। এই ধাতুগুলি ভাবিয়া চিন্তিয়া গ্রথিত করা হয় নাই, হাতের কাছে যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে লওয়া হইয়াছে। ইহাদের সবগুলিই বাংলা হিন্দী মারাঠী প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় সমস্ত ই.-ই. ভাষাতেই আছে, কতগুলি জার্মানীয় শাখার ইংরেজীতেও পাই। ইংরেজীতে যেগুলি বিদ্যমান সেগুলি হইল: কৃ, ক্রন্দ্, ক্লিশ্, ক্ষি, জ্ঞা, তক্ষ্, ধৃষ্, প্রী, ফুল্ল্, বন্ধ্, ষ্ঠিব্, স্থা, স্বপ্, স্বিদ্, স্মি ও হ্লাদ্, মোট ১৬টি অর্থাৎ প্রায় এক চতুর্থাংশ। এই ধাতুগুলি ইংরেজীতেও কি করিয়া রহিয়াছে তাহা অল্প বিশ্লেষণ করিয়া বোঝানো যাইতে পারে। কৃ>ল্যাটিন creo, তাহা হইতে ইংরেজী work; ক্রন্দ্>cry, ন ও দ লোপ পাইয়াছে; ক্লিশ্ ধাতুর অর্থ harass, ঐ harass কথাটির মধ্যেই ক্লিশ্ রহিয়াছে, ই.-ই. ক>গ্রীক-জার্মানীয় h , ক্ষি>মধ্য-ল্যাটিন decasus>ই. decay; জ্ঞা ধাতুর অর্থ to know, ইহা ধ্বনিপরিবর্তনের ফলে এইরূপ হইয়াছে; প্রী>ই. plea, যথা please , বন্ধ্ স্পষ্টতই bind; ষ্ঠিব্ ধাতুর অর্থ to spit, ইহাও ধ্বনিপরিবর্তন এবং ধ্বনিবিপর্যয়ের ফলে এইরূপ হইয়াছে; স্থা ধাতুর স্থা>স্তা-স্টা প্রায় সব ইউরোপীয় ভাষাতেই পাওয়া যায়, যেমন ইংরেজী stand; স্বপ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন পদ স. স্বপ্ন, পুরাতন ইংরেজীতে পাই swefan, চসারেও দেখি swefen; স্বিদ্ স্পষ্টতই sweat; স্মি ধাতুর অর্থ to smile, ইহার smiএর মধ্যে ধাতুটি বর্তমান; অনুরূপ হ্লাদ্>ই. glad। সুতরাং দেখা যাইতেছে যুক্তধ্বনি সম্বলিত সংস্কৃত ধাতুর এক চতুর্থাংশ সংখ্যক ক্রিয়ামূল ইউরোপীয় সমস্ত ভাষাতেই বর্তমান এবং ইহাদের সর্বত্রই প্রায় যুক্তধ্বনি রহিয়াছে। ব্যঞ্জন আশ্রিত ঋ-কেও এখানে যুক্তিধ্বনি বলিয়া ধরা হইয়াছে।

ধাতু যুক্তধ্বনি সম্বলিত হইলেও নিষ্পন্ন পদে যুক্তধ্বনি নাও থাকিতে পারে, যেমন ধ্মা>ধমতি, ম্না> মনতি ইত্যাদি। আধুনিক ইউরোপীয় ভাষাগুলিতে যেসব অযুক্ত-ধ্বনি সম্বলিত পদ পাই তাহার অনেকগুলিই এইরূপ যুক্তধ্বনি সম্বলিত ধাতু হইতে উৎপন্ন। এই কারণে ধাতু ও নিষ্পন্ন পদের সহিত অনেক সময় সম্পর্ক খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন।

আবার ধাতু অযুক্ত ধ্বনির হইলেও নিষ্পন্ন পদে যুক্তধ্বনি থাকিতে পারে, যেমন অস্+তি>অস্তি। সমস্ত ইউরোপীয় ভাষাতেই এই পদটির অস্তিত্ব আছে: যেমন গ্রী. esti, ল্যা. est, জা. ist, ফ. est ও ই. is। উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলিতে ব্যবহৃত st (স্ত-স্ট) যুক্তধ্বনি।

শব্দমূলেও এইরূপ যুক্তধ্বনির ব্যবহার আছে, যেমন ই.-ই. মূল osth>স. অস্থি, গ্রী. osteon; স. বৃকঃ, ই.-ই. মূলে ইহা wlqw>wlqwos, ই. wolf, গ্রী lukos; স. জন্+অ=জানু, ইংরেজীতে ইহার রূপ পাইতেছি knee অর্থাৎ ই.-ই. শব্দমূলটি সম্ভবত গেনু অথবা জেনু অথবা জ্ঞেউ হইয়া থাকিবে।

ই.-ই. মূলভাষার প্রত্যয় অনুসর্গ উপসর্গ ও বিভক্তি ইত্যাদিও সংস্কৃত এবং তাবৎ ইউরোপীয় ভাষায়

বলবৎ আছে। ই.-ই. মূল প্রে>স. প্র, গ্রী. প্র, ই. প্রো, যেমন স. প্রমথঃ, গ্রী. প্রমেথিউস্। ই.-ই. মূল এষ্ঠ>স. ঈষ্ঠ, গ. ইষ্ট্, স্ট্, কখনো কখনো ঔষ্ট্, ইংরেজীতে শুধু স্ট্, যেমন স. গরীষ্ঠ, গ. maist, ই. most।

কখনো কখনো মূল শব্দও সংস্কৃত সহ ইউরোপীয় ভাষাগুলিতে বর্তমান আছে। যেমন ই.-ই. মূলভাষা aktou>স. অষ্ট, গ্রী. okto, ল্যা. octo, গ. ahtau, ই. eight; মূলভাষা antheranon>স. অন্তরা, গ. anthara, ই. other; মূলভাষা dhughter>স. দুহিতৃ, প্রা. ই. dohtor, গ. dautar, আ. ই. daughter; মূলভাষা sweohur>স. শ্বশুর, প্রা. জা. swehur, গ. swahur ইত্যাদি।

স. শতম্ শব্দটি ই.-ই. বিভিন্ন ভাষায় কিভাবে রূপলাভ করিয়াছে দেখা যাক। ইহা ল্যাটিনে কেন্তুম, ওয়েল্‌সে কন্থ্, গথিকে খুন্দ্, রাশিয়ানে স্তো, ইংরেজীতে হাণ্ড্রেড হইয়াছে; মূল ভাষায় ইহার রূপ ছিল kmtom।

দৃষ্টান্ত আর বাড়াইবার প্রয়োজন নাই। যুক্তধ্বনি ই.-ই. মূলভাষাতে ছিল, মূলভাষা হইতে শাখা ভাষাগুলিতে আসিয়াছে। এই যুক্তধ্বনি কোথাও ক্রিয়ামূল ও কোথাও শব্দমূলের সহিত গ্রথিত বলিয়া বেশির ভাগ সময় নিষ্পন্ন পদে বিদ্যমান এবং এই কারণে অবিচ্ছেদ্য; আবার কোথাও ক্রিয়ামূল ও শব্দমূলে ছিল না, কিন্তু নিষ্পন্ন পদে আসিয়াছে, সুতরাং এ ক্ষেত্রেও অবিচ্ছেদ্য।

ভাষা প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তিত হইতেছে; ভাষা কেন, আরো স্পষ্ট করিয়া বলিলে ধ্বনি প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তিত হইতেছে, তবে এই পরিবর্তনের গতি অতিশয় মন্থর, হিমবাহের গতির চাইতেও শ্লথ। ই.-ই. ধ্বনি এইরূপ মন্থর গতিতে তাহার শাখাপ্রশাখার মধ্যে প্রসারিত হইয়াছে, কিন্তু সর্বত্র সমানভাবে হয় নাই। সংস্কৃত গ্রীক জার্মান ও ইংরেজী ভাষাতে যুক্তধ্বনির ব্যবহার অন্যান্য ভাষার চাইতে কিছু বেশি। ইংরেজী ভাষায় যুক্তধ্বনির বাহুল্য যে কী পরিমাণ তাহা নির্ণয় করা একপ্রকার দুঃসাধ্য বলিলেই হয়। এই দিক লক্ষ করিয়া জনৈক ভাষাবিদ্ ইংরেজী ভাষাকে most masculine বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[২] কিন্তু যুক্তধ্বনি বিশ্লিষ্ট হোক কি বিশ্লিষ্ট ধ্বনি যুক্ত হইয়া পড়ুক ইহার উপর মানুষের হাত নাই, ইহা স্বাভাবিকভাবেই হইয়াছে। এবং যাহা স্বাভাবিক ভাবেই হাজার হাজার বছরের অতি ধীর বিবর্তনের ফলে সম্ভব হইয়াছে, তাহার অনুরূপ কোনো কাজ রাতারাতি সম্পন্ন করিয়া তোলা অসম্ভব। বাংলা বানান সংস্কার করিবার আগে ধ্বনিবিজ্ঞানের এই দিকটির প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে। এই সম্পর্কে পরে আরো বিশেষভাবে আলোচনা করা যাইবে, আপাতত অন্য একটি গুরুতর বিষয়ের আলোচনা প্রয়োজন। ইহা হইল লিপিতত্ত্ব।

লিপিমালা: ইউরোপীয়

অধুনা প্রচলিত পৃথিবীর সমুদয় লিপিমালাকে পণ্ডিতেরা ৫টি শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। এই ৫টি শ্রেণী হইল:

---

২ Otto Jespersen: তিনি strength কথাটির যুক্তি দেখাইয়া বলিয়াছেন একটিমাত্র স্বরধ্বনিকে কেন্দ্র করিয়া ৭টি ব্যঞ্জন জড়াইয়া রহিয়াছে।

১ ঈজিপশীয় লিপি
২ বানমুখ লিপি
৩ চীনীয় লিপি
৪ আজটেকীয় লিপি
৫ ইউকেটনীয় লিপি

এখানে কেবল ঈজিপশীয় লিপির আলোচনা করিলে যথেষ্ট হইবে। ইহা হইতেই আধুনিক ইউরোপে প্রচলিত সমস্ত লিপির উদ্ভব হইয়াছে। ঈজিপশীয় লিপির উদ্ভব কবে হইয়াছিল তাহা স্থির করিবার উপায় নাই। খ্রীষ্টপূর্ব বহু শত অব্দে ফিনিশীয়রা এই লিপি গ্রহণ করে এবং কিছু সংস্কার কিছু পরিবর্তন দ্বারা আপনাদের উপযোগী করিয়া লয়। ক্রমে ইহা হইতে হিব্রু লিপির উৎপত্তি হয়। খ্রী. পূ. নবম অষ্টম শতকে গ্রীকরা পুনরায় ইহা হইতে তাহাদের নিজস্ব লিপিমালা প্রস্তুত করে। এই গ্রীক লিপিমালা হইতে রোমক লিপিমালার উৎপত্তি এবং তাহা হইতে ইউরোপীয় সমস্ত লিপিমালার সৃষ্টি। শত শত বৎসর ধরিয়া এইরূপ নানা পরিবর্তনের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও ঈজিপশীয় লিপির তেমন কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয় নাই। হিব্রু বর্ণমালায় মোট ২২টি লিপি ছিল; গ্রীক বর্ণমালায় বর্ধিত হইয়া ইহার সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫টিতে, অধুনা রোমক বর্ণমালায় হইয়াছে ২৬টি। ২৬টি লিপির সাহায্যে আজ ইন্দো-ইউরোপীয় ৫৭টি মৌলিক ধ্বনির প্রকাশ হইতেছে। ইহাতে কতখানি অসুবিধা হইতে পারে কল্পনা করিয়া দেখুন। ঈজিপশীয় লিপির অপ্রতুলতার দরুণ ইহার অনেক অসুবিধা ছিল, এই সম্বন্ধে একজন লিপি-বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন: "While Egypt must be credited with having first invented an alphabetic system, and must for ever claim for this the gratitude of the world, yet that system was far too imperfect to become the instrument of a popular literature. It suffered equally from the opposite diseases of homophony and polyphony, from the expression of same sound by many different symbols, and from the use of one symbol to denote many different syllables. And each of these evils was only aggravated by time."[৩] কথাটি সমস্ত ইউরোপীয় বর্ণমালা সম্পর্কেও প্রযোজ্য। ইউরোপীয় বর্ণমালা বলিতে গ্রীক রোমক ও রাশিয়ান বর্ণমালা; রোমক বর্ণমালার সহিত অন্যান্য বর্ণমালার মূলত কোনো তফাত নাই। গ্রীক ও রোমক বর্ণমালায় যথাক্রমে ২৫টি ও ২৬টি লিপি আছে, ৫টি স্বরবর্ণ এবং বাকি ২০টি ও ২১টি ব্যঞ্জনবর্ণ। রাশিয়ান বর্ণমালার কথা পরে বলা যাইবে। ইন্দো-ইউরোপীয় ধ্বনিমালায় স্বরধ্বনির সংখ্যা ২৩ ও ব্যঞ্জনধ্বনির সংখ্যা ৩৪। সুতরাং ৫টি স্বরবর্ণের সাহায্যে ২৩টি স্বরধ্বনির ও ২০-২১টি ব্যঞ্জনবর্ণের সাহায্যে ৩৪টি ব্যঞ্জনধ্বনির প্রকাশ করিতে যে অসুবিধা হইবে ইহা জানা কথা। তাহার পর আধুনিক ইউরোপীয় ভাষাগুলিতে ধ্বনির সংখ্যা আরো বাড়িয়াছে, বাড়িয়া কত হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করা সহজ নয়। অথচ লিপি সেই একই থাকিয়া গিয়াছে বলিয়া একটি লিপির সাহায্যে আজ পাঁচটি সাতটি ধ্বনির প্রকাশ করিতে হইতেছে। রোমক বর্ণমালায় ৫টি স্বর-লিপি আছে, কিন্তু ইউরোপীয়

৩ *Encyclopaedia Britanica*তে প্রকাশিত **Alphabet** প্রবন্ধে **John Pelle**

ভাষাগুলিতে ইহাদের প্রত্যেকের দ্বারা অন্তত ১৮টি করিয়া ধ্বনি প্রকাশিত হয়। তাহার জন্য মূল লিপির উপরে ও নীচে বিভিন্ন ধরনের নানারকম diacritics বা চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, কখনো কখনো বিভিন্ন কোণের রেখা দ্বারাও লিপিটিকে ছেদ করিতে হয়। এইরূপ চিহ্নের সংখ্যা মোট ১৮। এবং ছোট ও বড় দুই জাতের হরফ রহিয়াছে; সে ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি লিপির জন্য মোট চিহ্নের সংখ্যা ১৮×২=৩৬এ দাঁড়ায়। একটি লিপিকে যদি এইভাবে ৩৬টি বিশেষ চিহ্নের দ্বারা ৩৬ প্রকার করা হয় তাহা হইলে রোমক বর্ণমালায় শুধু স্বর-লিপির সংখ্যাই ৩৬×৫=১৮০তে পর্যবসিত হয়।

ব্যঞ্জনধ্বনির জন্য এতখানি জটিলতা না থাকিলেও একেবারে কম নাই। দৃষ্টান্তের জন্য রোমক বর্ণমালা হইতে কেবল একটি মাত্র ব্যঞ্জন লইলেই যথেষ্ট হইবে। ধরা যাক C c; ইহা ল্যাটিনে ক এবং ইতালীয়ানে ক ও ত, ইংরেজীতে ক ও স; ফরাসীতে ইহার দুই রূপ, স বুঝাইতে ইহার নীচে একটি cedilla যোগ করা হয়, জার্মানে ক ও ত্স্; স্প্যানিশে ক ও থ; নাগরীতে আবার ইহার ধ্বনিরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে চ। ইউরোপীয় প্রত্যেক ভাষাতেই অধুনা চ ধ্বনিটি বর্তমান, কিন্তু ইহার নির্দিষ্ট কোনো লিপিরূপ নাই। ইংরেজীতে ch, ফরাসীতে tch, জার্মান ও রাশিয়ানে tsch, পোলিশ ও চেকে cz, হাঙ্গেরিয়ানে cs ইত্যাদি দ্বারা ধ্বনিটির প্রকাশ হয়। একই ধ্বনির একই লিপিরূপও সকল ভাষায় গৃহীত হয় নাই: যেমন জার্মান V=ইংরেজী ফ, W=হ্ব, রোমক y=রাশ. উ (ইউ), c=স, H=ন, রোমক g=জা. অন্তঃস্থ অ (য়), z=ট্স্ ইত্যাদি। এবং আরো অনেকরূপেই ইউরোপীয় ভাষাগুলিতে একই লিপির বিভিন্ন ধ্বনি নির্ণীত হইয়াছে। অনেক সময় ব্যঞ্জনের উপরে ও নীচেও স্বরবর্ণের মত diacritical marks রহিয়াছে এবং তাহাও সকল ভাষায় সমান নয়।

এবং শুধু ইহাই নয়। ইউরোপীয় বর্ণমালার অপ্রতুলতা সত্ত্বেও বহু জায়গায় একই ধ্বনিকে প্রকাশ করিবার জন্য দুইটি তিনটি করিয়া বর্ণের ব্যবহারও হইয়া থাকে। যথা, ইংরেজীতে ক বোঝাইতে c ch k ও q, ফ বোঝাইতে f gh ও ph, গ্রীকে স বোঝাইতে রোমক s ও গ্রীকবর্ণমালার ১৯শ সংখ্যক বর্ণ এবং এই একই ভাষায় ই বোঝাইতে ৩টি এবং ও বোঝাইতে ৩টি লিপি ব্যবহৃত হয়; প্রাচীন ফিনিশীয়তে সামেক (হিব্রু বর্ণমালার ১৫শ সংখ্যক বর্ণ) বোঝাইতে ৫টি লিপি, আধুনিক হিব্রুতেও কফ বোঝাইতে ২টি, মেম বোঝাইতে ২টি, নান বোঝাইতে ২টি, পো বোঝাইতে দুটি এবং ত্সাধে বোঝাইতে ২টি লিপি ব্যবহৃত হয়।

এইবার রাশিয়ান বর্ণমালা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। গ্রীক বর্ণমালাকে সংস্কৃত ও পরিবর্ধিত করিয়া নবম শতকে সিরিল (Cyrill) নামে কন্স্টান্টিনোপ্লের জনৈক ধর্মযাজক রাশিয়ান বর্ণমালা প্রস্তুত করেন। এই বর্ণমালায় মোট ৪৮টি বর্ণ-লিপি ছিল (নাগরী বর্ণমালায় বর্ণ-লিপির সংখ্যা ৫০, লুপ্ত অকার ধরিলে ৫১)। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি যুক্তধ্বনি-প্রকাশক লিপি, এই কারণে ইহাদিগকে যুক্তলিপি (যুক্তাক্ষর নয়) বলা যাইতে পারে। এইগুলি হইল: ত্স্ (২৯ সংখ্যক), স্ত (৩২ সংখ্যক), ইউ (৩৮ সংখ্যক), ইঅ [য়] (৩৯ সংখ্যক), ইএ (৪০ সংখ্যক), স্কি (৪৫ সংখ্যক) প্সি (৪৬ সংখ্যক)। অধুনা এই বর্ণমালা হইতে ১৪টি লিপি বাদ পড়িয়াছে; এইগুলির ভিতর কয়েকটি যুক্তলিপিও আছে। ২টি যুক্তধ্বনি-প্রকাশক যুক্তলিপি এখনো বলবৎ আছে, ইহারা হইল ত্স্ ও স্ত (সিরিলের ২৯ ও ৩২ সংখ্যক লিপি); ইহা ছাড়া দুইটি যৌগিক স্বর সংবলিত লিপিও বলবৎ আছে, ইহারা ইউ এবং ইঅ।

রোমক বর্ণমালার দুইটি যুক্তধ্বনি-প্রকাশক লিপি আছে, ইহারা হইল ইংরেজী x ও জার্মান z, ইহাদের উচ্চারণ যথাক্রমে ক্স্ ও ট্স্ বা ৎস্। এবং এই একই বর্ণমালাতে মৌলিক ধ্বনি -প্রকাশক তিনটি যুক্তলিপিও আছে, ইহারা fi (f i), ffi (f f i) ও ti (t i)। যৌগিক ধ্বনি-প্রকাশক দ্বিস্বরগুলির কথা ছাড়িয়াই দিলাম, বর্তমানে তাহাদের ব্যবহার কমিয়া আসিতেছে।

সুতরাং ইউরোপীয় বর্ণমালায় যে যুক্তধ্বনি ও পরিপূরক যুক্তলিপি আছে তাহার পরিচয় পাওয়া গেল। এইবার ভারতীয় লিপি লইয়া আলোচনা করা যাইতে পারে।

লি পি মা লা : ভা র তী য়

ঈজিপশীয়-ফিনিশীয় লিপি হইতে ভারতীয় লিপির উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া কয়েকজন ইউরোপীয় পণ্ডিত মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু এই মত সর্বত্র গৃহীত হয় নাই। ঈজিপশীয় লিপির সহিত ইহার কিছু সম্বন্ধ থাকিলেও ভারতীয় লিপি এই ভারতবর্ষের কোথাও না কোথাও উদ্ভূত হইয়াছিল এইরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। তবে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলিবার উপায় নাই। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে অশোকের অনুশাসনে আমরা প্রথম ভারতীয় লিপির সাক্ষাৎ পাই। অশোকের অনুশাসনগুলি দুই প্রকারের লিপিতে লিখিত হইয়াছিল, একটি খরোষ্ঠী এবং অন্যটি ব্রাহ্মী। খরোষ্ঠী লিপি দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত হইত, ইহা ফিনিশীয় লিপির সাদৃশ্যে রচিত বলিয়া বিশ্বাস; ব্রাহ্মী লিপি বাম হইতে দক্ষিণে লেখা হইত, ইহা হইতেই নাগরী লিপির উৎপত্তি হইয়াছে এবং নাগরী লিপির সাদৃশ্যে ও সমান্তরালে অন্যান্য ভারতীয় লিপিমালাগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে।

নাগরী বর্ণমালায় লিপির সংখ্যা ৫০, সংস্কৃত ভাষায় মূল ধ্বনির সংখ্যাও ৫০। ইহার অর্থ একটি ধ্বনির জন্যই কেবল একটি লিপি নির্দিষ্ট। ইহা সম্পূর্ণই বৈজ্ঞানিক এবং John Pelle কথিত homophony ও polyphony নামক ব্যাধি দুইটি হইতে মুক্ত। এই লিপিমালার বিন্যাসপদ্ধতিও অতি অপূর্ব। প্রথমে স্বরবর্ণ, ইহারা সংখ্যায় ১৪। অ সবচেয়ে লঘুস্বর, তাই ইহা সর্বপ্রথমে বসিয়াছে; ঔ সবচেয়ে দীর্ঘস্বর এবং ইহা যৌগিকস্বরও বটে, এই কারণে ইহার স্থান হইয়াছে সর্ব পশ্চাতে। ইহাদের মধ্যবর্তী স্বরগুলি মাত্রার ক্রম অনুসারে বিন্যস্ত হইয়াছে। ব্যঞ্জনধ্বনির বর্ণবিন্যাস ইহা অপেক্ষাও বৈজ্ঞানিক। ২৫টি স্পর্শবর্ণ, তাহার জন্য ২৫টি ব্যঞ্জন, ইহারা আবার সমান ৫টি বর্গে বিভক্ত। প্রত্যেক বর্গের ধ্বনি একত্রে বসিয়াছে। বর্গীয় পঞ্চম বর্ণ সর্বত্রই আনুনাসিক, স্পর্শবর্ণের পর ৪টি অর্ধব্যঞ্জন, 'য' 'র' 'ল' ও অন্তস্থ 'ব', বর্গীয় ব্যঞ্জনের সহিত ইহাদের উচ্চারণগত মৌলিক পার্থক্য আছে। ইহার পর ৩টি উষ্মবর্ণ এবং সর্বশেষে অনুস্বার ও বিসর্গ। এইরূপ বৈজ্ঞানিক প্রথায় লিপিবিন্যাস পৃথিবীর অন্য কোনো বর্ণমালায় নাই। ইউরোপীয় বর্ণমালা তো হ-য-র-ল-ব অবস্থায় পড়িয়া আছে; প্রথমে A a, ইহা স্বরবর্ণের আদি ধ্বনি, কিন্তু তাহার পরেই ব্যঞ্জনের B b। মুখগহ্বর হইতে ধ্বনিমালা যে ক্রম অনুসারে নির্গত হয়, তাহার প্রতি লক্ষ রাখিয়া নাগরী বর্ণমালার বর্ণসংস্থান হইয়াছে বলিয়া তাহা এত বৈজ্ঞানিক, অন্যপক্ষে রোমক বর্ণমালায় মুখগহ্বরের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই।

সংস্কৃতে ৫০টি মৌলিক ধ্বনি; যুক্তধ্বনির সংখ্যা কত তাহা নির্ণীত হয় নাই— ইহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। দুইটি মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনি একত্র হইয়া একটি যুক্তধ্বনি প্রস্তুত হয়, ইহা ইন্দো-ইউরোপীয়

ধ্বনিমালার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। দুইটির অধিক মৌলিক ধ্বনির সংশ্রবে যুক্তধ্বনি গঠিত হইতেও পারে। ইউরোপীয় বর্ণমালায় ইহার জন্য পাশাপাশি বর্ণসংস্থান করিবার বিধি আছে; নাগরী লিপিমালায় পাশাপাশি নহে, একটির সহিত আর-একটি লিপি সংযুক্ত হইয়া যুক্ত লিপিতে পরিণত হয়। কেবল ক্ষ জ্ঞ হ্ম (হ্ম) ইত্যাদি কয়েকটি যুক্তধ্বনির জন্য স্বতন্ত্র লিপি আছে; Cyrill-রচিত রাশিয়ান লিপিমালায় এইরূপ স্বতন্ত্র লিপির উদ্ভব হইয়াছিল। নাগরীতে উক্ত ৩টি লিপি রচনায় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার পক্ষে ও বিপক্ষে বলিবার সমান যুক্তি আছে। যথাস্থানে তাহার আলোচনা হইবে।

স্বর ও ব্যঞ্জনের যোগসাধনও অনুরূপ। দুই ধ্বনির উচ্চারণ যদি যুগপৎ হয় তাহা হইলে তাহাদের লিপিসংস্থান আলাদা হইবে কেন? এই কারণে র ও উ-এর যুগপৎ উচ্চারণের জন্য রু হইয়াছে, রউ হয় নাই। স্বরধ্বনির প্রতীক চিহ্নগুলিও অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত স্বরবর্ণ যুক্ত হইলে মূল স্বরবর্ণ ব্যবহৃত না হইয়া তাহার চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। এই চিহ্নগুলি ধ্বনির স্পষ্ট প্রতীক এবং তাহাদের গঠনরীতিতেও এই বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হইয়াছে। অ ধ্বনি ব্যঞ্জনকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়া থাকে বলিয়া তাহার জন্য স্বতন্ত্র চিহ্ন নাই, তাহা ব্যঞ্জনেই প্রকাশিত; আ ধ্বনি পার্শ্বধ্বনি, তাহার চিহ্ন ব্যঞ্জনের দক্ষিণপার্শ্বে প্রদত্ত হয়; উ ঊ নিম্নধ্বনি, তাহারা ব্যঞ্জনের নিম্নে বসিয়া থাকে; ই ঈ আচ্ছাদী-ধ্বনি, তাহারা ব্যঞ্জনকে ছাতার মত আচ্ছাদন করিয়া রাখে বলিয়া তাহাদের চিহ্নগুলির মধ্যে সেইরূপ লক্ষণ প্রতীত হয়। তবে এই ই-চিহ্ন ও ঈ-চিহ্নের সহিত ব্যঞ্জনের সংস্থানে কিঞ্চিৎ পার্থক্য দেখা যায়। ঈ-চিহ্ন ডান পার্শ্বে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ই-চিহ্ন বাম পার্শ্বে। ইহা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক নহে। ইহাও ডান পার্শ্বে রক্ষিত হইলে লিপিচিহ্নকরণ নিখুঁত হইত। সম্ভবত ই-চিহ্নকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে রচনা করিতে পারেন নাই বলিয়া প্রাচীন লিপিকারগণ এই সামান্য একটু ভুল করিয়াছেন। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে ই- ও ঈ-চিহ্ন প্রায় একই চিহ্ন; একটির মোড় ডান দিকে, অন্যটির মোড় বাম দিকে। এইজন্যই তাঁহারা ই-চিহ্নের স্থান ব্যঞ্জনের বাম পার্শ্বে নির্দিষ্ট করিয়াছেন। ঋ এবং র-ফলাও ব্যঞ্জনকে প্রায় সম্পূর্ণ গ্রাস করিয়া থাকে, এইজন্য তাহাদের স্থান ব্যঞ্জনের নীচে হইয়াছে, কিন্তু নীচে হইলেও তাহাদের আকৃতিতে তাহাদের ব্যঞ্জন-গ্রাসিতার লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। ও ঐ ধ্বনিও ব্যঞ্জনকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে, কিন্তু ই- ও ঈ- ধ্বনির মত এতটা নহে, এই কারণে ও- এবং ঐ- চিহ্নের মধ্যে অল্প বাঁক রচিত হইয়াছে। এইরূপ বৈজ্ঞানিক লিপিচিহ্নরচনা ফিনিশীয় বর্ণমালায় দেখা যায় না। রোমক বর্ণমালায় ধ্বনি ও বর্ণের সংস্থানেও এতখানি সামঞ্জস্য নাই। সেখানে স্ট উচ্চারণ করিতে st অর্থাৎ স্ট্, রু উচ্চারণ করিতে roo বা ru, এইভাবে বর্ণসংস্থান হইয়াছে। রোমক লিপির যে সুবিধা কিছু নাই তাহা নহে। একটি মস্ত সুবিধা আছে। তাহা হইল বানানে স্বর ও ব্যঞ্জনের অবস্থান। আর-একটি সুবিধা হইল H h; এই H h-এর সহায়তায় অল্পপ্রাণ ধ্বনিকে মহাপ্রাণে পরিণত করা যায়। এই কারণে মাত্র ২৬টি বর্ণের সাহায্যে সেখানে অসংখ্য ধ্বনি প্রকাশিত হইতেছে। নাগরী লিপিতে এরকম কোনো সুবিধা নাই। কিন্তু ইহার অন্যান্য অনেক সুবিধা আছে। নাগরী লিপি ধ্বনির স্পষ্ট প্রতীক; ইহা উচ্চারণে সর্বত্রই একরূপ। রোমক লিপির অপ্রতুলতা হেতু ইহারা কোনো নির্দিষ্ট ধ্বনির প্রতীক হইতে পারে নাই, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধ্বনির প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহাতে নূতন ব্যক্তির পক্ষে এই লিপির সঠিক ধ্বনি নির্ণয় করা সব সময় সম্ভব নয়। নাগরী লিপিতে এইরকম হইবার আশঙ্কা নাই। সংস্কৃত

বানানই সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণ; ইউরোপীয় ভাষাগুলিতে বানানের সহিত উচ্চারণের কদাচিৎ যোগ থাকে। সংস্কৃত বানান সর্বাংশেই উচ্চারণভিত্তিক। গ্রীক ও ল্যাটিন ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো বর্গের কোনো ভাষার বানান এইরূপ উচ্চারণভিত্তিক হইতে পারে নাই। তাহার অনেক কারণ আছে, সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইবে। সংস্কৃত ভাষার ধ্বনি ও বানান অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত বলিয়া ইহা সম্পূর্ণই বৈজ্ঞানিক ভাষা; ইহার ব্যাকরণেও অরাজকতার অবকাশ সীমাবদ্ধ। "The Sanscrit language, whatever be its antiquity, is of wonderful structure; more perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than the either."[৪] বস্তুত ব্যাকরণ, গঠনরীতি, ধ্বনিবিন্যাস ইত্যাদি বিষয়ের বিচারে সংস্কৃত পৃথিবীর নিখুঁততম ভাষা। ইহার শ্রেষ্ঠত্ব সমস্ত তর্কের অতীত। এবং ইন্দো-ইউরোপীয় পরিবারের ভিতর ইহার স্থান কতখানি তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই সম্পর্কে জনৈক ভাষাচার্যের উক্তি: "The origin of Comparative Philology dates from the time when European scholars became accurately acquainted with the ancient language of India. Before that time classical scholars had been unable, through centuries of their learned research, to determine the true relations between the known languages of our stock. This fact alone shows the importance of Sanskrit for comparative research. Though its value in this respect has perhaps at times been over-rated, it may still be considered as the eldest daughter of the old mother tongue. Indeed so far as direct documentary evidence goes, it may rather be said to be the only surviving daughter; for none of the other six[৫] principal members of the family have left any literary monuments, and their original features have to be reproduced, as best as they can, from the materials supplied by their own daughter languages."[৬]

এই সংস্কৃত ভাষা হইতে বাংলা ভাষা ও নাগরী লিপির সাদৃশ্যে বাংলা লিপির উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া সংস্কৃত ভাষা ও নাগরী লিপির সমস্ত সুবিধা বাংলা ভাষা ও লিপির মধ্যে আছে। অবশ্য সংস্কৃত ভাষার সহিত তুলনায় বাংলা একটি অর্বাচীন ভাষা; কিন্তু তবুও উহার কতকগুলি বৈজ্ঞানিক দিক আছে। মোটা-মুটিভাবে বাংলা বানানও উচ্চারণভিত্তিক। সংস্কৃত ধ্বনিমালা হইতে বাংলা ধ্বনিমালা অনেক দূর সরিয়া আসিয়াছে। স্বরধ্বনির বেলায় এই দূরত্ব একটু বেশি; ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে ঞ ও ণ, অর্ধব্যঞ্জন ব এবং উষ্মবর্ণ ষ বাংলা ধ্বনি হইতে লোপ পাইয়াছে, অর্ধব্যঞ্জন য বর্গীয় জ-তে রূপান্তরিত হইয়াছে, বাকি ব্যঞ্জনগুলি অবিকৃত আছে। স্বরধ্বনির মধ্যে অ-এর উচ্চারণ সরল হইয়াছে, ঐ (সংস্কৃত উচ্চারণ অ্যায়)

৪ Sir William Jones, ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল-এ প্রদত্ত ভাষণ

৫ প্রকৃতপক্ষে ইন্দো-ইউরোপীয় মূলভাষার শাখা হইল ১০টি। ইহাদের মধ্যে তোখারীয়, আলবানীয়, হিট্টি ও কেলতীয় লেখকের প্রবন্ধ রচনার সময় স্বতন্ত্র শাখা-ভাষা বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই।

৬ *Encyclopaedia Britanica*তে প্রকাশিত **Sanskrit Language and Literature** প্রবন্ধে **Julius Eggeling**

ওই হইয়াছে, ঋ ৯ ৠ উঠিয়া গিয়াছে। ঋ ধ্বনি অবশ্য আজ একমাত্র সার্বিয়ান ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায় নাই; বাংলাতে ইহা রি, গ্রীকে উ, প্রাকৃতে উ ই ইত্যাদি হইয়াছে। ৯ সংস্কৃতেও অল্প ছিল, একমাত্র ক্লৃপ্‌ ধাতু ছাড়া অন্যত্র ইহার পরিচয় নাই। বাকি স্বর- ও ব্যঞ্জন -ধ্বনিগুলি অবিকৃত আছে।

নাগরী লিপির মত বাংলা লিপি রচনায় অবশ্য এতখানি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয় না। কেবল স্বরচিহ্নগুলি লইয়া আলোচনা করিলেই যথেষ্ট হইবে। আ ই ঈ উ ঊ ঋ র-ফলা এবং রেফ— এই ৮টি স্বরধ্বনির লিপিচিহ্ন নাগরীলিপিচিহ্নের অনুরূপ। কিন্তু এ ঐ ও এবং ঔ— এই ৪টি চিহ্ন নাগরী লিপি চিহ্ন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, এ এবং ঐ চিহ্ন অর্থাৎ ে-কার ও ৈ-কার ব্যঞ্জনের বামপার্শ্বে বসে; ও এবং ঔ চিহ্ন অর্থাৎ ো-এবং ৌ-কার ব্যঞ্জনকে মধ্যে রাখিয়া ঘিরিয়া থাকে। এ বক্র পার্শ্বধ্বনি; ঐ উর্ধ্ব পার্শ্বধ্বনি; এই দুইটি স্বরচিহ্নকে ব্যঞ্জনের বামপার্শ্বে রাখিবার যৌক্তিকতা নাই। নাগরীতে ইহারা ব্যঞ্জনের দক্ষিণে মাথার উপর কাত হইয়া বসিয়া থাকে। ও এবং ঔ চিহ্নও নাগরীতে মাথা ও পার্শ্বদেশ বেষ্টন করিয়া দক্ষিণে উপবিষ্ট, কিন্তু ঈ-চিহ্নের মত নয়। বাংলা লিপিতে ইহাদের সন্নিবেশ যথাযথ হয় নাই। নাগরী লিপিতে ই চিহ্নের সন্নিবেশ দেখিয়া আদি বাংলা লিপিকারগণ বিভ্রান্ত হইয়া থাকিতে পারেন।

এইবার দুই-একটি যুক্তব্যঞ্জন লইয়া আলোচনা করিতে হয়। বাংলা লিপিতে ক্‌ষ-এর জন্য একটি স্বতন্ত্র লিপি আছে, ইহা হইল ক্ষ; নাগরীতেও ইহা ক্ষ না হইয়া হইয়াছে ক্ষ। নাগরীতে এইরূপ হইবার কোন কারণ ছিল না, কেননা ক ও ষ উভয়েই সেখানে উচ্চারিত হয়। বাংলাতে ক ও ষ-র যুগ্ম উচ্চারণ একেবারে আলাদা, ইহা কোথাও খ, কোথাও ক্‌খ, কোথাও খ্য। সুতরাং উভয় ধ্বনির সম্মিলনে যদি একটি তৃতীয় ধ্বনির উৎপত্তি হয় তবে উভয় ধ্বনির চিহ্নগুলি বাদ দিয়া স্বতন্ত্র একটি লিপি গঠনে যুক্তিযুক্ততা থাকিতে পারে। এইরূপে জ ও ঞ মিলিয়া জ্ঞ হইয়াছে। এখানে জ ও ঞ পরস্পরের মধ্যে এমনভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে যে উহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব উঠিয়া গিয়াছে। এই লিপিটি রচনায় নাগরী ও বাংলা উভয়েই সমান বৈজ্ঞানিকতা রক্ষা করিয়াছে। নাগরী ও বাংলা উভয় লিপিতেই র-ফলা-যুক্ত উ এবং র-ফলা-যুক্ত ঊ কারের সম্মিলিত চিহ্ন দুটি বড়ই অদ্ভুত, র-ফলার ডান পাশে উ এবং ঊ চিহ্ন দিয়া উহারা রচিত হইয়াছে। র-ফলা-যুক্ত উ ধ্বনিটির চিহ্ন যথাযথ হয় নাই কেননা উ নিম্নধ্বনি, অথচ এখানে ইহার চিহ্নের মুখ রহিয়াছে উর্ধ্বে। তবে র-ফলা-যুক্ত ঊ চিহ্নটি ঠিক হইয়াছে। ই এবং ঈ চিহ্ন দুটি রচনায় যে মানসিকতা কাজ করিয়াছ এখানেও তাহা বর্তমান।

বাংলা বানান ও উচ্চারণ

বাংলা বানান মোটামুটিভাবে উচ্চারণভিত্তিক, কিংবা বিপরীতভাবে বলিতে গেলে বাংলা উচ্চারণ মোটামুটিভাবে বানানভিত্তিক। অবশ্য ই.-ই. বর্গের কোন আধুনিক ভাষাতেই আজ সম্পূর্ণরূপে উচ্চারণ-ভিত্তিক বানান বা বানানভিত্তিক উচ্চারণ নাই। আধুনিক গ্রীক আর প্রাচীন গ্রীক এক ভাষা নয়। আধুনিক গ্রীক ভাষাতে উচ্চারণ ও বানানের পরিপূরক সম্বন্ধ নাই, অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষাগুলিতেও নাই। এই সম্পর্কে কেবল ইংরেজীর বানানরীতি লইয়া আলোচনা করিলে যথেষ্ট হইবে, ফরাসী ও জার্মান বানান ও উচ্চারণ লইয়া অল্প কিছু বলিলে চলিবে।

ইংরেজী বানান উচ্চারণভিত্তিক বলিয়া অনেকের বদ্ধ ধারণা রহিয়াছে। তাঁহারা but ও put এর ব্যাপারটা বোধ হয় ভাবিয়া দেখেন নাই। ইংরেজী বানানে যে কোন নিয়ম নাই এবং উহা উচ্চারণকে অনুসরণ করিয়া রচিত হয় না, এমন কথা বলিব না। তবে ইংরেজী ও ফরাসী বানান ও উচ্চারণে যতখানি পার্থক্য রহিয়াছে ততখানি পার্থক্য পৃথিবীর অন্য কোন তৃতীয় ভাষাতে নাই। *Oxford English Dictionary*তে ৫ লক্ষাধিক শব্দ আছে, ধরা যাক এই ৫ লক্ষাধিক শব্দ লইয়াই ইংরেজীর কারবার। ইহাদের মধ্যে কতগুলি বানানে উচ্চারণের সমতা রহিয়াছে? শুনিলে অবাক হইতে হইবে যে গড়ে প্রতি ১০০টি বানানের জন্য ইংরেজীতে একটি করিয়া উচ্চারণ নির্দেশিত হয়। সর্বত্র তাহারও সমতা নাই। Lieutenant শব্দটির উচ্চারণ কি? education এর উচ্চারণ এজুকেশন না এডুকেশন? Psycho, pslam, pseudo ইত্যাদির p-এর উচ্চারণ নাই, pitch, match ইত্যাদিতে t-এর উচ্চারণ নাই; Pslam, calm-এর l, hymn, column-এর n অনুচ্চারিত, know, knee-এর k অনুচ্চারিত, এইরূপ আরো কত বর্ণের উচ্চারণ নাই। humble এর h উচ্চারিত, কিন্তু honour-এর h? যেখানে সেখানে আবার অহেতুক দ্বিত্বের বাড়াবাড়ি, যেমন ফ কখনো f আবার কখনো ff, স কখনো s আবার কখনো ss, এইরূপ আরো বহু বর্ণের দ্বিত্বের চল আছে। এবং অনেক সময় দুই-তিনটি ব্যঞ্জন মিলিয়া এমন একটি ধ্বনির প্রকাশ হয় যাহার ভাষাতাত্ত্বিক কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। gh এর উচ্চারণ কখনো ঘ আবার কখনো ফ, ti-এর উচ্চারণ কখনো শ আবার কখনো টি। এই প্রসঙ্গে বানার্ড শ-র একটি সমীকরণ আছে। তাহা নিম্নরূপ হইতে পারে :

ফ = gh যেমন laugh
ই = ie যেমন coterie
ল = law যেমন law
স = tio যেমন action
ই = e যেমন catastrophe
∴ ফিলসফি = ghielawtioghe।

ইহার পর ইংরেজী বানান সম্পর্কে আর কিছু না বলিলেই চলে। তবু ইংরেজী বানানের জন্য যাঁহাদের শ্রদ্ধা অকৃত্রিম তাঁহাদের জন্য উক্ত বার্নার্ড শ-রই একটি উক্তি তুলিয়া দিতেছি। "The English have no respect for their language, and will not teach their children to speak it. They cannot spell it because they have nothing to spell it with but an old foreign alphabet of which only the consonants and not all of them— have any agreed speach value···it is impossible for an Englishman to open his mouth without making some other Englishman despising him. Most European languages are now accessible in black and white to foreigners; English and French are not thus accessible even to Englishmen and Frenchmen."[৭]

৭ *Pygmalion*-এর **preface**

এবং ইহাতেও তিনি ক্ষান্ত হন নাই, আরো বলিয়াছেন: "an e upside down indicates the indefinite vowel, sometimes called obscure or neutral, for which, though it is one of the commonest sounds in English speech, our wretched alphabet has no letter."[৮] বার্নার্ড শ-কে অনেকে eccentric বলিয়া জানেন এবং এই কারণে তেমন আমল দিতে চান না। তাঁহাদের জন্য অন্য একজন পণ্ডিতের একটিমাত্র উক্তিই যথেষ্ট হইবে ভরসা করি। তিনি বলিয়াছেন: "Ordinary written English is extremely illogical in spelling, a confusing variety of different sounds being represented by the same letters e.g. cough = kof, but plough = plow, and dough = doh, etc. This makes English harder to learn and use than it might be if a separate letter or symbol were for every sound."[৯]

ইংরেজী বানান ও উচ্চারণে এই বৈসাদৃশ্যের কারণ ইংরেজী বানানে আদি ই.-ই. শব্দ ও ক্রিয়ামূলের কাঠামো রহিয়া গিয়াছে, কিন্তু উচ্চারণ বদলাইয়া আধুনিক হইয়াছে। daughter-এর উচ্চারণ dawter কিন্তু বানানে ই.-ই. মূলভাষার daughter-এর gh বিদ্যমান।

ফরাসী বানান ও উচ্চারণে বৈষম্য আরো প্রকট। তাহারা বলে ফিস, লেখে fils; বলে বিলি-ডু, লেখে bellet deaux। অনুরূপ enturage হইল তাহাদের আঁতুরা, monsieur>মসিঁয়ে, Jean> ঝাঁ, denoument>ডিনুমুঙ ইত্যাদি। শব্দান্ত ব্যঞ্জন কখনো উচ্চারিত হয়, আবার কখনো অনুচ্চারিত থাকে, যেমন bon jour>বঁ জুর, কিন্তু au revoir>অ´ রিভোয়া, monsieur>মসিঁয়ে প্রভৃতি। দৃষ্টান্ত বাড়াইবার দরকার নাই। ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে ইংরেজী ও ফরাসী বানানরীতি অনেক বেশি অরাজকতায় ভর্তি। জার্মান বানানরীতি এতখানি বিসদৃশ নয়, সেখানে স্বর- ও ব্যঞ্জন-ধ্বনি মাত্রই উচ্চারিত হয়, যেমন Knave—কেনফে, কিন্তু ইংরেজী Knave—নেভ, Mueller—মুইলর, Hoheit—হোহেইট ইত্যাদি।

বাংলা বানান জার্মান বানানরীতির কাছাকাছি, সুতরাং অরাজক বা বিসদৃশ ব্যাপার ইহাতে অল্পই আছে। বাংলা বানানের মোটামুটি কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হইল নিম্নরূপ:

এক ॥ শব্দান্ত অ-স্বরান্ত ধ্বনি হলন্ত হইয়া যায়, যেমন জল বল চল খল কর ইত্যাদি। শুধু বাংলা নয়, ই.-ই. বর্গের সমস্ত ভারতীয় ভাষাতেই এই প্রবণতা বর্তমান, ব্যতিক্রম শুধু উড়িয়া। যুক্তধ্বনি মাত্রই স্বরান্ত যেমন শক্ত, ভক্ত, সুপ্ত, সাম্রাজ্য ইত্যাদি। পাঞ্জাবী মারাঠী ও হিন্দীতে কিন্তু এইরূপ ক্ষেত্রেও হলন্ত উচ্চারণ হয়, যেমন বুদ্ধ>বুধ budh, শুদ্ধ>শুধ sudh, শক্ত>শক্ত্ shakt, অঞ্জলি>অঞ্জ্লি anjli, সাম্রাজ্য>সাম্রাজ্জ samrajj ইত্যাদি।

দুই ॥ পদভেদে উচ্চারণের রীতিও আলাদা। বিশেষ্য পদে শব্দান্ত অ-স্বরান্ত ধ্বনির উচ্চারণ হলন্ত হয়, কিন্তু অব্যয় পদে হয় না, অর্থাৎ অ-স্বর বজায় থাকে। যেমন আইনত, আপাতত, ক্রমশ, ন্যায়ত, প্রথমত, ফলত, বস্তুত, মূলত, যথাযথ ইত্যাদি। ইহাদের অনেকগুলি সংস্কৃত শব্দ, শব্দান্তে বিসর্গ ছিল, অধুনা বিসর্গ

[৮] *Pygmalion*-এর preface

[৯] *General Introduction to Bernard Shaw's Plays*-এ A. C. Ward

উঠিয়া যাইতেছে, কিন্তু উচ্চারণের গোলমাল হয় নাই। আইনত আরবী আইন হইতে ত (তস্ নয়) প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন হইয়াছে। জনৈক ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিত বলিয়াছেন তিনি বস্তুত না লিখিয়া বস্তুতঃ, ক্রমশ না লিখিয়া ক্রমশঃ লিখিবেন, কেননা বিসর্গ তুলিয়া দিলে বস্তুতঃ প্রস্তুত ও ক্রমশঃ লোমশ হইয়া যাইবে।[১০] এই দুইটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে "অঙ্কের মাস্টার" শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ একদা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সমিতির পণ্ডিতগণকে হতভম্ব করিয়া দিয়াছিলেন; তাঁহারাও বিসর্গ তুলিয়া দিবার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু ঘোষ মহাশয়ের অকাট্য যুক্তিতে তাহা পারেন নাই। ঘোষ মহাশয়ের যুক্তি অবশ্য অকাট্য নয়। অত কত তত মত যত ইত্যাদি অব্যয়, ইহাদের কোথাও বিসর্গ নাই, কখনো ছিল বলিয়া মনেও হয় না (সংস্কৃতে অবশ্য ইহারা বিসর্গযুক্ত), তবু তো ইহারা দিব্যি অ-স্বরান্ত হইয়া উচ্চারিত হইতেছে। রবীন্দ্রনাথ মত-কে ম তো লিখিতেন, সম্ভবত মত (dictum) শব্দের সহিত পার্থক্য দেখাইবার জন্য। তাঁহার দেখাদেখি অনেকে অধুনা কতো, ততো, যতো এমনকি এতো-ও লিখিয়া থাকেন। এইরূপ লিখিবার প্রয়োজন নাই, কেননা ইহাতে সুবিধা কিছুই হইতেছে না, বরঞ্চ অমিতব্যয়িতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আধুনিক যুগে ইকনমি বা মিতব্যয়িতার বিশেষ গুরুত্ব আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমেরিকায় যে ইংরেজী বানানের কিঞ্চিৎ সংস্কার হইয়াছে তাহা এই ইকনমি বা মিতব্যয়িতার কথা চিন্তা করিয়া। এতো তো কোনক্রমেই সিদ্ধ নয়, এখানে এ প্রসারিত অ্যা, তাহার পাশেই বিস্তারিত ও, এই দুইটি স্বরের পাশাপাশি উচ্চারণ নিতান্তই আয়াসসাধ্য, আমাদের জিহ্বার পক্ষে বড় বেশি ভারী।

বিশেষণ পদও ক্ষেত্রবিশেষে স্বরান্ত, যেমন ছোট, বড়, মেজ (অধুনা বানানে মেজো), ভাল, হত, গত, আহত, বিস্তৃত ইত্যাদি। কিন্তু বিশেষ্য পথ মত রথ হলন্ত। চূত বিশেষ্য হইলেও বিশুদ্ধ সংস্কৃত রূপে রহিয়া গিয়াছে, এই কারণে স্বরান্ত। কেন তেন যেন হেন ইহারাও অব্যয়; অব্যয় বলিয়া স্বরান্ত। কিন্তু ক্রিয়া দেন নেন লেন হলন্ত। আবার দিল নিল শুল ইত্যাদি ক্রিয়াও স্বরান্ত, অথচ দিল (বি), নীল (বিণ) শূল (বি) ইত্যাদি হলন্ত। রবীন্দ্রনাথ ছোটো বড়ো ইত্যাদি লিখিতেন, শব্দান্ত অ-স্বর বোঝাইবার জন্য। রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করিয়া পরে অনেকেই এইরূপ বানান পছন্দ করিতেন। অধুনা তাহা উঠিয়া যাইতেছে। ভালই হইতেছে। ঐ শব্দগুলিও অবশ্য কখনো কখনো হলন্তরূপে উচ্চারিত হয়, যেমন ছোটদা > ছোট্‌দা-ছোড়্‌দা, বড়দা > বড়্‌দা, মেজদা > মেজ্‌দা ইত্যাদি। কিন্তু এক্ষেত্রে ইহারা আর বিশেষণ নাই, উপসর্গ হইয়া গিয়াছে।

একই শব্দ বিভিন্ন পদের হইয়া থাকিলে পদভেদে তাহার বিভিন্ন রকম উচ্চারণ হয়, যেমন বি. বদল > বদল্, অসম. ক্রিয়া বদলে > বদ্‌লে (উচ্চারণ বোদ্‌লে), অব্যয় বদলে > বদলে; বি. অমৃত > অমৃত্, বিণ. অমৃত > অমৃত ইত্যাদি।

পদভেদে উচ্চারণের পার্থক্য ইংরেজীতে আছে, বৈদিকে প্রচুর ছিল। ক্রিয়ার কাল-ভেদেও উচ্চারণের পার্থক্য হয়, যেমন ইংরেজী বর্তমান ক্রিয়া read > রিড, কিন্তু অতীত ক্রি. read > রেড।

প্রমথঃ > প্রমথ বিশেষ্য হওয়া সত্ত্বেও স্বরান্ত, চূত শব্দের মত। ব্যতিক্রম কিন্তু মনঃ, ইহা মন হইয়া

---

১০ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, দেশ, ২২ এপ্রিল ১৯৬৭

হলন্ত রূপে চলিতেছে। অনুরূপ বল ফল ইত্যাদি। ইহারা হলন্ত বিশেষ্য পদের প্রভাবে হলন্ত হইয়াছে, কিন্তু প্রমথ সুমথ ইত্যাদি শব্দে সে প্রভাব পড়ে নাই বলিয়া ইহাদের স্বরান্ত উচ্চারণ অবিকৃত আছে।

অনুকার শব্দ হলন্ত, যেমন কনকন, চনচন, বনবন, ঘ্যান ঘ্যান, প্যান প্যান ইত্যাদি। অনুকার শব্দের অনুরূপ শব্দ ভিন্নপদাশ্রয়ী হইলে কিন্তু তাহার উচ্চারণে পার্থক্য থাকিবে। যেমন ঘন ঘন, ইহা অব্যয়, সেই কারণে স্বরান্ত। পুনঃপুনঃ হইতে বিসর্গ তুলিয়া দিলে পুনপুন করিবে বলিয়া অনেকে আশঙ্কা করেন। ইহা অমূলক।

তিন॥ কয়েকটি সংস্কৃত ধ্বনির বাংলা উচ্চারণ নাই। যেমন ঋ ণ ষ; ঋ রি হইয়াছে, মূর্ধণ্য দন্ত্য ন হইয়াছে, মূর্ধণ্য ষ তালব্য শ হইয়াছে। বাংলা-অসমীয়া ছাড়া মূর্ধণ্য ণ-এর উচ্চারণ সমস্ত ভারতীয় ভাষায় রহিয়াছে।

কৃষ (ক্ষ) খ কৃথ খ্য হইয়া গিয়াছে। যেমন ক্ষেত>খেত, ভিক্ষা>ভিকখা, লক্ষ>লখ্য ইত্যাদি। হিন্দীতে এই ধ্বনিটির উচ্চারণ আছে, লৌকিক হিন্দীতে নাই, কোথাও খ কোথাও ছ হইয়াছে। যেমন ভিক্ষা>ভিক্‌ষা, কিন্তু লক্ষ্মণ>লকখন>লখন; লক্ষ্মী>লছমী— লখিম ইত্যাদি। এইভাবে রামলখন লখনৌ ও লখিমপুর পাইতেছি। লখনৌ শব্দের বানান লইয়া কিছু গোলমাল উঠিয়াছে। কেহ যেন একবার লক্ষ্ণৌ রাখিবার পক্ষে কড়া যুক্তি দেখাইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন ইহাতে শব্দটির তাৎপর্য বুঝিতে সুবিধা হইবে। কিন্তু শব্দটি লখনৌ হইলেও সে তাৎপর্য নষ্ট হইবে না, কেননা লখন তো রহিয়াছে। অনেকে শব্দটিকে লখনউ করিবার পক্ষপাতী। কিন্তু ইহা আমাদের উচ্চারণে লখনৌ হইয়াছে, ঔ-এর উপর বল রহিয়াছে, লখনউ হইলে উ-এ বল পড়িবে, আমরা সেরকম উচ্চারণ করি না।

য়-ফলার উচ্চারণ দ্বিবিধ: কখনো ইহার রূপ অ্যা আবার কখনো য়-ফলা-স্পৃষ্টধ্বনির অনুরূপ, যেমন ব্যবহার, ব্যাকরণ; কিন্তু বাক্য, খাদ্য ইত্যাদি।

পরধ্বনি আচ্ছাদী ধ্বনি হইলে তাহার প্রভাবে য়-ফলা এ হইয়া যায়, যেমন ব্যক্তি>বেক্তি, ব্যতিক্রম> বেতিক্রম ইত্যাদি।

একটি ক্ষেত্রে আ-কার অ্যা হইয়াছে, যেমন জ্ঞা, জ্ঞান, বিজ্ঞান হইয়াছে গ্যাঁ, গ্যাঁন, বিগ্যাঁন; সম্ভবত ব্যাকরণ শব্দের অ্যা ধ্বনির প্রভাবে এইরূপ হইয়া থাকিবে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক শব্দে আ-কার বজায় আছে।

ম ধ্বনির উচ্চারণও দ্বিবিধ: ম এবং মঁ, যেমন মৃত্যু>মৃত্যু, মরা>মরা, কিন্তু মা>মাঁ, মাতাল> মাঁতাল।

স্থান নামের বানানে যুক্তবর্ণ থাকিলেও অনেক সময় যুক্তধ্বনির উচ্চারণ হয় না, যেমন মস্কো>মসকো লক্ষ্ণৌ>লখনৌ, লণ্ডন>লনডন। মসকো শব্দটির রাশিয়ান উচ্চরণ মসকওয়া, রবীন্দ্রনাথ মসকাউ লিখিয়াছেন।

লখনৌ সম্পর্কে পূর্বেই বলা হইয়াছে। লনডন-এ দুইটি সিলেব্‌ল্ রহিয়াছে। এই কারণে তাহা যুক্তবর্ণ দিয়া লিখিত হইলেও আলাদাভাবে উচ্চারিত হয়। উচ্চারণের দোহাই দিয়াও শব্দটিতে যুক্তবর্ণ রাখিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু আক্রা, ইণ্ডিয়ানা, ইস্তাম্বুল, উইম্বলডন, কর্সিকা, পার্থ (Perth), বর্মা ইত্যাদি শব্দে যুক্তধ্বনি পাইতেছি। পার্থ (অর্জুন) ও পার্থ (অস্ট্রেলিয়ার নগরী) এক নয়, প্রথমটিতে র্থ-এ বল, দ্বিতীয়টিতে পা-এ, এই কারণে প্রথমটির র-এর মাত্রা অধিক।

চার ॥ বাংলা উচ্চারণের প্রবণতা দ্বিমাত্রিকার দিকে। বহুবর্ণ-বিশিষ্ট-শব্দ দুই মাত্রার পর্বে বিভক্ত হইয়া উচ্চারিত হয়। অ-স্বরান্ত ধ্বনি যে হলন্ত হইয়া যায় তাহার একটি কারণ এই দ্বিমাত্রিকতা। দ্বিমাত্রিকতা লইয়া শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার ODBL গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন, সুতরাং এই সম্পর্কে আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

পাঁচ ॥ উচ্চারণের উপর বলের অপরিসীম প্রভাব। এই বলই ধ্বনিমালাকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। ইহার অমোঘ শক্তি। ফিজিক্সে যেমন ল অফ গ্র্যাভিটেশন, কেমিস্ট্রিতে যেমন ল অফ কন্সারভেশন অফ মাস, সাইকোলজিতে যেমন ল অফ অ্যাসোসিয়েশন, ভাষাবিজ্ঞানেও তেমনি ল অফ অ্যাকসেঞ্চুয়েশন। ইহাকে বাদ দিয়া ধ্বনিতত্ত্বের কোনো আলোচনাই হইতে পারে না। ই.-ই. মূলভাষার ধ্বনি যে বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হইয়া বিভিন্ন শাখা-ভাষার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার মূলে এই বল। পূর্বে যে দ্বিমাত্রিকতার কথা বলা হইয়াছে, তাহাও প্রতি পদক্ষেপে এই বলের উপর নির্ভরশীল, বলকে বাদ দিলে দ্বিমাত্রিকতার কোন গুরুত্বই থাকিবে না।

বলের স্থান পরিবর্তনে উচ্চারণ পরিবর্তিত হয়, ধ্বনি পরিবর্তিত হয়, অর্থও বদলাইয়া যায়। বাংলাতে এই বল কোথায় কিভাবে উচ্চারণকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে আলোচনা করিয়া দেখা যাক।

শব্দান্ত অ-স্বরান্ত বর্ণে বল না থাকার জন্য তাহা হলন্ত হইয়া যায়, যেমন জ´ল পা´ল বণি´ক ইত্যাদি। কিন্তু ক্রিয়া মরল´ হল´ হইল´ বলযুক্ত হেতু স্বরান্ত রহিয়াছে। এইরূপ কল´তান চল´মান জল´যান বল´বান, কিন্তু উ´দ্যান উ´দ্যোগ জ´লতরঙ্গ জ´লপান বা´পযান রা´মধনু শ্র´মদান সু´লতান ইত্যাদি। অতীত-কালের 'ত' ও 'ল' প্রত্যয়ান্ত এবং ভবিষ্যৎ কালের 'ব' প্রত্যয়ান্ত সমস্ত ক্রিয়াপদ বলযুক্ত হেতু স্বরান্ত। যেমন করিত´ দিত´ নিত´, কিন্তু ক´রিত (কর্মা) ভি´ত শী´ত ইত্যাদি হলন্ত।

যুক্তধ্বনিযুক্ত শব্দে কোথায় বল পড়ে এবং তাহা ভাঙিয়া আলাদা করিয়া বানান করিলে কোথায় পড়ে তাহা দেখা যাক। উগ্র´ > উ´গর, চাক্তি´ > চা´কতি, পাঞ্জা´ব > পা´নজাব, লণ্ড´ন > ল´নডন, মস্কো´ > ম´সকো, হিব্রু´ > হি´বরু ইত্যাদি। আমরা কিভাবে উচ্চারণ করি তাহা ভাবিয়া দেখিলেই কোন্ রূপটি গ্রহণযোগ্য তাহা বোঝা যাইবে। বলা বাহুল্য আমরা উগ্র উচ্চারণ করি, উগ্‌র নয়; চাক্তি বলি, চাকতি নয়। মস্কো ও লণ্ডন স্থাননাম, তাই শব্দগুলি ভাঙিয়া আলাদা করিয়া লিখিলে উচ্চারণ হেরফের হইলেও তেমন যায় আসে না, কেননা আমরা খাঁটি বৃটিশ ও রাশিয়ানের মত ঐ দুইটি শব্দ উচ্চারণ করি না, বৃটিশের উচ্চারণে বরঞ্চ লণ্ডনের ল-এ বল থাকে। কিন্তু পাঞ্জাব পানজাব হইবে না, কেননা আমাদের পাঞ্জাব উচ্চারণে ঞ্জা-এর উপর প্রবল বল রহিয়াছে, ফলে ঞ > ন জ-এর ভিতর এতই অনুপ্রবিষ্ট হইয়া যায় যে তাহা হস্‌চিহ্ন দ্বারাও প্রকাশ পায় না। তবে মাদ্রাজ > মাদরাজ, পার্শী > পারশী প্রভৃতিতে একই জায়গায় বল রহিয়াছে, সুতরাং এইসব ক্ষেত্রে যুক্তবর্ণ রাখিবার পক্ষে এই দিক দিয়া তেমন যৌক্তিকতা নাই।

বলযুক্তধ্বনির পরে র-ফলা-যুক্তধ্বনি থাকিলে র-ফলা-যুক্তধ্বনির দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়, যেমন বলপ্রয়োগ, ইহার উচ্চারণ হইতেছে বলপ্‌প্রয়োগ—ল-এ বল থাকার জন্য প্র উচ্চারণ অসম্ভব হইয়া পড়ায় প্-এর আগম হইয়াছে। ঐ শব্দটি উচ্চারণকালে ল-এ বল না দিয়া দেখুন, প্ আসিবে না। অনুরূপ বলযুক্ত-ধ্বনির পরে সমস্ত র-ফলা-ও-ঋ-কার-যুক্তধ্বনির দ্বিত্ব উচ্চারণ, যেমন নম্র বক্র বিপ্র ও আকৃষ্ট, আবৃত্তি, সুকৃত ইত্যাদি। কিন্তু বানানে এই দ্বিত্ব কুত্রাপি প্রদর্শিত হয় না। র-ফলা-যুক্তধ্বনির পূর্বধ্বনি বলহীন হইলে

কিন্তু তাহার দ্বিত্ব উচ্চারণ হয় না, যেমন বলয়গ্রাস, এখানে তুইটি বলযুক্তধ্বনির মাঝখানে বলহীন য় রহিয়াছে। পাণিনি রেফ-যুক্ত ধ্বনির প্রসঙ্গে কেবল বিকল্পে দ্বিত্ব বিধান করিয়াছিলেন, যেমন কর্দ্দম, দুর্দ্ধর্ষ, স্থর্য্য ইত্যাদি; রেফযুক্ত ধ্বনির পূর্বধ্বনি বলযুক্ত না হইলে উচ্চারণে দ্বিত্ব লক্ষিত হয় না, যেমন দুর্দ্ধর্ষ। এখানে বল রহিয়াছে দু এবং র্দ্ধ-এর উপর, এই কারণে র্ষ বলহীন। রেফ-যুক্ত মূর্ধণ্য ধ্বনিতে পাণিনি দ্বিত্ব বিধান করেন নাই, সম্ভবত এই কারণে যে ইহা বিকেন্দ্রিক ধ্বনি, উচ্চারণ করিতে জিহ্বার উপর তত চাপ পড়ে না।

ইংরেজী উচ্চারণেও ঠিক এই ব্যাপার পরিলক্ষিত হয়, সেখানে একটি অ্যাকসেণ্টেড সিলেব্‌লের পরের সিলেব্‌ল্ প্রায় সর্বদাই আন-অ্যাকসেণ্টেড। ইংরেজী ছন্দে এই রীতির বহুল ব্যবহার। ইংরেজীতেও বাংলা সংস্কৃতের মত কেবল বলের কারণেই পদভেদ হইয়া যায়, যেমন mi'nute>minu'te; কখনো কখনো এই কারণে অর্থভেদ হইয়াও যায়, যেমন hou'sewife (গৃহকর্ত্রী)>housewi'fe (উচ্চারণ হাজিফ) (সূঁচ-সুতা রাখিবার তাক)।

ধ্ব নি প রি ব র্ত ন

বলের প্রভাবে তুইটি স্বর-যুক্তধ্বনির একটি স্বর হারাইয়া অন্যটির সহিত মিশিয়া যায়, এইরূপে যুক্তধ্বনির সৃষ্টি হয়। আবার যুক্তধ্বনি স্বরাক্রান্ত হইয়া পৃথক ধ্বনিতে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। সুতরাং যুক্তধ্বনিকে ইচ্ছামত ভাঙিয়া আলাদা করিয়া লিখিলে সব দিক রক্ষিত হয় না।

অনেকের ধারণা বাংলা ভাষার প্রবণতা যুক্তাক্ষর ভাঙার দিকে, তাঁহারা দৃষ্টান্ত দেন রত্ন>রতন। শুধু রত্ন>রতন নয়, এইরূপ হাজার হাজার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, যথা মুক্তা>মুকুতা, শক্তি>শকতি প্রভৃতি। ইহাদের ব্যবহার সাধারণত কবিতায় হয়, এবং এই কারণে ইহাদের কবিপ্রয়োগ বলা হয়। কবিতায় জনপ্রিয়তা অর্জন করিলে ইহারা ক্রমে ক্রমে গদ্যেও আসিয়া পড়ে, যেমন উক্ত রত্ন>রতন এবং সমুদ্র>সমুদ্দর, রাত্রি>রাত্তির ইত্যাদি। ধ্বনিবিজ্ঞানে এই প্রক্রিয়া স্বরভক্তি নামে পরিচিত। এই প্রক্রিয়া কেবল যে বাংলা ভাষাতেই আছে তাহা নহে, ই.-ই. বর্গের সমস্ত ভাষাতেই আছে। এবং প্রক্রিয়াটি নিত্যই বর্তমান। বিভিন্ন ভাষা হইতে কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি। স. ইন্দ্র>পান. ও হি. ইন্দর, হিট্টি ইন্দর; স. উগ্র> ব্যক্তিভেদে আধুনিক বাংলা উচ্চারণে উগ্‌র; হিব. ktb>আ. katab; ই.-ই. মূলভাষা kmtom>ল্যা. centum, গ্রী. he katon; ই. গ্লাস>বা. গেলাস; বা. ধর্মতলা>হি. ধরমতলা; ই. film>বা. ফিলিম, গ. baitrs>আ. ও প্রা. ই. bitter; প্রা. জা. burg>আ. জা. burug; ই.-ই. মূলভাষা wlqwos>গ্রী, লুকোস; ই. cycle>বা. সাইকেল, ইত্যাদি।

ইহার বিপরীত ক্রিয়াও আছে। তুইটি ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যস্থ স্বরধ্বনি লুপ্ত হইয়া যুক্তধ্বনিতে পরিণত হয়। এইরূপ প্রক্রিয়াও কেবল বাংলাতে নহে, ই.-ই. বর্গের সমস্ত ভাষাতেই আছে। যথা, ই. all correct>orl krect (ইহা হইতেই o. k. কথাটির উৎপত্তি); ই. economics>ই. উচ্চারণে ecnomics; ই. operation>হি. উচ্চারণে অপ্রেশান, বা. কোথাথেকে>কোত্থেকে; স. দারু>গ্রী. drus; স. বারাণসী-বানারসী>হি. বানার্সী, হিব. বেন-জামিন>ই. Benjamin; বা. ভাল লাগে>বা. উচ্চারণে ভাল্লাগে; গ. maithmaz>maithms; ই. literature>ই. উচ্চারণে litrature; স.

শতম>রাশ. স্তো; স. সুবর্ণ>স্বর্ণ, ইত্যাদি। অদূর ভবিষ্যতে যদি ভাল্লাগে, litrature, ecnomics ইত্যাদি লিখিত রূপে ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে আশ্চর্যের কিছু নাই। অনুরূপে চালবাজ>চাল্বাজ, জলতরঙ্গ>জল্তরঙ্গ, জলপান>জল্পান ইত্যাদি রূপে লিখিত না হইলেও উচ্চারিত হইতে পারে, শ্রমদান>শ্রন্দান হইতেও পারে।

বলের প্রভাবে শুধু ধ্বনি পরিবর্তিতই হয় না, অনেক সময় লুপ্ত হইয়াও যায়, যেমন বৈদিক অপি'ধান>স. পিধান, স. পিতা'>আবেস্তীয় প্তা'>পার তা।

কখনো আবার এক ধ্বনির জায়গায় সম্পূর্ণ ভিন্ন ধ্বনি আসিয়া পড়ে, যেমন স. ভিক্ষা>বা. উচ্চারণে ভিক্‌খা বা ভিখ্যা।

সংস্কৃত গ্রীক প্রভৃতি ভাষায় শব্দের পদভেদে কারকভেদে বচনভেদে লিঙ্গভেদে এবং ক্রিয়া হইলে তাহার কালভেদে বলের স্থানভেদ হইত। যেমন, স. অমৃত (বি) অমৃত' (বিণ), স. এ'মি (আমি যাই) ইম'স (আমরা যাই), স. সু'কৃত (বি) সুকৃত' (বিণ) গ্রী. pati'r (কর্তৃকা) pa'ter (কর্মকা), স. য'শস্ (ক্লিবলিঙ্গ) যশ'স্ (পুংলিঙ্গ) ইত্যাদি।

সংস্কৃত ও গ্রীক অত্যন্ত স্থিতিশীল ভাষা বলিয়া ইহাদের শব্দাবলীতে বলের নির্দিষ্ট স্থান ছিল, সেই কারণে ধ্বনি পরিবর্তন হইত না। বাংলা প্রভৃতি আধুনিক ভাষাগুলি ক্রমশ গতিশীল হইতেছে, এই কারণে ইহাদের শব্দাবলীতে বলের নির্দিষ্ট স্থান নাই। নাই বলিয়া যে একেবারে নাই তাহা নহে। অনেক সময় শব্দ পরিবর্তিত হইলেও তাহার বল পরিবর্তিত হয় নাই; যেমন বিসর্গযুক্ত অব্যয় শব্দে সংস্কৃতে বিসর্গযুক্ত ধ্বনির উপর বল পড়িত, বাংলা হইতে বিসর্গ উঠিয়া যাইতেছে, কিন্তু বল তাহার পূর্বস্থানে রহিয়াছে। বাংলায় স্থানভেদে ব্যক্তিভেদেও বলের স্থান পরিবর্তন হয়। ইহার জন্য ক্রমশ উচ্চারণ পরিবর্তিত হইতেছে, ধ্বনি পরিবর্তিত হইতেছে। ভাষাতত্ত্বে এই ধ্বনিপরিবর্তন এক সাংঘাতিক প্রক্রিয়া। ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে আবার শব্দের উচ্চারণ আরো পরিবর্তিত হইতেছে। ধ্বনি পরিবর্তনের সহিত তাল রাখিয়া লিপি পরিবর্তন হয় নাই। হাজার হাজার বছর ধরিয়া লিপি এক জায়গায় পড়িয়া আছে, দুই হাজার বছর আগে যে বর্ণের দ্বারা যে ধ্বনি প্রকাশিত হইত আজ সেই বর্ণের দ্বারা সেই ধ্বনি প্রকাশিত হইবার নয়। বাংলাতে ঋ ণ ও ষ ধ্বনিগুলি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাদের লিপি পড়িয়া রহিয়াছে। এমন সব ভাষাতেই হয়, ইহার জন্য আক্ষেপ করিয়া লাভ নাই।

ধ্বনি পরিবর্তিত হইয়া ভাষাকেও পরিবর্তিত করিয়া ফেলে। সংস্কৃত গ্রীক জার্মানীয় প্রভৃতি ভাষাগুলি হইতে যে-সব মধ্যযুগীয় ও আধুনিক ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা এই ধ্বনি-পরিবর্তনের ফল। ভাষা পরিবর্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার বানানও পরিবর্তিত হয়। এই কারণে ই.-ই. মূলভাষার বানান আর তাহার শাখা বা উপভাষার বানানে এত পার্থক্য। কথাগুলি আরো সহজ করিয়া বলিলে দাঁড়ায়: ধ্বনি বানানকে নিয়ন্ত্রণ করে, আবার বানান নিয়ন্ত্রিত হইয়া ধ্বনিকে শুদ্ধ-ভাবে প্রকাশ করে। তাহা না হইলে এক জেনারেশনের উচ্চারণ তাহার পরবর্তী জেনারেশনে বোধগম্য হইত না। যে-সব আরণ্যক ভাষার লিখিত রূপ নাই সেইসব ভাষায় এইরূপই হইয়া থাকে। সম্প্রতি একটি পত্রিকা ভাষাতত্ত্বের এই দিক লক্ষ্য না রাখিয়া বানান গঠন করিতেছে এবং বলিতে চাহিতেছে বানানমুখী উচ্চারণ হইবে, উচ্চারণমুখী বানান নয়। বলা বাহুল্য ইহা একটি reverse process। ধ্বনিতত্ত্বে এইরূপ reverse process

বলিয়া কোনো process নাই। নদীর গতি যেমন ঊর্ধ্বমুখী হইবে না, ভাষার গতিও তেমনি পশ্চাৎমুখে যাইবে না। Volapuk, Esperanto প্রভৃতি কৃত্রিম ভাষাও reverse process-এর ফল, এই কারণে তাহারা সাঙ্কেতিক শর্টহ্যাণ্ড লিপির মত শর্টহ্যাণ্ড ভাষা হইয়া এক কোণে পড়িয়া রহিল, জনসমাজে তাহাদের ব্যবহার হইল না।

এ পর্যন্ত যে আলোচনা হইল তাহা হইতে বাংলা ভাষা ও বাংলা লিপি এবং বানান সম্পর্কে অভিযোগগুলির আশা করি স্পষ্ট জবাব মিলিবে। বাংলা বানানে অতিরিক্ত অনিয়ম নাই, বাংলা অপেক্ষা অনেক বেশি অনিয়ম ইংরেজী ফরাসী প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষায় রহিয়াছে (১); ইংরেজী ফরাসী প্রভৃতি ইউরোপীয় ও পাঞ্জাবী মারাঠী হিন্দী প্রভৃতি ভারতীয় ভাষায় ধ্বনি ও বানানের মধ্যে বাংলার চাইতে অধিক পরিমাণে সমতার অভাব রহিয়াছে (২); যুক্তাক্ষরের বাড়াবাড়ি কেবল বাংলাতে নয়, যুক্তধ্বনি ই.-ই. বর্গের সমস্ত ভাষাতেই আছে, যুক্তাক্ষরও ইউরোপীয় ভাষাতে কিছু পরিমাণে বর্তমান (৩); বাংলা বানানের গতি যুক্তাক্ষর বর্জনের দিকে নয়, ধ্বনি পরিবর্তনের ফলেই যুক্তধ্বনি বিশ্লিষ্ট ধ্বনিতে এবং বিশ্লিষ্ট ধ্বনি যুক্তধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়, এই নিয়ম ই.-ই. বর্গের সমস্ত ভাষাতেই বিদ্যমান (৪); বাংলা লিপির অপ্রতুলতা নাই, ইউরোপীয়, গ্রীক ও রোমক প্রভৃতি লিপির অপ্রতুলতা বাংলা লিপির চেয়ে বরঞ্চ অধিক (৫); বাংলা ভাষা ধ্বনি ও বর্ণমালায় বৈজ্ঞানিকতার অভাবও নাই, ইউরোপীর ভাষাগুলিতে বরঞ্চ এই বিষয়ে ইহার অধিক অবৈজ্ঞানিকতা রহিয়াছে (৯)। ৯টি অভিযোগের মধ্যে ৬টির জবাব পাওয়া গেল। ৬ নম্বর অভিযোগের সম্পর্কে কোনো কথা বলি নাই; বলিবার প্রয়োজনও হয়তো নাই। বাংলা ভাষা শিখিতে আসিয়া কোনো বিদেশী শিক্ষার্থী যদি অজ্ঞানতাবশত বিভ্রান্ত হন, তাহা হইলে কি করিবার আছে? শিক্ষার্থী যদি ইউরোপের কোনো দেশ হইতে আসিয়া থাকেন এবং তা সত্ত্বেও যদি তাঁহার মনে হয় বাংলা ভাষা অনিয়মে ভর্তি, তাহা হইলে ধরিতে হইবে তাঁহার বিদেশী ভাষা শিক্ষা করিবার যোগ্যতা অর্জিত হয় নাই; তিনি নিজের মাতৃভাষাই ভাল করিয়া শিখেন নাই, বিদেশী ভাষা শিখিবেন কিরূপে? তবে চীন জাপান হইতে যদি শিক্ষার্থী বাংলা শিখিতে আসেন তাহা হইলে তাঁহার অসুবিধা হইবে ইহা ঠিক; আবার ভিন্ন বর্গের ভাষা বাংলায় তিনি যে চমৎকারিত্ব দেখিবেন তাহাতে তাঁহার মুগ্ধ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। আর কঠিন ভাষা কাহাকে বলিব? চীনীয় জাপানীয়কে, না বাংলাকে?

বাকি রহিল দুইটি অভিযোগ: বাংলা লিপির তুলনায় রোমক লিপির সুবিধা (৭), এবং লিপি ও বানান লইয়া ছাপাখানা কর্মীদের মস্ত অসুবিধা (৮)। এইবার বিষয় দুইটি লইয়া আলোচনা করিব। বিষয় দুইটি তুলনামূলক লিপিতত্ত্বের অন্তর্গত। সুতরাং কয়েকটি ভিন্ন ভাষার লিপি ও মুদ্রণ বিষয়ে আলোচনা করিব।

লিপি ও মুদ্রণ

বাংলায় মূল লিপির সংখ্যা ৫৪, য় ড় ঢ় ৎ সংস্কৃতে ছিল না, লুপ্ত অ-কার বাংলায় নাই। ইহা ছাড়া স্বরচিহ্ন-জ্ঞাপক কয়েকটি লিপি আছে, সংস্কৃতেও ছিল। সংযুক্ত লিপির সংখ্যা অনেক। হ্যাণ্ড কম্পোজিশনের টাইপ বোর্ডে ঘরের সংখ্যা চার শতাধিক, লাইনোতে ইহা ২৯২। তদুপরি বাংলা লিপির আকৃতি বড়ই জটিল, যুক্তলিপিতে জটিলতা আরো বৃদ্ধি পায়। এতগুলি জটিল লিপির এতগুলি ঘর লইয়া

ছাপাখানাকর্মীদের যে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয় তাহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই। কিন্তু এই অসুবিধা কেবল বাংলার নয়, অন্যান্য ভাষাতেও অনুরূপ অসুবিধা আছে। হিব্রু ও আরবী লিপি বাংলা লিপির চাইতে বহুগুণে জটিল, তবে ইহাদের বর্ণমালায় লিপির সংখ্যা অনেক কম, তাই রক্ষা; উড়িয়া ও উর্দু লিপিও সমান জটিল, উড়িয়া লিপিমালায় লিপির সংখ্যা বাংলার মতই। রাশিয়ান বর্ণমালায় অধুনা ৩৪টি লিপি আছে, তাহাদের আকৃতি যে কি পরিমাণ জটিল তাহা বলিবার নয়, একটি বর্ণ লিখিতে তিন-চারবার হাত উঠাইতে হয়। রাশিয়ান লিপির সহিত কোথাও কোথাও চীনীয় লিপির সাদৃশ্য আছে। আরবী ও হিব্রু বর্ণমালায় যুক্ত লিপি নাই, রাশিয়ানে অল্প আছে। গ্রীক লিপিও কম জটিল নয়; গ্রীক লিপিমালায় যুক্তলিপি নাই। এবং চীনীয় লিপি? চীনীয় লিপিকে লিপি বলিলে ভুল হয়, চিত্র বলাই ঠিক। বস্তুত চীনীয় একাক্ষরীয় ভাষা বলিয়া তাহার লিপি কিংবা বর্ণ ধ্বনিনির্দেশক নহে, তাহা নিতান্তই চীনীয় শব্দের প্রতীক। *The Great Standard Dictionary Of Chinese Language*-এর প্রামাণ্য স্বীকার করিলে ধরিতে হইবে চীনীয় ভাষার শব্দসংখ্যা প্রায় ৪৪,০০০। ইহাদের ভিতর পিকিং উপভাষায় মাত্র ৪,২০০ শব্দ ব্যবহৃত হয়। এই ৪,২০০ শব্দের জন্য কিন্তু ৪,২০০ প্রতীক-লিপি নাই, মাত্র ৪২০টি প্রতীক-লিপি আছে। এই লিপিগুলির আকৃতি অন্যান্য সমস্ত লিপির চেয়ে অনেকগুণে জটিল। তাহার উপর এক-একটি লিপিকে যে গড়ে ১০টি করিয়া শব্দ প্রকাশ করিতে হয় তাহার জন্য স্বরজ্ঞাপক সাঙ্কেতিক চিহ্নও আছে। এইরূপ এতগুলি জটিল প্রতীক-লিপি ও সাঙ্কেতিক চিহ্ন লইয়া চীনারা তো বেশ লেখার ও ছাপার কাজ চালাইয়া যাইতেছে। একবার ইউরোপীয় মিশনারীরা রোমান হরফ লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা জটিলতাকে আরো বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। *Chinese Board Of Education*-ও মাত্র ৩৯টি লিপির একটি লিপিমালা উদ্ভাবন করিয়াছিল; ইহাও চলে নাই। জাপানীয় আলাদা বর্গের ভাষা; ইহার গঠনরীতি ই.-ই. বর্গের ভাষার মত বহু-অক্ষরীয়। কিন্তু জাপানীয়রা চীনীয় লিপি ও লিখনরীতি গ্রহণ করিয়াছে। একবার চীনীয় লিপির বদলে কোনো ইউরোপীয় লিপিমালা গ্রহণ করিবার প্রস্তাব উঠিয়াছিল, কিন্তু জাপানীয়রা তাহা মানিয়া লয় নাই। তাহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন বর্গের চীনীয় লিপি দিয়াই তাহাদের লেখা ও ছাপার কাজ অতি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিয়া যাইতেছে।

বাংলাতে একই ধ্বনির জন্য অনেক সময় দুইটি লিপি ব্যবহৃত হয়, যেমন অ-য়, ণ-ন, শ-ষ ইত্যাদি। গ্রীকের মত উচ্চস্তরের ভাষাতেও এইরূপ একই ধ্বনির জন্য দুইটি লিপি আছে। স ধ্বনি আদি- বা মধ্য-ধ্বনি হইলে গ্রীক লিপিমালার ১৯শ সংখ্যক লিপি এবং অন্ত-ধ্বনি হইলে রোমান s রাখিবার ব্যাপার নিয়মে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বাংলাতেও আদি অ-ধ্বনির জন্য অ হইবে, মধ্য- বা অন্ত-ধ্বনির জন্য য় হইবে; সংস্কৃত শব্দেই যেখানে মূর্ধন্য ণ সেখানে মূর্ধন্য ণ থাকিবে, বৈদেশিক প্রাদেশিক বা দেশী শব্দে দন্ত্য ন হইবে। ষ-এর জন্যও এই একই নিয়ম। বাংলা উচ্চারণে অন্তঃস্থ ব-এর উচ্চারণ নাই, তাহা রাখিবারও প্রয়োজন হয় নাই। যেসব সংস্কৃত শব্দে অন্তঃস্থ ব আছে সেইসব শব্দের বানানে ইহার সেইরূপ ব্যবহার হয় মাত্র, কিন্তু উচ্চারণ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। কাজেই অন্তঃস্থ ব-এর জন্য একটি স্বতন্ত্র লিপির প্রয়োজন নাই। যে ধ্বনি একবার পরিবর্তিত হইয়া নূতন ধ্বনিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে, তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়া তাহার পূর্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করার যুক্তিযুক্ততা নাই।

অধুনা ধুয়া উঠিয়াছে বাংলা লিপির বদলে রোমক লিপি গ্রহণ করিলে সুবিধা হইবে। বাংলা লিপির তুলনায় রোমক লিপির অনেক সুবিধা আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং সে কথা পূর্বেও আলোচনা করিয়াছি। মুদ্রণবিদ্‌গণ বাংলা লিপির, বিশেষ করিয়া, লাইনো টাইপের অনেক অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়া থাকেন। যথা, বাংলা লিপির vertical space। কিন্তু রোমক লিপিও কি vertical space হইতে মুক্ত? b d f g h i j k l p q t y ইত্যাদি ১৩টি লিপির verticals রহিয়াছে; ইহা ছাড়া কেহ কি একবার ইতালিক্‌স্ f (এফ)-এর কথা ভাবিয়াছেন? বাংলা লিপিমালায় এক-একটি লিপির কেবল একদিকেই verticals আছে, হয় উপরে নয় নীচে, রোমক লিপিতেও অনুরূপ ব্যাপার। কিন্তু ইতালিক্‌স্ f ও q-এ যে উপরে ও নীচে দুই দিকেই verticals। অবশ্য রোমক লিপির কেবল ছোট হরফেই এই অসুবিধা আছে, বড় হরফে নাই। horizontal space-ও কম অসুবিধা সৃষ্টি করে না। লাডলো মনো ও হ্যাণ্ডকম্পোজিশনের তুলনায় লাইনোতে এই সমান্তরাল পরিসর বেশি লাগে, এই কারণে ৭০ পয়েন্টের লাইনো টাইপে বাংলা অক্ষরের আকৃতি কল্পনা করা যায় না। সে ক্ষেত্রে রোমক লিপিও কি এই অসুবিধা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত? বড় হরফের W Y এবং A এই তিনটি বর্ণকে ৭০ পয়েন্টে বাড়াইয়া পাশাপাশি রাখিলে বোঝা যাইবে এখানে সেই মস্ত ফা রা ক রহিয়াছে।

রোমক লিপির তুলনায় বাংলা লিপি যে অধিক স্থান গ্রহণ করিয়া থাকে তাহাও নহে। বরঞ্চ তাহার বিপরীতটাই সত্য। কয়েকটি বাংলা শব্দকে রোমানে এবং কয়েকটি ইংরেজী শব্দকে বাংলায় লিপ্যন্তর করিয়া লিখিলে বা মুদ্রণ করিলেই বোঝা যাইবে। ধরা যাক ক ত, রোমানে ইহা k a t a; ইংরেজী k i n g, বাংলা কিং বা কি ঙ। কোন্‌টার স্পেস বেশি লাগিল? বলা বাহুল্য ইকনমি অফ স্পেসের কথা ধরিলে সংক্ষেপে কাজ সারিবার ব্যাপার কোনো ইউরোপীয় ভাষাতেই নাই। সংস্কৃত পু র, অতি ক্ষুদ্র দুই বর্ণের একটি শব্দ: ইউরোপীয় ভাষাগুলিতে ইহারই রূপ হইয়াছে গ্রী. poils, ই. borough, জা. berg, রাশ. pole। ইংরেজী ও বাংলা হইতে দুইটি বাক্য লইয়া বাংলা ও ইংরেজীতে যথাক্রমে অনুবাদ করিয়াও দেখা যাইতে পারে। ই. I shall go home, বা. আমি বাড়ি যাইব; বা. তোমার নাম কি? ই. what is your name?। কোন্ ভাষায় বেশি স্পেস লাগিতেছে? ইংরেজী না বাংলায়? ইংরেজী বাংলার চাইতে অনেক বেশি স্পেস লয়, তাহার কারণ তাহাতে স্বর ব্যঞ্জনের পরে বসে, বাংলার মত ব্যঞ্জনের গায়ে মিশিয়া থাকে না। এবং ইংরেজীতে মহাপ্রাণ বর্ণের স্বতন্ত্র কোনো লিপি নাই। ইহা সত্ত্বেও দেখা যায় যে এক পৃষ্ঠা ইংরেজী হইতে বাংলায় অনুবাদ করিলে তাহা দুই পৃষ্ঠার হইয়া যায়। ইহার কারণ কি? একটি কারণ: ইংরেজী ও বাংলা একই পয়েন্টের টাইপে ছাপা হয় না, ইংরেজী অনেক কম পয়েন্টের টাইপে ছাপা হয়, এত অল্প পয়েন্টের টাইপে ছাপা বাংলা অক্ষর পড়িতে অসুবিধা হয়। সাধারণত ১০ পয়েন্টে ইংরেজী এবং ১২ পয়েন্টের টাইপে বাংলা অক্ষর ছাপা হয়। লাইনোতে ১০ পয়েন্ট এমনকি ৮ পয়েন্টের বাংলা অক্ষরও পড়িতে অসুবিধা হয় না। এবং আর-একটি কারণ ইংরেজী ভাষার গঠনরীতি, ইহাতে প্রত্যয় বিভক্তি ইত্যাদি বড়ই কম; ইহার শব্দভাণ্ডার বাংলার তুলনায় অনেক বেশি সমৃদ্ধ। তাই যেখানে বাংলাতে একটি গোটা বাক্য দরকার হয় সেখানে ইংরেজীতে একটি মাত্র শব্দ বসাইয়াই কাজ সারা যায়। বাংলা লাইনো টাইপ সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন নয় ইহা মানিয়া লইয়াও বলিতে পারা যায় ইহাই বাংলা লিপির আদর্শ হইতে পারে। অন্য টাইপের এরকম কোনো

সুবিধা নাই। এবং চেষ্টা করিলে লাইনো টাইপ বোর্ডে চাবির সংখ্যা অর্ধেক কমানো যাইতে পারে।

ইহার পরেও যদি কেহ রোমক লিপির পক্ষে ওকালতি করতে চান তো তাঁহাকে আমি আর-একটি বিষয়ের কথা ভাবিতে বলিব। রোমক লিপি বা অন্য কোনো লিপি যথেষ্ট নহে বলিয়া ইণ্টারন্যাশন্যাল ফোনেটিক অ্যাসোশিয়েশন একটি লিপির উদ্ভাবন করিয়াছে। প্রচলিত সমস্ত ইউরোপীয় লিপির সহায়তায় এই লিপি প্রস্তুত হইয়াছে, আমাদের নাগরী বিসর্গও আছে। ইহার সাহায্যে পৃথিবীর সকল ভাষার ধ্বনি নিখুঁতভাবে প্রকাশ করা যায়। এই কারণে বাংলা লিপিকে নিতান্তই বাদ দেওয়ার কথা হইলে, রোমক লিপি নহে, ইণ্টারন্যাশন্যাল ফোনেটিক স্ক্রিপ্ট দিয়া স্থানপূরণ করা অধিকতর সংগত। তবে ইহারও অসুবিধা এই যে ইহা ধ্বনি-লিপি বলিয়া সাঙ্কেতিক লিপির পর্যায়ে পড়িয়া আছে।

কয়েকটি পূর্বতন সংস্কার

কোনো কিছু সংস্কারের আগে সংস্কারের কি ফল হইতে পারে তাহাও ভাবিয়া দেখা কর্তব্য। ভাষা সংস্কারের প্রসঙ্গে কয়েকটি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। সুতরাং বাংলা ভাষা সংস্কার করিবার পূর্বে সেইগুলিও বিবেচনা করিতে হইবে। পূর্বাপর না ভাবিয়া কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দেওয়া ঠিক নয়।

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সংস্কৃত ভাষার সংস্কার হইয়াছিল, ইহাই পৃথিবীর সর্বপ্রথম ভাষা সংস্কার এবং এই সংস্কার করিয়াছিলেন পাণিনি। পাণিনির সম্পর্কে একটি কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে তাঁহার পর দুই হাজার তিন শো বছর অতিক্রান্ত হইয়াছে, ইহার ভিতর তাঁহার একজনও জুড়ি খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। সংস্কৃতের মত বিরাট ভাষাকে তিনি একাই বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন, শুধু বিশ্লেষণ নয়, সমস্ত ধাতুর সমস্ত পদের কি স্থান, কি রূপ তাহাও পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার সংস্কারের ফলে অসংস্কৃত বৈদিক ভাষা সংস্কৃতের মধ্যে আসিয়া সংহতি লাভ করিল। এত বড় কৃতিত্ব নিশ্চয়ই ভাষাবিজ্ঞানের ইতিহাসে দুর্লভ। কিন্তু ইহাতে যে ফল ফলিল তাহাও বড় মারাত্মক। জনতার চৌহদ্দি হইতে সরিয়া গিয়া সংস্কৃত অতঃপর ভদ্রসমাজের প্রাসাদে আসিয়া প্রবেশ করিল এবং ইহাতে তাহার মৃত্যু হইল। মধ্যযুগে দেখিতেছি অশিষ্ট সাধারণ মানুষ দুরূহ সংস্কৃত ধ্বনিসকল উচ্চারণ করিতে গিয়া পদেপদেই বিকৃত করিয়া ফেলিতেছে; ফলে সংস্কৃত পড়িয়া রহিল, তাহা হইতে জন্ম লইল পালি প্রাকৃত অপভ্রংশ ইত্যাদি অ শি ষ্ট জনতার ভাষা। পাণিনি সংস্কৃত ভাষার জন্য যাহা করিয়াছিলেন তাহার তুলনা নাই ইহা যেমন সত্য, তিনিই তাহার মৃত্যু কারণ ইহাও তেমন সত্য।[১১]

পাণিনির পরে ভাষাসংস্কারের ব্যাপারে যদি একক কোনো প্রচেষ্টার উল্লেখ করিতে হয় তাহা হইলে তাহা নোয়া ওয়েবস্টার -এর প্রচেষ্টা। তিনি তাঁহার অভিধান ও বানান-সংক্রান্ত পুস্তকগুলির দ্বারা আমেরিকান ইংরেজীর উপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। খাস বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের ইংরেজীর তুলনায় আমেরিকান ইংরেজীর বানান যে অনেক সহজ তাহার মূলে তাঁহারই অবদান রহিয়াছে। কিন্তু

১১ "Sanskrit would become the spoken language of India if all editions of Panini's grammar were drowned."—গোবিন্দ শাস্ত্রী পরদেশী, *Elements of the Science of Language*: I. J. S. Taraporewala হইতে উদ্ধৃত।

তাঁহার ব্যর্থতাও কম নয়। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁহার *Dissertations on the English Language* পুস্তকে ইংরেজী বানান সংস্কার করিবার ব্যাপারে একটি প্রস্তাব করিয়াছিলেন; ইহাতে give, breast, speak, daughter, prove, character প্রভৃতির জায়গায় giv, brest, speek, dawter, proov, karacter প্রভৃতি বানানের নির্দেশ ছিল। কিন্তু উদারপন্থী বলিয়া আমেরিকানদের খ্যাতি থাকিলেও তাঁহারা তাঁহার বানান সংস্কারের এই প্রস্তাব মানিয়া লন নাই।

ইংরেজী বানানের গরমিল দূরীকরণের উদ্দেশে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে *The English Spelling Reform Association* নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার অনতিপরে আমেরিকান ইংরেজী বানান সংস্কারের উদ্দেশে অনুরূপ একটি সংস্থারও প্রতিষ্ঠা হয়। এই দুইটি সংস্থার সহিত বহু বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তির সংশ্রব ছিল। কিন্তু দুইটি সংস্থার কোনোটিই বর্ণমালার বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে পারে নাই। ইহার একবছর পরে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে *The Philological Society of London* ইংরেজী বানানের আংশিক সংস্কার করে, আমেরিকান সংস্থাও ইহা মানিয়া লয়। কিন্তু ইহাকে ঠিক বানান সংস্কার বলা যায় না। এবং ইহাতে যে পরিবর্তনের সংকেত করা হইয়াছিল তাহা নিতান্তই সামান্য। অধুনা আমেরিকায় ইংরেজী বানানের অতি অল্প সংস্কার হইয়াছে, এই সংস্কারও কোনোদিক দিয়া যুগান্তকারী বা বিপ্লবাত্মক নহে, এবং ইহাকেও ঠিক সংস্কার বলা চলে না। কিন্তু ইহারই ফল এত মারাত্মক হইতেছে যে ভবিষ্যতে আমেরিকান ইংরেজী বলিয়া একটি স্বতন্ত্র ভাষা গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

ইতিপূর্বেও একবার বাংলা বানানের সংস্কার হইয়াছিল। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানান সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়, এই সমিতিতে পরলোকগত রাজশেখর বসু, পরলোকগত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং পরলোকগত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ-এর মত বিখ্যাত ভাষাচার্য ব্যক্তিগণ ছিলেন। এবং পিছনে থাকিয়া সমিতিকে উৎসাহ দিয়াছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু অ ক্ষে র মা ষ্টা র শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষের সমালোচনায় সমিতি এতই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল যে পর পর দুইবার সমিতির সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত করিতে হইয়াছিল। তা সত্ত্বেও বাংলা বানানের স্থায়ীরূপ নির্ধারিত হয় নাই।

ইহা ছাড়া আরো বহু ভাষার বহু সংস্কার হইয়াছে। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যায় নাই। চীনীয় ভাষার লিখিত ও কথিত রূপে আকাশ-পাতাল ব্যবধান; কনফুসিয়াসের বহু পূর্ব হইতেও ইহার লিখিত রূপ একস্থানে পড়িয়া আছে, কিন্তু কথিত রূপ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ক্রমশ পরিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে। জাপানীয়তেও কথিত ও লিখিত রূপে অনুরূপ ব্যবধান আছে। তবু চীনীয়-জাপানীয়রা তাহাদের ভাষার সংস্কার করে নাই।

ইহা হইতে এই প্রশ্ন জাগিতে পারে: তাহা হইলে কি বাংলা বানানের সংস্কার হইবে না? যেমন চলিতেছে তেমনি চলিতে থাকিবে? তাহাও নহে। বাংলা ভাষার বানান ধ্বনি ও বর্ণমালায় যথেষ্ট বৈজ্ঞানিকতা থাকিলেও অধুনা বানান লইয়া ব্যভিচার বাড়িয়া যাইতেছে। ইহার একটি কারণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সমিতির বিকল্প ব্যবস্থা। কোনো বিষয় সম্পর্কে একটির অধিক নিয়ম থাকিলে সাধারণ স্বল্পশিক্ষিত লোকে মনে করে ইহাতে কোনো নিয়ম নাই, সে ক্ষেত্রে তাহারা নিজেরাই নিজেদের পছন্দমত

নিয়ম সৃষ্টি করিয়া লয় এবং এইরূপ পরিস্থিতিতে যত মত তত পথ আসিয়া দেখা দেয়। বিকল্প ব্যবস্থা রোধ করিয়া বানানের কাঠামো বাঁধিয়া দিলে সাধারণ স্বল্পশিক্ষিত মানুষের এই প্রবণতা দূরীভূত হইতে পারে। লিখিত রূপেরও কিছু সংস্কার প্রয়োজন। রেফ স্পৃষ্টধ্বনির পূর্বে উচ্চারিত হয়, লিখিত এবং হ্যাণ্ড কম্পোজিশনের মুদ্রিত রূপে ইহা স্পৃষ্টবর্ণের মাথায় বসিত, কিন্তু লাইনোতে স্পৃষ্টবর্ণের পরে বসিয়াছে। যেমন গ র্ব> উচ্চারণ গর্‌ব, ইহা ঠিক নয়। রেফের স্থান পরিবর্তিত হইয়া মুদ্রিত হইলে বানান ও উচ্চারণে সমতা বজায় থাকে। স্বরধ্বনি ব্যঞ্জনের সহিত বা তাহার পরে উচ্চারিত হয়। এই কারণে ব্যঞ্জনের পরে তাহাদের স্বরচিহ্ন বসিয়া থাকে, নাগরীতে একমাত্র ই-কার ছাড়া সর্বত্র এই নিয়ম। কিন্তু বাংলাতে ি ে সম্পূর্ণরূপে এবং ো ৌ চিহ্নের অর্ধেক স্পৃষ্টবর্ণের বামপার্শ্বে ব্যবহৃত হয়। ইহা যুক্তিযুক্ত নয়। সংস্কার করিতে চাহিলে আগে ইহাদের সংস্কার করিতে হইবে। ক্ষ যখন নূতন ধ্বনিতে পরিণত হইয়াছে তখন উহা মানিয়া লওয়াই সংগত।

যুক্তলিপি গঠনে বাংলার আগে যে কিছু অনিয়ম না ছিল তাহা নহে। বলিতে গেলে পূর্বের লেখকগণ যুক্তলিপির প্রতি বেশি পক্ষপাত দেখাইয়াছেন। অনেকে Shakespeareকে শেক্ষপীয়র, Max Muellerকে মোক্ষমুলর, William Wordsworthকে বিলিয়ম্ বার্ডস্বার্থ ইত্যাদি রূপে বানান লিখিতেন। ইহাতে তাঁহাদের বাঙালিয়ানা বৃদ্ধি পাইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ঐ শব্দগুলির আড়ালে যেসব মহাপুরুষ রহিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হয় নাই। বাংলা যুক্তধ্বনি মাত্রই স্বরান্ত, কিন্তু উক্ত তিনটি শব্দের যুক্তধ্বনি হলন্ত বলিয়া ম্যাক্স মূল্যার, শেক্‌স্‌পীয়র, উইলিয়ম ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ লিখিলে তাহা সিদ্ধ হয়। এখানেও অবশ্য যুক্তবর্ণ আছে, কিন্তু ইউরোপীয় ভাষার শব্দে যুক্তবর্ণের হলন্ত উচ্চারণ বাংলাতে স্বতঃসিদ্ধ-রূপে দাঁড়াইয়া গিয়াছে, হস্ চিহ্ন দিয়া তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হয় না। লিপি সংস্কারের বেলায় অন্য যুক্তবর্ণের এইরূপ অজ্ঞতাজনিত ব্যবহার আছে কিনা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। থাকিলে তাহা আলাদা লিপির সাহায্যে লিখিলে লাভ বই ক্ষতি হইবে না। ইংরেজীতে দ্ব্যক্ষরবিশিষ্ট শব্দের বাংলা রূপে প্রচলিত যুক্তবর্ণ কতকক্ষেত্রে ভাঙিয়া আলাদা করা যায়, যেমন মস্কো>মসকো; কিন্তু একাক্ষর শব্দে যুক্তধ্বনি থাকিলে তাহার লিপ্যন্তরণে যুক্তবর্ণ রাখাই অধিকতর সংগত, যেমন and>অ্যাণ্ড, Max>ম্যাক্স, land>ল্যাণ্ড, Perth>পার্থ, mosque>মস্ক ইত্যাদি। হস্-চিহ্নের বিধি যখন এইসব ক্ষেত্র হইতে উঠিয়া গিয়াছে, তখন তাহাকে আর জিয়াইবার চেষ্টা না করাই বিধেয়।

এবং আরো এক দিকে সংস্কার হইবে। তাহা উচ্চারণ। এক এ ধ্বনি এ এবং অ্যা হইয়া যে কিরূপ জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে তাহার ঠিক নাই। তবে ইহাকে ঠিক সংস্কার বলা যায় না, অভিধানে শব্দগুলির উচ্চারণ বাঁধিয়া দিলেই কাজ হইবে। ইংরেজী ফরাসী জার্মান প্রভৃতি ভাষার কোন্ শব্দে কি উচ্চারণ তাহা একেবারে বাঁধা। তাই ঐ সব ভাষার বানান ও উচ্চারণে বৈজ্ঞানিকতার অভাব থাকিলেও তাহাতে ব্যাভিচার নাই। এক এক অঞ্চলের লোক এক এক রকমে উচ্চারণ করে; বানান রচনার সময় ঐ বিভিন্ন উচ্চারণরীতি কাজ করে বলিয়া যত প্রকার উচ্চারণ তত প্রকার বানান হইয়া থাকে। অভিধানে উচ্চারণ বাঁধিয়া দিলে ও শব্দের সঠিক বানান কি হইবে তাহার নির্দেশ থাকিলে ব্যাভিচারবৃত্তি আস্তে আস্তে কমিয়া আসিবে এবং বাংলা বানানের স্থায়ীরূপ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

এবং যে-সব শব্দের বানানে ব্যাকরণ স্থির হয় নাই অর্থাৎ যে-সকল শব্দ বিদেশী ভাষা হইতে বাংলা

ভাষায় আসিয়া প্রবেশ করিতেছে, তাহাদের বানান স্থির করিবার সময় আমাদের দুইটি জিনিস মনে রাখিতে হইবে : একটি, উচ্চারণ ; অন্যটি, ইকনমি। বিদেশী শব্দের ক্ষেত্রে বাঙালীর জিহ্বায় উচ্চারণযোগ্য বানানই বিধেয়, ব্যাকরণগত বানান রচনার প্রয়োজন নাই, তাহাতে জটিলতা বৃদ্ধি পাইবে। এবং সমস্ত স্তরের ও সমস্ত শ্রেণীর বানান রচনায় ইকনমি বা মিতব্যয়িতার দিকে সবিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। বাংলা বানানেও এই নিয়মের ব্যত্যয় হইবে না। যুক্তধ্বনি দিয়া বানান করিলে অনেক সময় সেই মিতব্যয়িতা রক্ষিত হয় বলিয়া স্বচ্ছন্দে আমরা যুক্তধ্বনি দিয়া বানান করিতে পারি; কিন্তু উচ্চারণ বাদ দিয়া মিতব্যয়িতার নামে যুক্তধ্বনিকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিবারও কোনো যুক্তি নাই। মোট কথা প্রতিটি শব্দের মাত্র একটি করিয়া বানান হইবে, তাহা সকলে মানিয়া লইবেন। ভাষার ভিতর নূতন শব্দ আসিয়া পড়িলে পুরাতন শব্দের অ্যানালজিতে তাহাদেরও বানান স্থিরীকৃত হইবে। এবং কোনক্ষেত্রেই একটি শব্দের একাধিক বানান হইবে না। ইংরেজী ফরাসী প্রভৃতি ভাষার বানানে বিকল্প ব্যবস্থার তেমন সুযোগ নাই, বাংলাতে একেবারেই থাকিবে না।

ভাষা চলমান, সততই চলিয়াছে। আকৃতি-প্রকৃতিহীন জনতাই তাহাকে চালাইয়া লইয়া যায়। রামায়ণ মহাভারত ইলিয়াড ও ওডিসি কোনো-এক ব্যক্তিবিশেষের রচনা নয়, শত শত বৎসর ধরিয়া ইহারা লক্ষ লক্ষ জনতার হাতে ধীরে ধীরে রচিত হইয়া থাকিবে। বাল্মীকি ব্যাস এবং হোমার ঐ জনতা রচিত কাব্যকাহিনীগুলিকে গ্রন্থবদ্ধ করিয়াছিলেন মাত্র। সেইরূপ ভাষাও সকলের অজান্তে জনতা কর্তৃক রচিত হইতেছে, হাজার হাজার বছর ধরিয়াই হইতেছে। ইহার বিরাম নাই। প্রতি ভাষাতেই এমন বহু শব্দ শব্দগ্রন্থি বাক্‌ধারা ইত্যাদি আছে যাহা ব্যাকরণের নিয়মে মানিয়া লওয়া যায় না। এইরূপক্ষেত্রে ব্যাকরণের দোহাই দিয়া ইহাদের বাদ দিবে কে? যাহা চলিতেছে তাহা সমস্ত ব্যাকরণের উর্ধ্বে। ব্যাকরণ-সিদ্ধ বহু নিয়ম ভাষায় চলে নাই। ইহার কারণ আগে ভাষা, তাহার পরে ব্যাকরণ; আগে ব্যাকরণ, তাহার পরে ভাষা নহে। এবং অ শি ষ্ট জনতা কখনো ব্যাকরণের ধার ধারে না। তাই চলমান ভাষাকে সংস্কারের যাঁতাকলে পুরিয়া বন্দী করিলে আস্তে আস্তে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া তাহার মৃত্যু হইতে পারে। যে-কোনো প্রকার সংস্কারের পূর্বে ভাষানীতির এই দিকটি সম্বন্ধে সাবধান হইতে হইবে।

সংকেত : আ.=আরবী ; ই.=ইংরেজী ; ই.-ই.=ইন্দো-ইউরোপীয় ; গ.=গথিক ; গ্রী.=গ্রীক ; জা.=জার্মান ; আ. জা.=আধুনিক জার্মান ; প্রা. জা.=প্রাচীন জার্মান ; পান.=পাঞ্জাবী ; পার.=পার্সী ; ফ.=ফরাসী ; বা.=বাংলা ; রাশ.=রাশিয়ান ; ল্যা.=ল্যাটিন ; স.=সংস্কৃত ; হি.=হিন্দী ; হিব.=হিব্রু।

বাংলা ব্যাকরণের নিয়ম ও রবীন্দ্রনাথ

সাধারণত বাংলাভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসৃত হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় সর্বত্র তা অনুসরণ করেন নি, করা সম্ভবও নয়। এ বিষয়ে আলোচনার জন্য রবীন্দ্রনাথের প্রয়োগগুলি লক্ষ্য করার বস্তু।

যেমন বানানের ক্ষেত্রে— অনুসঙ্গ, অনুসঙ্গী, অভিসেচন ও সৌসাম্য। 'তারা স্ত্রীকে চায় স্ত্রীরূপেই, তারা চায় যুগলের অনুসঙ্গ।' গ্রন্থপরিচয়, ১১।৫১৪। 'সেই জেনারেল সাহেবের একদল অনুসঙ্গী এই স্টেশন হইতে উঠিবার উদ্যোগ করিতেছে।' গল্পগুচ্ছ, ২৩।৩০৫। 'শিক্ষার অভিসেচনক্রিয়া সমাজের উপর স্তরকেই দুই এক ইঞ্চিমাত্র ভিজিয়ে দেবে…' শিক্ষা, ২৩১। 'যে গ্রীস একদা সভ্যতার উচ্চ চূড়ায় উঠেছিল তার নৃত্যগীত চিত্রকলা নাট্যকলার সৌসাম্যের অপরূপ ঔৎকর্ষ্য কেবল বিশিষ্ট সাধারণের জন্যে ছিল না, ছিল সর্বসাধারণের জন্যে। পল্লীপ্রকৃতি, ২৭।৫৫০।— এই-সব স্থলে 'সঙ্গ' 'সঙ্গী' 'সেচন' 'সাম্য' শব্দগুলি অবিকৃত রাখবার মানসেই বোধহয় কবি ষত্ববিধান মানেন নি। অবশ্য অন্যত্র ষত্ববিধান মানতেই দেখা যায়। 'আনন্দ হল সৃষ্টির অনুষঙ্গী নিত্যসঙ্গী।' র-র, ১৪।৯৪৫।[১] অনুষঙ্গীর আভিধানিক অর্থের সঙ্গে অর্থান্তর ঘটেছে এ ক্ষেত্রে। রবীন্দ্ররচনায় প্রায়শ নঞর্থক স্থলে নঙর্থক অনবধানতা প্রযুক্ত ব'লে মনে হয়।

সন্ধির ক্ষেত্রেও এরকম দু-একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে। সংস্কৃতে সমাসে সন্ধি নিত্য। বাংলায় সে নিয়ম চলে না। রবীন্দ্রনাথ বাংলার প্রকৃতিকে তো অনুসরণ করেছেনই, উপরন্তু দু-একটি ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে সন্ধি বিশ্লিষ্ট করেছেন। উদ্দেশ্য সংশ্লিষ্ট শব্দকে অবিকৃত দেখাবার অভিপ্রায়। 'ভূমা থেকে উৎশিষ্ট যে শ্রেষ্ঠতার কথা অথর্ববেদ বলেছেন সে কোনো একটিমাত্র বিশেষ সিদ্ধিতে নয়।' মানুষের ধর্ম, ২০।৪১৪। 'সকল সীমার উদ্‌বৃত্ত, সকল শেষের উৎশেষ।' মানুষের ধর্ম ২০।৪০২। দুটি শব্দের অর্থই অবশিষ্ট। সন্ধিবন্ধনে এ দুয়ের আকার উচ্ছিষ্ট, উচ্ছেষ।

সমাসের গঠনব্যাপারেও সংস্কৃত ব্যাকরণবিধি রবীন্দ্রনাথ কোথাও কোথাও লঙ্ঘন করেছেন। সেই-সব আপাত অবৈধ সমাসবদ্ধ শব্দের অধিকাংশই বাংলাভাষার প্রকৃতি-অনুসারী। আবার সেগুলির কিছু সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মেও সমর্থন করা যায়। কোথাও কোথাও নিয়ম একটু শিথিল করা আবশ্যক। 'স্বদেশী বা বিদেশী দুরাকাঙ্ক্ষীদের হাতে তাদের নির্যাতন ঠেকাবে কিসে।' রাশিয়ার চিঠি, ২০।৩৬৫। 'নিঃসঙ্গিনী ধরণীর…' চিত্রা, ৪।৩২; 'দ্বার খোলে সন্ধ্যা নিঃসঙ্গিনী'— জন্মদিনে, ২৫।৯৯। 'মোহমুক্ত মনে নিরাশী হয়েই যথাসাধ্য কাজ ক'রে যেতে পারি যেন।' বিশ্বভারতী, ২৭।৪০৮। 'এটা নিরোগী নিকেতন'—পথে ও পথের প্রান্তে, ৪৮। 'আমরা ডাক্তার, রোগীর দুঃখটাই জানি, নীরোগীর দুঃখ ভাববার জিনিস নয়।' গৃহপ্রবেশ, ১৭।১১৭। উপরের দৃষ্টান্তগুলিতে দুষ্ট আকাঙ্ক্ষা দুরাকাঙ্ক্ষা, দুরাকাঙ্ক্ষা আছে যার— দুরাকাঙ্ক্ষী; এবং আশা আছে যার আশী, ন-আশী— নিরাশী[২]; ন রোগী— নীরোগী; ন সঙ্গিনী—

১ র-র— পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী বোঝাতে ব্যবহৃত। সংখ্যাগুলি খণ্ড ও পৃষ্ঠাসূচক।

২ এটি গীতায় আছে।

নিঃসঙ্গিনী—অভাব অর্থে রবীন্দ্রপ্রয়োগ। বস্তুত বাংলায় এটাই রীতি। নির্দোষী, নিরাপরাধী প্রভৃতি শব্দে এই রীতিই লক্ষ্য করা যায়। লৌকিক ব্যবহারও কবি উপেক্ষা করেন নি। ন রুগী—নীরুগী এই কবি-প্রয়োগও সমর্থনযোগ্য। 'শরীর এতটা নীরুগী…' ছেলেবেলা, ২৬।৫৯৬। 'ঋজুকায়া পপলার গাছের'—রাশিয়ার চিঠি, ২০।২৭৬। 'নতুনকালের নটরাজা নিল নতুন রূপ।' সেঁজুতি, ২২।৪৪। 'এরা শুধু/ যজ্ঞভূমে কুক্কুরের মতো লোলজিহ্বা / একপাশে পড়ে থাকে', রাজা ও রানী, ১।২৭৭; 'বিনোদিনী স্বহস্তে স্বচেষ্টায় মাটি খুঁড়িয়া মহেন্দ্রের হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে এই যে একটা লোলজিহ্বা লোলুপতার ক্লেদাক্ত সরীসৃপকে বাহির করিয়াছে', চোখের বালি, ৩।৪৬৬। উদাহরণ তিনটিতে সংস্কৃত বিধানে ঋজুকায়, নটরাজ ও লোলজিহ্ব হয়। এগুলির বিধিমতো রূপও রবীন্দ্রপ্রয়োগে আছে। অন্যত্র 'লেলিহজিহ্ব' পাওয়া যায়।— 'লোলুপ লেলিহজিহ্ব সর্পসমক্রূর'— কাহিনী, ৭।১০৩। 'কর্মক্ষেত্র আমাদের আয়ত্তগত'—আত্মশক্তি, ৩।৫৭৩; 'তাহার যে প্রমাণ আলোচনা আমাদের আয়ত্তগত এ কথা আমাদের বিশ্বাস হইত না।' আধুনিক সাহিত্য, ৯।৫০৩। 'আয়ত্তগম্য পদার্থকে'— ঔপনিষদ ব্রহ্ম, অচলিত সংগ্রহ ২।২০১; 'চাঁদ আয়ত্তগম্য নহে', লোকসাহিত্য, ৬।৬০৫। 'আয়ত্তগম্য' শব্দটির প্রচুর রবীন্দ্রপ্রয়োগ আছে। 'সামান্য পল্লীগ্রামের লোকেরও আয়ত্তগোচরে'— রাশিয়ার চিঠি, ২০।৩১৬; 'যা আবদ্ধ ছিল বিশেষ বিশেষ পণ্ডিতের অধিকারে তাকেই অনবচ্ছিন্নরূপে সর্বসাধারণের আয়ত্তগোচর করবার এই এক আশ্চর্য অধ্যবসায়।' শিক্ষা, ২০১। 'তাহাই যে রাখালের আয়ত্তাধীন', সমালোচনা, অচলিতসংগ্রহ, ২।৮৪; 'বিদ্যাশিক্ষা কালক্রমে কর্তৃপক্ষের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন হইয়া এই প্রভেদকে বাড়াইয়া তুলিবে।' আত্মশক্তি, ৩।৫৮৩। আরো অনেক প্রয়োগ আছে। এই-সব দৃষ্টান্তে 'আয়ত্ত' শব্দ বিশেষ্য ধরতে হবে। এর বিশেষ্য রূপেরও রবীন্দ্র-প্রয়োগ আছে। 'তাহাকে বিশেষ আয়ত্তিগম্যরূপে সহজ করিতে চেষ্টা করিতে গেলে'— ধর্ম ১৩।৩৬২। 'ক্রোধ ও যন্ত্রণাব্যঞ্জক কর্ণবধিরকর চীৎকার করিয়া সেই বিকট প্রাণী'—অনুবাদ, অচলিত সংগ্রহ ২।৫৭৯; 'সাময়িক তাগিদের বধিরকর কলকলায় বিভ্রান্ত হইয়া'— রাজাপ্রজা, ১০।৪৬২। উপপদ তৎপুরুষে পূর্বপদ বিশেষ্য হয়। বাংলায় বিশেষণও দেখা যায়। 'অভ্রচুম্বিত আলোকমালার প্রাসাদ'— খৃষ্ট, ২৭।৫০১; 'যাতে বিবাহিত এবং বিবাহ সংকল্পিত লোকদের'—প্রজাপতির নির্বন্ধ, ৪।২৬৬; 'ধ্যানগম্ভীর এই যে ভূধর, / নদী-জপমালাধৃত প্রান্তর, গীতাঞ্জলি, ১১।৮১।— 'অভ্রচুম্বিত', 'বিবাহ সংকল্পিত' ও 'নদী-জপমালা-ধৃত' 'বাহিতাগ্ন্যাদিষু' সূত্রে সমর্থনযোগ্য। 'ওটাকে ইন্‌-ভাগান্তগণ্য করলে কোনোদিন কোনো পণ্ডিতা-ভিমানী লেখক 'মুসলমানিনী' কায়দা বা 'ইংরেজিনী' রাষ্ট্রনীতি বলতে গৌরব বোধ করবেন এমন আশঙ্কা থেকে যায়।' বাংলাভাষা পরিচয়, ২৬।৪২৭। পণ্ডিত ব'লে যে অভিমান করে— এভাবে সমর্থনীয়। 'শব্দকল্পদ্রুম' অভিধানে শব্দটি প্রাচীনদের প্রয়োগ ব'লে সমর্থিত। 'পণ্ডিতমানী' শব্দ দ্রষ্টব্য।

"আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্র যতই বেড়ে চলেছে ততই দেখতে পাচ্ছি আমাদের চলতিভাষার কারখানায় জোড়তোড়ের কৌশলগুলো অত্যন্ত দুর্বল। বিশেষ্যকে বিশেষণ বা ক্রিয়াপদে পরিণত করবার সহজ উপায় আমাদের ভাষায় নেই বললেই হয়। তাই বাংলাভাষার আপন রীতিতে নতুন শব্দ বানানো প্রায় অসাধ্য।" বাংলাভাষা পরিচয়, ২৬।৪২১। রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত শব্দ এবং ধাতুর সঙ্গে সংস্কৃত প্রত্যয় যোগে নূতন শব্দসৃষ্টির এটি অন্যতম কারণ। অনেক সময় অসংস্কৃত শব্দ এবং ধাতুতেও সংস্কৃত প্রত্যয় যোগ করতে তিনি দ্বিধা করেন নি। এখানে ব্যাকরণের নিয়মবিরুদ্ধ আরো কয়েকটি শব্দের আলোচনা করছি।

চঞ্চলিত, বিল্লোলিত, শিথিলিত Monier সাহেবের অভিধানে উল্লিখিত। চঞ্চলিত শব্দটির বাংলা-সাহিত্যে রবীন্দ্রপূর্ব প্রয়োগও আছে। 'চিত অতি চঞ্চলিত'—নিধুবাবু। (জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানে উদ্ধৃত।) এটির একাধিক রবীন্দ্রপ্রয়োগ আছে। —'মনে যেন আগুন উঠল খেপে,/চঞ্চলিত বীণার তারে যৌবন মোর উঠল কেঁপে কেঁপে।' পলাতকা, ১৩।৩৬। 'উরহি বিলোলিত শিথিল চিকুর মম/বাঁধহ মালত মালে।' ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, ২।১৮। 'মুঠি শিথিলিত করি'—সেঁজুতি, ২২।৩৬; 'নব আষাঢ়ের কেতকী গন্ধ—/শিথিলিত নিদ্রাতে।' সানাই ২৪।৮৪। এই রকম বিশেষণের উত্তর ইতচ্-প্রত্যয়ান্ত রবীন্দ্র-প্রযুক্ত শব্দ হল— অলসিত, পূর্ণিত, ভিন্নিত। 'মুদিত নয়ানে দুটি উলসিত অলসিত অরবিন্দের মত, শ্যামের কোলে রাধা'—সমালোচনা, অচলিত সংগ্রহ ২।১২৭; 'পান্থ, এখনো কেন অলসিত অঙ্গ'—গীতবিতান, ১।১১৯। 'সমস্ত ধরার তরে নয়নের জল/বৃদ্ধ সে কবির নেত্র করিল পূর্ণিত।' কবিকাহিনী, অচলিত সংগ্রহ ১।৪৪; 'পুলকে পূর্ণিত তার প্রাণ'—প্রভাত-সংগীত, ১।৮৩। 'আরো ক্যাবিন সারি সারি/নম্বরে চিহ্নিত,/একই রকম খোপ সেগুলোর দেয়ালে ভিন্নিত। আকাশপ্রদীপ, ২৩।১০৪।—উল্লিখিত শব্দগুলি ইতচ প্রত্যয়ের ভুলপ্রয়োগ মনে হ'লেও এগুলি নামধাতুর উত্তর ক্ত-প্রত্যয়ান্ত ধরে সমর্থন করা যায়।

ভব অর্থে কালবাচক অব্যয়ের উত্তর তনয্ হয়। ঊর্ধ্ব প্রভৃতির পরে নিত্য তনষ্ হয়। বাংলায় অনব্যয়ের পরেও তনষ্ প্রযুক্ত দেখা যায়। উচ্চ শব্দের উত্তর রবীন্দ্রনাথ তনষ্ যোগ করেছেন। 'উচ্চতন কর্মচারী'—পঞ্চভূত, ২।৫৮১, 'অধস্তনের নিকট উচ্চতনের,—রাজাপ্রজা, ১০।৪১৭। নব শব্দের পরে তনষ্ যুক্ত হলে নূতন হয় (দ্র. শব্দকল্পদ্রুম)। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু 'নবতন'ই প্রয়োগ করেছেন।—'আছে তাহে নবতন আরম্ভের মঙ্গলবারতা'—পূরবী, ১৪।১৪।

ণ ইৎ হয়ে যায় এরকম প্রত্যয় হলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে প্রাতিপদিকের পূর্বপদের, কখনো বা উভয়পদের, কখনো বা দ্বিতীয়পদের আদ্য স্বরের বৃদ্ধি হয়; আবার কখনো বা কোনো পদেরই আদ্যস্বরের বৃদ্ধি হয় না। এই নিয়ম সুবিধামতো প্রযুক্ত ধ'রে নিলে রবীন্দ্রব্যবহৃত এই শব্দগুলি ব্যাকরণদোষ-দুষ্ট নয়।—ব্রহ্মিক, ব্রাহ্মিক, ভূমিকাম্পনিক, ভৌমগুলিক, মাহাদেশিক, যমদৌতিক, রবিবারিক, রবিবাসরিক, রাঘুবংশিক, রাষ্ট্রনৈতিক, সংবাদপাত্রিক, সমমাত্রিক, সার্বজাতিক, স্বজাতিক, স্বদৈশিক, স্বসাম্প্রদায়িক, স্বাজাতিক, স্বারাজিক। এগুলির ক্রমিক উদ্ধৃতি— 'লিখিতে পড়িতে পারে না এমন একজন ব্রহ্মিককে পাওয়া দুঃসাধ্য।' অনুবাদ, অচলিত সংগ্রহ ২।৫৪৪; 'প্রতিমার মধ্যে যে সত্য নেই এত বড়ো ঘোর ব্রাহ্মিক গোঁড়ামিও ঠিক নয়।' পথে ও পথের প্রান্তে, ২১; 'ভূমিকাম্পনিক কেন্দ্রের উপরে কাঁচা মালমশলায় তৈরি নড়বড়ে বাসায় আশ্রয় নিতে সে নারাজ।' গ্রন্থপরিচয়, ১১।৫১২; 'সেই রূপটি একই কালে ভৌমগুলিক রূপ'— শিক্ষা, ২০১; 'সেই দৈশিক কেন্দ্রগুলি একটি মাহাদেশিক কেন্দ্রচূড়ায় পরিণত হইবে।' সমূহ, ১০।৫১৫; 'যখন আধিভৌতিকের বাজিবে শেষ ঘড়ি/গলায় যমদৌতিকের দড়ি।' প্রহাসিনী, ২৩।১৮; 'রবিবারিক সভার'— য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র, ১।৫৬৬; 'রবিবাসরিক স্কুল'—' ঐ, ১।৫৬৩; 'রাঘুবংশিক চেহারা'— বাঁশরি, ২৪।১৫৯; রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্যচেষ্টাকে উপেক্ষা করিতে পারি না।' আত্মশক্তি, ৩।৫৬৭; 'লেখনী বজ্রপাণি সংবাদপাত্রিক ঘেঁষাঘেঁষি ভিড়ের মধ্যে'— তিনসঙ্গী, ২৫।৩১৫; 'সমমাত্রিক ছন্দে'— ছন্দ, ২১।৩৯৫; 'এবছর কোপেন-হেগেনে সার্বজাতিক ম্যাথামাটিক্‌স্ কন্‌ফারেন্স হবে।' তিনসঙ্গী, ২৫।২৩৮; 'তার সম্পত্তি স্বজাতিক লোহার সিন্ধুকে

দলিলবদ্ধ হয়ে নেই।' সাহিত্যের স্বরূপ, ২৭।২৬২ ; 'সেটা তাদের স্বদৈহিক নয়, বিশ্বদৈহিক।' মানুষের ধর্ম, ২০।৩৭৫ ; 'স্বসাম্প্রদায়িক পাদ্রিকে অনুরোধ করেন।' যাত্রী, ১৯।৪৪৬ ; 'আজ পৃথিবীতে অন্তত একটি দেশের লোক স্বাজাতিক স্বার্থের উপরেও সমস্ত মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করছে।' রাশিয়ার চিঠি, ২০।২৭৯ ; 'আজ চরকা খদ্দর সর্বপ্রধান স্বারাজিক ধর্মকর্মের বেশে গদা হাতে বেড়াতে পারল,' কালান্তর, ২৪।৪১২।

বাংলাভাষায় প্রচলিত আহরিত, বিসর্জিত ছাড়াও রবীন্দ্রপ্রয়োগে আবরিত উদ্‌গিরিত, উন্মোচিত, খনিত, বিকিরিত, বিদারিত, বিবরিত, বিসর্পিত দেখা যায়। এই দৃষ্টান্ত সমূহে ক্ত প্রত্যয়ে ইট্‌ প্রত্যয়ের ব্যাপক প্রয়োগ হয়েছে। 'হিমাদ্রি শিখর করি আবরিত'—বনফুল, অচলিতসংগ্রহ ১।৫২ ; 'আমরা সে-সকল আহরিত সাহিত্য সম্পদ তখনো স্বকীয় করে নিতে পারি নি।' আলোচনা, অচলিত সংগ্রহ ২। নিবেদন ; 'দুর্বিষহ স্পর্ধা হইতে উদ্‌গীরিত [উদ্‌গিরিত]'— রাজাপ্রজা, ১০।৪২৪ ; 'উন্মেষিত উষা'— মানসী, ২।১৭৭ ; 'কালিদাস দুষ্মন্ত-শকুন্তলার বাহিরের মিলনকে দুঃখখনিত পথ দিয়া লইয়া গিয়া অভ্যন্তরের মিলনকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন' — প্রাচীন সাহিত্য, ৫।৫৩৩ ; 'সূর্যকিরণের ন্যায় দশদিকে বিকিরিত'— রাজর্ষি, ২।৩৯৫ ; 'বিদারিত ঘাটের'— গল্পগুচ্ছ, ২১।২৪৯ ; 'বৃত্তান্ত বিবরিত করিল।' নৌকাডুবি, ৫।৩২০ ; 'বিসর্জিত দেবপ্রতিমা' —সমালোচনা, অচলিত সংগ্রহ ২।১৫৩ ; 'অতিদূরবিসর্পিত দুর্গম শৈলপথের মতো…' নৌকাডুবি, ৫।৪০৮।

নামধাতুজাত শব্দের প্রচলন বাংলার বিশিষ্ট লক্ষণ। রবীন্দ্রপ্রয়োগে ম্লানায়মান, শাখাপল্লবায়িত ও শাখায়িত পাওয়া যায়।—'আকাশের ম্লানায়মান সূর্যাস্ত দীপ্তির মধ্য দিয়া…' নৌকাডুবি, ৫।২৪৪ ; 'কৌতূহলী কল্পনা হ্যারিসন রোডের প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া তুরস্কের অর্ধচন্দ্রশিখরী রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত সম্ভব ও অসম্ভব অনুমানকে শাখাপল্লবায়িত করিয়া চলিল।' রাজাপ্রজা, ১০।৪২৮; 'উদ্‌ঘাটিল আপনার নিগূঢ় আশ্চর্য পরিচয়/ শাখায়িত/রূপে রূপান্তরে।' জন্মদিনে, ২৫।৭৩। রবীন্দ্রনাথ এড়ায়ন ও খড়খড়ায়িত প্রয়োগ করেছেন। উদ্ধৃতি— 'ইস্কুল-এড়ায়নে/সেই ছিল বরিষ্ঠ,' খাপছাড়া, ২১।৪২; 'জানালার খড়খড়িগুলো ক্ষণে ক্ষণে খড়খড়ায়িত।' ভানুসিংহের পত্রাবলী, ১২। প্রথমটি রহস্যচ্ছলে ও দ্বিতীয়টি অনুপ্রাস-অনুরোধ প্রযুক্ত।

বাংলায় প্রচলিত মান ও মন্ত প্রত্যয় দুটি শানচ্‌ প্রত্যয়জাত। মানপ্রত্যয়ান্ত শব্দ বাংলাভাষায় প্রচুর। ধ্বনিগাম্ভীর্যের কারণেও এটা হতে পারে। এ ব্যাপারে পরস্মৈপদী আত্মনেপদী বাছবিচার নেই। বাংলায় উভয়প্রকার ধাতুর পরই এই প্রত্যয় দেখা যায়। প্রচলিত গর্জমান, চলমান প্রভৃতি ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ নর্তমান, ম্লায়মান, সঞ্চলমান, সর্জ্যমান ব্যবহার করেছেন। 'হে রুদ্র, আমার/মার্জনা তোমার/গর্জমান বজ্রাগ্নিশিখায়',/বলাকা, ১২।৩০ ; 'চিরদিন তার স্রোতে/বাঁধন-বাহিরে মোর চলমান বাসা/ভেসে চলে তীর হতে তীরে।' জন্মদিনে, ২৫।১০০ ; 'ওই নর্তমান প্রাণের সঙ্গেই…', শান্তিনিকেতন, ১৪।৪২৫ ; 'যে পথিক অস্ত সূর্যের/ম্লায়মান আলোর পথ নিয়েছে'— শেষ সপ্তক, ১৮।১২ ; 'সম্মিলিত সঞ্চলমান ইচ্ছার বেগ'— পুনশ্চ, ১৬।১৩০ ; 'এই সর্জ্যমান অনন্ত বিশ্বচরাচরের সঙ্গে নিজের যোগ উপলব্ধি করি।' ছিন্নপত্র, ২৮৩। বাংলা রীতিতে এই প্রত্যয় প্রয়োগে রবীন্দ্র-রচনায়ও কর্তৃবাচ্য-কর্মবাচ্যসূচক অর্থভেদ লক্ষ্য করা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ গম্যমান, ঘূর্ণ (-র্ণ্য) মান, পরিবর্ত (-র্ত্য) মান শব্দগুলির উল্লেখ করা যায়। 'গম্যমান শরীর, প্রবহমান ভাব, পরিবর্তমান অবস্থা তাঁহার কবিতার বিষয়।' সমালোচনা, অচলিত সংগ্রহ ২।৯১ ; 'হেথা চলো ফিরে/দয়ামায়াহীন ওই সদা ঘূর্ণমান/কর্মচক্র ছাড়ি।' রাজা ও রানী, ১।৩৩৫ ; 'ঘূর্ণ্যমান চক্রগুলিকে নিয়ে গোপন করিয়া…', ভারতবর্ষ, ৪।৩৬৮ ; 'যখন এই চঞ্চল ঘূর্ণ্যমান

বিষয়াবর্তের মধ্যে একটি নির্বিকার ধ্রুব অবলম্বনের জন্য…', আধুনিক সাহিত্য, ৯।৫৪০ ; 'ইতিমধ্যে পরিবর্তমান মানুষের ইতিহাস তাহাকে স্পর্শ করে নাই।' বিচিত্র প্রবন্ধ, ৫।৪৬৫ ; 'সাহিত্য সেই পরিবর্ত্যমান মানবজগতের চঞ্চল প্রতিবিম্ব।' পঞ্চভূত, ২।৫৫৯।

এই রকম মতুপ্‌প্রত্যয় প্রয়োগে বাংলাপ্রয়োগের অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ মতুপ্ বা বতুপ্ প্রত্যয় ব্যবহারে পার্থক্য মানেন নি। আকৃতিবান, আকৃতিমান, ধ্বনিবান, ধ্বনিমান, সংস্কৃতিবান, সংস্কৃতিমান দুইই লিখেছেন। 'বনস্পতির দেহ বিচিত্ররূপে আকৃতিবান'— সাহিত্যের পথে, ২৩।৪৫০ ; 'আমাদের চৈতন্যকে গতিমান আকৃতিমান্ করে তুলছে'— ছন্দ, ২১।৩৬৫ ; 'ধ্বনিবান শব্দ'— সাহিত্যের পথে, ২৩।৪৯৪ ; 'ধ্বনিমান শব্দকে'— ছন্দ, ২১।৩৬৫ ; 'সংস্কৃতিবান্ মানুষ'— শিক্ষা, ২২৬ ; 'সংস্কৃতিমানদের বোধশক্তির রূঢ়তা যায় ক্ষয় হয়ে'— বাংলাভাষা পরিচয়, ২৬।৩৮১।

বাংলায় উৎকর্ষতা, নির্ভরতা, নিশ্চয়তা, প্রসারতা প্রভৃতি প্রচলিত। রবীন্দ্রনাথ অগ্রসরতা ও সখ্যতা প্রয়োগ করেছেন। এগুলি স্বার্থিক প্রত্যয়ের দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্রপ্রযুক্ত সাবধানিতা শব্দ এইভাবে সমর্থনীয়। বিশেষভাবে অবধানী আতিশয্যে স যোগে সাবধানী। তার পরে তল্ প্রত্যয় হয়েছে। উদ্ধৃতি— 'তাকেই সেখানকার লোকে বলে অগ্রসরতা, প্রোগ্রেস।' যাত্রী, ১৯।৪০৭ ; 'তাহার দিন চারেক পরে স্বরূপবাবুর সহিত সখ্যতা জন্মিল।' গল্পগুচ্ছ, ২৭।১২৮ ; 'তবে সাবধানিতা বিজ্ঞতা আসিয়া পড়ে'— সমালোচনা, অচলিত সংগ্রহ ২।১৫১। 'সাবধানী'র প্রয়োগও আছে— 'ওরে সাবধানী পথিক…'।

প্রয়োজন স্থলে রবীন্দ্রনাথ লৌকিক প্রয়োগও উপেক্ষা করেন নি। যথা— 'চিত্রলিখায় জানি আমি জানি/তব আলিপন লিপ্তি।' পরিশেষ, ১৫।১৭৬ ; 'লেখে আর মোছে তব আলোছায়া/ভাবনার প্রাঙ্গণে/খনে খনে আলিপন।' সানাই, ২৪।১১৫। 'কিন্তু যমের পত্রলিখককে তো সরানো যায় না।' ফাল্গুনী, ১২।৮৮, 'পুঁথি লিখকদের'— লিপিকা, ২৬।১৩২ ; 'কোনো ফল ফলিবে না আঁখি জল সিচনে ; / শুকনো হাসিটা তবে রেখে যাই পিছনে।' প্রহাসিনী, ২৩।৮ ; 'সে কথা সুরে সুরে ছড়াব পিছনে/ স্বপন ফসলের বিছনে বিছনে। / মধুপগুঞ্জে সে লহরী তুলিবে,/কুসুমপুঞ্জে সে পবনে দুলিবে,/ঝরিবে শ্রাবণের বাদল-সিচনে।' গীতবিতান, ২।২৮৬। ব্যাকরণসিদ্ধ লেখা, আলেপন, লেখক ও সেচন শব্দগুলির পরিবর্তে উদ্ধৃত লৌকিক প্রয়োগগুলি কবি করেছেন। কোথাও কোথাও এই-সব প্রয়োগের পশ্চাতে ছন্দ, অন্ত্যমিল, অনুপ্রাস প্রভৃতি কারণ আছে।

রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক ব্যবহৃত ধন্বন্তরিণী, নটিনী, ও নর্তিনী আলোচনার যোগ্য। 'তুমি আমার ধন্বন্তরিনী।' গল্পগুচ্ছ, ২১।২৪৬। 'সুপ্ত নটিনীর মতো'—চিত্রা, ৪।২৫ ; 'উতলা হয়েছে তটিনী /…লক্ষ মানিক ঝলকি আঁচলে/নেচে চলে যেন নটিনী'— কথা, ৭।৪০ ; 'মরণে মরণে চকিত চরণে/ছুটে চলে প্রাণ নটিনী।' পরিশেষ, ১৫।১৮৭ ; 'কোন্ নটিনীর ঘূর্ণি আঁচল লাগে আমার গায়ে।' শাপমোচন, ২২।১১০ ; 'ওড়না রাঙে ধূপছায়াতে/প্রাণ নটিনীর নৃত্যলীলায়।' নবজাতক, ২৪।২২ ; 'তার অন্তিমেও উন্মত্ত হয়ে উঠবে এই নৃত্যের ভাষাতেই প্রলয়ের অগ্নিনটিনী।' শ্রাবণগাথা, ২৫।১১৯ ; 'নৃত্যতরঙ্গিত তটিনী বর্ষণ নন্দিত নটিনী— আনন্দিত নটিনী,' গীতবিতান, ৩।৯০১। 'হে নর্তিনী, / বেণীর বন্ধনমুক্ত উৎক্ষিপ্ত তোমার কেশজালে'। সানাই, ২৪।৭১ ; 'প্রলয় নর্তিনী বন্যা',— সে, ২৬।২৩০। বাংলার প্রকৃতি অনুযায়ী ধন্বন্তরিণী হয়েছে। নটিনীও তাই। নটিনীর রবীন্দ্র-পূর্বপ্রয়োগ বিরল নয়। সংস্কৃত নর্তিন শব্দের স্ত্রীরূপ নর্তিনী তো সংস্কৃত ব্যাকরণ মতেই সিদ্ধ।

প্রচলিত সক্ষম, সচল প্রভৃতি শব্দের মতো রবীন্দ্রনাথ সকম্পিত, সকরুণ, সকাতর, সকৃতজ্ঞ, সচঞ্চল, সলজ্জিত ও সশঙ্কিত প্রয়োগ করেছেন। 'সকম্পিত পরামর্শ উপদেশ নিয়ে / তোমরা চাহিয়া থাকো'— রাজা ও রানী, ১।৩৩০। 'স্রোতস্বিনী আর কিছু না বলিয়া সকৃতজ্ঞ স্নেহদৃষ্টির দ্বারা…' পঞ্চভূত, ২।৫৬৬। 'মাঝে মাঝে বিশাল নয়নে সকৃতজ্ঞ শান্ত দৃষ্টি মেলি,' বিদায় অভিশাপ, ৪।১২৭। 'প্রভাতে যে বায়ুদল / ফিরেছিল সচঞ্চল'— কল্পনা, ৭।১৮৩। 'সর্বদা সশঙ্কিত'— বিবিধ প্রসঙ্গ, অচলিত সংগ্রহ ১।৩৫১ ইত্যাদি। এই দৃষ্টান্তগুলিতে স অতিশায়নাত্মক নিরর্থক ধ্বনিমাত্র। সংস্কৃত মতে বহুব্রীহি সমাস নয়। Monier-এর অভিধানে সকরুণ, সকাতর, সলজ্জিত আছে। কিন্তু রবীন্দ্র-প্রয়োগে যে অর্থ পাওয়া যায়, তাতে ঐ অতিশায়ন-অর্থ ই স্পষ্ট।

প্রচলিত চলন্ত, জ্বলন্ত প্রভৃতি শব্দে যে অন্ত প্রত্যয় পাওয়া যায় তা শতৃ-প্রত্যয়-জাত। রবীন্দ্রনাথ এই ধারার অনুবর্তন ক'রে উচ্চরন্ত ও মহান্ত শব্দ দুটি প্রয়োগ করেছেন। 'উচ্চরন্ত সূর্যকে আমি সর্বদা দেখব'— আত্মপরিচয়, ২৭।২৪৬। 'মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে/জ্যোতির্ময়।' নৈবেদ্য, ৮।৪৯।

আলোচিত শব্দগুলি ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ-প্রযুক্ত এমন দু-চারটে শব্দ অবশ্যই আছে যেগুলি ব্যাকরণের নিয়মে সমর্থন করা শক্ত। যেমন— অন্নপায়ী, আবাঙ্‌শাখ, আনুকৌলব, গৃহনিরীশ্বরী, মর্মঙ্গম, মাশবী, মৌলিন্য [মৌলীন্য], রজন্ময়। 'অন্নপায়ী বঙ্গবাসী/স্তন্যপায়ী জীব'— মানসী, ২।১৯৭; 'অন্ন শ্রেষ্ঠ না অন্নপায়ী শ্রেষ্ঠ,'— হাস্যকৌতুক, ৬।১০২। 'আমাদের শাস্ত্রে বলে সংসারটা ঊর্ধ্বমূল আবাঙ্‌শাখ'— কালান্তর, ২৪।৪২২। 'এই ক্ষুদ্র অনুকৌলবটি রাইচরণকে দেখিলে একেবারে পুলকিত হইয়া উঠে।' গল্পগুচ্ছ, ১৬।২৯৬। 'বৌমার শরীর অসুস্থ। হাওয়া বদলের জন্য পর্শু যাবেন ওয়ালটেয়রে। 'গৃহনিরীশ্বরী ঘরে আতিথ্যের ত্রুটি হবে।' চিঠিপত্র, ৫।৯৭। 'প্রকৃতির সৃষ্টির দূরত্ব থেকে মানুষের ভাষায় সেতু বেঁধে তাকে মর্মঙ্গম নৈকট্য দিতে হবে;' সাহিত্যের পথে, ২৩।৪৬০। 'মধুর মাশবী বেণু নীরব সহসা।' প্রহাসিনী ২৩।৭০। 'ইংরেজি ইস্কুলে এত দীর্ঘকাল দাগা বুলাইয়াও কেন আমরা কোনো বিষয়ে জোরের সঙ্গে মৌলিন্য প্রকাশ করিতে পারিলাম না।' শিক্ষা, ১৭৫। 'তরঙ্গের ধারে ধারে রঞ্জিয়া রজতধারে/সুনীল সলিলে ভাসে রজন্ময় কর!' বনফুল, অচলিত সংগ্রহ, ১।৮৯।— এই শব্দগুলি বিচিত্র গঠন। অন্ন পান করে যে সে অন্নপায়ী; গভীর অর্থ— অন্নভোজনে ক্লেশ স্বীকার করতে হয় না; জল পানের মতোই তা সুসাধ্য। আবাঙ্‌শাখ শব্দের শুদ্ধ রূপ অবাক্‌শাখ হবে। শব্দটি কঠোপনিষদে (১১০।১) আছে। অনুকূলের অপত্যার্থে ষ্ণ প্রত্যয় করলে আনুকৌল হয়। গৃহনিরীশ্বরীর অর্থ যে-গৃহে ঈশ্বরী নেই। খচ্ প্রত্যয়ান্ত হলেও মর্মঙ্গম শব্দে মর্মন্ শব্দের দ্বিতীয়ান্ত রূপ মর্মম্ হয় না। মশা সম্বন্ধীয় এই অর্থে মশ + ষ্ণ হলে মাশ হয়; মাশব হয় না। রজত + ময়ট্ রজতময় হয়; রজন্ময় হয় না। মূল + ঈন + ষ্ণ্য এভাবে মৌলীন্য [মৌলিন্য বানান নয়] সমর্থনযোগ্য। অন্নপায়ী স্তন্যপায়ীর সঙ্গে মিলের বা অনুপ্রাসের জন্য, আনুকৌলব, মাশবী সম্ভবত পরিহাসবশে ও গালভরা ব'লে, আবাঙ্‌শাখ, মর্মঙ্গম, মৌলিন্য [মৌলীন্য] ও রজন্ময় যথাক্রমে আবাঙ্‌মুখ, হৃদয়ঙ্গম, কৌলীন্য ও হিরন্ময় শব্দের সাদৃশ্যে রচিত বা ব্যবহৃত বলেই মনে হয়।

এই প্রবন্ধ রচনায় শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকট ব্যক্তিগতভাবে ও বিশেষত
তাঁর লিখিত 'ভাষা সাহিত্য-সংস্কৃতি' গ্রন্থ থেকে সাহায্য পেয়েছি।

রবীন্দ্রসাহিত্যে সংস্কৃত সাহিত্যের শব্দ

রবীন্দ্রনাথের অতি বাল্যকাল থেকেই সংস্কৃতের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ ছিল। শৈশবে পিতার কাছে সংস্কৃত ব্যাকরণ শিখেছিলেন। উপনিষদের শ্লোকগুলির সঙ্গেও পরিচয় ছিল। তৎপর কালিদাসের গ্রন্থাদি এবং অন্যান্য গ্রন্থও সাগ্রহে যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে পড়েছিলেন। ফলে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব তাঁর সাহিত্যে পড়েছে। আমি শব্দের ক্ষেত্রে সেই প্রভাবের বিষয় আলোচনা করছি।

সংস্কৃত সাহিত্যের কিছু শব্দ অনুবাদসূত্রে রবীন্দ্ররচনায় প্রযুক্ত দেখা যায়। মেঘদূত কাব্য বা কবি কালিদাস সম্পর্কে কবিতায় বা গদ্যরচনায় স্বতই মেঘদূত কাব্যের অনেক শব্দ ও বাগ্‌বন্ধ এসে গেছে। এ ছাড়া যেখানে সজ্ঞানে অনুবাদ করেছেন সেখানে তো এসেছেই। যেমন 'প্রাচীন সাহিত্যে' "কাদম্বরী চিত্রে"র অংশ বিশেষ। প্রসঙ্গ উল্লেখক্রমেও এসে গেছে অনেক স্থলে। যেমন "কাব্যে উপেক্ষিতা" রচনায়। এ ছাড়াও নানা রচনায় শ্লোক বা শ্লোকাংশ উদ্ধৃত ও সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ করে দিয়েছেন। এই-সব শব্দের অধিকাংশের সঙ্গে সাধারণ পাঠকের পরিচয় নেই। যেমন—

অক্ষরার্থ (শকুন্তলা ৫।১): বিদূষক যখন জিজ্ঞাসা করিল, 'এই গানটির অক্ষরার্থ বুঝিলে কি' রাজা ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন, 'সকৃৎকৃতপ্রণয়োঽয়ংজনঃ।'— প্রাচীন সাহিত্য ৫।৫৩০ পৃ

আবলিত (কাদম্বরী): রাজগণ মুখ আবলিত করিয়া তদভিমুখে দৃষ্টিপাত করিলেন।— প্রাচীন সাহিত্য ৫।৫৪৮ পৃ

কুথা (কাদম্বরী): ক্ষিতিতলবিন্যস্ত কুথার উপর সখী পত্রলেখা সসুপ্ত [সুষুপ্ত] থাকে।— প্রাচীন সাহিত্য ৫।৫৫৪ পৃ

পুষ্পলাবী (মেঘদূত ২৭): সেই সিপ্রাতীরের যূথীবনে যে পুষ্পলাবী রমণীরা ফুল তুলিত,— প্রাচীন সাহিত্য ৫।৫০৯ পৃ

প্রতিবোধবিদিত (কেন ২।৪): তেমনি আমি শুনি, তুমি শোন, এখন শুনি, তখন শুনি, এই প্রত্যেক শোনার বোধে যে একমাত্র পরম শোনার সত্য বিদিত সেই প্রতিবোধবিদিত এক সত্যই শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং।— মানুষের ধর্ম ২০।৩৮৬ পৃ

সাচীকৃত (কুমার ৩।৬৮ ; রঘু ৬।১৪): উমার শরীর তখন পুলকাকুল, দুই চক্ষু লজ্জায় পর্যস্ত এবং মুখ এক দিকে সাচীকৃত। —প্রাচীন সাহিত্য ৫।৫১৪ পৃ

নীচের শব্দগুলি রবীন্দ্রনাথ স্বকীয় রচনায় স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করেছেন। দু-চারটে শব্দের প্রয়োগের মূলে উপসর্গপ্রীতিও থাকা বিচিত্র নয়।

অধিদেবতা (রঘু ১২।১৭): ক্ষণতরে পশ্চাতে ফিরিয়া মোর নম্র নমস্কারে
বন্দনা করিয়া যাব এ জন্মের অধিদেবতারে। —প্রান্তিক ২২।১৬ পৃ
জয়দেবতার অধিদেবতা নীরব। —ভানুসিংহের পত্রাবলী ১২৬ পৃ

অন্তর্গূঢ় (রঘু ১৯।৫৭): যাহার অন্তর্গূঢ় আগ্নেয় আন্দোলনে সমস্ত মহাকাব্যে ভূমিকম্প উপস্থিত হয়, সেই অভ্রভেদী বিরাট মূর্তি মেঘনাদবধ কাব্যে কোথায়। —সমালোচনা, অচলিত সংগ্রহ ২।৭৮ পৃ

গম্ভীর নির্ঘোষ সেই মেঘসংঘর্ষের
জাগায়ে তুলিয়াছিল সহস্রবর্ষের
অন্তর্গূঢ় বাষ্পাকুল বিচ্ছেদ ক্রন্দন
এক দিনে। —মেঘদূত, মানসী ২।২৫৮ পৃ

মুক্তিকার দিবে আসি মন্ত্র পড়ি,
ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটিবে বিধাতার অন্তর্গূঢ় সংকল্পের ধারা।

—রোগশয্যায় ২৫।১৩ পৃ

অবকীর্ণ (মেঘদূত ৫৭): মানবের সামাজিক জগৎ দ্যুলোকের ছায়াপথের মতো। তার অনেকখানিই নানাবিধ অবচ্ছিন্নতত্ত্বের অর্থাৎ অ্যাব্‌স্ট্রাক্‌শনের বহুবিস্তৃত নীহারিকায় অবকীর্ণ, তাদের নাম হচ্ছে সমাজ, রাষ্ট্র, নেশন, বাণিজ্য, এবং আরও কত কী। —সাহিত্যের পথে ২৩।৪৪৯ পৃ

অবনম্র (কুমার ৩।৫৪): ভদ্রতায় অতি গদ্‌গদভাবে অবনম্র, আর হাসির আপ্যায়নে মুখ নিয়তই বিকসিত। —যোগাযোগ ৯।২২৬ পৃ

সর্ব অমঙ্গল-সর্প অবনম্র ফণা
আন্দোলিবে শান্ত লয়ে। —নটরাজ ১৮।১৯৮ পৃ

কামচারিতা (মেঘদূত ৬৬—কামচারী আছে):

ভিন্ন ভিন্ন পাঠের মধ্য হইতে কোনো-একটি বিশেষ পাঠ নির্বাচিত করিয়া লওয়া সংগত হয় না। কারণ, এই কামচারিতা, কামরূপধারিতা, ছড়াগুলির প্রকৃতিগত।

—লোকসাহিত্য ৬।৬০৯ পৃ

ক্রীড়াশৈল (মেঘদূত ৮৩): রেবার তটে চাঁপার তলে
সভা বসত সন্ধ্যা হলে,
ক্রীড়াশৈলে আপন-মনে
দিতাম কণ্ঠ ছাড়ি। —ক্ষণিকা ৭।২৪৩ পৃ

গুণদাদার বাগানের ক্রীড়াশৈল হইতে পাথর চুরি করিয়া আনিয়া আমাদের পড়িবার ঘরের এককোণে আমরা নকল পাহাড় তৈরি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম —জীবনস্মৃতি ১৭।২৭৫ পৃ।— এই দৃষ্টান্তে শব্দটি শুধু স্বাধীনভাবেই প্রযুক্ত হয় নি; নূতন অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। এ স্থলে ক্রীড়াশৈলের অর্থ বিহারশৈল নয়; miniature hill। তুলনীয়—

নেবুঘাস ঝাঁকড়া হয়ে উঠেছে
খেলা-পাহাড়ের গায়ে। —শেষসপ্তক ১৮।২২ পৃ

পতত্রী (কুমার ৫।৪): শিক্ষার জন্যে ভ্রমরস্য পেলবং পদং সরিয়ে দিয়ে পতত্রীকে বসানো গেল। —চিঠিপত্র ৯।৩১পৃ— তুলনীয়:

পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবং
শিরীষপুষ্পং ন পুনঃ পতত্রিণঃ।

মানসোৎক (মেঘদূত ১১): দীর্ঘবিরহের শেষ মোক্ষস্থানে যাইবার জন্য মানসোৎক হংসের ন্যায় উৎসুক হইয়া উঠে। —বিচিত্র প্রবন্ধ ৫।৪৬৭ পৃ

স্নেহব্যক্তি (মেঘদূত ১২): উভয়েই নিজ নিজ সন্তানদিগকে সর্বদাই উত্তেজিত করিতে লাগিল— দুই দলে মিলিয়া পিতার গলা জড়াইয়া ধরা, কোলে বসা, মুখচুম্বন করা প্রভৃতি প্রবল স্নেহব্যক্তিকার্যে পরস্পরকে জিতিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। —গল্পগুচ্ছ ১৬।৩৩৫ পৃ

স্বাধীনপ্রয়োগে কোনো কোনো শব্দের মূলের সঙ্গে অর্থপার্থক্য দেখা যায়। পূর্বেই ক্রীড়াশৈল শব্দটির অর্থান্তর উল্লেখ করা গেছে। আরো দু-একটি দৃষ্টান্ত:

অনুভাব। তেজ অর্থে রঘু ২।৭৫; মহিমা অর্থে রঘু ১০।৩৮। কিন্তু রবীন্দ্র-প্রয়োগে অনুভূতি, অধিকাংশ স্থলে ইংরাজি emotion ও feeling শব্দের একার্থক।—

চূড়ান্ত যুক্তির ভাষা গদ্য, চূড়ান্ত অনুভাবের ভাষা পদ্য।
—সমালোচনা, অচলিত সংগ্রহ ২।৮৯ পৃ;

তুমি আমার অনুভাবে
কোথাও নাহি বাধা পাবে,
পূর্ণ একা দেবে দেখা
সরিয়ে দিয়ে মায়াকে। —গীতাঞ্জলি ১১।১১১ পৃ

পেরিয়ে মরণ সে মোর সঙ্গে যাবে—
কেবল রসে, কেবল সুরে, কেবল অনুভাবে। —সেঁজুতি ২২।৩৫ পৃ

এই উদাহরণটিতে অনুভাব শব্দটি অন্ত্যমিল সাধনও করেছে।

নিস্তল। গোল অর্থে কুমার ১।৪২; রবীন্দ্রার্থ তলহীন॥

সরোবর প্রশান্ত নিশ্চল,
বাহিরেতে নিস্তরঙ্গ, অন্তরেতে নিস্তব্ধ নিস্তল। —বীথিকা ১৯।৫২ পৃ

বিতন্ত্রী। বেসুরা বীণা অর্থে কুমার ১।৪৫; রবীন্দ্রার্থ তার-ছেঁড়া।

কুটীরে কেহই নাই, শূন্যতা রয়েছে পড়ি—
বেষ্টিত বিতন্ত্রী বীণা লূতাতন্তুজালে।
—কবিকাহিনী, অচলিত সংগ্রহ ১।৩২ পৃ

স্বীকরণ। নিজের করা অর্থে রঘু ১২।১৬; ইংরাজি assimilation-এর প্রতিশব্দরূপে রবীন্দ্র-প্রয়োগ।

অনুকরণই চুরি, স্বীকরণ চুরি নয়। মানুষের বড়ো বড়ো সভ্যতা এই স্বীকরণশক্তির প্রভাবেই পূর্ণ মাহাত্ম্য লাভ করেছে। —সাহিত্যের পথে ২৩।৪১৭ পৃ; অন্ধ অনুকরণ দোষের, কিন্তু স্বীকরণ নয়।—রবীন্দ্র-রচনাবলী (পশ্চিমবঙ্গ সরকার -প্রকাশিত), ১৪।৯৪১ পৃ

সংস্কৃত সাহিত্যের শব্দের সাদৃশ্যে কিছু নূতন শব্দ রবীন্দ্রনাথ গঠন করেছেন। মেঘদূতের কামচারী শব্দের অনুকরণে কামরূপধারিতা নবসৃষ্ট শব্দ। পূর্বেই কামচারিতার উদাহরণেই এটি আছে।

মেঘদূতের অস্তঙ্গমিত (প্রথম শ্লোক) শব্দের সাদৃশ্যে দূরঙ্গমিত শব্দ রচিত।— আমি এখন তিনকুড়ি বছরের পরপারে, নিরতিশয় দূরঙ্গমিত হয়ে বসে আছি।—চিঠিপত্র ৫।৪৪ পৃ

এইরকম পল্লীবৃদ্ধ শব্দটি মেঘদূতের গ্রামবৃদ্ধ (৩১) শব্দের সাদৃশ্যে গঠিত।— পল্লীবৃদ্ধেরা চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া কহিল,···।—চোখের বালি ৩।৪৩৫ পৃ ; পল্লীবৃদ্ধগণ ধনী অতিথিদের সম্মাননার উপযুক্ত উপায় না দেখিয়া যাহাকে তাহাকে ক্রমাগতই জোড়হস্তে বিনয় করিয়া বেড়াইতে লাগিল।—গল্পগুচ্ছ ২২।১৯৯ পৃ

কৃতকতনয় আছে মেঘদূতে (৮১) আর শকুন্তলায় (৪।১৪) আছে পুত্রকৃতক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কৃতক-পুত্র (প্রাচীন সাহিত্য ৫।৫১৮,৫২৮ পৃ) প্রয়োগ করেছেন।

মেঘদূতে আছে পথিকবণিতা (৮) ; রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন— পথিকবধূ, পথিকললনা।

পথিকবধূ : চাহিত পথিকবধূ শূন্য পথপানে। —মানসী ২।১৪০ পৃ

নেই বাঁশি, নেই বঁধু, নেই রে যৌবনমধু,
মুছেছে পথিকবধূ সজল নয়ান। —মানসী ১৬২ পৃ

তাহা শ্রুতিমধুর বলিয়া পথিকবধূকে ব্যাকুল করে না। —বিচিত্র প্রবন্ধ ৫।৪৫৬ পৃ

কুসুমরথে মকরকেতু উড়িত মধু-পবনে
পথিকবধূ চরণে প্রণতা। —কল্পনা ৭।১২৯ পৃ

পথিকবধূদের কথা কাব্যে পড়া যায়। —চিঠিপত্র ৫।১৫৩ পৃ

হঠাৎ কখন এসেছ ঘর ফেলে
তুমি পথিক-বধূ, —সানাই ২৪।১০১ পৃ

পথিকললনা :

কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিকললনা,
জনপদবধূ তড়িৎ চকিত নয়না। —কল্পনা ৭।১২৩ পৃ

এ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের সমাস রচনায় ও বাগ্‌বন্ধেও সংস্কৃত সাহিত্যের শব্দের প্রভাব আদৌ দুর্নিরীক্ষ্য নয়।

বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

শান্তিনিকেতনস্থিত রবীন্দ্রসদনে রবীন্দ্ররচনার অনেকগুলি পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে। এই-সকল পাণ্ডুলিপিতে গ্রন্থাতিরিক্ত অনেক অংশ, মুদ্রিত রচনার সহিত বহু পাঠভেদ, লক্ষ্য করা যায়। কোনো কোনো শব্দ বা ছত্র বারংবার পরিবর্তন করিয়া কবি কিভাবে শেষ পাঠে উপনীত হইয়াছেন তাহার ইতিহাস অনেক ক্ষেত্রে এইসকল পাণ্ডুলিপিতে বিধৃত।

বিশ্বভারতী-কর্তৃক প্রবর্তিত রবীন্দ্রচর্চাপ্রকল্প হইতে বর্তমানে এইসকল পাণ্ডুলিপির বিবরণ প্রস্তুত হইতেছে। তন্মধ্যে 'পুষ্পাঞ্জলি' ও 'নলিনী' ইতঃপূর্বে বিশ্বভারতী পত্রিকার শ্রাবণ-আশ্বিন ও কার্তিক-পৌষ (১৩৭৫) সংখ্যায় প্রকাশিত। অন্য একটি বিবরণ এই সংখ্যায় মুদ্রিত হইল।

পাণ্ডুলিপিতে যে-সকল স্বতন্ত্র পাঠ ও বিভিন্ন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, বিভিন্ন গ্রন্থের পাঠভেদ-সংবলিত সংস্করণে তাহা সংকলন করিবার প্রযত্ন করা হইবে।

পূরবী

রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি-১০২

পূরবীর পথিক অংশের অধিকাংশ কবিতা এবং সানুবাদ লেখন-স্ফুলিঙ্গের কতকগুলি

সংরক্ষণের উদ্দেশে প্রত্যেক বিচ্ছিন্ন পাতা (রুল-টানা / ২০.১ × ১৫.৬ সেন্টি মিটার) কাচ-কাগজে মুড়িয়া, এই পাণ্ডুলিপি বর্তমানে বিশেষভাবে বাঁধাই করা হইয়াছে। পুরাতন ১খানি মলাট -সহ (এক পিঠে লেখা আছে) পত্রসংখ্যা ৭৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫৪। (নূতন বাঁধাইয়ে শেষের মলাট আগে আসিয়াছে কি ? উহার ভিতর-পিঠে 'ওগো মোর না-পাওয়া গো' কবিতা এবং এখনকার 1 অঙ্ক। বিন্যাসের এবং / বা অঙ্কপাতের এই অসংগতি স্বীকার করিয়া বর্তমান আলোচনায় যাবতীয় পৃষ্ঠাঙ্কের উল্লেখ।) এই পৃষ্ঠাগুলিতে কোনো লেখা নাই— পৃ ২ (মলাটের রচনারিক্ত পৃষ্ঠা), ১৪, ১৬, ১৮, ২০, ২৬, ৩০, ৩৪, ৩৬, ৪০, ৪২, ৪৪, ৪৬, ৪৮, ৫০, ৫৪, ৫৮, ৬২, ৬৪, ৬৬, ৬৮, ৭০, ৭২, ৭৪, ৭৬, ৭৮, ৮০, ৮২, ৮৪, ৯০, ৯৪, ৯৬, ৯৮, ১০০, ১০৬, ১১০, ১২০, ১২৬, ১৪০।

কতকগুলি পৃষ্ঠা যদৃচ্ছাকৃত চিত্রের কারণে ('লেখাচিত্র' বলা যায়) বিশিষ্ট— পৃ ৩, ৮, ১৭, ১৯, ২১, ২৩, ২৫, ২৯*, ৩৩, ৩৫, ৩৭, ৪১, ৪৩, ৪৯, ৫৩, ৬৩, ৬৫, ৬৭, ৮১, ৮৯, ৯৩, ১০১, ১০৫, ১১৩, ১১৯, ১২৩*, ১২৯, ১৩৫, ১৩৮, ১৪২, ১৪৪*, ১৫২। ইহার মধ্যে তারকাচিহ্নিত পৃষ্ঠায় কবিতা বা কবিতার অংশ যাহা লেখা হইয়াছিল লেখাচিত্রে তাহা সম্পূর্ণ অবলুপ্ত বা অবগুণ্ঠিত বলা চলে।

কবি প্রথম লিখিবার কালে সাধারণতঃ জোড় পৃষ্ঠাগুলি ছাড়িয়া গিয়াছেন, পরে অনেকগুলি জোড় পৃষ্ঠাও ব্যবহার করিয়াছেন, কদাচিৎ খাতা উল্টাইয়া বা কালক্রম ভঙ্গ করিয়া ঐরূপ 'সাদা' পাতায় লিখিয়াছেন। পরবর্তী তালিকা -সংকলনে পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাঙ্ক দিয়া সর্বদা রচনার কালক্রমই অনুসরণ করা হইয়াছে।
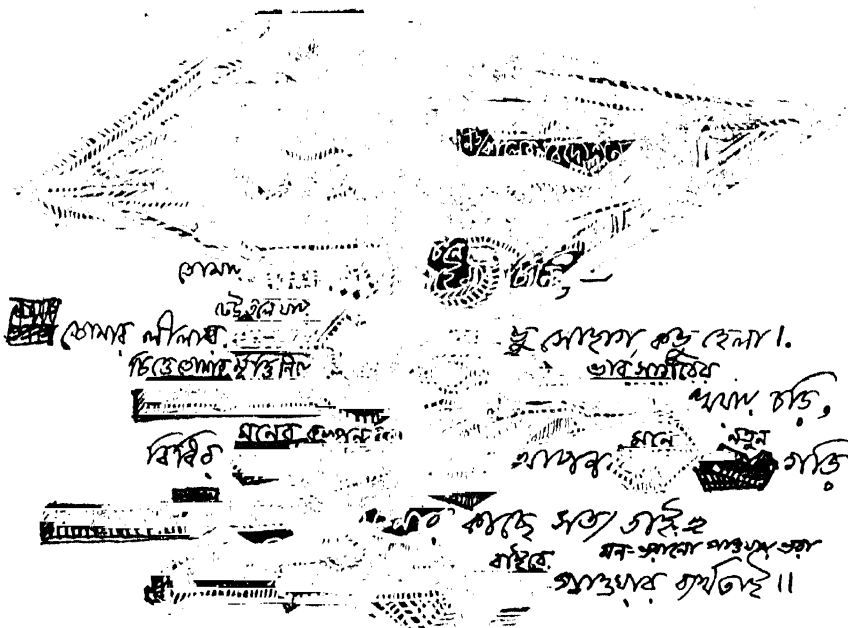
তোমায় আমি দেখি না কো, তোমার শুধু স্বপ্ন দেখি,
তুমি আমায় বারে বারে শুধাও ওগো, "সত্য সে কি?"
হয়ত বুঝি
তোমার মাঝে
এই জনমের দেখার চলে
আর-জনমের
হয়ত দেখি তোমার চোখে
আদি যুগের ইন্দ্র
লোকে
শিশু চাঁদের পথ-ভোলানো
স্বপন-
পারিজাতের বীথি
হয়ত হবে সত্য তাই,
হয়ত তোমার স্বপন আমার সত্য তাই!
আমি বলি, স্বপ্ন যাহা তার চোখে কি সত্য আছে?
আজ তুমি নওত বাঁধন,
স্বপ্নরূপে
সেই তুমি মোর মুক্তি স্বাধীন,
ফুলের সাথে, তারার সাথে, তোমার সাথে দেখায় মেলায়।

স্বাক্ষর-কবিতাগুলি সবই খাতা উল্টাইয়া (পৃ ১৫৩-১৪৯) লেখা। ইহারও পূর্বে দেড় পৃষ্ঠায় (১৫৪-৫৩) কতকগুলি বিদেশীয় (স্পানিশ ?) পদ / বাক্য এবং সঙ্গে সঙ্গে উহাদের ইংরাজি লিপিবদ্ধ।

লেখা ও লেখাচিত্রের কারণে বর্তমান পাণ্ডুলিপির কতকগুলি পৃষ্ঠার প্রতিচ্ছবি বিভিন্ন সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থে মুদ্রিত।

রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত, রবীন্দ্রনাথের হাতে লেখা, পূরবীর এই অংশেরই কয়েকটি কবিতার নকল কতকগুলি খুচরা পাতায় ও অন্য পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়, তাহাও ১০২-সংখ্যক পাণ্ডুলিপির বিবরণে একত্র তালিকাবদ্ধ হইল।

পূরবী ॥ পথিক

পৃষ্ঠা	সংখ্যা		সাময়িক পত্রে প্রকাশ
3	১	পথ [অপরিচিতা] / পথ বাকি আর নাই ত আমার	প্রবাসী
		১৮ অক্টোবর [১৯২৪] / স্টীমার এণ্ডিস / S.S. Andes	ফাল্গুন ১৩৩১
6	২	[আন্‌মনা] / আন্‌-মনা গো, আন্‌মনা	প্রবাসী
		[স্থান-কাল পূর্ববৎ]	বৈশাখ ১৩৩২
8	৩	[বিস্মরণ] / মনে আছে কার-দেওয়া সেই ফুল	
		১৯ অক্টোবর [১৯২৪ / আণ্ডেস জাহাজ]	
11	৪	[আশা] / বহুদিন মনে ছিল আশা	প্রবাসী
13	৪ক	মস্ত যে সব কাণ্ড করি (প্রবেশক)	বৈশাখ ১৩৩২
		[স্থান-কাল পূর্ববৎ]	
15	৫	[বাতাস] / গোলাপ বলে, ওগো বাতাস	বঙ্গবাণী
		২০ অক্টো[বর ১৯২৪] / লিস্‌বন বন্দ[র] / এণ্ডিস্ স্টীমার	চৈত্র ১৩৩১
19	৬	[স্বপ্ন] / তোমায় আমি দেখি নাকো, শুধু তোমার	
		২০ অক্টোবর [১৯২৪] / লিস্‌বন্ বন্দর	
23	৭	[সমুদ্র] / হে সমুদ্র, স্তব্ধ হয়ে শুনেছিনু	
		২১ অক্টোবর [১৯২৪ / আণ্ডেস জাহাজ]	
28	৮	[মুক্তি] / নানা মূর্তি ধরি মুক্তি দেখা দিতে আসে	কল্লোল প্রবাসী
		২২ অক্টোবর ১৯২৪ / এণ্ডিস স্টীমার	বৈশাখ '৩২ জ্যৈষ্ঠ '৩২
35	৯	[ঝড়] / সুপ্তির জড়িমাঘোরে	প্রবাসী, চৈত্র ১৩৩১
38	৯ক	ছোট্ট ক্যাবিন, আলোয় আঁধার (প্রবেশক)	প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২
		২৪ অক্টোবর [১৯২৪ / আণ্ডেস জাহাজ]	
41	১০	[পদধ্বনি] / আঁধারে প্রচ্ছন্ন ঘন বনে	বঙ্গবাণী
		[স্থান-কাল পূর্ববৎ]	জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২

49	১১	[প্রকাশ] / খুঁজতে যখন এলাম সেদিন ২৬ অক্টোবর ১৯২৪ / স্টীমার এণ্ডিস	
53	১২	[শেষ] / হে অশেষ, তব হাতে শেষ ॥ হস্তলিপিচিত্র ॥ [২৯ অক্টোবর ১৯২৪ / আণ্ডেস জাহাজ]	বার্ষিক বসুমতী শারদীয়া ১৩৩২
57	১৩	[দোসর] / দোসর আমার, দোসর ওগো ২৮ অক্টোবর ১৯২৪ / স্টীমার এণ্ডিস	
61	১৪	[অবসান] / পারের তরী এসেছে তার ৩০ অক্টোবর [১৯২৪ / আণ্ডেস জাহাজ]	
65	১৫	[তারা] / আকাশ-ভরা তারার মাঝে ১ নবেম্বর[১] [১৯২৪ / আণ্ডেস জাহাজ]	
71	১৬	কৃতজ্ঞ / বলেছিনু "ভুলিব না," যবে তব ২ নবেম্বর[১] ১৯২৪ / Rio de Janiero / S.S. Andes	
75	১৭	[মৃত্যুর আহ্বান] / জন্ম হয়েছিল তোর ৩ নভেম্বর[১] ১৯২৪ / [আণ্ডেস জাহাজ]	প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২
79	১৮	[দান] / কাঁকনজোড়া এনে দিলেম যবে ৩ নভেম্বর[১] ১৯২৪ / [আণ্ডেস জাহাজ]	
83	১৯	[দুঃখসম্পদ] / দুঃখ, তব যন্ত্রণায় যে দুর্দ্দিনে ৪ নবেম্বর[১] [১৯২৪ / আণ্ডেস জাহাজ]	প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২
85	২০	সমাপন / এবারের মত কর শেষ ৫ নভেম্বর[১] [১৯২৪ / আণ্ডেস জাহাজ]	
87	২১	ভাবীকাল / ক্ষমা কোরো যদি গর্ব্বভরে ৬ নভেম্বর[১] ১৯২৪ / আণ্ডেস [জাহাজ]	প্রবাসী ফাল্গুন ১৩৩১
86	২২	Pardon me, if in my pride ('ভাবীকাল'এর ভাষান্তর) No. 70, *Poems* (1943)	
87	২৩	অতীতকাল / সেই ভালো প্রতিযুগ আনে না ৭ নভেম্বর[১] ১৯২৪ / আণ্ডেস্ [জাহাজ]	সবুজ পত্র ভাদ্র ১৩৩২
	'২৩'	অতীত[কাল] / সেই ভালো প্রতিযুগ ৭ নবেম্বর ১৯২৪ [আণ্ডেস জাহাজ]	সবুজ পত্র ভাদ্র ১৩৩২
88	২৪	It is well that ages pass away (পূর্ববর্তীর অনুবাদ)	
91	২৫	বেদনার লীলা / গানগুলি বেদনার (তু বলাকা / সংখ্যা ১৫) ৭ নবেম্বর[১] [১৯২৪ / আণ্ডেস জাহাজ]	প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২

১ 'অক্টোবর' কাটিয়া 'নভেম্বর' বা 'নবেম্বর' লেখা হয়।

92	২৬	[শীত] / কেন শীতের হাওয়া হঠাৎ ছুটে এল ১০ নবেম্বর [১৯২৪ / বু]য়েনোস এয়ারিস	
95	২৭	[কিশোর প্রেম] / অনেক দিনের কথা সে যে ১১ নবেম্বর ১৯২৪ / বুয়েনোস্ এয়ারিস্	॥ লিপিচিত্র ॥ বার্ষিক বসুমতী শারদীয়া ১৩৩২
99	২৮	[প্রভাত] / স্বর্ণসুধা ঢালা এই প্রভাতের ১১ নবেম্বর ১৩২৪[২] [১৯২৪] / বুয়েনোস্ এরারিস্	
101	২৯	[বিদেশী ফুল] / হে বিদেশী ফুল, যবে ১২ নভেম্বর ১৯২৪ / বুয়েনোস এয়ারিস্	
105	৩০	[অতিথি] / প্রবাসের দিন মোর পরিপূর্ণ করি দিলে ১৫ নবেম্বর [১৯২৪ / বুয়েনোস্ এয়ারিস্]	
104	৩১	Woman, thou hast made my days ('অতিথি'র ভাষান্তর) No. 72, *Poems* (1943)	
107	৩২	[অন্তর্হিতা] / প্রদীপ যখন নিবেছিল ১৬ নভেম্বর[৩] [১৯২৪] বুয়েনোস্ এয়ারিস্	
111	৩৩	শেষ আশা [শেষ বসন্ত] / আজিকার দিন না ফুরাতে ২১ নবেম্বর [১৯২৪] / বুয়েনোস্ এয়ারিস্।	
117	৩৪	বিপাশা / মায়াময়ী নাই বা তুমি ২২ নবেম্বর ১৯২৪ / বুয়েনোস্ এয়ারেস / সান ইসিড্রোস্	
114	৩৫	[চাবি] / বিধাতা যেদিন মোর মন ২৬ নবেম্বর ১৯২৪ / বুয়েনোস এয়ারেস	
119	৩৬	[বৈতরণী] / ওগো বৈতরণী ২৭ নবেম্বর ১৯২৪ / বুয়েনোস এয়ারেস	
122	৩৭	[প্রভাতী] / চপল ভ্রমর, হে কালো কাজল ১ ডিসেম্বর [১৯২৪ / বুয়েনোস এয়ারিস][৪]	সবুজ পত্র ভাদ্র ১৩৩২
	'৩৭'	প্রভাতী / চপল ভ্রমর, হে কালো কাজল ১ ডিসেম্বর ১৯২৪ [বুয়েনোস এয়ারিস]	সবুজ পত্র ভাদ্র ১৩৩২

---

২ '১৩২৪' লিপিপ্রমাদ মাত্র।

৩ 'ডিসেম্বর' কাটিয়া 'নভেম্বর' লেখা হয়।

৪ পাণ্ডুলিপির '60' অঙ্কিত পৃষ্ঠায় একটি সূচীপত্রে, প্রথম হইতে এ পর্যন্ত যে কবিতাগুলি পাওয়া গেল তাহার তালিকা : অপরিচিতা [পথ], আনমনা, বিস্মরণ, আশা, বাতাস, স্বপ্ন, সমুদ্র, মুক্তি, ঝড়, পদধ্বনি, প্রকাশ, শেষ, দোসর, সন্ধ্যা[অবসান], তারা কৃতজ্ঞ, মৃত্যু, দান, দুঃখ [দুঃখসম্পদ], সমাপন, ভাবীকাল, অতীতকাল, বেদনা[র লীলা], শীত, কিশোর প্রেম, প্রভাত, বিদেশী [বিদেশী ফুল], অতিথি, রাতে[অন্তর্হিতা], শেষ আশা[শেষ বসন্ত], চাবি, বিপাশা, বৈতরণী, ভ্রমর [প্রভাতী]।

127	৩৮	[মধু] / মৌমাছির মত আমি	প্রবাসী
		৪ ডিসেম্বর [১৯২৪] / বুয়েনোস এয়ারেস।	বৈশাখ ১৩৩২
129	৩৯	[তৃতীয়া] / কাছের থেকে দেয় না ধরা	প্রবাসী
		৪ই ডিসেম্বর ১৯২৪ / বুয়েনোস এয়ারেস।	জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২
132	৪০	অদেখা / আসিবে সে আছি তার আশাতে	
		৭ই ডিসেম্বর [১৯২৪] / বুয়েনোস এয়ারেস	
132	৪১	She will come ('অদেখা'র ভাষান্তর)	
		অপ্রকাশিত ?	
135	৪২	[চঞ্চল] / হায় রে তোরে রাখব ধরে	
		১০ ডিসেম্বর [১৯২৪] / বুয়েনোস এয়ারেস।	
138	৪৩	প্রবাহিনী / নই আমি দূর গিরিশিরের স্তব্ধ তুষার	প্রবাসী
		১১ ডিসেম্বর ১৯২৪ / বুয়েনোস এয়ারেস	জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২
141	৪৪	[আকন্দ][৫] / যেদিন প্রথম কবিগান	প্রবাসী
		১৬ ডিসেম্বর [১৯২৪] চাপাট[৬] মালাল	চৈত্র ১৩৩১
145	৪৫	[কঙ্কাল] / পশুর কঙ্কাল ওই	প্রবাসী
		১৭ ডিসেম্বর [১৯২৪] / কাপাট[৬] মালাল।	চৈত্র ১৩৩১
146	৪৬	[চিঠি] / স্বপ্নসম পরবাসে এলি পাশে কোথা হতে তুই	প্রবাসী
147	৪৬ক	দূর প্রবাসে সন্ধেবেলায় (প্রবেশক/সংক্ষিপ্ত)	ফাল্গুন ১৩৩১
		২০ ডিসেম্বর [১৯২৪] / বুয়েনোস আইরেস।	
	'৪৬'	[চিঠি] / ওঁ / শ্রীমান দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর / কল্যাণীয়েষু	প্রবাসী
		দূর প্রবাসে সন্ধ্যাবেলায় (পরিবর্ধিত প্রবেশক ও কবিতা)	ফাল্গুন ১৩৩১
		২০ ডিসেম্বর ১৯২৪ / বুয়েনোস আইরেস্।	
148	৪৭	[বিরহিণী] / তিন বছরের বিরহিণী	প্রবাসী
		২০ ডিসেম্বর / [বুয়েনোস এয়ারিস]	জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২
	'৪৮'	[না-পাওয়া] / ওগো আমার না-পাওয়া গো	প্রবাসী
		২৪ ডিসেম্বর ১৯২৪ / বুয়েনোস্ আইরেস্।	বৈশাখ ১৩৩২
1	৪৮	[না-পাওয়া] / ওগো মোর না-পাওয়া গো	
		২৪ ডিসেম্বর ১৯২৪ / বুয়েনোস আইরেস	
	অ১	একদা [মিলন] / জীবন মরণের স্রোতের ধারা	সবুজ পত্র
		৯ জানুয়ারি ১৯২৫ / [জুলিয়ো চেজারে জাহাজ]	ভাদ্র ১৩৩২

৫ প্রবেশক-হীন।

৬ সর্বত্র পাণ্ডুলিপির শব্দ / বানান উদ্‌ধৃত ; এই দুই স্থলে পত্রে ছাপা হয় : চাপাড মালাল।

32	৪৯	[ইটালিয়া] / কহিলাম, ওগো রাণী ২৪ জানুয়ারি ১৯২৫ / মিলান / ইটালি[৭]।

সানুবাদ স্বাক্ষরলেখন[৮]

পৃষ্ঠা	সংখ্যা	দ্রষ্টব্য :	লেখন সংখ্যা	Ff. পৃষ্ঠা	স্ফুলিঙ্গ সংখ্যা
153	৫০	দেবতা যে চায় পরিতে গলায় ×	১৩৫		
	৫১	God claims from man a garland ×	No. 25 (*Stray Birds*)		
	৫২	আকাশে মন কেন তাকায়	১০৫		
	৫৩	Why this weary waiting ×	ঐ	67	
	৫৪	বাতাসে তাহার প্রথম পাপড়ি			১৬৬
	৫৫	The rose no longer belongs			
152	৫৬	আলো তার পদচিহ্ন			৩৩
	৫৭	Light leaves no footprints			
	৫৮	তরঙ্গের বাণী সিন্ধু	তু ১২২		১০২
	৫৯	The sea writes in foam	তু ঐ	cf. 26	
	৬০	বাহির হতে বহিয়া আনি			১৬৯
	৬১	We gather materials			
151	৬২	হে প্রিয়ে, হোথায় তব জানালায় ×	১৫০		
	৬৩	Thy lamp, my love, with its finger			
151	৬৪	অজানা ফুলের গন্ধে আমায় ×	১৪৬		
	৬৫	The smell of some strange flower			
	৬৬	হে সাগর, তুমি বিপদের লোভ দিয়া ×	৪৯		
	৬৭	With the temptation of danger ×	ঐ	98	
	৬৮	মন্দ যাহা নিন্দা তার ×	১৬৭		
	৬৯	If you must fully pay ×	ঐ		
150	৭০	Wealth is the burden ×	49	171	
	৭১	বাহিরে বস্তুর বোঝা			১৭০

৭ এই পাণ্ডুলিপিতে পূরবীর 'পথিক' অংশের কবিতাগুচ্ছ এখানেই শেষ। অতঃপর খাতা উল্টাইয়া কতকগুলি সানুবাদ স্বাক্ষর-কবিতা লেখা হয় ; উহাদের আধারগ্রন্থ যথাক্রমে : লেখন (নভেম্বর ১৯২৬) / Fireflies (ফেব্রুয়ারি ১৯২৮) / স্ফুলিঙ্গ (পরিবর্ধিত সংস্করণ চৈত্র ১৩৬৭)।

৮ বলা অবশ্যক স্বতন্ত্র লেখন গ্রন্থে (দ্রষ্টব্য ১৩৬৮ সংস্করণ) অধিকাংশ বাংলা কবিতার সঙ্গে তাহার ইংরেজি ভাষান্তর দেওয়া আছে। বর্তমান সারণীতে বাংলা লেখনের অনুবর্তী এরূপ ইংরেজি লেখা বুঝাইতে, 'ঐ' সংকেতটি ব্যবহৃত ; অর্থাৎ ঐ স্থলেই ইংরেজি পাঠ দ্রষ্টব্য।

	৭২	যাবার যা সে যাইবে ×	১২১		
	৭৩	Open thy door wide ×	ঐ	214	
	৭৪	যাওয়া আসার একই সে পথ ×			২০৪
	৭৫	The path is the same			
	৭৬	দিনান্তের ললাট লেপি ×	১৪৭		
	৭৭	Crowning the parting day			
	৭৮	পারের তরীর পালের হাওয়ার পিছে	১১৩		
	৭৯	The sorrow of the shore ×	ঐ	188	
149	৮০	He lives whose life is a star			
	৮১	আশার আলোকে জ্বলুক			৩৪
	৮২	The morning star cried			
	৮৩	"এস মোর কাছে" শুকতারা গাহে গান			৪৪
149	৮৪	আপনি ফুল লুকায়ে			২৮
	৮৫	কাছের রাতি দেখিতে পাই মানা			৫৩
	৮৬	The night though near			

পাণ্ডুলিপিতে ও মুদ্রিত গ্রন্থে পাঠভেদ প্রচুর, সে সকলের বিস্তারিত পঞ্জী এ স্থলে দেওয়া গেল না। পাণ্ডুলিপি-ধৃত পাঠ সম্পর্কে কতকগুলি বিশেষ তথ্যই এ স্থলে সংকলিত।

৮ পাণ্ডুলিপি-ধৃত অতিরিক্ত স্তবক, মুদ্রিত প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবকের অন্তর্বর্তী :—

পথে যেতে যদি কভু সাথী বলে' চিনি, বিশ্বপতি,
তোমারে কোথাও,—
প্রভু, যদি কভু তব প্রভুত্বের দাবী মোর প্রতি
ছেড়ে দিতে চাও!
তাহলে আসুক সন্ধ্যা বিরামের মহাসিন্ধুতটে,
শান্তিবারি পূর্ণ হোক্ গোধূলির স্বর্ণময় ঘটে ;

৫২-সংখ্যক কবিতায় বর্তমান পাণ্ডুলিপিতে পাই : তা নিয়ে থাকে খুসি। / 'থাকে' লিপিপ্রমাদ হইলে, 'থাক্' সংগত পাঠ হইলে, লেখনের সহিত পাঠভেদ থাকে না।

৭০-সংখ্যক কবিতা লেখনের No.49, এটি শতপূর্তি সংস্করণে (১৩৬৮) '২৬' অঙ্কিত পৃষ্ঠার চতুর্থ ; লেখনে ইহার বাংলা নাই।

কোন্ বাংলা কবিতার সহিত কোন্ ইংরেজী রচনার সম্পর্ক তাহা সব সময়েই পার্শ্বস্থিত ঢেউ-খেলানো বন্ধনীতে নির্দেশ করা হইল।

× সংকেতের অর্থ, মুদ্রণকালে পাঠের কোনো-না-কোনো পরিবর্তন হইয়াছে। 'তু' অথবা তুলনীয় তখনই বলা যায়, যখন পরিবর্তন অত্যধিক।

স্ফুলিঙ্গের কবিতা সকল সংস্করণেই বর্ণানুক্রমে সন্নিবিষ্ট। লেখনের বাংলা কবিতার সংখ্যা পাওয়া যাইবে রবীন্দ্র-রচনাবলী (বিশ্বভারতী) চতুর্দশ খণ্ডে (১৩৭১ বৈশাখ), পৃ ১৬০-১৮১।

শিশুর মতন তুমি এঁকে দাও আকাশের পটে
আন্‌-মনে যাহা-তাহা ছবি।
শিশুর মতন বসি একাসনে তোমাসনে কবি। / p. 28

১৩ অতিরিক্ত স্তবক, মুদ্রিত তৃতীয় ও চতুর্থের অন্তর্বর্তী :—

দোসর আমার, দোসর ওগো, একলা ভাবি
আমার পরে কেন এমন গোপন দাবী?
চন্দ্রসূর্য্যগ্রহতারার ভিড়ের মাঝে
আমায় তুমি দিবসরাতি খুঁজে বেড়াও কিসের কাজে?
বিশ্ব আমার ভরে আছে তোমার চাওয়ায়
তোমার আলোয় তোমার হাওয়ায়। / p. 56

১৯ মুদ্রিত কবিতার যেখানে শেষ তাহার পরে পাণ্ডুলিপি-ধৃত অতিরিক্ত ৬ পংক্তি। ইহা 'second thought' মনে হয়, কেননা রচনায় তারিখ দেওয়া হয় ইহার পূর্বেই।—

যখন কুঁড়ির বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দেয় তাপে,
তখনি ত জানি, ফুল চিরদিন ছিল তারি চাপে।
দুঃখ চেয়ে আরো বড় না থাকিত কিছু
জীবনের প্রতিদিন হ'ত মাথা নীচু,
তবে জীবনের অবসান
মৃত্যুর বিদ্রূপহাস্যে আনিত চরম অসম্মান॥ / p. 83

'২৩' খুচরা ১ পাতার ১টি পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের হাতে লেখা 'কপি' সবুজ পত্রের উদ্দেশে প্রেরিত— ছাপাখানার মসী-লাঞ্ছিত নহে।

২৪ অতীতকাল কবিতার কবি-কৃত ভাষান্তর এ স্থলে সংকলিত হইল :—

It is well that ages pass away before they have spent all their songs, that they leave in the air the anguish of the unfulfilled. Our commonplace sorrow is tinged by the dusk of the sunken day with a sad splendour of death.

The spring flower bring the sigh of some beloved of the world whose name has long been lost,

and in the night of lover's tryst the dumb forgotten adds to the familiar whispers its own mysterious

meaning. p. 88

২৭ অতিরিক্ত স্তবক, মুদ্রিত তৃতীয় ও চতুর্থের অন্তর্বর্তী :—

তার পরে সেই তীরে বসে কত কাঁদন কাঁদা।

ওপার পানে যাবার লাগি আঁধার রাতে ছিলেম জাগি

কে জানিত তটচ্ছায়ায় তরী ছিল বাঁধা,

মিছে কত কাঁদন কাঁদা। / p. 95

২৯ চতুর্থ স্তবকের মুদ্রিত পঞ্চম-ষষ্ঠ ছত্র পাণ্ডুলিপিতে রেখার বেষ্টনীতে আবদ্ধ, বর্জন-চিহ্নিত তাহা নিশ্চিত বলা যায় না; অথচ উহার পরেই (মনে হয় উহার পরিবর্তে) এই দুটি অপ্রকাশিত পংক্তি :—

কহিলাম, দেখনি কি তুই চোখে মোর

স্বপনের ঘোর? / p. 102

৩৬ তৃতীয় স্তবকের মুদ্রিত প্রথম-দ্বিতীয় ছত্র (ওগো বৈতরণী, / অদৃশ্যের উপকূলে থেমে গেছে যেথায় ধরণী) পাণ্ডুলিপিতে নাই।

৩৭ শেষ স্তবক পূর্বে (p. 125) একরূপ লেখা হয়। তাহা বর্জনচিহ্নিত না করিয়াই নূতন ছত্র যোগ করিয়া পুনশ্চ যেভাবে লিখিত হয় (pp. 122/124), তাহাই গ্রন্থের অন্তিম ২ স্তবক বা ১৬ ছত্র।

'৩৭' আলগা দুই পাতায় তথা দুই পৃষ্ঠায় কবি-কৃত পরিচ্ছন্ন নকল, সবুজ পত্রে মুদ্রণের উদ্দেশে প্রেরিত মনে হয়, মসীলাঞ্ছিত নহে— সম্ভবতঃ ইহার নকল করিয়াই ছাপাখানায় প্রেরিত হইয়া থাকিবে। যাহা হউক, খুচরা এই পাণ্ডুলিপিতে শেষ স্তবকের দ্বিতীয় ছত্রটি (বেণুশাখাগুলি খনে খনে টলমল) স্খলিত মনে হয়, সবুজ পত্রেও ছাপা হয় নাই।

৩৯ শেষ স্তবকের একটি পূর্বপাঠ স্পষ্ট বর্জনচিহ্নিত না হইলেও বিচিত্র রেখাজালে ঘিরিয়া দেওয়া, তাহা এ স্থলে সংকলিত (যে যে অংশ স্পষ্ট বর্জনচিহ্নিত তাহা বাদ দেওয়া গেল) :—

বয়স হলে ইচ্ছা হবে আকাশপানে চেয়ে

আবার হতে কবির প্রিয়া, তিন বছরের মেয়ে।

ইচ্ছা হবে কালো তাহার তরল চাহনিতে

শ্রাবণ মেঘের তিন বছরের সজল ছায়া নিতে।

ইচ্ছা হবে ছন্দে আমার গড়তে নাচের ছাঁদ—

জলের ঢেউয়ের তালে যেমন দোলায় ছায়ার চাঁদ।

সাঁওতালিনী নেপালিনী সঙ্গী তাহার নানা

ছাগল বাছুর ভোঁদা কুকুর বাঁদর বেড়ালছানা

ঝগড়ু বোকা বুড়ো মালী থাকবে ঘিরে ওকে

স্থানের অভাব হয় না কারো কবির কাব্যলোকে। / p. 130

উদ্ধৃতির শেষাংশে (থাকবে ঘিরে··· কবির কাব্যলোকে।) দুই অবর্জিত পাঠান্তরও আছে :

চা'ক্ না যা'কে তা'কে
কবির গানের বিশ্বমাঝে সবাই বজায় থাকে।/
এবং
বজায় থাকবে সবে
কবির বিশ্বে ছোট বড় সবারি ঠাঁই হবে।/

৪১ ৪ স্তবক কবিতার অনুবাদ বিস্তারিতভাবে ৪ স্তবকেই করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ অপ্রকাশিত।

৪২ অতিরিক্ত একটি স্তবক পাণ্ডুলিপি-ধৃত, মুদ্রিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবকের অন্তর্বর্তী (পাণ্ডুলিপিতে ইহার বর্জনচিহ্নিত পূর্বপাঠও একটি আছে— তাহা উদ্ধৃত হইল না):—

এবার তোমার বাসা দেব / ফুলের দলে।
কাঁটাবনের ছায়াতলে।
দেখা দেবে প্রথম ভোরে / যখন খুসি যাবে ঝরে,
ডাক্‌বে না কেউ চোখের জলে।
আবার কখন্ চুপে চুপে / নতুন প্রাণে নতুন রূপে
আস্‌বে ফিরে নতুন ছলে।
তোমার চলা আপন মতে, / যখন চল দূরের পথে
কাছে আসার যাত্রা তোমার তারেই বলে। p. 136

৪৩ পাণ্ডুলিপি-ধৃত পাঠে অনেকগুলি অতিরিক্ত ছত্র আছে। মুদ্রিত চতুর্থ পঞ্চমের মধ্যে :—

পথ জানিনে চলাই জানি / যে খুসি দিক্ পথ ভুলায়ে।
বাঁকে বাঁকে ঘূর্ণিপাকে / যায় যদি স্রোত যা'ক্ ঘুলায়ে॥/

মুদ্রিত ষোড়শ সপ্তদশের মধ্যে :—

বৃন্দাবনের বাঁশির বাণী বাজে আমার কলরোলে
আমার ঢেউয়ে তারার ছায়ায় সন্ধ্যারতির আলো দোলে।/

মুদ্রিত বিংশ একবিংশের মধ্যে :—

বিনা কাজে আলোকছায়ায় মাল্য গেঁথে যাই চলে যাই।
তটের কাণে যখন তখন যা খুসি মোর তাই বলে যাই।/ p. 138

মুদ্রিত চতুর্বিংশ পঞ্চবিংশের মধ্যে :—

নিন্দা আমার উপলখণ্ড নিত্য মুখর পায়ে পায়ে—
স্তবের গীতি নিত্য বাজে বেলাভূমির বনচ্ছায়ে।

আমি নিলাজ আমি চপল আমি অকাম উদাসীনা,

আমি গভীর আমি প্রবল, আমি ঝড়ের রুদ্রবীণা।

আমি রাতের স্বপ্নসখী আমি প্রাতের জাগরণী।

চিরকালের সূত্রে গাঁথি ক্ষণকালের রতনমণি। /

শেষ ৪ ছত্রের পাঠ পাণ্ডুলিপিতে অন্যরূপ :—

অশ্রুহাসির রাগরাগিণীর সকল বাণীর বাহন আমি।

গানসাগরে গান সঁপে দিই, যাত্রা আমার যায় গো থামি॥ / p. 139

৪৫ পাণ্ডুলিপিতে ও মুদ্রিত গ্রন্থে বিশেষ পাঠভেদ বহু ছত্রে দেখা যায়। তদ্‌ব্যতীত, মুদ্রিত তৃতীয় স্তবকের 'যাহা ফুরাইলে দিন··· শেষ ঋণ।' ২ ছত্র পাণ্ডুলিপিতে নাই। কিছু পরে মুদ্রিত 'যা পেয়েছি··· কোথা পরিমাণ' ছত্র-দুটিও দেখা যায় না। পক্ষান্তরে চতুর্থ স্তবকের মুদ্রিত তৃতীয় চতুর্থ ছত্রের অন্তর্বর্তী পাণ্ডুলিপি-ধৃত অতিরিক্ত ২ ছত্র :—

যে আকাশে উড়েছে সে প্রসারিয়া ডানা,

কোথাও ছিল না সেথা মানা। / p. 145

৪৬ ক কবিতা লেখার পরে প্রবেশক অংশ সংক্ষেপে লিখিত, ছত্রসংখ্যা ৫৮। প্রবেশক অংশের মুদ্রিত ছত্র সংখ্যা ৮৮। পাণ্ডুলিপির এই অংশে পরিচিত / মুদ্রিত পাঠের তুলনায় বিচিত্র পাঠভেদ আছে তাহা বলাই বাহুল্য।

'৪৬' খুচরা ৬ পাতার এক পিঠে লেখা রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি, ইহাই মুদ্রিত রচনার (প্রবেশক-সহ) আদর্শ বলা যায়।

'৪৮' 'না-পাওয়া' কবিতার এই পূর্বপাঠ রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহের যে পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায় (অভিজ্ঞানসংখ্যা ১০৯) তাহা 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারী'র এক অংশ। 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়রী'র অঙ্গীভূতভাবেই উহা প্রবাসী মাসিক পত্রে (বৈশাখ ১৩৩২, পৃ ৬-৭) মুদ্রিত। পূরবীর পথিক অংশে সংকলিত কবিতা এবং এ কবিতা ভিন্ন ছন্দে লিখিত হওয়ায় বর্তমানে পূরবীর গ্রন্থপরিচয় অংশে সংকলিত।

অ ১ বর্তমান পাণ্ডুলিপির ৪৮ ও ৪৯-সংখ্যক কবিতার অন্তর্বর্তীকালে রচিত। সম্ভবতঃ সবুজপত্রে প্রকাশের জন্য রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে নকল করিয়া পাঠান আলাগা ২ খানি পাতার মোট ২ পৃষ্ঠায়। এই 'কপি' ছাপাখানায় মসীলাঞ্ছিত হয় নাই।

৫৩ Why this weary waiting for fruit, my heart?

Be content if thou hast thy flowers.

২৬-সংখ্যক রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপিতে তথা লেখনে ও Fireflies গ্রন্থে ইহার পাঠান্তর :—

The greed for fruit misses the flower. /

৫৮	বর্তমান পাণ্ডুলিপির পাঠ স্ফুলিঙ্গে সংকলিত, ইহা লেখন-ধৃত (১২২) পাঠের তুলনায় সংক্ষিপ্ত পূর্বরূপ বলা যায়।
৫৯	লেখনে (একটি লিপিপ্রমাদ গণ্য না করিলে) ও Fireflies গ্রন্থে বস্তুতঃ একই পাঠ পাওয়া যায়।
৬২	লেখনে প্রথম ছত্র : চেয়ে দেখি হোথা তব জানালায় /
৬৪	লেখনে প্রথম ছত্র : শিশির-সিক্ত বনমর্ম্মর /
৬৬	লেখনে প্রথম ছত্র : হে মহাসাগর ইত্যাদি।

পূরবীর কতক অংশের একখানি রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি আছে শিল্পী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয়ের সংগ্রহে। পূরবীর কতকগুলি পৃষ্ঠার বিভিন্ন সময়ের বা stageএর আলোকচিত্র রবীন্দ্রসদনে উপহার দিয়াছেন শ্রীমতী ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো। এ-সকলের বিবরণ পরে সংকলিত হইতে পারিবে।

কানাই সামন্ত

মহাত্মা গান্ধী। ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, মূল্য ৬·৫০
আত্মকথা। বীরেন্দ্রনাথ গুহ অনূদিত, মূল্য ১২·০০
গান্ধীরচনা সংকলন। নির্মলকুমার বসু -সংকলিত, মূল্য ৫·০০
মোহনমালা। অনাথ বসু ও সুধীর লাহা অনূদিত, মূল্য ৩·৫০
অহিংসার পথে বিশ্বশান্তি। শিশিরকুমার সান্যাল অনূদিত, মূল্য ১·০০
সত্যই ভগবান। বীরেন্দ্রনাথ গুহ অনূদিত, মূল্য ৩·০০
গীতাবোধ। ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও কুমারচন্দ্র জানা অনূদিত, মূল্য ১·৫০
আমার সমাজবাদ। অজিতকুমার বসু অনূদিত, মূল্য ১·০০
গান্ধীজীর অর্থনৈতিক দর্শন। রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মূল্য ৫·৫০
নারী ও সামাজিক অবিচার। উপেন্দ্রকুমার রায় অনূদিত, মূল্য ৪·৫০
সর্বোদয়। অমলেন্দু দাশগুপ্ত অনূদিত, মূল্য ২·৫০
সর্বোদয় ও শাসনমুক্ত সমাজ। শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মূল্য ২·৫০
সর্বোদয়ের পথ। মূল্য ৩·০০
মহাত্মাজীর গঠনকর্ম-পদ্ধতি। পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত, মূল্য ৩·০০
কর্মের সন্ধান। শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত, মূল্য ০·৭৫
উৎপাদক শ্রম। শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মূল্য ০·৬০
পল্লী-পুনর্গঠন। শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মূল্য ৩·০০
অছিবাদ। সাধনা সোম অনূদিত, মূল্য ০·৬২
পঞ্চায়েত রাজ। সাধনা সোম অনূদিত, মূল্য ০·৭৫
গান্ধী-স্মারকনিধি প্রকাশিত

'সত্য ও অহিংসা চিরন্তনী তত্ত্ব। আমি কেবল এই দুই মহাতত্ত্বকে, যত বড় ক্ষেত্র পাইয়াছি, কাজে লাগাইবার প্রয়াস করিয়াছি মাত্র। এই প্রচেষ্টায় কখনো কখনো আমি ভুল করিয়াছি— সেই ভুল হইতে আবার শিক্ষালাভ করিয়াছি। জীবন ও জীবনের যত সমস্যা আমার কাছে সত্য ও অহিংসার সাধনের পরীক্ষাক্ষেত্র বলিয়া মনে হইয়াছে।' আজকের এই মিথ্যাচালিত ও হিংসামত্ত জগতে গান্ধীজীর দুই মহাদান— সত্য ও অহিংসা চারদিকের অন্ধকারের মধ্যে দুইটি আলোর শিখার মত জ্বলছে। সত্য ও অহিংসার মন্ত্র গান্ধীজীই প্রথম প্রচার করেন নি তা সত্য, কিন্তু তিনিই এই দুইটি মন্ত্রকে আমাদের মনন, আচরণ, কর্ম ও সংগঠন প্রভৃতি ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত সকল কিছু মানসিকতা ও বাহ্যপ্রয়াসের মধ্যে মূল প্রেরণা ও উদ্দেশ্যরূপে স্থাপন করেছেন। গান্ধীজী বলেছেন, সত্যের পথ ঋজু ও ক্ষীণ এবং তা ক্ষুরের ধারের মতই তীক্ষ্ণ। অহিংসার পথও তাই। সেজন্য সত্য ও অহিংসার পথ অবলম্বন করতে হলে কঠোর

দুঃখই বরণ করতে হবে। নিরন্তর কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্য দিয়ে, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সত্যসাধককে অগ্রসর হতে হবে। অহিংসা একটি নেতিবাচক মনোবৃত্তি নয়, এ হল সর্বাত্মক প্রেম— বিরোধীকে, শত্রুকে ভালোবাসার নামই অহিংসা। এই প্রেমের মহাপ্রেরণাতেই গান্ধীজী পরাধীন ভারতের মুক্তি-আন্দোলন চালনা করেছিলেন, শোষিত ও অসাম্যপীড়িত শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের স্বাধীনতা চেয়েছিলেন, আবার বিদেশী অত্যাচারী রাজপ্রতিনিধিদের সঙ্গে বন্ধুর মত আচরণ করেছিলেন এবং স্বজাতীয় লোকেদের মতই বিজাতীয় লোকেদের ভালোবেসেছিলেন। সব দেশের সাধারণ রাজনীতিকের সঙ্গে গান্ধীজীর পার্থক্য এই যে, তিনি উদ্দেশ্য ও উপায় উভয়ের উপরেই সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর কাছে সত্য ও অহিংসা শুধুমাত্র উদ্দেশ্য নয়, উপায়ও বটে। আজকের বিশ্বরাজনীতি কূটনীতি, মিথ্যাচার ও অধর্মের দ্বারা কলুষিত, কিন্তু গান্ধীজী রাজনীতিকে পরিশোধিত, নির্মল ও ধর্মনিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছিলেন। রাজনীতি ও ধর্মনীতির যোগ সম্ভব, গান্ধীজী সারাজীবনের সাধনার মধ্য দিয়ে তা দেখিয়ে গেছেন।

আজ আমাদের চরম পরিতাপের বিষয়, গান্ধীজীর ভারত তাঁকে ভুলতে বসেছে। বুদ্ধদেবকে এমনি ভারত একদিন ভুলেছিল, সেদিন ভারতের বাইরের বহু দেশ তাঁকে আপন করে নিয়েছিল। আজও তেমনি গান্ধীজীর আদর্শ ভারত থেকে বিলুপ্তপ্রায় হলেও বহির্বিশ্বের বহু উন্নত দেশ সেই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হচ্ছে। আমরা সত্যকে ক্রুশবিদ্ধ করেছি; অহিংসা আজ উপহাসের সামগ্রী, রাজনীতি বিদ্বেষ ও হত্যার রক্তমাখা সংগ্রামে তার বিকৃত মুখ জাহির করে রয়েছে। আজ গান্ধীজীর নীতি ও আদর্শ— কে দেবে আর কেই বা নেবে! কিন্তু তবুও তো প্রয়াস ছাড়লে চলবে না, সেই প্রয়াস যত ক্ষীণ হোক চালিয়ে তো যেতেই হবে। রাজনৈতিক নেতৃবর্গ নয়, মুষ্টিমেয় প্রচারবিমুখ নিষ্ঠাবান গান্ধীভক্ত কর্মিবৃন্দ সেই প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। গান্ধীস্মারকনিধি থেকে যে-সব বই প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি গান্ধীজীর জীবনদর্শন ও কর্মনীতি সর্বসাধারণের সম্মুখে উপস্থাপন করতে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। আজকের উত্তেজিত ও উদ্‌ভ্রান্ত জনগণ যদি এ-গুলি পড়েন তবে শান্ত, স্থায়ী ও কল্যাণময় জীবনের পথ পাবেন তা বোধহয় জোর করেই বলা যায়।

গান্ধীজীর অন্যতম বিশ্বস্ত সহযোগী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের 'মহাত্মা গান্ধী' নামে জীবনী-গ্রন্থখানি কয়েক বছর আগে লেখা একখানি বহুপঠিত এবং উচ্চপ্রশংসিত গ্রন্থ। এর ভূমিকা-অংশে লেখক গান্ধীজীর নীতি ও দর্শন ব্যাখ্যা করেছেন এবং পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে তাঁর বিচিত্র কর্মবহুল জীবন বর্ণিত হয়েছে। রচনার ভাষা প্রাঞ্জল, সংযত ও গতিশীল। গান্ধীজীর আত্মজীবনী মূল গুজরাটি ও ইংরেজি থেকে বাংলায় 'আত্মকথা' নাম দিয়ে অনুবাদ করেছেন বীরেন্দ্রনাথ গুহ। সাধুভাষায় রচিত হলেও এই ভাষা বেশ সহজ ও স্বচ্ছন্দ। গান্ধীজীর নিজের কথায় তাঁর জীবনবাণী নানা প্রকারে ব্যক্ত হয়েছে। 'গান্ধীরচনা সংকলন' 'মোহনমালা' 'অহিংসার পথে বিশ্বশান্তি' প্রভৃতি সংকলন-গ্রন্থে বিভিন্ন সময়ে উচ্চারিত গান্ধীজির বহু বাণী উদ্‌ধৃত হয়েছে। 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' 'হরিজন' প্রভৃতি পত্রিকা থেকে উদ্‌ধৃতিগুলি নেওয়া হয়েছে।

গান্ধীজী গভীরভাবে ভগবদ্‌বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বলেছেন, 'এক সর্বব্যাপী অবর্ণনীয় রহস্যময় শক্তি বিদ্যমান। দেখিতে না পাইলেও তাহা আমি অনুভব করি।' এই শক্তি তাঁর দৃষ্টিতে পরম মঙ্গলময়— 'ভগবানই জীবন, সত্য ও আলোক। তিনি প্রেমময়, পরম কল্যাণবিধান।' ভগবানরূপী সত্য বা সত্যরূপী ভগবানকে পাওয়া যায় জনতার সেবার মাধ্যমে। মানুষ চেষ্টা করলে অন্তরবাণীর

মধ্যে ভগবানের কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। তাঁর মতে ধর্মের প্রাণবস্তু হল প্রার্থনা এবং আত্মশুদ্ধির মধ্য দিয়েই শুধু প্রেম ও অহিংসার শক্তি আয়ত্ত করা যায়। গান্ধীজীর ধর্মীয় চিন্তাধারার সংকলন-গ্রন্থ *Truth is God* অনুবাদ করেছেন বীরেন্দ্রনাথ গুহ 'সত্যই ভগবান' নাম দিয়ে। ধর্মজিজ্ঞাসু গান্ধীজীর সবচেয়ে প্রিয় গ্রন্থ ছিল গীতা। তিনি বলেছেন, 'আর যখনই কোনো সংকটে পড়ি তখনই সংকট হতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য গীতার নিকট ছুটে যাই এবং তার কাছে সান্ত্বনা লই। গুজরাটি ভাষায় লিখিত তাঁর 'গীতাবোধ' অনুবাদ করেছেন ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও কুমারচন্দ্র জানা।

গান্ধীজী নিজেকে একজন সমাজতন্ত্রী বলে মনে করতেন। তবে প্রচলিত সমাজতন্ত্র ও তাঁর সমাজতন্ত্রের ধারণা ঠিক এক ছিল না। তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও পরিকল্পিত উৎপাদন উভয়েই বিশ্বাসী ছিলেন। পুঁজিপতি ও জমিদারদের বিলোপ তিনি চান নি। কিন্তু অহিংসা দ্বারা তাদের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটাতে চেয়েছিলেন। আবার কলকারখানায় শ্রমিকদের অংশীদাররূপে নেবার জন্যই তিনি সুপারিশ করেছিলেন। তিনি সমাজবাদ বলতে বুঝেছিলেন সর্বমানবের উদয়। শুধু ভৌতিক উন্নতি নয়, ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের স্বাধীনতাই হল তাঁর সমাজবাদের উদ্দেশ্য। শোষণহীন ও শাসনমুক্ত যে সমাজের পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন তার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি অন্ত্যোদয়, বিকেন্দ্রিত উৎপাদন, অপরিগ্রহ ও অস্তেয়, পুঁজি ও শ্রমের সমমর্যাদা প্রভৃতির উপর জোর দিয়েছেন। গান্ধীজীর অর্থনৈতিক দর্শন চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

রাস্কিনের 'আনটু দিস লাস্ট' পড়ে গান্ধীজীর মনে সর্বোদয়ের ভাবনা জন্মলাভ করে। সর্বোদয়, অর্থাৎ বাস্তবানুগ প্রকৃত গণতন্ত্রই ছিল তাঁর আদর্শ। শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর 'সর্বোদয় ও শাসনমুক্ত সমাজ' নামক পুস্তিকায় সর্বোদয়ের আদর্শ ব্যাখ্যা করে বলেছেন, 'ভবিষ্যতের সেই আদর্শ সমাজব্যবস্থায় প্রেমই হবে পারস্পরিক সম্বন্ধের নিয়ামক। ব্যক্তিগত হিংসা বা হিংসার গোষ্ঠীগত বৈধানিক রূপ রাষ্ট্রশক্তি ও আইনকানুনের পরিবর্তে প্রেম বা অহিংসাই তখন জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রবল হ'য়ে মানবের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয় করবে। সমাজের সংহতি বিধৃত করে রাখার প্রেরক-শক্তি হবে প্রেম বা ভালবাসা।'

গান্ধীজী বলতেন, 'গঠনমূলক কাজই স্বরাজ'। তাঁর এই গঠনমূলক কাজের কেন্দ্র হল পল্লীসমাজ। এই সমাজ পুনর্গঠনের নানা পথ তিনি দেখিয়েছেন। বুনিয়াদী শিক্ষা, চরখা ও খদ্দর, কুটিরশিল্প, কায়িকশ্রম, অস্পৃশ্যতা বর্জন প্রভৃতি নানা কর্মসূচীর উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। গান্ধীজি বুঝেছিলেন ভারতের প্রাণকেন্দ্র গ্রামেই নিহিত। সেজন্য তিনি চেয়েছিলেন যে প্রত্যেকটি গ্রাম হবে পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি সাধারণতন্ত্র বা পঞ্চায়েত; অর্থাৎ প্রত্যেকটি গ্রাম আত্মনির্ভরশীল। তাঁর পরিকল্পিত আদর্শ গ্রামে নিরক্ষর ও অলস কেউ নেই, প্রত্যেকেই পুষ্টিকর খাদ্য ও বাসগৃহের অধিকারী ও পরস্পরের কল্যাণকাজে নিযুক্ত।

অজিতকুমার ঘোষ

গান্ধী। অন্নদাশংকর রায়। এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ১২। ছয় টাকা।

সম্প্রতি মহাত্মা গান্ধীর জন্মশতবার্ষিকীর একটি বছর উদ্‌যাপিত হল। কেবলমাত্র এদেশ নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেও। এই পুণ্যস্মৃতি-পর্ব উপলক্ষে বিভিন্ন ভাষায় নানা আকার-প্রকারের নানা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এ সম্পর্কে একটি পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত হয়েছিল যে, গান্ধীজী সম্পর্কে এ যাবৎ বিভিন্ন দেশে যেসকল গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে, সংখ্যায় সেগুলি নাকি ৩৬৬৪টিরও অধিক। পশ্চিমবঙ্গ গান্ধী-শতবার্ষিকী সমিতির প্রকাশন উপসমিতিও উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। বহু সংখ্যক গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন তাঁরা। আকারে সেগুলি বৃহৎ না হলেও, মহাত্মাজীর ধর্ম, কর্ম ও রাজনীতির নানাদিক উদ্ভাসিত হয়েছে উক্ত গ্রন্থগুলির মাধ্যমে।

অন্নদাশংকরের আলোচ্য গ্রন্থ 'গান্ধী' গান্ধীবাদের বিশ্লেষণধর্মী আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। সাধারণতঃ জীবনী বলতে যা বোঝায়, এ গ্রন্থ সঠিক সে পর্যায়ে পড়ে না। মোহনদাস করমচাঁদের জীবনের রাজনৈতিক ঘটনাবলী ও উক্তি সমূহের সঙ্গে, নিজের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ-পরিচয় ও চিন্তন-মননের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে, কিছুটা 'মেমোয়ার'-এর রসও নীরস বিশ্লেষণের মধ্যে উপস্থাপন করেছেন জীবনশিল্পী অন্নদাশংকর।

গান্ধীজীর মূল্যায়ন সম্পর্কে মদ্দেশীয় তথাকথিত স্বল্পসংখ্যক বিদ্বজ্জনসমাজে মতদ্বৈধের অবকাশ থাকলেও, বহুসংখ্যকের সঙ্গে সুর মিলিয়েই মহান্ আদর্শের উদ্গাতা মহাত্মাকে পুরুষোত্তম বলতে সংকোচ বোধ করেন নি গ্রন্থকার—দেখেছেন ভক্তের উদার দৃষ্টিতে। এর সমর্থনে প্রথম দিকে ২৪ পরগনার সোদপুর অঞ্চলে মহাত্মাজীর দর্শনাভিলাষী হয়ে গ্রন্থকারের যাওয়া ও তাঁকে দেখার বর্ণনাটি উল্লেখ করা যায়। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত রায় লিখেছেন, "বুদ্ধের মত পদ্মাসনে মুদিতনেত্র গান্ধী। একান্ত গম্ভীর। হয়ত বিশ্বের বেদনায় কাতর। সামনে কি আছে কে জানে! বেদীর উপরে তিনি, তলায় তাঁর পরিজন। ভজন চলছিল, কিন্তু ওতে তাঁর যোগ ছিল না। তিনি বিগ্রহের মত নিশ্চল। তবে চাদরের আড়ালে তাঁর ডান হাত নড়ছিল। অনুমানে বুঝতে পারলুম মালা গড়ান হচ্ছে। তখন তিনি কর্মযোগী নন, ভক্তিযোগী। তিনি গীতার সেই ভক্ত যার সম্বন্ধে বলা হয়েছে, অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।" এর পরেও আছে, "মহাত্মা যে উত্তুঙ্গ শিখরে উপনীত হয়েছেন, সেখানে তিনি সব মানুষের নমস্য। যেমন বুদ্ধ। যেমন যীশু।"

তাহলেও এ ভক্ত সোজা নয়! যাচাই করে নেবার পক্ষপাতী; অন্ধভক্ত নয়। তাই মহাত্মার পদরজ-সংগ্রহ করা তাঁর অনুমোদন পায় না। তিনি বলেন, এতে মানবাত্মার অবমাননা। অকপটে এমন অনেক আত্মসচেতন বলিষ্ঠতার কথাও আছে গ্রন্থখানির মধ্যে যা বিদগ্ধ মানুষকে খুশি করবে, নিরীশ্বরবাদীকে চিন্তান্বিত করে তুলবে।

গ্রন্থের একটি বিস্তৃত অংশ জুড়ে আছে দেশ-বিভাগ ও হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা। দেশ বিভক্ত হওয়া নিয়ে যে 'বীভৎস, নৃশংস হত্যা, লুণ্ঠন ও ব্যাভিচার' প্রভৃতি শব্দগুলি যথেচ্ছ ব্যবহৃত হয়েছিল বলা যায়, আজও যার ব্যথা-বেদনা অবস্থিত আছে, যার ধূমায়িত বহ্নি আজও হল্‌কার মত মাঝে মাঝে এদেশে-ওদেশে ছড়িয়ে পড়ছে, সেই পার্টিশনে মহাত্মাজীর ভূমিকা যে কী ছিল তা অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ব্যাখ্যাত হয়েছে এই অংশে। শান্তির পূজারী গান্ধীজী যা চান নি, সেই

নারকীয়, মর্মভেদী দৃশ্য তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে। কিন্তু তাতেও এই মহামানব ভেঙে পড়েন নি, বারংবার ঢুকেছেন 'ইন্‌ফারনো'র মধ্যে, শান্তিস্থাপনের সাধনায় নিয়োগ করেছেন নিজেকে।

এই সময় মাউন্টব্যাটেন নামক উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজ-প্রতিনিধি মহাত্মাজীকে কিভাবে পাশ কাটিয়ে কংগ্রেস ও লীগের দলপতিদের সঙ্গে ফয়সালায় বসে সিদ্ধকাম হয়েছিলেন, সে আলোচনাগুলিও খুব কৌতূহলোদ্দীপক। পার্টিশনে মহাত্মাজী সায় দেন নি বলে শেষ বড়োলাট এই মাউন্টব্যাটেনের যে আশঙ্কা ছিল, তা তিনি ওয়াভেলকে সরিয়ে, তৎকালীন বৃটীশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলীর সহায়তায় কিভাবে অতিক্রম করেছিলেন, সেই কাহিনী যেমন ইতিহাসভিত্তিক, তেমনি ইংরেজের 'ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল'এর সার্থক অভিব্যক্তি।

মাউন্টব্যাটেন মহাত্মাজীকে বাদ দিয়ে ভারতের বুকে এই ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটালেও, মহাত্মাজীর উপর তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অবিচলিত। সাম্প্রতিককালে গান্ধী-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে রচিত তাঁর একটি প্রবন্ধ থেকে সে কথা উপলব্ধি করা যায়। এই বিস্তৃত নিবন্ধের একস্থানে তিনি যা বলেছেন তার বাংলা অনুবাদ হল, "কোন রকম অতিরঞ্জন না-করেও আমি বলতে পারি যে, ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে কলকাতার ময়দানে গান্ধীজীর অলোকিক উপস্থিতি এ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ঘটনাগুলির অন্যতম। মনোবিজ্ঞান নিয়ে যাঁরা পর্যালোচনা করেন, তাঁদের কাছে এটা একটা বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনা। যে শত-সহস্র মানুষ উন্মুক্ত ছুরি নিয়ে রক্তপাত ও প্রতিশোধ গ্রহণের মধ্যে দিয়ে আপন-আপন আবেগোন্মত্ততাকে মুক্ত করতে উদ্যত হয়েছিল, তারা গান্ধীজীর ভালবাসায় আবার তাদের অন্তরের অভ্যন্তরস্থিত ভ্রাতৃত্ববোধকে ফিরে পেয়েছিল।…এই ঘটনা মহাত্মা হিসাবে তাঁর শক্তির বাহ্য-প্রকাশের একটা উদাহরণ এবং এটি সাধারণ রাজনৈতিক কর্তৃত্বের চেয়ে অনেক উর্ধ্বের বস্তু।"

স্বাধীনতা প্রসঙ্গে দেশ-বিভাগের সমকালীন অবস্থার উপর লেখক অধিকতর গুরুত্ব দিলেও, বাপুজীর নীতি ও আদর্শের কথা, রাজনৈতিক ঘটনাবলীতে তাঁর প্রতিক্রিয়া, সেকুলার স্টেটের কথা, সংখ্যালঘুদের কথা, জিন্নার কথা, সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মতান্তরের কথা এসেছে প্রসঙ্গান্তরে। এর মধ্যে ভারতীয় কংগ্রেসের নানা বিষয়ও যে অনিবার্য ভাবে বর্ণিত হবে, আলোচিত হবে, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তা হলেও, লেখকের দৃষ্টিতে সে বলা নিরপেক্ষ দ্রষ্টার বলা। সে দৃষ্টি স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ; তার মধ্যে অমূলপ্রত্যক্ষ নেই। সেখানে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে দেশজ স্বার্থান্ধ মানুষ কি ভাবে জাতীয় আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করেছে—জাতীয়তাবাদকে বিসর্জন দিয়ে সাম্প্রদায়িকতাবাদের মিনার গড়ে তুলেছে; নিঃস্ব জনগণের চিন্তাকে জলাঞ্জলি দিয়ে এক শ্রেণীর পুঁজিপতি আরও স্ফীত করেছে নিজেদের। স্থানবিশেষে এইসব সত্য ভূয়োদর্শনের কথা যেমন ব্যক্ত হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে, তেমনি দলবেঁধে এসেছে প্রচুর কাহিনী-চিত্র গান্ধী-চরিত্র বিশ্লেষণের পরিপূরক হিসাবে। এই কাহিনীগুলি হীরকখণ্ডের ঔজ্জ্বল্যের মত বইয়ের পাতা ঢাকা পড়লেও মনের পাতায় জ্বলজ্বল করে।

অন্নদাশংকর বলেছেন, "ওয়ার্ডসওয়ার্থের জীবনে যেমন ফরাসী বিপ্লব, গান্ধীজীর জীবনে তেমনি অসহযোগ আন্দোলন।" কথাটির সত্যতা অবশ্যই স্বীকার্য। উভয়ের গুরুত্ব ঠিক সমপর্যায়ভুক্ত না হলেও, গান্ধীজীর আন্দোলনের কার্যপ্রণালী সমগ্র জাতির জীবনে যে রোমাঞ্চ এনেছিল, উন্মাদনা এনেছিল, তা যেমন ছিল ফলপ্রসূ, তেমনি নিরস্ত্র জাতির পক্ষে অমোঘ অস্ত্র স্বরূপ। এ ছাড়া এর মধ্যে ছিল বিদেশী বর্জনের সঙ্গে

দেশকে স্বাবলম্বী করে তোলার পথ, গঠনের পথ—এসেছিল খাদি, চরকা, তকলি প্রভৃতি বস্তুসমূহ। আপাতদৃষ্টিতে এগুলি অকিঞ্চিৎকর মনে হলেও, সুদূরপ্রসারী শক্তিসম্পন্ন ছিল এরা।

এই 'অসহযোগ' ও 'বর্জন' প্রসঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কি মত পোষণ করতেন সে সম্বন্ধেও বিশদ আলোচনা আছে গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে। কবির ইচ্ছা ছিল 'বর্জন' কথাটিকে আদৌ আমল না দিয়ে 'গঠন' কথাটিকে প্রাধান্য দেওয়া। শেষের দিকে গান্ধীজী অবশ্য দুটিকেই সমান মর্যাদা দিয়েছিলেন।

মূলতঃ পঁচিশটি অধ্যায়ে সমূহ গ্রন্থখানি সমাপ্ত হয়েছে এবং যে স্বাধীনতার সূত্রপাত থেকে গ্রন্থের সমারম্ভ হয়েছিল, গ্রন্থকার বিলক্ষণ বুদ্ধির কৌশলে সেই স্বাধীনতার উত্তর-পর্বে এসে, যেখানে তাঁর অনুগামীদের মধ্যেই কিছুসংখ্যক তাঁর প্রয়োজনীয়তায় সন্দিহান হয়ে উঠেছিল, সেখানেই তাঁর পরিনির্বাণের সঙ্গে গ্রন্থের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। গান্ধী-জীবননাট্যের এই শেষ মহা-ট্রাজেডী শিল্পীর চোখে সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে।

এর পর এই গ্রন্থের উপরি-পাওনা হিসাবে আমরা পেয়েছি একটি পরিশিষ্ট অংশ। এই অংশে সন্নিবিষ্ট হয়েছে মহাত্মাজীর আদর্শ সম্পর্কে সোচ্চারিত পাঁচটি মূল্যবান নিবন্ধ। এই নিবন্ধগুলির নাম যথাক্রমে—গান্ধীত্ব, ক্ষুরধার পন্থা, দ্বান্দ্বিক আদর্শবাদ, মহাকাব্যের নায়ক ও অগ্নিপরীক্ষা। এগুলির মধ্যে আছে গান্ধীবাদের আলোচনা ও তাঁর সত্য-ন্যায়-নীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষার নির্যাস। আকারে এগুলি ক্ষুদ্র হলেও বৃহৎ চিন্তার ধারক এবং মানব-চেতনায় গান্ধীবাদের সর্বাঙ্গীণ দিক সমঝানোর পক্ষে বিশেষ সহায়ক।

যদিও মহাত্মাজী নিজেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পরিণতিকে 'গ্লোরিয়াস স্ট্রাগলের ইনগ্লোরিয়াস এণ্ডিং' বলেছিলেন, কিন্তু এই গ্রন্থরচনায় অন্নদাশংকর যে ব্যক্তিত্ব সংযম ও অপক্ষপাত ঐতিহাসিকের পরিচয় দিয়েছেন, তাতে তাঁর এই প্রচেষ্টাকে আমরা অবশ্যই গ্লোরিয়াস স্ট্রাগলের গ্লোরিয়াস এণ্ডিং-ই বলব।

বিশু মুখোপাধ্যায়

বেদ গ্রন্থমালা। প্রথম খণ্ড। সম্পাদক শ্রীপরিতোষ ঠাকুর ও শ্রীঅমরকুমার চট্টোপাধ্যায়। প্রাপ্তিস্থান সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ বিধান সরণী, কলকাতা ৩। মূল্য তিন টাকা

বেদ-পরিচয়। সত্যবান। প্রকাশিকা অমিতা দেবী, ৭৮।২।১১ বীরেন রায় রোড, কলিকাতা ৩৪। মূল্য পাঁচ টাকা

তন্ত্র-পরিচয়। সত্যবান। প্রকাশক লিপিকা, ৩০।১ কলেজ রো, কলকাতা ৯। মূল্য সাত টাকা

বহুদিন থেকেই বেদত্রয়ী (অর্থাৎ ঋক্‌ যজু ও সাম) ও অথর্ব বেদ নিয়ে বহু গবেষণার সূত্রপাত করেছেন ইউরোপীয় ও আমেরিকান সংস্কৃতজ্ঞ মনীষীরা ও এ দেশের পণ্ডিতসমাজ। পুরাকালে আমাদের দেশে প্রকৃত বিদ্যাচর্চা ছিল গুরুমুখী ও আত্মজ্ঞান উদ্দীপনেই তার মীমাংসা হত। যে কোনোদিক দিয়েই এই সাহিত্যের বা চিন্তাধারার বিচার করি-না কেন, ব্যবহৃত মন্ত্র বা বাক্যগুলির একটি সুষ্ঠু পরিচয় পেতে হলে তার প্রকৃত অর্থ জানা চাই, অর্থাৎ পদবিভাগ, অন্বয়, অনুবাদ ও শব্দার্থ ব্যাখ্যা। এরূপ ব্যাখ্যার কাজে

আত্মনিয়োগ ক'রে সম্পাদকদ্বয় সকলের ধন্যবাদার্হ হলেন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম সূক্ত নিয়েই তাঁদের যাত্রা শুভ হোক্— কিন্তু শুধু বুদ্ধির কসরত বা কথার কারিকুরি বা ব্যাখ্যার চাকচিক্যেই বেদার্থ পরিস্ফুট হয় না, সঙ্গে চাই একটু বোধির দীপ্তি। ধরা যাক্, অগ্নিমীলে পুরোহিতং হোতারং রত্নধাতমম্ এই অতি সুবিখ্যাত মন্ত্রটির হোতারং কথাটি যদি সম্যক্ অনুধাবন করি, তাহলে দেখি যাস্ক সায়ন প্রভৃতির ব্যাখ্যা প্রায় সমধর্মী হলেও কিছুটা বিভিন্ন, যেমন যাস্কের মতে হোতা শব্দের অর্থ আহ্বানকারী— হ্বি ধাতু হতে উৎপন্ন। সায়ান বললেন— হোতৃ হ্বয়তি ধাতু থেকে উৎপন্ন— অগ্নি এসেই যজ্ঞ নির্বাহ করেন। সম্পাদকদ্বয় একটি বৈদিক শব্দকোষও পরিশিষ্টে দিয়েছেন, এতে সাধারণ পাঠক-পাঠিকারা উপকৃত হবেন। তাঁদের উদ্যম প্রশংসনীয়।

বেদ মানেই জানা— সত্যিকারের জানা— কোনো বাইরের অধ্যাত্ম আকাশের মেঘলীন কুয়াশার ধোঁয়া নয়— একটা জ্যোতির্ময় উন্মেষ, একটা প্রকাশময় স্বীকৃতি, একটা প্রেরণাময় সন্ধানের ইতিহাস। লেখক সত্যবান এই সংস্কৃতিবান পরিচয়কে সহজ সরল ভাষায় গল্পে গাথায় কথায় কাহিনীতে ও নানা উপমার মাধ্যমে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। তাই তাঁর বেদ-পরিচয়ে পাই পহ্লব সৈন্যের কথা, বরুণমিত্রের কাহিনী, জৈনধর্মের মূল তথ্য, গীতার তত্ত্ব, বর্ণাশ্রমের রহস্য। ফলে এই পুস্তকটির নামকরণ আক্ষরিক ভাবে সমীচীন হলেও আনুষ্ঠানিক ভাবে সুষ্ঠু কিনা তার বিচার সংশয়াতীত নয়। মন্ত্র আর ব্রাহ্মণ নিয়ে যেমন বেদ, বেদ আর বেদাঙ্গ নিয়ে বৈদিক সাহিত্য। একটি শ্রুতি আর-একটি স্মৃতি এবং এই বিরাট্ সাহিত্যের নানা শাখাভেদ। শোনা যায় সামবেদেরই হাজার শাখা 'সহস্রবর্ত্মা সামবেদঃ'।

আলোচ্য তৃতীয় গ্রন্থ তন্ত্র-পরিচয়। এই গ্রন্থে লেখক নানা প্রসঙ্গের বিচার করেছেন। আলোচনা-গুলি খণ্ড ও বিক্ষিপ্ত হলেও তন্ত্রের আলোকে এক ঐক্যের সূত্রে বেঁধে দিয়ে লেখক তার একটি সামগ্রিক পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মূল তত্ত্বটির আর-একটু ব্যাপক ও ইতিহাসসম্মত বিবর্তনের আলোচনা হলে পুস্তকটি আরও লোভনীয় হত।

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

শিবনাথ শাস্ত্রী। সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। ২১১ বিধান সরণি, কলিকাতা ৬। মূল্য ·৭৫ পয়সা।

শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোকগমনের পর সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী তাঁর জীবনালেখ্য তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করেন। সেই জীবনালেখ্য শেষ হয় নি, কিন্তু অপ্রকাশিত অংশ আর কোথাও পাওয়া যায় নি। তাতে প্রাপ্ত রচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার অসুবিধা হয় নি। কারণ এই জীবনালেখ্য শাস্ত্রীমহাশয়ের অসাধারণ চরিত্রের অসামান্য গুণের স্মৃতিকথা মাত্র— কোনো ধারাবাহিক ঘটনাধারার বর্ণনা নয়। শাস্ত্রীমহাশয়ের ত্যাগ, সততা, ঔদার্য, ধর্মচেতনা, কর্তব্যপরায়ণতা, ধর্মসাধনা প্রভৃতি মহাপুরুষ-সুলভ গুণ তাঁর সহচর সতীশ চক্রবর্তী মহাশয়ের মনে যে স্থায়ী রেখাঙ্কন করেছিল, যা শুধু ব্যক্তিগত শ্রদ্ধাজাত গুণগ্রাহিতার ফল নয়— যে গুণ সর্বমানবিক আদর্শের অনুসরণীয় বর্তমান বইতে সেগুলি অতি

উজ্জ্বলরূপে আঁকা হয়েছে। পিতার সঙ্গে পুত্রের আদর্শের মিল ছিল না, কিন্তু চরিত্রের মিল ছিল। ব্রাহ্মণের ত্যাগ এবং ক্ষত্রিয়ের বীরত্ব দুয়েরই অপূর্ব সমন্বয় ছিল শাস্ত্রীমহাশয়ের মধ্যে।

শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে নিবন্ধ রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ রজনীকান্ত গুহ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং অমৃতলাল গুপ্ত। প্রবাসীর ১৩২৬এর অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যা থেকে সেই রচনাগুলি এই পুস্তিকার পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন তাঁর মানববৎসলতার কথা, রজনীকান্ত উল্লেখ করেছেন ধর্মজীবন ও কয়েকটি মধুর ব্যক্তিস্বভাবের কথা, রামানন্দ উল্লেখ করেছেন ত্যাগ নিষ্ঠা ও শ্রমের কথা, অমৃতলাল উল্লেখ করেছেন ত্যাগ ও নির্ভীকতার কথা। শাস্ত্রী মহাশয়ের চরিত্র-ব্যাখ্যায় সকলেই একমত। সে চরিত্র যতই ধ্যান করা যায় ততই আত্মোন্নয়ন ঘটে।

ভবতোষ দত্ত

সংশোধন

বিশ্বভারতী পত্রিকা। সূচীপত্র : বর্ষ ১ - বর্ষ ২৫। শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৬

পৃ ১৩০ ভবতোষ দত্ত :২ কর্তৃক রচিত রূপে উল্লিখিত
'সমরান্তিক শিল্পবিবর্তন' প্রবন্ধটি ভবতোষ দত্ত :১ কর্তৃক রচিত।
পৃ ১৫৩ সুদর্শন চক্রবর্তী স্থলে সুদর্শন চক্রবর্তী (কানাই সামন্ত)

নৃত্যনাট্য 'মায়ার খেলা'র গান

হায় হতভাগিনী,
স্রোতে বৃথা গেল ভেসে—
কূলে তরী লাগে নি, লাগে নি ॥
কাটালি বেলা বীণাতে সুর বেঁধে, কঠিন টানে উঠল কেঁদে,
ছিন্ন তারে থেমে গেল যে রাগিণী ॥
এই পথের ধারে এসে
ডেকে গেছে তোরে সে।
ফিরায়ে দিলি তারে রুদ্ধদ্বারে—
বুক জ্বলে গেল গো, ক্ষমা তবুও কেন মাগি নি ॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

II জ্ঞা -মা । মা -া মা -জ্ঞা I জ্ঞা -ঋা । ঋা -া সা -া I
হা য়্ হ ০ ত ০ ভা ০ গি ০ নী ০

I -া -া । -া -া -া -া I সা -া । সা -দা দা -া I
০ ০ ০ ০ ০ ০ স্রো ০ তে ০ বৃ ০

I দা -া । দা -পা পা -া I পা -মা । পা -া -দা -া I
থা ০ গে ০ ল ০ ভে ০ সে ০ ০ ০

I পা -া । পা -মা মা -া I মা -া । মা -া মা -পা I
কূ ০ লে ০ ত ০ রী ০ লা ০ গে ০

I মা -ণা । ণপা -ণা ণদা -পা I মজ্ঞা -া । রা -জ্ঞা -মা -পদা I
নি ০ লা০ ০ গে ০ নি০ ০ হা ০ ০ ০য়্

I মা -পা । মা -জ্ঞা মা -জ্ঞা I জ্ঞা -ঋা । ঋা -া সা -া I
হা য়্ হ ০ ত ০ ভা ০ গি • নী ০

I { মা -দা । দা -া দা -ণা I ণা -া । র্সা -া সা -া I
কা ০ টা • লি ০ বে ০ লা ০ বী ০

I সা -মা । মা -া মা -া I মা -া । মা -া -া -া I
ণা ০ তে ০ সু র্ বেঁ ০ ধে ০ ০ ০

I মদা -া । দা -া ণা -র্সা I র্সা -র্জ্ঞা । -া -া -া -র্ঋা I
ক০ ০ ঠি ন্ টা ০ নে • ০ ০ ০ ০

I র্ঋা -া । র্ঋা -র্সা না -া I র্সা -া । -া -া -া -া } I
উ ঠ ল ০ কেঁ ০ দে ০ ০ ০ ০ ০

I র্সা -র্জ্ঞা । র্জ্ঞা -র্ঋা র্ঋা -র্সা I র্সা -া । র্সর্ঋা -া র্সা -া I
ছি ন্ ন ০ তা ০ রে ০ থে০ ০ মে ০

I র্সা -র্ঋা । র্ঋা -র্সা ণা -া I দণা -া । [ণ]দা -া পা -দা I
গে ০ ল • যে • রা০ ০ গি ০ নী ০

I মা -পা । -জ্ঞা -া জ্ঞা -া I মা -া । মা -া মা -জ্ঞা I
হা • ০ য়্ হা য়্ হ ০ ত ০ ভা ০

I জ্ঞা -ঋা । ঋা -া -সা -া I { সা -মা । মা -া মা -া I
গি ০ নী ০ ০ ০ এ ই প ০ থে র্

I মা -া । মা -া মা -পা I মা -া । -দা -া [দ]পা -া I
ধা ০ রে ০ এ ০ সে ০ ০ • ডে •

I মা -া । জ্ঞা -রা জ্ঞা -া I -া -া । -মপা -দা ᵈপা -া I
কে ॰ গে ॰ ছে ॰ ॰ ॰ ॰॰ ॰ ডে ॰

I মা -া । জ্ঞা -রা জ্ঞা -মা I জ্ঞা -া । ঋা -া সা -া } I
কে ॰ গে ॰ ছে ॰ তো ॰ রে ॰ সে ॰

I -া -া । -া -া -া -া I মদা -া । দা -া ণা -া I
॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ফি॰ ॰ রা ॰ য়ে ॰

I র্সা -া । র্সা -ঋা ণা -া I র্সা -া । -া -া -া -া I
দি ॰ লি ॰ তা ॰ রে ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

I সা -মা । মা -া মা -া I মা -া । -া -া -া -া I
রু দ্ ধ ॰ দ্বা ॰ রে ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

I মা -দা । দা -া ণা -া I র্সা -জ্ঞা । জ্ঞা -ঋা ঋা -র্সা I
বু ক্ জ ॰ লে ॰ গে ॰ ল ॰ গো ॰

I র্সা -ঋা । র্সা -া র্সা -ঋা I র্সা -া । ণা -া ণা -া I
ক্ষ ॰ মা ॰ ত ॰ বু ॰ ও ॰ কে ॰

I ণা -া । ণপা -ণা দা -া I পা -দা । মা -পা -জ্ঞা -া I
ন ॰ মা॰ ॰ গি ॰ নি ॰ হা ॰ ॰ য়্

I মা -া । মা -া মা -জ্ঞা I জ্ঞা -ঋা । ঋা -া সা -া II II
হা য়্ হ ॰ ত ॰ ভা ॰ গি ॰ নী ॰

বিশ্বভারতী পত্রিকা

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

১. প্রকাশের স্থান : ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

২. প্রকাশের সময়-ব্যবধান : ত্রৈমাসিক

৩. মুদ্রক : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায় (ভারতীয়)
৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা ৯

৪. প্রকাশক : শ্রীসুশীল রায় (ভারতীয়)
৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

৫ সম্পাদক : শ্রীসুশীল রায় (ভারতীয়)
৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

৬. স্বত্বাধিকারী : বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
পো : শান্তিনিকেতন। বীরভূম। পশ্চিমবঙ্গ

আমি, শ্রীসুশীল রায়, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উল্লিখিত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী সত্য।

১ মার্চ ১৯৬৯ স্বা: সুশীল রায়
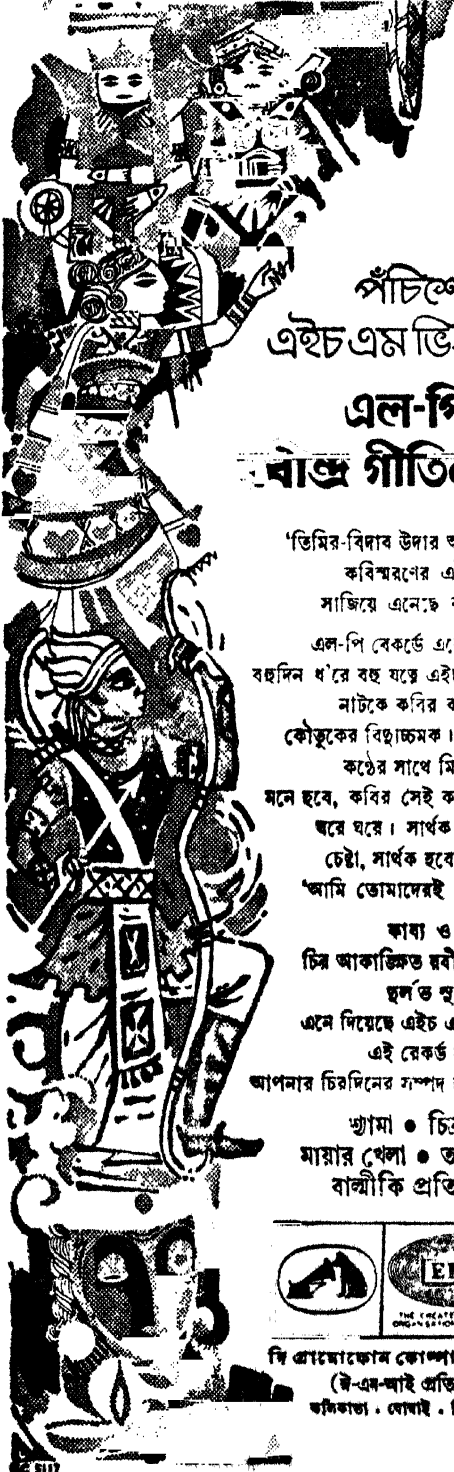
পঁচিশে বৈশাখে
এইচ এম ভি-র নিবেদন—
এল-পি রেকর্ডে
রবীন্দ্র গীতিনাট্য সংকলন
'তিমির-বিদাব উদার অভ্যুদয়ে' চিহ্নিত পঁচিশে বৈশাখ।
কবিস্মরণের এই পুণ্যদিনে এইচ এম ভি
সাজিয়ে এনেছে কবির গীতিনাট্যের সংকলন।
এল-পি রেকর্ডে একের পর এক নতুন সংযোজনে,
বহুদিন ধ'রে বহু যত্নে এইচ এম ভি-র এই অর্ঘ্য রচনা। প্রতিটি
নাটকে কবির কল্পলোকের আনন্দ-বেদনা-
কৌতুকের বিদ্যুচ্চমক। প্রতিটি রেকর্ডে কৃতী শিল্পীদের
কণ্ঠের সাথে মিলেছে কবি-মনের মাধুরী।
মনে হবে, কবির সেই কল্পলোকের ছোঁয়া লেগেছে আমাদের
ঘরে ঘরে। সার্থক হবে এইচ এম ভি-র নিরলস
চেষ্টা, সার্থক হবে কবির অন্তরের আকূতি—
'আমি তোমাদেরই লোক, আর কিছু নয়—'।
কাব্য ও গীতিসুষমায় গড়া,
চির আকাঙ্ক্ষিত রবীন্দ্রনাট্যাবলী ইচ্ছেমত শোনার
দুর্লভ সুযোগ হাতের কাছে
এনে দিয়েছে এইচ এম ভি। কবিগুরুর গীতিনাট্যের
এই রেকর্ড সংকলন ঘরে রাখুন—
আপনার চিরদিনের সম্পদ হয়ে থাকবে। এই সংকলনে পাবেন:
শ্যামা • চিত্রাঙ্গদা • চণ্ডালিকা
মায়ার খেলা • তাসের দেশ • শাপমোচন
বাল্মীকি প্রতিভা • চিরকুমার সভা
EMI
দি গ্রামোফোন কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড
(ই-এম-আই প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি)
কলিকাতা . বোম্বাই . দিল্লী . মাদ্রাজ . গৌহাটি

বর্ষ ২৬ · সংখ্যা ৩

মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬

বিশ্বভারতী

শান্তিনিকেতন

সম্পাদক

শ্রীসুশীল রায়

UCO-7/70
Take advantage of UCOBANK'S Financial Assistance Schemes to Agriculture, Small-Scale Industries, Self-Employed Artisans and Technicians, Transport Operators and Small Businessmen.
For details contact the nearest Branch of the Bank.
UNITED COMMERCIAL BANK
HEAD OFFICE : CALCUTTA
CUSTODIAN : R. B. SHAH

॥ প্রকাশিত হল ॥

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যে শিল্পে সংস্কৃতিতে লোকযাত্রায় বিচিত্রকর্মা অগ্রণী ছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রথম পরিচয় নাট্যকাররূপে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-রচিত মৌলিক নাটকের সংখ্যা কম নয়। এইসব নাটক একত্র প্রকাশিত হল।

মূল্য ১৪.০০ : শোভন ১৬.০০

প্রমথ চৌধুরী

গল্পসংগ্রহ

প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে তাঁর 'গল্পসংগ্রহ' গ্রন্থের নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এই সংস্করণে আরও আটটি গল্প সংকলন করা সম্ভব হয়েছে। গল্পগুলির সাময়িক পত্রে প্রকাশের তারিখ উল্লিখিত হয়েছে। লেখকের আলোকচিত্র সংবলিত।

মূল্য ১০.০০ : শোভন সংস্করণ ১২.০০ টাকা

প্রবন্ধসংগ্রহ

বর্তমান মুদ্রণে ইতিপূর্বে প্রবন্ধসংগ্রহের দুই খণ্ডে সংকলিত পঞ্চাশটি প্রবন্ধ একত্র প্রকাশিত হল।

মূল্য ১৬.০০ : শোভন সংস্করণ ১৮.০০ টাকা

বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা-৭

বিদ্যোদয়ের বই

শ্রীমন্তকুমার জানার

রবীন্দ্র মনন ৮.০০

মোহিতলাল মজুমদারের

সাহিত্য-বিচার ৮.৫০

কবি শ্রীমধুসূদন ১০.৫০

বাংলার নবযুগ ৮.০০

সাহিত্য-বিতান ৯.৫০

বঙ্কিম-বরণ ৬.৫০

খগেন্দ্রনাথ মিত্রের

শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য ১০.০০

ডঃ বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্যের

সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা ৯.০০

ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্যের

নাট্যতত্ত্বমীমাংসা ১৩.০০

অনন্ত সিংহের

অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম : প্রথম খণ্ড ১১.০০

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বিপ্লবের সন্ধানে ১৩.০০

ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের

পথিকৃৎ রামেন্দ্রসুন্দর ৮.০০

ভুজঙ্গভূষণ ভট্টাচার্যের

রবীন্দ্র শিক্ষা-দর্শন ১০.০০

শান্তিরঞ্জন সেনগুপ্তের

অলিম্পিকের ইতিকথা ২৫.০০

কানাই সামন্তের

চিত্রদর্শন ২৫.০০

সংকলন

বিজ্ঞানী ঋষি জগদীশচন্দ্র ৬.০০

সুপ্রকাশ রায়ের

ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম : প্রথম খণ্ড ১৬.০০

অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ৩.৫০

সুপ্রকাশ রায়ের

ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস : প্রথম খণ্ড [যন্ত্রস্থ]

মোহিতলাল মজুমদারের

শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র [যন্ত্রস্থ]

খগেন্দ্রনাথ সে র

মধু-স্মৃতি [যন্ত্রস্থ]

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা ৯

ফোন : ৩৪-৩১৫৭

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৬ সংখ্যা ৩ · মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬ · ১৮৯১-৯২ শক

সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

মূল্য দেড় টাকা

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৬ সংখ্যা ৩ · মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬ · ১৮৯১-৯২ শক

চিঠিপত্র জগদানন্দ রায়কে লিখিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[কলিকাতা]

ওঁ

সবিনয় নমস্কার

আমার উপর দিয়াই কি সব ঝড় যাইবে? এবারে চালটা যাহাতে একটু বিশেষ মজবুৎ হয় তাই চেষ্টা করিয়ো। বিদ্যালয়ের দোতলা ঘরটা জাল দিয়া আচ্ছন্ন বলিয়া বোধহয় ঝড়ের বেগে তাহার চালের ক্ষতি হয় নাই। ইঁদারা ত্রিশ হাত পর্য্যন্তই খতম করিয়া দিয়ো। তোমাদের ওখানে যখন এঞ্জিন আদি আসিবে তখন কারখানার কাজে জলের দরকার হইবে— সে সমস্ত সামলাইতে পারিবে ত? সন্তোষের প্রেরিত একটী কেমিষ্ট্রির চটি বই পাঠাই।

মীরা ও বেলা কাল হইতে ভাল আছে। এখনও বল পাইতে বিলম্ব হইবে। ইতি ২৩শে জ্যৈষ্ঠ [১৩১৫]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

ওঁ

সবিনয় নমস্কার—

Geography এবং Mechanics সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য তোমরা অধ্যাপকদের মধ্যে একবার স্থির করে রেখো তার পরে আমি কলকাতায় গিয়ে তোমাকে ডেকে পাঠাব। আমার কলকাতায় যাওয়ার খবর পেলেই তুমি এ কথাটা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ো অথবা নিজেই এসো।

দিনু বিদ্যালয়ের ব্যয় বাহুল্য সম্বন্ধে আশঙ্কা জানিয়েছেন। একবার এ সম্বন্ধে তোমাদের বিশেষভাবে সকলে আলোচনা করে দেখা উচিত। কারণ, আয় ব্যয়ের সামঞ্জস্য যদি এত ছাত্রবৃদ্ধিতেও না হয় তা হলে কিছুতেই হবে না— এবং তা হলে বুঝতে হবে এ বিদ্যালয় কোনোদিন নিজের জোরে টিঁকতে পারবে না— আমাদের আশ্রিত হয়ে থাকবে। আমরাও ত চিরস্থায়ী নই— সেই কথা স্মরণ করে বিদ্যালয়টি কি উপায় করলে নিজের আয়ের প্রতি নির্ভর করেই নিজেকে রক্ষা করতে পারে তোমরা তৎসম্বন্ধে বিচার কোরো না। যতদিন কোনো পক্ষের কাছ থেকে সাহায্যপ্রাপ্তি ও অভাব পূরণের প্রত্যাশা মনের ভিতরে রাখবে ততদিন কোনো মতেই বিদ্যালয়ের যথার্থ স্থায়ী মঙ্গল হবেই না। অতএব এ সম্বন্ধে তুমি, ক্ষিতিমোহন, অজিত, দিনু, সত্যেশ্বর এবং বঙ্কিম একবার একটা কমিটিতে বসে ভাল করে চিন্তা করে

দেখ— তোমাদের মধ্যে জ্ঞানবাবুকেও নিতে পার— কিন্তু তাই বলে বিদ্যালয়ে নূতন পুরাতন ছোট বড় যে কেউ আছেন সকলকে নিয়ে একটা মহতী সভা ডেকো না— তাতে কোনো ফল হয় না। এটা একটা গুরুতর বিষয় এবং তোমরাই এই তরণীর কর্ণধার— একবার ভাল করে চিন্তা করে দেখ— এক দিনেই কথাটাকে শেষ না করে উপরি উপরি দুই তিন দিন মিলিত হয়ে কাগজপত্র আয় ব্যয় দেখে একটু বিশেষ বিবেচনা করে সৎপন্থা উদ্‌ভাবনের চেষ্টা কোরো। ইতি— ৩রা শ্রাবণ ১৩১৬

ভবদীয়

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

৩

[শিলাইদহ]

ওঁ

সবিনয় নমস্কার

নিম্ন ঠিকানায় নিয়মাবলী সত্বর পাঠাইবে :—

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়

শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র রায় মহাশয়ের বাটি

কাশ্যপপাড়া

শান্তিপুর, নদিয়া।

ইতি ৪ঠা আষাঢ় ১৩১৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪

ওঁ

শিলাইদা

বিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

নেপালী ছেলে দুটিকে নিশ্চয়ই লইবে। আমার বড় ইচ্ছা শুভকৃষ্ণের প্রস্তাবিত সেই মান্দ্রাজি ছেলে দুটিকেও লওয়া হয়। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন দেশের ছেলে একত্র হইলে যথার্থই সমস্ত ভারতবর্ষে আমাদের আশ্রমের বিস্তার হইবে এবং আশ্রমবাসী সকলেরও উপকার হইতে পারিবে— এজন্য যদি কিঞ্চিৎ আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতেও হয় তাহাতে কুণ্ঠিত হওয়া উচিত হয় না।

নগেন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক একজন আমেরিকায় Dairy Farming শেখা যুবক এখানে আসিয়াছিলেন। তাঁহার অল্প কিছু Capitalও আছে। আমাদের বিদ্যালয়ের Dairyর সঙ্গে যোগ দিয়া একটা কম্পানি খুলিবার জন্য আমি তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়াছি। তাঁহার ইচ্ছা এই সঙ্গে ওখানে জমি লইয়া গোরুর খাদ্য ও Vegetable farming করেন। এত প্রচুর Manure হয় যে বিদ্যালয়ের ছেলেদের জন্য ওখানে শাক সবজি উৎপন্ন করা অসম্ভব নয় ইঁদারা খুঁড়িয়া এঞ্জিন যোগে পাম্প চালাইলে irrigation হইতে পারিবে এবং ময়দা ভাঙিয়া ভুষি ও তেল করিয়া খোল প্রস্তুত করাও ঐ একই কলে হইতে পারিবে। গোরুর খোরাকি বাঁচাইতে পারিলেই dairy সম্বন্ধে অনেক দুশ্চিন্তা দূর হইবে। ইনি শীঘ্রই বোলপুরে

যাইবেন। দ্বিপুকে বলিয়ো ইহাঁর প্রস্তাবটা যেন তিনি বিচার করিয়া দেখেন ইহাতে আমাদের বিস্তর ঝঞ্ঝাট বাঁচিয়া যাইবে। ওখানে যে জমি লইবার কথা চলিতেছিল সেও যদি এই কম্পানি হইতে লওয়া হয় তবে সেটা অনেক কাজে লাগিতে পারিবে অথচ বিদ্যালয়ের এক পয়সা লাগিবে [না]। বিদ্যালয় এই গোরু মহিষ প্রভৃতিতে যে টাকা ফেলিয়াছেন সেই পরিমাণ Share বিদ্যালয়ের থাকিবে সুতরাং বিদ্যালয়ের একটা Profitও রহিল।

আজ জগদীশ আসিবেন তাই বোট লইয়া চরে যাইতেছি। একটা লেখায় হাত দিয়াছি— এ কয়দিনের মধ্যে সেটা শেষ করিতে পারিলে একটা দায় চোকে। আর ত বেশি দেরি নাই। Phelps সাহেব কয়দিন এখানে থাকিয়া চলিয়া গিয়াছেন— তাঁহার এ জায়গাটা অত্যন্ত ভাল লাগিয়াছে— তিনি বলিয়াছেন This is an ideal place to live in।

তোমরা আমার প্রীতি অভিবাদন গ্রহণ করিয়ো এবং ছাত্রদিগকে আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ জানাইও। ইতি ১৮ই ফাল্গুন ১৩১৮

তোমাদের
[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

৫

ওঁ

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

কয়দিন এখানে এসে সুস্থ বোধ করছিলুম। মনে করছিলুম সেদিন যে ধাক্কাটা খেয়েছিলুম সেটা কিছুই নয়। সুস্থ হয়ে উঠলেই অসুখটাকে মিথ্যা বলে মনে হয়। আবার আজ দেখি সকাল বেলায় মাথাটা রীতিমত টলমল করচে। কাল বুধবার ছিল বলে, কাল সন্ধ্যাবেলায় মেয়েদের নিয়ে একটু আলোচনা করছিলুম— এইটুকুতেই আমার মাথা যখন কাবু হয়ে পড়ল তখন বুঝতে পারচি নিতান্ত উড়িয়ে দিলে চল্‌বে না।

কালীমোহন অনঙ্গবাবুর কথা বলেছিলেন। শুনেছি তিনি লোকটি ভাল। তাঁকে তোমাদের বিদ্যালয়ে কি চল্‌বেনা ?

রথী বল্‌চেন হীরালালকে এখনি অবিলম্বে কাজে যোগ দিতে হবে— নইলে বিশেষ ক্ষতির কারণ ঘট্‌বে। বিষয়কর্ম্মে ত শৈথিল্য করা চল্‌বে না— কাজ যাতে চলে সে দিকে দৃষ্টি দিতেই হবে। অতএব হীরালাল যদি জমিদারীর কাজটা গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকেন তা হলে আর দেরি না করে একেবারে যেন এখানে শিলাইদহে চলে আসেন। তাঁর আপিসের কাজে কি প্রভাতকে নিযুক্ত করা চল্‌বে না ? আমি ভাবছিলুম যদি অতুল বিদ্যালয়েই থাক্‌তে ইচ্ছা করে তাহলে তাকে আপিসে নিযুক্ত করলে বোধ হয় তার দ্বারা বেশ ভাল কাজ হয়।

একটা কথা মনে রেখো— অরুণ এবং যতীন দুজনেই বি. এ পরীক্ষার পর বিদ্যালয়ে যোগ দেবে। তাহলে লোকের দরকার হবে কি ? যতীন এ সম্বন্ধে আমাকে চিঠি লিখেচে।

আজ এখানে দিনু এবং ছেলেপুলে নিয়ে নলিনীরা আস্‌চে। তোমাদের বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য ভাল চল্‌চে শুনে খুব নিশ্চিন্ত হলুম। আমার মনটা ওখানকার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল এমন সময়েই কাল

রাত্রি থেকে মাথাটা খারাপ হওয়াতে মনের মধ্যে পুনরায় বাধা অনুভব করচি। ভাবিছি মে মাসের শেষে যে জাহাজটা ছাড়বে সেইটেতে আর একবার সমুদ্র পাড়ি দেবার চেষ্টা করব। এবার আর কারো কাছে বিদায় নেবনা— তাহলে বিদায় নেওয়াই হবে কিন্তু যাওয়া হবেনা। এখনো মাথাটা ঘুরচে অতএব আর নয়।

শ্রী[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

৬

ওঁ

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

হীরালালকে তোমাদের ছুটির আরম্ভ পর্য্যন্ত রাখিতে পার। কিন্তু তাহার পরেই তাঁহার কাজে যোগ দেওয়া আবশ্যক হইবে। আজ প্রায় ৪।৫ মাসে সত্যেশ্বর হঠাৎ কাজ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত মহলগুলি অরাজক পড়িয়া আছে। ওদিকে আষাঢ়ে পুণ্যাহ হইবে— তাহার পূর্ব্বে কাজকর্ম্ম দেখিয়া ও শিখিয়া না লইলে আমাদের বিশেষ ক্ষতির কারণ হইবে। বস্তুত প্রতিদিনই অসুবিধা ঘটিতেছে। অতএব হীরালাল এবার গ্রীষ্মের ছুটি ভোগ করিবার অবসর পাইবেন না। ওখান হইতে একেবারেই কাজের ক্ষেত্রে চলিয়া আসিতে হইবে। যে কর্ম্ম হীরালালের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছি তাহাতে তাঁহার আর্থিক ক্ষতি কিছুই হইবে না বরঞ্চ এখনকার চেয়ে সুবিধা হইবে এ কথা তাঁহাকে জানাইতে পার।

অরুণ ও যতীন যদি পরীক্ষায় পাস হইতে পারেন তবেই তাঁহারা কর্ম্মে যোগ দিবেন কিন্তু সে সংবাদ বাহির হইতে ত বিলম্ব হইবে। যদি তাঁহারা ফেল করেন তবে সে সংবাদ বাহির হইবার পরে লোক খুঁজিয়া পাওয়ার সময় থাকিবে কি? যাহাই হউক ভাল লোক আগে থাকিতে বাছিয়া রাখা দরকার। কেবল পাকা শিক্ষক হইলে চলিবে না— মানুষটি ভাল হওয়া নিতান্তই চাই।

সন্তোষ মিত্রের খুড়িকে যদি আনাইয়া রাখিতে পার সে ত ভালই হয়। পাড়াগেঁয়ে মানুষ— কোনোরূপ উৎপাত ঘটিবে না— বৌমার কাছে থাকিয়া তাঁহার নির্দ্দেশ মত কাজকর্ম্ম করিতে পারিবেন।

আজকাল আমার শারীরিক অপটুতা বাড়িয়াছে বই কমে নাই— এমন কি, চিঠি লিখিতেও তেমন মন দিতে পারি না। অতএব আর একবার শরীর সারিবার জন্যই বিলাত যাত্রার চেষ্টা করিব। মে মাসের কোনো একটা জাহাজে যাইবার ব্যবস্থা করা যাইতেছে।

রামানন্দ বাবুর চিঠি বোধ হয় দেখিয়াছ। নর্দ্দামাগুলার একটা উপায় ত করা চাই। তোমাদের স্নানের জল যদি সেই নর্দ্দামা দিয়া বাহির হইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতে পার তাহা হইলে ওটা অনেকটা পরিষ্কার থাকে। যদি ভাতের ফেন একেবারেই নর্দ্দামায় না ফেলিয়া কোনো পাত্রে ধরা হয় তবে ভাল হয়— এ সম্বন্ধে আমি বার বার বলিয়াও কোনো ফল পাই নাই। আমাদের লোকের শৈথিল্য কোনো-মতেই ঘোচে না বলিয়াই সকল বৃহৎ কর্ম্ম এমন অসাধ্য ও ব্যয়বহুল হইয়া পড়ে। এই অতি সামান্য ব্যবস্থা কি একেবারে অসম্ভব? গোরুর জন্য ফেন লইবার কথা আছে কিন্তু আমাদের অব্যবস্থায় ও শাসনের শৈথিল্যে তাহা সম্পূর্ণ ভাবে সম্পন্ন হয় না। ফেন ও সমস্ত উচ্ছিষ্ট ভাত প্রভৃতি কি গো মহিষের ব্যবহারে নিঃশেষে লাগানো যাইতে পারে না? ইতি ২৬ চৈত্র ১৩১৮

তোমাদের

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

ওঁ

শিলাইদা
নদিয়া

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

আমার এই ৫২ বৎসরের জন্মদিনের উৎসব খুব একটা ঝড় জলের মধ্যে সমাধা হয়ে গেছে। মনে মনে তাই আশা করচি এই ঝড়ে আমার জীবনের আর একটা পর্য্যায় বুঝি সূচনা করে দিচ্চে— পুরাতনের সমস্ত জীর্ণ পাতা উড়িয়ে দিয়ে জীবনের শেষ ফল ফলাবার জন্যে এবার বুঝি আর একবার নূতন সবুজে সাজ্‌তে হবে।

এবারে তোমাদের ছুটির পরে যে ফাঁক পড়বে তা পূরণ করবার জন্যে এখন থেকেই প্রস্তুত হচ্চ ত? কিন্তু যাঁরা যাবেন তাঁরা কে যে কখন বিদায় হবেন এখনো ত তা ঠিক হয়নি। প্রথমত বঙ্কিমের যাওয়া হবে কিনা খুব সন্দেহ— দ্বিতীয়ত কালীমোহন হয়ত অগষ্ট মাসের পূর্ব্বে যাত্রা করবেন না— অথচ এরকম অনিশ্চিতের মধ্যে থাকাও যে শক্ত।

অনঙ্গবাবুকে তোমরা কি নিয়োগ পত্র দিয়েছ? হরিচরণ ছোট ছেলেদের পাঠশালা চালাবার জন্য একটি অল্প বেতনের লোক আনবেন বলেছেন। অরুণ ত আস্‌বেই। যতীন আস্‌বেন কিনা তাঁকে চিঠি লিখে নিশ্চিত খবরটা জেনো। তার পরে শুনেছি জীবনের আসবার ইচ্ছা আছে। নেপালবাবুকে জিজ্ঞাসা কোরো সে খবরটা ঠিক কিনা? জীবন কি হীরালালের স্থানটা নিতে পারবেন না? আমাদের কর্ম্মচারী কেশব বিশ্বাসের এক জামাই, এফ. এ. ফেল করা— তাকে বোলপুরে কোনো কাজে নিযুক্ত করবার জন্যে তার শ্বশুর আমাকে ধরেছে। যদি তোমাদের দরকার থাকে এবং তাকে পরীক্ষা করে পছন্দ কর তাহলে রাখতেও পার— কিন্তু আর যে লোকের দরকার হবে তা ত মনে হয় না।

এবার বিদ্যালয় খোলার পর শিশুদের স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য সকল বিষয়েই বিশেষ মনোযোগ করা দরকার হবে।

আমি এখান থেকে ৭ই জ্যৈষ্ঠে কলকাতায় যাব— কলকাতা থেকে ১০ই জ্যৈষ্ঠে বম্বাই অভিমুখে রওনা হব— ১৪ই জ্যৈষ্ঠে আমাদের জাহাজ বম্বাই ছাড়বে— এই রকম ত আমাদের প্ল্যান— তার পরে বিধাতার প্ল্যান কি তা দেখা যাক্। ইতি ২৯শে বৈশাখ ১৩১৯

তোমাদের
[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

৮

[পোস্টমার্ক
শিলাইদা
১৫ই মে ১৯১২]

ওঁ

সবিনয় নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন

সুধাকান্তর পত্র পাঠালুম। শ্রীকণ্ঠবাবুর দৌহিত্র রায়পুরের ভোলানাথ বিদ্যালয়ে কর্ম্মপ্রার্থী। সে

বি,এ। লোক অত্যন্ত সরল। অধ্যাপনায় কি রকম হবে জানিনে। দ্বিপুকে বলেছি তোমাদের সঙ্গে তার মোকাবিলা করিয়ে দিতে।

কলকাতা থেকে যাত্রা করতে আর দিন সাতেক আছে। তার পরে কত দিনে ফিরব জানিনে। আমার এই অনুপস্থিতি কালের মধ্যে সকল প্রকার সংঘাত ও সংঘর্ষ থেকে বিদ্যালয়কে বাঁচিয়ে, পরস্পরের অধিকারকে সম্পূর্ণরূপে সম্মান করে বিদ্যালয়কে শান্তির মধ্য দিয়ে উন্নতির দিকে অগ্রসর করতে থাকবে এই আমি একান্ত মনে কামনা করি। এতদিন তোমরা এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে একেবারে একাত্মভাবে যুক্ত হয়ে আছ যে যদি এর জন্য কখনো তোমাদের কিছু অসুবিধা, আঘাত বা ত্যাগ-স্বীকার করতেও হয় তবে তাতেও কুণ্ঠিত হবে না এটুকু আমি তোমাদের কাছ থেকে আশা করি। অবিচলিত সহিষ্ণুতার সঙ্গে বিদ্যালয়ের হাল ধরে থাকতে হবে এ কথা মনে রেখো।

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯

ওঁ

সবিনয় নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

কাল রাত্রে আসিয়াছি। আজ সকালে হীরালাল আসিয়াছে তাহার হাতে এই চিঠি দিতেছি।

আমার যাওয়ার সময় নিকটবর্ত্তী। ইতিমধ্যে শনি রবিবারে দুই দিন দুই বক্তৃতা আছে। নিশ্চয়ই আরও বিস্তর উৎপাত জুটিবে।

তোমাদের অধ্যাপকেরা আমাকে জাহাজে চড়াইয়া দিতে কেহ কেহ বোধকরি আসিবেন। কিন্তু তুমি যখন কর্ণধার তখন তোমার বিদ্যালয় তরীটি ফেলিয়া আসা তোমার দ্বারা হয়ত ঘটিবেনা। অতএব দূর হইতেই তোমার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। তোমার রাজত্বকালে বিদ্যালয় উন্নতি লাভ করিতে থাকুক। শাসনে তোমার শৈথিল্য নাই, অথচ তোমার শাসন ছেলে বুড়ো কাহারো অপ্রিয় নহে— এমন কি, রাণাঘাটে রমণীমোহন ঘোষ পর্য্যন্ত তোমার রাজ্যাভিষেকে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

হীরালাল সেনকে একবার পাঠাইয়া দিতে হইবে। গবর্মেণ্টের পত্র পাইয়াছি— এখন তাহাকে রাখা ত আর চলিবে না। তাহার জন্য আমি অন্য ব্যবস্থা করিব। তাহার স্থানে রাজবাড়ির সেই ব্যক্তিকে চেষ্টা দেখিতে পার। রাজবাড়ির লোকটিকে ৪০ টাকার এক পয়সা অধিক দিবার দরকার হইবে না— এমন কি, সম্ভবত ৩৫ টাকাতেই পাইবে— কারণ আশ্রমে তাহার ত অন্য কোনো খরচ নাই। বড় ব্যস্ত আছি

তোমাদের

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

১০

ওঁ

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ—

Circular-এর ব্যাপার নিয়ে Viceroy-এর সঙ্গে লেখালেখি সুরু করেছি। দুই একদিন তার

ফলাফলের জন্যে অপেক্ষা করতে হচ্চে। কাল সোমবারে যাওয়া ঘট্‌বে না। পর্শু একটা কোনো খবর পাওয়া যাবে আশা করচি। হয়ত বুধবারে সন্ধ্যার সময় পৌচব। তোমরা অভিভাবকদের ভরসা দিয়ো। যা হয় একটা কিছু না করে ছাড়চি নে। কলকাতায় বাস অসহ্য কিন্তু উপায় নেই।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১

ॐ

সবিনয় নমস্কার নিবেদন—

জগদানন্দ, সমুদ্রের এ পারে এসে পৌচেছি। এখন মনের মত একটা বাসার সন্ধানে ঘুরে বেড়ানো যাচ্চে। দুচার দিনের মধ্যে যা হয় একটা ঠিক হয়ে যাবে। এখন যেখানে আছি বেশ ভাল বাড়ি এবং খুব ভাল জায়গা, ব্যয়ও তদনুরূপ— কিন্তু আমার বর্ত্তমান অবস্থা তদনুযায়ী না হওয়াতে চিন্তা করতে হচ্চে। আমি এখানকার ভদ্রসম্প্রদায়ের সংস্রবে এসে পড়াতে নিতান্ত অজ্ঞাতবাসে থাকতে পারচি নে। এখানে দেখা সাক্ষাৎ নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ বিদেশীর পক্ষে যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য। অথচ সেটা যদি এড়িয়ে চলি তা হলে এখানে আসবারই অভিপ্রায় ব্যর্থ হয়ে যায়। কিন্তু অর্থ না থাকার ব্যর্থতা কি করে দূর হতে পারে সে কথাটা ভাবচি। হয়ত বা আরম্ভেই ভঙ্গ দিয়ে এখানকার কোনো নির্জ্জন পাড়াগাঁয়ে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে।

বৌমা নূতন লোকের মধ্যে নূতন জায়গায় এসে কিছু মাত্র অভিভূত হয়ে পড়েন নি— তিনি বেশ আছেন— দেখ্‌চেন শুনচেন ঘুরে বেড়াচ্চেন এবং সকলেরই কাছে সকল বিষয়েই প্রশংসা লাভ করচেন।

"পাঠ সঞ্চয়" বইটা সম্বন্ধে আশু মুখুয্যে মশায়ের সঙ্গে তোমার কি আলাপ হল এবং তার একটা সদগতি হতে পারবে কিনা জানবার জন্যে উৎসুক হয়ে আছি।

সোমেন্দ্র এ পর্য্যন্ত আহার ও নিদ্রা সম্বন্ধে অনন্য সাধারণ পারদর্শিতা দেখিয়ে আমাকে বিস্মিত ও চিন্তান্বিত করেছে। এইবার এখানে তাকে কঠোর অধ্যয়নের ঘানিতে জুড়ে দেবার চেষ্টায় আছি। আশা করচি চেষ্টা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হবে না। এরা ইংরেজি এতই যৎসামান্য জানে যে আমাকে পর্য্যন্ত অবাক করে দিয়েছে। আমেরিকায় কলেজে যোগ দেবার পূর্ব্বে এখানে ইংরেজি ভাষাটা কিছু পরিমাণে সঞ্চয় করে যাতে যেতে পারে আমাকে তারই আয়োজন করতে হবে।

বোলপুর আশ্রম ও বিদ্যালয়ের সকল রকমের ফোটোগ্রাফ আমার দরকার। এইগুলি সংগ্রহ করে যথাসম্ভব সত্বর আমাকে পাঠিয়ে দিয়ো। এবং আমাদের বিদ্যালয়ের মূল ভাব ও কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে অজিত যদি একটি ইংরেজি প্রবন্ধ লিখে পাঠাতে পারেন তা হলেও বিশেষ উপকার হবে। তোমাদের সকল সংবাদের জন্যে উৎসুক আছি। ইতি ২০ জুন ১৯১২

তোমাদের

[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

১২

ওঁ

সবিনয় নমস্কার নিবেদন—

লণ্ডনের উত্তর প্রান্তে একটি শ্যামল বনশোভিত পাহাড়ের তলায় আমরা একটি বাসা ভাড়া করে ছয় সপ্তাহের জন্যে নিজেদের ঘরকন্না পেতে বসেছি— মাঝে মাঝে খিচুড়ি মাঝে মাঝে পায়স পরমান্নের ভোগ চল্‌চে। তা ছাড়া দ্বিপদ চতুষ্পদে যাঁদের অভিরুচি তাঁরাও বঞ্চিত হচ্চেন না। সোমেন্দ্র সুদীর্ঘ-কাল শান্তিনিকেতনে বাস করে এত প্রচুর পরিমাণে পশু মাংসের ক্ষুধা সঞ্চয় করে এসেছে যে কেবল-মাত্র তার পাশে বস্‌লেই আমিষ ভোজনের ফললাভ করা যায়। আগামী সোমবারে সোমেন্দ্রকে এখানকার পল্লীগ্রামে একটি গৃহস্থ বাড়িতে বাস করবার জন্যে পাঠিয়ে দেব। সেইখানে থেকে সে ইংরেজিটা কতকটা পরিমাণে ঝালিয়ে নেবে এবং তারা ওকে পড়াশুনারও সহায়তা করবে। ওর একটা সুবিধা আছে ওর বিপুলদেহে লজ্জাসঙ্কোচের লেশমাত্র নেই— ও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সকলের সঙ্গে আলাপ করে' ইংরেজিভাষার ভীষ্মব্যাকরণের শরশয্যা রচনা করতে দয়ামায়ামাত্র করে না— সত্যেশ্বরের কাছে ও যেটুকু শিখেছিল তার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে মিথ্যাস্বর যোগ করে ও যে একটি ভাষা রচনা করেছে সেটাতে কোনোমতে কাজ চলে কিন্তু লজ্জারক্ষা হয় না। এই জন্যই ওকে কিছুদিন আমাদের সংস্রব থেকে ইংরেজি আণ্ডামানে নির্ব্বাসন দেবার ব্যবস্থা করচি। ওর এমনি দুর্ভাগ্য সেখানেও তারা নিরামিষাশী— এই গোখাদকের দেশে এসেও যে সে আবার দ্বিতীয় ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে ঢুক্‌বে এ কথা সে কোনোদিন মনে করে নি,— এম্‌নি ওর ডালভাতের কপাল! যা হোক্ সেখানে বোলপুরী মোহনভোগ তৈরি করতে কেউ জানে না এই কথা মনে করে সে নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্চে। ইতি ১৪ই আষাঢ় ১৩১৯

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩

[Postmark
HAMPSTEAD
12 July 1912]

ওঁ

সবিনয় নমস্কার

শাস্ত্রীমহাশয় লিখেছেন তিনি তোমাদের লাইব্রেরী থেকে পালি বইগুলি নিয়ে গিয়ে কাছে রেখে ব্যবহার করতে চান। এ সম্বন্ধে তোমাদের সমিতিতে আলোচনা করে যে রূপ ভাল মনে কর তাঁকে লিখে দিয়ো— এ বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অধিকার বহির্ভূত হবে। পূর্ব্বেই তোমাদের জানিয়েছি এখানে আমি খুব একটা আবর্ত্তের মধ্যে পড়ে গেছি— রয়ে বসে চিঠিপত্র লেখার সময় করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়েছে। সেই জন্যে এবারে পোষ্টকার্ডের উপর দিয়েই সারা গেল। রথী এখানকার একজন খুব বড় Scientist এর সঙ্গে কাজ করবার আমন্ত্রণ পেয়েছে।

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪

সবিনয় নমস্কারপূর্বক নিবেদন

হঠাৎ এইমাত্র ঠিক হয়ে গেল, আমরা ফ্রান্স ও জর্মানি ঘুরে আসব। সেপ্টেম্বর মাস ফাঁকা মাস, হাতে কোন কাজ নেই, অতএব এই অবকাশে ভ্রমণটা সেরে এলে মন্দ হয় না। এখান থেকে প্রথমটা হাইডেল্‌বার্গে যাবার ইচ্ছা— সেখানে জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের ধরণ ধারণ কিরকম সেটা বুঝে নিতে পারব।

তোমাদের পূর্বেই লিখেছি যদি বোলপুরে উপযুক্ত পরিমাণে জায়গা ও সুযোগ পাওয়া যায়, তাহলে রথী যাতে সেইখানেই বিজ্ঞান চর্চায় জীবনযাপন করতে পারেন, সেইটেই আমি একান্তমনে ইচ্ছা করি। আমেরিকায় হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বায়োলজি অধ্যয়নে নিযুক্ত হবেন বলে সংকল্প করা যাচ্ছে— তারপরে গ্রীষ্মাবকাশের সময় অধ্যাপক বেট্‌সনের কাছে এসে কাজ করে যেতে পারবেন। একবার Research-এর প্রণালী তাঁর আয়ত্ত হলেই তিনি ঐ পথেই তাঁর জীবনের চেষ্টাকে নিযুক্ত করতে পারবেন। আমি তাঁকে আর জমীদারি সেরেস্তার জীর্ণ কাগজের কোটরের মধ্যে প্রবেশ করতে দিতে কোনমতেই ইচ্ছা করিনে। ওখানে তোমরা এখন থেকে কিছু জমি সংগ্রহ করে রেখে দিতে কি পারবে না? রথীর ধারণা এই যে, জলসেচনের ব্যবস্থা করতে পারলেই ওখানে ফসল ফলানো কিছুই শক্ত হবে না। সন্তোষে রথীতে একদিন বোলপুরে মানুষ হয়েছিলেন— আবার তাঁরা জীবনের কাজে সেখানে একত্র মিলতে পারলে আমি খুব আনন্দিত হব।

Circularটা তুলে নিয়েছে এখবর ভাল; কিন্তু ওর মধ্যে কালীমোহনের নামটা জড়িত থাকাটা ভাল হয়নি। ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্টের পত্রাবলীতে কেবল হীরালালেরই উল্লেখ ছিল। কালীমোহন যখন এখান থেকে প্রস্তুত হয়ে দেশে ফিরবেন তখন তাঁকে আমাদের বিদ্যালয়ে নিতেই হবে, আমরা তাঁর অধ্যয়নের ব্যয় বহনও কতকটা পরিমাণে করচি, এরপরে তাঁর বিদ্যালয়ে প্রবেশের পথে যদি কোন বাধা ঘটে তবে সেটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হবে।

তোমাকে কতকগুলি বৈজ্ঞানিক চটি বই পাঠাব বলে কিনে রেখেছি। এগুলি খুব ভাল। শিশু-পাঠ্য নয় অথচ সহজবোধ্য। এগুলি অবলম্বন করে তোমরা যদি ছেলেদের বিজ্ঞান সম্বন্ধে কতকগুলি লিখিত বক্তৃতা দিতে পার তাহলে ভাল হয়। এর পরে পাঠ্য পুস্তকরূপে সে সমস্ত ছাপাও হতে পারে।

ছেলেদের মনকে চারিদিক থেকে উদ্বোধিত করে তোল। তাদের চিন্তার জড়ত্ব মোচন করে দাও। এইটেই সবচেয়ে দরকার। আমাদের মন ছেলেবেলা থেকে কোন খাদ্যই পায় না বলে চিরদিনের মত তাদের ক্ষুধা মরে যায়। আমাদের ছেলেদের মন যেন উপবাসে অভ্যস্ত হয়ে না যায়। তারা কেবল কলের শিক্ষায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বেরবে এইদিকেই তোমাদের অধিকাংশ চেষ্টা প্রয়োগ করো না। মনের ভিতর দিয়ে জীবনের ভিতর দিয়ে তারা জগৎটাকে গ্রহণ করতে পারে এমন শক্তি এমন আনন্দ তাদের মনে সঞ্চারিত করে দাও। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার এই য়ুরোপ ভ্রমণ আমার বিদ্যালয়ের পক্ষে ব্যর্থ হবে না। আমি তোমাদের সঙ্গে কাজ করবার জন্যে অনেকটা পরিমাণে প্রস্তুত হয়ে যেতে পারব এবং হয়ত আমাদের বিদ্যালয়ের প্রতি এখানকার লোকের হৃদয় আকর্ষণ করে যেতে পারব। আমাদের সঙ্গে যদি এদেশের কেউ কেউ মিলতে পারেন তাহলে হয়ত আমাদের অনেক দুর্বলতা ও দারিদ্র্য মোচন হতে পারে। কিন্তু তাই বলে সেদিকে লোভ রাখা ভাল হবে না। আমাদের কাজ আমাদেরই— আমাদের

শক্তির দ্বারাই তাকে নির্বাহ করতে হবে— এই দৃঢ় পণ করে নিজের মনকে সমস্ত অবসাদ থেকে মুক্ত করে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। ইতি ১০ ভাদ্র ১৩১৯ তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫

ঔ

বিনয় নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

তোমাদের এক বাক্স বই পাঠিয়ে দিয়েছি। হয়ত এ চিঠি পাবার হপ্তাখানেক পরে পাবে। তার মধ্যে বৈজ্ঞানিক বই অনেক আছে। আমার ইচ্ছা এইগুলো অবলম্বন করে তোমরা ছেলেদের বক্তৃতা দাও। এক সেট্ বই পাঠিয়েছি তাতে বৈজ্ঞানিক প্রায় সকল বিষয়েই খুব মনোজ্ঞ করে আলোচনা করেছে। তোমরা এক একজনে তার এক একটা বিষয় নিয়ে ছেলেদের কাছে যদি আলোচনা করো তা হোলে খুব উপকার হবে। আগে আমাদের বিদ্যালয়ে ছেলেদের মনের চর্চ্চা এখনকার চেয়ে অনেক বেশি হোতো— আজকাল ক্রমশই বড়ো বেশি যান্ত্রিক হয়ে পড়চে— ইস্কুল মাস্টারি মত্ত হস্তী সরস্বতীর পদ্মবনে প্রবেশ করেছে— ক্রমশই ওঁর বাসাটা একেবারে লণ্ডভণ্ড করে দিতে পারে। তোমরা ঐ চতুষ্পদটাকে অধিক পরিমাণ প্রশ্রয় দিয়ো না— অন্তত ওর যেখানে স্থান সেইখানেই আলানস্তম্ভে ওকে বেশ ভালো করে বেঁধে রেখো— ওকে জননী বীণাপাণির পদ্মবনের ভ্রমর বলে কোনোদিন যেন ভুল কোরো না।

আমেরিকায় পাড়ি দেবার পথে লিভারপুলের ঘাট পর্য্যন্ত গিয়ে দেবলকে ফিরে আসতে হল। ডাক্তার পরীক্ষা করে বলেছে ওর চোখে granular lids— ওকে যদি যেতে দেওয়া হয় তাহলে আমেরিকা থেকে ওকে ফিরিয়ে দেবে। এখন চেষ্টা করে দেখতে হবে এইখানে থেকেই যাতে ওর পড়াশুনার ব্যবস্থা হতে পারে। মুস্কিল এই, এ জায়গায় অধ্যয়নের খরচের পরিমাণটা অত্যন্ত বেশি— আমাদের অবস্থা এখন যে রকম হয়ে এসেছে তাতে আর ভার চাপানো চল্‌বে না। যাই হোক্ একটা উপায় করতেই হবে। অরবিন্দ আর হপ্তা দুয়েকের মধ্যেই এসে পড়বে। কিন্তু সে যে কেম্ব্রিজে প্রবেশ করতে পারবে এমন ভরসা খুব কম। কেন না, আজকাল অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের কোনো কলেজেই অতিশয় অল্প সংখ্যকের বেশি ভারতবর্ষীয় নেয়ই না। সেই সংখ্যা পূর্ণ হয়ে গেছে। আমি সেখানকার অধ্যাপকদের বলে কয়ে যদি কিছু করতে পারি চেষ্টা করে দেখব কিন্তু এখানে নিয়মের মধ্যে একটুও ছিদ্র করা বড়ো শক্ত।

আমার সেই বইটা ছাপাখানায় দেওয়া হয়েছে। Yeats তার যে ভূমিকা লিখে দিয়েছেন সেটা পড়েছি। পড়ে লজ্জা বোধ হয়। এটা আমার পক্ষে বহুমূল্য অলঙ্কার সন্দেহ নেই কিন্তু যাকে বলে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার।— বোধ হয় পূর্ব্বেই লিখেছি, চিত্রাঙ্গদা, মালিনী এবং ডাকঘরটা তর্জ্জমা হয়ে গেছে। রোটেন্‌স্টাইন্ এগুলি ট্রেভেলিয়ান ব'লে একজন কবিকে পড়তে দিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তিনি এ সম্বন্ধে যে-রকম অভিমত প্রকাশ করলেন তাতে বোধ হচ্ছে এগুলোও এ দেশে চল্‌বে— এমন কি, তিনি এই নাটকগুলিকে অন্য তর্জ্জমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আসন দিতে চান। এই

তিনটের মধ্যে কোনটা যে সব সেরা সেটা তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কয়দিন ধরে আলোচনা করে কিছুতেই স্থির করতে পারছেন না। প্রথমে তিনি স্থির করেছিলেন, চিত্রাঙ্গদাই ভালো, তাঁর স্ত্রী স্থির করেছিলেন, ডাকঘর—তারপরে মালিনীটা ভালো করে পড়তে গিয়ে তাঁর মনে আবার ধোঁকা লেগে গেছে। ইনি নিজে গ্রীক পৌরাণিক কথা নিয়ে নাটক লিখে থাকেন। আমার এই লেখাগুলির মধ্যে তিনি সেই গ্রীক সাহিত্যের রস পান। আমাকে এণ্ড্রুস্ সাহেব বলেছিলেন মালিনী পড়ে তাঁর গ্রীক নাটকের কথা মনে পড়ে। এণ্ড্রুস্ সাহেবের সঙ্গে অল্প কয় দিনে আমার বিশেষ একটু হৃদ্যতা হয়েছে। বড়ো চমৎকার সহৃদয় লোকটি। তিনি আমাকে বলে রেখেছেন, দিল্লিতে তুমি আমার সঙ্গে তিন মাস একত্রে যদি কাটাও তা হোলে আমি তোমাকে গ্রীক অনেকখানি শিখিয়ে দিতে পারব। আমি তো মনে করছি এই নিমন্ত্রণটি গ্রহণ করব। তারা অক্টোবর মাসেই ভারতবর্ষে ফিরবেন।

এই মেলেই কুমারস্বামীর *Art and Swadeshi* নামক একটা বই পাঠিয়ে দেব। তাতে আমার উপরে একটা প্রবন্ধ আছে। অজিতের একটা তর্জ্জমার খাতা একবার তিনি দখল করে নিয়ে গিয়েছিলেন, এই লেখার কতক উপকরণ বোধ হচ্চে তার থেকে পেয়েছিলেন— আমারও কতকগুলো তর্জ্জমা দেখলুম এর মধ্যে আছে। একটা কথা তোমাদের বলে রাখি—আমাদের চিঠিতে আমার সম্বন্ধে এখানকার লোকের যে সব অভিমত পাও সেগুলো তোমরা কাগজে ছাপিয়ে দাও এতে আমি অত্যন্ত লজ্জা বোধ করি। তোমাদের আমি আত্মীয়ভাবে লিখি সেগুলো বাইরে যাবার জিনিষ নয়।

সকল কথাই কি কাগজে প্রকাশ করতে হবে। ইতি ২রা আশ্বিন ১৩১৯

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬

ওঁ

২১ ক্রমোয়েল রোড
সাউথ কেন্সিঙটন্

সবিনয় নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্ররা একটা বড়ো জিনিষ লাভ করছে যেটা ক্লাসের জিনিষ নয়— সেটা হচ্চে বিশ্বের মধ্যে আনন্দ— প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তার যোগ। সেটাতে যদিও পরীক্ষার সহায়তা করে না কিন্তু জীবনকে সার্থক করে। আমাদের ছেলেরা বৃষ্টিতে ছুটে বেড়ায়, জ্যোৎস্নারাত্রিতে আনন্দ ভোগ করে, তারা রৌদ্রকে ডরায় না, তারা গাছে চড়ে বসে পড়া করে, এগুলোকে আমি সামান্য জিনিষ মনে করিনে। চারিদিকের সঙ্গে জীবনের ব্যবধান ঘুচিয়ে দেওয়া, আনন্দের ছোটো বড়ো নানা যাতায়াতের পথ খুলে দেওয়া যে কত বড়ো লাভ তা বলে শেষ করা যায় না। এ যেন জগৎকে দান করা। আমরা হতভাগ্যরা বিদ্যাসাধ্য খ্যাতিমান টাকাকড়ি যত সহজে পাই জগৎকে তত সহজে পাইনে— আমরা যার দ্বারা বেষ্টিত হয়ে রয়েছি তাকেই হারিয়ে বসেছি— ঈশ্বর যা আমাদের দিয়ে বসেছেন তা আমাদের তুলে নেবার শক্তি নেই— এই অসাড়তাটার খোলস ভেঙে ফেলে ছেলেদের

মন যাতে ডিমের ভিতর থেকে মুক্ত জগতের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে এখানকার মাটিতে জলেতে আলোতে অবাধে সঞ্চরণ করবার অধিকার লাভ করে এইটে আমি একান্ত মনে কামনা করি। বোলপুরের মাঠে আমাদের ছেলেরা এই জিনিষটা পাচ্ছিল— তারা নিজের ছোট ছোট মুঠো তুলে ভগবানের এই দক্ষিণ হস্তের দান গ্রহণ করছিল। তোমরা দেখো আমাদের বিদ্যালয়ে এই জিনিষটার যেন ব্যাঘাত না হয়। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে এবং শিক্ষকদের হৃদয়ের সঙ্গে ছাত্রদের হৃদয়ের প্রত্যহ অব্যবহিত যোগই আমাদের বিদ্যালয়ের সকলের চেয়ে বড়ো বিশেষত্ব— এইটেকে কোনোমতে কিছুমাত্র আচ্ছন্ন করতে দেওয়া চলবে না। আমি চলে আসার পর তোমাদের বিদ্যালয় থেকে অনেক পুরাতন অধ্যাপক একসঙ্গে চলে এসেছেন— তেজেশ, হীরালাল, কালীমোহন, বঙ্কিম এঁরা সবাই পলাতক— ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে এঁদের জীবনের যোগসূত্র বেঁধে গিয়েছিল— হঠাৎ তাঁদের জায়গায় অনেকগুলি নূতন শিক্ষক এসেছেন— এঁরা ছেলেদের সঙ্গে আপনার জীবনকে তেমন করে জড়িত করতে চাইবেন কিনা, পারবেন কি না কিছুই জানিনে। এই যোগটা কর্ত্তব্য-জ্ঞানের দ্বারা হোতে পারে না— এর মূলে একটি উদার প্রেম থাকা চাই— সেই প্রেমের উৎস যেন কিছুমাত্র শুকিয়ে না যায়, এই কথাই আমি বারবার ভাবি।— আমাদের আশ্রমের সেই উৎসবটি আমাদের মন্দিরে আছে— সেইখানকার উৎসের মুখে যেন কোনো বাধা না আসে— বাধা হলেই দেখতে পাবে যা সবুজ ছিল তা ক্রমে ক্রমে শুকিয়ে হল্‌দে হয়ে যাবে— যা প্রাণের জিনিষ ছিল, তা কলের জিনিষ হয়ে উঠবে। অমৃত নির্ঝরিণী যদি না বয় তা হলে আমাদের শুষ্কতাকে কেউ দূর করতে পারবে না। আমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রকৃতির পার্থক্য শিক্ষার প্রভেদ বাধা ব্যবধান এমন কি, বিরুদ্ধতা কিছু না কিছু ছিলই এবং থাকবেই— কিন্তু তৎসত্ত্বেও আশ্রমে সেই জিনিষটাই একান্ত হয়ে ওঠেনি— বেসুরের উপরেও সুর বেজেছে; গ্রন্থি যতই কঠিন হোক তা ক্রমশই শিথিল হবার দিকে গিয়েছে। এখনো সেই অমৃতের ধারাটিকে তোমরা রক্ষা করে চোলো— ছেলেদের হৃদয় প্রত্যহ পূর্ণ হোক্, তারা প্রত্যহ আনন্দিত হোক্, তারা প্রত্যহই বড়োর দিকে তাকাতে শিখুক্। তাদের চিত্তের বোধশক্তি বিশ্বজগতে ব্যাপ্ত হোতে থাক্— তাদের হাসি উজ্জ্বল হোক্, তাদের আনন্দ গানের সুরে মুখরিত হয়ে উঠুক্। সেই প্রান্তরের মধ্যে ছেলেদের আনন্দ-সম্মিলনের কলধ্বনি সমুদ্র পার হয়ে আমার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করছে— আনন্দের নির্ম্মল আলোকে তাদের হৃদয়মুকুল পূর্ণবিকশিত হয়ে উঠুক্ এই আমি তাদের আশীর্ব্বাদ করছি। ১০ই আশ্বিন, ১৩১৯

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭

ওঁ

সবিনয় নমস্কার—

আমরা সূর্য্যাস্তের পথ অনুসরণ করতে চল্লুম। এবার অতলান্তিকের ও পারের ঘাটে পাড়ি দেওয়া যাচ্চে। ভেবেছিলুম সূর্য্যের রথরেখার অনুবর্ত্তন করতে করতেই ভারতবর্ষে গিয়ে পৌঁছব কিন্তু বোধ হচ্চে ঠিক সেরকমটি হবে না। এখানে এঁরা ধরেছেন আবার আমার গ্রীষ্মের সময় আসা চাই। ততদিনে

আমার অন্য বই ছাপবার সময় হয়ে আসবে। খুব কাছাকাছি একসঙ্গে অনেকগুলো বই ছাপতে এরা সকলেই নিষেধ করে। তাতে বিক্রি কম হয়। মাঝে মাঝে ক্ষুধা জমবার সময় দেওয়া চাই। সে প্ল্যানে কাজ করতে গেলে আমার হাতে যে-সব লেখা জমেছে তা চুকিয়ে দিতে আরো বছর দুই তিন লাগবার কথা। কাল রাত্রে Yeatsএর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ডাকঘরের তর্জ্জমাটা তাঁর খুব ভাল লেগেছে, ওটা তিনি তাঁদের Irish Theatreএ অভিনয় করবার জন্যে উৎসুক হয়েছেন। এখানকার একজন ছেলে "রাজা" তর্জ্জমা করে দিয়েছেন। সেটাও কাল রাত্রে Yeatsকে দিয়েছি, আমার বিশ্বাস এইটেই আমার সকল লেখার চেয়ে এঁদের ভাল লাগ্‌বে। কাল সকালে একজন ফরাসী গ্রন্থকার আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি প্রুফে আমার তর্জ্জমাগুলো পড়ে খুব উত্তেজিত হয়ে আমার কাছে এসেছেন। তিনি বল্লেন, তোমার মত কবির জন্যে আমরা অপেক্ষা করে আছি। আমাদের Lyricsএ আমরা কেবল accidentalকে নিয়ে বদ্ধ হয়ে আছি— তোমার লেখা দেশকালের অতীত, চল তুমি আমাদের ফ্রান্সে চল, সেখানে তোমাকে আমাদের প্রয়োজন আছে। ইত্যাদি। ইনি আমার এই তর্জ্জমাগুলি ফরাসীতে অনুবাদ করবার অনুমতি নিয়ে গেলেন। এদের এই উৎসাহ দেখে আমি অত্যন্ত বিস্ময় বোধ করি— এ আমি কখনো কল্পনা করতেও পারতুম না। ব্রজেন্দ্রবাবু বলেছিলেন, আপনার লেখা ফ্রান্সে আদর পাবে এ আমি জানতুম কিন্তু ইংলণ্ডে এরা যে এমন করে মেতে উঠবে তা আমি কখনো আশা করিনি। ব্রজেন্দ্রবাবুকে কেম্ব্রিজে কিম্বা লণ্ডনে কোনো কাজ দিয়ে এখানে আবদ্ধ করবার জন্যে আমরা খুব চেষ্টা করচি। একটা কিছু জুটবে বলে মনে করচি। এ দেশে উনি থাকলে আমাদের ভারি উপকার হবে।

বৈজ্ঞানিক পুস্তকগুলি এতদিনে নিশ্চয় তোমাদের হাতে গিয়ে পৌচেছে। সেটা খুব একটা ভারি পার্শেল হয়েছে— সেইজন্যে পেতে দেরি হবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু পেলে যেন তোমাদের বিদ্যালয়ের কাজে লাগাতে পার এবং তত্ত্ববোধিনীতে কিছু কিছু করে লেখা দিয়ো। আবার আমেরিকায় গিয়ে আর এক কিস্তি পাঠাবার চেষ্টা করা যাবে। ইতি ২রা কার্ত্তিক ১৩১৯

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮

Harald Square Hotel
European Plan
34th Street & Broadway
C. F. Wildey & Son Proprietors

New York

২৯ অক্টোবর ১৯১২

বিনয় নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন

দেবাসুরে মিলে যখন সমুদ্রমন্থনে লেগেছিলেন তখন মহাসমুদ্রের পেটে যা-কিছু ছিল সমস্ত তাঁকে নিঃশেষে উদ্গার করতে হয়েছিল। সে সময়ে তাঁর যে কী রকমের পীড়া উপস্থিত হয়েছিল সেটা তিনি

মহাভারতের বেদব্যাসকে কোনোদিন বোঝাবার সুযোগ পেয়েছিলেন কিনা জানিনে কিন্তু এই বর্ত্তমান কবিটিকে খুব স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমার জঠর তাঁর জঠরের মতো এমন বিরাট নয় এবং তার মধ্যে বহুমূল্য জিনিষ কিছুই ছিল না কিন্তু বেদনার পরিমাণ আয়তনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না; সেইজন্যে অতলান্তিক পার হবার সময় তার অপার দুঃখ অল্পকালের মধ্যেই উপলব্ধি ক'রে নিয়েছিলুম। আমরা যে নিতান্তই মাটির মানুষ সেটা বুঝতে বাকি ছিল না। এখন কেবলই মনে হচ্ছে, কালো জল আর হেরব না গো, দূতী, সমুদ্র আর পার হব না— স্টীমারের বংশীধ্বনি যত জোরেই বাজুক আর কূল ছাড়তে মন যাচ্ছে না। ডাঙায় নেমে এখনও শরীরটা ক্লান্ত হয়ে আছে। দিনরাত্রি নাড়া খেয়ে খেয়ে প্রাণটা যেন শরীরের থেকে আলগা হয়ে নড়নড় করছে। সমুদ্র আমাকে যেন তার ঝুম্‌ঝুমি পেয়েছিল— দু'হাতে ক'রে ডাইনে বাঁয়ে নাড়া দিয়েছিল, ভেবেছিল কবির পেটের মধ্যে ত্রিপদী চতুষ্পদী যা-কিছু আছে সমস্তর মিলে একটা হট্টগোল বাধিয়ে তুল্‌বে— কিন্তু উল্‌টে পাল্‌টে খানাতল্লাসী ক'রে জঠরের মধ্য থেকে ছন্দোবন্ধের কোনো সন্ধানই যখন পাওয়া গেল না তখন মহাসমুদ্র আমাকে নিষ্কৃতি দিলেন।

স্থরুলের বাড়িটা পাওয়া গেছে। পূর্ব্বেই লিখেছি আপাতত সেটা ইস্কুলের কাজে লাগিয়ে দিয়ো। সিংহ লিখেছেন তার আসবাবগুলো আপাতত ঐখানেই রেখে ব্যবহার করতে। কিন্তু পাছে লোকসান হ'লে তার দাম ধরে বসেন এই আমার আশঙ্কা হয়। দ্বিপুকে জানিয়ো তিনি যেটা ভালো বোঝেন তাই করবেন। আস্‌বাবের একটা ফর্দ্দ ক'রে বুঝে নিয়ো এবং তার একটা কাপি আমাকে পাঠিয়ে দিয়ো। স্থরুলের বাগানে বিদ্যালয়ের জন্যে তরীতরকারী উৎপন্ন করানো যেতে পারে কিনা ভেবে দেখো— অবশ্য ফসলের দামের চেয়ে চাষের দাম বেশি না হয়ে পড়ে। অন্তত ফলের গাছের গোড়া খুঁড়ে এইবেলা সার দিয়ে রাখলে নিশ্চয়ই ফল পেতে পারবে। ইলিনয়ের ঠিকানায় পত্র লিখো। ইতি

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯

ওঁ

508, High Street
Urbana
Illinois
U. S. A.

সবিনয় নমস্কার নিবেদন—

ইলিনয়ে এসে আমরা বাসা বেঁধে বসেছি। বাড়িটি বেশ ছোটখাটো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, নিভৃত নিরালা। এখানে দাসী চাকর পাওয়া যায় না— যারা ঘরের কাজ করে দেয় তাদের help বলে, তারা ভৃত্য নয়— অনেক ভদ্র গৃহস্থের ছেলেমেয়েরা এই করে খরচ চালিয়ে দেয়। এখানকার গৃহিণীদের অধিকাংশকেই রীতিমতো পরিশ্রম করতে হয়— রাঁধা বাড়া, ঘর সাফ করা, বাসন মাজা, কাপড় কাচা ইত্যাদি। যে শ্রেণীর লোকদের এইরকম খাটতে হয় আমাদের দেশের সে শ্রেণীর মেয়েরা তার সিকি পরিমাণ কাজও করে না। এদের আবার আরো অনেক উপসর্গ আছে। কেবলমাত্র ঘরকরনার কাজ

করে এলোমেলো হয়ে অন্তঃপুরে প্রচ্ছন্ন হয়ে দিন কাটালে এদের চলে না। তার উপরে পড়াশুনা, বক্তৃতা আদি শোনা এবং করা, অতিথি অভ্যাগতদের আদর অভ্যর্থনা করা, এবং সর্ব্বদাই সুপরিচ্ছন্ন হয়ে থাকা। আবার ছেলেমেয়েদের পড়ানোও অনেকটা পরিমাণে নিজেরাই করে। এখানকার অধ্যাপক সীমুরের বাড়ীতে একজনও চাকর নেই। তাঁরা স্বামীস্ত্রী মিলে ঘরের সমস্ত ছোটখাটো কাজ আদ্যোপান্ত নিজের হাতে করেন— তার উপরে Mrs Seymour বৌমাকে প্রত্যহ ইংরেজি শেখাবার ভার নিয়েছেন। যাকে অমন অশ্রান্ত খাটতে হয় তিনি যে কী করে আবার এরকম অনাবশ্যক দায়িত্ব কেবলমাত্র রথীর প্রতি স্নেহবশত গ্রহণ করতে পারেন আমি তো বুঝ্‌তে পারি নে। আমাদের ছোটখাট ঘরকরনার ভার বৌমাকে নিতে হয়েছে— আমরাও আজ পর্য্যন্ত help জোটাতে পারিনি। তাঁকে রাঁধতে, ঘর ঝাঁট দিতে, বিছানা তৈরি করতে হয়— অবকাশমতো রথীকেও এসব কাজে যোগ দিতে হচ্চে। বঙ্কিম ও সোমেন্দ্র আমাদের সঙ্গে আছেন। বঙ্কিম এতদিন Mrs Seymour-এর বাড়ী কাজ করছিলেন— এখন তিনি আমাদেরই কাজে সাহায্য করেন এবং তার পরিবর্ত্তে তাঁর খাওয়া এবং থাকা চলে যায়।

এতদিনে তোমাদের স্কুল খুলেছে। স্কুলের বাড়ি কি কোনো কাজে লাগাতে পেরেছ? ওটা ব্যবহার করতে পেলে তোমাদের জায়গার টানাটানি অনেকটা ঘুচে যাবে। এবার তোমাদের ছাত্রসংখ্যা কি কিছু বাড়বার সম্ভাবনা আছে? যে সকল অধ্যাপক নূতন নিযুক্ত হয়েছেন আমাদের আশ্রমের সঙ্গে তাঁদের হৃদয়ের যোগ সাধন হয়েছে?

Literary Digest কতকগুলি পাঠাচ্ছি এবং ক্রমে ক্রমে পাঠাব— এর থেকে ছেলেদের দিয়ে তত্ত্ববোধিনীর সংকলন লেখাবার চেষ্টা কোরো। এতে লেখবার মতো অনেক জিনিষ আছে। কিছু কিছু তোমার কাজেও লাগ্‌তে পারে। ইতি ২৩শে কার্ত্তিক ১৩১৯

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০

ওঁ

508 W. High Street
Urbana. Illinois
U. S. A.

সবিনয় নমস্কার নিবেদন—

আমার বই বিশ্ববিদ্যালয়ে মঞ্জুর হোলো না এতে তোমরা রাগ করছ কেন? যারই বই নামঞ্জুর হোতো সেই তো বেজার হোতো এবং মনে করত অবিচার করা হয়েছে। যাঁরা বিচারক তাঁরা ঠিকই বিচার করেছেন বলে ধরে নিলে ফল সমানই থেকে যায় অথচ মনের আক্ষেপটা বেঁচে যায়— সেটা তো কম লাভ নয়। হয়তো আমার বইয়ের ভাষা প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের প্রবেশগম্য নয় ওটা তোমাদের বিদ্যালয়ের চতুর্থ পঞ্চমশ্রেণীতে ব্যবহার করে দেখতে পারো। কিন্তু আমি ভাবছি, ওটা রামানন্দবাবু ছাপিয়েছেন, আমাদের কাছ থেকে কিছুই নেননি— এর ঋণভার কি তার উপরেই সমর্পণ করে আমরা নিশ্চিন্ত থাকব? গল্পচারিটি বলে আমার যে বই বিদ্যালয় নিজস্ব করে নিয়েছেন সেটা বিশেষভাবে বিক্রি করবার জন্যে

কি তোমরা কোনো চেষ্টা করেছ? আজ তো পয়লা অঘ্রাণ শনিবার— আগামী মঙ্গলবার ৪ঠা অঘ্রাণে তোমাদের বিদ্যালয় খুলবে। আশা করছি স্কুলের বাড়িটাকে কোনো প্রকারে ব্যবহার করে তোমরা নূতন ছাত্র গ্রহণ করতে পারবে। উপরের তিন ক্লাসের ছেলেরা দিনের বেলা শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের কাজ সেরে রাত্রে সেখানে গিয়ে শুতে পারে। তা হোলে খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে আলাদা বন্দোবস্ত করবার দরকার হয় না। কিম্বা সেইখানেই যদি অজিত সন্তোষরা বাসা করে এইখানকার জায়গা খালাষ করে দিতে পারেন সেও হোতে পারে।— এদিককার পড়াশুনা সেরে রথীদের ফিরে যেতে যথেষ্ট দেরি হবার সম্ভাবনা আছে— হিসাব করে দেখা যাচ্চে তিন বছর হবার কথা— আমি চাই ওর শিক্ষা সকলপ্রকারে বেশ ভালো রকম করে সমাধা করে ও ফিরে যায়। এখানে জুন পর্য্যন্ত Botany এবং Zoology-টার গোড়াপত্তন ক'রে নিয়ে তার পরে ও কেম্ব্রিজে গিয়ে অধ্যয়নে যোগ দেবে। সেখানে research-এর কাজে অন্তত দু-বৎসর লাগবার কথা। এই research-এর চর্চ্চায় পাকা হয়ে যেতে না পারলে ভারতবর্ষে ফিরে গিয়ে কোনো কাজের মতো কাজ করতে পারবে না। আমাদের বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থেকে ও যদি বেশ রীতিমতো-ভাবে ল্যাবরেটরি খুলে রিসার্চে লেগে যেতে পারে তা হোলে আমাদের ছাত্রদের ভারি উপকার হবার কথা। তারা অনেকে এণ্ট্রেন্স দিয়ে অন্যত্র না গিয়ে ওর সঙ্গেই কাজে লেগে যেতে পারবে। অতএব ধৈর্য্য ধরে কিছু বিলম্ব করেও ওকে আমার বিদ্যালয়ের জন্যে বেশ রীতিমতো উপযুক্ত করে নিয়ে যেতে চাই। এদিকে ততদিনে কালীমোহন ফিরে যেতে পারবেন। তাঁর দ্বারা আমি প্রভূত উপকার প্রত্যাশা করি। আমি দেখে এসেছি তিনি যে রকম উঠে পড়ে লেগে গিয়েছেন তাতে তিনি খুব অল্পকালের মধ্যেই বিস্তর উন্নতি করতে পারবেন আমার সন্দেহ নেই। দেবলও ততদিনে ফিরবে— তোমাদের শিক্ষকের টানাটানি ঘুচে যাবে— অতএব মাঝখানের এই দু বছরের ফাঁড়াটা কোনো প্রকারে তোমরা কাটিয়ে দাও। তোমরা সাধনা করতে থাকো আমরা এখান থেকে মাভৈঃ বাণী পাঠাচ্চি।— তোমাদের অধ্যক্ষ সভার কাছে আমার একটি নিবেদন, তোমাকে আগামীবারের জন্যেও যেন সর্ব্বাধ্যক্ষ পদে তাঁরা নিযুক্ত করেন। আমার প্রস্তাব এই যে এই পদটার ব্যাপ্তি অন্তত তিন বৎসর পর্য্যন্ত হয়— কারণ যন্ত্রটাকে আয়ত্তে নিতেই একটা বছর লাগে— তোমার হাতে খুব সুন্দর কাজ হচ্ছিল এ কথা সকলকেই স্বীকার করতে হবে। আগামী ৭ই পৌষে পুনরায় তোমার রাজ্যাভিষেক হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ইতি ১লা অগ্রহায়ণ ১৩১৯

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১

ওঁ

508 W. High Street
Urbana. Illinois U. S. A.

সবিনয় নমস্কার নিবেদন—

এতদিনে তোমরা নিশ্চয়ই গীতাঞ্জলি পেয়েছ, পড়েছ এবং মনে মনে ভেবেছ এর মধ্যে এমনই কী আছে যা নিয়ে গোরা পাঠকের দল এমন ক্ষেপে উঠেছে। অন্তত আমি নিজে তো তাই ভাবি। আমি লণ্ডনে থাকৃতে একজন ফরাসী কবি এবং একজন আমেরিকান কবিকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম তোমরা

আমার এই তর্জ্জমাগুলোর মধ্যে এমন কী দেখেছ যাতে তোমাদের এত বেশি উত্তেজিত করেছে? তারা যে আমাকে খুব স্পষ্ট করে বোঝাতে পেরেছে তা বলতে পারিনে। তারা দুজনেই আমাকে বলেছে, আমরা যা করতে চাচ্চি তা তুমি অত্যন্ত অনায়াসে করে তুলেছ। কিন্তু কী যে করতে চায় এবং আমি কী করে তুলেছি সে খবরটা এখনো পরিষ্কার করে পাইনি। সম্প্রতি টাইম্‌সের *Literary Supplement*এ গীতাঞ্জলির প্রথম সমালোচনা বেরিয়েছে। এতদিনে তোমরা সেটা কোনো না কোনো সূত্রে দেখেছ বোধ হয়। আমি আমেরিকায় থাকার দরুন এগুলো ঠিক সময় মতো তোমাদের পাঠাতে পারছিনে— নিজেই ঠিক সময়মতো পাইনে। বোধকরি আমার কাছ থেকে খবর পাবার পূর্ব্বেই কালীমোহন দেবল প্রভৃতির কাছ থেকে সমস্ত সংবাদ পাচ্চ। *Times*-এর সমালোচক ঠিক কে জানিনে কিন্তু খুব সম্ভব Edmund Gosse। Yeats-এর কাছে শুনেছিলুম তিনিই ওদের সহিত্য সমালোচনা করে থাকেন। যথেষ্ট প্রশংসাই করেছেন। কেন যে এ বই ওঁদের অত ভালো লেগেছে এই সমালোচনায় তার কতকটা আভাস দিয়েছেন। যে ফরাসী কবির কথা তোমাকে লিখেছি তিনি আমার এই বই ফরাসী তর্জ্জমা করবার অনুমতি আমার কাছে চেয়ে রেখেছেন। তিনি আমাকে বারবার জানিয়ে রেখেছেন, তোমাকে একবার ফ্রান্সে আসতেই হবে— সেখানে তোমার লেখা অন্যদেশের চেয়ে ঢের বেশি আদর পাবে। এখানে জর্ম্মন সাহিত্যের যিনি অধ্যাপক তিনি আমার এই বইটা দেখবার জন্যে ভারি উৎসুক হয়ে রয়েছেন— তিনি বলেন তিনি এ সম্বন্ধে জর্ম্মনির কাগজে সমালোচনা লিখ্‌তে চান। য়ুরোপের নাট্যসাহিত্য সম্বন্ধে তিনি বিশেষজ্ঞ— তিনি আমার নাটকের তর্জ্জমা দেখবার জন্যে ব্যগ্র আছেন। দুঃখের বিষয় আমার নাটকের তর্জ্জমাগুলো এখানে আনিনি। রোটেনস্টাইনকে লিখেছি পাঠিয়ে দিতে — এঁদের ইচ্ছা মালিনীর তর্জ্জমাটা এখানকার কলেজে ছাত্রদের দিয়ে অভিনয় করানো হয়।

আজ সমস্ত দিন এখানে মেঘ করে আছে। খুব হাওয়া দিচ্চে। শীতটা খুব ঘনিয়ে উঠেছে। খুব সম্ভব দুই একদিনের মধ্যেই বরফ পড়তে আরম্ভ করবে। এ বৎসর আমাদের ভাগ্যক্রমে শীতের শাসন এখনো রীতিমতো আরম্ভ হয়নি। গত বৎসর এর ঢের আগে বরফ পড়া সুরু হয়েছিল। লণ্ডনে এবার যেমন গ্রীষ্মঋতুতেও বাদলা এবং শীত ভোগ করেছি, এখানে তেমনি শীত ঋতুতেও দিনের পর দিন সূর্য্যালোক ভোগ করছি। আমার আকাশের মিতা তাঁর লণ্ডনের দেনা ইলিনয়ে শোধ করে দিচ্চেন। ইতি ৮ই অগ্রহায়ণ ১৩১৯

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২

ওঁ

508 W. High Street
Urbana, Illinois
13 Dec. 1912

সবিনয় নমস্কার নিবেদন—

মনে আশা করে এসেছিলুম এদেশে এসে সময় পাওয়া যাবে, এবং সে সময়টা তোমাদের জন্যে ব্যয় করা যাবে। কিন্তু ঠিক তার উল্‌টো হল। এই সহরটি খুব নিরালা এবং মানুষকে নিয়ে এরা অতিরিক্ত

পরিমাণে উৎপাত করেনা— কিন্তু বক্তৃতার ঘূর্ণিপাকের মধ্যে পড়ে গেছি। এখানকার মানুষ আর কিছু হোক বা না হোক্ বক্তৃতা শুন্‌বেই— আমি ভেবেছিলুম সেটা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব— কিন্তু দেখ্‌তে পাচ্চি, মানুষ যে কি করতে পারে এবং না পারে তা দায়ে না পড়লে নিজেই বুঝতে পারে না। আমার মত মূর্খও এখানকার বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা করবে আমার ভাগ্য সেইরকমের ষড়যন্ত্রটা সম্পূর্ণ পাকিয়ে তুলেছেন। সম্প্রতি বষ্টন থেকে একটা নিমন্ত্রণ পেয়েছি Rochester সহরে একটা বড় রকমের Religious Congress হবে তাতে আমাকে Race Differences and Human Brotherhood সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে হবে। অধ্যাপক Euckenও সেখানে বক্তৃতা করবেন। তার পরে Chicago University-তে খুব সম্ভব কিছু বল্‌তে হবে— সেখানে তার আয়োজন চল্‌চে কিন্তু এখনো পাকা কথা পাইনি। Iowa বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিমন্ত্রণ পেয়েছি— কিন্তু সে বহু দূর। এখানকার Universityও আমাকে আহ্বান করেছেন। কাজেই এখন থেকে আর আমেরিকা প্রবাসের শেষ দিন পর্য্যন্ত আমি আর সময় পেয়ে উঠ্‌ব না। অতএব তোমরা কিছুকাল আমার কাছে আর কিছুই প্রত্যাশা কোরো না। অবশ্য আমার এখানকার সমস্ত কাজই একদিন তোমাদেরই কাজে লাগ্‌বে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এক এক সময় আমার অত্যন্ত বিতৃষ্ণা বোধ হয়— দূরে কোথাও নির্জ্জনে পালিয়ে যাবার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। আমি ভেবে দেখ্‌লুম আমার দ্বারা সে আর হয়ে উঠ্‌বে না যেখানে হোক্ যেমন করে হোক্ আমাকে কিছু বল্‌তেই হবে— আমি কেবল কথা কইতেই শিখেছি, আমাকে কথা কইয়ে নেবেই— তার বেশি আমার আর কিছু হবে না— কিন্তু কথাবার্ত্তা বন্ধ করে একটু চুপচাপ করে বস্‌তে পারলে বাঁচি।

তোমাদের শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৩

ওঁ

508 W. High Street
Urbana, Illinois
U. S. A.

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

জগদানন্দ, কাল হঠাৎ সকালে খবরের কাগজে পড়া গেল দিল্লিতে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর কে একজন বোমা ছুঁড়ে মেরেছে। পড়ে আমার মনটা অত্যন্ত পীড়িত হচ্চে। আমরা মনে করি পাপকে আমাদের কাজে লাগাব, কাজ ত গোল্লায় যায় তারপরে সেই পাপটাকে সামলায় কে? এ যে চালুনিতে করে সমুদ্র পার হবার চেষ্টা। পৃথিবীতে যারা সদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করাটাকে বিলম্বজনক ও কষ্টসাধ্য মনে করে তারাই সিঁধ কেটে বড় মানুষ হতে চায়। আমাদের হতভাগ্য দেশে আমরা যথার্থ ত্যাগ-স্বীকার করে দেশের কাজ করতে কষ্ট বোধ করি বলেই আমাদের ওখানেই একদল বীর পুরুষ বোমা ছুঁড়ে দেশ উদ্ধার করতে চায়। এই বোমা কোন্‌খানে গিয়ে পড়ে বল দেখি? একেবারে স্বদেশলক্ষ্মীর মঙ্গলঘটের উপরে। আমাদের দেশে দুর্গতি ত নানা আকারেই বিরাজ করচে, তার উপরে আবার এই

সয়তানটাকে ঘরের মধ্যে ঢুকতে দিলে কে? একে ত সহজে বিদায় করতে পারবে না। এখন থেকে ক্ষণে ক্ষণে অকস্মাৎ কোন্ অন্ধকার থেকে এ হঠাৎ আমাদের উপর এসে পড়ে আমাদের ভাঙ্গা কপালকে আরো ভাঙ্গবে।

তোমাদের ওখানে দুটি মারাঠি ছাত্র আশ্রয় নিয়েছে এতে আমি বড়ই আনন্দ বোধ করচি। তাদের অভিভাবকদের আশাকে তোমরা সর্ব্বাংশে সফল করে তুলো— ছেলে দুটিকে সকল দিক থেকে মানুষ করে তাদের পিতামাতার কাছে ফিরে পাঠিয়ে দিয়ো। এই যে দূরদেশ থেকে ছাত্ররা আমাদের শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে আস্‌চে এর মহৎ দায়িত্ব যেন আমাদের বাঙ্গালী ছাত্ররা অন্তরের মধ্যে অনুভব করে। তারা যেন এটা বুঝতে পারে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ বাংলা দেশের কাছ থেকে কতখানি আশা করে— সেই আশা পূর্ণ করবার ভার তাদের প্রত্যেকের উপর আছে। স্বদেশের মুখের দিকে তাকিয়ে আমাদের বিদ্যালয়ের উচ্চ আদর্শকে তারা যেন অক্ষুণ্ণ করে রাখে। প্রবাস থেকে এখানে সব অতিথিরা আস্‌চে— তাদের উপযুক্ত অন্ন পরিবেষণ করতে হবে, সেই আয়োজনের প্রধান ভার আমাদের ছাত্রদেরই উপরেই। আমরা বাইরে থেকে যা কিছু চেষ্টা করি সে সব চেষ্টার শক্তি অতি সামান্য, কিন্তু আমাদের ছাত্ররা নিজের জীবনে সাধনাকে যতই সত্য করে তুল্‌বে ততই তারা পরস্পরকে শক্তি দিতে পারবে— তাছাড়া কখনই যথার্থ মঙ্গল ঘটতে পারে না। আমাদের ছাত্ররাই এই বিদ্যালয়কে সৃষ্টি করে তুল্‌চে— তাদের প্রাণের মধ্য থেকে যে সুর বেজে উঠ্‌চে সেই সুরই এই বিদ্যালয়ের সুর। তাদের উপর এই যে দায়িত্বটি আছে সেটি যে কত বড় সে কথা তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ো। তারা যেন একদিনের জন্যও এ ভ্রম না করে যে আমরা শিক্ষকরা বিদ্যালয়কে চালনা করচি— অবশ্য আমাদের যেটুকু কাজ সেটুকু আমরা করচি, কিন্তু এর প্রধান ভারটি তাদের উপরেই আছে। তারা যেখানে দুর্ব্বল আমাদের বিদ্যালয় সেইখানেই দুর্ব্বল— তারা যেখানে নিষ্ফল হচ্চে আমাদের বিদ্যালয় সেইখানেই ব্যর্থ হচ্চে।— এই যে একটি মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা এখানে হচ্চে এতে আমরা তাদেরই আনুকুল্যের দিকে একাগ্রভাবে তাকিয়ে আছি— তাদের বাক্য মন ও কর্ম্ম প্রসন্ন হয়ে আমাদের এই সাধনাকে সিদ্ধিদান করুক এতকাল পর্য্যন্ত আমি এই কামনাই করচি। আমার এ কামনা নিষ্ফল হয়নি। আমার ছাত্ররা আমার বিদ্যালয়কে শ্রী দিচ্চে, শক্তি দিচ্চে, আনন্দ দিচ্চে আমি তা নিশ্চয় জানি— আমাদের এই নবীন তাপসেরাই আশ্রমের উপরে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ আকর্ষণ করে আন্‌চে— আমরা ত কেবলমাত্র নদীর উপকূল, কিন্তু এ নদীর স্রোতের ধারা ত তারাই— এই ধারা প্রাণের ধারা হোক্ পুণ্য ধারা হোক্, অমৃত ধারা হোক্— এই ধারায় দেশ সফল হোক্ পবিত্র হোক্।

রথী যে বই পাঠিয়েছেন তা অনেক দিন হল দেশে পৌচেছে খবর পেয়েছি কিন্তু এখনো তোমরা কেন পাওনি আমি ত কিছুই বুঝতে পারচি নে। আমার নাম করে খুব কড়া করে গোপালকে ভর্ৎসনা করে একখানা চিঠি লিখে দিয়ো। আমি কেবলি মনে করচি এতদিনে তোমরা নিশ্চয়ই পেয়েছ। না পাওয়াতে আমি অত্যন্ত বিরক্ত ও চিন্তিত হচ্চি। রথী যে কেন একেবারে তোমাদের ঠিকানায় পাঠালেন না তা আমি আজ পর্য্যন্ত বুঝতে পারলুম না। আমিও আজ সত্যকে এ সম্বন্ধে একটা চিঠি লিখে দেব। কিন্তু আশা করচি এতদিনে নিশ্চয়ই পেয়েছ। ইতি ১০ই পৌষ ১৩১৯

তোমাদের

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

২৪

ওঁ

508 W. High Street.
Urbana, Illinois
২০ পৌষ ১৩১৯

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

ইংলণ্ড থেকে খবর পেয়েছি ম্যাকমিলান কম্পানিরা আমার গীতাঞ্জলি ছাপবার জন্যে উদ্যোগী হয়েছে। তাদের সঙ্গে লেখাপড়া পাকা করবার জন্যে India Society-র Secretary Fox Strangways-এর নামে একটা Power of Attorney পাঠাতে হচ্চে। বোধ হচ্চে ওর মধ্যে এ সর্ত্তও থাকবে যে তারাই আমার ভবিষ্যৎ তর্জ্জমাগুলিরও প্রকাশক হবে। ম্যাকমিলানদের একটা মস্ত সুবিধা এই যে ইংলণ্ড, আমেরিকা এবং ভারতবর্ষ তিন জায়গাতেই তাদের কারবার আছে— বই বিক্রির পক্ষে ওরাই বোধ হয় সব চেয়ে ভাল বন্দোবস্ত করতে পারবে।

খবর পাওয়া গেল সন্তোষের একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেছে— তার দীর্ঘ জীবন কল্যাণে পূর্ণ হয়ে উঠুক এই কামনা করি। কিন্তু তার নামকরণের জন্যে উদ্বিগ্ন আছি— ওদের নামে ত একটা স-কার থাকতেই হবে— ওদের বৃহৎ পরিবারের নামাবলীতে আমাদের বর্ণমালার তিন স বোধহয় দেউলে হয়ে গেছে। কিন্তু এ জন্যে বেশি চিন্তা করতে ওকে বারণ কোরো। একটা এখনো বাকি আছে— ভবিষ্যতে গো-শালার অধ্যক্ষতার প্রতি দৃষ্টি রেখে সেই নামটি ওর ছেলেকে দেওয়া যেতে পারে। সেটি হচ্চে ষণ্ডেশচন্দ্র। ঐটেকেই আর একটু আদর করে মিষ্টি করে মিলে দাঁড়াবে সন্দেশচন্দ্র।

রথীরা কিছুকাল শিকাগোতে কাটিয়ে ফিরে এসেছেন। আমি সেখানে অনেকগুলি নিমন্ত্রণ পেয়েছিলুম— কিন্তু গোলমালের মধ্যে গিয়ে পড়তে কোনোমতেই ইচ্ছা হল না। আমার কেমন একটা সংবর্দ্ধনা Phobia-র মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষত আমেরিকায় একটা হট্টগোল করা এতই সহজ, এবং এত রকম বেরকমের হুজুগে লোকেরা এখানে জয়পতাকা উড়িয়ে বেড়ায় যে ওতে আমার প্রবৃত্তি হয় না।

ইংলণ্ড থেকে গীতাঞ্জলি সম্বন্ধে প্রায় মাঝে মাঝে চিঠি পাওয়া যাচ্চে। এ দেশের লোকের ভাললাগাটা সম্পূর্ণ ফাঁকা জিনিষ নয় তাই এক একবার মনের মধ্যে আশা মায়াবিনী আশ্বাস দিয়ে যাচ্চে হয়ত বহুকাল অনাবৃষ্টির পরে আমাদের বিদ্যালয়ের দুর্ভিক্ষের দিন দূর হতেও পারে— কারণ উত্তর-পশ্চিমে মেঘ হঠাৎ দেখ্‌তে দেখ্‌তে আকাশ ছেয়ে ফেলে এবং এক ঘণ্টার মধ্যে বর্ষণে শুষ্ক ধরাতল ভাসিয়ে দিয়ে যায়— এবার যেন সেই উত্তর-পশ্চিমে মেঘের আমেজ দেখা যাচ্চে। কিন্তু আমার অর্থভাগ্য নেই, সে ত তোমাদের অগোচর নেই। মাঝে মাঝে আয়োজন হয় বেশ প্রচুর কিন্তু শুকনো পাতা ও ধুলোটাই আসে আমার দিকে আর ধারা বর্ষণটা হয়ে যায় অন্যত্র— এক প্রকাশকের পর আর এক প্রকাশক কেবল গ্রন্থই প্রকাশ করচেন কিন্তু কই রজত হাস্য বিকাশ করচেন কই— ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজত গিরি নিভং— ধ্যানের ত্রুটি হচ্চে না কিন্তু সিদ্ধির বেলায় নন্দী ভৃঙ্গী ছাড়া কারো দেখা পাবার জো নেই। এবারে রজত গিরির বাহন John Bull-র মেজাজটা কি রকম দেখা যাবে। বোধ হচ্চে হয় গুঁতো, নয় গোবর।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫

ওঁ

508 W. High Street
Urbana, Illinois.

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

জগদানন্দ, আমরা এখানে এতকাল পর্য্যন্ত প্রায় নিরবচ্ছিন্ন সূর্য্যালোক ভোগ করে এসেছি। নবেম্বর ডিসেম্বরে প্রকৃতির এরকম প্রসন্ন মুখচ্ছবি এখানকার লোকেরা প্রায় দেখ্‌তে পায় না। জানুয়ারির দুই তিন দিন থেকে বৃষ্টি বাদলার সুত্রপাত হয়েছে। সেদিন একচোট বরফ পড়ে সমস্ত শাদা হয়ে গেল, তার পরে সমস্ত রাত খুব কষে বৃষ্টি হল— একেবারে আমাদের দেশের বর্ষার ধারার মত। সকালে দেখি সেই বৃষ্টি রাস্তার উপরে গাছের উপরে টেলিফোনের তারের উপরে জমে বরফ হয়ে গেছে। রাস্তা ভয়ঙ্কর পিছল— সোমেন্দ্র ত প্রতিদিন দুই একবার করে আছাড় খেয়ে নিয়েছে, পরের রাত্রে আবার বৃষ্টি। তার পরের দিনে বরফের আবরণ আরো ঘন আরো কঠিন। গাছগুলো আগাগোড়া যেন কাঁচ দিয়ে মোড়া— বরফের ভারে মড় মড় শব্দে গাছের ডাল ভেঙে ভেঙে পড়চে— ইলেকট্রিক আলোর তারের উপর গাছ পড়ে রাত্রে ত সব আলো নিভে গেল। রাস্তায় পথিকের সংখ্যা অল্প, মোটর গাড়ির আস্ফালন নেই বল্লেই হয়— আমি ত এ দুইদিন একেবারেই বেরইনি— অল্প বয়সে পদস্খলন হলে লোকসান পূরণ হয়, আমার বয়সে সেটা সাংঘাতিক হবার কথা— এইজন্য পিছলের সম্ভাবনা দেখ্‌লে ঘরে বসে থাকাই আমার পক্ষে বুদ্ধির কাজ। বসে বসে অনেকগুলো কবিতা তর্জ্জমা করেছি—। মনে হচ্চে এগুলো ভালই হয়েছে। আজ সকালে সূর্য্যোদয় হয়েছে। এ কি সুন্দর শোভা। শীতকালের পত্রহীন গাছের ডালগুলো একেবারে আগাগোড়া হীরের মত ঝলমল করচে— যেন উৎসব বাড়িতে সারি সারি স্ফটিকের ঝাড় লাগিয়ে দিয়েছে। কাল রাস্তাগুলো আয়নার মত স্বচ্ছ ছিল— রাত্রে তার উপর বরফ পড়ে সমস্ত শুভ্র হয়ে রয়েচে। আজ চিঠি লেখা সেরে মনে করচি একবার বাইরে ঘুরে আসব— পতনের সম্ভাবনা সম্পূর্ণ ই আছে— কিন্তু শক্তি সাধকদের মত সময় বিশেষে “পুনঃ পততিভূতলে” হলেও উত্থায় চ পুনশ্চ অগ্রসর হওয়া উচিত— কেননা বরফের এরকম কারিগরি এখানেও দৈবাৎ দেখা যায়। তোমাদের ওখানে ইংরেজি অধ্যাপকের অভাব ঘটবে আশঙ্কা করচ। মুকুন্দিলাল বলে যে ছেলেটি Modern Reviewতে প্রায় লেখে সে আমাকে কিছুদিন পূর্ব্বে ঐ পদের জন্য আবেদন করে পাঠিয়েছিল। ছেলেটি বাঙালী নয়— আমার মনে হয় সেটা সুবিধারই কথা। যদি মনে কর তার দ্বারা কাজ চলতে পারে তাহলে রামানন্দবাবুকে লিখ্‌লে তিনি বোধ হয় তার সন্ধান বলে দিতে পারবেন এবং তার যোগ্যতা সম্বন্ধেও বোধ করি তাঁর কাছ থেকে খবর পেতে পার। নূতন মাস্টারের প্রয়োজন হলেই আমার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে— আমাদের বিদ্যালয়ের সঙ্গে নূতন লোকের প্রাণের যোগ হতে কত বিলম্ব হবে, এবং তার ব্যাঘাত কত। আমাদের ছাত্রেরা তৈরি হয়ে ফিরে যাওয়া পর্য্যন্ত এই সমস্যার মীমাংসা হবে না। এতদিন কেটে গিয়েছে আরো পাঁচ বৎসর কাটতে দাও— তারপরে দেখা যাবে— এখনো যে আমাদের জরা নাবেনি— মাঝে মাঝে এখনো ছাত পিটানোর সঙ্গে অতিষ্ঠ করে তোলে। ইতি ২৪ পৌষ ১৩১৯

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৬

C/o. Messrs Thomas Cook & Son
Ludgate Circus, London

…জগদানন্দ, কাল আমরা Mrs. Boole নামক একজন বিখ্যাত আঙ্কিকের বাড়ি গিয়েছিলুম। তাঁর বয়স ৮২ বছর। কিন্তু কি সুতীক্ষ্ণ তাঁর মানসিক শক্তি। ইনি বিধবা, এঁর স্বামী একজন বিখ্যাত গণিতবেত্তা ছিলেন। খুব ছোট ছেলেদের মনে সহজে ও প্রত্যক্ষভাবে জ্যামিতির বোধ সঞ্চার করে দেবার যে উপায় ইনি উদ্ভাবন করেছেন তাই দেখে আমরা ভারি বিস্মিত হয়েছি। এঁর প্রণালী এবং তার সমস্ত উপকরণ আমরা সংগ্রহ করবার চেষ্টায় আছি। সঙ্গে করে নিয়ে যাব। অবশ্য তোমরা যদি এটা ব্যবহারে না লাগাও তাহলে সমস্তই ব্যর্থ হয়ে যাবে। এদেশে সকলেই অধ্যাপনা সম্বন্ধে সচেষ্টভাবে চিন্তা করচে এজন্য শিক্ষাপ্রণালী ক্রমশই যান্ত্রিকতার লৌহশৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে বেরচ্চে। আমাদের চিত্তবৃত্তির মধ্যে চিরাগত প্রথার অধীনতা স্বীকার করবার একটা মজ্জাগত অনুরাগ আছে— মুক্তির প্রতি আমাদের বিশ্বাস নেই খাঁচার পাখির মত আমরা আকাশকে ভয় করি। এইজন্য আমাদের ছেলেদের মনও জড়বৎ হয়ে যায়। তাদের উদ্ভাবনী শক্তির একেবারে শিকড় পর্যন্ত শুকিয়ে যায়, এমন করে আর বেশি দিন চলবে না। আমাদের মনকে যদি আমরা যুগযুগান্তর ধরে দাসত্বে দীক্ষিত করি, তাকে কলে ছাঁটি, ছাঁচে ঢালি, জাঁতায় পিষি, মন জিনিসের মর্মস্থলে তার একটি স্বকীয় জীবনীশক্তি আছে এ কথা যদি কোনোমতেই শ্রদ্ধাপূর্বক গ্রহণ করতে আমরা প্রস্তুত না হই তাহলে আমরা আমাদের দেবতাকে নিয়ে যেমন মাটির প্রতিমা গড়েছি তেমনি আমাদের ছেলেদের জীবনটাকে নিয়েও কতকগুলো মাটির পুতুল গড়ে তুলব। এখানকার আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা যতই দেখি ততই কেবল আমার মনে হয় আমিও এই রকম করে শেখাবার উপায় করতে চেয়েছিলুম। কিন্তু সেখানে কোনোমতেই এ বীজ অঙ্কুরিত হল না কেন? আমাদের আবার এখান থেকেই সমস্ত নকল করতে হবে! আমরা ভেবেছি কিন্তু গড়ে তুলতে পারি নি— কোনো প্রাণ পদার্থ টার পরে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নেই— আমরা কল নামক একটা প্রাণহীন লোহার ঠাকুরকেই মানি। কাল যখন এখানকার ৮২ বছরের বৃদ্ধার সঙ্গে কথা কয়ে এলুম তখন নিজেদের অসহায় দীনতা দুর্বলতা বিশ্বাস-হীনতার জন্যে আমার সমস্ত মন পীড়িত হল। এমনি করেই কি চিরদিন চলবে? আমরা নিজেরা কিছু ভাবব না, গড়ব না, জগতের কোনো সমস্যার কোনো মীমাংসা করব না— কেবল টেক্‌স্ট বুক কমিটির জীর্ণ ভেলা বুকে আঁকড়ে ধরে সমুদ্র পার হবার দুরাশা করব? ইতি ২৯শে বৈশাখ ১৩২০

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৭

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

আমার ত বোধ হয় প্রয়োজন হলে এণ্ড্রুজ সাহেব ছুটি পর্য্যন্ত তোমাদের সঙ্গে থেকে কাজ করতে পারেন। অতএব ছুটির পূর্ব্বে নূতন লোক আনবার দরকার হবেনা। ছুটির পরে যদি আমি যাই তাহলে আমি তোমাদের কতকটা সাহায্য করতে পারব। ক্ষিতিমোহনবাবুকে এখানে আনবার জন্যে আমি

যথাসাধ্য চেষ্টা করচি। ইণ্ডিয়া সোসাইটি থেকে ওঁকে আনাবার প্রস্তাব প্রায় স্থির হয়েছিল কিন্তু আমি যখন শুনলুম তারা ২৫।৩০ জনে মিলে চাঁদা করে ওঁকে আনাবার উদ্যোগ করচে তখন আমি দেখ্‌লুম সেটাতে অবশেষে গ্লানির কারণ ঘটতে পারে। কেননা এত লোকের দাবি মেটানো সহজ নয়— হয়ত ওদের মধ্যে কেউ কেউ একদিন ভাবতে পারে যে এই অর্থব্যয় অনাবশ্যক হয়েছে সেইজন্যে আমি তৎক্ষণাৎ তাদের নিবারণ করে দিয়েছি। Mrs Moody বলেছেন তিনি দেশে ফিরে গিয়ে স্বয়ং এর ব্যবস্থা করবেন। তিনি বড় সরল-হৃদয়া এবং শ্রদ্ধামতী— তাঁর কাছে ক্ষিতিমোহনবাবু ঘরের লোকের মত থাকতে পারেন। বষ্টনে Dr. Woods ওঁকে আনাবার জন্যে উৎসুক আছেন। সম্প্রতি তাঁর সঙ্গে একজন মারাঠি যুবক কাজ করচে— বোধ করচি আগামী শীতে তাকে অবসর দেবার সময় হবে— সে চলে গেলেই তাঁর সুযোগ হবে। রোটেনষ্টাইন লণ্ডনের বাইরে গেছেন তিনি এলে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ হতে পারবে। এটা দেখলুম যে, এ দেশের দরজা জানলা অনর্গল নয়।

সুরেনের সঙ্গে নিশ্চয় এতদিনে দেখাসাক্ষাৎ এবং আলোচনা হয়ে গেছে। যত শীঘ্র পার তোমাদের নিত্যগোপালবাবুকে অনিত্যগোপাল করতে হবে। সুরেনকে যদি বুঝিয়ে সুঝিয়ে চেপে ধরতে পার তাহলে তিনি একটা উপায় করে দেবেন। আমার বোধহয় আগামী জানুয়ারিতে এই সমস্ত দেনা শুধে দেবার একটা উপায় হবে। ইতিমধ্যে আমার গোটা দুই তিন বই বেরবে তার থেকেও কিছু আগাম পাওয়া যাবে। আমার ত বোধ হয় শরৎবাবুর মত একজন অধ্যাপককে তোমাদের ব্যবস্থাবিভাগের কাজে নিয়ত নিযুক্ত রাখ্‌লে সুবিধা হবে। কিন্তু তহবিল ও হিসাবের খাতাটি সম্পূর্ণ তোমাদের হাতে থাকা চাই— তাহলে তোমাদের আয়ব্যয়ের নাড়িটা তোমরা দেখতে পাবে।

অধ্যাপকদের ছুটি বেতন প্রভৃতি ব্যাপারের ভার তোমাদের নিজের হাতে রাখা কোনোমতেই সঙ্গত ও শোভন নয়। রামানন্দবাবু যদি এই অপ্রিয় কাজের ভার নেন তাহলে অত্যন্ত ভাল হয়। আমাদের একটা মজ্জাগত দুর্ব্বলতা আছে যে জন্যে সকল কাজ পণ্ড হয়, আমরা কাজের সঙ্গে ব্যক্তিকে অত্যন্ত বিজড়িত করে দেখি— সেই জন্যে ব্যক্তিগত মান অভিমান খাতির ও চক্ষুলজ্জায় কাজের সমস্ত পথঘাটকে নিরতিশয় দুর্গম করে রেখেছে। এই কাজ উপলক্ষ্যে আঘাত দেওয়া এবং আঘাত পাওয়া সম্বন্ধে আমাদের অনেক বেশি কঠিন হতে হবে— পরস্পরকে অহরহ বাঁচিয়ে চল্‌তে গিয়ে আমাদের চলাই অসম্ভব হয়ে উঠেছে। কাজের পথ পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে রাখ্‌তে হবে— ওটা ত মাদুর পেতে বিশ্রম্ভালাপ করবার জায়গা নয়।

তোমাদের শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৮

ওঁ

সাদর নমস্কার—

চিঠির বোঝার ভারে আমার মেরুদণ্ড আর টেঁকে না।

Nicholas Reyকে সম্মতি জানাবার জন্যে অজিতকে বলে এসেছিলেম— তুমি না হয় লিখে দিয়ো।

দেশী ভাষায় যারা তর্জ্জমা করচে তাদের বাধা দিয়ে কোনো লাভ নেই। দেশী লেখকদের সঙ্গতি কি তাও জানি, প্রত্যাশা কি তাও বুঝি। ওদের সঙ্গে দর দস্তুর করে কেন হয়রান করা। ২৫ পার্সেণ্ট্‌ই

কব্‌লাক্ আর ৫০ পার্সেন্টই কব্‌লাক্ কেই বা তার হিসাব রাখবে কেইবা আদায় করবে তার চেয়ে সম্মতি দিয়ে চোখ বুজে থাকাই শ্রেয়।

বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় দুখানি চিঠি পাঠাচ্ছি জবাব দিয়ো। মালাবারের নায়ার ছেলেটিকে আমাদের বিদ্যালয়ে যদি বিনা বেতনেও নিতে হয় তা হলে উপকার আছে বলে মনে করি। ভারতবর্ষের দূর প্রদেশের ছেলেরা আমাদের আশ্রমে একত্র হলে সকল ছাত্রেরই পক্ষে ভাল। ভেবে দেখো।

পেটাভেল দম্পতিকে খাইয়ে দাইয়ে যথোচিত কাজ আদায় করে নিয়ো।

ভয়ঙ্কর ব্যস্ত। হয়ত বৃহস্পতিবার কলকাতায় যাব। সোমবার

তোমাদের

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

২৯

ওঁ

সবিনয় নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

জগদানন্দ, সন্তোষকে পেটাভেল সাহেবের কথা লিখেছি বোধ হয় পড়েছ। এদের যত দেখি আমার বিস্ময় বোধ হয়। এমন অখ্যাতনামা কত লোক যে এখানে আইডিয়ালের কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে তার আর সীমা নেই। বিদেশে অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় বিদেশী ছেলেদের মধ্যে বাস ক'রে সেখানকার স্বজাতীয়দের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবার সমস্ত অসুবিধা যে কতখানি তা আমি পেটাভেলকে বারবার বলেছি কিন্তু কিছুতেই তাঁকে নিরস্ত করবার জো নেই। এঁদের অন্তরের মধ্যে প্রেরণার শক্তি যে কত বড়ো তা বিচার করে দেখলে ভক্তিতে মন নত হয়ে পড়ে। পশ্চিমের কাছ থেকে এই শিক্ষা এই দীক্ষা পাবার জন্যে হাত জোড় করে আছি— চরিত্রের দীনতা প্রাণ সমর্পণের কৃপণতা আমাদের একেবারে ঘুচে যাক্ মনে মনে এই প্রার্থনা করছি। পশ্চিমের তীর্থযাত্রা আমার কাছে এই জায়গায় বিশেষভাবে সফল হয়েছে। মানুষের মধ্যে ভগবানের যে জাগ্রত বিগ্রহ আছে এদেশে এসে আমার তারই সঙ্গে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার হোলো। সেই দেবতার প্রসন্নতা যদি হৃদয়ের মধ্যে বহন করে নিয়ে যেতে পারি তা হোলেই জীবন কৃতার্থ হবে। মানুষের জীবন জুড়ে যাঁর সিংহাসন সেই দেবতাকে আমরা বারম্বার অপমানিত করেছি— সেইজন্যে মানুষের হাত থেকে প্রতিদিন এত অপমান আমাদের স্বীকার করতে হচ্চে।

আমাদের আশ্রমে রাজপুরুষদের গতিবিধি হোতে চল্‌ল সে জন্যে মাঝে মাঝে মন উৎকণ্ঠিত হয় কিন্তু এ কথাও ভাবি যে আশ্রমের রক্ষাভার যাঁর উপরে আছে তাঁর প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করা যেতে পারে। এর থেকে যদি কিছু ফল হয় সে ভালো ফলই হবে। কেবল একটি কথা মনে রাখা দরকার এদের কারো মন জোগাবার ইচ্ছা যেন আমাদের প্রলুব্ধ না করে— আমরা যেন কোনোরকম ছদ্মবেশ ধারণ করবার আয়োজন না করি। আমাদের ভাবে আমাদের কাজ আমরা করে যাব তাতে যদি আপনিই কারো ভালো লাগে তো ভালোই যদি না লাগে তো ক্ষতি নেই। কিন্তু তোমরা নিজের আদর্শের উচ্চতা সম্বন্ধে যেন লেশমাত্র সন্দিহান হোয়ো না। আজ যদি বাইরের লোক স্বীকার করে যে তোমাদের কাজের

মধ্যে সার্থকতার পরিচয় পাওয়া যাচ্চে তা হোলে সেইটিকেই অত্যন্ত বেশি মনে কোরো না— তারা ঠিক এর উল্টো কথা বল্‌তেও পারত। তোমাদের অন্তর্য্যামী যেদিন অন্তরের মধ্যে থেকে লোকচক্ষুর অগোচরে তোমাদের পুরস্কৃত করবেন সেইদিনই তোমরা আনন্দ কোরো। আমাদের চিত্তের মধ্যে দৈন্য আছে কিন্তু আমাদের লক্ষ্যের মধ্যে নেই— আমাদের পূজার আয়োজনে ত্রুটি আছে কিন্তু আমাদের দেবতার সিংহাসনে যিনি বিরাজ করছেন তিনি পরিপূর্ণ। তাঁকে আমরা যেন ছোটো করে না দেখি।

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩০

ওঁ

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

আমাদের বিদ্যালয় দেখবার জন্যে ইংরেজ অতিথির ভিড় হচ্চে কিন্তু তাঁরা দেখবার চেষ্টা করলেও ত দেখ্‌তে পাবেন না। তাঁরা যে এণ্টেন্স স্কুল দেখবার চোখ নিয়ে আসবেন, কিন্তু আমাদের এ ত স্কুল নয়। আশ্রমের ধারণা তাঁদের মনের মধ্যে নেই। তাঁরা আশ্রমকে ইংরেজি ভাষায় hermitage বলে তর্জ্জমা করে থাকেন। তাঁরা জানেন এ সমস্ত সন্ন্যাস ধর্ম্মের উপকরণ মানব সভ্যতার মধ্যযুগের জিনিষ— এখনকার কালে সে সমস্তই ঐতিহাসিক আবর্জ্জনাকুণ্ডের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে— এখনকার ঝকঝকে নতুন জিনিষ হচ্চে প্রায়মারী ইস্কুল সেকণ্ডারি ইস্কুল— বোর্ড অফ এডুকেশন। এঁরা চিরকালের জিনিষকে সকলকালের মধ্যে অখণ্ড করে দেখতে জানেন না। এঁরা নিজেদের বানানো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঐতিহাসিক গবাক্ষের ভিতর দিয়ে শাশ্বতকালকে কৃত্রিমভাগে বিভক্ত করে দেখেন— এবং মনে করেন মানুষ গুটিপোকার মত এক একটি বিশেষ ভাবের গুটি বেঁধে তার মধ্যে এক একটি বিশেষ যুগ যাপন করে। তার পরে তার থেকে যখন বেরিয়ে আসে তখন সম্পূর্ণ নূতন ডানা নিয়ে উড়ে বেড়ায় এবং পুরাতন গুটি অনাবশ্যক পড়ে থাকে। মানুষ যেন যুগে যুগে কেবল সভ্যতার চকমকি ঠুক্‌ছে— তার একটি স্ফুলিঙ্গ অন্য স্ফুলিঙ্গের সঙ্গে স্বতন্ত্র। কিন্তু ইতিহাসের ভিতর দিয়ে মানব জীবনের সমগ্রতাকে দেখাই হচ্চে যথার্থ দেখা। মধ্যযুগ আজও মানুষের মধ্যেই আছে নইলে মধ্যযুগেও থাকতে পারত না— তার বাহ্যরূপের হয়ত কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হতে পারে। প্রাণের ক্রিয়া রাত্রি বেলাকার নিদ্রার মত মাঝে মাঝে প্রচ্ছন্নতাকে আশ্রয় করে— তখন মনে হয় বুঝি সে বিলুপ্ত হল কিন্তু জাগরণের দিনে দেখতে পাই মৃত্যুর আবরণের মধ্যে অতি যত্নে সে রক্ষিত হয়ে ছিল। য়ুরোপের মধ্যযুগে একদা সাধকেরা আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যোগসাধনাকে একান্তভাবে গ্রহণ করেছিলেন— দীর্ঘকাল য়ুরোপ তাকে Mysticism নাম দিয়ে তার ভাঙা কুলোর মধ্যে ঝেঁটিয়ে রেখে দিয়েছিল। কিন্তু এককালে মানুষ যাকে সর্ব্বান্তঃকরণের ব্যাকুলতা দিয়ে স্বীকার করেছে অন্যকালে তাকে অসত্য এবং অপ্রয়োজনীয় বলে বর্জ্জন করবে এ হতেই পারে না। একদিন সে জেগে উঠে দেখে মধ্যযুগের সত্য এ যুগেও আছে। আত্মার যে ক্ষুধা তখন যে অমৃত স্তন্যের জন্যে কেঁদেছিল আজকের দিনের নূতন প্রভাতে তার সেই কান্না সেই স্তন্যকেই চাচ্চে। একদিন আমাদের দেশে বিদ্যাশিক্ষার যে ব্যবস্থা ছিল তার মূল আশ্রয় ছিল পরাবিদ্যা— পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধনকেই মুখ্য লক্ষ্য করে সমস্ত

বিদ্যাকে তার উপযুক্ত স্থান দেওয়া হত। মানুষের জ্ঞানকে ভক্তিকে শুভ বুদ্ধিকে বিচ্ছিন্ন করা হত না। অবশ্য তখন জ্ঞানের উপকরণ এত বহুবিস্তৃত ছিল না। এখন অনেক শিখ্‌তে হয় বলে শিক্ষা ব্যাপারকে ভাগ করতে হয়েছে; কিন্তু মানুষের প্রকৃতিকে ত ভাগ করে ফেলা যায় না— হাতের দরকার বেড়েছে বলেই ত পাকে শুকিয়ে ফেল্লে চলে না। বিদ্বান মানুষ বা ব্যবসায়ী মানুষেরই খাতিরে পরম মানুষের চরম লক্ষ্যকে ত কোনো একটা মধ্যযুগের জীর্ণ বস্তার মধ্যে অনাবশ্যক ছাপ মেরে ফেলে রাখা যায় না। এই জন্যে আশ্রমেই মানুষকে শিক্ষা করতে হবে ইস্কুলে নয়। তার মুখ্য প্রয়োজনের সঙ্গেই তার গৌণ প্রয়োজনকে মিলিয়ে দেখতে হবে— বিচ্ছিন্ন করতে গেলেই মানুষের মর্ম্মে আঘাত দেওয়া হবে— তাতে এমন সকল সমস্যার সৃষ্টি হবে কোনো কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা যার সমাধান সম্ভবপর হতে পারে না। এখনকার ইস্কুল বিদ্যাশিক্ষার কল কিন্তু কলের মধ্যে ত জীবনের সৃষ্টি হয় না,— মানুষের জীবন প্রবাহকে চির জীবনের পথে পরিপূর্ণ করে তোলাই হচ্চে শিক্ষার লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য বর্ত্তমান যুগ কিছুকালের জন্য বিস্মৃত হয়েছে বলেই যে সে প্রাচীন যুগের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠেছে এ কথা একেবারেই অগ্রাহ্য। তাকে পুনর্ব্বার বুঝতে হবে তার সেই প্রয়োজন আছে এবং তাকে তদুপযুক্ত প্রণালী অবলম্বন করতে হবে। আমাদের আত্মার সেই নিগূঢ় প্রায়োজনবোধই আশ্রমকে আশ্রয় করেছে এবং নানা প্রকারে এখানে আপনার বাসা বাঁধছে। এই আশ্রমে গুরুর সঙ্গে শিষ্যের গভীর যোগ কেননা এখানে উভয়েই ছাত্র— এখানে বিদ্যার সঙ্গে ধর্ম্মের ভেদ নেই কেননা উভয়েই এক লক্ষ্যের অন্তর্গত। এখানে জীবনের সাধনা নদীর স্রোতের মত সমগ্রভাবে সচল; স্নানাহার পাঠাভ্যাস খেলা উপাসনা সমস্তই সাধনার পথে প্রবাহিত। এখানে শিক্ষক যে শিক্ষাদান করচেন সে তাঁর ব্যবসায়গত কর্ত্তব্য বা নৈতিক কর্ত্তব্য নয় সে তাঁর সাধনা— তার দ্বারা তিনি তাঁর হৃদয়গ্রন্থি মোচন করচেন, ভূমা উপলব্ধির পথকে প্রশস্ত করচেন। এ কথা বলতে পারিনে আমাদের আশ্রমে এই সাধনাকে আমরা অবাধ করে তুলেছি কিন্তু আমাদের বীজমন্ত্র এই ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য— আমরা ভূমাকে জান্‌তে এসেছি, আমাদের সমস্ত জিজ্ঞাসা এই জিজ্ঞাসার অঙ্গ। এ কথা হঠাৎ কোনো ইস্কুল পরিদর্শককে বুঝিয়ে দেওয়া যাবে না, কিন্তু এ কথা আমাদের প্রত্যেককে সুস্পষ্ট করে বুঝতে হবে।

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩১

ওঁ

16, More's Garden
Cheyne Walk, S. W.

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

চিকিৎসার উত্তাল তরঙ্গভঙ্গ কাটিয়ে কাল বন্দরে এসে পৌচেছি। তুফান যতই প্রবল হোক্ উপর থেকে বরাবর পালে হাওয়া লাগছিল— তাই এই দিনগুলোকে নিতান্ত দুঃখের দিন বল্‌তে পারিনে। যা হোক্ অনেক দিনের একটা আপদ শরীর থেকে বিদায় হোলো। ডাক্তার বলেছে এখনো কিছুকাল সাবধান থাকতে হবে।

টুগ্‌লির বিবাহ ভালোয় ভালোয় সম্পন্ন হয়ে গেল শুনে ভারী খুসি হয়েছি। সে আমাদের আশ্রম-কন্যকা ছিল— আশ্রম দেবতার আশীর্ব্বাদ তাকে চিরদিন রক্ষা করুক। তোমার সাংসারিক কর্ত্তব্য এখন সমাধা হয়ে গেল— ঘরের দাবী সমস্ত চুকিয়ে দিয়েছ— এবার আর কোনো ওজর রইল না— এখন মানবজীবনের বড়ো দাবীগুলো চোকাবার জন্যে তোমার উপর ডাক পড়ল— আনন্দিত মনে কোমর বেঁধে লেগে যাও।

বঙ্কিমের উপর দিয়ে এবার একটা বিষম ফাঁড়া কেটে গেল। আর্ব্বানার রেলোয়ে কোম্পানির কারখানায় সে কাজ পেয়েছিল, সেখানে হঠাৎ তার মাথার উপরে একটা যন্ত্র পড়ে গিয়ে তার নাক ভেঙে মাথা ভেঙে বিষম একটা কাণ্ড হয়েছিল। এমন একটা সময় এসেছিল যখন ডাক্তার তার প্রাণের আশা ছেড়ে দিয়েছিল। যা হোক বহুকষ্টে রক্ষা পেয়ে গিয়েছে। ওখানকার রেলোয়ে কোম্পানি, ডাক্তার, অধ্যাপক ক্রক্‌স্ প্রভৃতি সকলেই খুব যত্ন করেছেন। এই বিপদের মধ্যে বঙ্কিম যে রকম মনের জোর দেখিয়েছে তাতে ওখানকার সকলেই খুব বিস্মিত হয়েছে। বঙ্কিমকে খুব শক্ত শক্ত সঙ্কটের মধ্যে আমি দেখ্‌লুম। তাতে ওর প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা হয়েছে। ওর মধ্যে যথার্থ একটি অকৃত্রিম মনুষ্যত্ব আছে— ও বীর্য্যবান পুরুষ, জীবন সংগ্রামে ও কোনোদিন পরাভূত হবে না। ওর চরিত্রবল দেখে ওখানকার লোকেরা মুগ্ধ হয়েছে। বস্তুত এই অপঘাতে ওর অন্তরে বাহিরে উপকার হোলো। রেলোয়ে কোম্পানি ওর চিকিৎসায় সমস্ত ব্যয় বহণ করছে এবং উপরন্তু এই রোগের সময়কার বেতনও পুরোপুরি দিচ্চে। তারা বলেছে বঙ্কিম সেরে উঠলে তারা ওকে আবার তাদের কারখানায় নিযুক্ত করবে। কারখানার সামান্য মজুররা পর্য্যন্ত ওর প্রতি খুব শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছে।

সুরেনের সঙ্গে এতদিন তোমাদের দেখা হয়েছে। তোমাদের যে ১৮০০ টাকা দিতে বলেছি বোধহয় পেয়েছ। সুরেনকে বলে দিয়েছি আমি যে পর্য্যন্ত না যাই তোমাদের সমস্ত আর্থিক ব্যবস্থা যেন ঠিক করে দেয়। ইতিমধ্যে সমস্ত অপব্যয়ের পথ রুদ্ধ করে যাতে যথাসম্ভব আয়ব্যয়ের সামঞ্জস্য হয় সে চেষ্টা কোরো। বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ ভার তোমাদেরই গ্রহণ করতে হবে, সে কথা আমি পূর্ব্বেই জানিয়েছি। জানুয়ারি মাসে তবে আমি নিশ্চয় জানতে পারব আমার বই থেকে ঠিক আমি কত টাকা পেতে পারব। আশা করি নিতান্ত সামান্য কিছু হবে না। কেননা এই এক বছরের মধ্যে চার সংস্করণ তো হয়ে গেল।

আমি বোধহয় অগষ্টের আরম্ভে একবার জর্ম্মানিতে যাব। ডাক্তার বলছেন সেখানে বায়ু পরিবর্ত্তনে আমি সম্পূর্ণভাবে স্বাস্থ্য ও বললাভ করতে পারব। Black Forest-এর কাছাকাছি কোথাও এক জায়গায় আড্ডা করা যাবে।

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩২

ওঁ

সবিনয় নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

জগদানন্দ, বষ্টনে কিছুদিন বক্তৃতাদি করে সম্প্রতি শিকাগোতে এসে বসেছি। বোধহয় আমার বষ্টনের পালা সম্বন্ধে অজিতের বন্ধু র‍্যাট্রের পত্রে অনেকটা খবর জানতে পারবে। আমার ইংরেজি

প্রবন্ধগুলো তোমরা দেখতে চেয়েছ। তোমাদের পাঠাতে ভয় হয় পাছে কোনো সম্পাদকের তাড়নায় সেগুলো কোনো কাগজে ছাপিয়ে বোসো। Harvard Theological Journalএ আমার প্রবন্ধ ছাপবার জন্যে অনুরোধ এসেছিল কিন্তু আমি সে কাটিয়ে দিয়েছি। যেমন করেই হোক এখানকার কাগজে আমার কিছু দিতে ইচ্ছা করেনা— এখানকার সাহিত্যের আকাশটা কেমন যেন আবদ্ধ— তার চারদিকে যেন একটা আমেরিকান গণ্ডি আছে— এখানকার ছোটবড়র আদর্শ ঠিক বিশ্বের আদর্শের সঙ্গে খাপ খায় না। মোটের উপরে সাহিত্যের তরফে এদের বিশেষ একটু দৈন্য আছে— সেইজন্যে এখানে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে। এমন কি, ভারতবর্ষের যে সমস্ত আবর্জ্জনা এদের হাটে বিকচ্চে তা দেখলে তোমরা আশ্চর্য্য হতে। অবশ্য এদের মধ্যে ওস্তাদ আছে এবং তারা আমাদের পুতুলবাজি দেখে হাসে কিন্তু তবু এখানকার জনসাধারণের কাছে এই সমস্ত বিড়ম্বনা মুহূর্ত্তকালের জন্যেও যে আসন পায় এইটেই আমার কাছে অদ্ভুত বোধ হয়। ইংলণ্ডে কোনো সভায় এরা একদিনের জন্যেও দাঁড়াতে পায় না। এইজন্যে আমাদের দেশের ছাত্রদের পক্ষে আমেরিকাটা যে ভাল জায়গা তা বলতে পারিনে। টাকার দিকে এখানে কতকটা শস্তা বটে তেমনি মালের দিকেও খেলো— এবার কলম্বিয়া কলেজের কতকগুলি বাঙালি ছাত্রকে দেখে তা বেশ স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি। কিন্তু ন্যাসনাল কলেজ থেকে যে কয়টি ছাত্র হার্ভার্ডে এসেছে তাদের খুব ভাল লাগল। স্বভাব চরিত্রে পড়াশুনায় সকল দিকেই তারা শ্রদ্ধার যোগ্য। ওখানে অধ্যাপকদের কাছে তারা বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এদের সঙ্গে পরিচয় হয়ে আমি ভারি আনন্দ পেয়েছি। এরা একটি সাধনার ভাব মনে নিয়ে এখানে এসেছে এবং সে ভাবটি এখানে এসে উৎকর্ষ লাভ করেছে— ওদিকে ন্যাসনাল কলেজের যে একটি ছাঁচে ঢালা সঙ্কীর্ণতা তাদের জীবনকে বেষ্টন করেছিল এখানে এসে সেটা তাদের সম্পূর্ণ কেটে গিয়েছে। ফিরে গিয়ে তারা ঠিক যে নিজের ক্ষেত্র খুঁজে পাবে এমন বোধ হয়না— অথচ তারা সাত বৎসরের জন্যে আবদ্ধ। এ একেবারে শাইলকের কারবার— তিন বছরের মত অর্থ-সাহায্য করে সাত-বছর ধরে প্রাণ শোষণ করা। মনুষ্যত্বকে সম্পূর্ণ মুক্তিদান করতে যারা ভয় করে তারা মনুষ্যত্বের চরম সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়। এগ্রিমেণ্টের ঘানিতে জুড়ে যে জিনিষ পাওয়া যায় সে জিনিষ এর চেয়ে আরো সস্তায় পাওয়া যেতে পারত। পৃথিবীতে নরবলি দিয়ে কোনো দিন কোনো বড় দেবতার পূজা করা চলেনি— জোর করে হাড়কাঠে বেঁধে যে অর্ঘ্য নিবেদন করা হয় অপদেবতা ছাড়া সে কারো ভোগে আসেনা। আমরা ইস্কুলেই কি আর সমাজেই কি সকল ক্ষেত্রেই মানুষের স্বাধীনতা হরণ করে তাকে পঙ্গু করে কাজ চালাতে চাই সেই জন্যেই সেইরকম খুঁড়িয়ে চলা কাজও পেয়ে থাকি।

তোমাদের

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

৩৩

ঔঁ

সবিনয় নমস্কার নিবেদন—

আশা করি এতদিনে বইগুলি তোমাদের হস্তগত হয়েছে। এগুলি যাতে ব্যবহারে লাগে সেই চেষ্টা কোরো। রথীর ইচ্ছা বইগুলো একেবারে তোমাদের লাইব্রেরীভুক্ত না হয় কারণ, যদি রথী

বোলপুরে বাসা বাঁধেন তা হোলে সেখানে নিজের ব্যবহারযোগ্য একটা স্বতন্ত্র লাইব্রেরী তাঁকে ফাঁদতে হবে। বইগুলি তোমাদের পড়া হয়ে গেলে আলাদা করে রেখে দিয়ো। Mysticism নামক একটা বই অজিতকে কিছুদিন হোলো পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল আশা করি সেটা তার হস্তগত হয়েছে।

আমার গীতাঞ্জলি ছাপতে গেছে। এখন আমার কবিতার একটা দ্বিতীয় ভাগ প্রেসে দেবার জন্যে প্রস্তুত করছি। অনেকগুলোই তর্জ্জমা করে ফেলেছি। তাতে নানা বিচিত্র রকমের কবিতা থাকবে— খুব হাল্কা থেকে খুব গম্ভীর। ওর মধ্যে ক্ষণিকার "মাতাল" কবিতাটা পর্য্যন্ত দিয়েছি। আমার এই নানাসুরের কবিতাগুলো দেখে এরা আশ্চর্য্য বোধ করে— আমার এই মণিহারির দোকানে জিনিষ তো কম জমেনি।

ক্যাম্ব্রিজের একজন ভারতবর্ষীয় ছাত্র "রাজা" নাটকটা তর্জ্জমা করতে সুরু করেছেন। এখানকার ভাবগতিক দেখে মনে হয় "রাজা" এদের ভালোই লাগবে। "ডাকঘর" এদের কী রকম লাগবে আমার সন্দেহ ছিল— বিশেষত ওর মধ্যে দইওয়ালা মোড়ল প্রভৃতি নানা ঘোরতর দিশি মসলা আছে কিন্তু যাঁরা পড়েছেন সকলেই তো বিশেষ করে ভালো বলছেন— তাই রাজা সম্বন্ধেও সাহস হচ্চে। ট্রেভেলিয়ন নামক একজন নাট্যকার ও কবি এগুলো দেখেছিলেন— তিনি বল্লেন এগুলি পড়ে আমার ভারী উপকার হয়েছে, আমি নূতন inspiration পেয়েছি।

আজ মিস্ সিন্‌ক্লেয়ারের ওখানে আমার ডিনারের নিমন্ত্রণ আছে। সেখানে Mysticism বইখানির রচয়িত্রী Evelyn Underhillএর সঙ্গে আমার দেখা হবে। শুনেছি ইনি খুব ক্ষমতাশালিনী বিদুষী। অক্টোবর মাস আরম্ভ হয়েছে, এখন থেকে লণ্ডন আবার ভর্ত্তি হয়ে উঠতে থাক্‌বে— আমার দুঃখের পেয়ালাও ভরে উঠ্‌ছে। অগষ্ট সেপ্টেম্বরে লণ্ডন উজাড় হয়ে যায়— তখন যে পারে সবাই পাড়াগাঁয়ে অথবা Continentএ বেরিয়ে পড়ে— সেই সময়টাতে লণ্ডনে একটু বেশ নিশ্চিন্ত মনে আরামে থাকা যেতে পারে। কিন্তু আমি স্থির করেছি, আমি ডিনারের নিমন্ত্রণ আর গ্রহণ করব না। চায়ের পেয়ালা পর্য্যন্ত আমার সীমা। এখানকার সামাজিকতা জিনিষটা নিতান্ত খেলা নয়। এ জিনিষটা বলহীনেন লভ্যঃ নয়। এর আদান প্রদান আলাপ প্রলাপ ক্ষীণজনের সাধ্যায়ত্ত নয়। বিশেষত আমরা শান্তিনিকেতনের মেঠো মানুষ— সেখানকার সেই মাঠ থেকে বঁড়শিতে গেঁথে একেবারে এই লণ্ডনের মাঝখানে টেনে তুলে কী রকম খাবি খেতে হয় তা বুঝতেই পারছ। ইলিনয়ে পালাতে পারলে আরাম পাওয়া যাবে আশা করছি। এঁরা ভয় দেখাচ্চেন, আমেরিকাটা তপ্তকড়া থেকে পালাতে গিয়ে জলন্ত আগুনে পড়ার মতো হবে।

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৪

Felton Hall

Cambridge Mass.

সবিনয় নমস্কার নিবেদন—

তুমি সর্ব্বাধ্যক্ষপদে পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠিত হয়েছ এতে আমি বিশেষ আনন্দ বোধ করছি। আমার তো মনে হয় এই কাজে একজন লোকের সুদীর্ঘকাল থাকা উচিত— এই পদটি ঘন ঘন ভাঙাগড়ার যোগ্য নয়— কেননা দীর্ঘকালের দায়িত্ব পেলেই তবেই মানুষ দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি রেখে একটা জিনিষকে বড়ো করে গড়ে

তোলবার জন্যে চেষ্টা করতে পারে— নইলে কাজের মেয়াদ যদি ছোটো হয় তা হোলে কাজের প্রকৃতি স্বতই, এমন কি কর্ম্মকর্তার অজ্ঞাতসারেই, খুচরো রকমের হয়ে ওঠে। দাঁড়টানার কাজে ঘন ঘন হাত বদল করলে ক্ষতি হয় না, বরঞ্চ ভালোই হয়, কিন্তু হাল ধরার কাজে একজন লোককে নিয়ত নিযুক্ত রাখতে হয়। সেইজন্যে আমার বোধ হয় সর্ব্বাধ্যক্ষ পদের মেয়াদ অন্তত পাঁচ বছর হওয়া উচিত।— রামানন্দবাবুর চিঠিতে খবর পাওয়া গেল পাঠসঞ্চয় ছাপতে ১৬৯৵০ খরচ হয়েছে— এ ঋণদায় তো আমি তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে রাখতে চাইনে— তাই যদুকে লিখে দিচ্চি কোনোমতে মাসে মাসে এই টাকাটা শোধ করে দিতে। এ বই বিশ্ববিদ্যালয়ে গৃহীত হয়নি বলেই কি হাল ছেড়ে দেওয়া উচিত? অন্য কোনো উপায়ে বিক্রির চেষ্টা করা কি উচিত হয় না? আমাদের বিদ্যালয়েও কি এ বই পাঠ্যরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে না? অন্তত এর ছাপার খরচটা উঠে গেলে তারপরে পোকায় কাটলেও ক্ষতি নেই। আমাদের দেশে বই বিক্রি করে লাভ করব এ দুরাশা আমি মন থেকে সম্পূর্ণ বিদায় করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি। এখানকার অধ্যাপক Woods আমাকে বারম্বার অনুরোধ করছেন আমার গদ্যপ্রবন্ধগুলি আমেরিকার একজন ভালো অধ্যাপককে দিয়ে বই আকারে ছাপাতে। তাঁর বিশ্বাস এদেশের পাঠকেরা এ বই আগ্রহের সঙ্গে পড়বে— ভারতবর্ষের সকল বিষয় সম্বন্ধেই এদের অত্যন্ত ভুল ধারণা, অথচ ভারতবর্ষের উপদেশ এদের গ্রহণ করবার একান্ত প্রয়োজন আছে। মনে করছি প্রস্তাবটা মন্দ নয়। আমি নিজে পাঁচটা লিখেছি, আরো দুই চারটে লিখব— অজিতও কতকগুলো তর্জ্জমা করেছেন— সবসুদ্ধ নিতান্ত মন্দ হবে না। হার্ভার্ডে এবং য়ুনিভর্সিটির অন্তর্গত দুটি ক্লাবে আমাকে এখনো তিনটে বক্তৃতা পাঠ করতে হবে। এগুলো পড়া হোলে এদের আরো আগ্রহ জন্মাবে। আর্ব্বানা থেকে বেরিয়ে পড়ে ক্রমে দুই চার জন লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়ে আমার মনে অল্প অল্প করে আশা হচ্চে যে হয়তো এখানে চেষ্টা করলে আমাদের বিদ্যালয়ের আর্থিক অভাব কতকটা দূর হোতে পারে। ওখানে একটি টেক্‌নিক্যাল বিভাগ স্থাপন করা, দুই একটি ল্যাবরেটরি পত্তন করা, পাকশালার সংস্কার এবং হাঁসপাতালের প্রসারসাধন খুব দরকার বলে মনে করি। আমার ইচ্ছা ওখানে দুই একজন যোগ্য লোক এক একটি ল্যাবরেটরি নিয়ে যদি নিজের মনে পরীক্ষার কাজে প্রবৃত্ত হন তা হোলে ক্রমশঃ আপনিই বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হবে। এখানে কয়েকজন খুব ভালো বাঙালী ছাত্র বিজ্ঞান ও দর্শন অধ্যয়ন করছেন। তাঁরা দেশে ফিরে গিয়ে কী করবেন কিছুই ভেবে পাচ্চেন না। তাঁরা উপার্জ্জনের জন্যে লোলুপ নন এবং এমন কোনো জায়গায় কাজ করতে চান যেখানে তাঁরা স্বাধীনতা পাবেন— আমি যদি এঁদের মতো লোককে নিয়ে ওখানে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বালোচনার একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পারি তা হোলে সেটা ক্রমশ খুব বড়ো হয়ে উঠতে পারে। এইটেই আমার অনেকদিনের সঙ্কল্প— ওখানে জ্ঞানানুশীলনের একটা হাওয়া বইয়ে দেওয়া চাই— সেই হাওয়া নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করতে করতে ছাত্রদের মন আপনিই অলক্ষিতভাবে বিকাশলাভ করতে পারবে। যদি এখান থেকে এই কাজের আয়োজন সম্ভবপর হয় তা হোলে সেদিকে এখন থেকে আমি একটু দৃষ্টি রাখব। কিন্তু মনে রেখো এখনো এটা আমার একটা আশা মাত্র— যদি সফল হয় তো ভালোই, যদি না হয় তা হোলে এ মায়াবিনীকে বিসর্জ্জন দিতে কোনো খরচ নেই। তত্ত্ববোধিনীকে রক্ষা করবার জন্যে তোমরা একটু চেষ্টা কোরো। ইতি

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিদ্যালয়ের কতকগুলো ভালো ছবি চাই— যে ছবি সন্তোষ পাঠিয়েছেন তাতে কোনো কাজ চল্‌বে না।

৩৫

ওঁ

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

কাল অপরাহ্ণে রোটেনষ্টাইনের শূন্য বাড়ির উপরে গিয়ে চড়াও হয়ে আমাদের চিঠিপত্রগুলো লুটপাট করে নিয়ে এসেছি। অনেক চিঠি জমেছিল, খামখা তোমার উপরে আদালতের দৃষ্টি পড়ল কেন আমি তো বুঝতেই পারছিনে। বোধ করি কোনো একটা কাগজে কোনো একটা নাম-সই প্রমাণ করবার দরকার ঘটেছিল— এতদিনে জমিদারী সেরেস্তা লীলা সম্বরণ করে সেটা বিস্মৃত হয়ে পরিষ্কার হয়ে বসেছিলে— কিন্তু পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল তোমার অনুসরণ করছে।

আমেরিকার বিদ্যালয়ে অধ্যাপনার প্রণালী আমি যতটা আলোচনা করে দেখলুম তাতে একটা কথা আমার মনে হয়েছে এই যে আমাদের বিদ্যালয়ে আমরা বই পড়াবার দিকে একটু ঢিল দিয়েছি। আমরা একদিকে যেমন ইংরেজি সোপান, সংস্কৃত প্রবেশ, প্রভৃতি অবলম্বন করে ধীরে ধীরে থাকে থাকে ভাষা শেখাবার চেষ্টা করি তেমনি সেই সঙ্গে উচিত অনেকগুলি ইংরেজি ও সংস্কৃত সাহিত্যগ্রন্থ একেবারে হূহু করে ছেলেদের পড়িয়ে যাওয়া। সেগুলো খুব বেশি তন্ন তন্ন করে পড়াবার একেবারেই দরকার নেই— তাড়াতাড়ি কোনোমতে কেবলমাত্র মানে করে এবং আবৃত্তি করে পড়ে যাওয়া মাত্র। এ রকম করে পড়ে গেলে সব যে ছেলেদের মনে থাকে তা নয় কিন্তু নিজের অলক্ষ্যে অগোচরে ভাষার পরিচয়টা মনের ভিতরে ভিতরে গড়ে উঠতে থাকে। যতদিন একজন ছেলে আমাদের ইস্কুলে আছে ততদিনে সে যদি অন্তত কুড়ি পঁচিশখানা বই যেমন করে হোক পড়ে যাবার সুযোগ পায় তাহলে ভাষার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা না ঘটে থাকতে পারে না। যেটুকু পড়বে সেটুকু সম্পূর্ণ পাকা করে পড়ে' তারপরে এগোতে দেওয়ার যে প্রণালী আছে, সেটা স্বভাবের প্রণালী নয়। স্বভাবের প্রণালীতে আমাদের মনের উপর দিয়ে পরিচয়ের ধারা দ্রুতবেগে বহে চলে যাচ্চে, কিছুই দাঁড়িয়ে থাকৃছে না। কিন্তু সেই নিরন্তর প্রবাহ ভিতরে ভিতরে আমাদের অন্তরের মধ্যে পলি রেখে যাচ্চে। ছেলেরা মাতৃভাষা একটু একটু ক'রে বাঁধ বেঁধে বেঁধে পাকা করে শেখে না— তারা যা জেনেছে এবং যা জানে না সমস্তই তাদের মনের উপরে অবিশ্রাম বর্ষণ হোতে থাকে— হোতে হোতে কখন যে তাদের শিক্ষা সম্পন্ন হয়ে ওঠে তা টেরই পাওয়া যায় না। প্রকৃতির প্রণালীর গুণ হচ্চে এই যে প্রকৃতি তার শিক্ষাকে কিছুতেই বিরক্তিকর ক'রে তোলে না। জীবন জিনিষটা চলতি জিনিষ— তাকে জোর করে একজায়গায় দাঁড় করাতে গেলেই তাকে পীড়ন করা হয়। আমি এটা বেশ বুঝতে পেরেছি ছেলেদের মনকে কোনো একটা জায়গায় ধরে রাখবার চেষ্টা করাই জড় প্রণালী— শিক্ষা ব্যাপারটাকে বেগবান করতে পারলে তবেই জীবনের গতির সঙ্গে তার তাল রক্ষা হয় এবং তখনই জীবন তাকে সহজে গ্রহণ করতে পারে। এই জন্যে অসম্পূর্ণ পড়াকে ভয় করলে চলবে না, আসলে বিলম্বিত পড়াটাই পরিহার্য্য। মুস্কিল এই যে, আমরা প্রতিদিন পদে পদে পরীক্ষার দ্বারা ফল দেখে দেখে তবেই আমাদের শিক্ষাপ্রণালীর সফলতার বিচার করি কিন্তু জীবন ব্যাপারের বিকাশ নিত্যে দেখা যায় না—

তার যে ফলটা অগোচর সেইটেই তার বড়ো সম্পদ— সেটা ভিতরে ভিতরে জম্‌তে জম্‌তে কাজ কর্‌তে কর্‌তে একদিন বাইরে অপর্য্যাপ্তভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে। শীতের সময় যখন গাছপালার পাতা ফুলফল সমস্ত বিলুপ্ত হয়ে যায় তখন যদি কোনো ইনস্‌পেকৃটর তাদের কাছ থেকে পরীক্ষাপত্র সংগ্রহ করতে আসে তা হোলে অরণ্যকে অরণ্য একেবারে ০ মার্কা পেয়ে মাথা হেঁট করে থাকে— কিন্তু বসন্ত জানে, পরীক্ষাপত্রের দ্বারা জীবনের বিচার চলে না। প্রশ্ন করলে জীবন ঠিক সময়ে উত্তর দিতে পারে না অনেক সময়ে চুপ করে বোকার মতো বসে থাকে কিন্তু একদিনে দক্ষিণে হাওয়ায় যখন তার বুলি ফোটে, তখন একেবারে অবাক হয়ে যেতে হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে শিক্ষাপ্রণালীতে আমরা জড়োপাসক, জীবনের গতিকে আমরা দেখতে পাইনে ব'লে তাকে কোনোমতে বিশ্বাস করতেই পারিনে— এতেই আমাদের অন্তরের ক্রিয়াকে পরিহার করে বাহ্য প্রক্রিয়াকেই সার করে বসে আছি। এই অন্ধতায় যে আমরা কত পীড়া ও কত ব্যর্থতার সৃষ্টি করেছি সে কথা বলে শেষ করা যায় না— ফলের প্রতি অতিরিক্ত মাত্রায় লোভ করেই আমরা বিফল হচ্চি। যাই হোক্‌ তোমাদের সংস্কৃত ও ইংরেজি অধ্যাপনার মধ্যে এখন থেকে সাহিত্যগ্রন্থ পাঠকে খুব বড়ো স্থান দিতে হবে— বছরের মধ্যে অন্তত দুখানা বই পড়ে শেষ করা চাই— সে পড়া যে খুব পাকা গোছের পড়া হবে না একথাও মনের মধ্যে জেনে রাখতে হবে— তাতে দুঃখ পেলে কিম্বা হতাশ হলে চলবে না— এই রকম অনুশীলনের ফলটা তিনচার বৎসর চেষ্টার পরে তোমরা জান্‌তে পারবে।

ম্যাকমিলানরা গীতাঞ্জলির দ্বিতীয় সংস্করণ বের করেছে, কিন্তু সেটা এই কয়দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে Nineteenth Century প্রভৃতি অনেক কাগজেই ঐ বইয়ের যথেষ্ট প্রশংসা বেরিয়েছে— কিন্তু সে সমস্ত সংগ্রহ করে তোমাদের আর কত পাঠাব। সেখানে থেকেও তোমরা বোধ হয় অনেকটা দেখতে পাচ্চ। যখন এ চিঠি তোমাদের হাতে গিয়ে পৌঁছবে তখন বিদ্যালয়ের ছুটি— কিন্তু ছুটিতে তোমাকে বোধ হয় বিচলিত করতে পারবে না। তুমি তোমার কুটীরের কোণে অচলপ্রতিষ্ঠ হয়ে আছ। যে Cuttingগুলো পাঠালুম তার মধ্যে যেটাতে Yeats-এর বক্তৃতার রিপোর্ট আছে সেইটে রামানন্দবাবুকে পাঠিয়ে দিয়ো— এই বিষয়টা Modern Reviewতে আলোচনার যোগ্য। যথার্থ দেশের গৌরববৃদ্ধি করবার উপায় কী এ সম্বন্ধে ঐ বক্তৃতায় আভাস আছে। রবি সিংহের সেই সন্ন্যাসীর বেশটা সত্বর রোটেনস্টাইনকে পাঠিয়ে দেওয়া দরকার। তাকে যেটা দেওয়া হয়েছিল সেটা কোনো কাজেরই নয়।— Globeএর সমালোচনা রামানন্দবাবু পেলে বোধ হয় খুসি হবেন। খুব মন খুলে লিখেছে।

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৬

ওঁ

প্রীতিনমস্কার নিবেদন,

জগদানন্দ, চিকাগোয় থাকতে সেখানকার একটি ভালো বিদ্যালয় দেখতে গিয়েছিলুম। সেখানে দেখবার জিনিস ঢের আছে। কিন্তু তাদের সমস্তই বহুব্যয়সাধ্য ব্যবস্থা, দেখে আমাদের পক্ষে বিশেষ

লাভ নেই। কেবল অঙ্ক শেখাবার একটা যা প্রণালী দেখলুম সেইটে তোমাকে লিখচি। এরা ক্লাসে একটা খেলার মত করে সেটা হচ্চে Banking। তাতে পুরোপুরি ব্যাঙ্কের কাজের সমস্ত অভিনয় হয়। চেকবই, ভাউচার, হিসাবপত্র সবই আছে। ছেলেদের কারো বা চিনির ব্যবসা, কারো বা চামড়ার— সেই উপলক্ষ্যে ব্যাঙ্কের সঙ্গে তাদের লেনাদেনা এবং তার লাভ লোকসান ও স্থদের হিসাব ঠিক দস্তর মত রাখতে হচ্চে। এতে অঙ্ক জিনিসটা এরা গোড়া থেকেই সত্যভাবে দেখতে পায়। ছেলেরা খুব আমোদের সঙ্গে এই খেলা খেলচে। তোমার মনে আছে কিনা বল্‌তে পারিনে, কিন্তু আমি বহুকাল পূর্বে আমাদের বিদ্যালয়ের অঙ্কের ক্লাসে এই দোকান রাখার খেলা চালাবার চেষ্টা করেছিলুম। গণিতশাস্ত্রে আমার বিদ্যার পরিমাণ গণনায় অতি যৎসামান্য বলেই আমি এ জিনিসটাকে খাড়া করে তুলতে পারলুম না। তখন জ্ঞানবাবু অধ্যাপক ছিলেন। কোনো জিনিস নূতন প্রণালীতে গড়ে তোলার শক্তি তাঁর ছিল না। এইজন্যে এটা ছেড়ে দেওয়া হল। কিন্তু অঙ্ক জিনিসটা কি এবং তার ভুল জিনিসটা যে কেবল নম্বর কাটার বিষয় নয় সেটা যে যথার্থ ক্ষতির কারণ এটা খেলাচ্ছলে ছেলেদের দেখিয়ে দিলে সেটা ওদের মনে গাঁথা হয়ে যায়। ছোট ছোট কাপড়ের বস্তায় বালি পুরে অনায়াসে এই খেলার আয়োজন করা যেতে পারে— অবশ্য খাতাপত্র ঠিক দস্তর মত রাখতে শেখাতে হয়। এই জিনিসটাতে ওদের হাত দুরস্ত হলে প্রত্যেক ঘরেই আমরা বিদ্যালয়ের ডিপজিটের কাজ স্বতন্ত্র করে চালাতে পারি। প্রথমটা এটা গড়ে তুলতে একটু ভাবতে এবং খাটতে হয় কিন্তু তার পরে কলের মত চলে যাবে। আতার বীচি তেঁতুল বীচি দিয়ে টাকা পয়সার কাজ চালাতে পার— কাগজ কেটে কতগুলো নোটও তৈরি করে নিতে পারো— এতে ওদের আমোদও হবে শিক্ষাও হবে। এই জিনিসটা একটু ভেবে দেখো। এদের ইস্কুলে এই জিনিসটার নূতন প্রবর্তন হয়েছে— আমরা এদের অনেক আগে এই প্রণালীর কথা চিন্তা করেছি। কিন্তু আমরা বাঁধা রাস্তার বাইরে কিছুই করতে পারলুম না— আর এরা অনায়াসে এগিয়ে যাচ্চে— এইটে দেখে আমার মনে দুঃখবোধ হল।

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৭

ওঁ

De Duinev
Huizen N. H.

সবিনয় নমস্কার নিবেদন—

হল্যাণ্ডে একটি সুন্দর জায়গায় সুন্দর বাড়ীতে এসেচি; অদূরে সমুদ্র; চারিদিকে বাগান ফলে ফুলে সুরম্য, পাখীর গানে মুখরিত। শরতের সূর্য্যালোক এই মনোহর জায়গাটির উপরে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছে। যিনি গৃহকর্ত্রী তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধার সঙ্গে আমাদের যত্ন করচেন সুতরাং দেবে মানবে মিলে যখন আমাদের আতিথ্যে নিযুক্ত হয়েচেন তখন ত্রুটি কোথাও থাকতে পারে না। প্যারিসে আমরা যাঁর আতিথ্যে ছিলুম তিনিও আমাকে একান্ত যত্নে সমাদর করেচেন। তিনি খুব ধনী অথচ আহারে ব্যবহারে সন্ন্যাসীর মত। মানুষের কল্যাণের জন্যে তাঁর মনে যে সব সঙ্কল্প আছে তাতেই অহরহ তাঁর সমস্ত শক্তি ব্যয় করচেন। এখানকার যাঁরা বড়লোক মানুষের ইতিহাসকে সমস্ত ভাবীকালের মধ্যে প্রসারিত

করে তাঁরা দেখেন। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, দেশকালের ক্ষেত্র আমাদের পক্ষে অত্যন্ত ছোট হয়ে গেছে, এইজন্যে আমাদের শক্তিকে আমরা বড়ো করে ফলাতে পারিনে। শক্তি যেখানে রস পায় না, খাদ্য পায় না, সেখানে মরুভূমির গাছপালার মত কেবল প্রচুর কণ্টক বিকাশ করে।

দেশে আজকাল কী সব গোলমাল চল্‌ছে দূর থেকে তার অল্প আভাস পাই। আমাদের গুমটের দেশে এ সব গোলমাল ভালো,—মনকে তার সঙ্কীর্ণ গণ্ডি থেকে জাগিয়ে তোলে। কিন্তু গোলমালেরই আবার নিজের একটা গণ্ডি আছে। অন্ধকার আমাদের পথ ভোলাবার ওস্তাদ বটে কিন্তু আলেয়ার আলোও পথ ভোলায়। দেশব্যাপী গোলমালের মধ্যে যদি সত্যের অভাব ঘটে তা হলে সে আমাদের ঘূর্ণির মধ্যে ঘুরিয়ে বেড়ায়, কোথাও এগোতে দেয় না। ঘোরো গণ্ডি আমাদের ধরে রাখে, উত্তেজনার গণ্ডি আমাদের ঘুরপাক খাওয়ায়। দুয়েরই পরিধি সঙ্কীর্ণ। একটা স্থির গণ্ডি, আর একটা চল্‌তি গণ্ডি; একটাতে ঘুম পাড়ায়, আর একটাতে মাথা ঘোরায়। সত্য হচ্চে পরমা গতি, অর্থাৎ এমন গতি যার প্রত্যেক পদক্ষেপেই সার্থকতা। আর মোহ হচ্চে সেই গতি যার চলায় সার্থকতা আনে না, কেবল নেশা আনে। একটা হচ্চে ধনাত্মক গতি, আর একটা হচ্চে ঋণাত্মক গতি। দেশ জুড়ে যখন তোলাপাড়া ঘটছে তখন ভালো করেই ভাবতে হবে, এই গতির প্রকৃতি কি। যে জলে স্রোত প্রবল কিন্তু তট অবর্ত্তমান সে-ই হচ্চে বন্যা। বন্যায় ভাঙে, ভাসিয়ে দেয়, ফসল নষ্ট করে। আমাদের দেশে যে আবেগ এসেছে সে যদি একমাত্র ভাঙনেরই বার্ত্তা নিয়ে আসে তা হোলে অনাবৃষ্টির শুকনো ডাঙা থেকে অতিবৃষ্টির অগাধ ক্ষতির মধ্যে ডুবে মরতে হবে। আমার অনুরোধ এই যে, মন যখন কোনোমতে জেগেছে, তখন সেই শুভ অবকাশে মনটাকে কষে কাজে লাগিয়ে দাও, অকাজে লাগিয়ে শক্তির অপব্যয় কোরো না। Non-Co-operation (নন্‌-কো-অপারেশ্যন) অকাজ —তার আবির্ভাব অন্তিমে। শাস্ত্রে বলে কর্ম্মের দ্বারাই কর্ম্ম থেকে মুক্তি, নৈষ্কর্ম্মের দ্বারা নয়; পাস করার দ্বারাই ইস্কুল থেকে মুক্তি, আমার মত ইস্কুল ত্যাগ করার দ্বারা নয়। আজ সময় এসেছে নিজেদের সব কাজ নিজেরা মিলে করতে হবে। সে কাজ কতখানি বাহ্যফল দেবে তা ভাববার দরকার নেই, কিন্তু কাজের উপলক্ষ্যে আমাদের যে মিল সেই মিলই সত্য মিল,— সেই সত্য মিলই হচ্চে চরম লাভ। অ-কাজ করবার উপলক্ষ্যে যে মিল সে কখনই সত্য এবং স্থায়ী হোতে পারে না। আহারে শরীরে যে শক্তি আনে সেইটাই শ্রেয়, মদের নেশায় যে শক্তি তার বেগ আপাতত বেশি হলেও পরিণামে প্রতিক্রিয়ার দিনে তার হিসাব নিকাশ হতে থাকে। গীতা বলেছেন—স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ—সত্যের মিলও অল্প যেটুকু দেয় সেও মস্ত বড়, আর ক্রোধের মিল, খিলাফতের মিল, এমন বর দিতে পারে যাকে নিয়ে কোথায় ফেলব ভেবে অস্থির হোতে হবে। মিথ্যা জোড় যখন ভাঙে তখন ভালোয় ভালোয় সরে যায় না, নিজের মধ্যে দমাদ্দম মাথা ঠোকাঠুকি করতে থাকে। এই জন্যে আবার একবার দেশকে এই কথা বলবার সময় এসেছে, যে, সমিধ যদি সংগ্রহ হয়ে থাকে তবে সে যজ্ঞ করবার জন্যই, দাবানল জ্বালাবার জন্যে নয়। একদিন আমি স্বদেশী সমাজে যা বলেছিলেম আবার সেই কথাই বল্‌তে চাই। আমরা যে রাগারাগি করছি তার গতি বাইরের দিকে অর্থাৎ অন্য পক্ষের দিকে, অর্থাৎ পরে তার কর্ত্তব্য করেছে, কি, না-করেছে, সেইটেই তার মুখ্য লক্ষ্য। ভিক্ষা করবার বেলাতেও সেই লক্ষ্যই প্রবল। আমি

বলি আপাতত বাইরের পক্ষকে ভোলো। পরের সঙ্গে অসহকারিতার দিকেই সমস্ত ঝোঁক দিয়ো না। নিজের লোকের সঙ্গে সহকারিতার দিকেই সমস্ত ঝোঁক দাও। আমাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পূর্ত্তকার্য্য, বিচার প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যভার সম্পূর্ণভাবে নিজের হাতে নেব এই পণ করো। সেজন্যে সমস্ত দেশ জুড়ে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার দরকার। গান্ধিজি সেই প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করে আমাদের প্রত্যেককে কাজে আহ্বান করুন, অকাজে না। আমাদের কাছ থেকে টাকার এবং কাজের খাজনা তলব করুন। আমাদের অন্নকষ্ট, জলকষ্ট, পথকষ্ট, রোগকষ্ট, সমস্ত নিজেরা দূর করব বলে আমাদের সত্যাগ্রহ করান। তার বাহ্যফল আপাতত কী হবে তার হিসাব করবার কোনো দরকার নেই, কিন্তু এই সত্য গ্রহণ ও পালনের ফল গভীর ও স্থায়ী। স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু। আমাদের সংযোজনের দরকার আছে, কিন্তু সেই যোগ শুভবুদ্ধির যোগ, যে বুদ্ধি আমাদের পুণ্যকর্ম্মে নিযুক্ত করে। সেই কল্যাণ কর্ম্ম আমাদের শুভবন্ধনে বাঁধে বলেই অশুভ বন্ধন থেকে স্বতই মুক্তি দেয়। আমাদের দেশের অতি লক্ষ্মীছাড়া পলিটিক্স্ এই সহজ কথা আমাদের ভুলিয়ে দিয়েছে।

আশ্রমের নানা খবর নানা লোকের কাছ থেকে পাই, প্রায় সবই সুখবর। সকলেই বল্‌ছে আশ্রমের ভিতরকার আত্মশক্তি জাগ্রত হয়ে উঠেছে। শুনে আমি ভারি আনন্দলাভ করছি। আশ্রমের ভিতরকার কাজ তোমরা সম্পূর্ণ আপনার ক'রে গ্রহণ করো— আমার কাজ হবে বাইরের জগতের সঙ্গে আশ্রমের যোগ স্থাপন করা। আমি নিজেই আগে জানতুম না তার আয়োজন এমন করে তৈরি হয়ে আছে। সুরুলের রাস্তা নিয়ে আমাদের কত নালিশ কত দরবার করতে হয়েছিল, কিন্তু শান্তিনিকেতন থেকে য়ুরোপের রাস্তা আমাদের অগোচরে কিছুদিন আগে থেকে আপনিই প্রস্তুত হচ্ছিল। তোমরা শুনে আশ্চর্য্য হবে হল্যাণ্ডে শান্তিনিকেতনের আদর্শে একটি বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে ইতিমধ্যে একদিন যাব। শান্তিনিকেতনে য়ুরোপীয় ছাত্রদের স্থান শীঘ্রই দরকার হবে। শান্তিনিকেতন থেকে দূরে এসে দূরের মানুষকে শান্তিনিকেতনের নিকটের মানুষ করবার এই যে ভার নিয়েছি এ ব্যর্থ হবে না— কেননা এতে আমার তপস্যা আছে— এই তপস্যার মস্ত তাপ হচ্চে বিরহের তাপ। আশ্রমের জন্য প্রতিদিনই মন উৎকন্ঠিত হয়ে ওঠে— সেই উৎকণ্ঠার দুঃখই আমার পূজার নৈবেদ্য। হল্যাণ্ডে আমার আদর অভ্যর্থনার বিবরণ লিখে সময় নষ্ট করতে পারব না— সে সব কথা পরে হবে, যদি মনে থাকে। রথীর কাছ থেকে বোধ হয় নিয়মিত সমস্ত খবর পেয়ে থাকো। পরশু থেকে পিয়ার্সন আবার আমার সঙ্গ নেবেন তখন থেকে তাঁর চিঠিতেও আমাদের সব খবর পাবে। এ চিঠি যখন তোমাদের হাতে পৌছবে তখন আমরা আমেরিকায়। সেখানে গিয়ে চিঠিপত্র লেখা আরো দুঃসাধ্য হবে। ইতি ৩ আশ্বিন ১৩২১

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৮

ওঁ

সবিনয় নমস্কার নিবেদন,

ভেসে ভেসে চলেচি। জাপানের পালা শেষ হয়ে এল। আর হপ্তাখানেক পরে আমেরিকায় রওয়ানা হচ্চি। সেখানে ঘূর্ণি হাওয়ার মত শহর থেকে শহরে বক্তৃতার ধুলো উড়িয়ে উড়িয়ে পশ্চিম সমুদ্রতীর

থেকে স্থরু করে পূর্ব সমুদ্রতীর পর্যন্ত ছুটতে হবে। আমার মত ঘোরতর কুণো এবং কুঁড়ে মানুষের ঘাড়েই এই রকম দায় চাপে। দিব্যি সেই আমার দোতলার ছাদটার উপর আরাম কেদারা নিয়ে রাত দুপুর একটা পর্য্যন্ত চুপ করে পড়ে থাকতুম, আকাশের তারাগুলি টু শব্দ করত না ; সকাল বেলা সেই পূর্ব আকাশ তার প্রথমজাত আলোক-দূতটিকে আমার জানলার কাছে পাঠিয়ে দিত ; তার পরে সমস্ত দিন খানিকটা ছোটদের কলরব, খানিকটা বড়দের আলাপ আলোচনা, খানিকটা লেখা, খানিকটা পড়া, খানিকটা ভাবা এমনি করে জীবনটা ছোট একটি গিরিনদীর মত বয়ে চলে যেত। আমাকে টেনে বের করে আনলে এই ঘরছাড়া জগৎটার মাঝখানে, এই হট্টগোলের বুকের ভিতরটাতে। আর আমার সেই নিভৃতে সেই আমার পূর্ব উদয়াচলের নির্জন পাদমূলে ফিরে যাবার জো নেই—এখন এই প্রকাণ্ড প্রচণ্ড অশান্ত পশ্চিমের মধ্যে এসে পড়েচি। এখন রাখাল ছেলের মত গাছের ছায়ায় আপনমনে বাঁশী বাজাবার দিন আমার চলে গেল, এখন তুরী ভেরী দামামা নহবতের বায়না নিয়ে বসে আছি। অতএব চল্লুম পশ্চিম হতে পশ্চিমে। কিন্তু সমস্ত মনটা পড়ে আছে সেই মাঠের ধারে সেই শালগাছের তলায়,— কেননা সেইখানেই, যিনি সকলের চেয়ে বড় তিনি সকলের চেয়ে ছোটদের কাছে গরীবের মত হয়ে দেখা দিয়েছেন, আর এখানে কেবল তাঁর ভোজপুরী দারোয়ানদেরই দেখতে পাই, ভারী মোটা সোটা সিদ্ধি খেয়ে ভোঁ হয়ে আছে।

এণ্ড্রুজ সাহেব ফিরে যাচ্চেন— এই চিঠি পৌছবার দিন পনেরোর মধ্যে তিনি পৌছবেন। কিন্তু তখন বিদ্যালয় বন্ধ— সেইটি আমার ভালো লাগচে না। এণ্ড্রুজের সমস্ত গল্প যখন পুরোনো হয়ে গেছে, তখন আমার ছেলেরা তাঁর কাছ থেকে বাসি খবর শুনতে পাবে।

পটলের[১] পাশ করার খবর পেয়ে খুসি হলুম। তাকে আমার আশীর্বাদ জানিয়ো। আর আশ্রমের ছেলেদের আমার আশীর্বাদ দিয়ো। ইতি ৯ই ভাদ্র ১৩২৩

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৯

ওঁ

বিনয় সম্ভাষণ পূর্ব্বক নিবেদন—

যখন ঠাণ্ডা পড়েচে তখন কিছুদিন দেরি করে ছুটি দেওয়াই ভাল। তাহলে ছেলেরা বাড়ি থেকে পেট ভরে আম খেয়ে আসবার সময় পায়। বৈশাখের শেষে যদি ছুটি হয় তাহলে আষাঢ়ের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত ছুটি চলে— ততদিনে বৃষ্টি পড়ে বেশ ঠাণ্ডা হবার সম্ভাবনা থাকে।

সিউড়িতে কলেরা হচ্চে শুনে উদ্বিগ্ন হলুম। পরীক্ষা দিয়ে ছেলেরা ভালোয় ভালোয় ফিরলে নিশ্চিন্ত হব।

আমাকে তোমরা কমলালেবু পাঠাবে এ আমি প্রত্যাশা করি নি। শান্তিনিকেতনে থেকে আমি গীতার উপদেশ পালন করবার স্থযোগ পেয়েছি— ওখানে ফলের গাছ রোপণ করা পর্য্যন্ত আমার অধিকার

১ জগদানন্দ রায়ের পুত্র

—কিন্তু সেই অধিকার "মা ফলেষু কদাচন"—ওখানে বিদ্যালয় স্থাপন হওয়ার পর থেকে ফলের আশা একেবারে ছেড়ে দিয়েচি।

এবারে বিদ্যালয়ে ইংরেজি ক্লাসের অত্যন্ত ক্ষতি হল। এ ক্ষতি পূরণ হবে না। যা কাঁচা রইল তা শেষ পর্য্যন্ত থেকে যাবে। একটা বিষয়ে বিশেষ মন দিয়ো—ভবিষ্যতে ক্লাস বসবার সময়টা যেন যথানিয়মে আরম্ভ হয়—আমাদের শৈথিল্যবশত ঐ সময়টার অনেকটা বাদ পড়ে—তার প্রতিকার করা কর্ত্তব্য।

বিদ্যালয়ের পাকশালা বিভাগের নূতন কোনো ব্যবস্থা হয়েচে কি? অর্থাৎ ছেলেরা অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে সকলে মিলে তার একটা ভার নিতে পেরেচে কি? এ সম্বন্ধে আদ্যবিভাগের ছেলেদের মন প্রসন্ন হয়েচে ত?

বড়দাদা উত্তরোত্তর সুস্থ হয়েচেন। জ্বর নেই কাশিও নেই—প্রতিদিন বল পাচ্চেন। কিছুকাল পূর্ব্বে Lowes Dickenson-এর রচিত একখানি বই ক্ষিতিবাবুকে পড়তে দিয়েছিলুম—নাম ভুলে গেছি। যদি পড়ে থাকেন তবে এতদিনে পড়া হয়ে গেছে, যদি পড়া না হয়ে থাকে তাহলে বোধ হয় হবে না। বিচিত্রা সেই বইখানি চান।

আমি ক্লান্ত আছি। ইতি ১৮ই চৈত্র ১৩২৪

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪০

ওঁ

সবিনয়-নমস্কার-সম্ভাষণমেতৎ—

এবার তোমাদের ছুটি কবে আরম্ভ হবে জানিনে—তাই এই চিঠিগুলি তোমার জিম্মায় পাঠাচ্ছি,—যথামত বিলি করে দিও। আমার দেশে ফেরবার সময় কাছে এসেচে। একদিকে মন যেমন খুসী হচ্চে, তেমনি আর-একদিকে ভয় লাগ্‌ছে পাছে দেশের লোকের সঙ্গে আমার সুর না মেলে। Nationalism হচ্ছে একটা ভৌগোলিক অপদেবতা, পৃথিবী সেই ভূতের উপদ্রবে কম্পান্বিত—সেই ভূত ঝাড়াবার দিন এসেছে। কিছুদিন থেকে আমি তারি আয়োজন কর্‌চি। দেবতার নাম কর্‌লে তবেই অপদেবতা ভাগে। আমাদের শান্তিনিকেতনের দরজায় সেই দেবতার নাম লেখা—আমাদের বিশ্বভারতীতে সেই দেবতার মন্দির গাঁথ্‌চি। দেশের নাম করে এখানে যদি আমরা কোনো বাধা দেবার বেড়া তুলি তাহ'লে আপনাদের দেবতার প্রবেশ-পথে বাধা দেওয়া হবে। যে ভারতবর্ষকে বহুকাল সমস্ত পৃথিবী একঘরে করে রেখেচে সেই ভারতবর্ষে সমস্ত পৃথিবীকে নিমন্ত্রণ কর্‌বার পত্র নিয়ে আমি বেরিয়েছিলুম—পাছে কিছুতে এই নিমন্ত্রণের পথ রোধ করে সেই আমার ভয়। অন্যায়কে অত্যাচারকে আমি কারো চেয়ে কম ঘৃণা করি এ কথা মান্‌তে পারব না—পঞ্জাবের ঘোর দুর্দ্দিনের সময়ে সমস্ত দেশে আমি ছাড়া আর-একজনও একটি কথাও বলেনি। আমার শরীরে রক্তের পরিবর্ত্তে বরফ-জল প্রবাহিত হচ্চে এ কথাও সত্য নয়। কিন্তু আমার বিশ্বাস দেশের চেয়েও বড় জিনিস আছে; সেই বড় জিনিসকে পেলে তবেই দেশ বড়

হবে। যে মানুষ নিজের বাড়ির সমস্ত দর্জা-জান্‌লার পথ বন্ধ করে তুলে দেয়াল গাঁথা স্থরু করে, সেই যে নিজের বাড়িকে ভালবাসে এ কথা মিথ্যে। যে গৃহস্থ বিশ্বের আকাশকে আলোককে নিজের ঘরের মধ্যে প্রবেশ কর্‌বার পথ উন্মুক্ত করে দেয়, সেই ঘরকে যথার্থ ভালবাসে। সেদিন যখন খবরের কাগজে পড়্‌লুম মহাত্মা গান্ধি আমাদের মেয়েদের বলেছেন, তোমরা ইংরেজি পড়া বন্ধ কর, সেইদিন বুঝেছি আমাদের দেশে দেয়াল গাঁথা স্থরু হয়েছে, অর্থাৎ নিজের ঘরকে নিজের কারাগার করে তোলাকেই আমরা মুক্তির পথ বলে মনে কর্‌চি— আমরা বিশ্বের সমস্ত আলোককে বহিষ্কৃত করে দিয়ে নিজের ঘরের অন্ধকারকেই পূজা কর্‌তে বসেছি— এ কথা ভুল্‌চি, যে-সব দুর্দ্দান্ত জাতি পরকে আঘাত করে' বড় হতে চায় তারাও যেমন বিধাতার ত্যাজ্য, তেমনি যারা পরকে বর্জ্জন করে' স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ক্ষুদ্র হতে চায় তারাও তেমনি বিধাতার ত্যাজ্য। এর পরে কোন দিন কথা উঠ্‌বে এণ্ড্রুজকে পিয়ার্সনকে ত্যাগ করতে হবে কেননা তারা ইংরেজ। এখানকার এক কলেজে হিন্দু ছাত্রেরা সেই দোহাই দিয়ে পিয়ার্সনকে বক্তৃতায় আহ্বান কর্‌তে অসম্মত হয়েছিল। এর মানে হচ্চে আমরা একবার যখন "না"-মন্ত্র সাধনা কর্‌তে বসি তখন তার প্রচণ্ডতা মরুবালুকার সীমানা কেবলি প্রসারিত কর্‌তে থাকে। আমি হাঁ-মন্ত্রের উপাসক— তার দেবতা হচ্চেন বিষ্ণু; তিনি দূর নিকট আত্মীয় পর সমস্তর মধ্যে প্রবেশ করে আছেন— তাঁর সাধনা যাঁরা করেন তাঁরা "সর্ব্বমেবাবিশন্তি"— তাঁদের অধিকার সর্ব্বত্র বিস্তীর্ণ হয়— তিনি "বিচৈতিচান্তে বিশ্বমাদৌ" এবং আমার একমাত্র প্রার্থনা এই— স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।" ইতি ২৪শে ফাল্গুন, ১৩২৭

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪১

ওঁ

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন

আমার এই চিঠিগুলি যখন পৌঁছবে তখন আমাদের গ্রীষ্মাবকাশ আরম্ভ হয়ে গেছে এবং আমাদের "নানাপক্ষী" "প্রভাত হইলে দশ দিকেতে গমন" করেছেন। বিশেষত এণ্ড্রুস্ পক্ষী প্রভাত না হলেও দশ দিকেতে উড়ে বেড়ান। কেবলমাত্র তুমিই একা কি প্রভাত কি রাত্রি আমাদের নীড় আগ্‌লে বসে আছ। সেইজন্যে এ চিঠিগুলি তোমারই নামে পাঠালুম— মালেকগণ যেখানে থাকুন তাঁদের কাছে পাঠিয়ে দিয়ো। দেশে ফিরতে আমার আর দেরি নেই— তোমাদের বিদ্যালয় খোলার সঙ্গে সঙ্গেই ছাত্রদের সর্দ্দার হয়ে আশ্রমে প্রবেশ করব। দেশে ফেরবার জন্যে চিত্ত ব্যাকুল হয়ে আছে, আমার সেই উত্তরায়ণের বারান্দায় আরামকেদারার দুই হাতায় দুই পা তুলে কিছুদিন খুব পেটভরে বিশ্রাম করতে পারলে আমি বাঁচি। কিন্তু বড় ভয় হচ্চে দেশে ফিরে যখন যাব তখন বিশ্রামের আশা থাক্‌বেনা— আমার কপালে কোথাও শান্তি নেই। আমার সঙ্কল্প আর দেশের উত্তেজনার সঙ্গে হয় ত মিল হবে না তখন গঞ্জনার অন্ত থাকবে না।

আপাতত নরোয়ে সুইডেন প্রভৃতি দেশে চলেছি— যতটা পারি য়ুরোপের সমস্ত দেশের সঙ্গে আমাদের যোগস্থাপন করবার চেষ্টা করতে হবে। দেশে তোমরা আছ বিয়োগের কোঠায় আমি এখানে

যোগের অঙ্ক চালাচ্ছি। সিন্ধু দেশের একজন সাধুর গল্প আছে, তিনি শিশুকালে যখন আরবী বর্ণমালা শিখ্‌ছিলেন তখন আলেফ দেখে ভারি খুসি হয়ে উঠ্‌লেন তার পরে যখন বে এল তখন মাথা নেড়ে বল্লেন, আলেফ্‌ই আছে বে নেই। তোমাদের অঙ্কের ক্লাসে আমার সেই দশা ঘট্‌তে পারে, আমি হয়ত বল্‌ব অঙ্কশাস্ত্রে যোগই আছে বিয়োগ নেই— কিন্তু মাষ্টার মশায় ছাড়বেন না আমাকে বেঞ্চির উপর এক পায়ে দাঁড় করিয়ে রাখ্‌বেন।

তোমাদের লাইব্রেরির জন্যে এবারে বই এত সংগ্রহ হয়েচে যে, কোথায় ধরবে তাই ভাবচি। আমেরিকা ও ইংলণ্ডের ম্যাক্‌মিলান তাদের বিস্তর বই আমাদের দিয়েচে। এইবেলা লাইব্রেরির জায়গা বাড়াবার চেষ্টা কোরো, নইলে কোন্‌দিন প্যাকবাক্‌সের মধ্যে উই ধরে ইঁদুর ঢুকে সর্ব্বনাশ করবে। দেশের মধ্যে আমাদের লাইব্রেরি একটা সেরা লাইব্রেরি হবে তার সন্দেহ নেই। তোমার সায়ান্‌সের বই বিস্তর সংগ্রহ হয়েচে— তোমার খোরাক তোমার ইহজীবনে ফুরোবেনা। ইতি ১০ই এপ্রেল ১৯২১

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪২

ওঁ

প্রীতিনমস্কার

জগদানন্দ, আশাকে যে চিঠি লিখেচি পড়ে দেখো। আমার ইচ্ছা পাঠভবনের পঞ্চমবর্গ পর্য্যন্ত অধ্যাপনা প্রভৃতির সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব আশার উপর পড়ে। অবশ্য তোমরা তাকে সাহায্য করবে। অনুকে লিখেচি সেও যাতে খানিকটা কাজের ভার নেয়। যদি তা সম্ভব হয় তাহলে সত্যজীবনকে উপরের বর্গে রাখাই শ্রেয়। আশঙ্কা হয় পাছে আশার চালনাধীনে কোনো অধ্যাপক প্রসন্ন মনে কাজ করতে সম্মত না হন। এ সম্বন্ধে তোমাকে সাহায্য করতে হবে। নগেন ও নরেনকেও এই বিভাগের অধ্যাপনায় রাখতে হবে। নগেন থাকবেন অঙ্কে, নরেন থাকবেন বাংলায়। আশার সঙ্গে যদি ভক্তিকে পাওয়া যায় তোমাদের অধ্যাপকের অভাব হবে না। এইটি তোমাকে দেখতে হবে, বাইরে থেকে কেউ যেন চালনাভার না নেন্, তাহলে দায়িত্বের জোর কমে যাবে। তোমরা নিজেরা পরামর্শ করেই সমস্ত ব্যবস্থা কোরো এবং নিজেরাই তার সম্পূর্ণ দায় নিয়ো।

অনুপস্থিতিকালে সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে থাকি, পাছে, কোনো উপলক্ষ্যে ছোটখাট খুঁটিনাটি বড়ো হয়ে ওঠে। সেইজন্যেই তোমার উপর অধ্যক্ষতা দেওয়া গেল— সকলকে সম্বরণ [ক'রে] চল্‌তে হবে, যেন কোন সংঘাত অপঘাত না ঘটে। তনয়কে তোমার সহযোগী পেয়েছ— ওঁর এতে খুব সুযোগ্যতা আছে, ওঁর পরে সম্পূর্ণ নির্ভর করা চলে। জুজুৎসুর পরেও দৃষ্টি রেখো। সঙ্গীতেরও ধারা যেন ক্ষীণ না হয়। দীনুকে দোলপূর্ণিমার প্রস্তাবে এখন থেকে আন্দোলিত করতে থেকো। ছেলেরা যেন নৃত্যগীতে শৈথিল্য না করে। ইতি ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র-প্রসঙ্গ

মুদ্রিত পত্রাবলী শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত। যেসব পত্র পূর্বে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত তার বিবরণ দেওয়া হল—

পত্রসংখ্যা

১৪ : দেশ ১৩৫০ শারদীয়া
৩৮ : দেশ ১৩৫০ শারদীয়া
৩৯ : দেশ ১৩৭০ শারদীয়া
১৮, ১৫ ও ১৭ : প্রবাসী ১৩৪১ চৈত্র
১৬ : প্রবাসী ১৩৪১ কার্তিক
১৯ : প্রবাসী ১৩৪২ আষাঢ়
৩৭ : প্রবাসী ১৩৪১ জ্যৈষ্ঠ
৫০ : প্রবাসী ১৩২৮ জ্যৈষ্ঠ
১৫, ১৬, ২৩,
২৬, ২৯, ৩০,
৩৫ ও ৩৬ : বিশ্বভারতী পত্রিকা
৫ : ফোটোকপি Visva-Bharati Newsএ প্রকাশিত

২৬-সংখ্যক পত্র অজিতকুমার চক্রবর্তী, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও জগদানন্দ রায়কে লিখিত
৪২-সংখ্যক পত্র শ্রীধীরানন্দ রায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত

জগদানন্দ রায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

…জগদানন্দের সম্পূর্ণ পরিচয় হয়তো সকলে জানেন না। আমি ছিলেম তখন 'সাধনা'র লেখক এবং পরে তার সম্পাদক। সেই সময়ে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়ের সূত্রপাত হয়। 'সাধনা'য় পাঠকদের তরফ থেকে বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন থাকত। মাঝে মাঝে আমার কাছে তার এমন উত্তর এসেছে যার ভাষা স্বচ্ছ সরল— বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গে এমন প্রাঞ্জল বিবৃতি সর্বদা দেখতে পাওয়া যায় না। পরে জানতে পেরেছি এগুলি জগদানন্দের লেখা, তিনি তাঁর স্ত্রীর নাম দিয়ে পাঠাতেন। তখনকার দিনে বৈজ্ঞানিক সমস্যার এরূপ সুন্দর উত্তর কোনো স্ত্রীলোক এমন সহজ ক'রে লিখতে পারেন ভেবে বিস্ময় বোধ করেছি। একদিন যখন জগদানন্দের সঙ্গে পরিচয় হল তখন তাঁর দুঃস্থ অবস্থা এবং শরীর রুগ্ন। আমি তখন শিলাইদহে বিষয়কর্মে রত। সাহায্য করবার অভিপ্রায়ে তাঁকে জমিদারি কর্মে আহ্বান করলেম। সেদিকেও তাঁর অভিজ্ঞতা ও কৃতিত্ব ছিল। মনে আক্ষেপ হল— জমিদারি সেরেস্তা তাঁর উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র নয়, যদিও সেখানেও বড় কাজ করা যায় উদার হৃদয় নিয়ে। জগদানন্দ তার প্রমাণ দিয়েছেন। কিন্তু সেখানে তিনি বারংবার জ্বরে আক্রান্ত হয়ে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়লেন। তাঁর অবস্থা দেখে মনে হল তাঁকে বাঁচানো শক্ত হবে। তখন তাঁকে অধ্যাপনার ক্ষেত্রে আহ্বান ক'রে নিলুম শান্তিনিকেতনের কাজে। আমার প্রয়োজন ছিল এমন-সব লোক যাঁরা সেবাধর্ম গ্রহণ ক'রে এই কাজে নামতে পারবেন, ছাত্রদেরকে আত্মীয়জ্ঞানে নিজেদের শ্রেষ্ঠ দান দিতে পারবেন। বলা বাহুল্য, এ রকম মানুষ সহজে মেলে না। জগদানন্দ ছিলেন সেই শ্রেণীর লোক। স্বল্পায়ু কবি সতীশ রায় তখন বালক, বয়স উনিশের বেশি নয়। সেও এসে এই আশ্রম গঠনের কাজে উৎসর্গ করলে আপনাকে। এঁর সহযোগী ছিলেন মনোরঞ্জন বাঁড়ুজ্যে— এখন ইনি সম্বলপুরের উকিল, সুবোধচন্দ্র মজুমদার, পরে ইনি জয়পুর স্টেটে কর্মগ্রহণ করে মারা গিয়েছেন।

বিদ্যাবুদ্ধির সম্বল অনেকের থাকে, সাহিত্যবিজ্ঞানে কীর্তিলাভ করতেও পারেন অনেকে, কিন্তু জগদানন্দের সেই দুর্লভ গুণ ছিল যার প্রেরণায় কাজের মধ্যে তিনি হৃদয় দিয়েছেন। তাঁর কাজ আনন্দের কাজ ছিল, শুধু কেবল কর্তব্যের নয়। তার প্রধান কারণ, তাঁর হৃদয় ছিল সরস, তিনি ভালোবাসতে পারতেন। আশ্রমের বালকদের প্রতি তাঁর শাসন ছিল বাহিক, স্নেহ ছিল আন্তরিক। অনেক শিক্ষক আছেন যাঁরা দূরত্ব রক্ষা ক'রে ছেলেদের কাছে মান বাঁচিয়ে চলতে চান, নিকট-পরিচয়ে ছেলেদের কাছে তাঁদের মান বজায় থাকবে না এই আশঙ্কা তাঁদের ছাড়তে চায় না। জগদানন্দ একই কালে ছেলেদের সুহৃদও ছিলেন সঙ্গী ছিলেন অথচ শিক্ষক ছিলেন অধিনায়ক ছিলেন— ছেলেরা আপনারাই তাঁর সম্মান রেখে চলত— নিয়মের অনুবর্তী হয়ে নয়, অন্তরের শ্রদ্ধা থেকে। সন্ধ্যার সময় ছাত্রদের নিয়ে তিনি গল্প বলতেন। মনোজ্ঞ ক'রে গল্প বলবার ক্ষমতা তাঁর ছিল। তিনি ছিলেন যথার্থ হাস্যরসিক, হাসতে জানতেন। তাঁর তর্জনের মধ্যেও লুকানো থাকত হাসি। সমস্ত দিন কর্মের পর ছেলেদের ভার গ্রহণ করা সহজ নয়। কিন্তু তিনি তাঁর নির্দিষ্ট কর্তব্যের সীমানা অতিক্রম ক'রে স্বেচ্ছায় স্নেহে নিজেকে সম্পূর্ণ দান করতেন।

অনেকেই জানেন ক্লাসের বাইরেও ছেলেদের ডেকে ডেকে তাদের লেখাপড়ায় সাহায্য করতে কখনই তিনি আলস্য করতেন না। নিজের অবকাশ নষ্ট ক'রে অকাতরে সময় দিতেন তাদের জন্যে।

কর্তব্যসাধনের দ্বারা দাবি চুকিয়ে দিয়ে প্রশংসা লাভ চলে। কর্তব্যনিষ্ঠতাকে মূল্যবান ব'লেই লোকে জানে। দাবির বেশি যে দান সেটা কর্তব্যের উপরে, সে ভালোবাসার দান। সে অমূল্য মানুষের চরিত্রে যেখানে অকৃত্রিম ভালোবাসা সেইখানেই তার অমৃত। জগদানন্দের স্বভাবে দেখেছি সেই ভালোবাসার প্রকাশ, যা সংসারের সাধারণ সীমা ছাড়িয়ে তাকে চিরন্তনের সঙ্গে যোগযুক্ত করেছে। আশ্রমে এই ভালোবাসা-সাধনার আহ্বান আছে। নির্দিষ্ট কর্ম সাধন ক'রে তার পর ছুটি নিয়ে একটি ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে নিজেকে বদ্ধ রাখতে চান যাঁরা, সে রকম শিক্ষকের সত্তা এখানে ক্ষীণ অস্পষ্ট। এমন লোক এখানে অনেকে এসেছেন গেছেন পথের পথিকের মত। তাঁরা যখন থাকেন তখনো তাঁরা অপ্রকাশিত থাকেন, যখন যান তখনো কোনো চিহ্নই রেখে যান না।

এই যে আপনার প্রকাশ, এ ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন— এ প্রকাশ ভালোবাসায়, কেননা, ভালোবাসাতেই আত্মার পরিচয়। জগদানন্দের যে দান সে প্রাণবান, সে শুধু স্মৃতিপটে চিহ্ন রাখে না, তা একটি সক্রিয় শক্তি যা সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার মধ্যে থেকে যায়। আমরা জানি বা না-জানি বিশ্ব জুড়ে এই প্রেম নিয়তই সৃষ্টির কাজ ক'রে চলেছে। কেবল শক্তি দান ক'রে সৃষ্টি হয় না, আত্মা আপনাকে দান করার দ্বারাই সৃষ্টিকে চালনা করে। বেদে তাই ঈশ্বরকে বলেছেন, 'আত্মদা বলদা'। যেখানে আত্মা নেই শুধু বল সেখানে প্রলয়।

আমি এই জানি আমাদের কাজ পুনরাবৃত্তির কাজ নয়, নিরন্তর সৃষ্টির কাজ। এখানে তাই আত্মদানের দাবি রাখি। এই দানে সীমা নেই। এ দশটা-চারটের মধ্যে ঘের-দেওয়া কাজ নয়। এ যন্ত্র-চালনা নয়, এ অনুপ্রাণন।

...এখানে তিনি তাঁর কর্মের মধ্যে কেবল সিদ্ধি লাভ করেন নি, অমৃত লাভ করেছেন। কেননা তিনি ভালোবেসেছেন, আনন্দ পেয়েছেন। আপনার দানের দ্বারা উপলব্ধি করেছেন আপনাকে।...আশ্রমে তাঁর আসন চিরস্থায়ী হয়ে রইল।

প্রবাসী ১৩৪০ ভাদ্র

জগদানন্দ রায় মহাশয়ের শ্রাদ্ধবাসরে মন্দিরে প্রদত্ত বক্তৃতা

জগদানন্দ ও বাংলা সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

অধ্যাপক টিণ্ডাল তাঁহার প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলির নাম দিয়াছিলেন—Fragments of Science for Unscientific People। বড় জিনিসের সঙ্গে এক নিশ্বাসে ছোট জিনিসের নাম করা সকল সময়ে সংগত হয় না— তথাপি সেই বড় দৃষ্টান্তের অনুকরণে বলা যাইতে পারে, এই গ্রন্থও অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণের জন্য বিজ্ঞানের টুকরার সংকলন মাত্র।

গ্রন্থকার বাঙ্গালা সাহিত্যে এতই সুপরিচিত যে, তাঁহাকে চেনাইবার ভার আমাকে লইতে হইবে না। আজকাল বাঙ্গালা মাসিক সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ দেখিলেই পাঠক বুঝিয়া লন যে, প্রবন্ধের নীচে জগদানন্দবাবুর স্বাক্ষর দেখা যাইবে। বাস্তবিক পাশ্চাত্য দেশেই হউক বা স্বদেশেই হউক, বিজ্ঞানের যে সকল উচ্চ তত্ত্ব আজকাল আবিষ্কৃত হইতেছে, এদেশে সাধারণ পাঠকের নিকট তাহার ঘোষণার ভার একা জগদানন্দবাবুর উপরই পড়িয়াছে ; অথবা তিনি তাহাই জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে অন্য যে কয় ব্যক্তি পূর্বে বৈজ্ঞানিক সমাচার ঘোষণা করিতেন, এখন তাঁহারা প্রায়ই আত্মগোপন করিয়াছেন।

এই গ্রন্থ যখন অবৈজ্ঞানিক পাঠকের জন্য লিখিত, তখন ইহার প্রতি বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের ভ্রূকুটিভঙ্গী প্রদর্শনের কোনো প্রয়োজন বা আশঙ্কা নাই। এই কথা বলিবার একটু তাৎপর্য আছে। এক দল বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এই শ্রেণীর গ্রন্থের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন না। অবৈজ্ঞানিককে তাঁহারা অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তাঁহারা মোটা হরপে লিখিয়া রাখিয়াছেন, বিজ্ঞানের দেবক্ষেত্রে অবৈজ্ঞানিক মর্ত্যজনের প্রবেশ নিষেধ।

ইহার একটু হেতু আছে। বৈজ্ঞানিকের নিকট বিজ্ঞান অত্যধিক আদরের সামগ্রী। জহুরি মণিমাণিক্যের কারবার করে ও মূল্য জানে ; বাজারের মধ্যে সে মণিমাণিক্য উপস্থাপিত করিয়া 'ইজ্জত' নষ্ট করিতে চায় না। বৈজ্ঞানিকেরা বহু পরিশ্রমে যে সকল মহামূল্য সত্যের আবিষ্কার করেন, তাহার মূল্য তাঁহারাই বুঝেন। ইতর সাধারণের সম্মুখে তাহার সমুচিত সমাদর কখনোই সম্ভবে না। কাজেই, তাঁহারা ইতরের সম্মুখে তাঁহাদের মহামূল্য সত্যগুলির উপস্থাপনে কুণ্ঠিত।

কত প্রমাণ পরম্পরা সংগ্রহের পর, কত সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও আয়াসসাধ্য পরীক্ষার পর, কত বিচার বিতর্ক বিতণ্ডার পর বৈজ্ঞানিকেরা প্রকৃতি দেবীর রহস্যলোক হইতে গুপ্ততত্ত্বের সংবাদ সঙ্কলন করেন, ইতর লোকে তাহার সংবাদ রাখে না। এই কর্মের গুরুত্ব নির্ধারণও তাহাদের পক্ষে অসাধ্য। অভিনব সত্যের আবিষ্কারে বৈজ্ঞানিকের যে বিস্ময় যে আনন্দ জন্মে, ইতরজনে তার অল্পাংশের অনুভবেও অধিকারী নহে। যে আবিষ্কারে বৈজ্ঞানিকের লোমহর্ষ উপস্থিত হয়, সেই আবিষ্কারের সংবাদে অবৈজ্ঞানিকের কিছুমাত্র ইন্দ্রিয়বিকার জন্মে না। বৈজ্ঞানিক বিস্মিত হইয়া নিরূপণ করেন, সূর্যের দূরত্ব নয় কোটি মাইল, অবৈজ্ঞানিক তাহা নির্বিকারে শুনিয়া থাকেন এবং নব্বই কোটি হইলেও তাহার বিস্ময়ের মাত্রা অধিক হয় না। আলোক সেকেণ্ডে লক্ষ ক্রোশ বেগে ভ্রমণ করে, ইহা প্রতিপাদন করিয়া বৈজ্ঞানিক

অসাধ্যসাধনের স্পর্ধায় স্পর্ধিত হন, অবৈজ্ঞানিক অতি অকাতরে তাঁহার সেই অসাধ্যসাধনসংবাদ মানিয়া লয়। তাহার কোনো ইন্দ্রিয় কোনোরূপ বিকার লক্ষণ দেখায় না। বিশ্বব্যাপী ঈথরের অথবা অভেদ্য অচ্ছেদ্য পরমাণুর অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিয়া বৈজ্ঞানিক যখন আস্ফালন করেন, তাঁহার অবৈজ্ঞানিক বন্ধু পুরাতন পুঁথির ছেঁড়া পাতা খুলিয়া তাঁহাকে দেখাইয়া দেন যে, তাঁহার চৌদ্দপুরুষ পূর্বে এই তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে; তাঁহার বিশেষ কোনো কৃতিত্ব নাই! সেই বিশ্বব্যাপী ঈথর কঠিন পদার্থ, না তরল পদার্থ, এই দারুণ সমস্যার সমাধানে বসিয়া যখন বৈজ্ঞানিকের শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়, অথবা সেই পরমাণুগুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, ইলেক্‌ট্রনে গুঁড়ায় পরিণত হইতেছে দেখিয়া যখন তিনি মাথায় হাত দিয়া বসেন, তখন তাঁহার আত্মীয়স্বজন, তাঁহার অকারণ দুশ্চিন্তার কারণ না পাইয়া তাঁহার ভবিষ্যতের জন্য চিন্তিত হন। তাঁহার প্রতিবেশীদের মধ্যে কেহ বা তাঁহাকে পাগল ঠাওরায়, কেহ বা তাঁহাকে কোনোরূপ দৈবশক্তিসম্পন্ন লোক মনে করিয়া তাঁহার বাক্য বেদবাক্য বলিয়া নির্বিকার চিত্তে মানিয়া লয়। পাগল ঠাওরানো বরং সহা যায়; কিন্তু এই নির্বিকারতা একেবারে অসহ্য। নির্জন দ্বীপের সমস্ত ক্লেশ আলেকজান্দার সেলকার্ক সহিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মত গোটা মানুষকে নূতন দেখিয়াও পশু-পাখীতে বিকার-লক্ষণ দেখায় নাই, ইহা তাঁহার অসহ্য হইয়াছিল।

অনধিকারীর নিকট তত্ত্বকথা প্রকাশে তত্ত্বদর্শীরা চিরকালই কুন্ঠিত এবং এই জন্যই অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণের সম্মুখে বৈজ্ঞানিক বার্তা উপস্থাপিত করিতে অনেক বৈজ্ঞানিক সংকোচ বোধ করেন। যত সহজ ভাষাতেই বিজ্ঞানের উপদেশ উপদিষ্ট হউক-না, অনধিকারী যে বৈজ্ঞানিক সত্যের যথার্থ তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিবে, তাহার সম্ভাবনা অল্প। জহুরি ব্যতীত ইতরলোকে মণিমাণিক্যের সমুচিত সমাদর করিবে, তাহার সম্ভাবনা অল্প। মুক্তার মালা সকলের গলায় শোভা পায় না। নরের নিকট উহার আদর হইতে পারে; কিন্তু নরের শাখাবিহারী কুটুম্বের গলায় উহার যথোচিত আদরের সম্ভাবনা কিছু বিরল।

এ সমস্তই সত্য। তথাপি বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত সময়ে অসময়ে ইতরজনকে নিকটে ডাকিয়া তাঁহাদের সম্মুখে বিজ্ঞানশাস্ত্রের গুরু-গম্ভীর তত্ত্বগুলি উপস্থিত করিয়াছেন, ইহার প্রচুর উদাহরণ আছে। অধ্যাপক টিণ্ডালের নাম পূর্বেই করিয়াছি; অবৈজ্ঞানিক জনসমাজের সহিত মাখামাখি, গলাগলি করিতে তাঁহার মত সকলে প্রস্তুত না হইতে পারেন,— কিন্তু হেলমহোৎজ, কেলবিন টেট, ক্লিকোর্ডের মত দিক্‌পালগণও তাঁহাদের দেবলোক হইতে অবসরমত নামিয়া আসিয়া বিজ্ঞানের অমৃতভাণ্ড হইতে অমৃতকণিকা মর্ত্যলোকে বিলাইতে কৃপণতা করেন নাই। স্বর্গের অমৃতের যেমন মাদকতা ছিল, বিজ্ঞানামৃতেও সেইরূপ একটা মাদকতা আছে। মাদকদ্রব্যের একটা সাধারণ লক্ষণ এই যে, অপরকে না বিলাইলে আনন্দের পূর্ণতা হয় না। বিজ্ঞানামোদীও অপরকে আপনার আনন্দের ভাগ দিতে চান; না দিতে পারিলে তাঁহাদের আনন্দ পূর্ণ হয় না। অপরকে মাতাইতে প্রবৃত্ত হইলে তখন আর অধিকারী অনধিকারী বিচার করা চলে না। ভৈরবী চক্রে সকল বর্ণই দ্বিজোত্তম হইয়া যায়, তখন জাতিবিচারের অবসর ঘটে না।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের ভূমিকা লিখিতে বসিয়া এত বড় বড় নাম ও বড় বড় কথা আনিবার হয়ত কোন প্রয়োজন ছিল না। গ্রন্থকর্তা আমাদের মতই মর্ত্যলোকের অধিবাসী; তবে দেবলোক হইতে দিক্‌পালেরা বিজ্ঞানামৃতের যে ছিটাফোঁটা যাহা মর্ত্যলোকে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন, তিনিও আমাদের মতই তাহার আস্বাদন

শান্তিনিকেতনে মাধবী-বিতানে জগদানন্দ রায়ের ক্লাস

করিয়া থাকেন এবং সেই ছিটা-ফোঁটার আস্বাদনে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন প্রতিবেশীকে অংশভাক্ করিবার জন্য আহ্বান করিয়া থাকেন। এই জন্য তিনি তাঁহার আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশীর কৃতজ্ঞতাভাজন। বাঙ্গালাদেশে তাঁহার এই উদ্যমের সহযোগী অধিক নাই। তিনি কয়েক বৎসর ধরিয়া বঙ্গদেশে অবৈজ্ঞানিক পাঠকসমাজের মধ্যে বিজ্ঞানপ্রচারের জন্য যে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, তজ্জন্য বঙ্গসাহিত্য তাঁহার নিকট ঋণী। কেননা বাঙ্গালা সাহিত্য এ বিষয়ে নিতান্ত দরিদ্র। এই গ্রন্থে সেই দারিদ্র্যের কতকটা মোচন হইবে। বাঙ্গালা সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের একান্ত অভাব। গ্রন্থকর্তা সেই অভাব মোচনে যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন আমি সেই কৃতিত্বের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয়দানের এই সুযোগ পাইয়া পরম আনন্দ অনুভব করিতেছি।

জগদানন্দ রায়ের 'প্রকৃতি-পরিচয়' গ্রন্থের ভূমিকা

জগদানন্দ রায়ের কৃতিবৈচিত্র্য

পরিমল গোস্বামী

প্রায় আটচল্লিশ বছর আগের কথা। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ। শান্তিনিকেতনে পূজোর ছুটি উপলক্ষে ঋণশোধ নাটক অভিনয়ের জন্য খুব তৎপরতা চলছে। রিহার্সাল চলছে নিয়মিত, আমি সে-সব রিহার্সালে উপস্থিত হই নি, যদিও সহপাঠীদের কেউ কেউ দর্শকরূপে সেখানে গিয়েছেন দু-এক বার।

ঋণশোধ নাটক কেমন রূপ নেবে তা আমার কল্পনার বইরে ছিল। আগে কখনো শান্তিনিকেতনের অভিনয় দেখি নি, তাই সাধারণ শৌখিন সম্প্রদায়ের আয়োজিত নাটক যেমন হয়ে থাকে, তার বেশি কিছু ভাবতে পারি নি। কিন্তু অভিনয়ে উপস্থিত থেকে অভিজ্ঞতা নতুন করে লাভ হল। অনেকগুলো দৃশ্য আজও ছবির মতো চোখে ভাসে, এত দিন পরেও। মনের উপর ছাপ এঁকেছিল বেশ ভালো রকমই।

ক্ষিতিমোহন সেনের সন্ন্যাসী-বেশী সম্রাট বিজয়াদিত্য এবং লক্ষেশ্বর-বেশী জগদানন্দ রায়, আর শেখরের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে আছে। ঠাকুর্দা কে হয়েছিলেন মনে নেই, দিনেন্দ্রনাথ সম্ভবত, কিন্তু জোর করে বলতে পারছি না।

মঞ্চে ক্ষিতিমোহনকে ক্ষিতিমোহন এবং রবীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথ রূপেই দেখেছি। কিন্তু জগদানন্দ রায় আমার চোখে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর জগদানন্দত্ব বিসর্জন দিয়ে ষোল-আনা লক্ষেশ্বর হয়ে গিয়েছিলেন। তাই আজ জগদানন্দ রায় সম্পর্কে লিখতে বসে প্রথম থেকেই মনে হচ্ছে যেন আমি ঋণশোধের লক্ষেশ্বর সম্পর্কে লিখছি।

কৃপণ লক্ষেশ্বর ছোটছেলেদের দেখলেই তাড়া করে, ছোটরা লক্ষ্মীপ্যাঁচা বলে খ্যাপায়, সেই তীক্ষ্ননাসা কৃপণাধম লক্ষেশ্বর, যে শুধু আপন সঞ্চয়ের উপর চেপে বসে তাকে রক্ষা করতে চায়, তার চরিত্র যে কি অদ্ভুত, আর সে চরিত্রের অভিনয় যে কি আশ্চর্য রকমের মনোহর, তা আজ এতকাল পরেও মনের মধ্যে জীবন্ত হয়ে আছে। ছাত্রবিদ্বেষী লক্ষেশ্বর আর ছাত্রপ্রিয় জগদানন্দ দুই সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র। লক্ষেশ্বর তার ধন-সঞ্চয়কে বেঁধে রাখতে চেয়েছিল, আর জগদানন্দ রায় তাঁর জ্ঞান-সঞ্চয়কে সবার মধ্যে অকাতরে বিলিয়ে গেছেন; আর, সরল বাংলাভাষায় বিজ্ঞান প্রচার করে বাংলাভাষাকে পুষ্ট করে গেছেন। ছোটদের জন্য যেসব বই তিনি লিখেছেন তা পড়তে গেলে বোঝা যায় ছোটদের মনে প্রবেশ করার মন্ত্র তিনি জানতেন।

লক্ষ্মীর পা রাখবার সোনার পদ্মটির দু-একটি পাপড়ি পেলে সব পাওয়ার শেষ হবে, কারণ তার বাজার-দর অনেক মনে করে সোনার পদ্ম-সন্ধানী সন্ন্যাসীর চেলা হতে যে লক্ষেশ্বরের লোভ, সেই লক্ষেশ্বর জগদানন্দ রায় রূপে সরস্বতীর হাঁসটিকে আগেই আয়ত্ত করেছিলেন, এ কথা ভাবতে আশ্চর্য লাগে। শান্তিনিকেতনে অবশ্য তাঁকে নানা ভূমিকায় (মঞ্চের বাইরের কথা বলছি) অভিনয় করতে হয়েছিল, এবং তাতে তিনি খ্যাতিলাভ করেছিলেন। নানা নাটকেও তিনি ভালো অভিনয় করেছেন, কিন্তু লক্ষেশ্বরের ভূমিকায় যিনিই তাঁকে দেখেছেন তাঁরই মনে শুধু ঐ ভূমিকাটাই সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে আছে। ঋণশোধ নাটকে যতগুলি আশ্চর্য চরিত্র আছে তাদের সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে রয়েছে লক্ষেশ্বর। লক্ষেশ্বর না হলে উপনন্দ মিথ্যা হয়ে যেত এবং ঐ সঙ্গে ঋণশোধও। সমস্ত নাটকখানিতে দার্শনিকতা ও কাব্যময়তা যে পরিমাণে আছে তার

মাঝখান দিয়ে লক্ষেশ্বরের বাস্তব বাহনে কৌতুকরসের স্রোতটি বইয়ে না দিলে ঋণশোধ হয়তো ভাবরাজ্যের মধ্যে হারিয়ে যেত। অতএব এ চরিত্রটি সৃষ্টি করাতেও যত কৃতিত্ব, অভিনয় করাতেও তত কৃতিত্ব। আমার মনে লক্ষেশ্বর তাই আজও জীবিত। তার বিস্ময় মন থেকে আজও ঘুচল না।

জগদানন্দ ছিলেন শিক্ষক। তাঁর শিক্ষকতার চেহারাটা কেমন ছিল তা কল্পনা করা সহজ হবে ভেবেই তাঁর অভিনয়-কুশলতার কথা এতখানি বলতে হল আগে। লক্ষেশ্বর চরিত্রটিকে তিনি যে ভাবে স্পষ্ট পরিচ্ছন্ন এবং বলিষ্ঠ রূপে প্রকাশ করেছিলেন তাতে এ বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না যে, শিক্ষকরূপেও তিনি তাঁর ছাত্রদের মনে এই রকম স্পষ্ট পরিচ্ছন্ন এবং বলিষ্ঠ রূপেই তাঁর শিক্ষণীয় বিষয়কে গেঁথে দেবার ক্ষমতা রাখতেন। সে ক্ষমতা অসামান্য। যে-কোনো শিক্ষকের আদর্শ।

শান্তিনিকেতনের শিক্ষক জগদানন্দ ও ঋণশোধের অভিনেতা লক্ষেশ্বর নিজেকে ব্যক্ত করার দিক থেকে এক ধরা যেতে পারে।

জগদানন্দ প্রথমে অভিনেতা হয়েছিলেন হয়তো দায়ে পড়ে। রথীন্দ্রনাথের পিতৃস্মৃতিতে দেখা যায় রথীন্দ্রনাথ ইংরেজী পড়তেন মোহিতচন্দ্র সেনের কাছে। MND পড়াবার সময় মোহিতবাবুর ইচ্ছা হল ঐ নাটকটি অভিনয় করতে হবে। সাফল্যে খুব ভরসা ছিল না, কিন্তু দুঃসাহস ছিল। রথীন্দ্রনাথ লিখছেন—

> এই অভিনয় ব্যাপার থেকে কাউকেই বাদ দেওয়া চলবে না— এই রকম স্থির হল। আমাদের গণিত শিক্ষক জগদানন্দ রায়কে Wallএর পার্ট দেওয়া হল— কারণ এই পার্টে কথা বলার পাট নেই বললেই চলে।
>
> In the same interlude it doth befall
> That I…
>
> এইটুকু বলেই জগদানন্দবাবু মঞ্চে অন্য যেসব অভিনেতা ছিলেন তাঁদের দিকে জিজ্ঞাসুভাবে তাকিয়ে রইলেন, যদি তাঁদের কেউ সেই পরের অংশটুকু ধরিয়ে দেন। বেশ একটু সময় কেটে যাবার পর শেষ দিকের কটি কথা তাঁর মনে পড়ে গেল—
>
> And thus have I
> Wall my part discharged.
>
> এই কথাটুকু ঊর্ধ্বশ্বাসে বলে যেই না তিনি দ্রুত প্রস্থান করেছেন— দর্শক-শ্রোতার দল উচ্চহাস্যে ফেটে পড়ল।

এমন মঞ্চভীরু জগদানন্দকে কল্পনা করা কঠিন। তবে রথীন্দ্রনাথ যা লিখেছেন প্রসঙ্গত সে বিষয়ে সামান্য কিছু বলা প্রয়োজন। Wallএর কথা তিনি যাকে শেষ অংশে বলেছেন, মূলত তাকে শেষ অংশ বলা যায় না। কারণ Wallএর In this same interlude দিয়ে যে কথা আরম্ভ, তার শেষ

Through which the tearful lovers are to whisper.

এবং এর পর অনেকের কথা আছে, প্রবেশ আছে, এবং সর্বশেষ Wallএর কথা—

Thus have I, Wall, my part discharged so ;
And being done, thus Wall away doth go.

মনে হয় অভিনয় কালে পার্ট সংক্ষেপ করে দেওয়া হয়েছিল— অর্থাৎ নাটকটাকেই সংক্ষেপ করা হয়েছিল।

এবং এতে আর যাই হোক, জগদানন্দ রায়ের মান রক্ষা হয়েছিল অনেকখানি, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সবখানি বলতে হলে কি বিপদই না ঘটত।

শান্তিনিকেতনে থাকতে তাঁকে বহু জাতীয় দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল, কিন্তু তার মধ্যেও বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশোনা করা এবং বিজ্ঞানের নানা বিভাগের বই রচনা করা, বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর আন্তরিক আকর্ষণ প্রমাণ করে। বাংলাদেশে এতগুলি বিষয়ে বিজ্ঞানের বই রচনা তাঁর আগে আর কেউ করেন নি, এবং পরেও কেউ করেছেন বলে আমার জানা নেই।

তাঁর বিষয়গুলি শ্রেণীভাগ করলে এই রকম দাঁড়ায়— ১. মিশ্র বিষয় ২. পদার্থবিদ্যা ৩. উদ্ভিদতত্ত্ব ৪. জ্যোতির্বিদ্যা ৫. প্রাণীবিদ্যা।

আমি তাঁর যে পুস্তকগুলি দেখেছি তার সংখ্যা পনেরো। যথা প্রকৃতি পরিচয় (১৯১১), প্রাকৃতিকী (১৯১৪), গ্রহনক্ষত্র (১৯১৫), পোকামাকড় (১৯১৯), গাছপালা (১৯২১), মাছ ব্যাঙ সাপ (১৯২৩), বাংলার পাখী (১৯২৪), আলো (১৯২৬), স্থির বিদ্যুৎ (১৯২৭), জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার (১৯২৭), চলবিদ্যুৎ (১৯২৩), চুম্বক (১৯২৪), নক্ষত্রচেনা (১৯৩১)।

জগদানন্দের জন্ম বাংলা আশ্বিন মাস। আবার তাঁর যে পনেরোখানা বই আমি সামনে নিয়ে বসে আছি, তার মধ্যে বাংলার পাখী, শব্দ, মাছ ব্যাঙ সাপ, পোকামাকড়, গ্রহনক্ষত্র, চুম্বক ও গাছপালা— এই সাতখানি পুস্তকের জন্মমাস আশ্বিন।

তা ছাড়া প্রকৃতি পরিচয়, (আষাঢ়), আলো (শ্রাবণ), নক্ষত্রচেনা (শ্রাবণ), প্রাকৃতিকী (ভাদ্র)— এই চারখানাও দেখছি কাছাকাছি সময়ে প্রকাশিত। বাকি চারখানা ব্যতিক্রম, পৌষ, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ (দুখানা)।

জন্মমাসের সঙ্গে পুস্তক প্রকাশের মাসের এতটা মিল অবশ্যই আকস্মিক। যদি তা না হয় এবং কার্যকারণ সম্পর্ক যদি কিছু থাকে তবে তা বিজ্ঞানীরা চিন্তা করুন। কোনো ব্যক্তির জন্মমাসের সঙ্গে পুস্তকপ্রকাশের মাসের সম্পর্ক থাকতেও পারে, কাকতলীয় ঘটনাও হতে পারে। অবশ্য যাঁরা আপাত-বিচ্ছিন্ন তুচ্ছ ঘটনার মধ্যেও শৃঙ্খলা আবিষ্কার করতে চান, তাঁদের এ খবরটা কাজে লাগতেও পারে।

কিন্তু এসব কথা প্রসঙ্গত। জগদানন্দের ভাষার সরলতা বিষয়ে অথবা তাঁর বুঝিয়ে দেবার নিপুণতা বিষয়ে আলোচনার আগে পটভূমিতে যিনি আছেন, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাঁর শিক্ষক খুঁজে বার করার সহজাত ক্ষমতাটা স্বীকার করে নেওয়া উচিত মনে করি। এ কথা সবারই জানা যে, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এস্টেটের কাজ থেকে ধরে না আনলে বাংলা ভাষার সর্ববৃহৎ অভিধান রচিত হত না; জগদানন্দ রায়কে এস্টেটের কাজ থেকে ধরে না আনলে বাংলাভাষায় বিজ্ঞান প্রচার এমন ব্যাপকভাবে করবার মতো একা মানুষ আর কেউ ছিলেন না।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষকসংগ্রহের পদ্ধতি বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত ব্যক্তিগতভাবে আমার জানা আছে। তবে তাঁর সৌভাগ্য ছিল এই যে, তাঁর ব্যক্তিগত আকর্ষণেও অনেকে আপনা থেকেই এসে জুটেছিলেন শান্তিনিকেতনের শিক্ষকরূপে। শিক্ষক হতে আমার পিতা বিহারীলাল গোস্বামীকেও তিনি ডেকেছিলেন যদিও বিশেষ কারণে তিনি যেতে পারেন নি। তিনি ছিলেন সাজাদপুর থানার অধীন পোতাজিয়া হাইস্কুলের হেড মাস্টার। ইংরেজী শিক্ষকরূপে এবং সমকালের লেখকরূপে তিনি রবীন্দ্রনাথের পরিচিত

ছিলেন। ইংরেজী ১৯০৮, ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে শিলাইদহ থেকে তিনি আমার পিতাকে যে চিঠি দিয়েছিলেন বিশ্বভারতীতে সেটি রক্ষিত আছে। তার অংশ এই—

সবিনয় নমস্কার পূর্বক নিবেদন,

বোলপুর বিদ্যালয়ে ইংরেজী অধ্যাপনার জন্য শিক্ষকের প্রয়োজন হইয়াছে। বেতন পঞ্চাশ—বিদ্যালয়গৃহেই বাস করিয়া অন্যান্য অধ্যাপকদের সহযোগে ছাত্রদের পর্যবেক্ষণভার লইতে হয়।··· লোকের অভাবে ক্ষতি হইতেছে অতএব আপনার মত জানাইতে বিলম্ব করিবেন না। আমি ফাল্গুন মাস এখানেই যাপন করিব স্থির করিয়াছি যদি সুবিধামত আমার সহিত সাক্ষাৎ করা সম্ভবপর হয় তবে সকল কথা আলোচনা হইতে পারিবে।···ইতি ৫ই ফাল্গুন ১৩১৪।

বিদ্যালয়ের সফলতার জন্য কবির মনে যে ব্যাকুলতা ছিল তার কিছু আভাস হয়তো এ চিঠিতে পাওয়া যাবে।

লক্ষেশ্বর-বেশী জগদানন্দ রায় ঋণশোধের সন্ন্যাসী-বেশী রাজা ক্ষিতিমোহন সেনকে বলেছিলেন, "ঠাকুর, চেলা ধরা ব্যবসা দেখছি তোমার।"— এই কথাটা পরিবর্তন করা যেত এই ভাবে, "(রবীন্দ্রনাথ) ঠাকুর, শিক্ষক ধরা ব্যবসা দেখছি তোমার।"

জগদানন্দের বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ তাঁর ছাত্রাবস্থা থেকেই ছিল। এই সূত্রেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটে, তার পরের ইতিহাস তাঁর সমস্ত জীবনের ইতিহাস।

বিজ্ঞান বিষয়ে বিবিধ পুস্তক রচনার মূল প্রেরণা অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। কারণ তাঁর নিজের উপরেও বিজ্ঞানের প্রভাব পড়েছে শৈশব থেকে, অতএব তাঁর বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ ছিল আন্তরিক।

জগদানন্দের জন্ম ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর প্রথম বই (আমার কাছে যে পনেরোখানা আছে, এ হিসাব শুধু তার উপর নির্ভর করে) প্রকৃতিপরিচয় প্রকাশিত হয়েছে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে। অর্থাৎ তাঁর বয়স যখন প্রায় বেয়াল্লিশ। এই পনেরোখানা পুস্তকের পরপর প্রকাশ-বৎসর হিসাব করলে এই রকম দাঁড়ায়।—

প্রকৃতিপরিচয়	১৯১১	বাংলার পাখী	১৯২৪
বৈজ্ঞানিকী	১৯১৩	শব্দ	১৯২৪
প্রাকৃতিকী	১৯১৪	আলো	১৯২৬
গ্রহনক্ষত্র	১৯১৫	জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার	১৯২৭
পোকামাকড়	১৯১৯	চুম্বক	১৯২৮
গাছপালা	১৯২১	স্থিরবিদ্যুৎ	১৯২৯
মাছ ব্যাঙ সাপ	১৯২৩	চলবিদ্যুৎ	১৯২৯
		নক্ষত্রচেনা	১৯৩১

মোট কুড়ি বৎসরে পনেরোখানার বেশি বই লিখেছেন জগদানন্দ, নানা দায়িত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থেকেও। এটি অসাধারণ বিজ্ঞানপ্রীতির পরিচয়। আমি ষোলখানার হিসাব জানি, তা ছাড়াও হয়তো বই আছে।[১]

১ এই সংখ্যায় প্রকাশিত জগদানন্দ রায়ের গ্রন্থপঞ্জী দ্রষ্টব্য, পৃ ৩১৮-৩২১

জগদানন্দ রায় -কর্তৃক লিখিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপির একাংশ

তাঁর প্রথম বই প্রকৃতিপরিচয় (১৯১১) যখন প্রকাশিত হয়েছে তখনো পরমাণুর পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় নি, কিন্তু যতদুর পাওয়া গিয়েছিল সে সম্পর্কেও হয়তো তখনকার সর্বাধুনিক বিজ্ঞান সম্পর্কিত পুস্তক জগদানন্দের পক্ষে সহজলভ্য হয় নি। তাই যখন পড়া গেল "অধ্যাপক লজ, র‍্যামজে, রদারফোর্ড এবং সডি -প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন ধনাত্মক তড়িতের পরমাণু পরিমিত কোষের ভিতরে আবদ্ধ অতি-পরমাণুর ছুটাছুটি জগতে নিয়তই চলিতেছে এবং ঐ ধনাত্মক তড়িতের ভিতরকার লক্ষ লক্ষ অতি-পরমাণু লইয়াই আমাদের পরিচিত এক একটি পরমাণুর (atom) গঠন হইয়াছে।"— তখন ঐ 'লক্ষ লক্ষ' অতি-পরমাণু (জগদানন্দ ইলেকট্রনকে অতি-পরমাণু বলেছেন) দিয়ে একটি পরমাণু গড়ার উক্তিতে কিছু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। কিংবা "যতগুলি অতি-পরমাণু আবদ্ধ থাকিয়া হাইড্রোজেন পরমাণু রচনা করে, পারদের পরমাণুতে তাহারি তেইশগুণ অতি-পরমাণু জড় হয়। এইজন্যই পারদের পারমাণবিক গুরুত্ব (atomic weight) হাইড্রোজেনের তেইশগুণ।" —তৃতীয় সংস্করণ ১৯৪০। তখনো হাইড্রোজেনের গঠনে "যতগুলি" ইলেকট্রন দরকার হয়. এমন উক্তি, অথবা পারদের পরমাণুকে ঘিরে হাইড্রোজেন ইলেকট্রনের "তেইশগুণ" ইলেকট্রন জড়ো হয়, অথবা পারদের পরমাণুর ওজন হাইড্রোজেন-পরমাণুর "তেইশগুণ"— এ জাতীয় উক্তিতে যথেষ্ট বিভ্রান্তির অবকাশ আছে। যেমন আছে হিলিয়ামকে ধাতুরূপে পরিচিত করায়। এই জাতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি পরবর্তী কোনো সংস্করণে সংশোধিত হলে ভালো হত।

কিন্তু জগদানন্দ রায়ের কৃতিত্বের দিকটি এত ভারী যে, এসব শোধনসাপেক্ষ ত্রুটি তার তুলনায় কিছুই না। পরমাণুর চেহারা আমাদের এ যুগে এক পরম রহস্যপূর্ণ এবং কল্পনাতীত ব্যাপার। এর কেন্দ্রের রহস্য এখনো, আমার বিশ্বাস, সম্পূর্ণ জানা যায় নি। সবই প্রায় অঙ্কের খেলা, কল্পনায় ধরা যায় না। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত রাদারফোর্ড-বোর যতদূর গবেষণা করেছিলেন, বিজ্ঞান-লেখকেরা বলেন, তা থেকে পরমাণুর ব্যাস জানা গিয়েছিল : এক ইঞ্চির প্রায় ত্রিশ কোটি ভাগের একভাগ ও নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রের ব্যাস তা থেকে প্রায় দশ হাজার গুণ ছোট। আর জানা গিয়েছিল : ইলেকট্রনসমূহ কেন্দ্রের বৈদ্যুতিক আকর্ষণে বাঁধা থাকে। এর বেশি জানা যায় নি।

কিন্তু সে যাই হোক, জগদানন্দ রাঁয়ের বাংলার পাখী, গ্রহনক্ষত্র, নক্ষত্রচেনা, গাছপালা, মাছ ব্যাঙ সাপ; প্রভৃতি পুস্তকের মতো পুস্তক বাংলাভাষায় আর লেখা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। বিশেষভাবে একটিমাত্র ব্যক্তির একক চেষ্টায়, নিষ্ঠায়, এবং বিজ্ঞানপ্রীতির ফলে, বিজ্ঞানের নানা বিভাগে বিচরণ করার দৃষ্টান্ত সহজে মিলবে না।

বিজ্ঞান-লেখকের ধর্মই হচ্ছে যথাযথা বিবরণ লেখা, অজানার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। তাঁর মনে যত প্রশ্নই থাক্, বিজ্ঞান-বিষয়ে লিখতে লিখতে চরম সত্য কি, এ প্রশ্ন তোলা তাঁর কাজ নয়। চরম সত্য কি, সমস্ত বিজ্ঞানকে বিধৃত করে, অবলম্বন করে, তার বাইরে এসে, তবে সে প্রশ্ন তোলা যায়। অর্থাৎ এ প্রশ্ন দার্শনিকের প্রশ্ন। বিজ্ঞানী শুধু উপকরণ জুগিয়ে যাবেন, বিজ্ঞান-লেখক শুধু বিজ্ঞানীর আবিষ্কার-কাহিনীর গল্প বলে যাবেন। কোনো একটা নতুন আবিষ্কার বর্ণনা করতে যদি লেখক 'ভগবানের কি লীলা !' বলে নাচতে থাকেন, এবং সেই বিস্ময় তাঁর আবিষ্কারের অঙ্গরূপে প্রচার করেন, তবে তাঁকে আর বিজ্ঞানী বলা চলবে না। তখন তিনি অন্য ব্যক্তি। কোনো ব্যাকটিরিওলজিস্ট যদি

তাঁর রিপোর্টে নীলপটে লাল যক্ষ্মা-জীবাণু দেখে ভাবে গদগদ হয়ে তাঁর মনের ভাব কবিতায় লিখে সেই রিপোর্ট দাখিল করেন, তবে তিনি জীবাণুবিদ্ রূপে আর নির্ভরযোগ্য নন।

জগদানন্দ রায় সম্পর্কে লিখতে এসব প্রসঙ্গের অবতারণা করতে হল বিশেষ কারণে। এক লেখকের একখানি বই থেকে আগে এই কথাগুলি উদ্ধৃত করি—

> রামেন্দ্রসুন্দর নিজস্ব বুদ্ধি ও বিচারের মাপকাঠিতে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে যাচাই করেছেন; জগৎপ্রবাহের উৎস সন্ধানে বেরিয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্যের সত্যাসত্য নির্ধারণ করেছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের রচনা তাই গভীর অন্তরদৃষ্টি সম্পন্ন। কিন্তু জগদানন্দের রচনায় এরূপ গভীরতার একান্ত অভাব। রামেন্দ্রসুন্দরের ন্যায় বিজ্ঞানকে তিনি কোথাও যাচাই করেন নি; দর্শন ও বিজ্ঞানকে পাথেয় ক'রে জগৎরহস্যের গভীরে প্রবেশ করবার কোনো প্রচেষ্টা তাঁর রচনায় দেখা যায় না। বিজ্ঞানসমুদ্রের বাহ্যিক শোভা দেখেই তিনি সন্তুষ্ট। সমুদ্রের গভীরে ডুব দিয়ে রামেন্দ্রসুন্দরের ন্যায় শুক্তি আহরণের চেষ্টা তাঁর নেই।

উক্ত লেখক জগদানন্দের এই দার্শনিক জিজ্ঞাসা-বিমুখতাকে প্রায় অপরাধের পর্যায়ে ফেলে দার্শনিকের সঙ্গে বিজ্ঞান-লেখকের তুলনা করেছেন।

কিন্তু দার্শনিক প্রশ্ন না তুললেও জগদানন্দ ঈশ্বরের কথা তুলেছেন। দুইয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য, এবং তা স্পষ্ট। জগদানন্দের ঈশ্বরের স্থানে 'প্রকৃতি' পড়তে হবে অথবা বুঝতে হবে। অবশ্য এ বিস্ময়কর বিশ্ব যে ঈশ্বরের ইচ্ছায় চালিত এ বিশ্বাস বিজ্ঞানীর ব্যক্তিগত ব্যাপার, বিজ্ঞান-বিষয়ে লেখার সময়ও যদি সে বিশ্বাস প্রকাশ করতে হয় তবে আদৌ একটি কাল্পনিক চেতন শক্তিকে মেনে নিতে হয়। বিজ্ঞানীর ধর্ম তা নয়। আবিষ্কারের পথে চলতে চলতে ঈশ্বর যদি আবিষ্কৃত হয়ে পড়েন তা হলে তাঁর নাম চলবে তখন, তার আগে নয়।

তবে জগদানন্দের পক্ষে এইটুকু মাত্র বলা যায় যে, তিনি শান্তিনিকেতনে বসে তাঁর পুস্তকগুলি রচনা করেছেন, এবং ঈশ্বরকে মান্য করেই শান্তিনিকেতনের উদ্‌ভব। অতএব সৃষ্টির মূলে ঈশ্বর এ কথা মাঝে মাঝে স্মরণ করা তাঁর পক্ষে হয়তো খুব অন্যায় হয়েছে মনে হয় না। কিন্তু একটি আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁর 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থে কোথাও ঈশ্বরের নাম করেন নি। তিনি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিষ্ঠাবান বিজ্ঞানী। অতএব 'তিনি বিজ্ঞান-সমুদ্রের বাহ্যিক শোভা দেখেই সন্তুষ্ট,' একথা কি তাঁর সম্পর্কেও ওঠে? আসল কথা হচ্ছে— বিজ্ঞান-সমুদ্রের বাহ্যিক শোভা নামক আদৌ কোনো বস্তু যদি থাকে তবে তা দেখে একমাত্র অবৈজ্ঞানিকেরা সন্তুষ্ট হয়, এবং সে 'শোভা' বিজ্ঞানের প্রয়োগ-ক্ষেত্রের শোভা। জলের বৈজ্ঞানিক স্বরূপ H_2O দেখে যদি বিজ্ঞানীরা সন্তুষ্ট হন তবে কি বলতে হবে ওটা বাইরের শোভা? অথবা একটি পরমাণুর দেহব্যবচ্ছেদ ঘটিয়ে যেসব তথ্য জানা গেছে— অর্থাৎ ইলেকট্রন-ঘূর্ণির কেন্দ্রের প্রোটন নিউট্রন মেসন প্রভৃতির অস্তিত্বতথ্য, অথবা একটি ইলেকট্রন থেকে একটি প্রোটন প্রায় এক হাজার গুণ ছোট অথচ ওজনে প্রায় দু হাজার গুণ ভারী, অথবা একটি পরমাণুর ব্যাস এক ইঞ্চির প্রায় ত্রিশ কোটি ভাগ এবং তার কেন্দ্রের ব্যাস তা থেকে প্রায় দশ হাজার গুণ ছোট (অবশ্য এও পূর্ণ সত্য কিনা আমার জানা নেই)— এইসব দেখে বিজ্ঞানী যদি সন্তুষ্ট হন, তবে কি বলতে হবে তিনি বাইরের শোভা দেখেই সন্তুষ্ট? অর্থাৎ বিজ্ঞানীর ভূমিকা কি হবে পরমাণু-কেন্দ্রে যত রকম

শক্তিকণিকা অথবা নিরপেক্ষ কণিকা আবিষ্কৃত হয়েছে, তার মধ্যে ঈশ্বর নামক কোনো চেতন কণিকা লুকিয়ে আছে কিনা তা খুঁজে বার করা ?

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বিজ্ঞান-বিষয়ে লিখতে গিয়ে বিজ্ঞানের সীমাতেই আবদ্ধ থেকেছেন, দার্শনিকের ভূমিকা নেন নি। এই সীমাজ্ঞান তাঁর ছিল। পৃথিবীর সকল বিজ্ঞান-লেখকেরই সে জ্ঞান আছে।

জগদানন্দ রায়ের প্রধান পরিচয় তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানা কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা গঠন করার, এবং তা তেমনি স্বচ্ছ ভাষায় প্রকাশ করার, ক্ষমতায়। তিনি বিজ্ঞানের প্রবন্ধে ঈশ্বরকে স্মরণ করেছেন সে কথা অবান্তর। আকাশ নিয়ে তাঁর কৌতূহলের অন্ত ছিল না, এবং নিজে দূরবীন নিয়ে ছাত্রদের আকাশ চিনিয়েছেন, এবং গ্রহনক্ষত্র বিষয়ে পুস্তক লিখেছেন। নক্ষত্রচেনা পুস্তকখানি খুব খরচ করে ছাপা, এতে বারোখানি রঙীন চিত্র আছে, তা ছাড়া নক্ষত্রমণ্ডলীর পৃথক শাদা-কালো চিত্র প্রচুর আছে। বাংলার পাখী দেখায় তাঁর ভুল হয় নি। গাছপালা মাছ ব্যাঙ সাপ কুমীর তিনি দেখেছেন। এসব বিষয়ে তাঁর লেখা যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য এবং সুপাঠ্য। কিন্তু বিজ্ঞানের নানা জটিল তত্ত্ব বিষয়ে তাঁর লেখা ভালো হোক মন্দ হোক, বর্তমান কালের দ্রুতপরিবর্তনশীল ধারণা ও আবিষ্কারের চাপে সেসবের আয়ু ফুরিয়ে গেছে। পুরানো বহু ধারণা বাতিল হয়ে গেছে নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে, এমনকি, অনেক বিষয়ে আজ যে-সব তথ্য সত্য বলে মনে হচ্ছে, এই প্রবন্ধ ছাপা হতে হতে তার অনেক বাতিল হয়ে যেতে পারে। পুরানোর মূল্য এখন শুধু ইতিহাসের দিক থেকে।

জগদানন্দের ভাষা কত সরল, স্পষ্ট এবং তা অন্যকে বুঝিয়ে দেওয়ার পক্ষে কত উপযুক্ত ছিল তার কয়েকটি নমুনা দিচ্ছি।

> অধিকাংশ পাখীই বারোমাস বাসায় থাকে না। ডিম পাড়িবার সময় হইলে তাহারা বাসা বাঁধে এবং সেখানে দুই-এক মাস বাচ্চাদের পালন করিয়া বাসা ছাড়িয়া দেয়। তখন গাছের ডালে বসিয়া তাহাদিগকে রাত্রি কাটাইতে হয়। কাকেরাও এই রকমে বৎসরের বারো মাসের মধ্যে দশ মাস গাছের ডালে বসিয়া হিমেশীতে রাত কাটায় এবং বৃষ্টিতে ভিজে।
>
> তোমরা হয়তো ভাবিতেছ, ইহারা রাত্রি হইলে সম্মুখে যে গাছ পায় তাহাতে বসিয়া রাত কাটায়। কিন্তু তাহা নয়। গ্রামের বাহিরে নির্জন জায়গায় ইহাদের এক-একটা গাছ ঠিক করা থাকে… এই গাছ ছাড়া অন্য গাছে তাহারা রাত কাটাইতে চায় না।
>
> …শালিকেরা রাত কাটাইবার জন্য সন্ধ্যেবেলায় গাছে আসিলে, ভয়ানক চেঁচামেচি এবং পরস্পর ঝগড়া-ঝাঁটি করে। কিন্তু কাকেরা তাহা করে না। গ্রাম হইতে দলে দলে ফিরিয়া প্রায়ই কাছের একটা গাছে বসিয়া প্রাণ ভরিয়া সকলে চেঁচাইয়া লয়। বোধ হয়, সমস্ত দিনে কে কাহার বাড়ীতে গিয়া কি রকম দুষ্টামি করিয়াছে, সেই সব কথাই পরস্পর বলাবলি করে, তার পরে উহাদের সভা ভঙ্গ হয় এবং নিঃশব্দে সে গাছ ছাড়িয়া নির্দিষ্ট গাছের ডালে বসিয়া ঘুমের আয়োজন করে।
>
> বাংলার পাখী, শাখাশ্রয়ী, কাক

মাঝে মাঝে কৌতুকরস মিশিয়ে ছোট ছোট পাঠকদের পক্ষে মনোরম করে তোলা হয়েছে। আমি এই পুস্তক থেকেই আরো কয়েকটি নমুনা দিচ্ছি। শালিক পাখী সম্পর্কে যে রচনাটি আছে তা থেকে কয়েক ছত্র এই—

শালিকদের পরস্পরের মধ্যে ভাব না থাকিলেও চরিবার সময়ে ইহারা দলবদ্ধ হইয়া বাহির হয়। আমাদের বাড়ীর সম্মুখের মাঠে একদিন পঁচাত্তরটা শালিককে এক জায়গায় চরিতে দেখিয়াছিলাম।

একসঙ্গে অনেকে চরিতে বাহির হইলেও শালিকেরা ভয়ানক ঝগড়াটে পাখী। ছোট ছেলেরা যেমন কখনো পরস্পর হাসিখুশি করে, আবার সামান্য কারণে কখনো মারামারি জুড়িয়া দেয়, ইহাদের মধ্যে ঠিক সেই রকমটিই দেখা যায়। কোনো কারণ নাই, হঠাৎ দুইটা শালিক রাগিয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া পরস্পরকে ঠোকর দিতে আরম্ভ করিল, ইহা প্রায়ই দেখা-যায়। পালোয়ানেরা কুস্তির সময়ে ল্যাং মারিয়া একে অন্যকে হারাইতে চেষ্টা করে।...শালিকেরা ঝগড়ার সময়ে সেই রকমে পায়ে পা বাধাইয়া লড়াই আরম্ভ করে।...

ফিঙে সম্পর্কে—

...লম্বা লেজ লইয়া ফিঙেদের সর্বদা ব্যস্ত থাকিতে হয়। গল্পে শুনিয়াছি, আমাদের দেশের প্রাচীনকালের রাজারা লম্বা কোঁচা ঝুলাইয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন। কোঁচা এত লম্বা থাকিত যে, তাহা মাটিতে লুটাইয়া চলিত। তাই এক-একজন খানসামা রাজাদের কোঁচা ধরিয়া হেঁট হইয়া চলিত। আজো য়ুরোপের রাজারাজড়াদের পোষাক পাছে মাটিতে লুটায় তাই পোষাকের আগা চাকরেরা ধরিয়া চলে।...কিন্তু ফিঙেদের ত আর চাকর-বাকর নাই যে লেজটা উঁচু করিয়া ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিবে। তাই উহারা মনের দুঃখে মাটিতে চরিতে নামে না...।

অথবা কোকিল সম্পর্কে—

...লোকে বলে, কোকিলরা বর্ষাকালে আমাদের দেশ ছাড়িয়া পলায় এবং তার পরে ফাল্গুন মাসে আবার এ দেশে আসে। বোধ করি, কোকিলের সে 'কু—উ, কু—উ' মিষ্ট ডাক শুনিতে না পাইয়া লোকে ঐ কথা বলে। কিন্তু উহা ঠিক নয়। কোকিলরা বারো মাসই আমাদের দেশে থাকে। আষাঢ় মাস পড়িলেই তাহাদের গলার স্বর বন্ধ হইয়া যায়...তার পরে ফাল্গুন মাসে যেই দক্ষিণে বাতাস গায়ে লাগে, অমনি তাহাদের স্ফূর্তি বাড়িয়া যায়...।

যাহা হউক কোকিলরা বড় লক্ষ্মীছাড়া পাখী। ফাল্গুন চৈত্র মাসে যখন অধিকাংশ পাখীই ডিম পাড়িবার জন্য ব্যস্ত হইয়া খড়কুটা কুড়াইয়া দিন কাটায়— তখন কোকিলরা কেবল গানেই মত্ত থাকে— ঘর সংসারের দিকে একটুও তাকায় না।

হরিয়াল পাখী সম্পর্কে—

সাধারণ লোকে বলে, হরিয়াল পাখীরা ভয়ানক অহঙ্কারী তাই মাটিতে কখনই পা ফেলে না।...অনেকে বলে, যখন পিপাসা লাগে তখন হরিয়ালরা পায়ে গাছের পাতা লইয়া নদীর ধারে বসে এবং পাছে পায়ে মাটি ঠেকে এই ভয়ে সেই পাতার উপরে পা রাখিয়া নদীর জল খায়। আমরা হরিয়ালদের এ রকমে জল খাইতে দেখি নাই। বোধ করি ইহা একটি গল্প।...

পাখী সম্পর্কে এমন সুন্দর ভাবে গল্প বলা বাংলাভাষায় আর দেখা যাবে না। আমি ছোটদের কাছে (যারা এখনো পড়তে শেখে নি) দু-একটি পাখীর কথা এই বই থেকে পড়ে শুনিয়েছি, মাঝখানে থামতে দেয় নি, সবটা শুনে তবে খুশি হয়েছে। শুনিয়েছি শুধুই পরীক্ষার উদ্দেশ্যে। এতে সন্দেহ থাকে না যে, যে উদ্দেশ্যে এ বই লেখা হয়েছে তা সার্থক হয়েছে। এই বইখানিতে মোট ৫৫টি পাখীর পরিচয় আছে,

এবং কোনোটা এক পৃষ্ঠায় কোনোটা বা সামান্য কিছু বেশি পৃষ্ঠায় শেষ, এবং প্রত্যেকটিতেই ছবি দেওয়া আছে। বর্ণনা দীর্ঘ নয়, অল্প পরিসরে শেষ, সেজন্যও ছোটদের পক্ষে এ বই চিত্তাকর্ষক হয়েছে। কিন্তু ছোটদের জন্য লেখা হলেও প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষেও এ বই অবশ্যপাঠ্য মনে করি।

এই পুস্তকের সঙ্গে আর দুখানি মাত্র বইয়ের তুলনা চলে। একখানা পোকামাকড়, অন্যখানা মাছ ব্যাঙ সাপ। এ দুখানা আরো সামান্য কিছু বেশি বয়সের বালকদের জন্য। গ্রহনক্ষত্রও তাই, এবং ঐ সঙ্গে গাছপালা। গাছপালার কথাও এমন সরলভাবে বলা আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

রসায়ন পদার্থবিদ্যা বিষয়ে যে বইগুলি আছে তাতেও ভাষার স্বচ্ছতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রহনক্ষত্র বই থেকে ভাষার একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি, যা আজকের দিনে বাংলাভাষায় ছোটদের জন্য বই লিখতে অনুকরণযোগ্য মনে করি। চাঁদের আগ্নেয় পর্বত রচনাটিতে জগদানন্দ একস্থানে বলছেন—

> চাঁদের পর্বতের নাম দেওয়ার কথায় একটা ঘটনা মনে পড়িয়া গেল। তিন-চারি বৎসর পূর্বে আমি তোমাদেরি মত ছোট ছেলেদের দূরবীন দিয়া চাঁদ দেখাইতেছিলাম। চাঁদের আগ্নেয় পর্বত, গুহা, পাহাড়ের শ্রেণী ও উঁচুনীচু মাটি দেখিয়া তাহারা অবাক হইয়া যাইতেছিল। নিকটে একটি অল্পশিক্ষিত ভৃত্য দাঁড়াইয়া ছিল; তাহাকেও দূরবীণ দিয়া চাঁদ দেখাইলাম এবং কোন্ পাহাড়টার কি নাম তাহাও বলিতে লাগিলাম। পৃথিবীর মত চাঁদেও পাহাড়-পর্বত আছে দেখিয়া সে খুবই আশ্চর্য হইল, কিন্তু সকলের চেয়ে আশ্চর্য হইল চাঁদের পাহাড়গুলির নাম শুনিয়া। সে বলিতে লাগিল, 'মহাশয়, কল দিয়া ত চাঁদের পাহাড় দেখাইলেন, কিন্তু পাহাড়গুলির নাম জানিলেন কি রকমে?'
>
> আমরা তো হাসিয়াই খুন।…লোকটা বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছিল, আমরা কোনো যন্ত্র দিয়া পাহাড়ের নামগুলাও হয় তো চাঁদ হইতে পৃথিবীতে আমদানী করিয়াছি।

তথ্যবর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে এই জাতীয় কৌতুক কথার মিশ্রণে ছোটদের কাছে (এবং বড়দের কাছেও) বর্ণনা কি রকম আকর্ষক হয়ে ওঠে তা লেখাগুলি পড়লেই বোঝা যায়।

গ্রহনক্ষত্র লেখা হয়েছে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে। এ বই ও তার ভাষা ও তথ্য যদি ছোটদের পক্ষে আদর্শ বিবেচিত হয়ে থাকে তা হলে বাংলাদেশে তা যথেষ্ট প্রচার হল না কেন এ ঘটনা অত্যন্ত রহস্যজনক। কারণ আমি বুনিয়াদি শিক্ষার জন্য লেখনীধারী দুজন পণ্ডিতের ১৯৬৫তে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণের বইতে, ও ১৯৬৬তে প্রকাশিত একখানি পঞ্চম সংস্করণের বইতে দেখেছি, যথাক্রমে লেখা হয়েছে 'চাঁদ বরফে ঢাকা' ও 'চাঁদ পৃথিবীর উপগ্রহ— ইহা বরফে ঢাকা, খুব ঠাণ্ডা।'

অর্থাৎ চাঁদ বিষয়ে এই দুখানা আধুনিক জ্ঞানের বইয়ের পঞ্চাশ বছর আগে, জগদানন্দ রায়ের আমলে যে আগ্রহ-উষ্ণতা ছিল, পঞ্চাশ বছর পরে তা ঠাণ্ডা হয়ে চাঁদের বিষয়ে জানবার আগ্রহে, ও চাঁদে, যুগপৎ বরফ জমে গেল কেন তা বিশেষভাবে চিন্তনীয়।

বাংলাদেশে বিজ্ঞান-প্রচারের এই পরিণাম দেশ তো মেনে নিয়েছে। (ঐ দুখানা ও আরো কয়েকখানা অনুরূপ বই সম্পর্কে দু বছর আগে লেখক ও প্রকাশকের পূর্ণপরিচয় সহ অন্যত্র আলোচনা করেছিলাম।)

গ্রহনক্ষত্র বই থেকে যেটুকু নমুনা দেওয়া গেল তা পড়তে বয়স্কদেরও ভালো লাগবার কথা। এবং যদিও অনেকের ধারণা, বিজ্ঞানের বই মাত্রেই শুধু গুরুগম্ভীর তথ্য পরিবেশন করতে হবে, তবু এ কথা

সকলক্ষেত্রে পালনযোগ্য বলে আমি মনে করি না। তথ্য পরিবেশন উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানসভায় পাঠের জন্য যেসব প্রবন্ধ লিখতে হয়, অথবা টেক্স্ট বইতে যেসব বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ থাকে, তা সোজাসুজি কাজের কথাতেই ভরা থাক। কিন্তু সর্বসাধারণের জন্য সহজ ভাষায় বিজ্ঞান-প্রচার করতে হলে তার মাঝে মাঝে কল্পনা বা উপমা বা প্রাসঙ্গিক কোনো গল্প যোগ করায় কোনো বাধা নেই, বরং তা ঠিক ভাবে করতে পারলে উদ্দেশ্য ভালোভাবে সফল হয়। আমি নিজে ইংরেজীতে সবার জন্য লেখা বিজ্ঞানের বই দেখেছি, বিশেষ করে প্রথম-পাঠকদের জন্য লেখা বই, যাতে কল্পনা, সমান্তরাল অন্য পরিচিত চিত্র, অথবা প্রাসঙ্গিক কাহিনী এমন সুন্দরভাবে মিশিয়ে পাঠকের মনকে অধিকার করার চেষ্টা করা হয়েছে, যাকে প্রশংসা না করে উপায় নেই। জগদানন্দ রায়ও এই আদর্শই অনুসরণ করেছেন তাঁর অধিকাংশ লেখায়। এই ভঙ্গিটি বিশেষ করে আমাদের দেশের উপযুক্ত, কারণ আমাদের দেশ সাধারণভাবে বিজ্ঞান-বিমুখ এবং কৌতূহল-বিমুখ। যে দেশে পাঠ্যপুস্তক লেখক ও শিক্ষক সমান স্তরের, কারণ যে দেশে চাঁদ বরফে ঢাকা এমন তথ্যপূর্ণ বই বহু সংস্করণ পার হয়, সে দেশে শিক্ষা ও ছাত্র সমান স্তরের। তাঁরা এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন তোলেন না। অতএব এ দেশে যে বিজ্ঞানের প্রতি সহজ উদাসীনতা আছে এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। প্রশ্ন তোলা যায়, বুনিয়াদি শিক্ষায় জগদানন্দ রায়ের বই চলে না কেন, এবং ভুল তথ্যে কণ্টকিত বই অনুমোদন পায় কেন? অবশ্য এ ব্যাপারটাই গভীর রহস্যপূর্ণ এবং তার উত্তর দেওয়া সহজসাধ্য নয়। এ দেশের বিজ্ঞান-লেখক যেখানে বিজ্ঞান-বিষয়ের লেখায় দার্শনিকতার অভাবে পীড়া বোধ করেন, সেখানে আর কি বলা যাবে?

জগদানন্দ রায় সম্পর্কে আলোচনা করতে এ প্রসঙ্গ না তুলে উপায় নেই। কেননা তাঁর বইগুলি যথাপ্রয়োজন মার্জিত করে এবং তাতে আধুনিকতম তথ্যের কিছু-কিছু সংযোজন করে দেশময় প্রচারের প্রয়োজন বোধ করছি। বিজ্ঞানীরা মিলে এ কাজ করতে পারেন অনায়াসে।

আমার আলোচনার শেষ বইখানি নক্ষত্রচেনা। সম্ভবত এ বই দুষ্প্রাপ্য। এবং স্বভাবতই, কারণ এমন মূল্যবান বইখানির উপর বহু জনের দাবি অনুপস্থিত বলেই, এর আর পুনর্মুদ্রণ ঘটে নি। ১৯৩১ সনে এগারো ইঞ্চি সাড়ে নয় ইঞ্চি আকারের বারোখানি পূর্ণ পৃষ্ঠা রঙীন আকাশচিত্র ও অসংখ্য পাঠসংলগ্ন চিত্র -সহ মুদ্রিত পুস্তকখানির দাম ছিল আড়াই টাকা। ব্লকগুলি রক্ষিত হয়ে থাকলে পুনর্মুদ্রণে অতটা সুলভ না হলেও যথেষ্ট সস্তায় এ পুস্তক প্রচারিত হতে পারে, এবং মনে হয় তা হলে এখন এ বই পড়ে না থাকতেও পারে। কারণ নক্ষত্রচেনার এমন সর্বাঙ্গসুন্দর বাংলা বই আপাতত অন্য কারো চেষ্টায় সহজে ছাপা হতে পারে বলে মনে হয় না।

জগদানন্দ এ পুস্তকের ভূমিকায় বলছেন—

> মনে পড়ে যখন বয়স অল্প ছিল, তখন এক সময়ে নক্ষত্রচেনার বাতিক এত প্রবল হইয়াছিল যে, সমস্ত রাত্রি খোলা মাঠের মাঝে দাঁড়াইয়া নক্ষত্র চিনিতাম। এই রকমে অনেক অনিদ্র রজনী কাটাইয়াছি। পঞ্জিকায় লিখিত রাশি ও নক্ষত্রগুলিকে যখন আকাশপটে প্রত্যক্ষ দেখিতাম, তখন যে আনন্দ হইত তাহা অতুলনীয়। কত পুরাণকথা এবং বেদ, উপনিষদ্ ও সংহিতার কত তত্ত্ব এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোকবিন্দুর সহিত হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া জড়িত রহিয়াছে, মনে করিয়া অভিভূত হইয়া পড়িতাম। আমার নৈশ অভিযানের সহায় ছিল একখানি ক্ষুদ্র ইংরেজি নক্ষত্র-পট এবং কালো

কাপড়ে ঢাকা একটি ছোট লণ্ঠন। লণ্ঠনের মৃদু আলোতে পটে-আঁকা নক্ষত্রদের সঙ্গে আকাশের নক্ষত্রদের মিলাইয়া লইতাম।

শিক্ষার সঙ্গে নয়, বৃত্তির সঙ্গে নয়, শুধু প্রবৃত্তির [illegible] জড়িত এই যে গ্রহনক্ষত্র-চেনার আকাঙ্ক্ষা, এটি একজন বাঙালী তরুণের পক্ষে সহজ কথা নয়। একটু চিন্তা করলেই জগদানন্দের এ কৌতূহলের গুরুত্ব বোঝা যাবে।

এ প্রবৃত্তি বহু যুগ আগে কার মনে প্রথম জেগেছিল বলা যায় না, তাঁকে খুঁজে বার করা এখন দুঃসাধ্য। অতীতের অন্ধকারে তাঁর নাম হারিয়ে গেছে। কে সেই প্রথম আগ্রহী যিনি রাশিগুলিকে ভাগ করেছিলেন তা আমরা জানি না বটে, কিন্তু কোন্ কোন্ জাতি এ কাজ করেছিলেন তা আমাদের অনেকখানি জানা আছে। প্রাথমিক জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে প্রাচীন যেসব জাতি একটা রূপ গঠন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ইতিহাসে লেখা আছে, কালডিয়ান, মিশরীয়, হিন্দু, চীনা ; এমনটি মেকসিকানদের নামও পাওয়া যায়। কিন্তু এঁরা যে তখন জ্যোতির্বিদ্যাকে বিজ্ঞানরূপে চর্চা করেছিলেন তা মনে হয় না। কল্পিত পৌরাণিক কাহিনীই গড়ে তুলেছিলেন নক্ষত্ররাশি সম্পর্কে, এবং কালডিয়ানই যে প্রথমে নক্ষত্র এবং গ্রহ-উপগ্রহের চক্রপথ অনেকখানি ধরতে পেরেছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আরও একটা বিষয় লক্ষণীয় এই যে, এইসব প্রাচীন জাতির মধ্যে রাশিগুলি একই নামে অভিহিত।

আমার মনে হয় বাঙালী জাতির মধ্যে একমাত্র জগদানন্দ রায়ই বালককাল থেকে প্রাচীন হিন্দুদের আকাশ দেখার প্রবৃত্তি এযুগে পুনরায় প্রথম লাভ করেছেন। তাঁরা হয়তো তাঁদের এই প্রবৃত্তি তাঁর নামে উইল করে গিয়ে থাকবেন। কারণ বইয়ের পাতার বাইরে আকাশের পাতা থেকে বহু কৃচ্ছ্রপথে স্বেচ্ছায় সোজাসুজি শিক্ষালাভের দৃষ্টান্ত বাঙালী স্কুলের ছাত্ররূপে একমাত্র সাহিত্যিক বনফুলের ক্ষেত্রে দেখেছি। তাঁর প্রধান প্রেরণা জগদানন্দ রায়ের গ্রহনক্ষত্র। এই প্রেরণা থেকে ক্রমে তিনি আকাশের পুরো পরিচয় লাভ করেছেন, গ্রহনক্ষত্রের পরিচয়। স্কুলের ছাত্ররূপে গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রকৃত বিজ্ঞানীর কৌতূহল সম্বল করে আপন গরজে ও প্রয়াসে আজ বিজ্ঞান-গবেষকরূপে পরিচিত হয়েছেন। অবশ্য তাঁর কৌতূহলের ক্ষেত্র আকাশ নয়, মাটি।

কৌতূহল অনেক ছেলের মধ্যে থাকে, কিন্তু পরিবেশ প্রতিকূল হলে অনেকের ক্ষেত্রে তা নষ্ট হয়ে যায়, কারো বা তা সত্ত্বেও বজায় থাকে। অল্প দু-একজন চরিতার্থতার পথে এগিয়ে যায়। আবার জানবার কৌতূহল যার মনে প্রবল নয়, তার মনেও জাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে উপযুক্ত পুস্তকের সাহায্যে, উপযুক্ত শিক্ষকের সাহায্যে। বিজ্ঞানের নানা বিভাগে কৌতূহল জাগাবার মতো বই জগদানন্দ প্রায় সবই লিখেছেন। তাঁর গাছপালা, পাখী, চুম্বক, স্থিরবিদ্যুৎ, চলবিদ্যুৎ প্রভৃতি স্মরণীয়। কিন্তু এ দেশে প্রাথমিক স্তরের উপযুক্ত এইসব বই থাকা সত্ত্বেও উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব অনুভব করা যাচ্ছে একটু বেশি মাত্রায়। তার কারণ সম্ভবত শিক্ষানীতির দ্রুত পরিবর্তন। অল্পদিনের মধ্যে ছাত্রদের একই সঙ্গে পণ্ডিত ও মিস্ত্রি বানাবার ব্যবস্থা এর জন্য দায়ী।

বুনিয়াদী শিক্ষা— অতএব এসব বই ছাত্রদের উপযুক্ত নয়? কিন্তু যে বইতে চাঁদ বরফে আচ্ছন্ন লেখা থাকে তা বুনিয়াদী শিক্ষার উপযুক্ত, অথবা জগদীশচন্দ্র বসু গাছের প্রাণ অবিষ্কার করেছিলেন যে বইতে লেখা থাকে তাই বুনিয়াদী শিক্ষার উপযুক্ত, এমন ধারণাই এর মূল কারণ। একেবারে শিক্ষার মূলোচ্ছেদের ব্যবস্থা!

নক্ষত্রচেনা বইখানির কথা বলছিলাম। আকাশকে এমন সরল ও সুন্দরভাবে চিনিয়ে দেবার প্রয়াস জগদানন্দ রায় করেছেন, যা দেখলে তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি অথবা শিক্ষার্থীর মনে সহজে প্রবেশ করার ক্ষমতা প্রতিমুহূর্তে অনুভব করা যায়। আমার মনে হয়, যে ব্যক্তি কোনো দিন নক্ষত্র চিনতে চেষ্টা করে নি সেও এ বই যত্ন করে পড়লে এবং আকাশের সঙ্গে পাঠ মিলিয়ে দেখলে একটি বছরের মধ্যে লেখক যা চেনাতে চেয়েছেন তা চিনতে পারবে। এ বইয়ের শেষ অধ্যায়ের নাম 'আমাদের জ্যোতিষ'। এই অধ্যায়ে জ্যোতির্বিদ্যার আদিকাহিনী থেকে আরম্ভ করে আমাদের দেশের জ্যোতির্বিদ্যার পুরাণভিত্তিক কাহিনীগুলি এবং পঞ্জিকার রাশিগণনা পদ্ধতি এবং বৎসর ও মাস গণনা, চান্দ্র মাস ও চান্দ্র বৎসরের পরিচয়, তিথি-পরিচয় প্রভৃতি অতি সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর-কোথাও এসব কথা পড়েছি বলে মনে পড়ে না।

কিন্তু প্রকৃতিকে নানা দিক থেকে চেনার ব্যাপারে জগদানন্দ রায় সমস্ত জীবন যে শ্রম স্বীকার করেছেন এবং তার ফলে যে সাফল্য লাভ করেছেন, আমার এই ছোট্ট প্রবন্ধে জগদানন্দ রায়কে তেমন সফলভাবে বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি পরিভাষা রচনা সম্বন্ধে যেসব কথা বলেছেন, তা আজও ভেবে দেখার কাল উত্তীর্ণ হয় নি। তিনি নিজেও অনেক সহজ পরিভাষা রচনা করেছেন এবং তা এমন সুন্দরভাবে ব্যবহার করেছেন, যাতে তাঁর বক্তব্য বুঝতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না।

চলবিদ্যুৎ বইয়ের ভূমিকায় জগদানন্দ বলছেন—

> বিদ্যুৎতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল বিদেশী বৈজ্ঞানিক শব্দ সাধারণের নিকট সুপরিচিত, সেগুলির কিম্ভূতকিমাকার বাংলা পরিভাষা গড়িয়া পুস্তকে ব্যবহার করি নাই। জার্মান পণ্ডিতেরা যে-পরিভাষা রচনা করিয়াছেন, সেগুলিকে ফরাসী জাপানী বা রুশ বৈজ্ঞানিকেরা ব্যবহার করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। পৃথিবীর সর্বত্রই ইহা দেখা যাইতেছে। সুতরাং বিশেষ বিদেশী পরিভাষা আমরা কেন আমাদের মাতৃভাষায় লিখিত পুস্তকে ব্যবহার করিব না, তাহার কোনো হেতু পাওয়া যায় না। সংস্কৃত ভাষামূলক কটমটো দেশী পরিভাষা বৈদেশিক পরিভাষার চেয়ে দুর্বোধ্য বলিয়া মনে করি।

জগদানন্দের অনেকগুলি ভূমিকাই এইরূপ উল্লেখযোগ্য, বহু প্রয়োজনীয় কথায় ভরা। সেগুলি থেকে অংশ বিশেষ বাছাই করে নিয়ে এখনও প্রচার চলতে পারে। একটি ভূমিকা থেকে উপরের এই অংশটি উদ্ধৃত করছি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে। সেটি এই যে, বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়েছে, সেখানে বিজ্ঞানীরা বাংলা পরিভাষা রচনায় নিযুক্ত আছেন। আশা করি তাঁরা এ সময়ে জগদানন্দের কথাগুলিও স্মরণ রাখবেন। অবশ্য জগদানন্দের প্রথমযুগে অদ্ভুত সব পরিভাষা রচনা করেছিলেন কেউ কেউ। ক্লোরিনকে কুলোহরিণ নাম দেওয়া তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। এক্স-রে'কে রঞ্জনরশ্মি বলা একই রকম অযৌক্তিক মনে করি। রবীন্দ্রনাথ এক্স-রশ্মি ব্যবহার করেছেন, মনে হয় সেইটিই একমাত্র গ্রহণীয় শব্দ। এ বিষয়ে জগদানন্দের প্রস্তাব বিশেষ যুক্তিসংগত বোধ হয়।

স্মৃতি

জগদানন্দ রায়

১৯০১ সালের শ্রাবণ মাসে যখন শান্তিনিকেতনে প্রথম আসি, সেদিনকার কথা বেশ মনে পড়ে। গুরুদেব শিলাইদহের জমিদারির কর্তৃত্ব ছাড়িয়া আগেই সপরিবারে শান্তিনিকেতনে আসিয়াছিলেন। আমি বাড়ি ঘুরিয়া কয়েকদিন পরে আসিলাম। তখন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। আমি যখন শিলাইদহে জমিদারি-সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত ছিলাম, সেই সময়ে শ্রীমান রথীন্দ্রনাথকে একটু একটু গণিত শিক্ষা দিতাম। জমিদারির জটিল কাজ আমার ভালো লাগিত না। কেবল ভালো না-লাগা নয়, জমিদারি-সংক্রান্ত কাজে একটা হাঙ্গামাও বাধাইয়াছিলাম। ইহাতে আমাকে কয়েকদিন অজ্ঞাতবাসে থাকিতে হইয়াছিল। জেলখানায় নয়। তাই যখন শুনিলাম গুরুদেব শান্তিনিকেতনে থাকিবেন এবং সেখানে বিদ্যালয় হইবে, তখন তাঁহার সঙ্গ লইয়া আনন্দ বোধ করিয়াছিলাম। যদি জমিদারির কাজেই থাকিয়া যাইতাম তাহা হইলে আজ আমার কী দশা হইত তাহা অনুমানই করিতে পারি না। আশ্রমে আসিবার পূর্বে যেদিন গুরুদেব আমাকে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি জমিদারির কাজে থাকিতে চাও, না, আমার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে যাইতে চাও" সেই দিনটা আমার জীবনের একটা স্মরণীয় দিন। আমি সানন্দে বলিয়া ফেলিলাম, "আমি নায়েব হইতে চাহি না। আপনার সঙ্গে শান্তিনিকেতনেই যাইব।" গুরুদেব বলিলেন, "তথাস্তু।" হাতে স্বর্গ পাইলাম।

যাহা হউক, শান্তিনিকেতনে আসিয়া দেখিলাম রথীন্দ্রনাথের সংস্কৃত-শিক্ষক শ্রীযুক্ত শিবধন বিদ্যার্ণব মহাশয় আগেই আসিয়াছেন। খুব আনন্দ হইল। তিনি খুব রসিক লোক ছিলেন। ভোরে উঠিয়াই বিদ্যার্ণব ও রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে খোয়াই দেখিতে বাহির হইলাম। উত্তরায়ণের পশ্চিমে যে খোয়াইটি আছে সেখানে খুব দৌড়াদৌড়ি করা গেল। এ পর্যন্ত নদীয়া জেলার সমতল ভূমির সীমানা ত্যাগ করি নাই। বীরভূমের রাঙামাটি ও অসমভূমি এবং দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর খুব ভালো লাগিল। আর ভালো লাগিল শান্তিনিকেতন আশ্রমটি। মনে হইতে লাগিল, যেন উদ্ভিদ্-বিরল মহাপ্রান্তর তাহার সমস্ত রসধারা নিঃশেষ করিয়া কোলের ছেলের মতো এই আশ্রমটিকে শ্যামলশ্রীতে মণ্ডিত রাখিয়াছে।

আশ্রমে আসিলাম বটে, কিন্তু আমার আগমনে একটি অতিথি আশ্রম ত্যাগ করিলেন। কলিকাতার স্বর্গীয় হে-বাবু কয়েকদিন গুরুদেবের সহিত অবস্থান করিবেন বলিয়া বেশ গুছাইয়া বসিয়াছিলেন। তখন আমি ম্যালেরিয়া-রোগী। স্বাস্থ্য কাহাকে বলে জানিতাম না। বৎসরের মধ্যে দশ মাস শয্যাগতই থাকিতাম। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে আম-কাঁঠাল খাইয়া একটু সুস্থ বোধ করিলে আষাঢ়ে ম্যালেরিয়ায় ধরিত, এবং তাহার জের ফাল্গুন-চৈত্রের পূর্বে শেষ হইত না। সুতরাং প্রথম-দর্শনেই হে-বাবু বুঝিয়া লইলেন ম্যালেরিয়া-রোগী। মশকই যে ম্যালেরিয়া-বীজের বাহন বোধ করি তখন সদ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। হে-বাবুর ভয় হইল পাছে আমাকে কামড় দিয়া মশারা তাঁহাকে কামড়ায়। প্রথমে একটা মশারির মধ্যে আমার শয়নের ব্যবস্থা হইল; তার পরে ডবল মশারির ভিতরে। কিন্তু ইহাতেও হে-বাবুর আশঙ্কা গেল না। মশারা দুই শত গজ রাস্তা উড়িলে হাঁফাইয়া পড়ে, এই তত্ত্বটিও

সেই সময়ে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। হে-বাবুর শয়নকক্ষ হইতে দুই শত গজ দূরে আমাকে নির্বাসিত করা হইল। তবুও মশার পাল তাঁহার মশারির চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। অগত্যা হে-বাবু আশ্রম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

আমরা যখন শান্তিনিকেতনে আসিলাম তখন বাড়ি-ঘরের মধ্যে অতিথিশালার দোতলা বাড়ি এবং এখন যে-বাড়িতে ডাকঘর আছে, তাহাই ছিল। দক্ষিণ দিকে ছিল, এখন যেখানে লাইব্রেরি আছে তাহারই মাঝের হল্‌ঘরটা এবং পাশের দুটি ছোটো কুঠরি। আর অতি দূরে বাঁধের ধারে নীচুবাংলা দেখা যাইত। তখন নীচুবাংলা খড়ে-ছাওয়া একখানা বড়ো আটচালা ঘরের আকারে ছিল। সেখানে কাহাকেও তখন বাস করিতে দেখি নাই। ভৃত্যেরা ডাকঘরের বাড়িতে থাকিত। সেখানেই অতিথিদের জন্য রন্ধনাদি হইত। জয়পুরী সাদা পাথরের থালাবাটি বোধ করি দশ-বারো সেট ছিল। অতিথি আসিলে সেইসকল ভোজনপাত্রে আহার করিতেন। প্রত্যেক বেলায় পাঁচ-সাত রকম নিরামিষ তরকারি থালায় সাজাইয়া দেওয়া হইত।

শান্তিনিকেতনে আসিয়া আমি এবং বিদ্যার্ণব মহাশয় আশ্রয় পাইলাম আজকালকার লাইব্রেরি-বাড়ির পশ্চিম কুঠরিতে। তখনো বাড়ির কাজ সম্পূর্ণ শেষ হয় নাই। শীঘ্রই ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া তাড়াতাড়ি কাজ চলিতেছিল। কিন্তু আশ্রমের এদিকটা ছিল ভয়ানক জঙ্গলাকীর্ণ। এখন যেখানে শিশুবিভাগ নারীবিভাগ ও হাসপাতাল আছে সেদিকে ভুলিয়াও কেহ পা দিত না। এই জায়গাগুলি ছোটো-বড়ো শাল ও কাঁটাগাছে আচ্ছন্ন ছিল। শুনিতাম শিয়াল ও হেঁড়েলের দল নাকি এইসব জঙ্গলে আশ্রয় লইত। শিশুবিভাগ, বীথিকাগৃহ ও কালাচাঁদবাবুর বাসার কাছের শালগাছগুলি এখনো সেই শালবনের সাক্ষ্য দিতেছে। এই জঙ্গলের তলা কিন্তু বেশ পরিচ্ছন্ন ছিল। পরে আমরা এই জঙ্গলের নীচে লুকোচুরি খেলা করিয়াছি মনে পড়ে। তখন দিন-দুপুরে ও সন্ধ্যার পরে সরকারি সদর রাস্তা দিয়া লোকজন চলিতে ভয় পাইত। শুনিয়াছিলাম, আমাদের শান্তিনিকেতনে আসিবার কিছুদিন আগেও গোয়ালপাড়ার রাস্তায় দুষ্ট লোকদের হাতে পথিকেরা লাঞ্ছিত হইয়াছে।

এই সময়ে আমাদের অধ্যাপনার কাজ বেশি ছিল না। আমি রথীন্দ্রনাথকে দিনে অল্পক্ষণের জন্য গণিত শিক্ষা দিতাম এবং হক্সলির যে ছোটো বিজ্ঞানের বইখানা এন্‌ট্রেন্সের পাঠ্য ছিল, তাহাই সন্ধ্যার পরে পড়াইতাম। আর সংস্কৃত পড়াইতেন শিবধন বিদ্যার্ণব মহাশয়। বাকি বিষয়ের অধ্যাপনার ভার আমাদের উপরে ছিল না। গুরুদেব নিজেই সে বিষয়গুলি পড়াইতেন। শিলাইদহেও তাঁহাকে ছেলে-মেয়েদের নিজে পড়াইতে দেখিয়াছি। সেখানে লরেন্স নামে এক সাহেব মাস্টার ও একজন একজন পণ্ডিত ছেলেমেয়েদের পড়াইতেন। কিন্তু মাস্টার ও পণ্ডিতের হাতে পুত্রকন্যাদিগকে সমর্পণ করিয়া গুরুদেব কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। এমনকি আমরা যখন পড়াইতাম তখন কাছে বসিয়া তাহা শুনিতেন।

এই সময়ের একটা সামান্য ঘটনার কথা মনে পড়িয়া গেল। একদিন সন্ধ্যার পরে আমি রথীন্দ্রনাথকে বিজ্ঞান পড়াইতেছিলাম। তখন সদ্য কলেজ ছাড়িয়া শিক্ষকতায় লাগিয়াছি। স্কুল-কলেজে তৃতীয় শ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া বি.এ. এম.এ. ক্লাস পর্যন্ত শিক্ষক ও অধ্যাপকেরা ইংরেজিতে অধ্যাপনা করেন। আমার ছাত্রটি এন্‌ট্রেন্সের পরীক্ষার্থী, সুতরাং ছাড়িব কেন? অনর্গল ইংরাজি ভাষায় রথীন্দ্র-

নাথকে পড়া বুঝাইতেছিলাম। ইংরাজিতে কত ভুল হইতেছে সেদিকে লক্ষ্যই নাই, অবিরাম ইংরাজি বলিয়াই চলিয়াছি। গুরুদেব কাছে বসিয়া পড়ানো শুনিতেছিলেন এবং বোধ করি মনে মনে হাসিতেছিলেন। শেষে তিনি আমাকে থামাইয়া বলিলেন, "দেখ, তুমি আর ইংরাজিতে পড়াইয়ো না।" তাঁহার কথায় চৈতন্য হইল। সেইদিন হইতে এ পর্যন্ত কোনো বাঙালী ছাত্রকে ইংরাজিতে কিছু শিখাইবার চেষ্টা করি নাই। জাতীয়-ভাষাকে শিক্ষার বাহন করিলে যে অল্পায়াসে সুশিক্ষাদান সম্ভব, আজ আমাদের দেশের লোকেরা বুঝিয়াছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয়-ভাষায় শিক্ষা দিবার আয়োজন হইতেছে। কিন্তু গুরুদেব পঁচিশ বৎসর পূর্বে আমাদের বিদ্যালয়ে বাংলায় শিক্ষাদান-পদ্ধতি প্রচলন করিয়াছিলেন।

ক্রমে পূজার ছুটি কাছে আসিল। আমরা বাড়ি ফিরিবার জন্য চঞ্চল হইয়া পড়িলাম। এই সময়ের একটা ঘটনার কথা মনে পড়িতেছে। দুই মাস শান্তিনিকেতনে আছি, অথচ আমরা পারুলবন ও আমানি ডোবা ছাড়া আর বাহিরের কোনো জায়গা দেখিলাম না, ইহা মনে করিয়া হঠাৎ বিদ্যার্ণব মহাশয় ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িলেন। একদিন দ্বিপ্রহরে আহারের পরে আমরা দুজনে ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িলাম। বোলপুর শহর ছাড়িয়া সোজা একটা রাস্তা ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করা গেল। রাস্তা শেষ হইয়া ধানের ক্ষেতে পড়িল; সেদিকে দৃক্‌পাত নাই, ক্রমাগত অগ্রসর হওয়াই গেল। শেষে যখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল এবং ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া পড়িলাম তখন আমাদের চৈতন্য হইল। কাছে একটা সাঁওতালপল্লী ছিল; অনুসন্ধানে জানিলাম বোলপুর শহর সেখান হইতে তিন ক্রোশ; শান্তিনিকেতন আরো দূরে। সাঁওতালরা ফিরিবার পথ দেখাইয়া দিল। অন্ধকার রাত্রি, তার উপরে একগলা ধানের ভিতর দিয়া সরু রাস্তা, পথে জনপ্রাণী নাই। মহা বিপদে পড়া গেল। তখন দিক্‌ভ্রম হইয়া গেছে; দূরে দিগন্তে কোনো গাছপালার চিহ্ন দেখিলেই মনে হইতে লাগিল এই বুঝি শান্তিনিকেতন। রাত্রি যখন নয়টা তখন অতিদূরে আলোর ক্ষীণ রেখা দেখা গেল। বাঁচা গেল—সেই আলো লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলাম, এবং শেষে উপস্থিত হওয়া গেল একটি কুটীরে। এখানে গ্রাম নাই, শ্মশানের উপরে এই কুটীর, দুইজন ভৈরব তাহার অধিবাসী। যাহা হউক, আমাদের অবস্থা দেখিয়া ভৈরবদের হৃদয়েও দয়ার উদয় হইল। তাঁহারা বলিলেন, ইহা কঙ্কালী দেবীর স্থান। সন্ধ্যার পরে কোনো গৃহস্থই এখানে আসিতে সাহস করে না। যাহা হউক, ভৈরবেরা আমাদের সাহসের প্রশংসা করিয়া আদরে আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং শেষে আলো লইয়া রেলের সাঁকো অবধি সঙ্গে আসিলেন। যখন শান্তিনিকেতনে পৌঁছিলাম, তখন রাত্রি প্রায় দুটা। এইরকমে আমাদের নিশীথ-অভিযান শেষ হইল বটে, কিন্তু পরদিন আমার খুব কম্প দিয়া জ্বর আসিল।

পূজার ছুটির পরে আশ্রমে ফিরিয়া শুনিলাম, ব্রহ্মবিদ্যালয় ৭ই পৌষ প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিভাবে তাহার কাজ চলিবে সে সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিতে লাগিলাম। শিলাইদহের হোমিয়োপ্যাথ ডাক্তার কালীপ্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয় এইসময়ে শান্তিনিকেতনে আসিলেন। বোধ করি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় এই সময়ে দুই-এক বার আশ্রমে আসিয়া বিদ্যালয় সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

১৯০১ সালের ২২শে ডিসেম্বর অর্থাৎ ৭ই পৌষ ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। কলিকাতা হইতে আগত অনেকেই সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন: পূজনীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রভৃতি

অনেকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এখানকার লাইব্রেরির মাঝের ঘরে সভা হইয়াছিল। যতদূর মনে পড়ে শ্রীমান রথীন্দ্রনাথ, সুধীরকুমার নাগ, গিরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, গৌরগোবিন্দ গুপ্ত এবং প্রেমকুমার গুপ্ত এই পাচটি বালক ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্ররূপে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। রক্তক্ষৌম বস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধান করিয়া ইঁহারা যেরূপে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন, তাহা আজ সুস্পষ্ট মনে পড়িতেছে। আমি এবং বিদ্যার্ণব মহাশয় তসরের ধুতি-চাদর পরিয়া নিকটে ছিলাম। এই অনুষ্ঠানের বিশেষ বিবরণ এবং পূজনীয় গুরুদেবের উপদেশের মর্ম ১৯০১ সালের মাঘের তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরে অনেকদিন ধরিয়া উপাধ্যায় মহাশয় গুরুদেবের সহিত পরামর্শ করিয়া সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা করিতেন। তাঁহারই উদ্যোগে ছাত্র-কয়েকটিকে পাওয়া গিয়াছিল। প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরে চুঁচুড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত রেবাচাঁদ বিদ্যালয়ের শিক্ষক হইয়া আসিলেন। রেবাচাঁদের উপরে ছাত্র-পরিচালনার ভার ছিল। তিনি বড়ো কড়া লোক ছিলেন। ছেলেরা যেমন তাঁহাকে ভালোবাসিত তেমনি তাঁহার ভয়ে কাঁপিত। আমরা পড়াইয়াই খালাস পাইতাম। রেবাচাঁদের কঠোর শাসননীতি আমাদের কিন্তু ভালো লাগিত না। এখন যেমন সকাল-সন্ধ্যায় ছেলেরা উপাসনা করে, এবং খালি-পায়ে থাকে, বিদ্যালয় আরম্ভের দিন হইতেই তাহার সূত্রপাত হইয়াছিল। প্রত্যেকের এক-এক খানি চেলির কাপড় ও চাদর থাকিত। তাহা পরিয়া ছেলেরা উপাসনায় বসিত। আহারের সময়ে প্রত্যেকে গাড়ুভরা জল লইয়া আহার-স্থানে যাইত। বলা বাহুল্য, পট্টবস্ত্র, গাড়ু থালা বাটি ইত্যাদি সকলই বিদ্যালয়ের খরচ হইতে দেওয়া হইত। অনেক ছাত্রের বিছানাও বিদ্যালয় হইতে দিতে দেখিয়াছি। তখন কোনো ছাত্রের নিকট হইতে নিয়মিত বেতন লওয়া লইত না। পাকশালা ছিল না; এখানকার লাইব্রেরির মাঝের ঘর এবং তাহারই পাশের দুইটি ছোট ঘর ছাড়া আর ঘরও ছিল না। রথীন্দ্রনাথের মাতৃদেবী তখন জীবিতা। তিনি তরকারি কুটিয়া এবং আহার্যসামগ্রী সাজাইয়া পাঠাইয়া দিতেন। রান্না হইত পোস্টঅপিস-সংলগ্ন যে ঘরে মোটর থাকিত, সেই ঘরে। ছাত্র ও অধ্যাপকের সংখ্যা বেশি ছিল না, আহারও সেখানে বসিয়া হইয়া যাইত। মাতাঠাকুরানীর সুব্যবস্থায় ছাত্র ও অধ্যাপকেরা কিছুদিন যে আনন্দ পাইয়াছিলেন তাহা ভুলিবার নয়। আমাদের সকাল-বিকালের জলখাবার তাঁহার নিজের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হইয়া আমাদের কাছে আসিত।

এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বৎসরের পর বৎসর গুরুদেব প্রায় সর্বদাই ছেলেদের সঙ্গে থাকিতেন। রাত্রিতে ছেলেদের পড়াশুনার পাট ছিল না। ছেলে অল্প ছিল, ক্লাসেই আমরা তাহাদের পড়াশুনা শেষ করাইয়া দিতাম। সন্ধ্যায় গুরুদেব ছেলে ও অধ্যাপকদের লইয়া পুস্তকপাঠ গল্প ও নানারকম খেলা করিতেন। সে এক আশ্চর্য সান্ধ্যসম্মিলন ছিল। আমরা ছাত্র ও অধ্যাপক সকলেই সন্ধ্যার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম। বলা বাহুল্য, গুরুদেবই এই সম্মিলনের নেতা ছিলেন। প্রত্যেক দিনই তিনি কি প্রকারে নূতন নূতন বিষয় লইয়া সকলের মনোরঞ্জন করিতেন, আমরা ভাবিয়া অবাক হইয়া যাইতাম। বৎসরের পর বৎসর এই সান্ধ্য সভায় উপস্থিত থাকিয়াছি— কোনোদিনই তাঁহাকে ক্লান্ত দেখি নাই। আজকাল যাহাকে sense training বলা হয়, গুরুদেব আমাদের বিদ্যালয়ের বালকগণের মধ্যে প্রথমে তাহার সূত্রপাত করেন। একটা জায়গায় কতকগুলি কড়ির স্তূপ রাখা হইত, বালকগণ আন্দাজে তাহার সংখ্যা বলিয়া দিত। একটা পাত্রে আট-দশ রকম জিনিস রাখা হইত, ছাত্রেরা একনজরে

দেখিয়াই সেগুলির বিবরণ লিখিয়া দিত। তা ছাড়া আন্দাজে জিনিসের ওজন ও দৈর্ঘ্য নিরূপণ প্রভৃতির অনেক খেলা ছিল। বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার পরে আট-দশ বৎসর গুরুদেব এইসকল চালাইয়াছিলেন। ইহার উপরে তিনি দুই-তিনটি ইংরাজি বাংলা ও সংস্কৃত ক্লাসে শিক্ষা দিতেন এবং ছেলেদের কবিতা আবৃত্তি করাও শিখাইতেন। এই সময়ে অভিনয় যে ছিল না তাহা বলা যায় না। এখনকার লাইব্রেরি-ঘরে ছেলেরা হেঁয়ালি নাট্যের অভিনয় করিত। তাহার ব্যবস্থাও গুরুদেবকে করিতে হইত। এখন যেমন নূতন গান হইলে সংগীতজ্ঞরাই তাহা প্রথমে উপভোগ করেন, তখন তাহা ছিল না; নূতন গান হইলেই ছাত্র ও অধ্যাপকদের সান্ধ্যসভায় তাহা গীত হইত। কেহই বঞ্চিত হইত না। 'মোরা সত্যের পরে মন' এই গানটি বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার কয়েকমাস পরেই রচিত হইয়াছিল। আমি ও বিদ্যার্ণব মহাশয় বিকালে পারুলডাঙায় বেড়াইবার সময়ে এই গানটি জোর গলায় গাহিতাম মনে পড়ে। তা ছাড়া আমাদেরও মাঝে মাঝে বৈঠক বসিত। সেখানে রসসাগরের পাদপূরণের মতো খেলা চলিত। ইহাতে কেহ হয়তো একটা শব্দ বা বাক্য বলিতেন, তাহারই সঙ্গে মিল রাখিয়া মুখে মুখে তাড়াতাড়ি দুই ছত্রের কবিতা রচনা করিতে হইত। মনে পড়ে একবার শিবধন বিদ্যার্ণব মহাশয় বলিলেন 'কীর্তির্যস্য স জীবতি' ইহার সহিত মিল রাখিয়া একটি কবিতা রচনা করিতে হইবে। তাড়াতাড়ি পাদপূরণ করা গেল—

হনুমতা হতা লঙ্কা
কীর্তির্যস্য স জীবতি।

খুব হাসির রোল উঠিয়াছিল।

একবার আমাদের মধ্যে স্থির হইল, সাধারণ বাক্যালাপে ইংরাজি শব্দ একেবারে ব্যবহার করা হইবে না; ব্যবহার করিলে প্রত্যেক শব্দের জন্য এক পয়সা করিয়া জরিমানা দিতে হইবে। গুরুদেবও এই খেলায় যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহাকে কিন্তু জরিমানা দিতে হয় নাই। বেশি জরিমানা দিয়াছিলেন শিবধন বিদ্যার্ণব মহাশয়। কারণ তিনি ইংরাজি লিখিতে-পড়িতে জানিতেন না, কিন্তু কথাবার্তায় অনেক ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করিতেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় একবার এই সময়ে আশ্রমে আসিয়াছিলেন। মনে আছে, ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করার জন্য তাঁহাকে অনেক দণ্ড দিতে হইয়াছিল। এমনকি যখন কলিকাতায় ফিরিবার জন্য গাড়িতে উঠিতেছেন সে সময়েও চারি পয়সা জরিমানা দিয়াছিলেন।

উপাধ্যায় মহাশয়ের গায়ে খুব জোর ছিল। তিনি ক্রিকেট ইত্যাদি নানারকম খেলা জানিতেন। তাঁহার উদ্যম ও উৎসাহ ঠিক যুবকের মতোই দেখিতাম। প্রতিদিন উপাধ্যায় মহাশয় বিকালে ছেলেদের লইয়া খেলা করিতেন। তিনি গৈরিক উত্তরীয়খানিকে সুকৌশলে জামার মতো গায়ে জড়াইয়া দৌড়াদৌড়ি করিতেন। উত্তরীয়কে গুটাইয়া জামার মতো গায়ে দেওয়ার কৌশল তখনকার অধ্যাপক ও ছেলেরা শিখিয়াছিলেন। এখন আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। কিছুদিন একজন পালোয়ান ছেলেদের কুস্তি শিখাইত দেখিয়াছি। তার পরে একজন জাপানি কুস্তিগির ছেলেদের 'যুযুৎসু' শিখাইতে আরম্ভ করিয়াছিল।

যাহা হউক, ক্রমে ছাত্রের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল ও সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপকের সংখ্যাও বাড়াইতে হইল। হিসাবপত্র রাখার জন্য একজন লোকের দরকার হইল। ডাক্তার কালীপ্রসন্ন লাহিড়ী হিসাবপত্র রাখিতেন, গুরুদেব স্বয়ং হিসাবপত্র পরীক্ষা করিতেন। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে আদি কুটীরের এবং রান্নাঘরের নির্মাণ আরম্ভ হইল। ডাক্তার কালীপ্রসন্নবাবু ও রাইপুরের রবীন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয় তাহার

তত্ত্বাবধান করিতেন। সিংহ মহাশয় ভয়ানক রাশভারি লোক ছিলেন। ঘরের জন্য মাটি লওয়া হইতে লাগিল এখনকার দুই ক্যাবিনের মাঝে যে জাম গাছটি আছে তাহার তলা হইতে। ইহাতে সেখানে একটা প্রকাণ্ড গর্ত হইয়া গিয়াছিল। বর্ষাকালে এবং এমনকি শীতকালেরও কিছুদিন পর্যন্ত সেখানে জল জমা থাকিত। ছেলেরা তাহাকে নাম দিয়াছিল 'কচ্ছপ-পুকুর'। বোধ করি হঠাৎ কোনো একদিন একটি কচ্ছপশাবক ইহাতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়াই এই নামটি। এখন কচ্ছপ-পুকুরের নামগন্ধ নাই। প্রায় চারি-পাঁচ বৎসর পরে যখন শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র রায় মহাশয় আশ্রমে শিক্ষক হইয়া আসেন, তখন তিনিই ছেলেদের লইয়াই সেই পুষ্করিণী ভরাট করিয়াছিলেন।

বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার বৎসর খানেকের মধ্যে আশ্রমের অনেক পরিবর্তন হইয়া গেল। উপাধ্যায় মহাশয় ও রেবাচাঁদ যাঁহারা বিদ্যালয়ের পত্তনের সহায় ছিলেন, তাঁহারা চলিয়া গেলেন। নূতন আসিলেন চন্দননগরের শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র মজুমদার এবং কুঞ্জলাল ঘোষ। ঘোষ মহাশয় বিদ্যালয়ের সাধারণ কার্যাধ্যক্ষ হইলেন। আমরা এখন নূতন রান্নাঘরে আহার করি, আদিকুটীরের ছেলেদের সঙ্গে বাস করি। বোধ হয় এই সময় হইতে যাহাকে বলে 'Constitution' তাহারই সূত্রপাত হইল। গুরুদেব আমাকে ও মনোরঞ্জনবাবুকে আদেশ দিলেন, কুঞ্জবাবুর হিসাবের খাতা আমাদিগকে প্রতিদিন পরীক্ষা করিয়া সহি দিতে হইবে।

এখন অধ্যাপক এবং কর্মচারীদের যেমন চায়ের গোষ্ঠী আছে, আশ্রমের প্রথম বৎসর হইতে আমাদেরও সেইরকম চা-পান-গোষ্ঠী ছিল। বিকালে চায়ের সভাটি জমিত ভালো। গুরুদেব প্রায়ই সেই সভায় উপস্থিত থাকিয়া সকলের সহিত গল্প করিতেন। আমরা সকলেই প্রাণ খুলিয়া হাসিতামাশা করিতাম। সুবোধবাবু ছিলেন এই সভার নেতা। সর্বদা একত্র অবস্থান, একত্র আমোদ-প্রমোদে, একযোগে কাজকর্ম করায় অধ্যাপকদিগের পরস্পরের সঙ্গে যে হৃদয়ের যোগ হইয়াছিল, এমনটি আর দেখি নাই।

তখনকার উৎসবগুলিও অনুপম ছিল। বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার পরে দুই-তিন বৎসর ১লা বৈশাখে যে উৎসব হইত তাহার কথা আজো ভুলি নাই। প্রথম বৎসরের উৎসবে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় প্রভৃতি অনেক অতিথি আসিয়াছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ মোহিতচন্দ্র সেন বোধ করি সেই উৎসবেই আশ্রমে প্রথম আসিয়াছিলেন। বেশ মনে পড়ে লাইব্রেরির মাঝের বড়ো ঘরটিতে সকলে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন এবং পাশের ঘরে জলযোগের আয়োজন হইতেছিল। গুরুদেব 'আমারে কর তোমার বীণা' গানটি গাহিলেন ; সকলে অবাক হইয়া শুনিতে লাগিলেন। তার পরে পশ্চিমে মেঘ করিয়া কালবৈশাখীর ঝড় আসিল। মোহিতবাবু এবং আরো অনেকে ঘর ছাড়িয়া সম্মুখের মাঠে দাঁড়াইলেন। মোহিতবাবু ঝড়ের প্রতিকূলে যে প্রকারে দৌড়াইতেছিলেন তাহার ছবি এখনো চোখে ভাসিতেছে। তিনি যেন ছিলেন উৎসাহের জীবন্ত মূর্তি। বর্ষশেষের রাত্রিতে আমরা কেহই ঘুমাইতাম না। কেহ ঘুমাইতে চেষ্টা করিলে তাহাকে জাগাইয়া রাখিতাম। সমস্ত রাত্রি মাঠে ঘুরিয়া গোলমালে কাটানো যাইত। তার পরে যখন রাত্রি চারিটার সময়ে মন্দির হইতে মৃদঙ্গের শব্দ এবং রাধিকা গোস্বামী মহাশয়ের প্রভাতী রাগিণীর সুর কানে আসিত, তখন মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইতাম। তার পরে সূর্যোদয়ের সঙ্গে আরম্ভ হইত গুরুদেবের উপদেশ। সেইসকল উপদেশ এখন বঙ্গভাষার পরম সম্পদ্ হইয়া রহিয়াছে। তাহার পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। এখন ভাবি, আমাদের তখনকার সেই উৎসাহ সেই উদ্যম কোথায় গেল।

সে সময়কার ৭ই পৌষের উৎসবগুলিও সুন্দর ছিল। কলিকাতা হইতে অনেক বিশিষ্ট অতিথি আসিতেন। মনে পড়ে একবারের ৭ই পৌষে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এবং কবি রজনীকান্ত সেন মহাশয় আসিয়াছিলেন। 'কান্তকবি'কে সেই প্রথমে দেখিলাম এবং তাঁহার গান শুনিলাম। একটা হারমোনিয়াম কাছে পাইলে তিনি অবিরাম গান করিতেন। গানে তাঁহার ক্লান্তি দেখি নাই। বোধ হয় সেইবারকার ৭ই পৌষে আশ্রমবালকেরা 'বিসর্জন' নাটকখানি অভিনয় করিয়াছিল। ইহাই আশ্রমের ইতিহাসে প্রথম অভিনয়। ইহাতে অপর্ণার ভূমিকা ছিল না। শ্রীমান সন্তোষচন্দ্র মজুমদার হইয়াছিলেন গোবিন্দমাণিক্য, জয়সিংহ হইয়াছিলেন শ্রীমান রথীন্দ্রনাথ, এবং রঘুপতি ছিলেন দিনুবাবু। শ্রীযুক্ত অক্ষয় মৈত্রেয় মহাশয় স্টেজ নির্মাণে সাহায্য করিয়াছিলেন। শ্রীমান নয়নমোহন চট্টোপাধ্যায় 'দুই কানে বাসা করিয়াছে দুই টিয়াপাখি' বলিয়া যে সুন্দর অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহা আজও মনে আছে। অভিনয়ে এমন উৎসাহ আর দেখি নাই। আমরা কয়েকজন সেই পৌষ মাসের শীতে স্টেজেই রাত্রি কাটাইয়াছিলাম। লাইব্রেরির উত্তরে এবং রান্নাঘরের পশ্চিমে যে একটি বড়ো ঘর ছিল, সেই ঘরে অভিনয় হইয়াছিল।

যতদূর মনে পড়ে বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার দুই বৎসর পরে সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় আশ্রমের কাজে যোগদান করেন। অজিতকুমার চক্রবর্তী মহাশয় তাঁহার বন্ধু ছিলেন। সেই সূত্রে অজিতবাবু প্রায়ই আশ্রমে আসিতেন। অজিতবাবুর তখন পাঠ্যদশা; সতীশবাবুর মৃত্যুর পরে বি. এ. পাস করিয়া তিনি আশ্রমের কাজে যোগদান করেন। সতীশবাবুর আগমনে বিদ্যালয়ের হাওয়া ফিরিয়া গিয়াছিল। এমন সাহিত্যরসিক উৎসাহী যুবক আর দেখি নাই। নিত্যনূতন রচনায় এবং কবিতাপাঠে তখনকার ছাত্রদিগের ভিতরে তিনি সাহিত্যপ্রীতি জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। এমন আপনভোলা লোক আর দেখা যায় না। রাত্রে একসঙ্গে আহারে বসিতাম, পাঁচ মিনিটের মধ্যে আহার শেষ করিয়া সতীশবাবু উঠিয়া মাঠে বাহির হইয়া পড়িতেন। কত অনিদ্র রজনী যে তিনি একা এবং কখনো অজিতবাবুর সঙ্গে মাঠে মাঠে ঘুরিয়া কাটাইয়া দিতেন, তাহা স্পষ্ট মনে পড়ে। প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয়ের অতি সামান্য উপলক্ষও তিনি ত্যাগ করিতেন না। সতীশবাবুর আয়োজনে একবার *Midsummer Night's Dream* -এর যে অভিনয় হইয়াছিল, তাহা সুস্পষ্ট মনে পড়ে। ইহার রিহার্সাল হইত উত্তরায়ণের পশ্চিমের খোয়াইয়ের ভিতরে। রথীন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ এবং সন্তোষচন্দ্র এই অভিনয়ে যোগদান করিয়াছিলেন। আমারও একটা ভূমিকা ছিল। শেক্সপিয়ারের লেখা কবিতা মুখস্থ করিয়া অভিনয় করিতে হইবে। খুব মুখস্থ করিলাম। কিন্তু রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া দেখি, সকল শ্রম পণ্ড হইয়াছে। যাহা মুখস্থ করিয়াছিলাম তাহার একছত্রও মনে নাই। কিন্তু অভিনয় তো করিতে হইবে— কাজেই যাহা মুখে আসিল তাহা বলিয়া অভিনয় শেষ করিলাম। শ্রোতৃবর্গ এই নূতন অভিনয় দেখিয়া অবাক। স্বর্গীয় রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই সময়ে মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতনে আসিয়া বিদ্যালয়ের কাজকর্ম দেখিতেন। দর্শকদের মধ্যে তিনি উপস্থিত ছিলেন। আমার অভিনয়পটুতা দেখিয়া তিনি খুব সাধুবাদ করিয়াছিলেন মনে আছে।

১৯০৪ সালের মাঘ মাসে সতীশবাবু এই আশ্রমেই বসন্তরোগে মারা যান। তখন বিদ্যালয় বন্ধ ছিল। আমরা চিঠি পাইলাম, বিদ্যালয় শিলাইদহে যাইবে। সকলেই শিলাইদহে উপস্থিত হইলাম। বৈশাখ পর্যন্ত বিদ্যালয়ের কাজ শিলাইদহেই হইয়াছিল। ইহার পূর্বে শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল এবং রাজেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিদ্যালয়ের কার্যে যোগ দিয়াছিলেন। বোধ করি এই সময়েই অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেন মহাশয় এবং নগেন্দ্রনাথ আইচ শিলাইদহে আসিয়া বিদ্যালয়ের কার্যে যুক্ত হইয়াছিলেন। মোহিতবাবু গুরুদেবের সহিত পরামর্শ করিয়া বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা প্রভৃতির পাকাপাকি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শিলাইদহেই ইহার সূত্রপাত হয়।

বিদ্যালয় শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলে ছাত্রসংখ্যা বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল মনে পড়ে। মোহিতবাবু এই সময়ে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। শীঘ্রই তাঁহাকে আশ্রম ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তখন গুরুদেবের শরীর ভালো ছিল না। অথচ দায়িত্ব বাড়িয়াই চলিয়াছিল। আবার উপর্যুপরি পারিবারিক বিপদ আসিতে লাগিল। এই সংকটকালে কিন্তু তাঁহাকে আমরা একটুও নিরুৎসাহ হইতে দেখি নাই। অক্ষম আমরা দীর্ঘকাল কাছে থাকিয়াও তাঁহার আদর্শ অনুসারে ছেলেদের গড়িয়া তুলিতে পারিতাম না; বরং আমরাই মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হইয়া গোলযোগ বাধাইয়া তুলিতাম। এখন সেসব কথা মনে করিলে লজ্জায় মাথা নত হয়। গুরুদেব নিজেই ছেলেদের সহিত মিশিয়া ছেলেদের মধ্যে থাকিয়া তাঁহার আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিতে প্রাণপণ পরিশ্রম করিতেন। এই সময়ে আচার্য জগদীশচন্দ্র মাঝে মাঝে আশ্রমে আসিতেন এবং তাঁহার গবেষণা-সম্বন্ধীয় পরীক্ষাদি আমাদের দেখাইতেন। অনেকবার গুরুদেব নিজে আয়োজন করিয়া রায়পুর প্রভৃতি স্থানে ছেলেদের লইয়া পিক্‌নিক করিতে গিয়াছেন। মনে পড়ে, একবার গুরুদেব এবং আচার্য জগদীশচন্দ্র ছেলেদের লইয়া হাঁটিয়া রায়পুর পর্যন্ত গিয়াছিলেন, এবং আহারান্তে হাঁটিয়া আশ্রমে ফিরিয়াছিলেন। ছেলেদের তখন যতগুলি বাসগৃহ ছিল, গুরুদেবকে পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক বাসগৃহে কিছুদিন করিয়া থাকিতে দেখিয়াছি।

ইহার অনেকদিন পরের একটি ঘটনার কথা মনে পড়িল। তখন গুরুদেব ছেলেদের সঙ্গে লাইব্রেরির উপরকার দোতলা খড়ের ঘরে থাকিতেন। সেই ঘরের ছেলেরা বড়ো উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। তাই তাঁহাকে কিছুকাল সেখানে থাকিতে হইয়াছিল। হয়তো ছেলেদের মনোরঞ্জন করিয়া সংযত রাখিবার জন্য ঐ ঘরে বসিয়া তিনি একখানি নাটক লেখা আরম্ভ করিয়া দিলেন। দিনে দিনে নূতন-নূতন সুরে গান রচনা হইতে লাগিল। সন্ধ্যার পরে সেখানে বসিয়াই ছেলেদের সেইসব গান শিখাইতে লাগিলেন। আনন্দের আর সীমা রহিল না। আশ্রমে যে একটা থম্‌থমে ভাব ছিল, তাহা কাটিয়া গেল। ইহাই সেই সুপ্রসিদ্ধ শারদোৎসব নাটক। এই নাটকখানি যেদিন আশ্রমবাসী সকলকে ডাকিয়া আগাগোড়া শুনানো হয়, তাহাও মনে পড়ে। তখন সবে নাট্যঘরের মাঝের অংশটা নির্মিত হইয়াছে। গুরুদেব সেই ঘরে সভা করিয়া একদিন সন্ধ্যায় 'শারদোৎসব' পড়িয়া শুনাইলেন। ইহার পরেও লক্ষ্য করিয়াছি, কোনো কারণে আশ্রমে যখন ক্ষোভ দেখা দিয়াছে তখন অভিনয়াদির আয়োজনে সবই পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। আমাদের আশ্রমে এখন যে ঋতু-উৎসবের অনুষ্ঠান হয়, তাহার সার্থকতা কম নয়।

আশ্রমের প্রথম-জীবনে এখনকার মতো সাহিত্যসভা এবং পত্রিকাদি প্রকাশের ব্যবস্থা ছিল না বটে, কিন্তু সাহিত্যের আলোচনা যথেষ্ট ছিল। মোহিতবাবু আসিয়া ছাত্র ও অধ্যাপকদের মধ্যে সাহিত্যসভা'র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মনে পড়ে আমি কয়েকটি প্রবন্ধ এই সভায় পড়িয়াছিলাম। গুরুদেব এই সভায় আসিয়া বসিতেন। সতীশবাবু যখন আশ্রমে ছিলেন তখন তিনি সাহিত্যের আসরখানিকে রচনাপাঠে মশগুল রাখিতেন। গুরুদেব যেসকল প্রবন্ধাদি রচনা করিতেন তাহার প্রথম প্রসাদ এখনকারই মতো

আমাদেরই ভাগ্যে জুটিত। তার পরে কিছুকাল ধরিয়া অতি প্রত্যূষে তিনি মন্দিরে নিয়মিতভাবে যেসকল উপদেশ দিতেন, তাহাও তখন আশ্রমে সাহিত্যক্ষেত্র-রচনার সহায় হইয়াছিল। সেই অমূল্য উপদেশাবলীর অধিকাংশই 'শান্তিনিকেতন' নামক পুস্তিকার কয়েক খণ্ডে রহিয়াছে। তার পরে পূজনীয় বড়োবাবু মহাশয় মাঝে মাঝে আসিয়া অধ্যাপকদিগকে লইয়া বৈঠক করিতেন। তাহাতে সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধে যেসকল আলোচনা হইত তাহা অধ্যাপকদিগকে কম উপকৃত করে নাই। এই সময়ের একটি ঘটনার কথা মনে পড়িয়া গেল। তখন 'বেদান্তদর্শন' অথবা 'কাণ্ট' লইয়া প্রত্যেক সন্ধ্যায় দিনের পর দিন আলোচনা চলিতেছিল। সকলে তন্ময় হইয়া শুনিতেন। আমার কিন্তু শুনিতে শুনিতে ঘুম পাইত। ঘুম আর রাখা যায় না, তাই ঘটি হাতে করিয়া প্রায়ই সভা ত্যাগ করিয়া যাইতাম। বড়োবাবু কয়েকদিন ইহা লক্ষ্য করিয়া একদিন বলিলেন— 'জগদানন্দ আমাকে দেখলেই ঘটি হাতে করে বার হয়ে পড়েন। তাঁর হল কি? আচ্ছা তাঁকে ছুটি দেওয়া গেল।' গুরুদেবের কাছে যেমন অনেক নূতন কবি ও লেখক রচনা সংশোধন করাইবার জন্য উপস্থিত হন, আমরাও একসময়ে আমাদের নিজের রচনা সংশোধন করাইবার জন্য তাঁহার নিকটে যাইতাম। ইহাতে তাঁহাকে একটু বিরক্ত হইতে দেখি নাই। কোন্ বিষয়ে কি-রকমে লিখিলে ভালো হইবে, সর্বদাই সে সম্বন্ধে উপদেশ পাইয়াছি। আমার আগেকার বৈজ্ঞানিক ভাষা ভয়ানক জটিল ছিল। সহজ ভাষায় বৈজ্ঞানিক বিষয় লিখিবার উপদেশ তিনি আমাকে বারবার দিয়াছেন। কেবল ইহাই নয়, আমার দুই-একখানি বইয়ের প্রুফ পর্যন্ত তিনি নিজে দেখিয়া সংশোধন করিয়াছেন। কেবল আমিই যে এই অনুগ্রহ পাইয়াছি, তাহা নয়। অধ্যাপক ও ছাত্রদের মধ্যে যাঁহারা একটু-আধটু লিখিতে পারিতেন, তাঁহাদিগের উপরে নানা বিষয়ের লেখার ভার দিয়া তিনি তাহা আদায় করিয়া লইতেছেন এবং সংশোধন করিয়া দিতেছেন ইহাও অনেক দেখিয়াছি। ইহার ফলে এক সময়ে আশ্রমের অধ্যাপক ও ছাত্রদের ভিতরে সাহিত্যচর্চা খুব বাড়িয়াছিল। সেই সময়ের কয়েকটি ছাত্র এবং অধ্যাপক এখন সুলেখক বলিয়া খ্যাতিও অর্জন করিয়াছেন।

শান্তিনিকেতন পত্র
জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩

জগদানন্দ রায়ের গ্রন্থপঞ্জী

জগদানন্দ রায়ের গ্রন্থ-প্রকাশের সময়কাল, স্থূলভাবে ধরা যেতে পারে ১৩১৮ থেকে ১৩৩৮। তাঁর নিজের তথ্য অনুযায়ী সম্ভবত ১২৯৮।৯৯ থেকে তাঁর 'সাহিত্যচর্চার' সূচনা; গ্রন্থ-প্রকাশের বহু পূর্বেই জগদানন্দ রায় প্রবাসী বঙ্গদর্শন তত্ত্ববোধিনী সাধনা প্রভৃতি পত্রে বিজ্ঞানবিষয়ক রচনাদি প্রকাশ করেছেন। এইসব রচনা পড়ে "তাঁর প্রতি" রবীন্দ্রনাথের "বিশেষ শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হয়েছিল"— 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' পুস্তিকায় এবংবিধ স্বীকৃতি রয়ে গেছে; রবীন্দ্রনাথ আরও লিখছেন, "আমি তাঁকে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনার কাজে আমন্ত্রণ করলুম।" এই শান্তিনিকেতন পর্বে জগদানন্দ রায়ের গ্রন্থরচনার পূর্ণ সুযোগ ও বিকাশ ঘটে; "তিনি যেমন শান্তিনিকেতনকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন, শান্তিনিকেতনও সুযোগ-সুবিধা দিয়ে তেমনি তাঁকে গড়ে তুলেছিল দেশের একজন বৈজ্ঞানিক লেখক হিসেবে।"—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। জগদানন্দ রায়ের সাহিত্যকর্ম প্রধানত অল্পবয়স্কদের উদ্দেশেই রচিত, সেসঙ্গে তিনি, তাঁর ভাষ্য-অনুযায়ী "যাহাতে…অন্তঃপুরের মহিলারাও বুঝিতে পারেন" কখনো-কখনো সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি দিয়েছেন। "জ্ঞানের ভোজে এদেশে তিনিই সবপ্রথমে কাঁচা বয়সের পিপাসুদের কাছে বিজ্ঞানের সহজ পথ্য পরিবেষণ করেছিলেন।"— রবীন্দ্রনাথ, ১২।৯।৩৮। বিজ্ঞানের বিচিত্র বিষয়ের ও তথ্যের বাংলাভাষায় সর্বপ্রথম গ্রন্থনার কৃতিত্ব শুধু নয়, আমাদের প্রত্যহদৃষ্ট প্রতিবেশী জীবপ্রকৃতি সম্বন্ধীয় সর্বপ্রথম রচনার গৌরবও জগদানন্দ রায়ের প্রাপ্য। 'প্রকৃতি-পরিচয়' গ্রন্থের ভূমিকায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় লিখছেন: "বাস্তবিক পাশ্চাত্ত্য দেশেই হউক বা স্বদেশেই হউক, বিজ্ঞানের যে-সকল উচ্চ তত্ত্ব আজকাল আবিষ্কৃত হইতেছে, এদেশে সাধারণ পাঠকের নিকট তাহার ঘোষণার ভার একা জগদানন্দবাবুর উপরই পড়িয়াছে; অথবা তিনি তাঁহার জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।" জগদানন্দ রায়ের পুস্তক-তালিকা সেই ব্রত-পালনের পরিচায়ক রূপে নিবেদিত হল।

জগদানন্দ কতসংখ্যক গ্রন্থ রচনা বা প্রকাশ করেছেন তার নির্দিষ্ট কোনো হিসেব করা মুশকিল। সৌভাগ্যের বিষয় অধিকাংশ গ্রন্থই পুনর্মুদ্রিত হয়েছে; কিন্তু তাঁর গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রায় দুষ্প্রাপ্য। যেখানে প্রথম সংস্করণ দেখা হয় নি, সেখানে লেখকের 'নিবেদন' বা 'বিজ্ঞাপন'এর তারিখ উল্লিখিত হয়েছে। এই তালিকা-বহির্ভূত কোনো গ্রন্থের অস্তিত্ব অসম্ভব নয়। জগদানন্দ রায়ের অধিকাংশ গ্রন্থের চিত্রশিল্পী বা প্রচ্ছদশিল্পী হিসেবে নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা, শ্রীরামকিংকর বেইজ প্রভৃতি শান্তিনিকেতন কলাভবনের তৎকালীন অধ্যাপক ও ছাত্রদের নাম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তিনি গ্রন্থের 'নিবেদন'এ উল্লেখ করেছেন।

বিভিন্ন সময়ে জগদানন্দ রায় বিদ্যালয়পাঠ্য গ্রন্থ রচনা বা সংকলন করেছেন— তন্মধ্যে দৃষ্ট বা বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে তালিকাভুক্ত পুস্তিকাগুলির সংক্ষিপ্ত তালিকাও দেওয়া গেল। তাঁর শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে শান্তিনিকেতন পুস্তক-প্রকাশ-সমিতি সম্প্রতি জগদানন্দ রায়ের জীবন ও সাহিত্য কর্ম বিষয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন।

প্রকৃতি-পরিচয় ॥ অতুল লাইব্রেরি, ঢাকা। তারিখ নেই।

'উৎসর্গ' ও 'বিজ্ঞাপন'এর তারিখ আষাঢ়, ১৩১৮

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় লিখিত ভূমিকা-সংবলিত।

"প্রবাসী, বঙ্গদর্শন, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, সাহিত্যসংহিতা, মানসী প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় আমার যে-সকল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাদেরি মধ্য হইতে কয়েকটি বাছিয়া লইয়া এই পুস্তক প্রকাশ করা হইল।" —'বিজ্ঞাপন'

বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার ॥ ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, এলাহাবাদ। তারিখ নেই।

'বিজ্ঞাপন'এর তারিখ আশ্বিন, ১৩১৯

"এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে আচার্য্যবরের সকল আবিষ্কার-বিবরণ স্থান পায় নাই, কেবল কয়েকটি স্থূল তত্ত্বের কথাতেই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে।··· রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী··· গ্রন্থপ্রকাশে উৎসাহ দিয়াছেন।" —'বিজ্ঞাপন'

"···সার্ জগদীশচন্দ্র তাঁহার আবিষ্কৃত আধুনিক তত্ত্বগুলির বিবরণ গ্রন্থকারকে জানাইয়াছিলেন। এই অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইলে পুস্তক অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত।" —'নিবেদন', দ্বিতীয় সংস্করণ

বৈজ্ঞানিকী ॥ ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ। ১৩২০। প্রবন্ধ-সংকলন

"যে-সকল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এই গ্রন্থে স্থান পাইল, তাহাদের কতকগুলি পূর্ব্বে "প্রবাসী", "বঙ্গদর্শন", "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" প্রভৃতি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। কয়েকটি নূতন রচনাও গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।···" —'নিবেদন', জ্যৈষ্ঠ ১৩২০

সূচী : দেহশত্রু ও দেহমিত্র ; মনুষ্যে পশুত্ব ; বংশের উন্নতিবিধান ; চক্ষু ও আলোক ; শ্বাসযন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ; সুরাসক্তি ; অব্যক্ত জীবন ; বন ও বৃষ্টি ; ভবিষ্যতের আহার্য্য ; মাখন ; শ্রম ও অবসাদ ; অবসাদ ; জৈব রসায়নের উন্নতি ; প্রাচীন ভূ-তত্ত্ব ; আধুনিক ভূ-তত্ত্ব ; ভূ-গর্ভ ; পৃথিবীর গুরুত্ব ; ভূ-কম্পন ; পৃথিবী ও সূর্য্যের তাপ ; নূতন রসায়ন-শাস্ত্র ; ইলেকট্রন ; নক্ষত্রের গঠনোপাদান ; সৌরকলঙ্ক ; আলোকের চাপ।

প্রাকৃতিকী ॥ ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, এলাহাবাদ। ১৯১৪। প্রবন্ধ-সংকলন

"নানা মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত আমার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলী হইতে কতকগুলিকে লইয়া "প্রাকৃতিকী" রচিত হইল।···"শুক্রভ্রমণ" প্রভৃতি দুই-তিনটি প্রবন্ধ প্রায় বাইশ বৎসর পূর্ব্বের রচনা ; তখন সাহিত্যচর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছি মাত্র।" —'নিবেদন', ভাদ্র ১৩২১

সূচীপত্র : বৈজ্ঞানিকের স্বপ্ন ; পরশ-পাথর ; রসায়নীবিদ্যার উন্নতি ; ধাতুর কয়েকটি গুণ ; বর্ণচ্ছত্র ; নূতন বিশ্লেষণ প্রথা ; অদৃশ্য কিরণ ; ডপলার সাহেবের সিদ্ধান্ত ; ভূমিকম্প ; বিম্ব ; লর্ড কেলভিন ; মনুষ্যসৃষ্টি জীবনটা কি ? ; প্রাণিদেহের উত্তাপ ; আলোক ও বর্ণজ্ঞান ; ঘ্রাণতত্ত্ব ; প্রাণী ও উদ্ভিদের বিষ ; অমৃত ও গরল ; প্রকৃতির বর্ণ-বৈচিত্র্য ; বৃক্ষের চক্ষু ; মৃত্যুর নবরূপ ; একটি নূতন আবিষ্কার ; কেরোসিন তৈল : দধি ; চা-পান ; বাবিলোনীয় জ্যোতিষিগণ ; পৃথিবীর শৈশব ; মঙ্গল গ্রহ ; নূতন নীহারিকাবাদ ; গ্রহদিগের কক্ষা ; বিজ্ঞানে সূক্ষ্মগণনা ; শুক্র-ভ্রমণ।

গ্রহ-নক্ষত্র ॥ ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ। ১৯১৫

"বিজ্ঞ পাঠক দুই-চারি পৃষ্ঠা উলটাইলেই বুঝিবেন, পুস্তকখানি তাঁহাদের জন্য লেখা হয় নাই। অল্প বয়সে …ইচ্ছা হইত সমবয়স্ক দুই চারি জন ছেলেকে ডাকিয়া জ্যোতিষের গল্প বলি; কিন্তু তখন ইহা হইয়া উঠে নাই। বাল্যের সেই সাধটি প্রৌঢ় বয়সে পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি।"—'নিবেদন', আশ্বিন ১৩২২

পোকামাকড় ॥ ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, এলাহাবাদ। ১৩৩১। দ্বিতীয় সংস্করণ

"…যে-সকল পোকামাকড় আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই তাহাদেরি জীবনবৃত্তান্ত ইহাতে বিশেষভাবে স্থান পাইয়াছে।" —'নিবেদন', আশ্বিন ১৩২৬

বিজ্ঞানের গল্প ॥ ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, এলাহাবাদ। ১৯২০

গাছপালা ॥ ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, এলাহাবাদ। ১৯২১

"ছোটো ছেলেমেয়েদের পড়ার উপযোগী উদ্ভিদ্‌বিদ্যার কোনো বই বাংলা ভাষায় নাই। তাই বাংলাদেশেরই সাধারণ গাছপালার পরিচয় দিয়া বইখানি রচনা করিয়াছি।…"— 'নিবেদন', আশ্বিন ১৩২৮

মাছ ব্যাঙ্‌ সাপ ॥ ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, এলাহাবাদ। ১৯২৩

"বইখানির নাম "মাছ ব্যাঙ্‌ সাপ" হইলেও ইহাতে কুমীর কচ্ছপ টিকটিকি গিরগিটি প্রভৃতি আরো অনেক প্রাণীর বৃত্তান্ত আছে।…" —'নিবেদন', আশ্বিন ১৩৩০

পাখী ॥ ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, এলাহাবাদ। ১৩৩১

"…ইহা আমার "পোকামাকড়" এবং "মাছ ব্যাঙ্‌ সাপ" নামক পুস্তক দুইখানির অনুবৃত্তি।"— 'নিবেদন', বৈশাখ ১৩৩১

শব্দ ॥ ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, এলাহাবাদ। ১৩৩১

বাংলার পাখি ॥ ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, এলাহাবাদ। ১৯২৪

পরিচ্ছেদ-সূচী নিম্নরূপ: শাখাশ্রয়ী; কপোত-জাতি; কূলেচর; সন্তরণকারী।

আলো ॥ ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা ও ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, এলাহাবাদ। ১৯৪৪

লেখকের 'নিবেদন'এর তারিখ শ্রাবণ, ১৩৩৩

চুম্বক ॥ ইণ্ডিয়ান প্রেস (পাবলিকেশন) লিমিটেড, এলাহাবাদ। ? সংস্করণ, ১৯৫৩।

'নিবেদন'এর তারিখ আশ্বিন, ১৩৩৫

তাপ ॥ ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, এলাহাবাদ। ১৩৩৫

স্থির-বিদ্যুৎ ॥ ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ ও কলিকাতা। ১৯২৮

চল-বিদ্যুৎ ॥ ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস। পুনর্মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৩৬০

"বিদ্যুৎ-তত্ত্বের মূল সূত্রগুলি…যাহাতে আমাদের বালক-বালিকারা এবং অন্তঃপুরের মহিলারাও বুঝিতে পারেন, রচনাকালে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছি।…ইহাই চল-বিদ্যুৎ সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় প্রথম পুস্তক। রচনাকালে কাহারো সাহায্য বা পরামর্শ গ্রহণের সৌভাগ্য ঘটে নাই।…"— 'নিবেদন', বৈশাখ ১৩৩৬

নক্ষত্র-চেনা ॥ ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা ও ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, এলাহাবাদ। ১৯৩১

"মনে পড়ে, যখন বয়স অল্প ছিল, তখন এক সময়ে নক্ষত্র-চেনার বাতিক এত প্রবল হইয়াছিল যে, সমস্ত রাত্রি খোলা মাঠের মাঝে দাঁড়াইয়া নক্ষত্র চিনিতাম। এইরকমে অনেক অনিদ্র রজনী কাটাইয়াছি।...আমার নৈশ অভিযানের সহায় ছিল একখানি ক্ষুদ্র ইংরেজি নক্ষত্র-পট এবং কালো কাপড়ে ঢাকা একটি ছোটো লণ্ঠন। লণ্ঠনের মৃদু আলোতে পটে-আঁকা নক্ষত্রদের সঙ্গে আকাশের নক্ষত্রদের মিলাইয়া লইতাম।

তারপরে শিক্ষকতা-সূত্রে বহু ছাত্রের সংস্পর্শে আসিয়া, তাহাদিগকে আকাশ দেখাইয়া মুখে মুখে নক্ষত্র চিনাইয়াছি। তাহারা ইহাতে আনন্দ ও শিক্ষা পাইয়াছে।..."—'নিবেদন', শ্রাবণ, ১৩৩৮

রচিত পাঠ্য-পুস্তক

আদর্শ স্বাস্থ্যপাঠ ॥ ১৩৩০

আর্য্য-কাহিনী ॥ তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৩১

বিভিন্ন পুরাণ, জাতক ও ভক্তমাল-অন্তর্ভূত কাহিনীর সংগ্রহ।

বিজ্ঞান-পরিচয় ॥ ১৯২৫

বিজ্ঞান-প্রবেশ ॥ ১৯২৫

ছুটির বই ॥ দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৩৯

সূচী: স্যার জগদীশচন্দ্র; পতঙ্গের আত্মরক্ষা; কয়েকটি অদ্ভুত প্রাণী; বানরের ভাষা; মানুষের নকল বুদ্ধি; ফরিদপুরের খেজুর গাছ; জড় ও জীব; দোলনা; ঘুণ, বায়োস্কোপ; চোখের ভুল; আগুন; সবচেয়ে বড়; মজার ছবি; অদ্ভুত পত্র।

পর্য্যবেক্ষণ শিক্ষা, ১ম ও ২য় ভাগ ॥ ?১৯৩৮

সংকলিত বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক

সাহিত্য-সোপান ॥ ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম ভাগ। ?১৯২২। সাহিত্য-সন্দর্ভ ॥ দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯১৭। কনক-পাঠ ॥ ১৩২৫। চয়ন ॥ শ্রীপ্রমথনাথ বিশী-সহযোগে। জ্ঞান-সোপান ॥ দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৩০। গদ্য ও পদ্য ॥ ১৯৩৬। পুস্তিকাটির গদ্যাংশ সম্পূর্ণ জগদানন্দ রায়-রচিত, এমন অনুমিত হয়।

সম্পাদিত পত্র

শান্তিনিকেতন ॥ প্রথম বর্ষ, ১৩২৬। দ্বিতীয় বর্ষ, ১৩২৭, বিধুশেখর ভট্টাচার্য শাস্ত্রী -সহ

বার্ষিক শিশুসাথী ॥ আশ্বিন ১৩৩৪

পার্থ বসু

জগদানন্দ রায় সম্বন্ধে রচনার সূচী

প্রবন্ধ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়। মনোরঞ্জন চৌধুরী, সুপ্রভাত ১৩১৮ মাঘ
স্বর্গীয় জগদানন্দ রায়। শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিচিত্রা ১৩৪০ আশ্বিন
জগদানন্দ রায়। মনোরঞ্জন গুপ্ত, যুগান্তর ৫ আশ্বিন ১৩৭০
জগদানন্দ রায়। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, দেশ ১৩৭৩ সাহিত্য-সংখ্যা
জগদানন্দ রায়। শ্রীঅমিয়কুমার সেন, ভারতকোষ, তৃতীয় খণ্ড ১৩৭৪
শিক্ষাব্রতী জগদানন্দ রায়। শ্রীচিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, যুগান্তর ৩ আশ্বিন ১৩৭৬
জগদানন্দ রায়। শ্রীকমলাকান্ত শর্মা [শ্রীপ্রমথনাথ বিশী], আনন্দবাজার পত্রিকা ৭ আশ্বিন ১৩৭৬
জগদানন্দ রায়। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কথাসাহিত্য ১৩৭৬ আশ্বিন
JAGADANANDA ROY S. K. M. [Sisir Kumar Mitra],
Visva-Bharati News, July 1933
MASTER MASHAI JAGADANANDA ROY Sudhiranjan Das,
Visva-Bharati News, September 1969
JAGADANANDA ROY Nityanandabinode Goswami,
Visva-Bharati News, September 1969
JAGADANANDA ROY Niranjan Sarkar, Visva-Bharati News, September 1969

প্রসঙ্গ-সংবলিত গ্রন্থ

রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। ১৩৫১
ON THE EDGES OF TIME Rathindranath Tagore, 1958
আমাদের শান্তিনিকেতন। শ্রীসুধীরঞ্জন দাস। ১৩৬৬
আমার দেখা রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর শান্তিনিকেতন। শ্রীপ্রমদারঞ্জন ঘোষ। ১৯৬৯
এতদ্‌ব্যতীত শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনীর বিভিন্ন খণ্ডে জগদানন্দ রায় প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

শ্রীঅনাথনাথ দাস

লোকসংস্কৃতি ও তত্ত্বজিজ্ঞাসা

তুষার চট্টোপাধ্যায়

"Folklore is a word with a short but turbulent history".*

'ফোকলোর' শব্দটির উদ্ভবকাল অধিক দিন না হলেও, প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টিকারী এর ইতিহাস—ফোকলোর তথা লোকসংস্কৃতি[১] সম্পর্কিত তত্ত্বালোচনার প্রারম্ভে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লোক-সংস্কৃতিবিদ্ রিচার্ড ডরসনের এই স্মরণীয় উক্তি উদ্ধৃত করে আমরা লোকসংস্কৃতির বহুবিতর্কিত স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে পারি। প্রকৃতপক্ষে 'ফোকলোর' শব্দটির উদ্ভবকাল থেকেই লোকসংস্কৃতির তাৎপর্য অনুশীলন ও তার সংজ্ঞাপ্রকরণ প্রসঙ্গে অবিচ্ছেদ্য রূপে বিতর্ক চলে এসেছে। বিভিন্ন দেশের লোক-সংস্কৃতিবিদ্গণই যে লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন মত পোষণ করেন তা নয়, একই দেশের লোকসংস্কৃতিবিশেষজ্ঞগণও লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা প্রকাশ করে থাকেন। লোকসংস্কৃতির সঙ্গে—ইতিহাস, জাতিতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য, শিল্পতত্ত্ব প্রভৃতি এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে অন্বিত যে স্বতন্ত্র বিষয় রূপে লোকসংস্কৃতির শিক্ষাগত শৃঙ্খলা সংস্থাপন অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। অবশ্য বিশিষ্ট সর্বজনস্বীকৃত গণ্ডিতে আবদ্ধ নয় বলেই জিজ্ঞাসুমনস্ক ব্যক্তির নিকট বিষয় হিসাবে লোকসংস্কৃতির গবেষণা-অনুশীলন আবিশ্ব উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে।[২] পরম্পরাশ্রয়ী বহুবিধ বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত লোকসংস্কৃতির মিশ্রচরিত্র অনুধাবনে স্বভাবতই বিভিন্ন শিক্ষাগত শৃঙ্খলানুসারী ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন।

বিষয় হিসাবে লোকসংস্কৃতি অগ্রবর্তী সমাজের উচ্চসংস্কৃতি এবং আদিম সমাজের সাংস্কৃতিক প্রয়াস থেকে ভিন্ন। ব্যাপক অর্থে মনুষ্যসমাজের সামগ্রিক সামাজিক ক্রমানুবর্তনই সংস্কৃতিরূপে অভিহিত হয়। যে কৃতির বলে মানুষ ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যে জীবনপ্রয়াস ও মানসিক সৃষ্টিশক্তির বহুবিধ বৈচিত্র্যে জীবনকে বিকশিত করে তাই সংস্কৃতি। নৃতত্ত্বের ভাষায়—জীবন প্রয়াসের বৃত্তে বাস্তব সৃষ্টি ও মানস-সৃষ্টি এবং বৈষয়িক কৃষ্টি ও শিল্পকলার সমূহ সম্পদই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত।[৩] সমাজ বিকাশের স্তরানুসারে সংস্কৃতিরও রূপভেদ লক্ষ্য করা যায়। অভ্যন্তরীণ ও বহির্মুখীন নানাবিধ কারণে মানবিক অভিজ্ঞতা, আবেগ ও ধারণা -সমষ্টি প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয় এবং তদানুসারে সংস্কৃতিও সতত রূপান্তরিত হয়।[৪] সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকাশের একপ্রান্তে আদিম সমাজ এবং অন্যপ্রান্তে ক্রমঅগ্রসরমান উচ্চ সমাজ এবং

---

* Richard M. Dorson—American Folklore, 1962, U.S.A. A Foreword on Folklore, Page 1.

১ "ফোকলোর"এর সর্বজন-স্বীকৃত বা -অনুমোদিত প্রতিশব্দ অদ্যাপি আমাদের দেশে গৃহীত হয় নি। বর্তমান লেখক 'লোককৃতি' শব্দটিকে ফোকলোরএর সার্থক প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহারের পক্ষপাতী। অবশ্য প্রতিশব্দ নির্ণয়ের সমস্যা সম্পর্কে সবিশেষ আলোচনার অবকাশ বর্তমানে না থাকায় 'লোকসংস্কৃতি' শব্দটিই সাধারণভাবে ব্যবহৃত হল।

২ "Folklore has been an exciting field for many students precisely because it has not yet hardened into a mold of accepted doctrine," Kenneth and Mary Clarke—A Folklore Reader, 1965, U.S.A., Page 7-8.

৩ John J. Hanigmann—Understanding Culture, 1963, Page 3.

৪ Melville J. Herskovits—Cultural Anthropology, 1969 Part IV—Cultural Structure and Cultural Dynamics, Page 446.

তদনুসারে সংস্কৃতির দুই রূপ— আদিম সংস্কৃতি ও উচ্চসংস্কৃতির মধ্যে প্রতিফলিত। পারস্পরিক সংযোগ ও সংহতির ভিত্তিতে উচ্চসমাজের পাশাপাশি গড়ে-ওঠা লোকসমাজের পারস্পরিক আত্মিক সংযোগ ও জীবনযাপনপদ্ধতি থেকে উদ্ভূত সংস্কৃতিই লোকসংস্কৃতি। অবিভক্ত আদিম সমাজে সংস্কৃতির একই রূপ দেখা যায়। কালের বিবর্তনে সমাজে যখন বর্ণ বা বৃত্তি -গত বিভাগ স্পষ্ট হল সেই সময় থেকেই সংস্কৃতি বিভক্ত হল দুই ধারায়। আদিম ঐক্যবদ্ধ সমাজ ভেঙে বর্ণ ও বৃত্তি -গত বিভাগ শুরু হবার পর থেকেই বিভক্ত সমাজ দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের পথ বেয়ে অগ্রসর হয়েছে এবং এইভাবে উচ্চ ও নিম্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত শ্রেণী-সমাজে সংস্কৃতির শ্রেণীবিভাগ সুস্পষ্ট হয়েছে। মোটের উপর বলা যায় ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পরিবেশ, উৎপাদনরীতি ও বণ্টনব্যবস্থা এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণের পটভূমির উপরেই সমাজ বিন্যস্ত এবং সেই বিন্যাসের বিশেষ ভিত্তিতেই লোকসংস্কৃতির বিকাশ। উৎপাদন-ব্যবস্থা, জীবন-যাপন-পদ্ধতি, জাতি-ধর্ম-বর্ণ প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ বৃত্তবন্ধনে আবদ্ধ লৌকিক সমাজজীবনের সংহতি স্বতঃস্ফূর্ত। সমাজের নিম্নস্তরে সমষ্টিবদ্ধ জীবনপ্রয়াসে ব্যক্তিজীবন প্রকটরূপে স্বাতন্ত্র্য বিভূষিত ও বিশিষ্ট হয় না, বিপরীতক্রমে আত্মতন্ত্র সতত সমাজ সংহতিতে সম্মিলিত হয়। এই রকম লোকায়ত সংহত সমাজের পটভূমিতেই সমষ্টিবদ্ধ মানুষের জীবন-প্রয়াসের সূত্রে সামাজিক ভাবে স্বতঃস্ফূর্ত লোকসংস্কৃতির উদ্ভব এবং বিপরীতক্রমে সমাজের উচ্চস্তরে যেখানে আত্মস্বাতন্ত্র্য অত্যন্ত প্রোজ্জ্বল সেখানেই সমষ্টিচেতনার দায়বন্ধহীন ব্যক্তি-প্রতিভা প্রকর্ষিত উচ্চসংস্কৃতির বিকাশ। ব্যক্তিচৈতন্য সমৃদ্ধ শিষ্টজনের সম্যক কৃতিই হচ্ছে উচ্চসংস্কৃতি আর সমষ্টিগতভাবে সমাজের বা গোষ্ঠীর সামগ্রিক জীবনাশ্রয়ী কৃতিই লোকসংস্কৃতি। উচ্চসংস্কৃতি সাধারণ-ভাবে নিত্যপরিবর্তনশীল কিন্তু লোকসংস্কৃতি মূলতঃ মন্থর। ঐতিহ্যানুসরণই লোকসংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্য এবং প্রথাবদ্ধ রক্ষণশীলতার ভিত্তিতেই লোকসংস্কৃতির বিকাশ। লোকসংস্কৃতি এদিক থেকে সাধারণভাবে উচ্চসংস্কৃতির বিপরীত কোটির সংস্কৃতি। সংস্কৃতির এই শ্রেণীভেদ শ্রেণীবিভক্ত সমাজেরই অনিবার্য পরিণাম। সমাজ যখন বিভক্ত সংস্কৃতিও তখন বিভক্ত এবং এই রকম সমাজ-পরিবেশেই সংস্কৃতির বিভেদ পরিলক্ষিত হয় এবং লোক-জীবন ও উচ্চ-জীবনাশ্রয়ী সংস্কৃতির দ্বিবিধরূপ অভিব্যক্তি লাভ করে লোকসংস্কৃতি ও উচ্চ-সংস্কৃতির মধ্যে। সাধারণভাবে উচ্চসংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতির মধ্যে প্রধান পার্থক্য আভিজাত্যবোধের তারতম্যে পরিগণিত করা হয়। উচ্চসংস্কৃতির মধ্যে যে মার্জিত মানসিকতার ভাব বিদ্যমান লোকসংস্কৃতিতে তার উজ্জ্বল অনুপস্থিতি। সংহত সমাজের পটভূমিকায় গণজীবনের নিত্যনৈমিত্তিক কর্মলীলা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকেই লোকসংস্কৃতির বিবর্তনধর্মী অকৃত্রিম প্রবাহটি স্বতঃস্ফূর্তরূপে উৎসারিত হয়। লোক-সংস্কৃতির একদিকে জনসাধারণ অন্যদিকে নিরবধি কাল। নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ লোকসংস্কৃতির ধারাটি উচ্চসংস্কৃতির শিষ্ট ধারার পাশাপাশি সতত প্রবাহিত। উচ্চ ও লোকসংস্কৃতির ধারা দুটি কখনো পরস্পরাশ্রয়ী, কখনো বিচ্ছিন্ন, কখনো ভিন্ন, কখনো অভিন্ন। বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী উচ্চ ও লোকসংস্কৃতি পারস্পরিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে গ্রহণ-বর্জনের পথে চলমান জীবনধর্মকেই প্রতিফলিত করে। প্রতি দেশেরই, যথার্থ অর্থে, সংস্কৃতির প্রাথমিক বিকাশ সমাজের লোকায়ত স্তরে লৌকিক জীবনযাত্রায় এবং লোকসংস্কৃতির ঐ প্রাথমিক ভিত্তির উপরেই উচ্চসংস্কৃতির প্রসার। উচ্চসংস্কৃতির ঐশ্বর্য-সীমান্ত থেকে সাক্ষরহীন সংস্কৃতির লোকায়ত মহিমায় মননকে সম্প্রসারিত না করলে জাতি বিশেষের বৈশিষ্ট্য ও তার সংস্কৃতির সম্যক্ পরিচয় লাভ করা সম্ভবপর হয় না। জীবাশ্ম-বিদেরা যেমন জীবজন্তু ও তরুলতার ফসিল থেকে

প্রাণীজগতের ক্রমবিকাশের ইতিহাস গড়ে তোলেন, সংস্কৃতি-বিজ্ঞানীগণও তেমনি লোকসংস্কৃতির উপকরণ অবলম্বনে সংস্কৃতি-বিকাশের ধারা ও রূপান্তরের ইতিহাস বিশ্লেষণ করেন এবং নৃতাত্ত্বিক সমাজতাত্ত্বিক অন্বেষা পরিতৃপ্ত করেন। নৃতত্ত্ববিদ্ এবং সমাজ ও সংস্কৃতি -বিজ্ঞানীর কাছে উচ্চসংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতি উভয়ই তুল্যমূল্য এবং লোকসংস্কৃতি ও উচ্চসংস্কৃতির বিচার-বিশ্লেষণ পরস্পর সাপেক্ষ।[৫] সামগ্রিক বিচারে বলা যায় উদ্ভব উৎস, রূপাঙ্গিক ও উদ্দেশ্যানুষঙ্গে বহুবিধ বিভিন্নতা থাকলেও লোকসংস্কৃতি ও উচ্চসংস্কৃতি সর্বতোরূপে পরস্পরবিরোধী বা বিচ্ছিন্ন নয়, বরং বহুলাংশে পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক।

সমাজ ও সংস্কৃতি বিকাশের উৎসে লোকসংস্কৃতির উদ্ভব ইতিহাস সুপ্রাচীন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক সুনির্দিষ্টতায় তার অনুশীলন মনন-চর্চার ইতিহাসে সাম্প্রতিক কালের ঘটনা এবং 'ফোকলোর' শব্দটির উদ্ভব-ইতিহাস দেড়শত বৎসরেরও কম। প্রকৃতপক্ষে পুরাতত্ত্ব-বিষয়ক অনুসন্ধিৎসার মৌল উৎসে লোকসংস্কৃতি-চর্চার সূত্রপাত। ইতিহাস-সন্ধানী সমাজবিজ্ঞানী ও প্রত্নতাত্ত্বিকের যত্নে ইতিহাসের সীমা যেমন ক্রমপ্রসারিত হয়েছে সুদূর অতীতে, তেমন সমাজ-অগ্রগতির পুরোভাগে দাঁড়িয়েও মননশীল মানুষ সংস্কৃতি অনুশীলনে হয়েছে প্রাচীন-অনিসন্ধিৎসু। প্রাচীন সংস্কৃতি অনুসন্ধিৎসার প্রেরণায় যে শাস্ত্রের উদ্ভব তা প্রথমে 'পপুলার অ্যান্টিকুইটি' বা লোকায়ত পুরাতনী নামে ঘোষিত হয় এবং পরবর্তীকালে 'ফোকলোর' শব্দ দ্বারা সুচিহ্নিত হয়। লৌকিক ঐতিহ্য বা লোকায়ত প্রাচীনতার পরিবর্তে 'ফোকলোর' বা লোকসংস্কৃতি শব্দটি সর্বপ্রথম এথেনিয়ম'এ প্রকাশিত একটি পত্রে উইলিয়ম টমাস, এম্ব্রসমেরটন ছদ্মনামে ব্যবহার করেন।[৬] 'ফোকলোর' অভিধা ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে চয়ন হলেও এটি সম্ভবত ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রচলিত 'ভলকসকুণ্ড' (Volks Kunde) জর্মান শব্দের অনুবাদ। মোটের উপর ফোকলোর শব্দটি উদ্ভবের পর থেকে অল্লাধিক রূপ বদল করে পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশেই বুৎপত্তিগত অর্থে গৃহীত হয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে সংস্কৃতি-চর্চার ইতিহাসে লোকসংস্কৃতির বিষয়গত শৃঙ্খলা কমবেশি বিন্যস্ত হয়েছে। ফোকলোর শব্দটি বর্তমানে শিক্ষাগত শৃঙ্খলায় যুগপৎ লোকসংস্কৃতির উপাদান-উপকরণ এবং ঐসমস্ত উপাদান-উপকরণসমূহ অনুশীলনের পদ্ধতিকে নির্দেশ করে।[৭] সাধারণভাবে সুইডিশ সংস্কৃতিবিদ্ লিনিয়স-ই (১৭০৭-১৭৭৮) প্রথম সমাজ-বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিতে লোকসংস্কৃতি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার সূত্রপাত করলেও জর্মানির গ্রীম-ভ্রাতাদের প্রথম লোককথা সংকলনের প্রকাশলগ্ন[৮] থেকেই প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতিচর্চার ইতিহাসে লোকসংস্কৃতির বিজ্ঞানসম্মত অধ্যয়ন অনুশীলন কার্যকর রূপ পরিগ্রহ করে এবং ক্রমান্বয়ে তা মানবজাতিতত্ত্ব-আদিমধর্ম-নৃতত্ত্ব-সমাজতত্ত্ব-পুরাতত্ত্ব-ভাষাতত্ত্ব-মনস্তত্ত্ব-ইতিহাস-সাহিত্য-শিল্প প্রভৃতি গবেষণায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। নৃতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞানের

---

৫ ". . . . the data of folklore can be used to test theories or hypothesis about culture as a whole; and conversely, the accepted theories of culture which have been developed can contribute to the understanding of folklore."
William R. Bascom— Folklore and Anthropology, Journal of American Folklore. Vol. 66, 1953, Page 287.

৬ The Athenaeum, No. 982, August 22, 1846, Page 862-863.

৭ "Folklore— The spiritual tradition of the folk, particularly oral tradition, as well as the science which studies this tradition."
International Dictionary of Regional European Ethnology And Folklore, Vol. I. 1960, Page 135.

৮ Grimm's Household Tales—Berlin, 1813.

পরিপ্রেক্ষিতে লোকসংস্কৃতির তাৎপর্য অনুধাবন-অনুশীলন ক্রমশ প্রাধান্য লাভ করলেও রোমান্টিক আন্দোলন থেকেই লোকসংস্কৃতি পর্যালোচনার প্রাথমিক সূত্রপাত, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

পরবর্তীকালে লোকসংস্কৃতি-চর্চায় যে-সমস্ত মতবাদ প্রাধান্য লাভ করে ভাষাতাত্ত্বিক মতবাদ তার মধ্যে অন্যতম। বপ্, শ্লাইকর প্রভৃতির নেতৃত্বে তুলনামূলক ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্বের রীতি ক্রম-ব্যাপকতা লাভ করে। লোকসংস্কৃতি অনুধাবনে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বরীতির প্রয়োগে জর্মান ভ্রাতৃদ্বয় ইয়াকব গ্রীম ও ভিলহেলম-এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ম্যাক্সমূলর বিশেষত পুরাকথায় ভাষার বিকৃতি ও শব্দতত্ত্বের প্রকৃতি অনুধাবনের তত্ত্ব প্রচার করেন। ল্যাঙ এই মতের তীব্র সমালোচনা করেন। পরবর্তী অধ্যায়ে লোকসংস্কৃতির উপাদান সমূহের মধ্যে প্রধানত অতীত যুগের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুধাবনের পুরাণতত্ত্ব সবিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। জর্মান পণ্ডিত গ্রীম ছিলেন এই মতের প্রবক্তা এবং গ্রীমের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কুন, মানহারদা, ফরাসী পণ্ডিত পিকং, রুশ পণ্ডিত এফ. আই. বুসলয়েভ, এ. এন. আফনামিয়ভ প্রভৃতি প্রধান। সূর্যকে কেন্দ্র করেই আদিম ধর্মবিশ্বাসের উদ্ভব ম্যাক্সমূলরের এই সৌরতত্ত্ব দ্বারা পুরাণতত্ত্ব মূলত প্রভাবিত ছিল। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সৌরতত্ত্ব বা পৌরাণিক অনুশীলন -পদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। অতীত যুগের ধর্ম নয়, অতীত যুগের ইতিহাসের ভিত্তিতেই পুরাকথার উদ্ভব— এই মতবাদ ক্রমপ্রাধান্য লাভ করে। এই মতগোষ্ঠীর প্রধানদের মধ্যে অন্যতম বেনিয়র ও লেমপ্রিরে পুরাকথাকে অতীতের ঐতিহাসিক তথ্য সংগোপনকারী অদ্ভুত কল্পনা বলে ব্যাখ্যা করেন।

ইতিমধ্যে জর্মান ভারততত্ত্ববিদ্ থিওডোর বেন্‌ফে লাইপজিগ থেকে পঞ্চতন্ত্রের জর্মান অনুবাদ প্রকাশ করেন (১৮৫৯) এবং পাশ্চাত্য মহাদেশের বিভিন্ন অংশে লোকসমাজে প্রচলিত লোককথার সঙ্গে পঞ্চতন্ত্রের কাহিনীগত সাদৃশ্য বিশ্লেষণ করে ভারতবর্ষকে পুরাকাহিনী ও রূপকথার উৎসভূমি বলে দাবি করেন। তাঁর প্রবর্তিত মত ভারতীয় উৎসতত্ত্ব বা 'ইণ্ডিয়ানিস্ট থিয়োরী' রূপে পরিচিতি লাভ করে এবং এই তত্ত্বের অনুসরণে পৃথিবীময় কাহিনী-পরিভ্রমণ কথা, এক জনগোষ্ঠী থেকে অপর জনগোষ্ঠীর ঋণ গ্রহণের তত্ত্ব 'ওয়ানগুারিং অব্ টেলস অথবা বরোয়িং অব্ টেলস' আত্মপ্রকাশ লাভ করে। থিওডোর বেন্‌ফের সঙ্গে এই মতগোষ্ঠীর অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন গ্যসটন পরিস, এমানুয়েল কসকিন, গীডিয়ন হুয়েস্ট প্রভৃতি। উনিশ শতকের সপ্তম ও অষ্টম দশক থেকেই পরিভ্রমণতত্ত্ব সমালোচিত হতে আরম্ভ করে এবং ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের জোসেফ বিডইর বেন্‌ফির ভারতীয় তত্ত্বের উপর তীব্র আঘাত হানেন। এর প্রতিক্রিয়ায় কোনো একটি মাত্র স্থান নয়, স্থানবিশেষের ভৌগোলিক পরিবেশ ও ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের বিভিন্নতায় লোকসংস্কৃতির ভিন্নমুখী বিচিত্র বিকাশের তত্ত্ব ঐতিহাসিক ভৌগোলিক মতবাদে 'হিস্টরিকাল জিওগ্রাফিকাল-মেথড' সুনির্দিষ্টতা লাভ করে। ফিনিশ বিজ্ঞান অ্যাকাডেমী ও সাহিত্য অ্যাকাডেমীর সম্পাদক ক্রোহনকর্ল (১৮৬৩-১৯৩৩) এই ঐতিহাসিক ভৌগোলিক মতবাদ প্রচার করেন। এই মতানুসারে সমগ্র পৃথিবীময় ব্যাপ্ত লোককথাসমূহের মৌল উৎস কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্যে বিধৃত এবং ঐগুলির মধ্যে সতত বহুবিধ সাদৃশ্য বিদ্যমান। প্রসঙ্গত স্মরণীয় এই মতবাদই শেষপর্যন্ত তুলনামূলক সাদৃশ্য অনুশীলনের ভিত্তিতে লোকসাহিত্য-বিশ্লেষণে মোটিফ ও টাইপের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠ করেছে, যার সুনির্দিষ্ট রূপ 'টাইপ ও মটিফ ইনডেক্‌সে' সংলক্ষ্য। লোকসংস্কৃতি অনুশীলনে সাধারণভাবে সাদৃশ্যসূচক মটিফ বা টাইপের তালিকা

অর্ণিট আন (১৯১০) কর্তৃক প্রথম সুসংবদ্ধ হয় এবং পরবর্তী অধ্যায়ে (১৯৩২-৩৬) স্টিথ টমসন কর্তৃক পরিবর্ধিত রূপ পরিগ্রহ করে।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ১লা ডিসেম্বর এক স্মরণীয় সভায় ডবলু. জে. টমাস, এডওয়ার্ড সলি, ডবলু. আর. এস. বসটন, এবং স্যার লরেন্স গোম সমবেত হয়ে 'ফোকলোর সোসাইটি' গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পর বৎসর ডবলু. জে. টমাসের সভাপতিত্বে পরিষদের প্রথম আনুষ্ঠানিক সভা অনুষ্ঠিত হয় (১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ ৩০শে জানুয়ারী) এবং টমাসকে পরিচালক ও লরেন্স গোমকে সম্পাদক নির্বাচিত করে লোকসংস্কৃতি পরিষদের কাজ শুরু হয়। এর পর ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনে ও ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় লোকসংস্কৃতি পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮৮৯-১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনটি আন্তর্জাতিক লোকসংস্কৃতি কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। বিভিন্ন স্থানে লোকসংস্কৃতি পরিষদ স্থাপন, লোকসংস্কৃতি বিষয়ক পত্র-পত্রিকা প্রকাশ ও আন্তর্জাতিক লোকসংস্কৃতি অধিবেশন সংগঠনের ফলে লোকসংস্কৃতি-চর্চা ক্রমসম্প্রসারতা লাভ করে এবং বিষয় হিসাবে লোকসংস্কৃতির শিক্ষাগত শৃঙ্খলা গড়ে ওঠে।

লোকসংস্কৃতি অধ্যয়নের বৈজ্ঞানিক পরিপ্রেক্ষিতটি ক্রমসম্প্রসারতা লাভ করলেও, প্রাথমিক স্তরে ইউরোপ-এশিয়া-উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় জাতীয় চেতনা বিকাশের উৎসেই লোকসংস্কৃতি-বিষয়ক উৎসাহ সম্প্রসারিত হয়। সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকে রোমান্টিসিজমের সর্বব্যাপক প্রভাবে অতীত-অভিসারী ঐতিহ্যপ্রিয়তা এবং জাতীয়তাবোধের উগ্রতায় লোকসংস্কৃতি-চর্চা ব্যাপকতা লাভ করে। ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে উদীয়মান ধনতন্ত্রের যুগে লোকসংস্কৃতি-চর্চার পশ্চাতে বৈজ্ঞানিক বিচারবোধ যতটা না ছিল তদপেক্ষা অধিক ছিল জাতীয়তাবাদের রোমান্টিক আকর্ষণ। তা ছাড়া সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পুঁজিপতিশ্রেণী জনসাধারণকে নিজেদের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করার মানসে জাতীয়চেতনা, জাতীয় লোকমানস ইত্যাদি ধারণা প্রচার করেন এবং এই সূত্রে জাতীয়মানসের ঐশ্বর্য ও মূল অনুসন্ধানে লোকসংস্কৃতি-চর্চা গতিময় হয়ে ওঠে। হার্ডার, কিয়েরেওস্কি প্রভৃতি প্রবর্তিত প্রতি জাতির স্বতন্ত্র রহস্যময় জাতীয়-সত্তার অস্তিত্ব-তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত সেই যুগে প্রধানত জাতিবিশেষের রহস্যময় ও গৌরবোজ্জ্বল অতীত আবিষ্কারের জন্যই পুরাতত্ত্বের অনুগামীরূপে লোকসংস্কৃতি-চর্চা ব্যাপকতা লাভ করে। এইভাবে জাতীয়তা-বোধ সম্প্রসারণের সূত্রে আঞ্চলিক জাতিতত্ত্বের আলোচনা সর্বাধিক প্রাধান্য লাভ করেছে এবং তা লোক-সংস্কৃতি গবেষণার ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে।[১] জাতীয়তাবোধ সম্প্রসারণের প্রয়োজনে লোকসংস্কৃতি-চর্চার মধ্যে সংকীর্ণতা থাকলেও এই প্রক্রিয়ায় পক্ষান্তরে দেশে দেশে প্রচুর লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগৃহীত হয়েছে, যার মূল্য লোকসংস্কৃতি-বিজ্ঞানীর কাছে কম নয়।

লোকসংস্কৃতি-চর্চায় রোমান্টিক আবেগসর্বস্ব জাতীয়তাবাদীতত্ত্বের পাশাপাশি ক্রমশ বিজ্ঞাননিষ্ঠ নৃতাত্ত্বিক মতবাদ প্রাধান্য লাভ করে। বৃটিশ নৃতত্ত্ববিদ্ ই. বি. টেইলর, অ্যাণ্ড্ল্যাঙ, সার্ জর্জ লরেন্স গোম, জে. এ ম্যাককলচ, প্রভৃতির নেতৃত্বে লোকসংস্কৃতি-অনুশীলনে নৃতাত্ত্বিক ধারা প্রাধান্য লাভ করে এবং জে. জি. ফ্রেজারের 'গোল্ডেন বাউ'তে ঐ ধারা তথ্যনির্ভর সুপরিণতি লাভ করে। রুশ প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ ওল্ডেন বুর্গ প্রভৃতির নেতৃত্বে নৃতাত্ত্বিক ধারার অনুরূপ তত্ত্বটি ঐতিহাসিক ধারা রূপে প্রচলিত ছিল। নৃতত্ত্ববিদ্ ম্যালেনবস্কি প্রবর্তিত আনুষ্ঠানিক মতবাদ এবং টেইলর-ল্যাঙ-গোম অনুশীলিত নৃতাত্ত্বিক ধারা

১ Octavian Buhocin—Current Anthropology, U.S.A. June 1966, Vol. 7, No. 3, Page 295.

রোমাণ্টিক অতীতমুখীনতার পৌরাণিক শ্রেষ্ঠত্বের মূলে আঘাত করে এবং পৃথিবীর আদিবাসীদের মধ্য থেকে সংগৃহীত তথ্য ও উপকরণের সাদৃশ্য বিশ্লেষণে আদিমকালে মানুষের সমাজ ও সভ্যতার সর্বত্র একই পথে বিকাশের তত্ত্ব প্রচার করে। সর্বত্র অনুরূপ ভাবে সংস্কৃতিবিকাশের তত্ত্ব পরবর্তীকালে সমাজ-বিজ্ঞানীগণ কর্তৃক অস্বীকৃত হলেও, মানুষের আদিম অবস্থার বহুবিধ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন যে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানে সংরক্ষিত হয়, এ বিশ্বাস অধুনা প্রায় সর্বজনস্বীকৃত এবং ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি পরম্পরাশ্রয়ী স্বরূপ লোকসংস্কৃতি-বিশেষজ্ঞদের গবেষণায় সুবিস্তৃত।[১০]

লোকসংস্কৃতি অনুধাবনে নৃতাত্ত্বিক ধারা পরিপুষ্টির সঙ্গে-সঙ্গে উনিশ শতকের শেষ দিকে অনেক গবেষক লোকসংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশের পশ্চাৎপট রূপে আদিম লোকমানসের অন্তর্লীন মানসিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে সচেষ্ট হন এবং এই ভাবে লোকসংস্কৃতি-চর্চায় মনস্তাত্ত্বিক মতগোষ্ঠী সৃষ্ট হয়। আরনেস্ট জোনস -এর ভাষায় লোকসংস্কৃতির উপকরণ সমূহের মধ্যে লোকমানসের বহির্মুখীন বা অন্তর্মুখীন প্রয়োজন ও প্রতীতির প্রতিফলন ঘটে।[১১] মনস্তাত্ত্বিক মতগোষ্ঠীর মধ্যে প্রখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ ভিলহেলম ভুনদ এবং ফ্রয়েড-এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। লোকসংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশে ভুনদ স্বপ্নাবিষ্ট ব্যাধিগ্রস্ত মনের কল্পনাপ্রবণতা এবং ফ্রয়েড মূলত আদিম মানুষের যৌনভাবনায় আবর্তিত উইশ-ফুলফিলমেণ্ট বা ইচ্ছাপূরণের কামনার প্রতিফলন প্রত্যক্ষ করেছেন। মনস্তাত্ত্বিক মতগোষ্ঠীর বিশেষজ্ঞগণ লোকসংস্কৃতিতে বিন্যস্ত বিভিন্ন মোটিফকে দেহগত, বিশেষত যৌনাচারের রূপক-রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। নৃতাত্ত্বিক মতগোষ্ঠীর অধিকাংশই মনস্তাত্ত্বিক গোষ্ঠীর মতবাদ সমালোচনা করেন ও পরিত্যাগ করেন এবং নৃতাত্ত্বিক ধারার অন্যতম মনীষী ফ্রেজার আদিম মানুষের কামনা-কল্পনা, চিন্তা-কর্ম জীবনপ্রয়াসের বৃত্তে জাদুবিশ্বাস ও জীবনাভিমুখী কর্মানুষ্ঠানের প্রাধান্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শিল্পের জন্য শিল্পনীতির কলাকৈবল্যবাদের প্রভাবে লোকসংস্কৃতির শিক্ষাগত সমাজতাত্ত্বিক মূল্য ক্ষেত্রবিশেষে উপেক্ষিত হয় এবং নিজস্ব রস রুচি ও সৌন্দর্য -চেতনা অনুসারে লোকসংস্কৃতির উপাদান-সংগ্রহ ও বিচারবিশ্লেষণ-পদ্ধতি আত্মপ্রকাশ লাভ করে। কিন্তু বস্তুতান্ত্রিক ও নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষার বৈজ্ঞানিক প্রভাবে ঐ মতবাদের ব্যাপকতা ব্যাহত হয়। প্রায় সমসাময়িক কালে ভি. জি. বেলিনস্কি, এন. জি. য়েবনিসভস্কি ও এন. এ ডবরোলিউড প্রভৃতি রুশদেশীয় পণ্ডিতেরা শ্রমজীবী মানুষের সৃষ্টিশীল কর্মপ্রয়াস ও শ্রেণীসংগ্রামের উৎসে লোকসংস্কৃতি বিকাশের তত্ত্ব প্রচার করেন। পরবর্তী-কালে এই মতের সুনির্দিষ্ট রূপ প্রত্যক্ষ করা যায় শোকোলভের উক্তিতে। শিষ্টসাহিত্য ও লোকসাহিত্য -সংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনায় শোকোলভ স্পষ্টতই লোকসংস্কৃতিকে শ্রেণীসংগ্রামের দর্পণ ও অস্ত্র রূপে

---

১০ "Combined history and folklore can restore much of the picture of early times, and can work through the fulness of later times with some degree of success."
George Lawrence Gomme—Folklore As An Historical Science, London 1908. Chapter 1, Page 22.

১১ ". . . the material studied in folklore, whether it be customs, beliefs, or folksong, for without exception it is the product of dynamic mental processes, the response of the folksoul to either outer or inner needs, the expression of various longings, fears, aversions, or desires."
Earnest Jones—Psychoanalysis and Folklore, Papers and Transactions: Jubilee Congress of the Folklore Society, London, 1930.

চিহ্নিত করেছেন।[১২] মোটের উপর এই সময় সামগ্রিকভাবে লোকসংস্কৃতি-চর্চায় বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারতা লাভ করে এবং ক্রমান্বয়ে নৃতাত্ত্বিক মতবাদ স্বীয় প্রাধান্য বিস্তারে সক্ষম হয়।

অবশ্য উনিশ শতকের নৃতত্ত্ববিদগণ লোকসংস্কৃতি গবেষণা কর্মকে বস্তুনিষ্ঠার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করলেও, তাকে আদিম যুগ ও সংস্কৃতি বিচারেই প্রধানত সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন এবং অতীত-অনুসন্ধিৎসু গবেষকগণ লোকসংস্কৃতিকে প্রাচীন নরগোষ্ঠীর মনস্তত্ত্ব ও জীবনপ্রয়াসের ধারক ও বাহক রূপেই মূলত গণ্য করেছিলেন। লোকসংস্কৃতির মধ্যে আদিমতার ধারা এবং অতীত-বিস্মৃতযুগের সংস্কৃতির অবশেষগুলি বজায় থাকলেও আধুনিক লোকবিজ্ঞানীগণ লোকসংস্কৃতি অধ্যয়নের কেবলমাত্র অ্যান্টিকোয়ারিয়ন বা প্রাচীনতার মূল্য আছে বলে মনে করেন না। লোকসংস্কৃতি-বিশেষজ্ঞগণ লোকসংস্কৃতিকে কেবলমাত্র অতীতের প্রতিধ্বনি হিসাবে না দেখে বর্তমানেরও কণ্ঠস্বর রূপে বিচার করেন, কারণ লোকসংস্কৃতির অয়নে রূপান্তরিত সমাজের মূল্যবোধ ও আকাঙ্ক্ষাগুলিও সমভাবে আত্মপ্রকাশ লাভ করে। জ্ঞানে ও আনন্দে সংস্কৃতিপ্রবাহের ধারাবাহিকতা অনুধাবন এবং লোকমানসের সদাচলমান স্বরূপ সন্ধান লোকসংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে যথার্থতা লাভ করতে পারে।[১৩] এ কথা সকলেই উপলব্ধি করেন যে লোকসংস্কৃতির উপকরণ সংগ্রহ এবং তা পর্যালোচনার প্রাথমিক প্রয়াসের পিছনে মূলত এই বিশ্বাসই নিহিত ছিল যে, অনগ্রসর সমাজের আধুনিক শিক্ষা -নিরপেক্ষ জনমানসের সামগ্রিক কৃতির মধ্যে প্রাচীনকালের চিন্তাভাবনা ও জীবনযাপন-পদ্ধতির অবশেষ অনুশীলন করা সম্ভব।[১৪] লোকসংস্কৃতির অয়নে অতীত অনুশীলনের আত্যন্তিক আবেগে শেষ পর্যন্ত অনেকে লোকসংস্কৃতিকে ফসিল-তুল্য বলে মনে করেছেন।[১৫] আধুনিককালে অবশ্য লোকসংস্কৃতিকে ফসিল বা দূর-অতীতের মৃত উপাদান রূপে গণ্য করা হয় না; পরিবর্তমান সমাজ-পরিবেশ ও জীবনযাপন -পদ্ধতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পারিপার্শ্বিক প্রভাব পরিপুষ্ট লোকসংস্কৃতিকে রূপান্তরসক্ষম সদাচলমান ঐতিহ্যাশ্রয়ী সংস্কৃতি রূপেই অভিহিত করা হয়। মূলত ঐতিহ্যাশ্রয়ী বলেই লোকসংস্কৃতির মধ্যে আদিমতম যুগ থেকে শুরু করে সমাজবিকাশের বিভিন্ন স্তরে সমসাময়িক মানুষের চেতনা ও জীবনাচারের পরিচয় পাঠ করা যায়। তাই অতীতকে বোঝার জন্য—প্রাক্ ইতিহাসের যুগের ও ঐতিহাসিক যুগের মানুষের ইতিহাস পাঠের জন্য লোকসংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আধুনিক লোকসংস্কৃতি-বিজ্ঞানীগণ এই অর্থেই বিষয়বস্তু ও বিষয়ানুশীলনের পদ্ধতিতে লোকসংস্কৃতিকে ঐতিহাসিক বিজ্ঞান রূপে ঘোষণা করে থাকেন।[১৬]

লোকসংস্কৃতির বিষয়ানুসারী শিক্ষাগত শৃঙ্খলা স্থাপনের পক্ষে সর্বাধিক অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছে নৃতত্ত্ব ও লোকসংস্কৃতির পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে। লোকসংস্কৃতির শ্রেণীবিন্যাসের পশ্চাতে উপকরণ বস্তু অনুসারে

---

১২ "Folklore has been, and continues to be, a reflection and a weapon of class conflict; consequently, again, it is not distinguished in nature, in any way, from artistic literature, with reference also to its social function as a reflection and a weapon of class conflict."
Y. M. Sokolov—Russian Folklore, New York, 1950, Page 15.

১৩ J. Russell Reaver and George W. Boswell—Fundamentals of Folkliterature, 1962, Chap. XXIV, Page 206.

১৪ Follore—London, 1963, Vol. 74, Page 508.

১৫ The Standard Dictionary of Folklore Mythology and legend, 1949, U.S.A. Vol. 1, Page 401.

১৬ Alexander Haggerty Krappe—The Science of Folklore. 1962, Introduction, Page XV.

কৃষ্টিমূলক নৃতত্ত্বের বিষয় বিন্যাসের প্রভাব সর্বজনস্বীকৃত বলা যায়।[১৭] কিন্তু লোকসংস্কৃতির বিষয়গত পরিধি সম্পর্কে লোকসংস্কৃতিবিদ্ ও নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে মতভেদ বর্তমান। সাধারণ ভাবে নৃতত্ত্ববিদগণ লোকসংস্কৃতিকে সমগ্রসংস্কৃতির একটি অংশরূপে পরিগণিত করেন এবং ফোকলোর বলতে মৌখিক ভাষাশ্রয়ী লোকসাহিত্যকে বোঝেন।[১৮] নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ লোকসংস্কৃতির মধ্যে লোকসমাজের সামগ্রিক অভিব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করা অসমীচীন এবং সংস্কৃতি বিশ্লেষণের পক্ষে অসুবিধাজনক বলে মনে করেন। নৃতত্ত্ববিদের অনুগামী রূপে সমাজবিজ্ঞানীগণও ফোকলোরকে সংস্কৃতির খণ্ডাংশরূপে বিবেচনা করেন।[১৯] মোটের উপর সমাজবিজ্ঞানী ও নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে অনেকেই লোকসংস্কৃতিকে সমগ্র সংস্কৃতির অংশবিশেষরূপে বিবেচনা করেন এবং ফোকলোর বলতে— মৌখিকভাষাশ্রয়ী লোককথা, সংগীত, গাথা, ধাঁধা, প্রবাদ প্রভৃতি অলিখিত সাহিত্যকে বোঝান। বিপরীতক্রমে অধিকাংশ লোকসংস্কৃতি-বিশেষজ্ঞগণ স্বীয় বিষয়-পরিধির মধ্যে লোকসাহিত্য-শিল্প-সংগীত-নৃত্য-নাট্য-আচারধর্ম ইত্যাদি সমস্ত কিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করেন এবং স্বতন্ত্র শৃঙ্খলায় লোকসংস্কৃতিশাস্ত্রের শিক্ষাগত রূপ নির্ধারণ করেন। লোকসংস্কৃতি ও নৃতত্ত্ববিদ্যার বিষয়-পরিধি সম্পর্কিত বিতর্ক বিদ্যমান থাকলেও উভয় শাস্ত্রের পারস্পরিক নির্ভরতা সম্পর্কে প্রায় সকলেই একমত। সর্বোপরি অধুনা কেবলমাত্র মৌখিক সাহিত্য -ধারার মধ্যে লোকসংস্কৃতিকে সীমাবদ্ধ রাখার পক্ষপাতী বিশেষজ্ঞগণও লোকসংস্কৃতি-অনুসন্ধিৎসাকে একান্ত মৌখিক সাহিত্যের বাইরে বিস্তৃত করেছেন এবং লোকসংস্কৃতিকে ব্যাপক অর্থে সমগ্র সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[২০] প্রসঙ্গত ফোকলোর শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থের মধ্যে যে বৃহৎ ব্যাপকতা আছে তা স্মর্তব্য। নৃতত্ত্ববিদ্ ও কোনো কোনো লোকবিজ্ঞানী 'লোর' শব্দটির অর্থকে সীমিত করে মৌখিক শিল্পের (ভারবাল আর্ট) মধ্যে সীমাবদ্ধ করলেও প্রকৃত তাৎপর্যে ফোকলোর বলতে ব্যাপক অর্থে সমগ্র লোকজ্ঞান তথা লোককৃতিকেই বোঝায়; কারণ 'লোর' শব্দের মৌলিক অর্থে এমন কোনো সীমাবদ্ধতা নেই যার দ্বারা কোনো বিষয় পরিত্যাগের অর্থ নির্দেশিত হয়।[২১] সামগ্রিক বিচারে বলা যায় লোকসংস্কৃতি হচ্ছে জনমানসের ঐতিহ্য, সামাজিক রীতিনীতি ও বিশ্বাসের স্বতোৎসারিত অভিব্যক্তি যা ক্ষেত্রবিশেষে — মৌখিক সাহিত্য শিল্প-সংগীত-নৃত্য-অভিনয়-আচার-আচরণ-ধর্মক্রিয়া-বিশ্বাসসংস্কার-তুকতাক-মন্ত্রতন্ত্র-পর্বপার্বণ-উৎসবঅনুষ্ঠান ইত্যাদিতে রূপলাভ করে।

অতীত-অভিসারী রোমন্টিক কল্পনা বা জাতীয় ভাববিলাসের বস্তু হিসাবে নয়, বাস্তব ব্যবহারিক মূল্যেই লোকসংস্কৃতির যথার্থ তাৎপর্য। নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ লোকসংস্কৃতিকে বাস্তব তাৎপর্য নিরপেক্ষ বস্তুরূপে কখনোই মনে

---

১৭ William Hugh Jansen—Classifying performance in the study of Folklore; Studies in Folklore—Ed: Edson Richmond, 1957, Page 111-112.

১৮ William R. Bascom—Folklore and Anthropology, Journal of American Folklore, Vol. 66, 1953, Page 285.

১৯ A Dictionary of the Social Science—Ed: Julius Gould & William L. Kolb, 1964, Page 273.

২০ Four Symposia on Folklore—Ed: Stith Thompson, 1953, Symposiam IV, Page 254-259.
Samuel P. Bayard—The materials of Folklore, Journal of American Folklore, Vol. 66, 1953, Page 9.

২১ ". . . . There is nothing in the basic meaning of lore which suggests that any object is excluded."
The Standard Dictionary of Folklore Mythology And Legend, 1949, Vol. 1, Page 399.

করেন না।[২২] এবং অনুরূপ ভাবে লোকসংস্কৃতি-বিজ্ঞানীও লোকসংস্কৃতির বিচিত্র অভিপ্রকাশে বাস্তব জীবন যাপন ও জীবনসংগ্রামের মিলিত কর্মরূপ ও শিল্পরূপ প্রত্যক্ষ করেন। প্রাকৃতিক ভৌগোলিক পরিবেশ, জনগোষ্ঠীর বিন্যাস, জীবনসংগ্রামের ধারা ও ভিন্ন -সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ে লোকসংস্কৃতির উদ্ভব। ইতিহাস-ভূগোলের সীমা, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক কার্যকারণ সম্পর্ক ও সংহত সমাজের সচল জীবন -প্রবাহের অখণ্ডতায় লোকসংস্কৃতির বিকাশ। সমাজ-বিকাশের ঐতিহাসিকতায় লোকসংস্কৃতির উৎপত্তি ও বিকাশে সমাজসত্যের সামগ্রিকতা অনুধাবনের প্রয়াস সার্থকতালাভ করেছে বলা যায়। বর্তমানে লোকসংস্কৃতির অয়নে কেবলমাত্র বিভিন্ন দেশের আদিম নরগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য অনুশীলন নয়, নৃতাত্ত্বিক-সমাজতাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিতে ও ঐতিহাসিক-অর্থনৈতিক পরিবেশের পটভূমিতে, লোকসাধারণের সামগ্রিক জীবনকৃতির রূপরেখাকে অনুধাবন করার অবকাশ ক্রমসম্প্রসারিত। এই সূত্রে সাম্প্রতিক কালে লোকসংস্কৃতিশাস্ত্র নৃতত্ত্ব-সমাজবিজ্ঞান-ইতিহাস-ভাষাতত্ত্ব-নন্দনতত্ত্ব ইত্যাদিকে অঙ্গীকার করে নিজেকে ব্যাপ্ত করেছে লোকসমাজের কর্ম-কামনা চিন্তা-কল্পনার সামগ্রিক প্রাণপ্রবাহে। প্রকৃতপক্ষে ইতিহাস সমাজতত্ত্ব নৃতত্ত্ব ভাষা ও সাহিত্য, শিল্প ও সংগীত, শিল্পতত্ত্ব, নন্দনতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন শিক্ষাগত বিষয়ের সঙ্গে লোকসংস্কৃতি পরস্পরাশ্রয়ী সম্পর্কে সংযুক্ত এবং এইজন্যই মিশ্রচরিত্রের ঐশ্বর্যসমৃদ্ধ লোকসংস্কৃতির স্বতন্ত্র শৃঙ্খলা স্থাপন অসুবিধাজনক।[২৩] লোকসংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জ্ঞানানুশীলনের বিভিন্ন বিষয়ের অন্তর্লীন সম্পর্কের আংশিক স্বরূপ নিম্নলিখিত চিত্রলেখার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়—
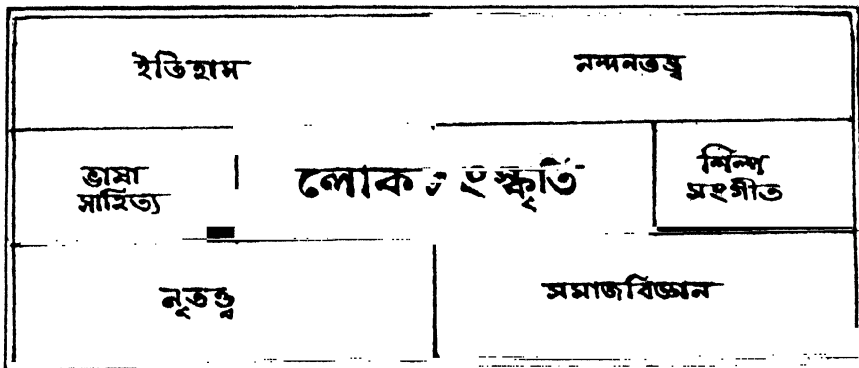
এই চিত্রলেখার মধ্যবর্তী চতুষ্কোণ-ক্ষেত্র লোকসংস্কৃতির এবং বিভিন্ন পার্শ্বের আয়তক্ষেত্রগুলি বিভিন্ন শিক্ষাগত বিভাগের প্রতিনিধি। চিত্রানুসরণে দেখা যায় প্রতিটি পার্শ্ববর্তী ক্ষেত্রই প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রীয় ক্ষেত্রের সঙ্গে সংযুক্ত। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ক্ষেত্র লোকসংস্কৃতি, জ্ঞানের এমন-একটি ক্ষেত্র যাকে বিভিন্ন দিক থেকে কোনো না কোনো রূপে স্পর্শ করেছে জ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ। মোটের উপর বলা যায় লোকসংস্কৃতি এমন-একটি শাস্ত্র যা বহুবিধ শিক্ষাগত শৃঙ্খলার সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কে অন্বিত। তাই বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন লোকসংস্কৃতি

২২ "Folklore is not without practical significance."
Mischa Tilier—Introduction to Cultural Anthropology, U.S.A., 1959, Chap. 17, Page 375.

২৩ International Dictionary of Regional European Ethnology And Folklore, Vol. 1, 1960, Page 140.

-চর্চার অগ্রগতির সঙ্গে লোকসংস্কৃতি-বিজ্ঞানীগণ স্বকীয় সীমান্তবর্তী বিষয়ের গবেষণা অনুশীলনে ভবিষ্যতে আরো অধিকতর রূপে নৃতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক, সমাজতত্ত্ববিদ, মনস্তত্ত্ববিদ প্রভৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ হবেন।[২৪] সংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে সুনির্দিষ্ট বিষয় হিসাবে লোকসংস্কৃতি প্রকৃতপক্ষে সুকুমার বিদ্যা ও সমাজবিজ্ঞান উভয় পরিধিকেই স্পর্শ করে।[২৫] যদিও জীবনের সমগ্র দিকের উপকরণ অন্তর্ভুক্ত করে লোকসংস্কৃতি — ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, শিল্পতত্ত্ব, ইত্যাদির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত এবং অনুশীলনের শিক্ষাগত শৃঙ্খলায় কমবেশী স্বাতন্ত্র্যে সুপ্রতিষ্ঠ, তথাপি বিষয়ানুধাবনের স্বকীয় পরিধি নির্ণয়ে লোকসংস্কৃতি শাস্ত্রের সঠিক অনুবন্ধন সৃষ্টি আজও অনায়ত্ত—

> "Folklore is a universal topic, its substance iucludes material from all areas of life ; but the particular study of this material as a distinct topic and the methods of this study distinguish folklore from other disciplines, though there is, of course, some overlapping and disagreement among scholars as to the exact provinces of their studies".[২৬]

বিষয়গত-শৃঙ্খলা-অতিরিক্ত লোকসংস্কৃতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত প্রশ্নটিই সম্ভবত আধুনিক লোকসংস্কৃতি-বিজ্ঞানীদের সর্বাধিক আলোড়িত করেছে। সমাজ-অগ্রগতির ইতিহাস ও সংস্কৃতির রূপ বিবর্তনের ধারা অনুসরণে সাধারণত মনে হয় শিল্পসভ্যতা ও উচ্চসংস্কৃতির প্রতিক্রিয়ায় পরিবর্তমান বিশ্বে অদূর ভবিষ্যতে লোকসংস্কৃতির অবলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী। লোকসংস্কৃতির যে প্রবল ধারাটি পল্লীর কৃষিভিত্তিক সংহত সমাজ জীবনকে আশ্রয় করে বিকশিত হয়েছিল পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, সংহত পল্লীজীবনের ভাঙনে ও নাগরিক জীবনের উৎকেন্দ্রিকতার আঘাতে, স্বভাবতই তা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। সমাজবিজ্ঞানীগণ বহুমুখী পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজ ও সংস্কৃতি বিবর্তনের তত্ত্বে বিশ্বাসী। সমাজবিজ্ঞানের আলোয় সমাজ-অগ্রগতি ও সমগ্র-সংস্কৃতি বিকাশের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণে আমরা লোকসংস্কৃতির ভবিষ্যতের স্বরূপ পর্যালোচনা করতে পারি। সমাজ অগ্রগতির ধারায় শিল্পোন্নয়ন ও নাগরিক যন্ত্রসভ্যতার সম্প্রসারণে লোকসংস্কৃতি বিকাশের উর্বরা ক্ষেত্র কৃষিভিত্তিক সংহত গ্রামসমাজে দ্রুত পরিবর্তন সংগঠিত হয় এবং নূতন শ্রেণীবিন্যাস ও যুগপারিপার্শ্বিকের প্রতিক্রিয়ায়, ঐতিহ্যানুযায়ী আপন ধারায় লোকসংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে দেখা দেয় প্রতিবন্ধকতা। সমাজের এই অগ্রবর্তী স্তরে সামগ্রিক ভাবে লোকসংস্কৃতির আত্মসম্প্রসারণের ক্ষেত্রে উদ্ভূত হয় ক্রমহ্রাসমান

---

২৪ "In this border field the scholar on successive days may be working with anthropologist, historian, sociologist, and psychologist."
Stith Thompson—Story-Writers and Story-Tellers ; A Folklore Reader—Ed: Kenneth and Mary Clarke, U.S.A., 1965, Page 47.

২৫ "The dual affiliations of folklore with the humanities on the one hand and with social science on the other are well recognised."
William R. Bascom—Folklore and Anthropology, Journal of American Folklore, Vol. 66, 1953, Page 283.
Alan Dundes—The study of Folklore, U.S.A. 1965, Preface V.

২৬ Kenneth W. Clarke and Mary W. Clarke—Introducing Folklore, U.S.A., 1963, Chap. I, Page 3.

প্রতিক্রিয়া। সমগ্রসংস্কৃতির (আদিমসংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতি ও উচ্চসংস্কৃতি) বিবর্তনে লোকসংস্কৃতির অবস্থান এবং তার ক্রমপরিণতির রূপরেখা নিম্নলিখিত ছকের সাহায্যে উপস্থিত করা যায়—

॥ সমাজস্তর ॥	॥ সংস্কৃতির বিভিন্ন রূপ ও প্রকৃতি ॥
(ক) অবিভক্ত আদিম সমাজ	সমষ্টিগত জীবনপ্রয়াস সম্ভূত অবিভক্ত আদিম সংস্কৃতি
(খ) অগ্রবর্তী সমাজের প্রাথমিক পর্যায়	সমাজবিন্যাস অনুযায়ী সংস্কৃতির স্তরভেদ বিভক্ত সংস্কৃতির দ্বৈতরূপ – উচ্চসংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতি : চরিত্রগত পার্থক্য সত্ত্বেও পরস্পর সম্পর্করহিত নয়
(গ) অগ্রবর্তী সমাজের উচ্চ পর্যায়	উচ্চ ও লোকসংস্কৃতির পারস্পরিক পার্থক্য প্রকট। উচ্চসংস্কৃতির ক্রমবর্ধমান এবং লোকসংস্কৃতির ক্রম-হ্রাসমান প্রভাব

সমাজবিকাশের বিভিন্নপর্যায় নির্দেশিত ছকের প্রথম স্তম্ভে ক খ গ স্তরে এবং তদানুষঙ্গে সংস্কৃতি-বিকাশের বিভিন্নতার স্বরূপ দ্বিতীয় স্তম্ভে প্রকাশ করা হয়েছে। এই সূত্রে সমাজবিকাশ ও সংস্কৃতির পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া -জনিত উত্থান-পতনের ধারা অপর একটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে পরিস্ফুট করা যায়। সমাজ-অগ্রগতি ও সংস্কৃতি বিকাশের ধারা যেহেতু দেশ কাল বিধৃত যুগ-পরিবেশ অনুসারে বিভিন্ন রূপে অভিব্যক্তি লাভ করে, তাই গাণিতিক সুনির্দিষ্টতায় সমাজবিকাশ বা সংস্কৃতির উত্থান-পতনের পরিসংখ্যাগত পরিমাপ সম্ভবপর নয়। প্রাসঙ্গিক সীমাবদ্ধতার কথা স্মরণে রেখে ফলিত সমাজবিজ্ঞানের শৃঙ্খলানুসারে সমাজ ও সংস্কৃতি বিকাশের পরস্পর সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়ায় লোকসংস্কৃতির স্বরূপ ও বিবর্তনের ধারা সাধারণ ভাবে পরপৃষ্ঠায় মুদ্রিত রেখাচিত্রে নির্দেশিত হল।

আলোচ্য রেখাচিত্রে সমান্তরাল অক্ষে (হরাইজনটাল অ্যাক্সিস) সমাজবিবর্তনের বিভিন্নস্তর এবং লম্বমান অক্ষে (ভার্টিকাল অ্যাক্সিস) সংস্কৃতির গতিপ্রকৃতি দেখানো হয়েছে। ১নং রেখার গতি আদিম সমাজের অবিভক্ত একক সংস্কৃতির আদিম ধারা নির্দেশ করছে যা আদিম সমাজে (ক) সম্পূর্ণরূপে বিকশিত, কিন্তু

পরবর্তী অগ্রবর্তী সমাজে (খ) আত্মসম্প্রসারণে অক্ষম। ২নং ও ৩নং রেখা যথাক্রমে অগ্রবর্তী সমাজের সংস্কৃতির দ্বিবিধরূপ লোকসংস্কৃতি ও উচ্চসংস্কৃতির প্রতিনিধি। ২নং ও ৩নং রেখার গতি খ এবং গ স্তরে ভিন্ন প্রকৃতির। অগ্রবর্তী সমাজের প্রাথমিক পর্যায়ে (খ) উভয় রেখার পরস্পরাশ্রয়ী গতি, সমাজবিকাশের বিশিষ্ট
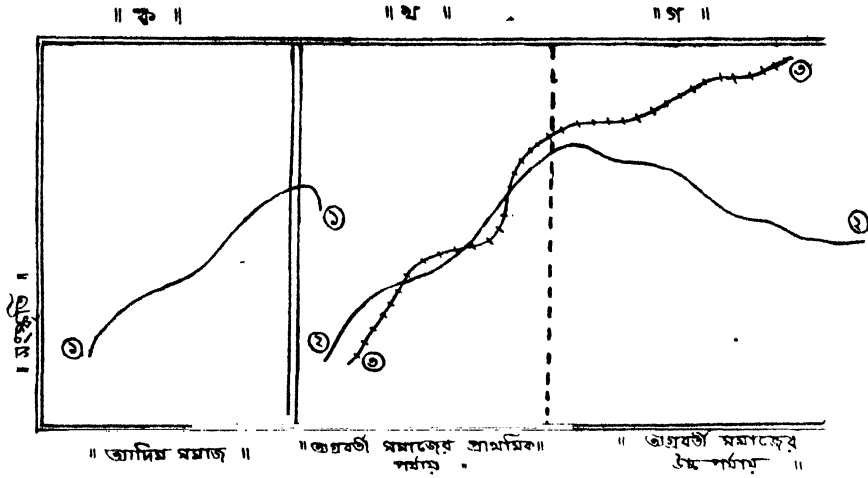
স্তর পর্যন্ত মৌলিক পার্থক্য সত্ত্বেও লোকসংস্কৃতি ও উচ্চসংস্কৃতির সর্বতোবিরোধহীন পারস্পরিক সম্পর্কের নির্দেশক। ২নং ও ৩নং রেখা পরবর্তী অগ্রবর্তী সমাজের উচ্চপর্যায়ে (গ) পরস্পরবিচ্ছিন্ন এবং ভিন্নমুখী গতিসম্পন্ন। এই পর্যায়ে ৩নং রেখা ক্রমবর্ধমান উচ্চসংস্কৃতির এবং ২নং রেখা লোকসংস্কৃতির ক্রমহ্রাসমান প্রতিক্রিয়ার প্রতীক।

সমগ্র সংস্কৃতির বিবর্তনে সমাজ-অগ্রগতির ধারায় লোকসংস্কৃতির অবস্থান ও তার ক্রমহ্রাসমান প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ সন্দর্শনে স্বভাবতই মনে হয় শিল্পযুগের আক্রমণে কৃষিসমাজের সংহত পল্লীজীবনে ভাঙনের পটভূমিকায় লোকসংস্কৃতির বিকাশ ব্যাহত হবে এবং আধুনিক নাগরিক সংস্কৃতির সর্বগ্রাসী প্রভাবে লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে দেখা দেবে সম্পূর্ণ বিনষ্টির সম্ভাবনা। তথাপি সমাজবিকাশের স্বরূপ বিশ্লেষণে মনে হয় অগ্রবর্তী সমাজের বাতাবরণেও কোনো এক পর্যায়ে লোকজাগরণের পটভূমিকায় উন্নতকালের সত্যে ও ভঙ্গিতে লোকসংস্কৃতি বেগবান হয়ে উঠবে। শিল্পপ্রসার ও নগরসভ্যতার যান্ত্রিকতার প্রভাবে জীবনে জটিলতা বৃদ্ধি পায়, আত্মকেন্দ্রিকতার অতিরেকে সমষ্টিগত চেতনা নেপথ্যচারী হয়, প্রচলিত ঐতিহ্য-আশ্রয়ী জীবনযাত্রা ও ধ্যানধারণায় ভাঙন ধরে এবং নাগরিক জীবনযাপন ও গ্রামীণ জীবনযাপন পদ্ধতির দ্বন্দ্বে লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে দেখা দেয় বিরূপ প্রতিক্রিয়া। আত্মকেন্দ্রিক শিল্প ও নগরসভ্যতার পরিবর্তিত পরিবেশ নিঃসন্দেহে লোকসংস্কৃতি বিকাশের পক্ষে ক্ষতিকর প্রভাব ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তাই বলে আধুনিক অগ্রবর্তী সমাজে লোকসংস্কৃতি বিকাশের আর কোনোরূপ সম্ভাবনা নেই এ কথা মনে করার কোনো যুক্তি-সঙ্গত কারণ নেই। গ্রামজীবনের কৃষিভিত্তিক সংহতি শিল্পসভ্যতা ও আধুনিক নাগরিকতার আঘাতে বিপন্ন হলেও, নগরকেন্দ্রিক সমাজেও উৎপাদনরীতি ও জীবনপ্রয়াসের সূত্রে সংহতি নূতন রূপরেখায় গড়ে ওঠে

এবং কোনো-না-কোনো পর্যায়ে লোকসংস্কৃতিবিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্ট হয়। এইজন্যই লোকসংস্কৃতিবিদ অধ্যাপক জর্জ হেরজগ আন্তর্জাতিক লোকসংস্কৃতি সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন যে সচরাচর লোকসংস্কৃতিকে গ্রামজীবন থেকে উদ্ভূত বস্তুরূপে কল্পনা করার যে প্রবণতা দেখা যায় তা সঠিক নয়; অগ্রবর্তী নগরকেন্দ্র থেকেও লোকসংস্কৃতির বিকাশ সম্ভব।[২৭] নিজস্ব প্রাণশক্তির প্রভাবে চলমান জীবন থেকে নূতন উপকরণ সংগ্রহ করে লোকসংস্কৃতি সহজেই অতীত থেকে বর্তমানে এবং বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে অগ্রসর হয়ে যায়। সামাজিক পরিবেশ লোকসংস্কৃতি-বিকাশের ক্ষেত্রে কখনো সাহায্য করে কখনো বাধা দেয়, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই লোকসংস্কৃতিকে বিনষ্টির অতলে সমাধিস্থ করতে পারে না। সমাজবিকাশের প্রতি স্তরে উচ্চশ্রেণীর জীবনধারা ও লৌকিক ভাবধারা দ্বন্দ্ব-সমন্বয় ও গ্রহণ-বর্জনের পথে যুগপৎ সক্রিয় থাকে। সামাজিক অগ্রগতির প্রভাবে সমাজজীবনে নানাবিধ পরিবর্তন সাধিত হলেও প্রথাসিদ্ধ জীবনচর্যা একেবারে তিরোহিত হয় না,[২৮] বরং পরিবেশানুসারে লৌকিক অভিব্যক্তি সাহিত্য-সংস্কৃতিতে নূতন রূপ পরিগ্রহ করে। নমনীয়তার দুর্লভ গুণে লোকসংস্কৃতি ঐতিহ্য-আশ্রয়ী স্বকীয় চরিত্রবৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে রূপান্তরের ধারায় যুগ ও সমাজের দাবিকে সাঙ্গীকরণের মাধ্যমে নিজের অস্তিত্বকে সম্প্রসারিত করতে সক্ষম। আধুনিক বিশ্বের অগ্রবর্তী দুটি দেশ, শিল্পকেন্দ্রিক নগরসভ্যতার চূড়ান্ত বিকাশস্থল সোভিয়েট রাশিয়া ও আমেরিকার লোকসংস্কৃতির সাম্প্রতিক ইতিহাস তার প্রমাণ। আধুনিক লোকসংস্কৃতি-বিজ্ঞানীগণ তাই মনে করেন সর্বাধিক অগ্রবর্তী নাগরিক সমাজ সমেত সমাজের সকল স্তরেই লোকসংস্কৃতির উদ্ভব সম্ভব।[২৯] তাই সামগ্রিক বিচারে মনে হয় আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার স্বাধিকারপ্রমত্ততা ও ঐতিহ্যের প্রতি অনীহা লোকসংস্কৃতি-বিকাশের পথে অনিশ্চিত মুহূর্ত স্থাপনা করলেও, লোকসংস্কৃতি— যুগমানসের পর্যায় জটিল সোপানাবলী অতিক্রমে সক্ষম হবে এবং যুগভেদে জগৎ ও জীবন নিরীক্ষার মৌলিক দূরান্বয়তা সত্ত্বেও স্বীয় বিবর্তনধর্মী নমনীয়তায় ভিন্ন মনঃপ্রতিন্যাসকে নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করে ক্রমসম্প্রসারিত হবে চিরায়ত ভবিষ্যতে।

---

২৭ "There is always the tendency to feel that folklore is something that comes out of the country districts. But there is a good deal of folklore that is urban."
Prof. George Herzog—Chairman address: Symposium IV; Four Symposia On Folklore—Ed: Stith Thompson, 1953, Page 257.

২৮ Alexander Haggerty Krappe—The Science of Folklore, 1962, Page XVIII.

২৯ "Folklore occurs in all societies, even most highly urbanized."
The Encyclopaedia Americana, U.S.A. 1962, Vol. XI. Page 422e.

চিঠিপত্র নেপালচন্দ্র রায়কে লিখিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

ওঁ

প্রীতিনমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন

শচীন্দ্রবাবু আমাদের কাজে যোগ দিবেন— কিন্তু আরো লোকের ত দরকার আছে। ইংরেজি ও গণিত সম্বন্ধে শচীন্দ্রবাবুর প্রতি নির্ভর করা যায়— আমি লোকমুখে শুনিয়াছি শিক্ষকতা সম্বন্ধে তাঁহার খ্যাতি আছে।

একজন মুসলমান অভিভাবক ছাত্র দিতে চান। আমিও লইতে ইচ্ছা করি। ছেলেটির বয়স অল্পই, আমি লিখিয়াছিলাম তাহার জন্য চাকর ও স্বতন্ত্র ব্যবস্থার দরকার তাহার যে উত্তর পাইয়াছি তাহা পাঠাই। এ ছেলেটিকে যদি আপনারা লওয়া স্থির করেন তবে অভিভাবককে জানাইতে বিলম্ব করিবেন না— যদি সুবিধা বোধ না করেন তবে তাহাও লিখিবেন।

বিদ্যালয়ের একটি বাংলা বিজ্ঞাপন লিখিয়া রাখিয়াছি কিন্তু কালীমোহনের ত দেখা নাই। আমি ত আর বেশী দিন বসিয়া থাকিতে পারিব না।

মুসলমান বালকটির প্রস্তাব দ্বিপুকে জানাইবেন।

বসন্তবাবুকে পত্র লিখিয়াছেন কি ?

দিনু[র] সঙ্গে এখনো আমার দেখা হয় নাই কিন্তু রথী বলিতেছিল দিনু তাহাকে বলিয়াছে অন্তত দুই মাসের পূর্ব্বে কাজে যোগ দিবার অবস্থা তাহার হইবে না। এস্থলে কি করা কর্ত্তব্য স্থির করিবেন।

বুধবারের উপাসনা আপনি ও বৃহস্পতিবারের উপাসনা ক্ষিতিমোহন বাবু করিবেন এইরূপ আমি স্থির করিয়াছি— এইরূপ নিয়মে মন্দিরের কার্য্য অব্যাহত ভাবে চলিবে আশা করি।

এবারে নূতন ছেলের আমদানি বেশি হইবে বলিয়া আশা করিতেছি না। বোধ করি আয় ব্যয় সমানই থাকিবে।

ব্যবস্থা সম্বন্ধে দ্বিপু আপনার পরামর্শ ও সহায়তা প্রার্থনা করেন। এ সম্বন্ধে তাঁহাকে যথোচিত আনুকূল্য করিবেন।

আমার শরীর কাল রাত্রি বিশেষ ভাবে অসুস্থ হইয়াছে— উপবাসী ও দুর্ব্বল আছি— শীঘ্রই বোটে বাহির হইব। কালীমোহনকে বলিবেন বিলম্ব না করে। ইতি— ৯ই কার্ত্তিক ১৩১৮

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

ওঁ

শিলাইদা।
নদীয়া

প্রীতি নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন

যদি লোক না বাড়াইয়া কাজ চালাইয়া দিতে পারেন তবে ত ভালই, এবার ছুটির পরে ছাত্র বাড়ে নাই সেইজন্য হয়ত গ্রীষ্মের ছুটি পর্য্যন্ত চলিয়া যাইবে। কিন্তু বসন্তবাবুকে যদি সংগ্রহ করিতে পারেন তবে তাহাতে বিদ্যালয়ের উন্নতিই হইবে— সুতরাং ক্ষতি হইবে না।

মুসলমান ছাত্রটির সঙ্গে একটি চাকর দিতে তাঁহার পিতা রাজি অতএব এমন কি অসুবিধা, ছাত্রদের মধ্যে এবং অধ্যাপকদের মধ্যেও যাহাদের আপত্তি নাই তাঁহারা তাহার সঙ্গে একত্র খাইবেন। শুধু তাই নয়— সেই সকল ছাত্রের সঙ্গেই ঐ বালকটিকে এক ঘরে রাখিলে সে নিজেকে নিতান্ত যূথভ্রষ্ট বলিয়া অনুভব করিবে না। একটি ছেলে লইয়া পরীক্ষা সুরু করা ভাল অনেকগুলি ছাত্র লইয়া তখন যদি পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়, সহজ হইবে না। আপাতত শাল বাগানের দুই ঘরে নগেন আইচের তত্ত্বাবধানে আরো গুটি কয়েক ছাত্রের সঙ্গে একত্রে রাখিলে কেন অসুবিধা হইবে বুঝিতে পারিতেছি না। আপনারা মুসলমান রুটিওয়ালা পর্য্যন্ত চালাইয়া দিতে চান, ছাত্র কি অপরাধ করিল? এক সঙ্গে হিন্দু মুসলমান কি এক শ্রেণীতে পড়িতে বা একই ক্ষেত্রে খেলা করিতে পারে না? চাকর রান্নাঘর হইতে কয়েকজনের খাওয়া আনিয়া শালবাগানে খাওয়াইয়া যাইবে। যে কয়জন তাহার সঙ্গে একত্রে খাইতে সম্মত তাহারা নিজের বাসন নিজে মাজিবে। ছেলেদের পক্ষে এইরূপ স্বেচ্ছাকৃত সাধনা উপকারজনক। প্রাচীন তপোবনে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খাইত, আধুনিক তপোবনে যদি হিন্দু মুসলমানে একত্রে জল না খায় তবে আমাদের সমস্ত তপস্যাই মিথ্যা। আবার একবার বিবেচনা করিবেন ও চেষ্টা করিবেন যে আপনাদের আশ্রমদ্বারে আসিয়াছে তাহাকে ফিরাইয়া দিবেন না— যিনি সর্ব্বজনের একমাত্র ভগবান তাঁহার নাম করিয়া প্রসন্নমনে নিশ্চিন্ত চিত্তে এই বালককে গ্রহণ করুন; আপাতত যদিবা কিছু অসুবিধা ঘটে সমস্ত কাটিয়া গিয়া মঙ্গল হইবে।

বুধবারে আপনার প্রতি উপাসনার ভার দিয়াছি তাহার কারণ আছে। আপনি আশ্রমের ছেলেদের সত্যই ভালবাসেন এবং তাহারাও আপনাকে ভালবাসে। আধ্যাত্মিক দান যদি কাহাকেও দেওয়া যায় তবে এই ভালবাসার ভিতর দিয়াই দেওয়া সম্ভব। আমি দেখিয়াছি আপনি ছাত্রদিগকে ক্ষমা করেন ও তাহাদের উপদ্রব স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত, আপনি তাহাদের অন্যায়কেও অত্যন্ত ভয় করেন না— আপনার ভরসা আছে এইজন্যই ছাত্রদিগকে পূর্ণভাবে দয়া করিতে পারেন। আমরা যেখানে অনিষ্ট আশঙ্কা করি সেখানে নিষ্ঠুর হইয়া উঠি— সেখানে, যাহাকে দণ্ড দিতে প্রস্তুত হই তাহার প্রতি তাকাইবার ধৈর্য্যও থাকে না। জানি সংক্রামকতার বিপদ আছে— কিন্তু কোনো বালকের ভবিষ্যৎকে এক কোপে বলিদান করিবার দায়িত্ব আমাদের পক্ষে কম নয়— কারণ, আমাদের এ ত সাধারণ ইস্কুল নহে— এ যে আশ্রম— এখানকার সাধনা সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলের সাধনা, কেবলমাত্র ইস্কুলের মঙ্গলের সাধনা নহে। যে ছেলের মনের মধ্যে যত গ্রন্থি পড়িয়াছে তাহাকে ততই দয়া করিয়া তাহার গ্রন্থি মোচনের জন্য সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে হইবে। ইতিমধ্যে বিদ্যালয়ের প্রচুর অনিষ্ট হইয়া যাইবে এ কথা আমি অন্তরের সঙ্গে

বিশ্বাস করি না— বিদ্যালয়ের উপর অনেক অনিষ্টপাত আমি দেখিয়াছি— অধ্যাপকদের চাঞ্চল্য ও একান্ত নৈরাশ্যও অনেকবার প্রবল হইয়াছে কিন্তু কল্যাণ ও শান্তিরই জয় হইয়াছে— প্রত্যেকবারের আলোড়ন আন্দোলনের পর বিদ্যালয় আরো নির্ম্মল হইয়াছে, আমরা আরো বেশি বল পাইয়াছি। বিপদের ভয় একটা স্বার্থপর ভয় এই ভয়টা যখন মনের মধ্যে আসে তখন তাড়াতাড়ি নিজের উদ্বেগকে দুর করিবার জন্য আমরা অন্যের গুরুতর অনিষ্টকেও শ্রেয় মনে করি— সেই ভয়ের আবেগেই আমরা ছোট বিপদকে অত্যন্ত বড় করিয়া দেখি। বিদ্যালয়ে এমন আমি অনেকবার দেখেছি— অগত্যা অনেক কঠোরতা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও স্বীকার করিয়াছি। কারণ জোর করিয়া নিজের মত চালাইয়া ন্যায়েরও প্রতিষ্ঠা করা ঠিক নহে যখন অন্তরের প্রীতি, ক্ষমা বিশ্বাসের ভিতর দিয়া সহিষ্ণুতা ও সেবা না আসিবে তখন বাহিরের দিক দিয়া তাহার বিড়ম্বনায় কোনো ফল নাই। আধ্যাত্মিক সম্বন্ধের সকলের চেয়ে যেটি প্রধান ভাব সেই একটি মাতৃভাব আপনার মধ্যে দেখিয়াছি সেইজন্যই আমি বুঝিয়াছি আপনি অন্তরের মঙ্গলকামনা দিয়া ছাত্রদিগকে যাহা বলিবেন ঈশ্বর তাহাকেই উপাদেয় করিয়া তুলিবেন। ধর্ম যে মিষ্ট, তাহা যে সুন্দর এইটেই গোড়ায় বুঝিবার বুদ্ধি-বিচার পরে হইবে। মাতা যেমন স্তনের ভিতর দিয়া নিজের জীবন গালাইয়া শিশুদিগকে খাদ্য দেন— বালকদিগকেও তেমনি করিয়া নিজের হৃদয় বিগলিত বাণীর দ্বারাই ধর্ম্ম-প্রাণে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতে হয়— বিশ্লেষণের দিন পরে যথাসময় আসিবে— কিন্তু গোড়া হইতেই ধর্ম্মকে হৃদয় হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া তত্ত্বজ্ঞানের শুষ্ক কাঠিন্য দিয়া…বুদ্ধির পক্ষে বিতৃষ্ণাজনক করিয়া তোলা কিছুতেই ভালো নহে। দুইয়ের মিশল হইতে পারিলেই সবচেয়ে ভাল— কিন্তু মগজের মধ্যে বুদ্ধির হামনদিস্তায় ত এই মিশল হয় না— প্রত্যহ ভক্তির ভিতর দিয়া, নিষ্ঠার ভিতর দিয়া, উপাসনা প্রার্থনার ভিতর দিয়া, জীবনের সাধনার ভিতর দিয়াই রসের সঙ্গে রূপের, সুন্দরের সঙ্গে সত্যের মিলন ঘটে— "ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।"

আশীর্ব্বাদ করিবেন আমি যে কামনা করিয়া এই নির্জ্জনে আসিয়াছি তাহা পূর্ণ হউক্। আমি যেন সমস্ত অসত্য আবরণ হইতে মুক্ত হইয়া নিজের সত্যরূপকে লাভ করিয়া সেই সত্যের সহিত মুখামুখি দাঁড়াইতে পারি। নিজের কাছ হইতে সুদূরে ছুটিয়া পালাইয়া উদার মুক্তিলাভ করিবার জন্য কিছুকাল হইতে আমার মনের মধ্যে অত্যন্ত তাড়না আসিতেছে— এইজন্য আমার অন্য সকল কাজের যদি ক্ষতি করি তবে আপনারা সকলে আমাকে ক্ষমা করিবেন। ইতি ১৬ই কার্ত্তিক ১৩১৮।

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

ওঁ

বিনয় সম্ভাষণপূর্ব্বক নমস্কার—

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত মহাশয়ের পত্র পাঠাইলাম। বিচার করিয়া তাঁহাকে একটা উত্তর পাঠাইবেন।

"গল্পচারিটি" এই বিদ্যালয় স্বহস্তে লইল অথচ তাহার বিক্রয়ের কোনো ব্যবস্থা হইল না ইহাতে বিদ্যালয়ের ক্ষতি হইবে মণিলাল আমাকে এইরূপ বিজ্ঞাপন দিয়াছে। বিক্রয়ের যে টাকা জমিয়াছে
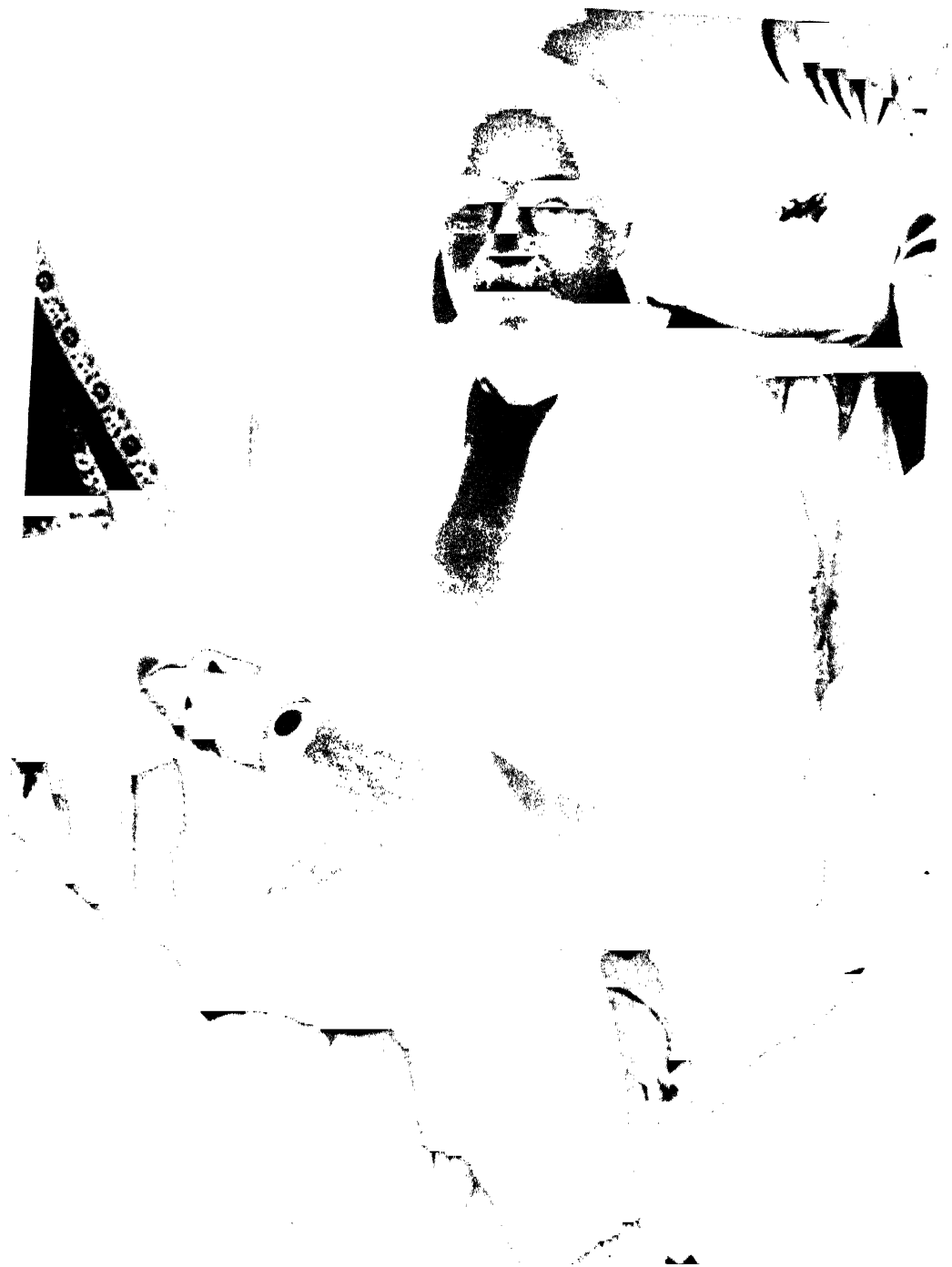
নেপালচন্দ্র রায়

রবীন্দ্রনাথ-সহ নেপালচন্দ্র রায়

তাহাতে বোধ করি এখনো বই ছাপিবার দাম উঠে নাই। এ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য স্থির করিবেন, অবশ্য এখনো Publishing House-এর দ্বার খোলা আছে। ইতি ২৭শে পৌষ ১৩১৮

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ একটি কথা বলিতে ভুলিয়াছিলাম। আদি সমাজে যিনি নিযুক্ত আচার্য্য ছিলেন তিনি আমাদের গতিক দেখিয়া পদত্যাগ করিয়াছেন। আপনারাও ইহার কার্য্যভার গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত। এক্ষণে কি করিব তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। আমার পিতা বর্ত্তমান থাকিতে একবার তাঁহাকে বলিয়াছিলাম ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে জাতি বর্ণ নির্ব্বিচারে উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। তিনি বলিয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন না করিয়া কাজে লাগিয়া যাও না—যদি পার তাহা হইলেই হইল। Principle লইয়া তর্ক করা সহজ কিন্তু কাজের বেলায় অনেক ভাবিবার কথা আসিয়া উপস্থিত হয়। আশ্রমের সহিত আদি সমাজকে এক করিয়া দিবার কি কোনো উপায়ই নাই? এ কথা বলিতে পারি আদি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে কোনো বাধা নাই। সে সকলকেই আহ্বান করিতে প্রস্তুত আছে। কেবল দুঃখের বিষয় এই যে আহ্বান করিবার কণ্ঠ নাই—যে লোক সকলকে ডাকিবে, টানিবে বাঁধিবে, তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। উদার ভাবে চিন্তা, ব্যাপক ভাবে প্রীতি ও বলিষ্ঠ ভাবে কর্ম্ম করিবার আদর্শ বহন করিয়া গুরু আসুন—তত দিন কেবলি সঙ্কোচের আবরণে আবৃত হইয়া দ্বিধার মধ্যে পড়িয়া ব্যর্থ দিন কাটাইয়া চলি।

৪

ওঁ

বিনয় সম্ভাষণপূর্ব্বক নমস্কার—

সত্যজ্ঞানবাবু শাস্ত্রীমহাশয়ের স্থানে সংস্কৃত অধ্যাপনার ভার লইতে প্রস্তুত। তাঁহার কথায় বার্ত্তায় বোধ হইল বালকদিগকে কেমন করিয়া শিক্ষা দিতে হয় সে সম্বন্ধে নিজের প্রতি তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস আছে—সেটা থাকা ভাল। ইঁহার কাছ হইতে কিছু পরিমাণে ইংরেজি আদায় করিতে পারিবেন এবং সন্তোষের প্রাতঃকালের অবসর হইতেও কিছু কাটিয়া লইয়া যদি আগামী গ্রীষ্মাবকাশ পর্য্যন্ত চালাইয়া দিতে পারেন তবে যতীনকে ও জীবনকে পাইলে আপনাদের অন্য শিক্ষকের প্রয়োজন হইবে না—এবং আমার বিশ্বাস আগামী ছুটির পরে অথবা তাহার পূর্ব্বেই দিনুকে পুনরায় বিদ্যালয়ে ফিরিতে হইবে। সুতরাং ইতিমধ্যে নূতন লোক রাখিলে তাহাকে লইয়া মুস্কিলে পড়িবেন। তবে যদি বাঙলা শিক্ষক ভাল কোথাও পান তবে চেষ্টা দেখিবেন।

সেদিন যে প্রস্তাব করিয়া আসিয়াছি আপনারা সেটা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবেন। আশ্রমের ভিতরকার সত্যটিকে ছেলেদের মনে স্পষ্টরূপে জাগাইবার জন্য ইতিপূর্ব্বে অল্পস্বল্প যেকিছু চেষ্টা করা হইয়াছে তাহার উৎসাহ অধিকদিন টেঁকে নাই—কেননা সেটা আমরা বাহির হইতে করিয়াছি এবং আমাদের নিজেদের দিকে আইডিয়া যেমন সুলভ নিষ্ঠা তেমন নহে। এবারে বালকদিগকেই আহ্বান করিয়া দেখুন। তাহারাই তাহাদের ইচ্ছার দ্বারা দাবির দ্বারা প্রশ্নের দ্বারা আমাদের চিত্তকে হয়ত

সচেতন রাখিতে পারিবে। সমস্ত আশ্রমের একটি প্রাণের কেন্দ্র যদি গড়িয়া উঠে তবে সেইখানে অতি সহজে আশ্রমের সুধারসটুকু সঞ্চিত হইতে থাকিবে।

আমি অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য দূরে যাইতে প্রস্তুত হইতেছি। এই সময়ে আমি আপনাদের সকলের কাছ হইতে অন্তরের সহিত ক্ষমা প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করি। অনেক সময়ে অবিবেচনা করিয়া আপনাদের কাছে অনেক অপরাধ করিয়াছি; অবিচারে অনেক বেদনার কারণ ঘটাইয়াছি; আপনাদের পরস্পরের মধ্যে যে সকল ঈর্ষাবিদ্বেষের তরঙ্গ মাঝে মাঝে দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছে আমি তাহাকে শান্ত না করিয়া অনেক সময়ে ক্ষোভের উপর ক্ষোভ বাড়াইয়াছি আজ বিদায় গ্রহণের সময় আমার সেই সমস্ত এবং অন্যান্য নানা গোচর ও অগোচর পাপ মার্জ্জনা করিবেন। আমি প্রথম হইতেই ইহা নিশ্চয় জানি মানুষকে চালনা করিবার শক্তি আমার নাই; সকলের হৃদয়কে সম্মিলিত করিতে আমি পারি নাই, আমার আহ্বানের মধ্যে সত্যের পূর্ণতেজ নাই— আমি কবি মাত্র, কবির সমস্ত দুর্ব্বলতা অসম্পূর্ণতা আমার আছে, এবং আপনারা জানেন কবির দ্বারা ইতিহাসে কখনো কোনো কাজের মত কাজ সৃষ্টি হয় নাই— বস্তুত বিদ্যালয়ের সৃষ্টিকার্য্যে বিধাতা আমাকে নিতান্তই একটি উপলক্ষ্য করিয়া বসাইয়া রাখিয়াছেন— এখানে আপনাদের যাঁহার যে শক্তি আছে তাহাই মিলাইয়া তুলিয়া যথার্থভাবে ইহার সৃষ্টির ভার আপনারা গ্রহণ করুন— আমার দ্বারা ইহার মধ্যে যাহাতে কোনো বিক্ষেপ উপস্থিত না হয় আমি সেজন্য সতর্ক থাকিব।

সত্যজ্ঞানবাবু তাঁহার কন্যার থাকিবার জন্য পুরুষের সংস্রবরহিত একটি ব্যবস্থা করিতে চান। ১৩ই মাঘে তিনি আশ্রমে গেলে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিবেন। ইতি বুধবার

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫

ওঁ

সবিনয় নমস্কারপূর্বক নিবেদন—

নেপালবাবু, লণ্ডনের জনস্থানে এসেছি। এই শ্বেতদ্বীপের নরলোকে যেখানে নারায়ণের অধিষ্ঠান সেই মন্দিরে প্রবেশ করবার অভিপ্রায়ে দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছি— এখানকার সজনতার ভিতরে যেখানে স্তব্ধতা, কর্ম্মক্ষেত্রের ভিতরে যেখানে তীর্থস্থান আমি যে এখনি সেখানকার আভাস পাচ্চি নে তা বলতে পারি নে। এখানকার জনকোলাহলের মধ্যে ঘুরে বেড়িয়ে আমার মনের মধ্যে যেন উপাসনার কাজ হচ্চে। সাগরসঙ্গমের তীর্থে সমুদ্রের বীচিভঙ্গের মধ্যে যাঁকে দেখা যায় মানুষের অতলস্পর্শ শক্তি-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গভঙ্গের মধ্যে যদি তাঁকে না দেখতে পারি তবে মিথ্যা আমাদের দর্শনশক্তি। মানুষের সমস্ত ক্রিয়াকর্ম্ম কীর্ত্তিকলাপকে আমরা কি একটা মোহবশত কিংবা অহঙ্কারবশত কৃত্রিম বলে গণ্য করি কিন্তু নায়েগ্রার জলপ্রপাত যেমন অকৃত্রিম এও তেমনি অকৃত্রিম। মানুষের মনের আলোড়নের মধ্যে সেই চিৎস্বরূপের অসীম শক্তিই আন্দোলিত হচ্চে— চারিদিকে এই সমস্ত গাড়িঘোড়া দোকান-বাজার বাড়িঘর কেবলি ফেনার মত অট্টহাস্যে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠ্‌চে। আমার ত মনে হচ্চে য়ুরোপের

মহানগরী সেই পুরীতে জগন্নাথক্ষেত্র বটে যেখান থেকে অগাধ লীলাসমুদ্রের সফেন নৃত্য এমন দিগন্ত-প্রসারিত করে দেখতে পাওয়া যায়।—যতদূর দেখি উচ্ছ্বাসের অন্ত নেই, কলগর্জ্জনের বিরাম নেই, কোথাও বা প্রলয়ের প্রচণ্ডতা, কোথাও বা বিপুলতার ঔদার্য্য। এখানে সমুদ্র আকারে যে অক্লান্ত শক্তিকে দেখচি সেই শক্তিই বোলপুর প্রান্তরের আশ্রমে আমাদের কর্ম্মচেষ্টার ভিতর দিয়ে উৎস আকারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে—সেই পবিত্র ধারা আমাদের ভিতরকার সমস্ত পাষাণ বাধাকে ক্ষয় করে ফেলুক। ইতি ২০ জুন ১৯১২

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬

ওঁ

508 W. High Street, Urbana
Illinois

প্রীতি নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

নেপালবাবু, আমার খ্যাতিতে আপনার মনে যে উৎসাহ জাগরুক হয়েছে তাহাতে করে আপনার কল্পনাকে অনেকদূরে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে। কল্পনার পক্ষে ওড়া সহজ কিন্তু আমার মত একটি আস্ত মানুষের পক্ষে তার সমস্ত বোঝা সমেত অতটা উর্দ্ধগামী হওয়া সম্ভব মনে করেন? আপনি ত দেখেছেন আমি কোনো কাজ আজ পর্য্যন্ত নিজে থেকে করিনি— কিছু যে করে কর্ম্মে নেব সেরকম শিক্ষা এবং অভ্যাস হয়নি— কোনো পরীক্ষার জন্যেই আজ পর্য্যন্ত কোমর বেঁধে প্রস্তুত হয়ে উঠতে পারি নি। গোলে মালে দৈবাৎ যা ঘটে উঠেছে তাই ঘটেছে। আমার শেষ পর্য্যন্ত এই রকমই চল্‌বে। থেকে থেকে হঠাৎ চম্‌কে উঠে দেখব একটা কিছুর মধ্যে আপাদমস্তক জড়িয়ে পড়ে গেছি— সেটার থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে মনটা অহরহ ব্যস্ত হয়ে থাকবে অথচ যতক্ষণ তার মধ্যে আছি ততক্ষণ তার দায় এড়াতে পারব না। বরাবর আমার এমনি করেই কাজ চলে এসেছে। তা যদি না হত, তা হলে খুব সম্ভব আমেরিকা থেকে কিছু সঞ্চয় করে নিয়ে যাওয়া যেতে পারত— কিন্তু তা করতে হলে তাল ঠুকে মল্লভূমিতে গিয়ে দাঁড়াতে হয়— নকীবের মুখ দিয়ে খুব লম্বা করে নিজের পরিচয় ঘোষণা করতে হয়— খবরের কাগজের সম্পাদকীয় স্তম্ভগুলোর সর্ব্বোচ্চ শিখরে চড়ে বসতে হয় — তূরী ভেরী দামামা জগঝম্প ঘাড়ে করে নিয়ে বেড়াতে হয়। আমাদের দেশের অনেকে সে কাজ করবেন, নিজের নানা বেশের ছবি সমেত নানা লোকের অভিমত সম্বন্ধ পরিচয়পত্র নির্লজ্জভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে বেড়াচ্চেন— এবং আশ্চর্য্য এই, তার ফল পাচ্চেন। অথচ মূলধন তাদের অতি যৎসামান্য কিন্তু অন্নবস্ত্র আদর অভ্যার্থনার অভাব নেই। আমিও রাস্তার ধার দিয়েও চল্‌তে পারলুম না। এখানে এসে অবধি ভয়ে কোনো বড় সহরে ঢুকিনি— শিকাগো থেকে বারবার নিমন্ত্রণ পাচ্ছি কিন্তু সে দিকে ভিড়িনি। রচেষ্টারে একটা কন্‌গ্রেস হবে সেখান থেকেও পালাবার চেষ্টায় ছিলুম। কিন্তু অনুরোধ কাটাতে পারচিনে। দেখুন আপনি রামানন্দবাবুকে একটা কথা বলবেন— এখানকার যে কোনো ছাত্র তাঁর কাগজে নিজের জয়ঢাক বাজায় সেটা তিনি কেন ছাপান? তাঁর কাগজ এদেশেও আসে অনেক সময় ছাত্রদের কীর্ত্তি কাহিনী তাদের পরিচিতবর্গের কাছে খুব অদ্ভুত

ঠেকে। আমেরিকায় আত্ম-ঘোষণাটা অত্যন্ত বেশি চলিত। আমাদের ছাত্ররা সেইটা সর্ব্বাগ্রে শিখে নেয়— আমার কাছে সেটা নিরতিশয় সঙ্কোচজনক মনে হয়।

যাই হোক্ ধীরে ধীরে আমাদের বিদ্যালয় সম্বন্ধে এখানকার একদল লোকের ঔৎসুক্য জাগরিত হয়ে উঠ্‌বে এরকম আশা করা যেতে পারে কিন্তু যাতে সেটা সত্য সীমার মধ্যে থাকে সে আমাদের দেখ্‌তে হবে। কথা কইতে গিয়ে কথা বেড়ে যায়— একবার সুরু হলে সেটা সাম্‌লে ওঠা শক্ত। যাই হোক্ বিদ্যালয়ের পরিচয় এখানে যতই বিস্তীর্ণ হোক্ না, সেটাকে আর্থিক লাভের সীমায় পর্য্যন্ত পৌঁছে দিতে পারব কিনা সে আমি কিছুই জানিনে। সে সম্বন্ধে অত্যন্ত আগ্রহ না করে স্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করাই সব চেয়ে ভাল— যা কিছু পাবার মত জিনিষ তা এমনি করেই পাওয়া যায়— যা চেয়ে চিন্তে কেঁদে কেটে পাই তার দায় সামলানো শক্ত— তা পেতে গেলে মাথা বিকিয়ে দিতে হয়— যত পাই তার চেয়ে অনেক বেশি দিই।

কেবল ভগবান আমাদের যা দেন তা ষোলআনা দেন, তার দস্তুরি কেটে নিয়ে তাকে ছিদ্র করে দেন না, সেই দানের জন্য অপেক্ষা করব এবং সেই দানের যোগ্য হতে চেষ্টা করব— সেই যোগ্যতা হয়নি বলেই যত কিছু দারিদ্র্য দেখ্‌তে পাচ্ছেন নইলে অভাব কিছুই ছিল না। এখনো সময় আছে— এখনো হবে আশা করচি ভয় করবেন না। ইতি—২৪শে পৌষ ১৩১৯

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭

ওঁ

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

নেপালববাবু, আপনার পত্রখানি পাইয়া বড় আনন্দিত হইলাম। আমি যে আপনাকে অনেকদিন চিঠি লিখি নাই আপনার চিঠি না পাওয়া তাহার গৌণ কারণ মাত্র, মুখ্য কারণ নহে। আসল কথা আমি স্বভাবতই কুঁড়ে— অথচ আমাকেই বিধাতা নানা কৌশলে বেশি করিয়া খাটাইয়া থাকেন—

অবকাশের কাঙ্গাল আমার মত অল্প লোকই আছে অথচ কিছুতেই আমি বেশ পেট ভরিয়া সময় পাইয়া উঠিনা। এইজন্য কোনো সঙ্গত ওজর পাইলেই আমি হাত গুটাইয়া বসি। এখান হইতে আমাকে বিস্তর চিঠি লিখিতে হয়, শুধু কেবল আত্মীয়স্বজনকে নহে এখানেও আমার চিঠি লিখিবার দায় বাড়িয়া উঠিয়াছে। এখানে আবার ইংরেজি ভাষায় লিখিতে হয়— সে ভাষাটার প্রতি আমার দখল কিরূপ সে আপনাদের অগোচর নাই, অতএব আমার অবস্থা চিন্তা করিয়া দেখিবেন আমি আপনাদের উত্তরে হাওয়ায় আক্রান্ত আমলকি বনেরই মত অহরহ পত্র বর্ষণ করিয়া একেবারে রিক্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছি। সেই জন্য আমি টানাটানি করিয়া যেটুকু পারি নিজেকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছি— কিন্তু ইহা আপনি নিশ্চয় জানিবেন আপনাদের কথা একদিনের জন্যও আমি ভুলি না। আশ্রমে আমি যে পত্র লিখি তাহার লেফাফার উপরে আপনাদের সকলেরই নাম অদৃশ্য কালীতে লেখা থাকে আপনারা নিশ্চয় তাহা জানেন। যখন এদেশে কোমর বাঁধিয়া যাত্রা করিলাম তখন মনে করিলাম আমি আপনাদেরই

Special correspondent-এর পদ লাভ করিয়া বাহির হইয়াছি। গোড়ায় তেমনি করিয়াই পুরাদমে কলম চালাইয়াছি। কিছুদিন যাইতেই বুঝিলাম আমি ভুল করিয়াছি; আমার উপর যে কাজের বরাত দেওয়া হইয়াছিল তাহা আমি গোড়ায় বুঝি নাই আমাকে এখানকার কাজে লাগিতে হইল। তাহার ফল হইয়াছে এই, বোলপুরে আমার সাপ্তাহিক চালান ক্রমশই শীর্ণতর হইয়া আসিয়াছে—এখন কোনো ক্রমে ভদ্রতা রক্ষা করিয়া দু'চারখানি চিঠি রওনা করিতে পারি মাত্র তাহার বেশী আর চলে না। নহিলে আপনাদের সম্বন্ধে কৃপণতা করা আমার স্বভাবসিদ্ধ নহে।

কিন্তু আপনারা ভ্রমেও মনে করিবেন না, আমি আপনাদের অশ্বমেধের ঘোড়া লইয়া জগৎ জয় করিতে বাহির হইয়াছি। পারিতাম ত ভালই হইত। কিন্তু আমি সে জাতের মানুষ নই—কি করিব বলুন। আমি দরবার করিয়া রাখিয়াছিলাম—"আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর"—আমার সে দরবারও মঞ্জুরও হইয়াছে। রাজসভাতে আমার স্থান নয়, যুদ্ধক্ষেত্রেও নহে—আপিস আদালতের ত কথাই নাই, কুঞ্জবন হইতে নাড়া দিলে আমাকে বিষম বিভ্রাটে ফেলা হয় সে কথা আমি প্রতিদিনই অনুভব করিয়া থাকি। আমি সহরের মানুষ না মহাশয় আমাকে দৌত্য কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব আপনারা কেন করিতেছেন? কোনো দিন আমার বক্ষে কি সে চাপরাস দেখিয়াছেন? তাই, এখানে আসিয়া আমি একটা কোণ আশ্রয় করিয়া বসিয়াছি। বষ্টন শিকাগো প্রভৃতি স্থানে আমার নিমন্ত্রণ ছিল কিন্তু আমি সেদিকে ভিড়ি নাই। আমি সঙ্‌বর্দ্ধনাকে ভয় করি তাই আমি নিমন্ত্রণ কাটাইয়া এইখানে চুপ করিয়া বসিয়া আছি। আজকে আমি, একটি মানুষের কাছ হইতে চিঠি পাইয়াছি তাহাতে বুঝিয়া বুঝিলাম তিনি আমার লক্ষণ ঠিক ধরিয়াছেন। তিন শিকাগোর Lewis Institute-এর Dean Lewis। তিনি লিখিয়াছেন "It is easy to imagine that the man who wrote—"no more loud words from me, such is my master's will" does not care to be lionized, though there are plenty of persons in our land Chicago who would vie with each other to lionize him. But you will find among us a few who know how to prize you better."

কিন্তু দেখুন আমি যেটুকু কাজ করিতে পারি তাহা এমনি করিয়াই পারি। যখন দেশে থাকিতে শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল তখন শিলাইদহে গিয়া নিতান্ত অগত্যা গীতাঞ্জলি ইংরেজিতে তর্জ্জমা করিয়াছিলাম, মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবি নাই সেগুলো কোনো দেশে কোনো কাজে লাগিবে। যদি শরীর সবল থাকিত ও লোকের ভিড়ের মধ্যে পড়িতাম তাহা হইলে ও কাজে হাতই দিতে পারিতাম না। আমার বিশ্বাস এখানে কোণে বসাইয়া রাখিয়া আমার কাছ হইতে একটা কোনো কাজ আদায়ের ব্যবস্থা হইতেছে। আমার সেই ছেলেবেলাকার মাষ্টার জ্ঞানবাবুর কথা মনে পড়িতেছে। তিনি আমাকে ইস্কুলের পড়া করাইবার চেষ্টায় হার মানিয়া শেষকালে আমাকে খানিকটা করিয়া ম্যাকবেথ বুঝাইয়া দিয়া ঘরের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিতেন। আমি সেই ম্যাকবেথটুকু তর্জ্জমা শেষ করিলে দরজা খুলিত। কোণে বন্ধ করিয়া কাজ আদায় করাই আমার সম্বন্ধে বিধাতার প্ল্যান। এইজন্য যখন সব চেয়ে মনে হয় চুপচাপ তখনি বোধহয় সব চেয়ে আমাদের খাটুনির পালা। কিন্তু যাহাই হোক আমার সম্বন্ধে কোনো আশা মনে রাখিবেন না। বরাবর যিনি আমার কাছ হইতে ভুলাইয়া কাজ আদায় করিয়া থাকেন তিনি যাহা

করেন তাহাই হইবে— আমি কোমর বাঁধিয়া কিছু করিতে পারিব না। আমি নিজে কিছু করিতে গেলে তাহা পুনরায় সংশোধন করিতে ডবল সময় নষ্ট হইবে তাহাতে কাজ বাড়িয়া যায়, কাজ সমাধা হয় না ইহা আমি বারবার দেখিয়াছি। আমি যে কি পারি এবং পারিনা, তাহা নিজে কিছুই জানিনা— খুব সম্ভব অধিকাংশ সময়েই সে সম্বন্ধে উল্টা বুঝি কিন্তু যিনি জানেন তিনি ঠিক সময়ে ঠিক কাজেই তলব করেন। নহিলে কি মনে করেন আমি এত দেশ থাকিতে মাঠের মাঝখানে একটা স্কুল ফাঁদিতে যাইতাম?

বিদ্যালয় সম্বন্ধে আমি কোনো খুঁটিনাটি খবর লইনা। কারণ, দূরে যখন আসিয়াছি তখন দূর হইতে যে চেহারা দেখা যায় সেইটেই দেখিব— আবার যখন কাছে গিয়া বসিব তখন সকল খুঁটিনাটিই চোখে পড়িবে। আপনাদের মধ্যে নূতন যে সকল শিক্ষক আসিয়াছেন তাঁহাদিগকে আমাদের আশ্রমের সহিত মিলিত করিয়া দেখিবার অবসর আমি পাই নাই— তাঁহারা আমার চিত্তের বাহিরে পড়িয়া আছেন। কিন্তু যাঁহাদিগকে আমাদের আশ্রমে দেখিয়া আসিয়াছি, তাঁহারা প্রত্যেকেই নিজের কোনো না কোনো গুণ কোনো না কোনো যোগ্যতার দ্বারা আমাদের বিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত হইয়াছেন। তাঁহাদের সহিত বিদ্যালয়ের বিচ্ছেদ নিশ্চয়ই বেদনাজনক ও ক্ষতিকর। এইজন্য আমি আশা করিয়া রহিলাম তাঁহাদের সকলকেই আমি ফিরিয়া গিয়া দেখিব এবং আমাদের বিদ্যালয়ের সমগ্রতার যে ছবি আমার মনের মধ্যে আছে তাহা কোনো দিক হইতে কিছু মাত্র ক্ষুণ্ণ হইবে না।

এদেশ হইতে বিদ্যালয়ের কোনো সাহায্য হইতে পারে কিনা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। লোভ করিবেন না, ভিক্ষুকের মত বাহিরের দিকে তাকাইবেন না— যাহা প্রাপ্য তাহা পাইবই— তাহার বেশি চাহিতে গেলেই নিরাশ হইতে হইবে। আপনি মনে করিবেন না আমি অদৃষ্টবাদীর মত কথা বলিতেছি। আমি দেখিয়াছি বাহিরের দিকে আশা স্থাপন করিতে গেলেই নিজের যথার্থ সম্পদের দিক হইতে দৃষ্টি দূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়।

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮

ওঁ

C/o Messrs Thomas Cook & Sons
Ludgate Circus, London
May 6, 1913

প্রীতি নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

নেপালবাবু, আশা করচি এখানকার কাজ সমাধা হতে আমার আর বেশি দিন লাগবে না। আমি বেশ দেখতে পাচ্চি গত বারের চেয়ে এবার আমাকে অনেক বেশি ভিড়ের মধ্যে ভিড়তে হবে— অথচ আমি ভিড়ের জীব নই, কি করব তাই ভাব্‌চি। Quest Societyর বক্তৃতার বন্ধনে জুনের প্রায় শেষ পর্য্যন্ত আমি এখানে বদ্ধ আছি— তার পরে যদি সুবিধা পাই তাহলে বৃটিশ চ্যানেলে পাড়ি দিয়ে একবার য়ুরোপে যাবার ইচ্ছা আছে। কিন্তু এই সমস্ত ঘোরাঘুরিতে আমার মন আর সায় দিতে পারচে না— এতদিন

পথের টানে ত অনেক ঘোরা গেল এবার আসনের ডাক পড়েছে। একট স্থবিধা এই হল পথের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ পাতিয়ে যাওয়া গেল— বেশ বুঝতে পারচি মাঝে মাঝে হঠাৎ সকাল বেলায় আবার বেড়িয়ে পড়ব। পাখীর ডাক শুনলে মন উতলা হবে এবং এক এক দিন গভীর রাত্রের স্বপ্নে সমুদ্রের গৃহহীন ঢেউগুলো হাত তুলে তুলে ডাক দেবে। আমার মত নিতান্ত কোণের মানুষকে সমুদ্রের পশ্চিম পারে যে এমন করে টানাটানি করবে একথা গেল বছরের বৈশাখ মাসে স্বপ্নেও মনে করিনি। দূরের সঙ্গে এই সম্বন্ধের দ্বারা কাছের সঙ্গেও আমার সম্বন্ধে আরো ঘনিষ্ঠ হতে পারবে এইটে আমার লাভ। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে বিরোধ বিদ্বেষ ঈর্ষা পূর্ব্বের চেয়ে আরো অনেক বেশি প্রবল হয়ে জেগে উঠ্‌বে, আমার পূর্ব্বের সেই নিরালা জায়গাটি হয়ত ঠিক তেমন করে আর ফিরে পাব না এই কথা চিন্তা করে মনের মধ্যে একটা আশঙ্কা ও বেদনা বোধ করচি। এ কথা বেশ বুঝতে পেরেছি চুপ করে বসবার দরবার আমার এখনো পর্য্যন্ত মঞ্জুর হল না। যত দিন বেঁচে আছি আমার ছুটি নেই, পেন্সন নেই।

বিদ্যালয়ের জন্য ম্যাজিক লণ্ঠন চেয়েছেন একটা ভাল ম্যাজিক লণ্ঠন ছিল সেটা রথীরা শিলাইদহে পল্লীর কাজে নিয়ে গিয়েছিলেন আমি রথীকে বলেছি সেটি তাঁরা বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে দেবেন। তার জন্যে কতকগুলো Slidesএর সংস্থান করতে হবে। Microscope বলে আজকাল একটা নতুন যন্ত্র বেড়িয়েছে তাতে দামী শ্লাইডের দরকার হয় না— যে কোনো ছবি দিয়ে কাজ চালানো যায়— খবর নেব তার দাম কত, আজকাল এদেশের শিক্ষাবিধি অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য হয়ে উঠেছে। সেই জন্যে এখানকার ভাল বিদ্যালয়ে গিয়ে আমি বিশেষ কোনো ফল পাইনে। যে প্রণালী একেবারেই আমাদের অসাধ্য তার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে লাভ কি। আমার ত মনে হয় এত অত্যন্ত বেশি আয়োজনের জটিলতা সফলতার লক্ষণ নয়। যেমন বড় মানুষের ছেলেরা অত্যন্ত বেশী খেলনা পায় বলে তাদের খেলার যথার্থ সুখ নষ্ট হয়ে যায় তেমনি ছাত্রদের মনকে বাইরের থেকে নানা উপায় ও কৌশলের দ্বারা অত্যন্ত বেশি নাড়া দিতে থাকলে বাইরের দিকটাতে তাদের চিত্তের গতিকে বাড়িয়ে তোলা হয় বটে কিন্তু ভিতরের দিকে নিশ্চয়ই জড়ত্ব সঞ্চার করা হয়। মনকে অতিশয় আনুকূল্য করলে তার স্বাভাবিক সৃজন চেষ্টা এবং সেই চেষ্টার আনন্দকে আচ্ছন্ন করে দেওয়া হয়। এ কথা আমি জোর করে বলতে পারি এই সমস্ত আসবাবগুলোকে বিদায় করবার জন্যে একদিন এদের মালগাড়ী ডাকতে হবে।

কেননা আসবাবের আধিক্যে মানুষের জায়গা কেবলি সঙ্কীর্ণ হয়ে আসবে, ধন যত বড় হয়ে উঠ্‌চে ধনী ততই ছোট হতে চলেছে। আমার বোধ হচ্চে যেন এ কথা এরা এখনি বুঝতে আরম্ভ করেছে এখন থেকে এরা রিক্ত হবার সাধনায় প্রবৃত্ত হবে। রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে মুক্তি লাভের জন্যে এদের অনেক বীরকে প্রাণপাত করে সংগ্রাম করতে হয়েছে এবারে বহির্বস্তুর বিপুল বন্ধনজাল থেকে মনে মুক্তি দেবার জন্যে এদের অনেক তপস্বীকে তপস্যা করতে হবে। আমাদের মুস্কিল হবে এই যে এরা যেগুলো ফেলে দিতে থাকবে আমরা সেগুলো সস্তায় পাব বলে কুড়িয়ে এনে ঘর বোঝাই করতে থাকব। য়ুরোপের আবর্জ্জনার বোঝা বোধ করি একদিন আমাদেরি টানতে হবে, আমাদের ধনীদের ঘরে এখনি তার লক্ষণ দেখা যায়। উপায় নেই। বস্তুর মোহের মধ্য দিয়ে না গিয়ে বোধ হয় তাকে কাটিয়ে ওঠা যায় না। দরিদ্র বোধহয় সত্যভাবে মহৎভাবে দরিদ্র হতে পারে না— দু হাতে ধন ছড়িয়ে ফেলে দিয়ে তাকে দরিদ্র হতে হবে— যে পূর্ণ হয়েছে সেই ত রিক্ত হবার আনন্দ ভোগ করতে পারে, যে শূন্য সে কেমন করে পারবে? সেই

জন্যই দেখচি য়ুরোপের বস্তুর বোঝা আমাদের মত দীন দরিদ্রের মন কেবলি মুগ্ধ করচে। আমরা হাত বাড়িয়ে বলচি ঐ মোট মাথায় তুলতে না পারলে আমাদের আর মুক্তি নেই অথচ দেখ্‌তে পাচ্চি এই বোঝার ভারে য়ুরোপের চিত্তের মধ্যে একটা গভীর ক্রন্দন উঠতে আরম্ভ করেছে, সে একদিন নিশ্চয়ই বল্‌বে যেনাহং নামৃত স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্ আজ তারই ভূমিকা হচ্চে। য়ুরোপ যখন বলবে আমি অমৃত চাই, তখন হয়ত আমরা বলতে থাকব আমরা উপকরণ চাই। মানুষের আত্মার চেয়ে তার উপকরণকে বিশ্বাস করবার অন্ধপ্রবণতা আমাদের মধ্যে খুব দেখা দিয়েছে সে ত দেখ্‌তেই পাচ্চেন। আমরা কেবলি লোভ করচি। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ— এ কথাটার মানে আমরা ভুলে বসেচি। এ কথার মানে এই, বস্তুর কাছে হাত বাড়িয়োনা, তাঁর দ্বারে দাঁড়াও। তিনি যা দেন সে ত হাতের মুঠোর উপরে দেন না, তার ত ভার নেই, সে তিনি জীবনের ভিতরে সঞ্চার করে দেন— সে সম্পদ আমাদের আত্মারই অংশ হয়ে যায় সুতরাং তাকে লোহার সিন্ধুকে ভরতে হয় না "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ", এ কথার উপরে আমরা ভরসা রাখতে পারিনে কেন না "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং" এ কথাটাকে আমরা গ্রহণ করতে পারি নি আমরা নিজেকে দিয়েই সমস্তকে আবৃত করেছি! কিন্তু আমাদের সর্ব্বদা সতর্ক হতে হবে। বস্তুর উপরে বিশ্বাস যান্ত্রিক প্রণালীর উপরে নির্ভর আমাদের তপস্যা ভঙ্গ করবার জন্যে কখনো মোহন বেশে কখনো বিভীষিকার আকারে দেখা দেয়। কিন্তু তার প্রতি যদি দৃকপাত না করেন তাহলে দেখ্‌তে পাবেন সে নিঃশব্দে অন্তর্ধান করবে। আমাদের আশ্রমের ইতিহাসে যা দৈন্যরূপে বাধারূপে দেখা দিয়েছে তা ছায়ার মতই নিজের কোনো পদচিহ্ন না রেখে চলে গিয়েছে। তা বারবার দেখেছি— ধনীর সাহায্যের দ্বারা আমরা ধনবান হইনি এ কথাটি কোনো দিন ভুলবেন না। ইতি ২৩শে বৈশাখ ১৩২০

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯

নেপালবাবু, Hornell সাহেবকে আমি জানি। আপনি আমার নাম করে তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে আমাদের বিদ্যালয় দেখবার জন্যে আমন্ত্রণ করবেন। তাঁর সঙ্গে আমার কথা ছিল তিনি বিদ্যালয় দেখতে যাবেন। লোকটি যথার্থই ভাল— এবং আমার প্রতি ওঁর শ্রদ্ধা আছে। তার পরে আপনাদের ভূগোলের বইটা ওঁকে দেখালে নিশ্চয়ই তিনি মনোযোগ দেবেন— এ সম্বন্ধে তাঁকে স্বতন্ত্রভাবে কিছু লেখবার কোনো দরকার নেই। ম্যাকমিলানদের সঙ্গে আমার কি রকম এগ্রিমেণ্ট হয়েছে সে ত আপনি শুনেছেন— এটা যদি জমিয়ে তুল্‌তে পারা যায় তাহলে আমাদের কাজে লাগতে পারবে।

আমার বক্তৃতার পালা আপাতত শেষ হয়ে গেল। এগুলি এখানকার লোকদের মনে লেগেছে। রোটেনস্টাইন বলচেন এই বইটি বের হলে গীতাঞ্জলির মতই সমাদর লাভ করবে এবং প্রচুর বিক্রি হবে। এ হলে শান্তিনিকেতনের গঙ্গাজলেই শান্তিনিকেতনের পূজা হবে। ইংরেজি ভাষাটাকে নিয়ে যদি সহজে ব্যবহার করতে পারতুম তাহলে এখানে অনেকটা কাজ এগিয়ে দিয়ে যেতে পারতুম কিন্তু এ যাত্রায় সে আর হবে না। কোনোদিন যে এই শ্বেতদ্বীপের শ্বেতভূজার পূজা করিনি এই জন্যে তিনি আমাকে যেটুকু দয়া করেছেন তার মধ্যে কৃপণতা আছে— আমার ভারতের ভারতীর দয়াই আমার সম্বল। আমার

বাঙালী পাঠকদের কাছ থেকে মাঝে মাঝে চিঠি পাচ্চি তাতে তাঁরা লিখ্‌চেন যে আমার ইংরেজি তর্জ্জমা বাংলার চেয়ে ভাল হয়েছে। এমন কথা বলবার তাৎপর্য্য এই যে তাঁরা যে আমার লেখার যথেষ্ট সমাদর করেন নি তার কারণ আমার লেখা যথেষ্ট ভাল ছিল না। এ কথা যদি সত্যও হয় তাহলে আমার তরফে বলবার কথা এই যে, যেখানে ভাল লাগবার শক্তি ক্ষীণ সেখানে বাজিয়ের হাতে বীণা পুরোপুরি বাজে না।

এণ্ড্রুজ সাহেব হয় ত এতদিনে আপনাদের ওখানে গিয়েছেন। যাতে তিনি সমস্ত শক্তি দিয়ে কাজ করতে পারেন কোনো বাধা না পান সেদিকে দৃষ্টি রাখবেন। আমাদের মধ্যে যে সমস্ত ব্যাঘাত আছে সেগুলি তাঁর মধ্যস্থতায় কেটে যাবে এইটেই আশা করি। বাইরের দিক থেকে প্রীতির জোয়ার এসে পড়লে আমাদের ভিতরের দিককার সঙ্কীর্ণতা কেটে যাবে। আমরা যখন আপনাকে ছোট করে জানি তখন ছোট হয়ে যাই। বাইরের পূজার সাহায্যে আমাদের বিদ্যালয়ের বড় পরিচয় আমরা লাভ করতে পারব। এণ্ড্রুজ সাহেবকে আমার আন্তরিক প্রীতির অভিবাদন জানাবেন।

এণ্ড্রুজ সাহেব যখন এদেশে আমার সঙ্গে দেখা করেন তখন আমাকে আমার নিজের জীবনের ভিতরকার ইতিহাস সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন। আমি দু চারটে কথা তাঁকে বলেছিলুম। কিন্তু তার মধ্যে কোনো অহঙ্কারের সুর ছিল বলে আমার মনে পড়ে না। বস্তুত আমার জীবনের ইতিহাসের মধ্যে যে দীনতা আছে সে আমি কোনোদিনই ভুলি নে। যেমন করেই আমি নিজেকে দেখি না কেন এটা আমার স্পষ্ট চোখে পড়ে যে আমার মধ্যে ফুল যত ফুটল ফল তত ধরল না। আমার সাধনা কবিত্বলোকে এসে থেমেছে তার উপরে যেখানে শব্দহীন জ্যোতির্ম্ময়লোক সেখানে পৌঁছতে পারে নি। এই কারণে জীবনের সাধনা নিয়ে আমি অহঙ্কার করতে পারি নি। কিন্তু এণ্ড্রুজ সাহেব বোধ করি তাঁর প্রীতির আবেগে আমার পরিমাণ বাড়িয়ে লোকের কাছে ধরেছেন। এতে আমি বড়ই লজ্জা বোধ করি। য়েট্‌স্‌ প্রভৃতি সমালোচকেরা আমাকে সাহিত্যের নিক্তিতে ওজন করে যা বলেছেন তা ভুল হোক সত্য হোক তাতে আমার কিছু আসে যায় না— কেননা যে জিনিষটা বাইরে এসে পৌঁচেছে তার বিচার প্রত্যেকে নিজের বিচারশক্তির দ্বারাই সম্পন্ন করবেন এই হচ্চে প্রথা। কিন্তু আমার ভিতরের কথা আমার অন্তর্যামীই জানেন সেখানকার খবর দেবার বেলা খুব সাবধানে কথা কওয়া উচিত— সেখানে সকল প্রকার অত্যুক্তিই সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য। বরঞ্চ সেখানে খাটো করে কথা কওয়া কর্ত্তব্য। আমি যে কবি এ কথা বলতে আমার কোনো সঙ্কোচ নেই— আমি আমার রাজার দেউড়িতে রসুনচৌকি বাজাবার বায়না পেয়েছি এ কথা আমি নিজেই লোককে বলে বেড়িয়েছি— কিন্তু অন্দরে যে আমার বসবার আসন আছে এ কথা উচ্চারণ করবার জো নেই। আমি কবি কিন্তু আমি গুরু নই এ কথা বলে বলে আমি হয়রান হলুম— দয়া করে এ কথাটা আপনারা গ্রহণ করবেন এবং এণ্ড্রুজ সাহেবকেও আমার এই পরিচয়টা সমজিয়ে দেবেন।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০

ওঁ

প্রীতি নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

সেই নেপালি ছেলেটিকে বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করা যদি স্থির করেন তবে তার আহারের খরচের ভার কিছুতেই নেবেন না। দিনু যদি ওখানে না থাকে তাহলে কাজেই নলিনীকে লিখে অন্তত মাসিক দশ টাকা নেওয়া চাই।

দিনু চলে যাচ্চে শুনে আমার মন বড় ব্যথিত হল। দিনুর জন্যে এবং আমার বিদ্যালয়ের জন্যে। ওর দ্বারা বিদ্যালয়ের একটা খুব বড় উপকার হয়েচে সেটা আনন্দের দিক। ও যদি নিতান্তই আশ্রম ত্যাগ করে তা হলে ওর জায়গায় আমাকেই ভর্তি হতে হবে। কিন্তু আমার বয়স হয়ে গেছে, ওর মত শক্তি আমার নেই— তবু যে পদ খালি হল তার উমেদার রইলুম।

রথীর হাতে টাকা দিলুম, কাল কলকাতায় যাচ্ছে— হয় ত সোমবারে আপনাদের ৪৫০০ পাঠাতে পারবে। তার বেশি জুটল না। বেলগাছিয়া হাঁসপাতালে আমার কাছ থেকে ৫০০ টাকা ছিনিয়ে নিচ্চে এই জন্যে ৫০০০ টাকা পূরল না। যাই হোক্ এখন থেকে যাতে আর ঋণ না হয় সে চেষ্টা করতেই হবে— কারণ ম্যাকমিলানের হিসাবমত আগামী কিস্তিতে টাকা অতি সামান্য পাব।

কাল পতিসরে যাচ্চি। এ চিঠি পাওয়ার পর আমার চিঠি কেবলমাত্র দিন দুই পতিসরে পাঠিয়ে তার পরে কলকাতায় পাঠাবেন। পতিসরে বেশিদিন থাকা হবে না। বিদ্যালয়ের ছেলেরা আমার মন টান্‌চে।

এবার শরীর মনের অবসাদ এখনো আমাকে ছাড়ে নি। কিন্তু তাই বলে আর বসে থাকা চল্‌বে না। ইতি ৬ই ফাল্গুন ১৩২২

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১

ওঁ

সবিনয় নমস্কার নিবেদন,

নেপালবাবু এইবার প্রাচ্যের শেষ সীমারেখা লঙ্ঘন করে পশ্চিম অভিমুখে চলেচি। আমার তিন জন সঙ্গী ছিলেন, একজন দেশে ফিরলেন, একজন সেইখানে রইলেন, একজন আমার সঙ্গে পাড়ি দিচ্চেন। জাপানে এই ক'মাস বেশ আনন্দে কেটেচে। এত বেশী সম্মান এবং সমাদর অন্য কোথাও পাইনি। তার পরে একটা জিনিষ খুব অনুভব করেচি, এরা যতই য়ুরোপের নকল করুক না কেন আসল জায়গায় এরা আমাদেরই মত,— অর্থাৎ এরা সম্পূর্ণ ব্যবসাদার হয়ে যেতে পারেনি, এদের কাজ কারবার সমস্তই মানুষের ধরনে, কলের ধরনের নয়। বিশেষত এখানকার মেয়েরা যেমন সম্পূর্ণ মেয়েলি এমন আর কোথাও দেখিনি, ভক্তি শ্রদ্ধা সেবা ও মাধুর্য্যে এরা পরিপূর্ণ— যাই হোক্ আসল জায়গায় এরা আমাদের থেকে খুব বেশি তফাৎ নয়। এখানে আমার গৃহস্বামী আমার কাছ থেকে একটা কবিতা চেয়েছিলেন, আমি লিখে দিয়েচি—

সেই আমাদের দেশের পদ্ম তেমনি মধুর হেসে,
ফুটেচে ভাই অন্য নামে অন্য সুদূর দেশে।

আমার জীবনের শেষ ভাগে এই কথাটা বোঝ্‌বার জন্যেই আমি বেড়িয়েচি যে, সব দেশই আমার দেশ— এবং সকল দেশের ইতিহাসে জড়িয়ে মানুষের ইতিহাস তৈরি হচ্চে। কেউ বা দুঃখ দিচ্চে কেউ বা দুঃখ পাচ্চে কিন্তু মোট ফলটা সব এক জায়গায় গিয়ে উঠ্‌ছে— নানা সভ্যতা এবং নানা রাজ্য-সাম্রাজ্যের ভাঙ্গাগড়ায় মানব মহিমার এক বিরাট মন্দির তৈরী হচ্চে।

সর্ব্বাধ্যক্ষের পক্ষে একটা সুখবর এই যে পিয়ার্সন পণ করেচেন যে আমেরিকার ডলার দিয়ে তিনি আপনাদের এক হাঁসপাতাল তৈরি করে দেবেন। কিন্তু এখানকার একটি মেয়ে-কলেজ দেখে অবধি আমার কেবল মনে হচ্চে স্কুলের বাড়ীতে একটি ভাল রকমের মেয়েদের বিদ্যালয় খোলবার চেষ্টা করতে হবে। যদি অর্থসংগ্রহ হয়, তাহলে এইটেই সকলের আগে দরকার। আমার সেটা অসম্ভব বোধ হচ্ছে না। ইতি—৮ই ভাদ্র ১৩২৩।

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

১২

ওঁ

প্রীতিনমস্কার

আমার ইচ্ছা রামানন্দ বাবুকেই সেই ঘরখানি বিক্রয় করা হয়। তাঁহারা আশ্রমে থাকিলে আমাদের বিশেষ উপকার হইবে। জগদানন্দ নিতান্ত সস্তায় পাইবার জন্য বোধ হয় এতদিন অপেক্ষা করিতেছিলেন— কিন্তু নূতন বাড়ি তৈরী করা এখন তাঁর পক্ষে সহজসাধ্য। ক্ষিতীশবাবুকে লইয়া আমার চলিবে— অন্য উপযুক্ত লোক জুটিবে আশা আছে। শরীর মাঝে খারাপ ছিল এখন ভাল আছি।

লাইব্রেরি র‍্যাক সম্বন্ধে ছুটির পরে পরামর্শ করা যাইবে। একটা কথা এই যে, লাইব্রেরিতে বর্ত্তমানে যে আলমারি র‍্যাক প্রভৃতি আছে তাহা কি বিক্রি হইবে না? তাহার দ্বারা যদি কিছু খরচ উঠিয়া যায় তাহা হইলে এ কাজটা সারিয়া ফেলাই ত ভালো।

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩

ওঁ

বিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন

আশামুকুলকে শনিবারে যদি এখানে পাঠিয়ে দেন তাহলে ওকে নিয়ে ডাকঘরের রিহার্সালটা ঠিক করে নিই। বুধবারে অভিনয় হবে। জায়গায় জায়গায় ওর কাঁচা আছে— তাছাড়া ওর সঙ্গে মিলে না তালিম দিলে আমাদেরও কাঁচা থাকবে। তিন চার দিন রিহার্সাল দেওয়া দরকার হবে।

আশা করচি জাল কেটে বেরিয়ে পড়তে পারব। কালপরশুর মধ্যেই বোঝা যাবে। হাঙ্গামাটা

কাটলেই একবার আশ্রমে নিশ্চয়ই যাব। আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেচে। আমি বোধ হয় আসচে হপ্তায় ওখানে যেতে পারব অবশ্য যদি বেলা একটু ভাল থাকে।

সেই তালতড়ের জমির কথাটা ভুলবেন না। যতটা পরিমাণ সম্ভব বন্দোবস্ত করে নেবেন— ১০০ বিঘা দুশো বিঘা কিম্বা তার চেয়ে বেশি।

নূতন ঘর একটা যদি করতে চান তবে পাকা ঘরই করবেন কি? মাটির দেওয়াল ও টালির ছাতে ক্ষতি কি? নইলে ১৫।২০ জনের বাসের জন্যে অন্তত তিন চার হাজার টাকা খরচ করতে হবে। ইতি— বৃহস্পতিবার

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪

ওঁ

বিনয় নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন

কলকাতার গোলমালে ও ক্লান্তিতে চিঠি লেখা দুঃসাধ্য হয়েচে। তাই এতদিন লেখা হয়নি। নগেন বোধ হয় আপনার ঘর বদল সম্বন্ধে অভিমত জানিয়ে আপনাকে চিঠি লিখেচে।

বড়দাদাকে নিয়ে কয়দিন খুব উদ্বেগ গেছে। যা হোক্ এখন তিনি প্রতিদিন আরোগ্যের পথে অগ্রসর হচ্চেন। আর কোনো ভাবনার কারণ নেই।

বেলার শরীর একটু ভাল আছে। আজকাল তার চিকিৎসা প্রায় আমারই হাতে এইজন্যে তাকে ছেড়ে কোথাও যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেচে।

আপনি ত সেরে উঠেচেন— তবে আপনার বনবাসের মেয়াদ আর কতদিন? জীবনের শুনচি আগামীকাল অপারেশন— দীর্ঘকাল তাকে শয্যাগত থাকতে হবে। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ইংরেজি শিক্ষায় বিশেষ বাধা পড়ল। এর ক্ষতি বোধ হয় আর পূরণ হবে না।

আজ দ্বিপু আশ্রমে ফিরে যাচ্চেন তাঁর হাতে এই চিঠি দেওয়া গেল।

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫

ওঁ

প্রীতিনমস্কার

অত্যন্ত ক্লান্তি ও অবসাদ নিয়ে এখানে এসেছিলেম— এখানকার হাওয়ায় সেটা অনেকটা কেটে গেছে।

ডাক্তার মিস দত্তকে আমি যাওয়া পর্য্যন্ত যদি শান্তিনিকেতন দোতলায় রাখেন এবং সুকেশী তার খাওয়া দাওয়ার ভার নেন তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হই। বৌমাকে সেই মর্ম্মে চিঠি লিখেচি— আপনি যদি এর ব্যবস্থা করে দেন ত ভাল হয়।

নিত্যগোপালবাবুর দেনাটা আমি মাসখানেকের মধ্যে শোধ করবার ব্যবস্থা করব। ভাববেন না। আমি এদিককার কাজ সেরে এবং কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করে ওখানে গিয়ে পড়ব।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬

ওঁ

প্রীতি নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

উৎসবের দিনে আপনাকে স্মরণ করেচি। আমি একান্ত মনে কামনা করি আপনি নীরোগ হোন এবং আশ্রমে এসে শান্তি ও স্বাস্থ্য লাভ করুন। ইতি—১৩ মাঘ ১৩২৬

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭

ওঁ

Santi-Niketan
Bengal, India

সুহৃদ্বরেষু

আপনার সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়েছিল বোধ হয় আপনার কানে তা মাত্রা অতিক্রম করে পৌঁছিয়েছিল। আমি শুনেছিলুম আপনার অনুপস্থিতিকালে ছাত্রেরা চাঞ্চল্য প্রকাশ করেছিল। তাই আমি ক্ষিতিবাবুকে আমার সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গে নিয়ে যাবার সঙ্কল্প ত্যাগ করেছিলুম। তাঁকে বলেছিলুম, এখানকার চলতি কাজে আর ফাঁক পড়াতে চাইনে। আমি আপনার উপর দোষারোপ করতে চাইনি— কেবলমাত্র সাবধান হতে চেয়েছিলুম। আমি ত নিজেই নানা উপলক্ষ্যে কাজের মধ্যে ফাঁক পড়িয়ে থাকি। পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে কোনোদিন চিন্তাই করি নি। কতদিন আমোদ বা অভিনয় উপলক্ষ্যে আমি ক্লাস ভেঙে দিয়েছি। কিন্তু তখন আমাদের ছেলেমেয়েরা আমাদেরই ছিল। হাল আমলে নতুন নতুন আমদানিবশত সময় বদলে গেছে সেই কথাই পূর্ব্বোক্ত আলোচনায় আমার মনে প্রথম জাগল। আমার কাছেও হয় ত কথাটা মাত্রা ছাড়িয়ে পৌঁছেছিল— আপনার কাছেও তদ্রূপ। দেখা হলে আপনার সঙ্গে খোলসা আলোচনা করতে পারতুম— কিন্তু দীর্ঘকালের জন্যে চলে যাচ্চি বলে লিখে গেলুম। এই সামান্য কথায় কিছু মনে করবেন না। এখানকার ছাত্রদের চাঞ্চল্যের কথা শুনে আমি আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধেই ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম। আমি ত নতুন ছাত্রদের সঙ্গে ব্যবহার করতে ভয়ই পাই। এই কারণেই আমি শিক্ষাভবনের (College) উপর বিশেষ আকৃষ্ট নই— ওটাকে বাধা বলেই গণ্য করি। আপনারা এ দায় যখন ইচ্ছা করে গ্রহণ করেছেন তখন যথাযোগ্য উপায়ে এটাকে সীধা রাখবার চেষ্টা করবেন। ইতি

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮

ওঁ

Uttarayan
Santiniketan
Birbhum

সুহৃদ্বরেষু

আপনারা সকলেই মস্ত একটা ভুল করেছেন। শিক্ষাভবন সম্বন্ধে নূতন যে ব্যবস্থা প্রচার হয়েছে তাতে নিয়মরক্ষার জন্যে আমার স্বাক্ষর আছে মাত্র। আমি দায়ী নই ; চারুবাবুর পরে সম্পূর্ণ ভার দিয়েছিলেম। তিনি আমার সঙ্গে পরামর্শ মাত্র করেন নি। কী রকম ব্যবস্থা তাঁর মনঃপূত আমি কিছুই জানতেম না। জানার প্রয়োজনও ছিলনা— কেন না কর্ত্তৃত্ব তাঁরই। সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তৃত্ব থেকে আমি নিষ্কৃতি নিয়েছি। ইতিপূর্ব্বেও অনেক ব্যবস্থা আমার মনের মত হয় নি— কিন্তু নিয়মমত হয়েছিল— কখনো কখনো মুখে আপত্তি করলেও কাজে বাধা দিইনি। এখনো আমার সেই রীতি। পাঠভবনেও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছে আমাকে সই করতে হয়েছে কিন্তু তার প্রবর্ত্তন আমার দ্বারা একটুও হয় নি। নগেন আইচ সম্বন্ধে আপনার আপত্তি ছিল, আমার ছিল না, কিন্তু সম্মতিও আমার নয়। বর্ত্তমান ব্যাপারে আমি আগাগোড়া নির্লিপ্ত। রথীর কাছে আপনার চিঠি পাঠাই।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আপনি চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ ভেবেছি। আপনি যুদ্ধের ঝাঁজ মনে নিয়ে গেছেন তাতে ঠকবেন। এখন কোনো বিপ্লব ঘটাবেন না। তাতে সুফল হবে না। প্রশান্ত যদি পদত্যাগ করে তবে কিছুতেই কাজের শৃঙ্খলা থাকবে না— বৃহৎ কাজ— কারো পক্ষে হঠাৎ বুঝে নেওয়া শক্ত। পরিষদের মীটিঙে বৈধভাবে শান্তভাবে যা কর্ত্তব্য তা সাধন করবেন।

বিদ্যালয় আমি নিজের হাতে নিয়েছি। নিজের আইডিয়া খাটাব। কলেজ নিতে পারিনে কারণ কলেজের বাঁধা কাজ, য়ুনিভার্সিটির সঙ্গে একাত্ম। এ কথা ওরা হয় তো reasonably বল্‌তে পারে যে ভকীল, প্রেমসুন্দরবাবু প্রভৃতি যাঁরা আছেন তাঁরা কেউ কলেজের সঙ্গে ঠিকমত যুক্ত ছিলেন না— অপর পক্ষে ওঁরা নিজেরা সবাই কলেজী। অতএব কলেজের কাজে ওঁদের যোগ থাক্‌লে সেটা অযৌক্তিক হবেনা। বস্তুত কলেজটাকে ওঁরা সৃষ্টি করে তুলতে চান— তার দায়িত্ব আমরা কেউ নিতে পারিনে— আমার তো সাধ্যই নেই। কি পরিমাণে কি ভাবে ওঁদের যোগ থাকবে সেটা আলোচনা করতে পারেন।

আপনি মনকে যদি শান্ত না রাখেন তাহলে তর্কে বিতর্কে ভালো ফল হবে না। যুক্তি যখনি ব্যক্তিগত বিতণ্ডায় গিয়ে পৌঁছবে তখনি তাতে করে পরাভব ঘটবে।

যেটা অনিবার্য্য সেটাকে স্বীকার করে নিয়ে তার পরে কী করা যেতে পারে সেইটে ভেবে দেখা উচিত। আপনি তো পার্লামেন্টের ইতিহাস জানেন—ইংরেজের পলিটিক্স কম্প্রোমাইজের জাল দিয়ে বোনা—সেই জন্যেই ওরা এমন কৃতকার্য্য। আমরা অত্যন্ত বেশি লজিক নিয়ে কথা কাটাকাটি করি তাতে কাজ এগোয় না। জগতে কোনো জিনিষেরই শেষ মীমাংসা নেই—সেইজন্যেই নিশ্চিন্ত থাকা চাই যে আপাতত যেটাই ঘটুক্ না কেন সেটা যদি অসঙ্গত হয় তবে ক্রমে ক্রমে বারবার চেষ্টায় তাকে সংশোধিত করা যায়। কিন্তু সে জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ ধৈর্য্য চাই। ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটলে নিশ্চিত পরাভব। স্থিরভাবে কাজ করবেন—আপাতত আপনাদের পরাভব ঘটলেও অতিমাত্র বিচলিত হবেন না। ইতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০

ওঁ

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন

আমি যে বাজেট শিরোধার্য্য করে কাজে নেমেছিলুম এখন দেখচি তার সীমা লঙ্ঘন করা হয়েচে—তা ছাড়া কোনো আকস্মিক ব্যয়ের যোগ্য উদ্বৃত্ত অর্থ কিছুমাত্র বাকি নেই। এ স্থলে আপনি বৃত্তিসম্বন্ধে কি পরিমাণে ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত জানাবেন। ইতি ২৫ আশ্বিন ১৩৩৫

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১

ওঁ

প্রীতিসম্ভাষণমেতৎ

কমলার মেয়ে হয়েচে এ সংবাদ আপনার এখানকার নাতনীদের কাছ থেকে পূর্ব্বেই শুনেছি। তার জ্বরের সংবাদ শুনে উদ্বিগ্ন রইলুম। আশা করি আরোগ্যলাভ করতে দুঃখ পেতে হবেনা।

হারাসান বার বার জ্বরে পড়াতে আমাকে কিছুদিন থেকে উৎকণ্ঠা ভোগ করতে হয়েচে। আজ অনেকদিন পরে সে ভালো হয়েচে—আশা করি আর জ্বর আসবেনা।

দীর্ঘকাল নিরন্তর বাদল চলছিল। রৌদ্র দেখা দিয়েচে। বাতাসে একটু শরতের স্পর্শ পাওয়া যাচ্চে। আমি ভালই আছি। ইতি ৪ কার্ত্তিক ১৩৩৬

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২

শান্তিনিকেতন

প্রীতিনমস্কার—

এবার নববর্ষারম্ভের উৎসবে আপনি উপস্থিত থাকতে পারেন নি। এমন বোধ হয় আর কখনো ঘটেনি। মন্দির থেকে বেরিয়ে চিরাভ্যাসমতো মন আপনাকে প্রত্যাশা করেছিল— পরক্ষণেই আপনার অনুপস্থিতির বেদনা চিত্তকে কঠিন আঘাত করল। জানি দূরে রোগশয্যা থেকেই আপনার ধ্যানের সত্তা আমাদের সকলের নিকটেই ছিল। আমার সর্ব্বান্তঃকরণের শুভকামনা আপনি গ্রহণ করুন।

এই মাসের শেষভাগে সিংহল যাত্রা করতে হবে। তারি উদ্যোগ চলচে। কিছু আহরণ করে আনতে পারব কিনা জানি নে। নানা ব্যর্থ পরীক্ষার পর দেখা গেল আমাদের ভিক্ষার ঝুলি এই নাচ গান। এই উপায়ে অল্প পরিমাণ অর্থ ও বহুল পরিমাণ লোকনিন্দা সংগ্রহ করে আনি। ছেলে-মেয়েরা খুসি আছে দেশ দেখা ও সমুদ্রযাত্রার এই সুযোগে। কিছু যদি না পাই অন্তত এইই হবে পুরস্কার। ফিরে যখন আসব তখন আপনি বল লাভ করে শয্যা ছেড়ে উঠ্‌তে পেরেছেন এই যেন দেখতে পাই— অনেকদিন উদ্বেগ ভোগ করেছি। ইতি ৩ বৈশাখ ১৩৪১

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৩

ওঁ

সবিনয় নমস্কার

বৃহস্পতিবার সকালে রওনা হব বিকালে পৌঁছব— আশা করি এর আর অন্যথা হবে না। যান-বাহনের ব্যবস্থা করবেন। দিনুরা বোধহয় শনিবারের আগে যেতে পারবেনা। ইতি বুধবার

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৪

ওঁ

প্রীতিসম্ভাষণমেতৎ

আপনার প্লানগুলি ভালই ঠেকচে। শীঘ্র এসে মোকাবিলায় মীমাংসা করবেন।

কলকাতায় এসেছি— প্রায় জ্যৈষ্ঠের শেষ পর্য্যন্ত থাকতে হবে। ইতি

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নেপালচন্দ্র রায়

পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ধ্যানে ও কল্পনায় শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের জন্যে এমন গুরুর আবির্ভাব কামনা করেছিলেন যাঁর জীবনচর্যা ছাত্রের জীবনাদর্শ হয়ে উঠবে— যাঁর জ্ঞানশিখায় তার জ্ঞানালোক প্রজ্বলিত হবে, আর যাঁর স্নেহ ও প্রীতির দাক্ষিণ্য ছাত্রের কল্যাণসাধন করবে। রবীন্দ্রনাথের সৌভাগ্য তিনি বিদ্যালয়-সৃষ্টির সংকল্পনাকে রূপদানের কাজে এমন কয়েকজন সহৃদয় শিক্ষককে সহচর পেয়েছিলেন যাঁদের মধ্যে দিয়ে তাঁর কল্পিত-গুরুর আদর্শ মূর্ত হয়ে উঠেছিল। সেই শিক্ষাগুরুরা রবীন্দ্রনাথের আশ্রমবিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর পরিকল্পনায় আর পরিচালনায় সর্বতোভাবে নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন। কোনো প্রতিষ্ঠানই একক প্রচেষ্টায় সার্থক হয়ে ওঠে না— একা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ 'বিমূর্ত কবিতা' রচনা করা— শান্তিনিকেতনকে সৃষ্টি করা— সম্ভব হত না যদি-না তিনি অমনি একদল নিবেদিত-প্রাণ শিক্ষকের সাহচর্য লাভ করতেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন— রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞাপন দিয়ে তাঁর বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ করেন নি, যথার্থ শিক্ষককে খুঁজে বের করেছেন, যোগ্য ব্যক্তিকে শিক্ষকে পরিণত করেছেন। সেই শিক্ষকেরাও নিজেদের সৃষ্টি করেছেন, রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে ও প্রেরণায় তাঁরা শান্তিনিকেতনকে সেবা করার উপযুক্ত হয়ে উঠেছেন। তাঁরা আত্মত্যাগের মহিমা উজ্জ্বলভাবে সামনে রেখে কবির সাধনায় যোগ দিয়েছেন— 'আপন আপন শক্তি ও স্বভাবের বিশিষ্টতা অনুসারে' আশ্রমপ্রতিষ্ঠাতার সহায়ক হয়েছেন। সেই আদর্শ শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম স্মরণীয় হলেন নেপালচন্দ্র রায়— যিনি শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর গঠনপর্বে নিপুণ স্থপতির ভূমিকা নিয়েছিলেন।

নেপালচন্দ্র রায়ের পৈতৃক-নিবাস ছিল খুলনা জেলার মূলঘর গ্রামে। যশোহররাজ প্রতাপাদিত্যের অধীন অতিপ্রাচীন সামন্ত বৈদ্যভূস্বামী জানকীবল্লভ রায়চৌধুরীর বংশধর স্বনামধন্য কবিরাজ প্রাণনাথ রায়চৌধুরী নেপালচন্দ্রের পিতামহ। আর পিতার নাম কাশীনাথ রায়চৌধুরী। ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের ৪ অক্টোবর (১২৭৪ বঙ্গাব্দের ১৯ আশ্বিন) মাতুলালয় সেনহাটি গ্রামে নেপালচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জননী নিত্যময়ী দেবী বহুগুণান্বিতা রমণী ছিলেন। শতবর্ষ-পূর্বে সুদূর পল্লী-গ্রামবাসিনী এই অসামান্যা মহিলা সনিষ্ঠভাবে বিদ্যাচর্চা করে নিজেকে শিক্ষিতা করে তুলেছিলেন। পুত্রকন্যাদের শিক্ষাদানের প্রতি তাঁর সুগভীর আগ্রহ ছিল। জননীর কাছ থেকে নেপালচন্দ্র কর্তব্য-পরায়ণতা পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি গুণাবলী লাভ করেন। পিতামহ প্রাণনাথ রায়চৌধুরীও ছিলেন তেজস্বী ও পবিত্রহৃদয়ের অধিকারী। ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত উদার মনোভাবাপন্ন ছিলেন। পিতা কাশীনাথ ছিলেন বিদ্যোৎসাহী ও পরোপকারী পুরুষ। নেপালচন্দ্রের জীবনে পিতা-পিতামহ ও জননীর প্রভাব সুদৃঢ়ভাবে পড়ে। আর-এক জন আত্মীয়-পুরুষ— যিনি নেপালচন্দ্রের শিক্ষাগুরুও ছিলেন— সেই অগ্রজপ্রতিম উমেশচন্দ্র রায়চৌধুরী নেপালচন্দ্রের জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেন। উমেশ-চন্দ্রের জননী ছিলেন নেপালচন্দ্রের শ্রদ্ধার পাত্রী। স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে এই মহিয়সী মহিলার দানের কথা নেপালচন্দ্র পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের কাছেও উল্লেখ করেছিলেন।

নেপালচন্দ্রের শৈশব অতিবাহিত হয় স্বগ্রাম মূলঘরে। গ্রামের পাঠশালায় তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হলে স্থানীয় টোলে তিনি সংস্কৃত শেখেন। পরে ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে মূলঘরের মধ্য-ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে বৃত্তি-সহ উত্তীর্ণ হয়ে খুলনা জেলা স্কুলে ভর্তি হন। ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের চিকিৎসক কলকাতার সুবিখ্যাত কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের দৌহিত্রী বিনোদিনী দেবীর সঙ্গে নেপালচন্দ্রের বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিনোদিনী ছিলেন রূপবতী ও গুণবতী মহিলা। অতিথি-সেবা ও সাংসারিক ব্রত পালনে তিনি নিজেকে নিযুক্ত রাখতেন।

খুলনা জেলা স্কুলে পড়ার সময়েই নেপালচন্দ্র 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের রচনার সঙ্গে সর্বপ্রথম পরিচিত হন। যখন তিনি নবম শ্রেণীর ছাত্র তখন রবীন্দ্রনাথের 'বৌঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসটিকে নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয়ের আয়োজন করেন। তা ছাড়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত খুলনা-বরিশাল স্টীমার সারভিসে যাত্রীসংগ্রহের জন্যে স্বেচ্ছাসেবকের কাজও করেন। বিদেশী কোম্পানী -পরিচালিত স্টীমার-সারভিসের সঙ্গে প্রতিযোগিতা উপলক্ষে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক নেপালচন্দ্রের পরিচয় ঘটে। স্বাদেশিকতাবোধে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে এই তরুণ ছাত্রটি সে সময়ে আবার ইলবার্ট বিল ও সরকারের ছাত্রদমননীতির প্রতিবাদে আন্দোলন করেন এবং তার ফলে সরকারী জেলা স্কুলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়।

১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নেপালচন্দ্র উচ্চশিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশে কলকাতায় আসেন এবং আত্মীয়-বাড়িতে থেকে পড়াশুনো শুরু করেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি রবীন্দ্রানুরাগী। কলকাতায় আসার ফলে সেই অনুরাগ আরও বেড়ে যায়। তৃতীয়বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালে ১৮৮৭ সালে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে অনুষ্ঠিত মাঘোৎসবে যোগ দিয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথকে একত্র দেখার সুযোগ পান নেপালচন্দ্র। বৌবাজারের সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন হলে বাল্যবিবাহের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দুবিবাহ' নামে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন সে সভাতেও নেপালচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। এই সময়ে তাঁর স্বগ্রামে একদল দুর্বৃত্ত কোনো-এক মহিলাকে অপমান ও নিগ্রহ করলে চতুর্থবার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র নেপালচন্দ্র তার প্রতিকারের জন্য সচেষ্ট হন। সেই উপলক্ষে তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কৃষ্ণকুমার মিত্রের সান্নিধ্যে আসেন। ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে ফ্রী চার্চ ইনস্‌টিটিউশন থেকে নেপালচন্দ্র এফ.এ. এবং ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে জেনারেল এসেম্‌বলি থেকে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

বি.এ. পাস করার পর নেপালচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে মনোনয়ন পেলেও তা প্রত্যাখ্যান ক'রে স্বগ্রামের মধ্য-ইংরেজি বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধনে ব্রতী হন এবং বিদ্যালয়টিকে উচ্চ-ইংরেজি বিদ্যালয়ে উন্নীত করে প্রতিষ্ঠাতা-প্রধানশিক্ষক রূপে শিক্ষাদানের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। অবশ্য অল্পকালের মধ্যেই প্রাচীনপন্থী গ্রামবাসীদের সঙ্গে তাঁর মতান্তর ও বিরোধ ঘটে। প্রগতিবাদী যুবক প্রধানশিক্ষক জাতিভেদ-প্রথা অগ্রাহ্য করে জনৈক ভিন্নজাতীয় বন্ধুর বাড়িতে আহার করেন এবং তার ফলেই রক্ষণশীল আত্মীয়-সমাজের তাড়নায় তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। যেদিন প্রায়শ্চিত্ত করেন সেই রাত্রেই নেপালচন্দ্র গ্রাম ত্যাগ করে কলকাতায় আসেন এবং বরানগরে সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় -প্রতিষ্ঠিত হিন্দু বিধবাশ্রম ও বোর্ডিং বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক নিযুক্ত হন।

কলকাতা-বাসের ফলে নেপালচন্দ্রের আবার সুযোগ ঘটল রবীন্দ্র-পরিবেশের সান্নিধ্য লাভের। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের ২৬ এপরিল এলবার্ট হলে উনত্রিশ বছরের যুবক রবীন্দ্রনাথ তদানীন্তন ভারতসচিব লর্ড ক্রসের বিলের প্রতিবাদে যে-ভাষণ দেন তা তেইশ বছর বয়স্ক রবীন্দ্রানুরাগী যুবক নেপালচন্দ্রকে মুগ্ধ করে। এই সময়েই তিনি পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হন। শাস্ত্রী-মহাশয়ের জীবন ও চরিত্রের প্রভাবে আর ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণকর দেশপ্রেমের আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে নেপালচন্দ্র ঐ বছরেই ২০ জুলাই এলবিয়ান রাজকুমার ব্যানারজির উদ্যোগে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষাদাতা ছিলেন স্বয়ং শিবনাথ শাস্ত্রী। ওদিকে তিনি মেরী কারপেনটারের সান্নিধ্যলাভ করেছেন একই সময়ে। তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা ও শিক্ষণ-বিষয়ে নানা অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছেন। আবার, যে-গ্রাম থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন তিনি সেই গ্রামেরই বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণের জন্যে অর্থসংগ্রহের কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে শিবনাথ শাস্ত্রী -কর্তৃক ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হলে নেপালচন্দ্র ঐ বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। স্বল্পকাল পরেই স্বগ্রামের হিতৈষী বন্ধুগণের অনুরোধে আবার তিনি মূলঘরের বিদ্যালয়ে প্রধানশিক্ষকের পদে যোগ দেন। ১৮৯২-৯৬ এই কয় বছর একদিকে বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধন, অন্যদিকে গ্রাম-উন্নয়নের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা-প্রসারের জন্যে একটি বালিকা বিদ্যালয়ও তিনি স্থাপন করেন। তাঁর সুপরিচালনায় বিদ্যালয়ের খ্যাতি দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে যায়। গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে ছাত্ররা শিক্ষালাভের উদ্দেশে মূলঘরের বিদ্যালয়ে যোগ দেয়। এই সময়েই নেপালচন্দ্রের ছাত্র ছিলেন নিশিকান্ত সেন, যিনি একদা দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় ও পরবর্তী যুগে বিশ্বভারতীর কর্মসচিব-পদে বৃত ছিলেন। গ্রামকল্যাণের কাজে নেপালচন্দ্র যতই নিঃস্বার্থভাবে কাজ করুন-না কেন— রক্ষণশীল প্রগতিবিরোধী-গ্রামবাসীদের সঙ্গে তাঁর আবার সংঘর্ষ ঘটল। জনৈক নমঃশূদ্র ছাত্রকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করার ফলে সংঘর্ষের সূত্রপাত। উচ্চবর্ণের হিন্দু ছাত্রদের সঙ্গে একই আসনে নমঃশূদ্র ছাত্র বিদ্যাচর্চা করবে এই অবস্থায় প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীল সমাজের বিরাগভাজন হন নেপালচন্দ্র। ফলে, আবার তাঁকে পৈতৃক গ্রাম ছাড়তে হল। কলকাতায় এসে তিনি সিটি স্কুলে শিক্ষক রূপে যোগ দিলেন। এখানে তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অজিতকুমার চক্রবর্তী, দেবেন্দ্রমোহন বসু প্রমুখ আরও অনেকে। ১৮৯৬ থেকে ১৯০১ পর্যন্ত সিটি স্কুলে তাঁর শিক্ষক-জীবন অতিবাহিত হয়।

সিটি স্কুল থেকে নেপালচন্দ্র যান এলাহাবাদের অ্যাংলো বেঙ্গলি স্কুলের প্রধানশিক্ষকের কাজ নিয়ে। সেখানেই তাঁর সঙ্গে প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচয় ঘটে এবং রামানন্দবাবুর পরিবারস্থ সকলের প্রীতিমধুর সম্পর্ক নেপালচন্দ্রের প্রবাসজীবনকে আনন্দময় করে রাখে। নেপালচন্দ্রের নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের ফলে অ্যাংলো বেঙ্গলি স্কুল অল্পকালের মধ্যেই আদর্শ বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। প্রধানশিক্ষকের স্নেহপ্রবণ ও ক্ষমাশীল হৃদয়, অন্যদিকে কঠোর শৃঙ্খলাবোধ অচিরেই ছাত্রসমাজকে প্রভাবিত করে। প্রাক্তন ছাত্র শ্রীজীবনময় রায়ের ভাষায় 'নেপালচন্দ্র রায় ছিলেন আমাদের প্রধানশিক্ষক। প্রধানশিক্ষক না আমাদের প্রধানসঙ্গী ও বন্ধু তাহা আমরা বুঝিতে পারিতাম না'। ছাত্রসুহৃৎ, জনহিতৈষী ও দেশপ্রেমিক নেপালচন্দ্র কিছুকালের মধ্যে উত্তর-প্রদেশের তদানীন্তন শাসক-সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হন। ১৯০৯ সালের কথা। রবীন্দ্রনাথ এলাহবাদে উপস্থিত হলে নেপালচন্দ্রের অনুরোধে অ্যাংলো স্কুল পরিদর্শনে যান এবং সেখানে ভাষণ দেন। এই ঘটনাটিও নাকি ইংরেজ শাসকের দল সুনজরে দেখেন নি। কারণ বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের

প্রধান পুরোহিত রবীন্দ্রনাথ তখন উত্তর-প্রদেশ সরকারের চোখে 'বিদ্রোহী বাঙালি-কবি' মাত্র। যাই হোক, রাজনৈতিক কারণেই গভরনর সার্ জন হিউয়েট নেপালচন্দ্রকে এলাহাবাদ ত্যাগ করতে আদেশ দেন। সে মাসেই নেপালচন্দ্র এলাহাবাদ ছেড়ে কলকাতা ফিরলেন। এলাহাবাদের ছাত্রসমাজের কাছে তিনি যে কতখানি প্রিয় ছিলেন তার দৃষ্টান্তস্বরূপ আবার ঐ প্রাক্তন ছাত্রের লেখা উদ্‌ধৃত করি: 'এখনও মনে আছে, তাঁহার [নেপালচন্দ্রের] দেশহিতৈষণা ও তেজস্বিতার জন্য লাট হিউয়েটের কৃপায় যেদিন তাঁহাকে কর্ম পরিত্যাগ করিয়া এলাহাবাদ হইতে চলিয়া আসিতে হয় সেদিন তাঁহার সমস্ত প্রাক্তন ও তদানীন্তন ছাত্রমণ্ডলী স্টেশনে আসিয়া জমায়েত হইয়াছিল। পুলিশ সেদিন ছাত্রদের হাবভাব দেখিয়া খুব স্বস্তিতে ছিল না।'

এলাহাবাদ থেকে কলকাতায় এসে নেপালচন্দ্র রিপন কলেজিয়েট স্কুলে সহকারী প্রধানশিক্ষকের পদে যোগ দেন। কিন্তু স্বাধীনভাবে জীবিকার্জনের বাসনা হওয়ায় তিনি আইন পরীক্ষায় বসেন ও সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। তখন ১৯১০ সাল। শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের বিশিষ্ট শিক্ষক ও নেপালচন্দ্রের প্রাক্তন ছাত্র অজিতচন্দ্র চক্রবর্তীর ইংলণ্ড যাওয়া স্থির হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীদের জন্যে একজন অভিজ্ঞ শিক্ষকের সন্ধান করছেন— এমন সময়ে অজিতচন্দ্রেরই বিবাহ-সভায় নেপালচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। রবীন্দ্রনাথ নেপালচন্দ্রকে বলেন, 'শুনলাম, আপনি এখন lawতে লীন আছেন। অজিত বিদেশে যাচ্ছে, ওর জায়গায় আপনি আমার বিদ্যালয়ে যদি কিছুদিন অধ্যাপনা করেন তবে নিশ্চিন্ত হই।' নেপালচন্দ্র তখন হাইকোর্টে ওকালতি ব্যবসায় শুরু করবার জন্যে প্রস্তুত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারলেন না। ১৯১০এর ২৭ জুন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক রূপে শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দিলেন। মাত্র ছ মাসের জন্যে, কিন্তু ছ মাসের পরিবর্তে তা হয়ে দাঁড়াল পঁচিশ বছর। রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে যাওয়া তাঁর কর্মজীবনে আর সম্ভব হয় নি। পঁচিশ বছর ধরে এই আশ্রম ও বিশ্বভারতীর সেবা করে ১৯৩৫ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথেরও বোধ হয় অভিপ্রায় ছিল নেপালচন্দ্রকে তাঁর আশ্রমে চিরস্থায়ী করতে। নেপালচন্দ্রের যোগদানের কিছুদিন পরেই ১৩১৭ সালের ৯ শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথ রামানন্দবাবুকে লিখছেন, 'নেপালবাবু কিছু দিনের জন্য এখানকার অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করাতে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। সেই কিছুকালের মেয়াদ যদি ক্রমে বাড়িয়া চলিতে থাকে তবে আরো আনন্দের কারণ হইবে।'

শান্তিনিকেতনের কাজে নেপালচন্দ্রকে বিভিন্ন সময়ে বিশিষ্ট ও দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। এখানেই তিনি যেন তাঁর কাজের যোগ্যস্থানটি খুঁজে পেয়েছিলেন। সে যুগে শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকেরা শান্তিনিকেতন-জীবনের প্রতিটি ঘটনা ও অনুষ্ঠানের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকতেন। তাঁদের মতোই নেপালচন্দ্র যেমন ম্যাট্রিকুলেশন-ক্লাসে ইংরেজি আর ইতিহাস পড়িয়েছেন, তেমনি আবার পুজোর ছুটিতে প্রায়শ্চিত্ত নাটকে রামমোহনের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। শিক্ষক রূপে নেপালচন্দ্র ছাত্রদের হৃদয় জয় করেছিলেন। তা ছাড়া পড়াশুনোয় খেলাধুলোয় সাহিত্যসভায়, বৈতালিক অনুষ্ঠানে, আশ্রম-সম্মিলনীর অধিবেশনে, নাট্যাভিনয়ে, ছাত্রদের সঙ্গে রাস্তানির্মাণের কাজে কিংবা অধ্যাপকমণ্ডলীতে নেপালচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। কখনও তিনি সভাপতি কিংবা বক্তা, আবার কখনও উপদেষ্টা কিংবা উৎসাহী দর্শক। শান্তিনিকেতনের সেই গৌরবময় যুগে যেসব শিক্ষক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য

আত্মদান করেছিলেন নেপালচন্দ্র তাঁদেরই একজন প্রতিনিধি রূপে স্মরণীয় হয়ে আছেন। বালক-বৃদ্ধ ছাত্র-শিক্ষক সকলের কাছেই ছিল তাঁর সমাদর। 'পাড়ার যত ছেলে এবং বুড়ো সবার আমি একবয়সী জেনো'— এ কথা বোধ হয় নেপালচন্দ্রও বলতে পারতেন।

রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছায় নেপালচন্দ্র আবার ছোটদের জন্যে আয়োজিত বুধবারের উপাসনায় ভাষণ দিতেন। শ্রীজীবনময় রায় প্রসঙ্গ পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, তিনি তখন শান্তিনিকেতনে কর্মী হয়েছেন, তিনি লিখছেন, 'মন্দিরের উপাসনার সময় দেখিয়াছি নেপালবাবু সুকুমারমতি বালকদের চরিত্রগঠনের উপযোগী করিয়া অতি সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় ম্যাট্‌সিনি গ্যারিবল্‌ডি নেলসন প্রভৃতি দেশভক্তদের বীরত্বগল্প, হ্যারো এবং ইটনের মধ্যে ক্রিকেট-প্রতিযোগিতার চাঞ্চল্যকর গল্প এবং অন্যান্য দেশী এবং বিদেশী মহাপুরুষদের জীবনী হইতে চিত্তাকর্ষক গল্পগুলির মাধ্যমে অতি নিপুণভাবে হৃদয়গ্রাহী উপদেশ দিতেন। ছেলেরা মন্দিরে অতি আশ্চর্যজনকভাবে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ঐ সব চমকপ্রদ গল্প শ্রবণ করিত।'

শিশু ও স্বল্পবয়সী ছাত্ররা নেপালবাবুকে 'দাদামশাই' ব'লে সম্বোধন করত। দাদামশাইয়ের কাছে তাদের অজস্র আবদার— খেজুরের রস খেতে গোয়ালপাড়া যাওয়া, কঙ্কালীতলার মেলায় কিংবা লাভপুরের ফুল্লরার পীঠস্থানে বেড়াতে যাওয়ার ব্যাপারে তারা দাদামশাইয়ের দ্বারস্থ হত। নেপালবাবুই সঙ্গী হতেন তাদের।

যেমন শিশুদের আসরে তেমনি আবার প্রবীণদের সভায় নেপালচন্দ্র বিশিষ্ট ভূমিকা নিতেন। আশ্রম-পরিচালনার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ ও রথীন্দ্রনাথ তাঁর কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করতেন। শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দেওয়ার পরের বছরেই রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন তাঁর উপরে বুধবারের উপাসনা পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি আশ্রমের আর্থিক ব্যাপারে দ্বিপেন্দ্রনাথকে সহায়তা করবার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখেছেন। ছাত্রদের স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন, আশ্রম-সম্মিলনীর সৃষ্টি ও তৎসংক্রান্ত উপবিধি প্রণয়নের কাজে রবীন্দ্রনাথের সহায়ক ছিলেন নেপালচন্দ্র। আইন-সংবিধান প্রভৃতি রচনায় তাঁর নৈপুণ্য ছিল। সেজন্যই বোধহয় পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনের চা-চক্র ও তার সভ্যদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে-গান রচনা করেন তা'তে নেপালবাবুকে constitution-বিশারদ বলে উল্লেখ করেছেন।

১৯১৩ সালে নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির টেলিগ্রাম রবীন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছলে তিনি সর্বপ্রথম তা নেপালবাবুর হাতেই তুলে দিয়ে বলেন, 'নিন্ নেপালবাবু, আপনার ড্রেন তৈরি করবার টাকা'। আর্থিক-সংকট থেকে সহকর্মীকে ত্রাণ করার জন্যে রবীন্দ্রনাথের উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করার মতো। সেইসঙ্গে নেপালবাবু যে কবির কতখানি অন্তরঙ্গ ও বিশ্বস্ত হয়ে উঠেছিলেন তাও অনুভব করা যায়; আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন লিখেছেন মেয়েদের শিক্ষাবিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে নেপালবাবুর মতামত নিতেন। মোট তিনবার— ১৯১৪, ১৯১৬ ও ১৯১৭— নেপালবাবু আশ্রমের সর্বাধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। শিক্ষাভবনের উপাধ্যক্ষ হন ১৯২৫এ, আর ১৯৩২-৩৫ সালে অধ্যক্ষের পদে তিনি আসীন ছিলেন। এরই মাঝে ১৯২৬এ আবার তাঁকে আশ্রম-সচিবের দায়িত্বও পালন করতে হয়। ১৯২৮এ রবীন্দ্রনাথ নেপালচন্দ্রকে তাঁর মন্ত্রণাসভার সভ্য মনোনীত করেন। এইভাবে শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে নেপালবাবু অনেক ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতা করেন। তাঁর এই নিবেদিত-জীবনের পরিচয় মেলে

তাঁর বিচিত্র কর্মধারায় ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজনের মধ্যে দিয়ে। নেপালচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশবর্ষ-পূর্তি জন্মোৎসব সাফল্যমণ্ডিত করতে যুবকের ন্যায় পরিশ্রম করেছেন, উৎসবের অন্যতম আচার্যও হয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে কলকাতার আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্যের আসনে বসেছেন। দক্ষিণ-আফরিকায় গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সমর্থনে আশ্রম-সম্মিলনী-আয়োজিত সভায় পৌরোহিত্য করেছেন, পদব্রজে রথীন্দ্রনাথ দিনেন্দ্রনাথ সুধাকান্ত নরভূপরাও ও মুকুলদের সঙ্গে কেদারবদরী-পরিক্রমায় বেরিয়েছেন, আমেরিকা-প্রত্যাগত রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনার জন্যে 'নতুন পথ' (বর্তমানের 'নেপাল রোড') নির্মাণ করেছেন, শান্তিনিকেতনে সমবায় ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছেন, ১৯২১ সালে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কলেজ-ত্যাগী ছাত্রদের সঙ্গে সুরুলে গ্রামোন্নয়নের কাজে নেমেছেন। আবার, তারই মাঝে চলছে ইতিহাসের অধ্যাপনা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের খাতা পরীক্ষা করা, ঠাকুর-পরিবারের জমিদারি-বাঁটোয়ারা দলিলের অন্যতম সাক্ষী হওয়া, কিংবা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পূর্ববঙ্গ-ভ্রমণ। এমন ঘটনা ও কর্ম-বহুল জীবনের ফাঁকে ফাঁকে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্যে তিনি লিখেছেন 'প্রথম শিক্ষা ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৯১১), 'শিশুরঞ্জন ভূপরিচয়' (১৯২০), কিংবা 'প্রাথমিক ভূ-পরিচয়'।

১৯৩৫ সালে নেপালচন্দ্র শান্তিনিকেতনের কাজ থেকে অবসর নেন। প্রাক্তন অধ্যাপক ও নেপালবাবুর সহকর্মী শ্রদ্ধেয় প্রমদারঞ্জন ঘোষ তাঁর 'আমার দেখা রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর শান্তিনিকেতন' বইয়ে লিখেছেন বিশ্বভারতীর আর্থিক সংকট মোচনের উদ্দেশে নেপালবাবুই প্রস্তাব করেছিলেন— যাঁদের বয়স ষাট অতিক্রম করেছে এবং যাঁদের বেতন স্বাভাবিক ভাবে অন্যের তুলনায় কিছু বেশি তাঁরা স্বেচ্ছায় অবসরগ্রহণ করলে সুবিধা হয়। সেই প্রস্তাবানুসারে অবসর নিলেন জগদানন্দ রায়, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নেপালবাবু স্বয়ং।

শান্তিনিকেতনের অধ্যাপনার কাজ থেকে অবসর নিলেও এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগ কখনও ছিন্ন হয় নি। বিশ্বভারতীর বিভিন্ন সমিতি-উপসমিতির সদস্য রূপে তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর প্রতিষ্ঠানের সেবা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই অন্তরঙ্গ সহচরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য কিভাবে কামনা করতেন তার পরিচয় পাই একখানি চিঠিতে। ১৩৪১এর নববর্ষ উৎসবের পর তেসরা বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ নেপালচন্দ্রকে লিখছেন,— 'এবার নববর্ষারম্ভের উৎসবে আপনি উপস্থিত থাকতে পারেন নি। এমন বোধ হয় আর কখনো ঘটেনি। মন্দির থেকে বেরিয়ে চিরাভ্যাসমতো মন আপনাকে প্রত্যাশা করেছিল— পরক্ষণেই আপনার অনুপস্থিতির বেদনা চিত্তকে কঠিন আঘাত করল। জানি, দূরে রোগশয্যা থেকেই আপনার ধ্যানের সত্তা আমাদের সকলের নিকটেই ছিল। আমার সর্বান্তঃকরণের শুভকামনা আপনি গ্রহণ করুন।'

শান্তিনিকেতনের কাজ থেকে অবসর-গ্রহণের পর নেপালবাবু আরও বৃহত্তর ব্যাপকতর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন। শেষজীবনে তিনি সক্রিয়ভাবে দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। রাজনীতি ও স্বাধীনতা-আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক প্রথমজীবন থেকেই। গান্ধীজীর অসহযোগ-আন্দোলনে তাঁর যোগ দেওয়ার কথা আগেও উল্লেখ করেছি। ১৯২৪ সালে সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় রাষ্ট্রসম্মিলনীতে 'ডে' সাহেবের হত্যাকারী গোপীনাথ সাহা সংক্রান্ত প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন অহিংসামন্ত্রে বিশ্বাসী নেপালচন্দ্র। ফলে, একদিকে তাঁকে বিদ্রূপ ও অপমান সহ্য করতে

হয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি পুরস্কার স্বরূপ অভিনন্দন লাভ করেছিলেন স্বয়ং মহাত্মাজী, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও দীনবন্ধু এন্‌ড্রুজের কাছ থেকে। সুদূর চীন থেকে দীনবন্ধু নেপালবাবুকে শুভেচ্ছা-অভিনন্দন পাঠান। মহাত্মাজী কলকাতায় এলে বাংলাদেশে কংগ্রেসের সম্মান রক্ষা করেছেন বলে আনন্দে অভিভূত হয়ে তিনি নেপালচন্দ্রকে আলিঙ্গন করেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং ইংরেজ সরকারের ছাত্রপীড়ন-নীতি সম্বন্ধে আলোচনার জন্যে নেপালবাবু মহাত্মাজীকে মধ্যাহ্নভোজনের আমন্ত্রণ জানান। মহাদেব দেশাই -সহ মহাত্মাজী নিমন্ত্রণকর্তার গ্রে-স্ট্রিটস্থ বাসভবনে আসেন এবং আলোচনায় যোগ দেন। অবশ্য কিছুকাল পরে নেপালবাবু আবার মহাত্মাজীর মতের প্রতিবাদও করেছিলেন। রামজে ম্যাকডোনাল্‌ডের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা যখন প্রকাশিত হল তখন গান্ধীজীর ও কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তার কোনো প্রতিবাদ হয় নি। নেপালবাবু কংগ্রেসের সেই না-গ্রহণ না-বর্জন নীতির সমালোচনা করেন। মদনমোহন মালব্যের অনুসরণে বাংলায় যখন ন্যাশানালিস্ট পার্টি গঠিত হল তখন নেপালচন্দ্রের নেতৃত্বে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে আন্দোলনও গড়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, এ-রকম ভাবে মাধ্যমিক শিক্ষা বিল ও সরকারী সমবায়নীতির প্রতিবাদেও নেপালবাবু আন্দোলন করেন। ১৯৪০ সালে হিন্দু-মুসলমান চুক্তির প্রতিবাদে টাউন হলে আহুত সভার অন্যতম উদ্যোগী নেপালচন্দ্র বিপক্ষদলের অকস্মাৎ আক্রমণে সাংঘাতিক ভাবে আহত হন। এই দুর্ঘটনার পর থেকেই তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। প্রায়ই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়তেন, শয্যাশায়ী থাকতেন। তবে সাময়িক-ভাবে আরোগ্যলাভ করলেই নেপালচন্দ্র আবার দেশকল্যাণের কাজে আত্মনিয়োগ করতেন। এই সময়ে তিনি সক্রিয়ভাবে হিন্দুমহাসভায় যোগ দেন এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পূর্ববঙ্গ-পরিক্রমা করেন। পঞ্চাশের মন্বন্তরে ছিয়াত্তর বছরের বৃদ্ধ নেপালচন্দ্র রুগ্ন ও ব্যাধিগ্রস্ত শরীরে দুঃস্থ দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নরনারীদের সেবা ও ত্রাণ -কার্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত দেশ ও সমাজের কল্যাণমূলক কাজে তাঁর উৎসাহ-উদ্দীপনার অন্ত ছিল না। কোনোরকম অন্তরায়—তা সে শারীরিক অসুস্থতাই হোক কিংবা অন্য কোনো বাস্তব অসুবিধাই হোক—তাঁকে আপন আদর্শ ও পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সেবাকার্যে নিযুক্ত থাকার সময়েই নেপালচন্দ্র ভয়ানক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং প্রায় একমাস শয্যাশায়ী অবস্থায় থাকার পর ১৯৪৪এর ২১ জানুয়ারি কলকাতার বাসভবনে পরলোকগমন করেন।

শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের প্রথমযুগের স্মরণীয় শিক্ষকেরা রবীন্দ্র-প্রতিভার জাদুস্পর্শে এবং নিজেদের সনিষ্ঠ সাধনায় অনন্যচরিত্র ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, শান্তিনিকেতনের শিক্ষাক্ষেত্রে নিজেদের আবদ্ধ রাখলেও তাঁরা হয়ে উঠেছিলেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষক—বিভিন্ন ক্ষেত্রে পথিকৃৎ। বিজ্ঞানসাহিত্য চর্চায় জগদানন্দ রায়, ভারততত্ত্ব সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যের গবেষণায় বিধুশেখর শাস্ত্রী ও ক্ষিতিমোহন সেন, বঙ্গীয় শব্দকোষ রচনায় হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনায় অজিতকুমার চক্রবর্তী, পল্লীসংগঠন-পরিকল্পনায় কালীমোহন ঘোষ, ভারতশিল্পসাধনায় নন্দলাল বসু—এঁরা সকলেই পথিকৃৎরূপে বাংলাদেশে শ্রদ্ধার আসন অধিকার করেছেন। নেপালচন্দ্রও তাঁর লব্ধপ্রতিষ্ঠ সহকর্মীদের মতো শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনার সঙ্গেসঙ্গে যেমন ইতিহাস-ভূগোলের বিদ্যালয়-পাঠ্যগ্রন্থ রচনা করেছেন ঠিক তেমনি আবার শান্তিনিকেতনের প্রতিনিধিস্বরূপ বাংলাদেশের সামাজিক ও

রাজনৈতিক আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়ে স্বদেশেরই সেবা করেছেন। বিলম্বে হলেও, শান্তিনিকেতনের আদর্শ শিক্ষক ও স্বদেশপ্রেমিক নেপালচন্দ্রের প্রতি শতবার্ষিকী-শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি।

এই রচনাটির জন্যে শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবন এবং নেপালচন্দ্র রায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত কালীপদ রায় ও পুত্রবধূ শ্রীযুক্তা কমলা রায়ের কাছ থেকে বহু তথ্য পেয়েছি।

নেপালচন্দ্র রায় -রচিত গ্রন্থ

প্রথম শিক্ষা ভারতবর্ষের ইতিহাস [১৯১১]
খগেন মিত্রের নামে প্রকাশিত, আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন লিখিত মন্তব্য
ভূ-পরিচয় [১৯১৪] অজিতকুমার চক্রবর্তী সহযোগে
শিশুরঞ্জন ভূ-পরিচয় [১৯২০]
শিশুরঞ্জন ভারতকথা
প্রাথমিক ভূ-পরিচয়
মধ্যশিক্ষা ভূ-পরিচয়। প্রথম ভাগ
মধ্যশিক্ষা ভূ-পরিচয়। দ্বিতীয় ভাগ
ভারতকথা [১৯৩০]
ইংল্যানডের ইতিহাস [১৯৩৫]
প্রথমশিক্ষা ভূ-পরিচয়

জগদানন্দ রায়। শান্তিনিকেতন পুস্তক প্রকাশ সমিতি। শান্তিনিকেতন। মূল্য এক টাকা।

এই ছোটো পুস্তিকাটি শান্তিনিকেতন পুস্তক প্রকাশ সমিতির পক্ষে সংকলন করেছেন শ্রীপুলিনবিহারী সেন ও শ্রীনিরঞ্জন সরকার। সম্প্রতি জগদানন্দের জন্মশতবর্ষ পূর্ণ হল। এই পুস্তিকাটি তদুপলক্ষে প্রকাশিত।

আমরা যারা শান্তিনিকেতনের বাইরের লোক তাদের কাছে জগদানন্দ পরিচিত সরল বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বইয়ের আদর্শ লেখক রূপে। জগদানন্দের আঠারোখানা বই বাংলা সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে। জগদানন্দ লিখতেন সাধনায়, রবীন্দ্রনাথ তখন তার সম্পাদক। রামেন্দ্রসুন্দর তার কিছু আগে থেকে লিখতে আরম্ভ করেছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের 'জগৎকথা'র ভূমিকায় জগদানন্দ লিখেছিলেন—

'ত্রিবেদী মহাশয়কে আমি গুরুতুল্য জ্ঞান করি। বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানচর্চায় তিনিই আমাকে পথ দেখাইয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে অনেক শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করিয়াছি।'

জগদানন্দের কীর্তি আলোচনা করতে গেলে স্বভাবতই রামেন্দ্রসুন্দরের প্রসঙ্গ এসে যায়। এ কথা অস্বীকার্য নয় মননের গভীরতায় রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন অসাধারণ, সে দিক থেকে জগদানন্দ তাঁর সমকক্ষ নন। জগদানন্দের আলোচ্য বিষয়গুলি পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় তিনি জগতের অন্তঃপুরের রহস্য জানবার অভিলাষী ছিলেন না; আমাদের চারপাশের সামান্য সামান্য বিষয়গুলির প্রতি তিনি পাঠকের কৌতূহল জাগাতে চেয়েছেন— এগুলি পর্যালোচনার যোগ্য বলেই যেন এতকাল মনে হয় নি। জগদানন্দের এই প্রয়াস স্বভাবতই শিশুচিত্তের অপার বিস্ময়বোধের রসদ জুগিয়েছিল। আজকের ছেলেমেয়েরা তাঁর বই পড়ে কিনা জানি না, বোধ হয় পড়ে না। জগদানন্দের সার্থক উত্তরাধিকারী দু-এক জনের লেখা বাদ দিলে বিজ্ঞানের অনেক রচনাই দেখি প্রগল্‌ভ ন্যাকামিতে ভরা তরল গদ্য। জগদানন্দ এই রীতিতে লেখেন নি। আদর্শ শিক্ষক ছিলেন তিনি; শিশুচিত্তের ক্রমপরিণতিশীল চিন্তাশক্তির পরিবর্ধনে তিনি ছিলেন সতর্ক। চিন্তাশক্তি যেন বলিষ্ঠ হয়, তেমনি তাদের স্বাভাবিক সুকুমার কল্পনাবৃত্তি যেন ব্যাহত না হয়— এই দুই দিকে তাঁর গদ্যরচনায় সতর্কতার পরিচয় আছে।

মনে হয় জগদানন্দের শিক্ষক-ব্যক্তিত্ব এবং সাহিত্যিক-ব্যক্তিত্ব এই সূত্রেই সমন্বিত। লক্ষ করেছি বর্তমান পুস্তিকাটিতে জগদানন্দের শিক্ষক-ব্যক্তিত্বটিকেই দেখানো হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন জগদানন্দের মৃত্যুতে তাঁর ব্যক্তিগত স্মৃতি। সে স্মৃতি নিরহংকার সরল শিক্ষকটির ত্যাগ ও প্রীতির উল্লেখে মধুর। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী জগদানন্দের প্রত্যক্ষ ছাত্র ছিলেন, কিন্তু তিনি নৈর্ব্যক্তিক ভাবেই (ছাত্রত্বের উল্লেখ না করে) জগদানন্দের ব্যক্তিত্বটি ব্যাখ্যা করেছেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর ছাত্র ছিলেন না, কিন্তু জগদানন্দের শিক্ষক-গৌরবটিকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন সরকার জগদানন্দের জীবনী এবং কর্মক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন; সাহিত্যিকরূপে, শিক্ষকরূপে, অভিনেতারূপে, দক্ষ কর্মকর্তারূপে জগদানন্দের এই বিবরণটি প্রয়োজনীয় তথ্যে পূর্ণ। শ্রীযুক্ত অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত জগদানন্দের রচনার সাহিত্যগুণ ব্যাখ্যা করেছেন; লেখাটি পিপাসা জাগায় কিন্তু নিবৃত্ত করে না। সবশেষে জগদানন্দের স্বরচিত 'স্মৃতি' সংকলিত।

এই পুস্তিকাটি প্রকাশ করে শান্তিনিকেতন তাঁদের চিরস্মরণীয় শিক্ষকের শ্রদ্ধাতর্পণ করলেন।

ভবতোষ দত্ত

স্বরলিপি

ওগো স্বপ্নস্বরূপিণী, তব অভিসারের পথে পথে
স্মৃতির দীপ জ্বালা॥
সেদিনেরই মাধবীবনে আজও তেমনি ফুল ফুটেছে
তেমনি গন্ধ ঢালা॥
আজি তন্দ্রাবিহীন রাতে ঝিল্লিঝঙ্কারে স্পন্দিত পবনে
তব অঞ্চলের কম্পন সঞ্চারে।
আজি পরজে বাজে বাঁশি
যেন হৃদয়ে বহুদূরে আবেশবিহ্বল সুরে।
বিকচ মল্লিমাল্যে তোমারে স্মরিয়া রেখেছি ভরিয়া ডালা॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

II না -া -র্সা । র্সা -ঋা -র্সা I না -দা -া । দা -পা পা I পা -ক্ষা -পা । পা -দা -পা I
ও ॰ ॰ গো ॰ ॰ স্ব ॰ প্ ন ॰ স্ব রূ ॰ ॰ পি ॰ ॰

I ক্ষা -গা -ঋা । -সা সা সা I সা মা মা । মা -া মা I মা মপা -গা । মা মধা -মগা I
ণী ॰ ॰ ॰ ত ব অ ভি সা রে ॰ র প থে॰ ॰ প থে॰ ॰॰

I মা ধা না । র্সা -র্গা র্গা I র্গঋা -া -র্সা । নর্সা -দা -া II
স্মৃ তি র দী ॰ প জ্বা॰ ॰ ॰ লা॰ ॰ ॰

-া -া II { দা দা দা । না -া -র্সা I র্সঋা ঋর্সা র্সা । র্সা -ঋা -র্সনা I র্সা -া -া । র্সা র্সা -না I
॰ ॰ সে দি নে রি ॰ ॰ মা॰ ধ॰ বী ব ॰ ॰॰ নে ॰ ॰ আ জো ॰

I র্সা র্সর্গা র্গা । র্গঋা -র্পা র্পর্গা I র্গা -া -ঋা । র্সা -া -না } I র্সা র্সর্গা র্গা । র্গা -ঋা র্সা I
তে ম॰ নি ফু॰ ল্ ফু॰ টে ॰ ॰ ছে ॰ ॰ তে ম॰ নি গ ন্ ধ

I না -া -র্সঋা । নমা -া -া I গা -মা -ধনর্সা । র্সা -ঋা -র্সা I না -দা -া । দা -পা পা I
ঢা ০ ০০ লা০ ০ ০ ও ০ ০০০ গো ০ ০ স্ব ০ প্ ন ০ স্ব

I পা -ঋা -পা । পা -দা -পা I ঋা -গা -ঋা । -সা সা সা I { সমা -া মা । মা মা মা I
প্ন ০ ০ পি ০ ০ নী ০ ০ ০ আ জি তং ন্ দ্রা বি হী ন

I মা -া -া । মা -া -া I সমা -া মা । মা -গা পা I মা -া -া । -া -া -া I
রা ০ ০ তে ০ ০ ঝিং ল্ লি ঝ ঙ্ কা রে ০ ০ ০ ০ ০

I সমা -া মা । মা মা মা I মা -পা -গা । গা গা -া I মা -ধা ধা । ধা -মা মগা I
স্পং ন্ দি ত প ব নে ০ ০ ত ব ০ অ ন্ চ লে ০ রং

I মা -ধা ধা । ধা ধা -না I না -া -ধা । ধা -া -পা I পা -মা মা । মা মা মা I
ক ম্ প ন স ন্ চা ০ ০ রে ০ ০ ত ন্ দ্রা বি হী ন

I মা -া -া । মা (সা সা) } I দা দা I দা দা দা । না -া -র্সা I র্সা -া -ঋর্সা । -না -র্সা -ধা I
রা ০ ০ তে আ জি আ জি প র জে বা ০ ০ জে ০ ০০ ০ ০ ০

I ধনা -া -ধা । -না -ধনা -র্সা I র্সা -া -া । র্সা র্সা -না I র্সা র্সগা গা । গা -ঋা ঋর্পা I
বাঁ ০ ০ ০ ০ ০ শি ০ ০ যে ন ০ হৃ দং য়ে ব ০ হুং

I গা -া -ঋা । ঋা -া -র্সা I না -া -র্সা । র্সঋা: -র্স: র্সা I না -া -দা । দা -পা পা I
দূ ০ ০ রে ০ ০ আ ০ ০ বেং ০ শ বি ০ ০ হ্ব ০ ল

I পা -া -ঋা । -পা -া -না I গা -া -ঋা । -সা -া -া I ধা ধা ধা । না -া র্সা I
সু ০ ০ ০ ০ ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ বি ক চ ম ল্ লি

I র্সঋ্ন -া -না । র্সা -া -া I সমা মা মা । মা -গা পা I মা -া -া । -া -া -া
মা ০ ০ ০ ল্যে ০ ০ তো ০ মা রে স্ম ০ রি য়া ০ ০ ০ ০ ০

I সমা মা মা । মা -গা গপা I মা -া -া । গা -মা -ধা I -না -র্সা -ঋর্সা । না -র্সা -ধা II
রে ০ খে ছি ভ ০ রি য়া ০ ০ ডা ০ ০ ০ ০ ০০ লা ০ ০

এই গানে ব্যবহৃত 'ঋ' এবং 'দ' এই দুটি স্বর সামান্য চড়া।
গানটির গায়কি মীড়প্রধান, তারযন্ত্রসহযোগে গেয়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

দেবেন্দ্রনাথের জীবন ও চরিত্রের সর্বকালীনতা রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করেছেন নানা প্রবন্ধে ও বক্তৃতায়, জীবনস্মৃতিতে ও কবিতায় ; এই গ্রন্থে সেগুলি বিভিন্ন সাময়িক পত্র ও গ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে। মূল্য ৬·৫০ টাকা

কবির ভণিতা

রবীন্দ্ররচনাবলী প্রকাশকালে রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি গ্রন্থের সূচনা-রূপে যেসকল মন্তব্য লিখে দিয়েছিলেন, রবীন্দ্ররচনাবলীর বিভিন্ন খণ্ডে মুদ্রিত সেই রচনাগুলি পাঠকের ব্যবহারসৌকর্যার্থ একত্র সংকলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি-সংবলিত। মূল্য ২·৫০ টাকা

চিঠিপত্র ১০

দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখিত পত্রের সংকলন। দীনেশচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথের পত্রগুলি ছাড়া রবীন্দ্রনাথকে লিখিত দীনেশচন্দ্রের কয়েকটি পত্র এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তথ্যপঞ্জী ও গ্রন্থপরিচয় সংবলিত। মূল্য ২·৫০ টাকা

রূপান্তর

সংস্কৃত পালি প্রাকৃত থেকে তথা ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা থেকে অনূদিত বা রূপান্তরিত রবীন্দ্রনাথের প্রকীর্ণ কবিতাগুলি— নানা মুদ্রিত গ্রন্থ, সাময়িকপত্র ও পাণ্ডুলিপি থেকে মূল-সহ এই গ্রন্থে একত্র সমাহৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্র, রবীন্দ্র-প্রতিকৃতি ও পাণ্ডুলিপি-চিত্রাবলী সংবলিত। মূল্য ৭·০০ টাকা

পল্লী-প্রকৃতি

এ দেশের পল্লীসমস্যা ও পল্লীসংগঠন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী— শ্রীনিকেতনের আশা ও উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা— অধিকাংশ রচনাই ইতিপূর্বে কোনো গ্রন্থে সংকলিত হয় নি। রবীন্দ্রশতপূর্তিবর্ষে শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠাদিবসে নূতন প্রকাশিত। সচিত্র। মূল্য ৪·৫০ টাকা

স্বদেশী সমাজ

'যে দেশে জন্মেছি কী উপায়ে সে দেশকে সম্পূর্ণ আপন করে তুলতে হবে' এ বিষয়ে জীবনের বিভিন্ন পর্বে রবীন্দ্রনাথ বার বার যে আলোচনা করেছেন তারই কেন্দ্রবর্তী হয়ে আছে 'স্বদেশী সমাজ' (১৩১১) প্রবন্ধ। সেই প্রবন্ধ ও তারই আনুষঙ্গিক ও অন্যান্য রচনা ও তথ্যের সংকলন 'স্বদেশী সমাজ' গ্রন্থ। মূল্য ৩·০০ টাকা

বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

বর্ষ ২৬ · সংখ্যা ৪

বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৭

সম্পাদক

শ্রীসুশীল রায়

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৬ সংখ্যা ৪ · বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৭ · ১৮৯২ শক

সম্পাদক শ্রীসুনীল রায়

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

মূল্য দেড় টাকা

প্রাচীন মাটির পুতুল — হরিনারায়ণপুর, চব্বিশ পরগণা

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৬ সংখ্যা ৪ · বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৭ · ১৮৯২ শক

চিঠিপত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

ক্যানাডা থেকে নিমন্ত্রণ এসেছে। আমি রাজি হয়ে উত্তর দিয়েচি। যাতে সেপ্টেম্বরের শেষে সেখানে পৌছনো যায় এমন ভাবে যাত্রা করতে হবে। বলা বাহুল্য খরচ তারাই দেবে। আরিয়াম ক্যানাডা ভালো করেই জানে। তার বিশ্বাস ক্যানাডা থেকে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যাবে। বলা বাহুল্য আমি ক্যানাডায় গেছি খবর পেলেই আমেরিকা থেকে ডাক পড়বে। আর এবার সেখান থেকেও কিছু পাওয়া যাবে বলেই আমার বিশ্বাস।

সেদিককার ভিড় ঠেলাঠেলি ও কাজের ব্যবস্থা একলা আরিয়ামের পক্ষে অতিরিক্ত হবে। এইখানেই তো সে হিমসিম্ খেয়ে গেছে। আর একজন শক্ত লোকের দরকার। সুনীতি সবদিকেই মজ্‌বুৎ ও উপযুক্ত। অন্তত ছ মাসের অতিরিক্ত ছুটির জন্যে সে দরখাস্ত করবে। পাবে কি না জানি নে। ইতিমধ্যে এণ্ড্রুজ ভারতবর্ষে আসবে জানি। কিন্তু তার পক্ষে মুস্কিল হচ্চে তার নিজের কতকগুলো পোষা বিষয় আছে যেখানে যাবে তাই নিয়ে উৎপাত করবে। তাতে আমাদের কাজের ব্যাঘাত হবার সম্ভাবনা। হয়তো বা তার দ্বারা উল্টো ফল হতে পারে।

এ সম্বন্ধে ভালো করে ভেবে দেখিস্। আর তো কাউকে ভেবে পাচ্চিনে। তুই এলে ভালো হোতো কিন্তু পুপে সমেত তোদের সকলকে নিয়ে ক্রমাগত ঘুরে বেড়ানো অসম্ভব হবে। দীর্ঘকালের জন্যে তুই চলে এলে শ্রীনিকেতনের শ্রী যাবে ছুটে— সে একটা ভাববার কথা। তা ছাড়া ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে চাঁদা তোলার ব্যবস্থা করতে হয় সেটাও তোর অবর্ত্তমানে মারা যাবে। শান্তিনিকেতনের কাজও আমাদের সকলের অনুপস্থিতিতে গুলিয়ে যাবার কথা।

অপরপক্ষে টাকা তোলার দিকে ভালো রকম দৃষ্টি রেখে ক্যানাডা ও য়ুনাইটেড স্টেট্সে ব্যবস্থা করা চাই। আরিয়াম ক্যানাডা সম্বন্ধে খুবই আশান্বিত। সেখানে তার বন্ধু আছে তা ছাড়া অভিজ্ঞতা আছে। এ কাজ কি করে কর্‌তে হয় বহুকাল থেকে সে শিক্ষায় ও পাকা। এখানে খুব চমৎকার গুছিয়ে নিয়েচে। গোড়ায় যা বলেছিল তার চেয়ে বেশি পাব বলেই আশা করছি। আমেরিকা অঞ্চলেও ও পারবে। কিন্তু তা করতে গেলে আর একজন লোক চাই যে আমাকে সাম্‌লাবে। যদিও এণ্ড্রুজ খুব আইডিয়াল লোক নয় তবু অন্য অনেকের চেয়ে ভালো। আমি ওকে শাসনে রাখতেও পারি। তা ছাড়া ক্যানাডায় ও আসতে চায় বলে অনেকদিন বারবার আমাকে

জানিয়েছে। এবার ক্যানাডায় আসচি অথচ ওকে সঙ্গে যদি নিতে না চাই তাহলে মনে খুবই আঘাত পাবে।

সুনীতি যদি সঙ্গে যেতে পারে তাহলে সেখানকার য়ুনিভার্সিটিগুলিতেও বক্তৃতা করবার অবকাশ পাবে। সেটাও একটা কম কাজ নয়। কিন্তু আমার মনে হচ্চে ও ছুটি পাবেনা। অতএব অভাবপক্ষে যা করা কর্ত্তব্য ঠিক করে রাখিস। আমাদের এখানকার মেয়াদ ১৭ই তারিখ পর্য্যন্ত পেনাঙে। তার পরেই যাব জাভায়। যদি সম্ভব হয় গরম কাপড় সেখানে পাঠাস এবং চার আউন্স শিশিতে পাঁচ শিশি Kali Phos 6x। গরম কাপড় তৈরি করিয়ে নেওয়া কঠিন হবেনা। যদি না পাঠাতে পারিস্ জাভায় কাপড় করিয়ে নেব। জাভা থেকে আমাদের দলের লোকদের দেশে রওনা করে দেব। শ্যামে ক্যাম্বোডিয়ায় যাওয়া চল্‌বেনা।

এইমাত্র সুনীতিদের সঙ্গে আর একবার আলোচনা করে দেখা গেল। স্থির হল এই যে, আমি ওদের জাভা ও বালিতে বসিয়ে ক্যানাডায় চলে যাব। ওরা র'য়ে বসে সেখানকার কাজ যথাসম্ভব শেষ করে দেশে ফিরে যাবে। তা না হলে অকর্ত্তব্য হবে। জাভাতে আমি নিজে অন্তত তিন সপ্তাহ হাতে পাব। সেই তিন সপ্তাহ ভূমিকা করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট হবে। তাহলে সুনীতিকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না।

এমন অবস্থায় এণ্ড্রুজ ছাড়া আমার গতি আছে বলে বোধ হয় না। এ চিঠি যখন তোদের হাতে গিয়ে পড়বে তখন এণ্ড্রুজ হয়ত এসে পড়েচে। অতএব তার সঙ্গে কথা পাকা হলেই আমাকে তার যোগে খবর পাঠিয়ে দিস্।

আমরা মলক্কা বলে এক জায়গায় এসেছি। সমুদ্রের ধারে একজন চীনে ধনীর বাড়িতে আছি। চমৎকার বাড়ি। এইখানে যদি কিছুদিন থাকতে পারতুম তাহলে বেশ হোত। কিন্তু আমার কপালে স্থিতি কোথাও নেই। ক্রমাগতই নতুন নতুন জায়গায় নতুন নতুন লোকের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বকে বকে বেড়াতে হচ্চে। ভারি শ্রান্তি।

এখানে কয়েকজন বাঙালী আছেন—সুবিধে হয়েচে। তাঁরা খুব সাহায্যের চেষ্টা করচেন। এখানকার চীনেদের কাছ থেকেই সবচেয়ে বেশি সহায়তা পাওয়া যাচ্ছে। ভারতীয়রা ভারতেও যেমন এখানেও তেমনি। তারা দিতে চায়না। আর আমিও জানিনে কি করে তাদের ভুলিয়ে টাকা আদায় করতে হয়—অথচ সুবিধা নেবার বেলায় এরা আমার নাম নিতে কুণ্ঠিত হয় না। ভারি ধিক্কার বোধ হয়।

Journalগুলো আমাকে পাঠিয়ে দিস। গোটাকতক আছে যেমন, যেটাতে Hindu Ideal of Marriage, Poet's School, নটীর পূজা, Fireflies আছে। অন্যগুলো পেলে তার থেকে আমেরিকা প্রভৃতি জায়গায় হয়ত বক্তৃতার সুবিধে হবে। এখানে যদিও মুখের বক্তৃতাগুলোই সবচেয়ে জমেচে। যেগুলোতে আমার বিশেষ কোনো লেখা নেই সেগুলো না পাঠালেও চল্‌বে। ইতি

২৭ জুলাই ১৯২৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

কল্যাণীয়েষু

ভেবে দেখলুম জাভার থেকে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি ক্যানাডার অভিমুখে যাত্রা করলে শীতের মুখে গিয়ে পড়ব। হয়ত সইবে না। তাই নিমন্ত্রণের মেয়াদ পিছিয়ে দিলুম। সেখানে মে মাসের গোড়ায় যাব জানিয়েছি। তাহলে হয়ত তোরাও যেতে পারবি। তা ছাড়া মাস চারেক আগে আরিয়ামকে পাঠিয়ে জমি তৈরি করে নেওয়া চাই। এখানকার টাকা থেকে কিছু টাকা এই কাজে লাগাতে হবে। সেখানে গিয়ে আরিয়াম ভূমিকা তৈরি করে নিতে পারবে বলে আরিয়ামের বিশ্বাস— তার পরে আমারও বিশ্বাস। ক্যানাডায় সে নিজে বক্তৃতা দিয়ে অর্থ উপার্জ্জন করেচে— য়ুনাইটেড স্টেট্‌সেও! এখানে আরিয়াম খুব কৃতিত্ব দেখিয়েছে। এখানকার কাজ কিছুমাত্র সহজ ছিলনা।

তা ছাড়া জাভা শ্যাম প্রভৃতি জায়গায় আমার কাজ সম্পূর্ণ না করে অন্যত্র চলে গেলে সেটা ভালো দেখাত না। এবারে সেইদিকেই সম্পূর্ণ মন দেব। হয় ত ফিলিপিনেও যাওয়া হতে পারে।

আজ এখনি মলক্কা থেকে কোয়ালালামপুরে যাচ্ছি। অত্যন্ত এনগেজমেন্টের ভিড় হয়েচে— উপায় নেই— অল্প দিনের মেয়াদে কাজ শেষ করতে হচ্চে বলেই এত ঠাসাঠেসি।

গাড়ি তৈরি। এবার যাই।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

ইপো

কল্যাণীয়েষু

রথী, আজ এসেচি ইপো বলে এক জায়গায়। বক্তৃতার পালা এখনো শেষ হয় নি। এটা একটা বড়ো জায়গা সুতরাং এখানে উৎপাত একটু বেশি রকমই হবে। এটা চুকলে পিনাঙ আছে সেখানেও হাঙ্গামা কম নেই। তারপর জাভায়। ধীরেনকে আরিয়ামের সঙ্গে রেখে যাব নইলে খরচে কুলোবেনা। আরিয়াম এখানকার কাজ সেরে শ্যামের জমি তৈরি করতে যাবে— যদি সেখানে কোনো আশা করবার না থাকে তাহলে যাবে রেঙ্গুনে। সেখানে ওদের তামিল অনেক আছে। কমই হোক বেশি হোক সেখান থেকে কিছু পাওয়া যাবে। জাভাতে বেশিদিন থাকা শক্ত হবে। সেপ্টেম্বর শেষ করে সেখান থেকে ফেরবার ব্যবস্থা করা ভালো। অক্টোবরে শ্যাম এবং রেঙ্গুন।

খুব সমাদর সমারোহ চল্‌চে। এতটা যে হতে পারে তা মনেও করিনি— এখানকার প্রতিকূল পক্ষের কেউ কেউ সে জন্যে ঈর্ষান্বিত। তারাই চক্রান্ত করে আমার সেই চীনে সেনা পাঠানোর প্রতিবাদ নিয়ে মহা গোলমাল করচে। তাতে কিছু ক্ষতি হয়েচে সন্দেহ নেই। কেননা এখানকার লোকেরা অত্যন্ত ভীতু— গবর্মেণ্টের মুখ তাকিয়ে থাকে। কিন্তু গবর্মেণ্টের বড় বড় কর্ম্মচারীরা এখনো আমার লেকচারে সভাপতিত্ব করচে দেখে একটু ওদের ভরসা হচ্চে। কিন্তু এই হাঙ্গামটা না হলে টাকার অঙ্কটা বেশ একটু বড় হতে পারত। তা হোক্ আশা করি নেহাৎ কম হবেনা। আরিয়ামের দক্ষতা দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেছি— ও ছাড়া আর কেউ এ কাজ করতে পারত না— অসাধারণ ধৈর্য্য, আর পরিশ্রম করবার ক্ষমতা।

সকল লোকের সঙ্গেই বনিয়ে নিতে পারে— ওর আর একটা সুবিধে ও ইংরেজদের সঙ্গে সহজে মিশতে পারে। ইতিমধ্যে ওর ক্লাসগুলো যাতে চলে সেদিকে দৃষ্টি রাখিস্। সিংহল থেকে যে লোকটি এসেছে সে কি রকম? অমিয় কি ক্লাস নিচ্চে? তোদের কোনো খবর অনেকদিন পাইনি। এখানে কখনো শীঘ্র চিঠি আসে কখনো দেরিতে। কখনো আট দিনে কখনো একুশ দিনে। ইতি ৬ অগষ্ট ১৯২৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্রে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

অমিয় ॥ অমিয় চক্রবর্তী

আরিয়াম ॥ আরিয়াম উইলিয়মস (আর্যনায়কম), শান্তিনিকেতন-পাঠভবনের তৎকালীন অধ্যক্ষ

এণ্ডুজ ॥ সি. এফ. এণ্ডুজ

ধীরেন ॥ শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মণ, শান্তিনিকেতন-কলাভবনের তৎকালীন অধ্যাপক

সুনীতি ॥ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

অন্তরঙ্গ

সৌরীন্দ্র মিত্র

১

সাহিত্যসংসারে কিছু বই আছে যেগুলি বিভিন্ন সাহিত্যগুণ ছাড়াও অতিরিক্ত একটি বিশেষ গুণের জন্য আবহমানকাল পাঠকসমাজে আদৃত হয়ে আসছে। গুণটি অতীব দুর্লভ, একে বলতে পারি অন্তরঙ্গতা। যে জাতের বইকে অন্তরঙ্গ বলে অভিহিত করা চলে তাতে বিষয়বস্তুর গৌরব বা আকর্ষণ এবং রচনারীতির সৌকর্যের সঙ্গে সঙ্গে— কখনো কখনো তাদের ছাড়িয়ে— প্রকাশিত হয় একটি বিশেষ মানসমূর্তি, বিশেষ মেজাজ-সমন্বিত একটি মন যার সঙ্গে অচিরে পাঠকের মনের গাঁঠছড়া বাঁধা হয়ে যায় চিরদিনের মতো। লেখক-পাঠকের সম্বন্ধের মধ্যে ব্যবধান ঘুচে যায়, পুস্তক-পাঠের আনন্দে কখন অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হয়ে যায় বন্ধুর সঙ্গে মুখোমুখী নিভৃত সংলাপের মধু। মঁতেইনের প্রবন্ধাবলী এই জাতের একটি বই। যে গুণে এই বইখানি বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে পাঠকদের মুগ্ধ করে আসছে তা মুখ্যত ঐ অন্তরঙ্গতা। প্রবন্ধগুলি মঁতেইনের পরিণত-বয়সের ফসল, তার মধ্যে আছে রেনেসাঁস্ হিউম্যানিজ্‌মের দ্বারা প্রবুদ্ধ মননের দীপ্তি ও গভীরতা, আছে মোহমুক্ত দৃষ্টির প্রখরতা, আছে স্বচ্ছ অথচ তির্যক পরিহাসপটুতার বিদ্যুৎবাণ, কিন্তু সকলের চেয়ে বেশি করে আছেন তিনি নিজে। ভূমিকায় তাই এই অত্যন্ত আক্ষরিক সত্যকথাটি তিনি বলতে পেরেছিলেন যে তাঁর বইয়ের বিষয়বস্তু তিনি নিজে: 'je suis moy-mesmes la matière de mon livre'। একথা ল্যামও বলতে পারতেন তাঁর *Elia*-সম্বন্ধে। এটিও আর-এক খানি সর্বজনস্বীকৃত অন্তরঙ্গ গ্রন্থ। ইংরাজী সাহিত্যের সঙ্গে যে-পাঠকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে— বিশেষত উনবিংশ শতকের ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে— দেখা গেছে কোনো-না-কোনো সময়ে এই Eliaর সঙ্গে সখ্যসূত্রে অনিবার্যভাবেই তাঁকে আবদ্ধ হতে হয়েছে এবং সে বন্ধন কালক্রমে শিথিল না-হয়ে বরং ক্রমশ দৃঢ়তরই হয়েছে। তার কারণ এই নিবন্ধগুলিতে রসপ্রাণ, আবেগ-স্পন্দিত গদ্যের মাধ্যমে ল্যাম যেন সমকালীন রোমান্টিক কবিদেরই সমধর্মী বা প্রতিদ্বন্দ্বী। এগুলির মধ্যেও একটি মানসমূর্তি ফুটে ওঠে। তার সঙ্গে মঁতেইনের শান্ত বিদগ্ধ বুদ্ধিপ্রদীপ্ত ব্যঙ্গস্ফুরিত মুখাবয়বের মিল নেই, কিন্তু হৃদয়ের রসসম্পদের, করুণার, হাস্যের, বিশিষ্ট রুচির এবং খেয়ালের বিচিত্র রঙে এই মূর্তির প্রতিটি রেখা পাঠকের মনে চিরকালের মতোই মুদ্রিত হয়ে যায়।

এই জাতীয় অন্তরঙ্গ সাহচর্য অল্পবিস্তর আরো কিছু ভিন্ন-প্রকৃতির গ্রন্থেও আমরা পেয়ে থাকি। যেমন, বসোয়েল-রচিত জন্‌সন-জীবনী অথবা একেরমান-অনুলিখিত গ্যয়টের শেষ কয় বৎসরের আলাপচারী। এদুটি গ্রন্থে গ্রন্থকারের আত্মকথন পরোক্ষ এবং গৌণ হলেও, দেখা যায়, কোনো এক অত্যাশ্চর্য জাদুর স্পর্শে জন্‌সন এবং গ্যয়টের পরিণত-বয়সের অবিস্মরণীয় মূর্তি জীবন্ত বাঙ্ময় হয়ে আমাদের ধ্যানদৃষ্টির সম্মুখে উদ্ঘাটিত। বই দুটির মধ্যে গুণগত পার্থক্য আছে। বসোয়েল-কৃত জীবনীর প্রাণসম্পদ বেশি, জন্‌সনের প্রতিকৃতিও পূর্ণতর, এবং জন্‌সনের পশ্চাতে বসোয়েলের নিজের যে ছবিটি ফুটেছে সেটিও পরম কৌতূহলের সামগ্রী। একেরমান-লিখিত গ্যয়টের সংলাপে আছে মনীষীর পরিণত মনন-সাধনার সুপক্ব ফসলের আঘ্রাণ। স্বীকার করতে দোষ নেই, গ্যয়টের সাহচর্য অনেক সময় ঈষৎ শ্বাসরোধকারী। মঁতেইনের সঙ্গে কি ল্যামের সঙ্গে,

এমনকি বৃদ্ধ জন্‌সনের সঙ্গে আমাদের যে পূর্ণ অন্তরঙ্গতার সম্বন্ধ গড়ে ওঠে, গ্যয়টের সঙ্গে সেই সম্বন্ধের মধ্যে কোথায় যেন একটু অভাব থেকে যায়। কিন্তু বইটিতে তাঁর উপস্থিতি অনস্বীকার্য—এবং এই উপস্থিতি তাঁরই স্বরচিত আত্মজীবনী, 'কাব্য ও সত্য' (*Dichtung und Wahrheit*) অথবা তাঁর অন্যান্য আত্মজীবনীমূলক রচনা অপেক্ষা অনেক বেশি জীবন্ত।

এ ছাড়া বিভিন্ন পাঠকের রুচি ও মনোভঙ্গি -অনুযায়ী আরো কিছু নাম উল্লিখিত হয়ে থাকে। কোনো কোনো পত্রলেখকের মধ্যে এই অন্তরঙ্গতার গুণ অন্যান্য নানা গুণের (এবং নানা ত্রুটির) সঙ্গে জড়িত হয়ে নানা পরিমাণে লক্ষ্য করা গেছে—যেমন মাদাম্ দ্য সেভিয়েঁ, কীট্‌স্, ভ্যান্ গগ্, রিল্‌কে। কোনো কোনো বিশেষ রুচির পাঠক এই গুণটি সানুরাগে আবিষ্কার করে থাকেন রুশো, চেলিনি, কাসানোভা কি সাঁ-সিমোঁ'র আত্মজীবনীমূলক রচনায়। ডায়েরি-লেখকদের মধ্যেও কেউ কেউ একই কারণে স্মরণীয়: আমিয়েল্, ডরোথি বার্ডস্বার্থ, আঁদ্রে জীদ্। এই জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে প্রকৃতিগত বিভিন্নতা এবং বৈচিত্র্য আছে, গুণগত তারতম্যও সহজলক্ষ্য, কিন্তু এদের মধ্যে একটা জায়গায় একটা বড় মিল আছে যার জন্য এগুলিকে একই গোষ্ঠীভুক্ত করা যায়। হুইট্‌ম্যান তাঁর নিজের কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে যা বলেছিলেন এদের প্রত্যেকটির সম্বন্ধেই অল্প বিস্তর সে-কথা বলা চলে: Who touches this touches a man।

বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে আজ স্মরণীয় বরণীয় গ্রন্থের অভাব নেই, কিন্তু ঐ অন্তরঙ্গ কথাটি বোধ করি সর্বতোভাবে একখানি বইয়ের বেলাতেই প্রযোজ্য, সেটি রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র। এই বইখানি বার বার পড়তে পড়তে এই একটা বিষয়ে আমরা ক্রমশ সচেতন না হয়ে পারি না যে, এই বইটির জুড়ি বাংলা সাহিত্যে তো বটেই, রবীন্দ্রসাহিত্যেও নেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুবিশাল সৃষ্টিচক্রের পাশে পাশে তারই যেন অতুলনীয় টীকাভাষ্য হিসাবে যে আত্মমূলক রচনা লিখেছেন বিভিন্ন আকারে, বিভিন্ন স্টাইলে, রসানুভূতি ও চিন্তাসম্পদের বিভিন্ন স্তর আশ্রয় করে, পরিমাণে ও আত্মনিরীক্ষার উজ্জ্বলতায় তার মূল্য যে অপরিসীম সে কথা নতুন করে বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু তারই মধ্যে এই ছিন্নপত্রের একটি বিশিষ্ট আসন আছে। নিজের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই বইখানিতে পাঠকের যত কাছে এসেছেন, তাঁর ব্যক্তিত্বের ইন্দ্রজাল এই বইখানিতে যেমন অব্যবহিতভাবে পাঠকের মনকে সম্পূর্ণ অধিকার করে নেয়, তার দৃষ্টান্ত তাঁর অপর কোনো আত্মমূলক রচনায় পাই না। যে পত্র এবং পত্রাংশগুলি নিয়ে এই বইখানি গ্রথিত সেগুলি কবি লিখেছিলেন পূর্ণযৌবনের আরম্ভকালে অর্থাৎ তাঁর ২৬ থেকে ৩৪ বৎসর বয়সের মধ্যে জমিদারির কাজে, পূর্ব- ও উত্তর- বাংলার এবং উড়িষ্যার নানা পরগণায় নিরন্তর ভ্রমণ এবং অস্থায়ী বাস উপলক্ষ্যে, লিখেছিলেন ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে। এই চিঠিগুলির জাত রবীন্দ্রনাথের সমগ্র পত্রসাহিত্য থেকে আলাদা। ঐ সময়েই লিখিত অন্যান্য চিঠিপত্র—এমনকি স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে লিখিত যে কয়খানি চিঠি মুদ্রিত হয়েছে সেগুলিও— পাঠ করলেই এগুলির প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। রবীন্দ্রনাথ যে বিশ্বের সেরা পত্রলেখকদের মধ্যে অন্যতম, তাঁর ক্ষুদ্রতম চিঠিও যে সাহিত্যগুণসমৃদ্ধ সে কথা সকলেরই জানা আছে, কিন্তু ছিন্নপত্রের এই চিঠিগুলি এই অর্থে শুধুমাত্র সুখপাঠ্য চিঠি নয়। কবি স্বয়ং কখনো কখনো এই চিঠিগুলিকে ডায়েরি বলেও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু চিঠিগুলি যে নিছক ডায়েরির কোঠাতেও পড়ে না তা ছিন্নপত্রেরই সমকালীন য়ুরোপযাত্রীর

ডায়ারি অথবা দীর্ঘকাল পরে দক্ষিণ-আমেরিকা যাত্রাকালে রচিত পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারির সঙ্গে তুলনা করলেই প্রতীয়মান হবে। বস্তুত এগুলি এমন চিঠি যার মধ্যে ডায়েরির অন্তরঙ্গতা আছে এবং সেই সঙ্গে আছে ব্যক্তিগত চিঠির যা প্রধান গুণ অর্থাৎ স্থান কাল পরিবেশ মিলিয়ে প্রাত্যহিকের জীবন-প্রবাহ। এই জাতীয় চিঠি, যাকে বলা হয় journal letter, শুধু এক বিশেষ জাতের পাঠকের উদ্দেশ্যেই লিখিত হতে পারে, যে পাঠক শুধুমাত্র মর্মগ্রাহী ও রসজ্ঞই নন, যিনি অন্তত অনেকাংশে পত্রলেখকের kindred spirit। ইন্দিরা দেবী ছিলেন ঠিক এই জাতের correspondent এবং তারই ফলে ঐ বিশেষ সময়ে মফস্বল পরিক্রমাকালে কবির এই চিঠিগুলির মাধ্যমে একটা অন্তরঙ্গ আলাপনের ধারা উৎসারিত হয়ে গিয়েছিল। এই আলাপনের মধ্যেই আছে আত্মপ্রকাশের সেই আশ্চর্য জাদু যার জন্য ছিন্নপত্রের প্রতিটি পাতায়, প্রতিটি ছত্রে লেখকের প্রাণবান অন্তরঙ্গ ব্যক্তিস্বরূপটি আমরা অব্যবহিত-ভাবে অনুভব করি, তার আবেদন সরাসরি পৌঁছয় গিয়ে মনের নিভৃত অন্দরমহলটিতে, তাঁর কণ্ঠস্বর আমাদের ভাবনায় চিন্তায় কল্পনায় অনুরণিত হয়ে চিরকালের মতোই আমাদের চেনা হয়ে যায়। প্রকাশের অন্তরঙ্গতায় এই বইখানি যে পূর্বোল্লিখিত বিশ্বের অন্তরঙ্গ গ্রন্থগোষ্ঠীর সগোত্র, শুধু এ কথা বললেই সবটুকু বলা হয় না। বইটির কেন্দ্রে মর্মকোষের মতো যে অন্তরঙ্গ আত্মপ্রকাশ আছে তার সর্বাঙ্গীণ এবং বিশিষ্ট স্বরূপটির মধ্যেই আছে তার অনন্যতা।

২

ছিন্নপত্রের পাতায় যে মনটির সাক্ষাৎ পাই তার একটা প্রাথমিক পরিচয় হল জীবন সম্বন্ধে অফুরন্ত, অক্লান্ত আগ্রহ, জীবনের পারিপার্শ্বিকের ছোট-বড় সব-কিছুর প্রতিই একটা সচেতন সানুরাগ এবং নিবিড় অনুভব এবং তাকে প্রকাশ করবার আগ্রহ এবং আশ্চর্য শক্তি। ছিন্নপত্রের পাতায় পাতায় তাই ছড়িয়ে আছে যাকে বলতে পারি দেখার ঐশ্বর্য।

ইতিপূর্বে য়ুরোপপ্রবাসীর পত্রে সতের বছরের চোখ দিয়ে ইংলণ্ডের সমাজকে যে তিনি দেখেছিলেন, সে এক জাতের দেখা, তাকে বলা যায় সমালোচকের দেখা। তারপর ১৮৯০ সালে (ছিন্নপত্রেরই সমকালীন) আড়াই মাস ইংলণ্ড-ভ্রমণ-কালে যে য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি লিখেছিলেন, তার মধ্যে আছে আর-এক রকমের দেখার নজির, তাকে বলতে পারি ট্যুরিস্টের দেখা। ছিন্নপত্রে যে দেখার ঐশ্বর্যের উল্লেখ করেছি তার প্রকৃতি ভিন্ন; তার মধ্যে আছে দেখার পূর্ণতা, অর্থাৎ সে দেখা আর্টিস্টের দেখা। আর্টিস্টের চোখ, আর্টিস্টের মন যে ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল, অন্তত মানসী-পর্বের কবিতাগুলির মধ্যে তার তর্কাতীত নিদর্শন আছে। কিন্তু কলকাতার গণ্ডীবদ্ধ জীবনে, এমনকি গাজীপুরে নির্জনবাসের আত্মকেন্দ্রিকতার মধ্যেও তার ক্ষেত্র ছিল সংকীর্ণ। ভরা যৌবনের আরম্ভকালে আর্টিস্টের মন, আর্টিস্টের দৃষ্টি নিয়ে তিনি এলেন শিলাইদহ পতিসর সাজাদপুর কালীগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলের নদীপ্রান্তর লোকালয়কে বেষ্টন করে মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গমে বিচিত্রিত গ্রাম-বাংলার যে প্রাণচঞ্চল, উদার এবং বহুবিস্তৃত জীবনটি প্রসারিত ছিল তারই মাঝখানে। প্রাণ-সম্পদে পূর্ণ একটা নূতনতর, বৃহত্তর জগতে তিনি মুক্তি পেলেন ঠিক এমনি সময়ে যখন স্পষ্টতই তার জন্য একটা আন্তরিক ক্ষুধার সঞ্চার হয়েছিল, যখন তাকে গ্রহণ করবার, সম্ভোগ করবার শক্তিও ভিতরে ভিতরে জাগ্রত হয়ে উঠছিল। এসেছিলেন বৈষয়িক কর্ম-

সূত্রে, কিন্তু সেই কর্মের দায় থাকলেও ভার ছিল না, বরং বিচিত্র সংযোগের সূত্র হিসেবে তাঁর আর্টিস্ট মনের অনুকূলই ছিল, আর তা ছাড়া ছিল অবকাশ এবং নির্জনতা। লেখক হিসেবে কিছুটা স্থানিক খ্যাতি এবং বদান্য জমিদার হিসেবে যথেষ্ট সম্মান যদিও তাঁর প্রাপ্য ছিল, বিশ্বখ্যাতি তখনো ছিল সুদূরপরাহত। ফলে আপেক্ষিক anonymityর আড়ালে বিনা বিক্ষেপে এবং অতি সহজে এই জগতের সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে, এখানকার প্রাণধারার মধ্যে সম্পূর্ণ মগ্ন হয়ে একটা পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতার সম্পদে মনের সদর-অন্দর পূর্ণ করে তুলতে পেরেছিলেন। এই জগৎ যে কবির মনকে শুধু আকর্ষণ করেছিল, আবিষ্ট করেছিল তাই নয়, সর্বতোভাবে জাগ্রত করেছিল, উদ্‌বোধিত করেছিল একটা আনন্দোজ্জ্বল চৈতন্যের সুরে। ছিন্নপত্র তারই অভিজ্ঞান।

কবি লিখেছেন, 'চেয়ে চেয়ে দেখবার এবং দেখে দেখে মনটা ভরে নেবার এমন জায়গা আর কোথায় আছে।' যিনি দেখেন, দেখতে জানেন, তিনিই দেখাতে পারেন। ঐন্দ্রজালিকের স্পর্শে কখন এবং কেমন করে যে আমরা তাঁরই চোখ দিয়ে দেখতে শুরু করেছি সেটা সম্পূর্ণ টের পাবার আগেই আমরা উপনীত হই এক অত্যাশ্চর্য দৃশ্যলোকে। কুঠি কাছারি শহর গ্রাম গঞ্জ— প্রসারিত শস্যক্ষেত্র, আলবাঁধা পথ, বিস্তৃত প্রান্তর, নিবিড় ছায়া-ফেলা বনশ্রেণী, দিগন্ত থেকে দিগন্তে প্রসারিত উন্মুক্ত আকাশ— দিনরাত্রির আলো-অন্ধকারে, ঋতুচক্রের আবর্তনে এই দৃশ্যপটের কত নতুন রূপসজ্জা, কত নতুন রঙের সমাবেশ। এরই মধ্যে স্নায়ুজালের মতো প্রবাহিত কত নদী উপনদী শাখানদী, কত ছোট বড় খাল বিল— পদ্মা যমুনা ইছামতী গোরাই আত্রাই চলনবিল। আর তাদের ঘিরে, তাদের দুই পাড় পূর্ণ করে, ছবির সমারোহ। ছবির মতো ক'রেই কবি দেখছেন— দূর থেকে অথচ ইন্দ্রিয়ের, অনুভূতির, রসমজ্জিত চিত্তের নিবিড় স্পর্শ দিয়ে। কখনো চল্‌তি বোটের জানালা দিয়ে দুই পাশের আদিগন্ত জল-স্থলের দৃশ্য, কখনো নোঙর-করা বোটের খড়খড়ি তুলে ঘাটের দৃশ্য, হাট-বাজার-গঞ্জের দৃশ্য, ধুধু শূন্য চরের দৃশ্য, কখনো বোটের ছাদে তারা-জ্বলা আকাশের নীচে স্বচ্ছ অন্ধকারে আবৃত স্নিগ্ধ শান্ত ছবি। কখনো গ্রামপথে, কখনো নদীর পারে, কখনো বা নদীর চরে একলা ভ্রমণরত কবির চোখের সামনে প্রকৃতির এক-একটি অবিস্মরণীয় ধ্যানমূর্তির আবির্ভাব।

একখানি চিঠিতে কবি তাঁর মনটিকে ফোটোগ্রাফের wet plateএর সঙ্গে তুলনা করেছেন। তুলনাটি অবশ্যই অংশত সার্থক। কারণ ছিন্নপত্রে যে চিত্রসম্ভার আছে তার মধ্যে ফোটোগ্রাফের বিশেষ গুণটি হামেশাই লক্ষ্য করা যায়— অসংখ্য খুঁটিনাটি যা সাধারণতঃ আমাদের উদাসীন চোখের সামনে পড়লেও মনোযোগ দাবি করতে পারে না, ফোটোগ্রাফের wet plate-এ তার সবটুকুই ধরা পড়েছে এবং ছবির দৃশ্যতাকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু ক্যামেরার ঐ যান্ত্রিক উপমাটি ছিন্নপত্র সম্বন্ধে সমগ্রভাবে প্রযোজ্য নয়। তার কারণ ছিন্নপত্রের পাতায় পাতায় যে ছবিগুলির মধ্যে আমাদের মন ডুবে যায় সেগুলি শুধুমাত্র অবিকল প্রতিকৃতি বা অনুকৃতি নয়, সেগুলি দৃশ্যে ধ্বনিতে গন্ধে স্পর্শে মিলিয়ে বিশেষ অনুভূতির, বিশেষ রসের, বিশেষ মূডের সৃষ্টি অর্থাৎ সেগুলি ক্যামেরায় তোলা ছবি নয়, কথা দিয়ে আর্টিস্টের আঁকা ছবি। এইসব ছবিতে বাইরের দৃশ্যসম্পদ যতটুকু আছে, কল্পনার ছোঁয়াচ-লাগা দর্শকের সুকুমার অনুভূতিপ্রবণ মনটি আছে ততখানিই, বা তার চেয়েও বেশি। ছবি তাই কখনো কখনো রেখা-রঙের স্থির সীমা ছাড়িয়ে ঋতুরঙ্গশালায় অনুষ্ঠিত এক-একটি জীবন্ত দৃশ্যবিশেষে রূপান্তরিত : শূন্য প্রান্তরের উপর কালবৈশাখী ঝড়ের

উন্মত্ত তাণ্ডব, পদ্মার বিরাট আকাশ পূর্ণ করে 'রাজবত্মন্নতধ্বনি' মেঘের সমারোহ, ভরা বর্ষায় একাকার নদীপ্রান্তরের উপর বৃষ্টিধারার কখনো দ্রুত কখনো বিলম্বিত লয়ে অবিশ্রাম গান আর নৃত্য। কবিমন আর শুধু দর্শক বা চিত্রশিল্পী নয়, বিশ্বজোড়া এই গীতনাট্যলীলায় সেই মন যেন একেবারে প্রকৃতির অন্তরঙ্গ দোহার।

প্রকৃতির সঙ্গে কবিমনের এই ঘনিষ্ঠতা উপলব্ধির এমন একটি গভীর স্তরের ইঙ্গিতবাহী, কবির জীবনে যা নূতন এবং যার তাৎপর্য অপরিসীম। প্রকৃতির আকর্ষণ কবি যে বাল্যকাল থেকেই অনুভব করেছেন সে কথা সকলেরই জানা। প্রকৃতিকে চকিতে দেখেছেন দূর থেকে: কলকাতায় প্রাচীরের ফাঁক-ফুকর দিয়ে, পেনেটির বাগানবাড়িতে প্রশস্ততর অবকাশের মধ্যে, চন্দননগরে বা গাজিপুরের গঙ্গাতীরে, দার্জিলিঙের সিঞ্চল শিখরে, ডালহৌসি-পর্বতের ছায়ানিবিড় অরণ্যে, কারোয়ারের সমুদ্রতীরে, বিলাতের পথে লোহিত সমুদ্রের স্থির জলের উপর একটি অলৌকিক সূর্যাস্তের মধ্যে। কবি নিজেই বলেছেন, এইসব দেখার রঙ তাঁর জীবনে র'য়ে গেছে, অলক্ষ্যে তাঁর আর্টিস্ট মনটিকে গড়ে তুলেছে। কিন্তু এ হল দূর থেকে ক্ষণিক দেখা, সুদূরকে। ছিন্নপত্রের এই জগতে প্রকৃতিকে কবি আর দূর থেকে দেখছেন না, দেখছেন অত্যন্ত কাছের থেকে— বলা উচিত, একেবারে ভিতর থেকে। এই দেখা যে সব সময় স্বস্তিকর তা নয়, এমনকি রুদ্রমূর্তি প্রকৃতির একটা অপরিমেয় শক্তির প্রকাশ যেখানে দেখেছেন তার মধ্যে যে একটা অমনস্ক নির্মমতা আছে তা মনকে প্রচণ্ড আঘাত করেছে। কবিকে স্বীকার করতে হয়েছে প্রতি মুহূর্তে যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাহচর্য, সেই প্রকৃতির অনেকখানিই বোধের অতীত। কবি তাই বারংবার বলছেন, 'সবটা গ্রহণ করতে পারছি না'। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে, হৃদয়াবেগ দিয়ে, কল্পনা দিয়ে কবি প্রকৃতির সঙ্গে যে একাত্ম হয়ে গেছেন সেই বোধটাই নানা সুরে বার বার প্রকাশ পেয়েছে ছিন্নপত্রে। এই একাত্মতার মূলে তত্ত্ব নেই, আছে নিবিড় ইন্দ্রিয়গত উপলব্ধি। 'সেপ্টেম্বরের সোনালি রোদ্দুরটুকু' কবি 'চোখ দিয়ে চাখ্‌তে চাখ্‌তে' আস্বাদন করেন, জলের উপরকার শৈবালের সরস কোমলতার উপর মনটাকে 'বুলিয়ে বুলিয়ে' অনুভব করেন। কবি লিখেছেন, 'ঐ যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন ভালোবাসি। ওর এই গাছপালা নদীমাঠ কোলাহল নিস্তব্ধতা প্রভাত সন্ধ্যা সমস্তটা সুদ্ধ দুহাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে।' কবির সারা জীবনের প্রকৃতি-সম্ভাষণের ধুয়াটি যেন এই উক্তির মধ্যে প্রথম শুনি। এর মধ্যে কোনো গুরুভার তত্ত্ব নেই, এবং এটা উচ্ছ্বাসমাত্র নয়, এর মধ্যে যে নিবিড় অনুভূতির সহজ প্রকাশ আছে কবি নিজেই তাকে বলেছেন 'নাড়ীর টান'। এই নাড়ীর টানেই কবির বোধ, কবির অনুভূতি বিস্তৃতিতে এবং গভীরতায় যেন প্রকৃতির সমগ্র প্রাণলোককেই অধিকার করেছে। কবি অনুভব করছেন 'যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে— সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে এবং নারকেলগাছের পাতায় জীবনের আবেগে থরথর করে কাঁপছে'। অনুভব করছেন, 'আমার সমস্ত মনটাকে কে যেন তুলিতে করে তুলে নিয়ে এই রঙিন শরৎপ্রকৃতির উপর আর-এক পোঁচ রঙের মতো মাখিয়ে দিচ্ছে'। এই নাড়ীর টানে মাটির সঙ্গে যে রক্তের সম্বন্ধ কবি প্রত্যক্ষ অনুভব করছেন তার যেন আদি-অন্ত নেই। তারই প্রবর্তনায় তাঁর মন চলে যায় প্রকৃতির সেই স্মৃতিহারা আদিম প্রাণলোকে, সেখানে প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে একটি বৃক্ষশিশু রূপে অঙ্কুরিত হয়ে উঠে যেন তিনি স্নান করেন প্রথম সূর্যালোকে, মাটির মাতাকে যেন তাঁর সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে আকণ্ঠ পান করেন তাঁর স্তন্যরস এবং 'একটা মূঢ়

আনন্দে', 'একটা অন্ধজীবনের পুলকে' যেন তার সর্বাঙ্গে ফুল ফোটে, পল্লব উদ্গত হয়। কবির অনুভূতি অভিজ্ঞতার যে গভীর স্তরে মূল প্রসারিত ক'রে আদিম প্রাণধারাকে স্পর্শ করেছে, সেইখান থেকেই আজীবন রস সঞ্চারিত হয়েছে তাঁর চৈতন্যে, তাঁর কল্পনায়, তাঁর অনুভূতিতে। এই 'মূঢ় আনন্দে'ই তাঁর কবিসত্তা পেয়েছে তার চিরকালের প্রতিষ্ঠাভূমি। গ্রীক-পুরাণের আন্টিয়ুস্‌কে কবিস্বভাবের প্রতীক হিসেবে ভাবা চলে: যতক্ষণ তার পদদ্বয় মাটিকে স্পর্শ করে আছে ততক্ষণই সে অজেয়। বৃদ্ধবয়সে বার্ডস্বার্থ ঐ স্পর্শটুকু হারিয়ে শুষ্ক তত্ত্বকে তার স্থলাভিষিক্ত করে তাঁর মনকে করলেন বন্ধ্যা এবং তাঁর কাব্যকে করলেন ব্যর্থ, এটাই তাঁর কবিজীবনের ট্র্যাজেডি। মাটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঐ 'মূঢ় আনন্দে'র যোগ চিরদিন অক্ষুণ্ণ ছিল বলেই বিশ্বপ্রকৃতি কোনোদিনই তাঁর কাছে জীর্ণ হয় নি অথবা তত্ত্বের কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় নি। তাঁর কবিতায় গানে ছবিতে যে প্রকৃতিচেতনার প্রকাশ বিস্ময়রসে ও প্রাণস্পন্দনে চিরনবীন ছিন্নপত্রের পাতাতেই দেখি তার প্রথম উদ্‌ঘাটন,— তত্ত্বের ভাষায় নয়, ম্যাথু আর্নল্ড্‌ যাকে বলেছেন 'natural magic', সেই জাদুর স্পর্শে রূপান্তরিত সরল অনুভূতির ভাষায়। কবির অনুসরণ করে পাঠকও ক্রমে উপনীত হন একটি মনোরম দৃশ্যলোক থেকে সেই বিরাট এবং গভীর দৃষ্টিলোকে যাকে বলা যায় রবীন্দ্রসৃষ্টির চিরকালের পশ্চাৎপট।

৩

এই দৃষ্টিলোক প্রকৃতিচেতনার দ্বারা ওতপ্রোত হলেও মানুষের সংসার তার বাইরে নয়। নিরালায় নিঃসঙ্গ মনের সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় সংযোগ আর তারই পাশে পাশে— বলা যায়, তাকেই পূর্ণ করে— প্রতিদিনের সংসারের মাঝখানে জীবনের অন্তহীন বৈচিত্র্যের মধ্যে সেই মনেরই আর-এক বিহার। মানুষের বিচিত্র জীবনকে কবি দেখেছেন, প্রকৃতিকে যে-চোখে দেখেছেন সেই চোখেই, সেই একই ঔৎসুক্য নিয়ে, উপলব্ধির সেই নিবিড় স্পর্শ দিয়েই। বাস্তব সংসারকে এত কাছের থেকে এত ঘনিষ্ঠভাবে কবি আর কখনো দেখেন নি। এই দেখার বিস্ময় এবং বেদনা, কৌতুক এবং আনন্দ ছিন্নপত্রের পাতায় পাতায় ছড়ানো। কবি দেখেছেন কত বিচিত্র চরিত্রের মানুষ— কত কর্মচারী, গোমস্তা, কত নিরীহ নিরক্ষর চাষীপ্রজা, কত ধুরন্ধর মোড়ল, কত আশ্রয়-প্রশ্রয়-প্রার্থী উমেদার, কত পাগল ভবঘুরে বাউল ও বেদের দল। কয়েকটি বিরল রেখায় আঁকা রেখাচিত্রের মধ্যে রয়ে গেছে তাদের কারো-কারো মুখাবয়ব। তাদের মধ্যে আছে সেই প্রগল্‌ভ মৌলবী যে 'দোঠো কথা' বলতে এসে 'দোঠো ঘণ্টা' কাবার করে দিয়ে যায়, আছেন সেই মিতবাক্‌ কিন্তু সদালাপী গল্পবিলাসী পোস্টমাস্টার। সেই মুন্সেফটিও আছেন যিনি সাজাদপুরের একটি বটবৃক্ষে বৈকুণ্ঠপুরীর যাবতীয় দেবদেবীর যাতায়াত দেখতে পেতেন, আর আছেন কটকের সেই উকিল, 'মোটা সোটা বর্ধিষ্ণু চেহারার' হরিবল্লভবাবু যিনি অগ্রজদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুবাদে গুরুগম্ভীর উপদেশের চাপে কয়েক মুহূর্তেই কবিকে নিষ্পিষ্ট করে ফেলেন। শিলাইদহের ধুরন্ধর দ্বারী মজুমদার দেখা দেন চকিতে, আবার তারই পাশে দেখা দেয় সাজাদপুরের সেই খানসামা যে ভোরবেলা দেরিতে কাজে এসে তিরস্কৃত হলে নতমুখে উত্তর দিয়েছিল যে গতরাত্রে তার মেয়েটির মৃত্যু হয়েছে এবং তার পরেই নীরবে ঝাড়ন-হস্তে প্রতিদিনের কাজে লেগে গিয়েছিল। বিচিত্র অতিথি রূপে দেখা দেন সন্ততিসহ সেই সাহেবদম্পতি যাদের আহার বিহার আলাপ কলহ কবির দিনরাত্রিকে ঘুলিয়ে দিয়ে যায়। দেখা

দেয় সেই চাষীপ্রজা, জীবিকার জন্য যাকে ভিন্ন এলাকায় বসতি করতে হয়েছে কিন্তু প্রাণের টানে যাকে আসতে হয় জমিদারের খোঁজ নিতে, তাঁকে প্রণাম করতে।

কবির চোখ আর কান সংসারের দিকে সজাগ। কত টুকরো ছবি দেখছেন, কত বিক্ষিপ্ত অসম্পূর্ণ নাট্যদৃশ্য, মনের কোন্ গভীরে সেগুলি গ্রথিত হয়ে সজ্জিত হয়ে, জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্রে বিকশিত হয়ে উঠছে। ঘাটে মেয়েদের জটলা, তাদের কতরকম আলাপন: যে দুরন্ত মেয়েটি নৌকায় শ্বশুরঘর করতে গেল তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশঙ্কা, কোন্ প্রতিবেশীর জামাইটি মনোমত হয় নি তার সমালোচনা। প্রবাসী বাড়ি ফিরছে— নৌকা থেকে নেমে হাত-পা ধুয়ে সযত্নে বেশ পরিবর্তন করে, জুতো পায়ে দিয়ে চাদরটি ঝুলিয়ে গৃহমুখে তার ধীর পদক্ষেপ। নদীর পারে নৌকার একটি ভাঙা মাস্তুল নিয়ে উলঙ্গপ্রায় শিশুদের বিচিত্র খেলা এবং ঝগড়া এবং কলরব। বিশেষ করে মনে দাগ রেখে যায় ছোট-করে চুল-ছাঁটা সেই হৃষ্টপুষ্ট শ্যাম্‌লা মেয়েটি যে কোলে একটি ছেলে নিয়ে নির্বোধের মত চক্ষু বিস্ফারিত করে বোটের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে 'ঐ দ্যাখ'। আবার বোটের জানালার সামনেই শুয়োর-ছাগল সমেত একটি বেদের সংসার, তার মধ্যে আবার দারোগার অকস্মাৎ আবির্ভাব এবং হুম্‌কি এবং পরিশেষে একটি মেয়ের অনর্গল কথার তোড়ে বেসামাল হয়ে তার পশ্চাদপসরণ। কবি দেখেছেন দিনের পর দিন শীত গ্রীষ্ম বর্ষায় চাষী মাঝি জেলেদের হাড়ভাঙা খাটুনি, তাদের দারিদ্র্য। সেই সঙ্গে দেখেছেন গোরু-মোষ সমেত নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে চাষী ছেলের সোল্লাস মাতামাতি। আবার অকালবর্ষার প্রকোপে কাঁচা ধান কেটে নৌকা বোঝাই করে চাষীর দল হাহাকার করতে করতে ফিরছে, তাও শুনছেন বোটে ব'সে। শুনছেন সারারাত পাশের নৌকায় মুমূর্ষুর কাৎরানি, আবার শুনছেন ঘরমুখো মাঝি গান ধরেছে, 'যোবতী, ক্যান্ বা কর মন ভারী'। গ্রামবাংলার চিরকালের ঘরকরনার ছবি। ভোরবেলা কবি শোনেন ঘাটে মেয়েদের উলুধ্বনি, তার মধ্যে সেই ঘরকরনার ভিতরে ভিতরে যে বিরাট বিশ্বব্যাপী সুখঃদুখের আন্দোলন আছে তারই সুরটি যেন কবির প্রাণে গিয়ে বাজে। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ 'যারা ঐ জলে নেমে স্নান করছে এবং ডাঙায় বসে বাঁখারি ছুলছে তারা যথাসময়ে ঐ ঘন গাছগুলোর আড়ালে কোন্-একটা জায়গায় তাদের বাড়িতে যাবে। সেইখানে তাদের নিত্যকর্ম এবং চিরজীবনের রঙ্গভূমি। সেখানকার অখ্যাতনামা অকৃতকীর্তি লোকেরা তাদের সর্বাপেক্ষা পরিচিত এবং প্রভাবসম্পন্ন প্রতিবেশী।' চোখ মেলে, কান পেতে, মন পেতে কবি তাদের অখ্যাত জীবনসূত্রগুলি অনুসরণ করে চলেছেন।

মানুষের এই নিবিড় সংস্পর্শ যে কখনো কখনো পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে নি তা নয়। বিরক্তিতে মন বিমুখ হয়ে ওঠে, হাস্যরস দিয়ে আর তাকে সম্পূর্ণ চাপা দেওয়া যায় না: 'অঘোরবাবু বলে একটি কে এসেছে সে পৃথিবীর সমস্ত জড় এবং চেতন পদার্থকে মামাশ্বশুরের ভাগ্‌নে ব'লে উল্লেখ করছে'। আবার 'একটি সংগীতকুশল লোক অর্ধেক রাত্রে ভৈরোঁ আলাপ করতে লাগল। বিবিধ কারণে সেটা নিতান্ত অসাময়িক বলে বোধ হতে লাগল।' অকাস্মাৎ ক্রোধের স্ফুলিঙ্গ জলে উঠেছে। একজন বাঙালীর নিমন্ত্রণে অতিথিরূপে এসে 'পূর্ণপরিণত জনবৃষ', সেই 'উৎকট ইংরেজটি' একঘর বাঙালীর মুখের উপর বলে কিনা 'এ দেশে moral standard low', এখানকার লোকের lifeএর sacredness সম্বন্ধে যথেষ্ট বিশ্বাস নেই, এরা জুরি হবার যোগ্য নয়! আবার কখনো কখনো হতাশা জাগে মনে, যখন দেখেন বর্ষায় ভাঙা কুঁড়ে ঘরের আবর্জনার মধ্যে রাজ্যের কীটপতঙ্গ ও সরীসৃপের সঙ্গে নিরুপায় মানুষকে একত্র বসবাস করতে

হচ্ছে, যখন দেখেন গৃহস্থবাড়ির মেয়েরা ভিজে শাড়ি গায়ে জড়িয়ে বাদলার ঠাণ্ডা হাওয়ায় বৃষ্টির জলে ভিজতে ভিজতে হাঁটুর উপর কাপড় তুলে জল ঠেলে ঠেলে 'সহিষ্ণু জন্তুর মতো' ঘরকন্নার কাজে ব্যাপৃত আর 'ঘরে ঘরে বাতে ধরছে, পা ফুলছে, পিলেওয়ালা ছেলেরা অবিশ্রাম কাঁদছে, কিছুতেই তাদের বাঁচাতে পারছে না'। যখন দেখেন নদীর ঘাটে অস্থিসার উলঙ্গ ছেলেটি প্রচণ্ড শীতে থরথর করে কাঁপছে এবং তারই মা আপাদমস্তক যথোচিত বস্ত্রাবৃত হয়ে স্নান করাবার অছিলায় ডাকিনীর মতো তাকে নির্মম প্রহার করছে অথবা যখন দেখেন একপাল নিরীহ মোষ নদীতীরে নতুন কচি ঘাসের মধ্যে নাক ডুবিয়ে দিয়ে পরম আরামে কচরমচর করে খাচ্ছে আর ছোট্ট একটি রাখাল বালক নেহাত রাখালিবৃত্তির উৎসাহে বৃহৎ একটি লাঠি নিয়ে, নিতান্ত অকারণে, তাদের তাড়না করছে এবং আহারে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে— তখন একটা প্রচণ্ড এবং অসহায় ক্ষোভে মনটা বিকল হয়ে যায়।

কিন্তু মানুষের অবস্থার এই শ্রীহীন দীনতা এবং স্বভাবের এই জড়তা এবং কার্পণ্যকেই যদি একান্ত ক'রে দেখা যায় তাহলে মানতেই হয় যে প্রকৃতির প্রাণলোকে মানুষ খাপছাড়া, একটি মূর্তিমান ছন্দপতন। কবি নিজেই লক্ষ্য করছেন যে বিশেষ অবস্থায় 'একটিমাত্র মানুষ কেবলমাত্র সামনে উপস্থিত থাকলেই প্রকৃতির অর্ধেক কথা কানে আসে না'। কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ যে সামঞ্জস্যহীন বিক্ষেপমাত্র নয়, তার মধ্যেও যে একটা ছন্দ আছে, সুর আছে, প্রকৃতির সঙ্গে যার মূলগত বিরোধ নেই, এই উপলব্ধি বিশেষ সুযোগের এবং বিশেষ দৃষ্টির অপেক্ষা রাখে। ছিন্নপত্রের জগতে সেই সুযোগ ছিল অপর্যাপ্ত এবং যে দৃষ্টিতে মানুষকে তার সমস্ত অসংগতি সমেত সমগ্রভাবে দেখা যায় সে দৃষ্টিও ছিল কবির প্রকৃতিচেতনারই অঙ্গ। কবি মানুষকে দেখেছেন প্রকৃতি থেকে বিবিক্ত করে নয়, প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত করে, বলেছেন: 'মানুষও নানা শাখা-প্রশাখা নিয়ে নদীর মতোই চলেছে— তার একপ্রান্ত জন্মশিখরে আর-এক প্রান্ত মরণসাগরে, দুই দিকে দুই অন্ধকার রহস্য, মাঝখানে বিচিত্র লীলা এবং কর্ম এবং কলধ্বনি— কোনোকালে এর আর শেষ নেই।' প্রকৃতির মধ্যে যে প্রাণগঙ্গা প্রবাহিত তারই একটি বিশেষ ধারা যেন মানুষের সংসারের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে— কত সুখ-দুঃখের তরঙ্গ তুলে, কত ভুল-ভ্রান্তি দ্বন্দ্ব-সংক্ষোভের আবর্ত রচনা করে, কত স্নেহ-প্রেমের ঈর্ষা-দ্বেষের হাস্য-পরিহাসের আলোছায়ার মধ্যে, ব্যক্তিতে অব্যক্তে, মানুষের জীবনটিকে প্রবাহিত করে নিয়ে চলেছে। যে পদ্মার স্রোতে কবি ভাসমান তাকেই যেন সেই ধারাটির রূপকল্প হিসেবে দেখছেন। বোটের তক্তার উপর পা রাখলেই অনুভব করছেন নীচে কত বিচিত্র শিহরণ কম্পন, কত বিভিন্ন স্রোতের অবিশ্রাম গতি, সংঘাত এবং আন্দোলন। কবি লিখেছেন, 'ঠিক যেন আমি সমস্ত দেশের নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করছি'। উক্তিটি প্রায় প্রতীকধর্মী। বাংলাদেশের নাড়ীর স্পন্দন তিনি অনুভব করেছেন এবং তারই ফলে প্রবেশাধিকার লাভ করেছেন মানবলোকের মর্মস্থানে, প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন সেই মানবসত্যে যার মধ্যে সমস্ত বিরোধের মিল, সমস্ত অসংগতির গভীরতম সামঞ্জস্য। যিনি দেশের মহাকবি হবেন— বিশেষ করে, যিনি গল্পগুচ্ছের গল্পগুলি লিখছেন এবং লিখবেন— এটাই তো তাঁর প্রাথমিক দীক্ষা।

৪

প্রকৃতি ও মানুষ সম্বন্ধে কবির এই গভীর চেতনার মধ্যে যেমন তাঁর সূক্ষ্ম সংবেদনশীল মনের একটা ঐশ্বর্যমণ্ডিত পরিচয় আছে, তেমনি প্রতিদিনের জীবনে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিবেশের মধ্যে রুচি অভ্যাস অনুরাগ বিরাগ

ইত্যাদির ভিতর দিয়ে সেই মনের যেসব বিচিত্র মানবিক লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে সেগুলি তাঁর মনের অন্তরঙ্গ ছবিটি পূর্ণতর করেছে। কবি আছেন কখনো বোটে, কখনো কুঠিবাড়িতে বা বোলপুরে 'শান্তিনিকেতনে'— কখনো ভ্রাম্যমাণ, কখনো নিজের কোণটি দখল করে বৈষয়িক কাজে অথবা সাহিত্যরচনায় অথবা নির্জন অবকাশে নিমগ্ন। কিন্তু যেখানে যেভাবেই থাকুন, সকলের সঙ্গেই, সব-কিছুর সঙ্গেই তাঁর সজাগ সানুরাগ সাযুজ্যবোধ— কখনো কখনো একটা মৃদু হাস্যের স্নিগ্ধ রশ্মিপাতে সমুজ্জ্বল। সস্নেহ কৌতুকে শুনছেন ছেলেমেয়েদের আলাপন : 'বেলি স্পষ্টই বলছে সে বিলেতের নীচেই বোলপুর ভালোবাসে, খোকাও সেই মতে ডিটো দিয়ে যাচ্ছে— রেণুকা কোনোপ্রকার ব্যক্ত শব্দে আপন মনের ভাব প্রকাশ করতে পারছে না… সে কেবল চতুর্দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করছে এবং অঙ্গুলির অনুগামী হবার চেষ্টা করছে…'। 'কনিষ্ঠ শাবকটিও' (মীরা) বড় কম নন, তার বিচিত্র কীর্তিকলাপ কবির প্রাত্যহিক রিপোর্টে কখনো কখনো সবিস্তারে বর্ণিত। 'বোট-লক্ষ্মী' পদ্মার চরে বেড়াতে গিয়ে হারিয়ে গেলেন ; লোহার ব্রিজে মাস্তুল ঠেকে অকস্মাৎ নৌকাডুবি হবার উপক্রম ; সাহেব-অতিথি আসছেন, ভাঁড়ারে সন্ধান করে খবর পান অতিথি-সৎকারের জন্য আছে শুধু কাৎলি আর পদ্মার জল ; লোকেন পালিতের সঙ্গে জ্যোৎস্নায় রাত্রি দেড়টা পর্যন্ত পদব্রজে ভ্রমণ ; সভাপতিরূপে গ্রামের ছাত্রসভায় বিনয়গুণ-সম্বন্ধে ইংরেজিতে অনবদ্য বক্তৃতা শ্রবণ ; 'কলকাতার তেতলা' থেকে একটি 'নাকি সুরের গৃহবিপ্লবের' কাহিনী বহন করে অকস্মাৎ ভজিয়ার ভয়াবহ আবির্ভাব— এই রকম ছোটখাটো ঘটনা বা দুর্ঘটনা কৌতুকহাস্যে মণ্ডিত হয়ে বিচিত্র রসে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। কোমরের ব্যথাই হোক বা দুর্বোধ্য টেলিগ্রামই হোক, নুড়ির উপর ঝর্নার মতো কবিমনের কৌতুকলীলা তার উপর উচ্ছল হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে আছে গভীর মমতা এবং সমবেদনা— তার পাত্র হয়তো সেই রূপচাঁদ খেধার মতো স্থূলকায় নির্বোধ কিন্তু অতিশয় সরল এবং ভক্ত প্রজা, অথবা এস্টেটের সেই দুটি নিরীহ হাতি কিম্বা নদীর তীরে তৃণভোজী একপাল নির্বিরোধ মোষ। ক্ষুদ্রতম প্রাণকণার মধ্যেও যেখানে আনন্দের প্রকাশ আছে তার প্রতি কবির সচেতন অনুরাগ : 'একটি পাখির সুকোমল পালকে আবৃত স্পন্দমান বক্ষটুকুর মধ্যে জীবনের আনন্দ যে কত প্রবল তা আমি অচেতনভাবে ভুলে থাকতে পারি না।'

সব কিছুকে স্পর্শ করবার, অনুভব করবার শক্তি নিয়ে কবির জাগ্রত চিত্তটি সব দিকেই প্রসারিত। সেই সঙ্গেই আছে অক্লান্ত মননসাধনার পরিচয়। জীবনস্মৃতিতে এই সময়টির উল্লেখ ক'রে কবি নিজেই বলেছেন, সাধনা'র সম্পাদক রূপে তিনি 'অবিশ্রাম গদ্যপদ্যের জুড়ি হাঁকিয়ে' চলেছেন এবং মফস্বলে লোকেন পালিতের বাংলো-ঘরে তাঁদের কাব্যালোচনা এবং সংগীতের সভা কতদিন 'সন্ধ্যাতারার আমলে শুরু হয়ে শুকতারার আমলে ভোরের হাওয়ার মধ্যে রাত্রের দীপশিখার সঙ্গে সঙ্গেই' অবসান হয়েছে। একটু খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যায় এই সময় সোনার তরী, চিত্রা প্রভৃতি কাব্য এবং গল্পগুচ্ছের প্রথম দিককার গল্পগুলি রচনা করা ছাড়াও শিক্ষাসমস্যার মূলগত প্রশ্নের আলোচনা করছেন, গ্রাম্য ছড়া ও গান সংগ্রহ করছেন এবং তার আলোচনা শুরু করেছেন, সাধনায় অক্লান্তভাবে লিখে চলেছেন বিস্তৃত রাজনৈতিক মন্তব্য, বিচিত্র সমাজসমস্যার বুদ্ধিদীপ্ত সুদূরপ্রসারী সমালোচনা, সেই সঙ্গে চলেছে ভারতবর্ষের একটি নিত্যরূপের সন্ধান। কবি লিখেছেন, 'সাধনা আমার হাতের কুঠারের মতো, আমাদের দেশের বৃহৎ সামাজিক অরণ্য ছেদন করার জন্য একে আমি ফেলে রেখে মরচে পড়তে দেব না।'

ছিন্নপত্রে এই মননসাধনার ভার নেই, আছে তার প্রতিফলিত দ্যুতি। কবির সঙ্গে ফিরছে কত

বিচিত্র ধরণের বই— কালিদাস শেক্সপীয়র কীট্‌সের কাব্যগ্রন্থ থেকে শুরু করে 'animal magnetism' সম্বন্ধে বই, কিম্বা Caird's *Philosophical Essays* ইত্যাদি। কিন্তু বই মনকে চাপা দেয় নি, প্রকৃতি মানুষ বা পারিপার্শ্বিকের মতোই মনকে সঙ্গ দান করছে। অনেক বই আছে যাদের স্পর্শমাত্র করবেন না; কিছু আছে যাদের অপেক্ষা করতে হবে দীর্ঘকাল; 'মৃত কবিকে' অনেক সময় 'জীবিত পোস্টমাস্টারে' জন্য স্থান ছেড়ে দিতে হচ্ছে। তাই বিশ্রম্ভালাপের সূত্র কখনো ছিন্ন হয় নি, বিচিত্রিত হয়েছে নানা প্রসঙ্গের অবতারণায়— তার মধ্যে আছে আর্টপ্রসঙ্গ, কাব্যতত্ত্ব, সৌন্দর্যচর্চা এবং সুবিধার চর্চা, রসিকতার বিপদ, গদ্যপদ্যের প্রভেদ, নাটকরচনার মূল সমস্যা। সেই সঙ্গে আছে সুখতত্ত্ব, নারী-পুরুষের সম্বন্ধ, ইংরেজ ও ভারতবাসী, খণ্ডকাল ও অনন্তকাল, মায়াবাদ, সোশিয়ালিজম্। গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় আছে এইসব বিক্ষিপ্ত উক্তির মধ্যে, আছে বুদ্ধির চমক, আছে অনুভূতির এবং কল্পনার তির্যক আলোকসম্পাত— কিন্তু কোনোটিকেই তত্ত্বের আকারে খাড়া করবার তাগিদ নেই। সমস্ত চিন্তার, সমস্ত তত্ত্বের একমাত্র কষ্টিপাথর হল জীবন এবং জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে স্বতঃস্ফূর্ত প্রত্যয়। নিছক একটি মতবাদ হিসেবে সোশিয়ালিজমের কী মূল্য সে বিতর্কে কবির উৎসাহ নেই, শুধু যখন তাঁর দরিদ্র অনাহারক্লিষ্ট ব্যাধিজর্জরিত রায়তদের দেখেন তখন মনে হয় 'সোশিয়ালিস্টরা যে সমস্ত পৃথিবীর ধন বিভাগ করে দেয় সেটা সম্ভব কি অসম্ভব ঠিক জানি নে— যদি একেবারেই অসম্ভব হয় তাহলে বিধির বিধান বড়ো নিষ্ঠুর, মানুষ ভারি হতভাগা।'

৫

এরই মধ্যে একটি রহস্যনিকেতনের দ্বারে এসে মাঝে মাঝে মন থমকে দাঁড়ায়। সেটি কবির নিজেরই অন্তর্লোক। এও যেন একটি জগৎ, প্রকৃতির মতোই রহস্যময়, অনেকখানিই সাধারণবুদ্ধির অতীত। এখানকার ঋতু ছ-টা নয়, একেবারে বাহান্নটা, 'এক প্যাকেট তাসের মতো— কখন কোন্‌টা হাতে এসে যায় তার কিছু ঠিক নেই'। ভিতরের দিকে তাকালে বিস্ময়ের, কৌতূহলের অবধি থাকে না: 'চতুর্দিকে শিরা উপশিরা স্নায়ু মস্তিষ্ক মজ্জার ভিতর কী এক অবিশ্রাম ইন্দ্রজাল চলেছে, হুহুঃ শব্দে রক্তস্রোত ছুটেছে··· স্নায়ুজাল কাঁপছে হৃৎপিণ্ড উঠছে আর নামছে আর রহস্যময়ী মানবপ্রকৃতির ঋতুপরিবর্তন হচ্ছে'। আর সেই সঙ্গে মুহূর্তে মুহূর্তে পৃথিবীর চেহারা পালটাচ্ছে, জীবনের স্বাদ যাচ্ছে বদলে। আপন স্কন্ধ-সংলগ্ন 'এই ভয়ংকর রহস্যটি'র সূত্র ধ'রে কবি আবিষ্কার করেন: 'আমি জানি আমার এক অংশ পাগল— যতই ইচ্ছা করি, চেষ্টা করি, আমি ইহজীবনে কিছুতেই তাকে বাঁধতে পারব না'। রক্তের মধ্যে যখন সেই পাগলের নৃত্য শুরু হয় তখন কত ব্যবস্থার ওলটপালট হয়, কত জরুরি কাজ পণ্ড হয়ে যায় তার হিসেব কে করে। কবির ছন্দকে সুরকে তখন সে-ই অধিকার করে নেয়। 'মদগর্বিত যুবতী' যেমন তার প্রেমিকদের কাউকেই হাতছাড়া করতে চায় না, ঠিক তেমনি কবির মন 'মিউজ'দের সব কটির দিকেই লোভীর মতন হাত বাড়ায়, ছবি-আঁকাও বাদ যায় না। মনের এই খ্যাপা অংশটার ঠিক পাশেই আর-একটি অংশে একটি 'গোছানো গিন্নিপনা'র দেখা পাওয়া যায়— 'সে দরকার বুঝে ব্যয় করে, সামান্য কারণে বলের অপব্যয় করতে চায় না'। স্বভাবের ভিতরকার এই দ্বৈততত্ত্ব কবির মনকে নিয়ত টানছে দুই দিকে— কখনো স্থিতির দিকে কখনো চঞ্চলতার দিকে। সচেতনভাবে অথবা অবচেতনভাবে মনের উপর এই বিপরীত আকর্ষণের প্রভাব

ছিন্নপত্রের পাতায় বিচিত্রভাবে প্রতিফলিত। একদিকে পদ্মা কবির মনকে অধিকার করে আছে, ইন্দ্রের যেমন ঐরাবত, পদ্মাও তেমনি তাঁর 'যথার্থ বাহন' এবং বোটটি যেন তাঁর 'পুরোনো ড্রেসিং গাউনের মতো'। আবার অন্যদিকে, অনেককাল বোটের মধ্যে বাস ক'রে হঠাৎ সাজাদপুরের বাড়িতে এসে উত্তীর্ণ হলে বড় ভালো লাগে: 'আমি চারিটি বৃহৎ ঘরের একলা মালিক— সমস্ত দরজাগুলি খুলে বসে থাকি'। একবার বলছেন 'আমার কিন্তু আর ভ্রমণ করতে ইচ্ছে করছে না। ভারি ইচ্ছে করছে একটি কোণের মধ্যে আড্ডা ক'রে একটু নিরিবিলি হয়ে বসি।' বলছেন 'সভ্যসমাজের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থেকে যদি তারই একটি কোণে বসে মৌমাছির মতো আপনার মৌচাকটি ভরে ভালোবাসা সঞ্চয় করতে পারি তা হলেই আর কিছু চাই নে'। আবার উলটো কথাটিও বলছেন একই আবেগের ভাষায়: অনুকূল সুযোগ পেলে 'কবির গান গলায় নিয়ে একটি ছিপছিপে ডিঙিতে জোয়ারের বেলায় পৃথিবীতে ভেসে পড়ি, গান গাই এবং বশ করি এবং দেখে আসি পৃথিবীতে কোথায় কী আছে; আপনাকেও একবার জানান দিই, অন্যকেও একবার জানি'। মনের এই 'উভচরবৃত্তি' সম্বন্ধে কবি ক্রমে সচেতন হয়ে উঠছেন, অনুভব করছেন, 'আকাশও দুই হাত বাড়িয়ে ডাকে এবং গৃহও দুই হাত ধরে টেনে নিয়ে আসে'। শেলির এবং গ্যয়টের জীবনী পড়ে বৃহত্তর জগতে চিত্তের সঙ্গে চিত্তের সংঘাতে, আদর্শের সঙ্গে আদর্শের সংঘর্ষে বৈদ্যুতিময় বৃহত্তর জীবনের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবেন, 'কোথায় নদীতীরে পতিসর, বোটের মধ্যে আমি, আর কোথায় বিচিত্রকর্মসংকুল ভাইমারের রাজসভায় রাজকবি গেটে'! আবার যখন কতকগুলি খবরের কাগজের 'কাঁচিছাঁটা টুকরো'র মধ্যে 'প্যারিসের আর্টিস্ট সম্প্রদায়ের উদ্দাম উন্মত্ততার' বিবরণ পাঠ করেন তখন মনে হয় সেই কৃত্রিম উত্তেজনার তুলনায় তাঁর চারপাশে ঐ গ্রামের নিরীহ নিরক্ষর মানুষদের 'স্বচ্ছ সরলতা' সহস্রগুণে শ্রেয়— 'সে যেন গঙ্গার মতো, তার মধ্যে স্নান ক'রে সংসারের অনেক তাপ দূর হয়ে যায়'। অতীত এবং ভবিষ্যৎ মনের উপর মাঝে মাঝে মায়াজাল বিস্তার করে। অতীতের স্মৃতি যেন বোতলে-ভরা মদিরা 'in the deep-delved earth'— মনকে উড়িয়ে নিয়ে যায় চিলের ডাকে মন-কেমন-করা সেই শৈশবের নির্জন মধ্যাহ্নে অথবা বাল্যকালের সেই প্রভাতে যখন বোলপুরের জনশূন্য খোয়াইয়ের মধ্যে বসে Lett's Diaryর পাতা ভরিয়ে লিখেছিলেন 'পৃথ্বিরাজ-পরাজয়'। ভবিষ্যতের স্বপ্নও আসে কখনো মৃদু পরিহাসে মণ্ডিত হয়ে অভিসারিকা posterityর রহস্যময় রূপ ধরে, কখনো বা আসে স্থির প্রত্যয়ের মুক্ত আলোয় বলিষ্ঠ সংকল্পের প্রত্যাশিত মূর্তি নিয়ে: 'এক-এক সময়ে আমি নিজেই খুব দূর ভবিষ্যতের যেন ছবি দেখতে পাই— আমি দেখতে পাই, আমি বৃদ্ধ পক্ককেশ হয়ে গেছি, একটি বৃহৎ বিশৃঙ্খল অরণ্যের প্রায় শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌঁছেছি, অরণ্যের মাঝখান দিয়ে বরাবর সুদীর্ঘ একটি পথ কেটে দিয়ে গেছি এবং অরণ্যের অন্য প্রান্তে আমার পরবর্তী পথিকেরা সেই পথের মুখে কেউ কেউ প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছে, গোধূলির আলোকে দুই-এক জনকে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে'। কিন্তু সেই সঙ্গেই শুনছেন নিজের মধ্যে মেহের আলির মতো কে একজন তাঁকে সতর্ক করে দিচ্ছে, অনুভব করছেন একটা অমোঘ শক্তি যা সমস্ত বিক্ষেপ থেকে তাঁর মনটিকে ফিরিয়ে এনে বর্তমান কালখণ্ডের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে দিচ্ছে, যে জীবন প্রত্যক্ষ তারই রন্ধ্রে-রন্ধ্রে অস্তিত্বের শিকড়জাল বিস্তার করে সব দিক থেকে তাকে বেষ্টন ক'রে তারই ভিতর থেকে সুখ-দুঃখ কৌতুক-উল্লাসের বিচিত্র রস আকর্ষণ করে আত্মসাৎ করতে নিযুক্ত করে দিচ্ছে। ঠিক যেমন করে একটি বনস্পতি তার গূঢ়তম শিকড় থেকে ঊর্ধ্বতম পল্লবাগ্র

পর্যন্ত সমস্ত শরীর দিয়ে মাটি জল আলো বাতাস থেকে সংগ্রহ করে সেই 'দাহহীন চির অগ্নি' যা একদিন ফুল ফল কচিপাতায় প্রাণের পূর্ণতাকে প্রচার করে। কবি অনুভব করছেন, 'সেই শক্তির হাতে আত্মসমর্পণ করাই জীবনের আনন্দ। সে যে কেবল প্রকাশ করায় তা নয়, সে অভনুব করায়, ভালোবাসায়, সেইজন্য অনুভূতি নিজের কাছে প্রত্যেকবার নূতন ও বিস্ময়কর'। কবি এই শক্তিকেই তাঁর কবিস্বভাব বলে আবিষ্কার করলেন। আমরা আরো একটু স্পষ্ট করে একেই বলতে পারি কবি-প্রতিভা। এটা হল সেই সৃজনীশক্তি যার মধ্যে আছে সমস্ত অসংগতি, সমস্ত আপাত-বিরুদ্ধতার সমন্বয়ের সূত্রটি— এই সমন্বয় শুধু জমিদারির সঙ্গে আস্‌মানদারির নয়, মনের এক অংশের সঙ্গে আর-এক অংশের, মনের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির, মনের সঙ্গে মানব-সংসারের। কবির নিজের মধ্যেও যে 'অনাদিকাল ধরে একটা সৃজন চলছে' তার গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে কবি সচেতন হয়ে উঠছেন, তার দিকে তাকিয়ে প্রত্যয় জাগছে, 'সমস্তটা মিলে জীবনটাকে একটা সমগ্রতা দিতে পারব'। বহুকালের প্রেয়সী সেই কবিতার কাছেই তাঁর আসল জীবনটি 'বন্ধক' আছে: 'সাধনাই লিখি আর জমিদারিই দেখি, যেমনি কবিতা লিখতে আরম্ভ করি অমনি আমার চিরকালের যথার্থ আপনার মধ্যে প্রবেশ করি— আমি বেশ বুঝতে পারি এই আমার স্থান।…সেই আমার জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের একমাত্র আশ্রয়স্থল।' আপন কবিসত্তার নিত্য আশ্রয় রূপে যাকে আবিষ্কার করলেন সেটাই তাঁর সকল উপলব্ধির, সকল প্রত্যয়ের, সকল প্রেরণার উৎস: 'আমার দৈনিক জীবনের সমস্ত ঘটনা সমস্ত শোকদুঃখের মধ্যস্থলে একটি অত্যন্ত নিস্তব্ধ জায়গা আছে, সেইখানে আমি নিমগ্ন হয়ে বসে সমস্ত বিস্মৃত হয়ে আপনার সৃষ্টিকার্যে নিযুক্ত আছি— সুখে আছি।' কবি নিজেকে দেখছেন স্বধর্মে সপ্রতিষ্ঠ। এই ধর্ম কবিধর্ম— পরবর্তীকালে যাকে বলেছেন 'the religion of a poet'— যে ধর্ম তাঁর 'জীবনের ভিতরে সংসারের দুঃসহ তাপে ক্রিস্টালাইজ্‌ড্' হয়ে উঠেছে। এই ধর্মের মন্ত্র কোনো শাস্ত্র থেকে বা গুরুভার গুরুবাক্য থেকে পান নি, পেয়েছেন সকল উপলব্ধির কেন্দ্রে যে ধ্রুব অক্ষুব্ধ আনন্দকে আপন কবিস্বভাবের মধ্যে গ্রহণ করেছেন সেইখান থেকে। এই কবিধর্মের মন্ত্র হল 'সর্বাস্তিবোধে'র মন্ত্র: 'আমি আছি আর আমার সঙ্গে আর সমস্তই আছে'। কবি বলছেন, '"আছি" এই কথাটাই একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার, সমস্ত প্রকৃতির এইটেই আদিম এবং সর্বব্যাপী আনন্দ'। এই আনন্দই সকল সৃষ্টির নিত্য উৎস এবং নিত্য সার্থকতা। কবিধর্মের মধ্যেই তিনি পেলেন কবিকর্মের প্রাথমিক নির্দেশ: 'কবিদের একটা প্রধান কাজ, এই পৃথিবীটাকে সর্বদা তাজা রেখে দেওয়া'। তাই জীবনের সুখদুঃখের মন্থনের মধ্যে কবি আছেন একটি 'সজীব পিয়ানো'র মতো: 'ভিতরে অন্ধকারের মধ্যে অনেকগুলো তার এবং কলবল— কখন কে এসে বাজায় কিছুই জানি নে— কেন বাজে তাও সম্পূর্ণ বোঝা শক্ত— কেবল কী বাজে সেইটেই জানি— সুখ বাজে কি ব্যথা বাজে, কড়ি বাজে কি কোমল বাজে, তালে বাজে কি বেতালে বাজে এইটুকুই বুঝতে পারি'। এইটুকুর মধ্যেই আর্টিস্টের গভীরতম সার্থকতা। তারই উপলব্ধি কৃতজ্ঞতার ভাষায় বারবার প্রকাশিত: 'সম্মুখে আনন্দময় প্রকাণ্ড জগৎ জীবনে যৌবনে সৌন্দর্যে সুবিস্তীর্ণ হয়ে রয়েছে। …মনে হয় আমি এ জগতে জন্মগ্রহণ করেছি বলে ধন্য, এ জগতে অনন্তকাল থাকব বলে আমি ধন্য— আমি যা জেনেছি, যা পেয়েছি, যা অনুভব করেছি তা একটিমাত্র হৃদয়ের পক্ষে আশ্চর্য বৃহৎ।' সেই সঙ্গে শুনি কবিমনের চিরকালের অভীপ্সা: 'হৃদয়ের ঠিক মাঝখানটা বিদীর্ণ ক'রে কবে সেই সুর বেরোবে যার দ্বারা এর সংগীত ঠিক ব্যক্ত হবে'!

৬

রবীন্দ্রনাথের অনেক গল্পের অনেক কবিতার ভাব চিত্রকল্প ও চরিত্রচিত্রের বীজ বা অঙ্কুর যে ছিন্নপত্রের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে তা সকলেই লক্ষ্য করেছেন এবং এ বিষয় আলোচনাও অনেকে করেছেন। কবিকৃতির ইতিহাসসূত্রের অন্বেষণে ছিন্নপত্রের যে একটা ব্যবহারিক মূল্য আছে তা স্বীকার করেও এ কথা স্পষ্ট ক'রে বলা দরকার যে হেন্‌রি জেম্‌সের *Notebooks*এর মতো নিছক আকর গ্রন্থ হিসেবেই ছিন্নপত্রের মূল্য বা পরিচয় নয়। বই হিসেবে হেন্‌রি জেম্‌সের *Notebooks*এর একমাত্র আকর্ষণ হল এই যে এর মধ্য দিয়ে আমরা প্রবেশ করি আর্টিস্টের কারখানা-ঘরে, সেখানে আমাদের পরিচয় ঘটে কারিগরের মালমসলার সঙ্গে, তাঁর বিচিত্র কলকব্জা-যন্ত্রপাতির এবং তাদের ব্যবহারপদ্ধতির সঙ্গে। আমরা দেখি তাঁর আঙ্গিকগত সমস্যা এবং তার সমাধানপ্রচেষ্টা, দেখি তাঁর কাজের রুটিন এবং প্ল্যানের ব্লু-প্রিন্ট এবং এইভাবে পর্যায়ক্রমে তাঁর কাজের ধারাটিকে তার পরিণাম পর্যন্ত অনুসরণ করে তুলনামূলক বিচারে প্রবৃত্ত হতে পারি— এই জাতীয় বইয়ের এইটাই একমাত্র সার্থকতা। কিন্তু ছিন্নপত্র এইরকম একজন আর্টিস্টের 'log-book' মাত্র নয়, বই হিসেবেই এর মধ্যে আছে একটি অত্যাশ্চর্য পূর্ণতা। এই বই আমাদের আর্টিস্টের কারখানা-ঘরে নিয়ে যায় না, নিয়ে যায় তাঁর জীবন্ত জগৎটির মাঝখানে। এই জগৎ প্রকৃতি, মানুষ ও কবির অন্তর্লোক দিয়ে তৈরি এবং তার কেন্দ্রে সব-কিছুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে, ব্যাপ্ত হয়ে যৌবনের ঐশ্বর্যে মণ্ডিত যে আর্টিস্টের মনটি প্রকাশিত তারই সঙ্গে আমাদের অন্তরঙ্গ পরিচয়। আমরা দেখি এই মনের নানা দিক, নানা dimension : এই মন ইন্দ্রিয়ের সহস্র বন্ধনে প্রত্যক্ষের সঙ্গে বাঁধা আবার চিন্তার, কল্পনার ডানায় আকাশচারী ; তার মধ্যে মিলেছে কর্মের সজাগ উৎসাহ, জীবনসম্ভোগ, গভীর থেকে গভীরতর আত্মসমীক্ষা এবং প্রাণের রাজ্যে সকলের সঙ্গে, সব-কিছুর সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তাবোধ। যৌবনের লাবণ্যে এবং স্বাস্থ্যে, শক্তিতে এবং প্রাণপ্রাচুর্যে, কৌতুকহাস্যের অজস্র রশ্মিবিকিরণে, আর্টিস্টের প্রত্যয়ে এবং আনন্দে এই মন যে পূর্ণতার মূর্তিতে প্রকাশিত সেটা স্থাণু নয়, তার মধ্যেই নিহিত আছে বিবর্তনের ইঙ্গিত— ভ'রে ওঠার, ফ'লে ওঠার, সীমা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে সত্তার মাটিতে প্রাণের দখলটিকে নিয়ত বিস্তৃত ক'রে বেড়ে ওঠার প্রচ্ছন্ন ইতিহাস।

রিল্‌কে এক তরুণ কবি-দীক্ষাপ্রার্থীকে একটি সংক্ষিপ্ত উপদেশ দিয়েছিলেন, 'let life happen to you'— 'প্রাণসম্পদে সমৃদ্ধ হও'। আর্টিস্টের জীবনে এটি বীজমন্ত্রের তুল্য। প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা আর্টিস্টের অন্তরে যে স্পর্শমণিটি আছে তারই স্পর্শে রূপান্তরিত হয়ে যায় সেই প্রাণসম্পদে, সেই আনন্দে, যা সকল সৃষ্টির উৎস। এই আনন্দে, এই প্রাণসম্পদে কেমন করে একজন আর্টিস্টের হৃদয়ের পাত্রটি দিনে দিনে পূর্ণ হ'য়ে উঠল, ছিন্নপত্রের পাতায় তা আমরা প্রত্যক্ষ দেখতে পেলাম। যে আর্টিস্টের মধ্যে এই প্রাণসম্পদের যে পরিমাণে ঘাটতি বা বিকৃতি সেই পরিমাণেই তাঁর পরাজয় বা ব্যর্থতা। এই সূত্রে মনে পড়বে রবীন্দ্রনাথেরই 'নির্জনের বন্ধু' আমিয়েলের কথা। নির্জনের বন্ধু হবার মতো অনেক সদ্‌গুণই আমিয়েলের ছিল— চিন্তাশক্তি, সুকুমার অনুভূতি, সত্যকে অন্বেষণ ও গ্রহণ করবার সংসাহস এবং আন্তরিকতা, অনাড়ম্বর সহজ ভাষণ এবং সর্বোপরি গোঁড়ামি-বর্জিত বৈদগ্ধ্য। রবীন্দ্রনাথের মতো অনেকেই আমিয়েলের এই সুদীর্ঘ তিরিশ বছরের দিনপঞ্জীটিকে একখানি অন্তরঙ্গ গ্রন্থ হিসেবে সমাদর করেছেন। কিন্তু ছিন্নপত্রের সঙ্গে মিলিয়ে এই সুবিশাল জর্নালটি— বিশেষ করে তার যৌবনকালের অংশটি—পড়লেই দুখানি বইয়ের

পার্থক্যটি ধরা পড়ে। আমিয়েল ছিলেন গ্রন্থাগারের জীব, জীবনের সকল ক্ষেত্র থেকে পশ্চাদপসরণ ক'রে আশ্রয় নিয়েছেন পাঠকক্ষের নির্জনতায়, তার পর সেইখানেই আজীবন স্বগতোচ্চারিত কথার মনোরম উর্ণাজালে নিজেকে আবৃত করেছেন, প্রত্যক্ষ জগৎটি তার পিছনে কোথায় হারিয়ে গেছে। আমিয়েলের শান্ত, অত্যন্ত মৃদু এবং ঈষৎ বিষণ্ণ কণ্ঠস্বরের সম্মোহন পাঠকমাত্রেই অনুভব করবেন, কিন্তু সেই সঙ্গেই অনুভব করবেন যে এই অত্যন্ত সুকুমার এবং পরিশীলিত মনটি আপন শিকড় দিয়ে প্রাণের মাটিকে কোনো দিন আঁকড়ে ধরতে পারে নি। তাই আমিয়েলের চিন্তায় ভাবনায় অনুভূতিতে প্রাণের রঙ লাগে নি, প্রাণের উত্তাপ সঞ্চারিত হয় নি, তাঁর জর্নাল-জুড়ে আছে এক দুরপনেয় ক্লান্তি। আমিয়েলের মনটি ছিল, এক কথায়, রক্তশূন্য এবং sterile, ফলে শুধু কবি হিসেবেই তিনি ব্যর্থ হন নি, তাঁর জর্নালটিও অংশত সুখপাঠ্য হলেও সমগ্রভাবে নিষ্প্রাণ এবং ক্লান্তিকর। ছিন্নপত্রের রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এইখানেই তাঁর দুস্তর ব্যবধান।

কোনো বইয়ের উলটো পিঠ বা antinomy যদি কল্পনা করা যায় এবং তার উল্লেখ যদি অসমীচীন না হয়, তাহলে বলা যায় ছিন্নপত্রের উলটো পিঠ মোপাসাঁর *Sur L'eau* ('জলপথে')। এটিও একজন আর্টিস্টের জর্নাল এবং ছিন্নপত্রের সঙ্গে এটির কয়েকটি বাহ্যিক মিলও কৌতূহল জাগায়। যে সময়ে রবীন্দ্রনাথ পদ্মা-বোটে বাংলাদেশের জলপথে ভ্রাম্যমাণ প্রায় সেই সময়েই (১৮৮৮) মোপাসাঁ তাঁর নিজের *Bel Ami* নামক yacht যোগে বেরিয়েছেন সমুদ্রপথে পনেরো দিনের ছুটি কাটাতে। জর্নালটি সেই সময়ের রচনা। বয়স যদিও মোটে ৩৮ বৎসর, ইতিমধ্যেই মোপাসাঁ তাঁর যৌবনকে পিছনে ফেলে এসেছেন, সেই সঙ্গে হারিয়ে এসেছেন তাঁর আর্ট, তাঁর শিল্পীমন। যে বিস্ময়কর বিশ্বখ্যাতি এবং ধনপ্রাচুর্য তাঁর শিল্পসিদ্ধিকে স্বাগত জানিয়েছিল তা দিয়ে ভোগবিলাসের এক বিরাট অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে নিজেকে ইতিমধ্যেই দগ্ধ করে ফেলেছেন। সেই উচ্ছৃঙ্খল ভোগের বিষক্রিয়ায় জর্জরিত মনে সমাজ মানুষ বিশ্বপ্রকৃতি, সব-কিছুকেই আজ দেখছেন কুৎসিত, ঘৃণ্য, ক্লেদাক্ত। সমুদ্রবক্ষে অবকাশযাপন তাই পলায়নেরই নামান্তর— ঠিক যেন টাইমনের দোসর, বিকৃত ঘৃণিত জীবনের কবল থেকে, এমনকি নিজেরই ক্লিন্ন ক্লিষ্ট মনের দুঃসহ সাহচর্য থেকে তাঁর পলায়নের শোচনীয় ব্যর্থ চেষ্টা। বইখানি একটি আশ্চর্য রচনা। লেখনীর জাদু এখনো অটুট। নানা স্মৃতিকথায়, চরিত্র-চিত্রণে ঘটনার বর্ণনায় বিচিত্র রসের সমাবেশ এই বইটির মধ্যেও আছে— যদিও স্বভাবতই কটুরসের আধিক্যটাই কিছু বেশি। কিন্তু সব-কিছুর তলায় তলায় অন্তঃশীলার মতো ব'য়ে চলেছে একটি রুগ্‌ণ, ক্লিষ্ট, উন্মাদ-প্রায় মনের বিকার এবং দুঃস্বপ্ন। তাঁর যৌবনে রচিত অনেক গল্পে (নিখুঁত শিল্পকর্ম হিসেবে তাদের কয়েকটির তুলনা গল্পগুচ্ছের বাইরে আজ পর্যন্ত মেলে নি) যে আর্টিস্টকে, যে কবিকে আমরা দেখেছি জর্নালের পাতায় দেখি তিনি মৃত বা মৃতপ্রায়। মনের যে সুস্থ সবল শিকড়গুলি দিয়ে একদা জীবন থেকে আর্টিস্টের প্রাণরস আকর্ষণ করতেন, আজ সেগুলি শুষ্ক; তাই বায়ুভূত নিরালম্ব আর্টিস্ট আজ বিষোদ্গারের দ্বারা নিজেকেই জর্জরিত করছেন। সামনে আর সৃষ্টি নেই, কিছুই নেই। আত্মঘাতী আর্টিস্ট্ চরম যবনিকাপাতের পূর্বে মৃত্যুর প্রদোষচ্ছায়ায় শেষ বারের মতো জীবনের মুখে কালিমা লেপন করে নিষ্ক্রান্ত হলেন,— 'not with a bang but a whimper'। এর অব্যবহিত পরেই তাঁর গলায় ক্ষুর দিয়ে আত্মহত্যার প্রচেষ্টা এবং উন্মাদাশ্রমে তাঁর মৃত্যু যেন জর্নালটিরই একটি প্রত্যাশিত পরিশিষ্ট-বিশেষ। মোপাসাঁর *Sur L'eau*-তে যে কাহিনীটি উহ্য আছে তা হল একজন

আর্টিস্টের নিজেকে প্রাণসম্পদে দেউলে করে দিয়ে নিঃশেষে ফুরিয়ে ফেলার কাহিনী। ছিন্নপত্রে আছে ঠিক তার বিপরীত কাহিনী: প্রাণপ্রাচুর্যে, স্বাস্থ্যে, আনন্দে পূর্ণ আর্টিস্টের ভবিষ্যৎ উত্তরণের অন্তহীন পথ-উন্মোচন। ছিন্নপত্র রবীন্দ্রনাথের আর্টিস্ট জীবনের পরিণততর, মহত্তর পর্বের প্রবেশদ্বার।

৭

কবি নিজেই বলেছেন, 'আমরা দৈবক্রমে প্রকাশিত হই, ইচ্ছা করলে চেষ্টা করলে প্রকাশিত হতে পারি না।' ছিন্নপত্র সম্বন্ধে কথাটি সম্পূর্ণ সত্য। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের এই একখানি বইয়ের উপর দৈবের সুস্পষ্ট হাত বিস্ময়কর। ইন্দিরা দেবী যে চিঠিগুলিকে একখানি খাতায় নকল করে রেখেছিলেন এবং তারই ফলে যে চিঠিগুলি সংরক্ষিত হয়েছে তাকে দৈব ঘটনাই বলতে হবে। কিন্তু দৈবের আনুকূল্য স্থান-কাল-পাত্রের বিন্যাসের মধ্যে স্পষ্টতর। রবীন্দ্রনাথ যদি বছর-দশেক পূর্বে ঐ শিলাইদহ-সাজাদপুর-পতিসরের জগতে আসতেন তাহলে— কল্পনা করা যায়— তিনি য়ুরোপপ্রবাসীর পত্রের মতো মফস্বলপ্রবাসীর পত্র লিখতেন ভারতীর পাতায়। তার মধ্যে হয়তো নানাবিধ তীক্ষ্ণ সমালোচনা থাকত এবং সেটিও হয়তো একখানি উপাদেয় বই হত কিন্তু ছিন্নপত্র আমরা পেতাম না। ছিন্নপত্রের পরবর্তী যুগেও কবি বহুবার শিলাইদহে গেছেন এবং বোটে জলপথে ভ্রমণের সেই পুরাতন আনন্দকে যে ফিরে পেয়েছেন তার নজিরও আছে অনেক চিঠিপত্রে, কিন্তু ছিন্নপত্রের আর নতুন পত্রোদ্গম হয় নি। জীবনে দৈবের অপঘাতই আমরা সচরাচর সর্বত্র দেখতে অভ্যস্ত কিন্তু এই ছিন্নপত্রের বেলায় দেখি দৈব যেন নিপুণ স্টেজ-ম্যানেজারের মতো ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় ঠিক ব্যক্তিটিকে হাজির করে দিয়েছে।

কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা এই যে ছিন্নপত্রের মধ্যে যে আত্মপ্রকাশটি আছে সেটা চেষ্টা করে, প্ল্যান করে হয় নি বলেই সম্ভব হয়েছে। চেষ্টা ক'রে, প্ল্যান ক'রে যেসব আংশিক বা পূর্ণাঙ্গ আত্মপ্রতিকৃতি অনেক কবি এবং আর্টিস্ট লিখেছেন এবং হামেশাই লিখে থাকেন তাদের অনেকগুলিই সাহিত্যিকগুণে এবং আত্মসমীক্ষামূলক তাৎপর্যে সমৃদ্ধ। কিন্তু প্রায়শই দেখা যায় সেগুলি জীবনের একটি পর্ব পার হয়ে গিয়ে পর্বান্তরের অভিজ্ঞতার আলোকে পূর্বতন পর্বের ব্যাখ্যা বা মূল্যায়ন। এই আত্মচিত্রণের মধ্যে যে অনিবার্য নির্বাচন ও রূপান্তর নিহিত থাকে তার ফলে প্রত্যক্ষ জীবনটির চেয়ে জীবনের ব্যাখ্যানটিই বড় হয়ে ওঠে। বার্ডস্বার্থের ***The Prelude*** এবং গ্যয়টের 'কাব্য ও সত্য' (***Dichtung und Wahrheit***) নামক আত্মব্যাখ্যানমূলক রচনা এর দৃষ্টান্তস্থল। বার্ডস্বার্থের কাব্যটির কেন্দ্রে আত্মপ্রকাশ নেই, আছে একটি তত্ত্ব: প্রকৃতির অনুকূল সাহচর্যে তাঁর কবিস্বভাবের উন্মেষের সূত্রটি কোথায় তারই অন্বেষণ। গ্যয়টের বইটিতে তত্ত্বান্বেষণ মুখ্য না হলেও, তার মধ্যে ভিন্ন একটা তাগিদ লক্ষ্য করা যায়: তাঁর জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনার মধ্যে যে জটিলতা আছে এবং যার সম্বন্ধে তিনি নিজেই সচেতন, ভবিষ্যৎ জীবনীকার বা ভাষ্যকারদের স্মরণ ক'রে পূর্বাহ্লেই সেগুলি সম্বন্ধে নিজস্ব জবানবন্দীটি লিখে রাখবার প্রচেষ্টা। বোধ করি সেই জন্যই গ্যয়টের আত্মজীবনীটি এত নিষ্প্রভ। কিন্তু যেখানে এই জাতীয় বিশেষ উদ্দেশ্য অনুপস্থিত সেখানেও দেখা যায় রচনাকালে রচয়িতার বিশেষ দৃষ্টি, বিশেষ মনোভঙ্গির স্পর্শ ঐ আত্মপ্রতিকৃতির রঙ-রেখার মধ্যে অনিবার্যভাবেই মিশে যায়। রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে এবং য়েট্‌সের ***Reveries Over Childhood and Youth*** নামক আত্মজীবনীর বিশেষ খণ্ডটিতে আমরা পাই কবিদ্বয়ের শৈশব-পর্ব থেকে

কৈশোর-পর্ব পর্যন্ত জীবনের যে আশ্চর্য মনোমুগ্ধকর ছবি, সে ছবি শুধু শিশুর বা কিশোরের নয়, যে প্রবীণ আর্টিস্ট তাকে বয়সের দূরত্ব থেকে স্মৃতির কুয়াশার ভিতর দিয়ে আগ্রহে, বেদনায়, কৌতুকের দৃষ্টিতে দেখছেন, তাঁরও। যিনি দেখছেন আর যাকে দেখা হচ্ছে এই দুয়ের সম্মেলনেই ঐ বিশেষ রসের উৎপত্তি যার মধ্যে শিল্পকর্ম হিসেবে বই দুটির সিদ্ধি। কল্পনার যোগে জীবনের কোনো বিশেষ পর্বকে যাঁরা ঈষৎ রূপান্তরিত করে উপন্যাসের আকার দেবার চেষ্টা করেন তাঁদের সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য— যেমন জয়েসের *A Portrait of the Artist as a Youngman* অথবা রিল্‌কের *The Notebooks of Malte Laurids Brigge*। শেষোক্ত উপন্যাস দুটি বর্তমান প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কেননা দুটিই হল কবিকিশোরের প্রতিকৃতি। এই প্রতিকৃতিও পূর্বোক্ত অর্থে interpretation, অর্থাৎ আর্টিস্টের পরিণত মন স্মৃতির সূত্র ধরে তাঁর বয়ঃসন্ধিকালের ঘটনা, চিন্তা, অনুভূতি এবং আদর্শের বিশ্লেষণ ক'রে যে ছক্‌টি উদ্ধার করেছে, উপন্যাস তারই কল্পনাসমৃদ্ধ চিত্ররূপ। ছিন্নপত্র সেই অর্থে প্রতিকৃতি নয়, এর মধ্যে কোনো design নেই। পরবর্তীকালের কোনো প্রক্ষেপের সুযোগমাত্র এর মধ্যে ছিল না বলেই নিজস্ব স্থান-কালের সীমার মধ্যে ছিন্নপত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ফুটে উঠতে পেরেছে। জীবনের ব্যাখ্যা নয়, জীবনের যে স্রোতের মধ্যে কবি ভাসমান ছিলেন তারই এক-এক গণ্ডূষ যেন চিঠির পত্রপুটে ভ'রে কালের হাতে সঁপে দিয়েছিলেন, নেহাত দৈবের আনুকূল্যে আমরা একটি গ্রন্থ রূপে তা লাভ করেছি। ছিন্নপত্রকে আত্মপ্রতিকৃতি বললে ভুল হবে, এটি সম্পূর্ণ এবং স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশ— দৈবের এবং প্রতিভার অকল্পনীয় সহযোগিতার ফলশ্রুতি।

প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ একখানি চিঠিতে লিখেছেন: 'মনে পড়ছে সেই শিলাইদহের কুঠি, তেতলার নিভৃত ঘরটি— আমের বোলের গন্ধ আসছে বাতাসে— পশ্চিমের মাঠ পেরিয়ে বহুদূরে দেখা যাচ্ছে বালুচরের রেখা, আর গুণটানা মাস্তুল!…সব নিয়ে ছিল যে আমার নিভৃত বিশ্ব সে আজ চলে গিয়েছে বহুদূরে। এই বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে ছিল আমার পরিণত যৌবন…'। ভাষার মধ্যেই জড়িয়ে আছে একটি দীর্ঘনিশ্বাস। কিন্তু কেন? সিদ্ধির কীর্তির দিক থেকে, সত্তর বৎসর বয়সের জগৎবন্দিত এই মহাকবির সঙ্গে ছিন্নপত্রের লেখকের তো তুলনাই হয় না। তবে অভাবটা কিসের? অভাব সেই তিরিশ বৎসরের পরিণত যৌবনের। কবির সেই পলাতক যৌবনের জীবন্ত মূর্তিটি রয়ে গেল ছিন্নপত্রের পাতায়, প্রাণের পূর্ণঘটটি নিয়ে তাঁরই অনুরাগে, আনন্দে চিত্রিত তাঁর জগৎটির মাঝখানে। শেক্সপীয়র কিম্বা দান্তের মতো মহাকবির জীবনেও নিশ্চয় যৌবনের প্রাণপ্রাচুর্য কোনো এক সময়ে জোয়ারের মুখে এমনি করেই দুইকূল পূর্ণ করে তুলেছিল কিন্তু তার কোনো প্রত্যক্ষ ছবি আমরা পাই নি, রচনা থেকে অনুমান করি মাত্র। অন্যান্য ছোট বড় মাঝারি কবি-আর্টিস্টদের নিজ রচনায় অথবা ভাষ্যকারের পরোক্ষ বিবৃতিতে যৌবনের চিত্র আমরা দেখেছি কিন্তু সে হল যৌবনের খণ্ডচিত্র— সে চিত্র অসহিষ্ণু বিদ্রোহের, উচ্ছৃঙ্খলতার, হিংস্র আত্মনিপীড়নের, ক্লিষ্ট মর্মদাহের অথবা কোনো আদর্শকে জীবনের স্থলাভিষিক্ত করে তারই পায়ে আত্মনিবেদনের। ছিন্নপত্রে যে যৌবনের মূর্তি দেখি সে হল যৌবনের পূর্ণরূপ— জ্ঞানে শক্তিতে আত্মস্থ, অনুরাগে করুণায় আনন্দে কৌতুকে জ্যোতির্ময়। এই মূর্তিটির দোসর সাহিত্যসংসারে নেই। একে যদি ছবি বলি, তাহলে বলতে হয় এটি এমন ছবি যার মধ্যে আমরাও আছি, আছি কবির চৈতন্যে, কবির আনন্দে এক হয়ে, তাঁরই অব্যবহিত সাহচর্যে লাভ করছি যাকে এক কথায় বলতে পারি জীবনের স্বাদ।

এটাই হল সেই অন্তরঙ্গতার জাদু যা সাহিত্যসংসারে মুষ্টিমেয় গ্রন্থের মধ্যে আমরা আবিষ্কার করি। সেইসব বইয়ের মধ্যে যেসব মানসমূর্তিগুলি আমাদের নিত্যসহচর হয়ে আছে তাদের মাঝখানে যখন এই যৌবনপ্রদীপ্ত প্রাণসমৃদ্ধ মূর্তিটিকে স্থাপন করে দেখি তখন বুঝি কোথায় তার অনন্যতা। তখন স্বীকার করতেই হয় বিশ্বের অন্তরঙ্গ গ্রন্থের যে রত্নহারটি আছে ছিন্নপত্র তার মধ্যমণি হবার যোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যজিজ্ঞাসা

সত্যেন্দ্রনাথ রায়

১

'সাহিত্যের পথে' বইটি প্রথম প্রকাশের সময় (১৯৩৬) রবীন্দ্রনাথ পত্রাকারে তার যে ভূমিকাটি লিখেছিলেন (অমিয় চন্দ্র চক্রবর্তীকে লেখা চিঠি, ৮ই আশ্বিন, ১৩৪৩) তাতে তিনি সৌন্দর্য সম্পর্কে নিজের ধারণার একটি তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করেন।—

"একদিন নিশ্চিত স্থির করে রেখেছিলেম, সৌন্দর্যরচনাই সাহিত্যের প্রধান কাজ। কিন্তু এই মতের সঙ্গে সাহিত্যের ও আর্টের অভিজ্ঞতাকে মেলানো যায় না দেখে মনটাতে অত্যন্ত খটকা লেগেছিল। ভাঁড়ুদত্তকে সুন্দর বলা যায় না—সাহিত্যের সৌন্দর্যকে প্রচলিত সৌন্দর্যের ধারণায় ধরা গেল না।

"তখন মনে এল, এতদিন যা উল্টো করে বলছিলুম তাই সোজা করে বলার দরকার। বলতুম, সুন্দর আনন্দ দেয় তাই সাহিত্যে সুন্দরকে নিয়ে কারবার। বস্তুত বলা চাই, যা আনন্দ দেয় তাকেই মন সুন্দর বলে, আর সেটাই সাহিত্যের সামগ্রী।"[১]

যে ধারণাটাকে রবীন্দ্রনাথ এখানে বাতিল বলে ঘোষণা করলেন, তার মূল কথাটা কী? মূল কথাটা হল এই—

সুন্দর আনন্দ দেয়, তাই সাহিত্যে সুন্দরকে নিয়ে কারবার। কিন্তু আনন্দটা দূরের লক্ষ্য। সাহিত্যের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য, অব্যবহিত লক্ষ্য সুন্দর। সাহিত্যের কাজ সৌন্দর্যরচনা।

একটু লক্ষ করলেই দেখতে পাব পূর্ব-পোষিত এই ধারণার সবটাই রবীন্দ্রনাথ এখানে বাতিল করে দিচ্ছেন না। আনন্দই যে সাহিত্যের লক্ষ্য এ কথা তিনি এখনো স্বীকার করছেন। কিন্তু সাহিত্যের কাজ যে সৌন্দর্যরচনা, এ কথা এখন আর তিনি স্বীকার করছেন না।

তাঁর এখনকার অর্থাৎ সংশোধিত মতকে বিশ্লিষ্ট করে বললে দাঁড়াচ্ছে—

এক, সাহিত্যের বা আর্টের সৌন্দর্য, আর ব্যবহারিক জীবনে সচরাচর যাকে আমরা সৌন্দর্য বলি, অর্থাৎ প্রচলিত সৌন্দর্য, এ দুই সম্পূর্ণ আলাদা। ভাঁড়ুদত্ত সাহিত্যের সুন্দর, কিন্তু জীবনের সুন্দর নয়, অর্থাৎ প্রচলিত অর্থে সুন্দর নয়।

দুই, সৌন্দর্য অর্থে যদি প্রচলিত সৌন্দর্য ধরি, তাহলে সৌন্দর্যরচনা সাহিত্যের কাজ নয়।

তিন, সাহিত্যের লক্ষ্য আনন্দ। যা-কিছু আনন্দ দেয়, তা-ই সাহিত্যের সামগ্রী।

চার, প্রচলিত অসুন্দরও সাহিত্যে আনন্দ দিতে পারে, অতএব সাহিত্যে সুন্দর হতে পারে।

পাঁচ, সাহিত্যে—যদি তা সত্যিই সাহিত্য হয়—সকলেই আনন্দকর, অতএব সকলেই সুন্দর।

সব জড়িয়ে দাঁড়াল এই যে, যদিও সাহিত্যে সবই সুন্দর, তবু সৌন্দর্যরচনা সাহিত্যের মুখ্য কাজ নয়। মুখ্য হচ্ছে আনন্দ।

কথাটা যখন সাহিত্যকে নিয়েই, তখন একটা প্রশ্ন এখানে অবশ্যই উঠতে পারে। জীবনে যা'ই হোক-

---

১ র ১৪/২৯১ [র—জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ (পঃ বঃ) রবীন্দ্ররচনাবলী ; সংখ্যার প্রথমটি খণ্ড এবং দ্বিতীয়টি পৃষ্ঠাসূচক।]

না কেন, সাহিত্যে ভাঁড়ুদত্তও যখন আনন্দ দেয়, সে-ও যখন 'সাহিত্যের সুন্দর'—সফল সাহিত্যের সব-কিছুই যখন সুন্দর, তখন কেন বলব না যে, সৌন্দর্যরচনাই সাহিত্যের কাজ? যা আনন্দকর তারই অপর নাম যখন সুন্দর, তখন সৌন্দর্যরচনার কথায় রবীন্দ্রনাথের হঠাৎ এত আপত্তি কেন?

আপত্তি এই জন্য যে, রবীন্দ্রনাথের মতে প্রাথমিক বা মৌল প্রত্যয় সৌন্দর্য নয়, মৌল প্রত্যয় আনন্দ। সৌন্দর্য তারই একটা বিকল্প নাম। তা পরবর্তী চিন্তা বা পরবর্তী অনুভব-সঞ্জাত একটা বাড়তি উপাধির মতন। তদুপরি সৌন্দর্য কথাটা দ্ব্যর্থবোধক। সেই কারণে বিভ্রান্তিকর।

আপত্তি দ্বিবিধ। প্রথমত তত্ত্বগত, দ্বিতীয়ত ব্যবহারিক।

আগে ব্যবহারিকের কথাই বলি। সাহিত্যের কাজ সৌন্দর্যরচনা—একথা বললে অনেকখানি ভুল বুঝবার আশঙ্কা থাকে। আশঙ্কা এই জন্য যে, সৌন্দর্য বলতে সাধারণত আমরা প্রচলিত সৌন্দর্যকেই বুঝে থাকি।

প্রচলিত সুন্দরের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি এ জন্য নয় যে তা প্রচলিত। এই জন্য যে তা আদৌ সুন্দর নয়। অথবা তা অতি নিম্নস্তরের সুন্দর। তা সংকীর্ণ, খণ্ডিত এবং স্বার্থ-সংসর্গে দূষিত। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের ক্ষেত্র থেকে এই নিম্নস্তরের স্বার্থদুষ্ট সৌন্দর্যের ধারণাকে সম্পূর্ণ দূর করে দিতে চান। সৌন্দর্যরচনা সাহিত্যের কাজ—এ কথা বললে এমন আশঙ্কা আছে যে, আমরা ভুল করে ভেবে বসব ওই রকম নিম্নস্তরের সৌন্দর্যরচনাই বুঝি সাহিত্যের কাজ। হয়তো ভেবে বসব, জীবনে যে-সব জিনিসকে আমরা সুন্দর বলে জানি, সাহিত্যের কারবার বুঝি বেছে বেছে কেবল তাদের নিয়েই। ধরে নেব, জীবনের অসুন্দরেরা— হয়তো তারাও তথাকথিত অসুন্দর—সাহিত্যেও তারা বুঝি বর্জনীয়।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা আমাদের সব সময় স্মরণ রাখতে হবে। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে সুন্দর-অসুন্দরের জাতিভেদ স্বীকার করেন না। পাশ্চাত্য ইস্থেট্‌রা যে-অর্থে সৌন্দর্যের পূজারি, রবীন্দ্রনাথ সে-অর্থে মোটেই সৌন্দর্যের পূজারি নন। 'সাহিত্য' গ্রন্থের 'সৌন্দর্য ও সাহিত্য' প্রবন্ধে ইস্থেট্‌দের সম্বন্ধে তিনি যে সব অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তা মোটেই প্রশংসাসূচক নয়।—

"য়ুরোপে সৌন্দর্যচর্চা সৌন্দর্যপূজা বলিয়া একটা সাম্প্রদায়িক ধুয়া আছে। সৌন্দর্যের বিশেষ ভাবের অনুশীলনটা যেন একটা বিশেষ বাহাদুরির কাজ, এইরূপ ভঙ্গিতে একদল লোক তাহার জয়ধ্বজা উড়াইয়া বেড়ায়।…

"য়ুরোপের সাহিত্যে সৌন্দর্যের দোহাই দিয়া, যাহা-কিছু প্রচলিত, যাহা-কিছু প্রাকৃত, তাহাকে তুচ্ছ, তাহাকে humdrum বলিয়া একেবারে ঝাঁটাইয়া দিবার চেষ্টা কোনো কোনো জায়গায় দেখা যায়। … সৌন্দর্যের টান মানুষের মনকে যদি সংসার হইতে এমনি করিয়া ছিনিয়া লয়, মানুষের বাসনাকে তাহার চারিদিকের সহিত যদি কোনোমতেই খাপ খাইতে না দেয়, যাহা প্রচলিত তাহাকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রচার করে, যাহা হিতকর তাহাকে গ্রাম্য বলিয়া পরিহাস করিতে থাকে, তবে সৌন্দর্যে ধিক্ থাক্।"[২]

এই ধিক্কারের প্রয়োজন আছে বলেই রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যরচনাকে সাহিত্যের কাজ বলতে আপত্তি করেছেন। এ আপত্তি ব্যবহারিক।

এইবারে তত্ত্বগত আপত্তির কথা। আগে-আগে তিনি যে রকমই ভেবে থাকুন-না কেন, এইখানে

২ র ১৩/৭৭৪-৫

এসে, অর্থাৎ সাহিত্যের পথে-র ভূমিকা রচনার কাছাকাছি কালে এসে রবীন্দ্রনাথ নিঃসংশয়ে অনুভব করছেন যে, সাহিত্য-অভিজ্ঞতায় আনন্দই প্রাথমিক উপলব্ধি, এবং সেই কারণে আনন্দই প্রাথমিক প্রত্যয়। শুধু প্রাথমিকই নয়, সাহিত্য-অভিজ্ঞতার পরিচয়ের পক্ষে প্রত্যয় হিসেবে আনন্দই পর্যাপ্ত, আনন্দই যথেষ্ট। আনন্দকে বোঝবার জন্য তার থেকে মৌলিক অপর কোনো প্রত্যয় খুঁজে পাওয়া যাবে না। অন্য-কোনো প্রত্যয়ের দ্বারস্থ হওয়া শুধু অনাবশ্যক নয়, অযৌক্তিক।

পূর্বে এ কথাটা রবীন্দ্রনাথ এত স্পষ্ট করে কখনো ভাবেন নি। এখন বুঝেছেন, আগের প্রত্যয়টাকে— মৌল প্রত্যয়টাকে— আগে বলা দরকার। এবং সেইটে পর্যাপ্ত হলে অন্য-কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। এখন বুঝেছেন যে, সৌন্দর্যরচনা সাহিত্যের কাজ, একথা বললে ব্যাপারটাকে উল্টো করে বলা হয়।

"... এতদিন যা উল্টো করে বলছিলুম তাই সোজা করে বলার দরকার। বলতুম, সুন্দর আনন্দ দেয় তাই সাহিত্যে সুন্দরকে নিয়ে কারবার। বস্তুত বলা চাই, যা আনন্দ দেয় তাকেই মন সুন্দর বলে, আর সেটাই সাহিত্যের সামগ্রী।"[৩]

এইবারে রবীন্দ্রনাথের সংশোধিত সৌন্দর্যসিদ্ধান্তের মূল কথাটাকে একটু বুঝে নেওয়া যাক।

সেই মূল কথাটা হল এই যে, সাহিত্যের লক্ষ্য সুন্দর নয়, সাহিত্যের লক্ষ্য আনন্দ। সুদূর বা শেষ লক্ষ্যও তাই, নিকট বা প্রত্যক্ষ লক্ষ্যও তাই।

আপাতদৃষ্টিতে কথাটা সরল। কিন্তু এর তাৎপর্য বহুদূরগামী। বর্তমান প্রসঙ্গে সেই তাৎপর্যই আমাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তা হল এই যে, সাহিত্যে সুন্দরের উপলব্ধি কোনো স্বতন্ত্র উপলব্ধিই নয়। আনন্দই আদি মধ্য অন্ত।

এ কথাটা ঠিক এইভাবে রবীন্দ্রনাথ কোথাও স্পষ্ট করে বলেন নি বটে, কিন্তু তিনি যা বলেছেন তা থেকে স্বাভাবিকভাবেই এ কথা অনুসৃত হয়। এই সিদ্ধান্তের উপর ভর করে' আরো এক ধাপ অনায়াসে এগিয়ে যাওয়া যায়। যেহেতু সাহিত্যিকের— অথবা সাহিত্য-রসিকের— সাক্ষাৎ সাহিত্য-অভিজ্ঞতাতে সুন্দর বলে কোনো-কিছুর অস্তিত্ব নেই, সেই হেতু সাহিত্যের প্রসঙ্গে সুন্দর কথাটির প্রয়োগ অপ্রয়োজনীয়, অবান্তর এবং অসার্থক।

২

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সাহিত্যের আনন্দ হল মানুষের নিজেকে পাওয়ার আনন্দ। নিজেকে পাওয়ার একটা অপরিহার্য শর্ত আছে। নিজেকে অপরের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। অপরের মধ্যে নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে তারই মধ্যে নিজেকে ফিরে পেতে হবে। মানুষ নিজেকে যথার্থভাবে পায় বহুর মধ্যে, বিচিত্রের মধ্যে। ইয়াগোর সঙ্গে ইয়াগো হয়ে, ওথেলোর সঙ্গে ওথেলো হয়ে, ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে তার অন্ধতা হয়ে, কর্ণের সঙ্গে তার নিষ্ফল বীরত্ব হয়ে। সব-কিছুই সে হতে চায়। "রামও হয় হনুমানও হয়, ঠিকমতো হতে পারলেই খুশি। তার মন গাছের সঙ্গে গাছ হয়, নদীর সঙ্গে নদী।... মানুষের আপনাকে নিয়ে এই বৈচিত্র্যের লীলা সাহিত্যের কাজ। সে লীলায় সুন্দরও আছে অসুন্দরও আছে।"[৪]

৩ স্যহিত্যের পথে'র ভূমিকা, র ১৪/২৯১

৪ সাহিত্যের পথে'র ভূমিকা, র ১৪/২৯১

বলা বাহুল্য উদ্ধৃতির শেষ বাক্যটিতে যে সুন্দর-অসুন্দরের কথা আছে, তা ব্যবহারিক জীবনেরই সুন্দর-অসুন্দর। সাহিত্যের লীলায় সকলেই আনন্দকর, তাদের মধ্যে কে যে প্রচলিত অর্থে সুন্দর আর কে-বা প্রচলিত অর্থে অসুন্দর, সে কথা একেবারেই অবান্তর। সাহিত্যে 'ঠিকমত হতে পারলেই খুশি'। এই হওয়াটাই সাহিত্যে আসল কথা। যাকে অবলম্বন করে' এই হয়ে-ওঠা, "সে অসুন্দর হলেও মনোরম; সে রস-স্বরূপের সনন্দ নিয়ে এসেছে।"[৫]

যে ঠিকমতো হয়ে-উঠেছে, যার মধ্যে দিয়ে আমরা নিজেকে পাই, তারই আছে রস-স্বরূপের সনন্দ। নিজেকে পাওয়ার আনন্দ, অর্থাৎ আত্মোপলব্ধির আনন্দই রস-স্বরূপের এই সনন্দ।

'আত্মোপলব্ধির আনন্দ' কথাটায় অনাবশ্যক বাগ্‌বিস্তার আছে। কারণ আত্মোপলব্ধি আর আনন্দ আলাদা নয়। আত্মোপলব্ধি নিজেই আনন্দ, এবং সব আনন্দই শেষ পর্যন্ত আত্মোপলব্ধি। তা-ই বা কেন, সব উপলব্ধিই আত্মোপলব্ধি, সব অনুভবই আত্মানুভব। সব অনুভবেই আনন্দ। রবীন্দ্রনাথের কাছে এইটেই মূল তত্ত্ব।

"ভাবে জানি আপনাকেই ...।"[৬] কিন্তু শুধু আপনাকেই নয়, আপনাকে জানা অর্থই অপর সকলকে জানা। সব অনুভবই যুগপৎ আত্মানুভব এবং সর্বানুভব। বলতে পারি, সব অনুভবই সত্যানুভব।

নিবিড় অনুভব, এই হল রস-স্বরূপের সনন্দ। সে অনুভব সুখের হতে পারে, দুঃখের হতে পারে, শান্তির হতে পারে, অশান্তিরও হতে পারে। সে অনুভব যা স্নিগ্ধ মধুর কোমল তারও হতে পারে, আবার যা ভয়ানক বীভৎস ঘৃণাজনক তারও হতে পারে। যে বহুর সঙ্গে মিলনে, যে বিচিত্রের সঙ্গে একাত্মতায় মানুষের 'আত্ম-অভিজ্ঞতা প্রবল ও বহুল' হয়, তার মধ্যে হাসি এবং অশ্রু, আশা এবং নৈরাশ্য, কমেডি এবং ট্র্যাজেডি সবই আছে। সব-কিছুকে নিয়েই জীবনের সমগ্রতা। সৌন্দর্য নয়, জীবনের প্রবলতা ও বহুলতা— জীবনের সমগ্রতা, এই হল সাহিত্যের লক্ষ্য।

সাহিত্য মানুষের মিলনের অভিযান, স্বীকরণের অভিযান। যতটুকু আমাদ্বারা স্বীকৃত, সেইটুকুই আমার সত্য, সেইটুকুই আমার বাস্তব— সেইটুকুই আমার চারিদিকের হাঁ-ধর্মী মণ্ডলী। কিন্তু কথাটা রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলা ভালো।—

"সংসারে আমাদের সকলেরই চার দিকে এই হাঁ-ধর্মীর মণ্ডলী আছে— এই বাস্তবদের আবেষ্টন; তাদের সকলকে নিজের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে আমাদের সত্তা আপনাকে বিচিত্র করেছে, বিস্তীর্ণ হয়েছে···। তাদের মধ্যে রাজাবাদশা আছে, দীনদুঃখীও আছে, সুপুরুষ আছে, সুন্দরী আছে, কানা খোঁড়া কুঁজো কুৎসিতও আছে···। এ ছাড়া আছে ভাবাবেগের বাস্তবতা— দুঃখ-সুখ বিচ্ছেদ-মিলন লজ্জা-ভয় বীরত্ব-কাপুরুষতা।··· বাইরে থেকে মানুষের এই আপন-করে-নেওয়া সংগ্রহ, ভিতর থেকে মানুষের এই আপনার-সঙ্গে-মেলানো সৃষ্টি, এই তার বাস্তবমণ্ডলী— বিশ্বলোকের মাঝখানে এই তার অন্তরঙ্গ মানবলোক— এর মধ্যে সুন্দর অসুন্দর, ভালো মন্দ, সংগত অসংগত সুরওয়ালা এবং বেসুরো, সবই আছে।··· মানুষ আপন মনের একান্ত অনুভূতি থেকে তাদের বলে নিশ্চিত সত্য। এই সত্যের বোধ দেয় আনন্দ, সেই আনন্দেই তার শেষ মূল্য। তবে কেমন করে বলব, সুন্দরবোধকে বোধগম্য করাই কাব্যের উদ্দেশ্য।"[৭]

৫ সাহিত্যের পথে'র ভূমিকা, র ১৪/২৯২
৬ সাহিত্যের পথে'র ভূমিকা, র ১৪/২৯১
৭ 'সাহিত্যের স্বরূপ'র, ১৪/৫১০

এই কথাই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যমীমাংসার শেষ কথা। সত্যের আনন্দেই সাহিত্যের চরম মূল্য। সত্যের আনন্দই সাহিত্যের সব-সময়ের লক্ষ্য। 'সুন্দরবোধকে বোধগম্য করা' সাহিত্যের কাজ নয়।

৩

সত্যের আনন্দকে আমরা সামঞ্জস্যের আনন্দও বলতে পারি। অন্যদিক থেকে, একে মিলনের আনন্দ বলতেও বাধা নেই। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, মিলনের জন্যই সাহিত্য সাহিত্য। সাহিত্যের শক্তি মেলাবার শক্তি। বস্তুত সাহিত্য মানেই মিলন।

কার সঙ্গে কার মিলন? এ মিলন সর্বতোমুখী। সকলের সঙ্গে সকলের। লেখকের সঙ্গে বিষয়ের, বিষয়ের সঙ্গে পাঠকের এবং লেখকমনের সঙ্গে পাঠকমনের। মিলন মানুষের সঙ্গে বিশ্বের এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের। মিলন বিশ্বসত্যের সঙ্গে মানবসত্যের।

আমাদের অব্যবহিত চৈতন্যে মিলনই আদি-সত্য এবং মিলনই শেষ-সত্য। কিন্তু তত্ত্বের দিক থেকে দেখলে, এমন কিছু পূর্ব-শর্তকে স্বীকার করতেই হবে যা না স্বীকার করলে মিলনের অর্থ হয় না। এরা মিলনতত্ত্বের বাইরের কোনো সত্য নয়, এদের নিয়েই মিলন মিলন বলে গণ্য। মিলনকে সত্য বলে মানার অর্থই এদের সত্য বলে মানা।

মিলনের প্রথম পূর্ব-স্বীকৃতি ঐক্য। মৌল একটা ঐক্য না থাকলে, আত্যন্তিক অনৈক্য থাকলে মিলন সম্ভব হতে পারে না। সেই-যে 'রাজা' নাটকের গানে আছে, যে-রাজার রাজত্বে সবাই রাজা, সেইখানেই রাজার সঙ্গে সবাই মিলতে পারে, সেই গানের নিহিতার্থটা বোধহয় এখানে স্মরণ করতে পারি।

মিলনের অপর পূর্ব-স্বীকৃতি আপাতদৃষ্টিতে এর বিপরীত। ঐক্য যেখানে সম্পূর্ণ ভেদ-বর্জিত, একাকার এবং নিত্য-সিদ্ধ, সেখানে মিলন কথাটাই অর্থহীন। মিলতে হলে একা নয়, দুজন চাই। মিলন একটা সজীব ক্রিয়াশীলতা। তার জন্য শুধু ঐক্য নয়, অনৈক্যকেও চাই: কোথাও একটা ভিন্নতা, বহুত্ব, বৈচিত্র্য, বিরোধ থাকতেই হবে। হয়তো তা আপেক্ষিক অনৈক্য, আপাতবিরোধ। কিন্তু মৌল ঐক্যের মতো এই আপেক্ষিক ভিন্নতাও মিলনের অপরিহার্য পূর্ব-শর্ত। ভিন্নতাকে যতই আপেক্ষিক বলি, মিলনের মধ্যে শেষ অবধি সে তার অস্তিত্বকে অটুট রাখে। তা রাখে বলেই বৈচিত্র্য মূল্যবান। অথবা, উল্টো করেও বলতে পারি, রূপ সত্য বলেই, বৈচিত্র্য সত্য বলেই, বহু সত্য বলেই মিলনকে বলি সাধনা। শুধু সাধনা নয়, লীলা। কথাটা রাবীন্দ্রিক হবে না, নচেৎ বলতাম অ্যাড্‌ভেঞ্চার।

উত্তরণ কথাটা বোধ করি আপত্তিকর হবে না। মিলন অর্থই খণ্ডতার উত্তরণ। তথ্যের ভূমিতে কোথাও একটা খণ্ডতার দ্বন্দ্ব না থাকলে সত্যে পৌঁছব কার উত্তরণের মধ্যে দিয়ে? উত্তরণ ঘটলেও তথ্যটা কিন্তু মিথ্যা হয়ে যায় না। তথ্য তখন নতুন তাৎপর্য পায়। যথার্থ বা সার্থক হয়ে ওঠে। সেই তাৎপর্যময়, ভাবময় সার্থক তথ্যকেই সত্য বলি।

যে এক বহু-কে সমন্বিত করে না, যে ঐক্য বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য নয়, তেমন ঐক্যকে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেন নি। আবার, যে বহু ঐক্যে সমন্বিত নয়, যে বৈচিত্র্য একের প্রকাশবৈচিত্র্য নয়, তেমন বহুকেও রবীন্দ্রনাথ সত্য বলে গ্রহণ করেন নি। রবীন্দ্রনাথের কাছে ফাঁকা ঐক্যও মিথ্যা, অসংলগ্ন বৈচিত্র্যও

মিথ্যা। এদের জীবন্ত সামঞ্জস্যই সত্য। সংগীত যেমন বিচিত্র ধ্বনিপুঞ্জের সুবিন্যস্ত সুবিহিত সামঞ্জস্যময় ঐক্য— প্রাণস্পন্দিত সৌষম্য, রবীন্দ্রনাথ যে ঐক্যের কথা বলেছেন, সেও তেমনি বহুবিচিত্র খণ্ডসত্য-পুঞ্জের নিবিড় সামঞ্জস্যময় প্রাণবন্ত ঐক্য।

যেখানেই এই প্রাণস্পন্দিত সৌষম্য আমাদের সামনে অনাবৃত করে নিজেকে মেলে ধরেছে, সেইখানে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বরহস্যের চাবিকাঠির সন্ধান পেয়েছেন, সে গানেই হোক, আর ফুলেই হোক আর মানুষের ব্যক্তিসত্তার মধ্যেই হোক। সামঞ্জস্যের মধ্যে যখন দেখি, সামঞ্জস্যকে যখন দেখি, তখনই সত্যকে যথার্থভাবে দেখি।—

"গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি
তখন তারে চিনি আমি, তখন তারে জানি।"[৮]

যেখানেই আমরা এই সৌষম্যকে আবিষ্কার করি, সেইখানেই— তার মধ্যেই আমরা নিজের মর্মগত সত্যকে দেখতে পাই। তার সঙ্গেই আমরা আমাদের আত্মীয়তা অনুভব করি। সেইখানেই বিশ্ব-সত্যের সঙ্গে আমাদের আত্মসত্যের মিলন ঘটে।

"গোলাপ-ফুলে আমরা আনন্দ পাই। বর্ণে গন্ধে রূপে রেখায় এই ফুলে আমরা একের সুষমা দেখি। এর মধ্যে আমাদের আত্মারূপী এক আপন আত্মীয়তা স্বীকার করে···। অন্তরের এক বাহিরের একের মধ্যে আপনাকে পায় বলে এরই নাম দিই আনন্দরূপ।

"গোলাপের মধ্যে সুনিহিত সুবিহিত সুষমাযুক্ত যে ঐক্য, নিখিলের অন্তরের মধ্যেও সেই ঐক্য। সমস্ত সংগীতের সঙ্গে এই গোলাপের সুরটুকুর মিল আছে; নিখিল এই ফুলের সুষমাটিকে আপন বলে গ্রহণ করেছে।"[৯]

যে সৌষম্যের কারণে গানকে সুন্দর বলি, যে সৌষম্যের কারণে গোলাপকে সুন্দর বলি, শিল্পে সাহিত্যে রচনা বিশেষকে সুন্দর বলি, সেই সৌষম্যই বিশ্বজগতের চরম সত্য।

"গোলাপফুল আমার কাছে যে কারণে সুন্দর সমগ্র জগতের মধ্যে সেই কারণটি বড়ো করিয়া রহিয়াছে। বিশ্বের মধ্যে সেইরূপ উদারপ্রাচুর্য অথচ তেমনি কঠিন সংযম; তাহার কেন্দ্রাতিগ শক্তি অপরিসীম বৈচিত্র্যে আপনাকে চতুর্দিকে সহস্রধা করিতেছে এবং তাহার কেন্দ্রানুগ শক্তি এই উদ্দাম বৈচিত্র্যের উল্লাসকে একটিমাত্র পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের মধ্যে মিলাইয়া রাখিয়াছে।"[১০] এই-যে একদিকে রূপ-বৈচিত্র্যের অজস্রতা এবং অন্যদিকে সুবিহিত ঐক্য, একেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন জগতের আনন্দলীলা। "জগতের আনন্দলীলাকেও আমরা যতই পূর্ণতররূপে দেখি ততই জানিতে পারি, ভালোমন্দ সুখদুঃখ জীবনমৃত্যু সমস্তই উঠিয়া ও পড়িয়া বিশ্বসংগীতের ছন্দ রচনা করিতেছে; সমগ্রভাবে দেখিলে এ ছন্দের কোথাও বিচ্ছেদ নাই···।"[১১]

একেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন জগতের মূল সুর। তিনি বলেছেন, এই মূল সুরটিকে ধরতে পারলে,

---

৮ গীতবিতান, র ৪/১১

৯ তথ্য ও সত্য, সাহিত্যের পথে, র ১৪/৩১৩

১০ সৌন্দর্য ও সাহিত্য, সাহিত্য, র ১৩/৭৭৪

১১ সৌন্দর্য ও সাহিত্য, সাহিত্য, র ১৩/৭৭৪

তখন বৃহৎ সামঞ্জস্যের মধ্যে সুন্দর-অসুন্দরের দ্বন্দ্ব ঘুচে যায়। তখন সকলেই রূপবান। কেউ আর আলাদা করে সুন্দর নয়, কেউ আর আলাদা করে অসুন্দরও নয়। তখন কেউই আলাদা নয়। সকলেই বৃহৎ সামঞ্জস্যে গ্রথিত। তখন ব্যবহারিক জীবনের প্রচলিত-সুন্দর সৌন্দর্যে তার বিশেষ অধিকারের দাবি পরিত্যাগ করে। তখন তথাকথিত অসুন্দর তার ছদ্মবেশ উন্মোচন করে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, আমাদের সামঞ্জস্যবোধ যখন জাগ্রত হয়, তখনই সৌন্দর্যবোধ পূর্ণভাবে জ্বলে ওঠে। তখন সমস্ত আংশিকতা নিরস্ত হয়। তখন সত্যকেই সুন্দর বলে জানি। তখন কিছুই অসুন্দর থাকে না।

"তখন কী হয়? তখন দ্বন্দ্ব ঘুচিয়া গিয়া সমস্তই সুন্দর হয়, তখন সত্য ও সুন্দর একই কথা হইয়া উঠে। তখনই বুঝিতে পারি, সত্যের উপলব্ধিমাত্রেই আনন্দ, তাহাই চরম সৌন্দর্য।"[১২]

৪

সামঞ্জস্য অর্থ হল রূপ-বৈচিত্র্য এবং তাদের আভ্যন্তরীণ ঐক্য— ঐক্যে-বিধৃত বহুবিধতা। আনন্দের মতো, সত্যের মতো, সৌষম্য বা সামঞ্জস্যও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের একটি মৌল তত্ত্ব। শুধু সাহিত্যতত্ত্বের নয়, রবীন্দ্রনাথের জীবনতত্ত্বেরও, বিশ্বতত্ত্বেরও।

সামঞ্জস্যের বোধ অন্য কোনো বোধের উপর নির্ভরশীল নয়। তাকে অন্য কিছু দিয়ে চিনি না। সে স্বপ্রকাশ। তাকে দিয়েই আমরা সত্তার চরিত্র-মহিমাকে অনুধাবন করি। তাকে দিয়েই আমরা বিশ্বভুবনকে চিনি। তার সূত্রেই আমরা বিশ্বভুবনকে আমাদের আত্মীয় বলে অনুভব করতে পারি।

সত্য, আনন্দ এবং সামঞ্জস্য বস্তুত পৃথক নয়। কিন্তু আমাদের বোধের দৃষ্টিকোণের দিক থেকে তাদের স্বতন্ত্র পরিচয় আছে। সেইখানেই তাদের তত্ত্বগত পাদপীঠ।

যা আছে তা আছে বলেই তাকে সত্য বলি। সত্য কথাটাতে সত্তার সত্তা হিসেবে স্বীকৃতি— বিশুদ্ধ অস্তিত্ব-গৌরবের ঘোষণা।

সামঞ্জস্য কথাটাতে সত্তার চরিত্র-মহিমার স্বীকৃতি।

আনন্দ কথাটাতে তার আস্বাদময়তার স্বীকৃতি। তার মধ্যে দিয়ে উপলব্ধির চরমত্ব ঘোষিত হয়, সত্তার মানবিকতা ও মানসিকতা সূচিত হয়, মিলন ও প্রেমের গৌরব প্রতিষ্ঠা পায়।

বোধের জন্য আর কোনো পৃথক দৃষ্টিকোণের প্রয়োজন নেই, অবকাশও নেই। সত্তার প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকারের মধ্যে পরিচয়ের আর কোনো নতুন দিক অবশিষ্ট নেই, আর কোনো স্বতন্ত্র তত্ত্বগত ভূমি নেই।

সামঞ্জস্যই বলি, আনন্দই বলি আর সত্যই বলি, প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব পরিচয় আছে, নিজস্ব একটা তত্ত্বগত পাদপীঠ আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরিণত সাহিত্যচিন্তায় সুন্দরের কোনো নিজস্ব পরিচয় নেই, তত্ত্বগত প্রতিষ্ঠাভূমি নেই। সুন্দর যেন অপর-কোনো-একটা কিছুর নাম। কখনো শুনি আনন্দই সৌন্দর্য। কখনো শুনি সামঞ্জস্যই সৌন্দর্য। আবার কখনো-বা শুনতে পাই, সত্যই সৌন্দর্য। কিন্তু কখনোই এরকম শুনি না—পরিণত সাহিত্যচিন্তার পর্বে কখনোই এরকম শুনি না যে, সৌন্দর্যই সামঞ্জস্য, সৌন্দর্যই আনন্দ বা সৌন্দর্যই সত্য।

---

১২ সৌন্দর্যবোধ, সাহিত্য, র ১৩/৭৬০

এ থেকে তিনটি জিনিস স্পষ্ট বুঝতে পারি। এক, রবীন্দ্রনাথের কাছে সামঞ্জস্য, সত্য এবং আনন্দ অভিন্ন। দুই, অভিন্ন হলেও, বোধের দিক থেকে তিনেরই তত্ত্বগত ভূমির স্বাতন্ত্র্য আছে। তিন, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তায় সুন্দর কথাটার কোনো স্বতন্ত্র তাৎপর্য নেই। তার কোনো তত্ত্বগত স্বাতন্ত্র্য নেই।

'তত্ত্বগত স্বাতন্ত্র্য' কথাটাকে যেন আমরা ভুল না বুঝি। এ কেবল বোধেরই স্বাতন্ত্র্য, দৃষ্টিভূমিরই স্বাতন্ত্র্য, বস্তুর স্বাতন্ত্র্য নয়। সত্তা নিজে সত্য, সামঞ্জস্য ও আনন্দ এই তিন খণ্ডে বিভক্ত নয়। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বে বিষয় এবং বিষয়ী, সত্য এবং তার উপলব্ধি, সামঞ্জস্য এবং আনন্দ কখনোই পৃথক করা যাবে না। আনন্দ সব সময়েই সামঞ্জস্যের আনন্দ, সামঞ্জস্য সব সময়েই উপলব্ধিগত সামঞ্জস্য—সামঞ্জস্যের চেতনাই আনন্দময়।

আনন্দকেই যদি সৌন্দর্য নামে ডাকি, সামঞ্জস্যকেই যদি সৌন্দর্য্য নাম দিয়ে চালাতে চাই, তাতে বাড়তি লাভ কিছু নেই। কেননা তার দ্বারা নতুন কিছুই বলা হল না।

তবু যে আমরা সুন্দর বলি তার কারণ অভ্যাস দুর্মর। ব্যবহারিক ক্ষেত্রের সংস্কারকে আমরা তত্ত্বের ক্ষেত্রেও বহন করে নিয়ে আসি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও সুন্দর কথাটিকে একেবারে বর্জন করতে পারেন নি। বলা দরকার যে, তেমন বর্জনের প্রস্তাবও তিনি করেন নি। সৌন্দর্য সম্পর্কে নিজের মত পরিবর্তনের ঘোষণার নিহিতার্থ শুধু এই যে, সৌন্দর্য নয়, আনন্দই প্রাথমিক সত্য—সাহিত্যতত্ত্বে আনন্দই প্রাথমিক প্রত্যয়। সত্যবোধ বা সামঞ্জস্য-চেতনা, এরই অপর নাম সৌন্দর্যচেতনা। বিষয় এবং বিষয়ীর মিলনলব্ধ যে আনন্দ, তারই নামান্তর সৌন্দর্য। সামঞ্জস্য অর্থেই সৌন্দর্য কথাটা তাৎপর্যপূর্ণ, অন্য কোনো অর্থে নয়। সুষম বলেই সুন্দর, সুন্দর বলে সুষম নয়। সত্য বলেই সুন্দর, সুন্দর বলে সত্য নয়।

সৌন্দর্য কথাটাকে এই অর্থে গ্রহণ করেছেন বলেই রবীন্দ্রনাথ অনায়াসে মঙ্গলকে সুন্দর বলতে পেরেছেন। পেরেছেন এই জন্য যে, রবীন্দ্রনাথের মতে সামঞ্জস্য অর্থই মঙ্গল এবং মঙ্গল অর্থই সামঞ্জস্য। সুন্দরের মতো মঙ্গলও সত্যের নামান্তর।

তা যদি হয়, তাহলে মানতে হবে, সুন্দর যেমন প্রাথমিক উপলব্ধি নয়, মঙ্গলও তাই। অব্যবহিত স্বয়ংসিদ্ধ প্রত্যয় নয়, সুন্দরের মতো মঙ্গলও সাধিত প্রত্যয়। সত্য বলেই—সামঞ্জস্যের কারণেই, আনন্দের কারণেই যেমন সুন্দর সুন্দর, ঠিক তেমনি, সত্য বলেই, সামঞ্জস্যের কারণেই, আনন্দের কারণে মঙ্গল মঙ্গল। আরো এক ধাপ এগিয়ে যেতে পারি। সামঞ্জস্যের কারণেই, আনন্দের কারণেই রবীন্দ্রনাথের চিন্তারাজ্যে সুন্দর এবং মঙ্গল অভিন্ন।

৫

বিষয় এবং বিষয়ীর সামঞ্জস্যকে বিষয় এবং বিষয়ীর আনন্দময় মিলনের সৌষম্যকে—অথবা আরো সোজা কথায়, বিষয় এবং বিষয়ীর মিলনকেই রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য বলেছেন। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-ভাবনার—যদি একে সৌন্দর্যভাবনাই বলি—তার অন্যতম প্রধান বিশিষ্টতা। এই বিশিষ্টতাকে সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করতে হলে, সৌন্দর্য সম্পর্কে প্রচলিত মতবাদগুলির সঙ্গে একে মিলিয়ে দেখা দরকার।

সৌন্দর্য সম্পর্কে বাজার-চলতি মতগুলিকে আমাদের প্রয়োজনের দিক থেকে আমরা মোটামুটি তিনটি

বৃহৎ গোত্রে ভাগ করে ফেলতে পারি। ভাগটা অন্য কোনো দিক থেকে নয়, ভাগটা বিষয় এবং বিষয়ী সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীকে অবলম্বন করে। বর্তমান প্রসঙ্গে এই দৃষ্টিভঙ্গীর কথাটাই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রথম গোত্রে বিষয়ভিত্তিক বা অব্‌জেক্‌টিভ মতবাদ: সৌন্দর্য একটা বস্তুগত গুণ, বস্তু সেই গুণের কারণেই সুন্দর। দ্বিতীয় গোত্রে পড়বে বিষয়ীভিত্তিক বা সাব্‌জেক্‌টিভ মতবাদ: সৌন্দর্য বলে কোনো বস্তুগত গুণ নেই। ভোক্তার মনের উপলব্ধি-বিশেষের নামই সুন্দরের উপলব্ধি। তৃতীয়টি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। একে বলতে পারি, বিষয়-বিষয়ীভিত্তিক বা সাব্‌জেক্‌টিভ-অব্‌জেক্‌টিভ সৌন্দর্যতত্ত্ব: সৌন্দর্য বস্তু এবং মন এই দুয়ের সংযোগ-সাপেক্ষ। সৌন্দর্যে বস্তু এবং মন দুয়েরই দান আছে।

প্রথম মতে, সৌন্দর্য একটা তথ্য। বস্তু যেমন একটা স্বাধীন তথ্য, সৌন্দ্যর্যও তাই। এই মতবাদের মর্মকথা হল এই যে, সৌন্দর্য বস্তুজগতের জিনিস। তা বিষয়েরই নিজস্ব গুণ বা ধর্ম, সম্পূর্ণভাবে বিষয়ী-নিরপেক্ষ। যা অসুন্দর, দেখবার কেউ না থাকলেও তা অসুন্দর। বিষয়ীর থাকা না থাকা, দেখা না দেখা সৌন্দর্যের অস্তিত্বের পক্ষে অবান্তর। যা সুন্দর তা সুন্দর হয়েই আছে, যা অসুন্দর তা-ও অসুন্দর হয়েই আছে, বিষয়ী শুধু আবিষ্কার করে মাত্র। অনাবিষ্কৃত সৌন্দর্য অনাবিষ্কৃত অসৌন্দর্য থাকতে পারে এবং আছে।

অবজেক্‌টিভ মতের অনুসিদ্ধান্ত হল এই যে, সৌন্দর্য একটা তথ্যগত অনুপাত এবং তথ্যগত মাপজোকের ব্যাপার। চেষ্টা করলে তত্ত্ববিদ্ সৌন্দর্যের মাপজোকের তদ্‌গত সূত্রগুলিকে আবিষ্কার করতে পারেন, অন্তত তার কোনো আত্যন্তিক বাধা নেই। সূত্র আবিষ্কারের পর তার সাহায্যে কে সুন্দর কে সুন্দর নয় তা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করাও সম্ভব হবে। বলা প্রয়োজন যে, বিষয়ভিত্তিক সৌন্দর্যতত্ত্বের সমর্থকেরা বহুকাল থেকেই সৌন্দর্যের তদ্‌গত মাপকাঠি নিরূপণের চেষ্টা করে আসছেন। অদ্যাবধি কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্ত তো দূরে থাক, বহুজনস্বীকৃত সিদ্ধান্তও পাওয়া যায় নি।

দ্বিতীয় মতটি এর বিপরীত। তার মূল কথা হল এই যে, সৌন্দর্য বলে বস্তুগত কোনো সত্য নেই। যা আছে সে হল সুন্দর লাগা। অর্থাৎ সৌন্দর্য বিষয়ে নেই, আছে বিষয়ীর মনে। বিষয় নিজে সুন্দরও নয়, অসুন্দরও নয়, সে কেবল ভ্যালু-বর্জিত একটা সত্তা, একটা নিরপেক্ষ তথ্যমাত্র। বিষয়ী না থাকলে সুন্দর-অসুন্দর কিছুই থাকে না। বিষয়ী তার আপন মনের মাধুরী দিয়ে বিষয়কে সুন্দর দেখে। সৌন্দর্য আবিষ্কার নয়, রচনা। বিষয়ের গুণ নয়, দৃষ্টির গুণ। বলতে পারি, দৃষ্টির আরোপ। সৌন্দর্য একটা সাব্‌জেক্‌টিভ ভ্যালু।

তৃতীয় মতবাদ অর্থাৎ সাব্‌জেক্‌টিভ-অব্‌জেক্‌টিভ সৌন্দর্যতত্ত্ব অনেকটা পূর্বোক্ত দুই মতের সমন্বয়। এর বক্তব্যটা এই যে, সৌন্দর্য বিষয়েরই গুণ বটে, কিন্তু তা বিষয়ী-নিরপেক্ষও নয়। সৌন্দর্যের হেতু আছে বিষয়ে, কিন্তু তার আবির্ভাব বিষয়ীর মনে। বিষয় এবং বিষয়ীর সংযোগ না ঘটা পর্যন্ত সৌন্দর্য নেই। বিষয়ী না থাকলেও সৌন্দর্যের হেতুগুলি বিষয়ে লগ্ন থাকে। কিন্তু তা সৌন্দর্য নয়, সৌন্দর্যের সুপ্ত সম্ভাবনা। বিষয়ীর দৃষ্টিপাতেই সুপ্ত সম্ভাবনা বাস্তব সত্য হয়ে ওঠে। সুতরাং বিষয়ীর গুরুত্ব অনেকখানি। কিন্তু বিষয়ের গুরুত্বও কিছুমাত্র কম নয়। বিষয়ী যে-কোনো বিষয়কেই খুশিমতো সুন্দর দেখতে পারে না, সুন্দর রূপে প্রতিভাত হবার যোগ্যতাটা বিষয়ের মধ্যেই থাকা চাই।

এইবারে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-সিদ্ধান্ত এই তিন গোত্রের

কোন্‌টিতে পড়বে? অথবা, যদি কোনো-একটা বিশেষ গোত্রে না-ও ফেলি, রবীন্দ্রনাথ এর কাকে কতটুকু সমর্থন করতে পারেন?

সহজেই বোঝা যায়, বিষয়ভিত্তিক মতবাদ মোটেই রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার অনুকূল নয়। সামঞ্জস্যকেও যদি সুন্দর বলি, তাহলেও তা নিছক বিষয়ভিত্তিক নয়। কেননা, আমরা আগেই দেখেছি, সামঞ্জস্য বিষয়ী-নিরপেক্ষ একটা তদ্‌গত মাপজোকের ব্যাপারই নয়। সামঞ্জস্য একটা উপলব্ধিগত সত্য। সামঞ্জস্যসাধন একটা সজীব প্রক্রিয়া, বিষয় এবং বিষয়ীর একটি সক্রিয় সহযোগিতা।

কিন্তু বিষয়ীভিত্তিক মতবাদ? এও কি রবীন্দ্র-চিন্তার অনুকুল নয়? এইখানে একটু খট্‌কার কারণ আছে। এই মতবাদের সঙ্গে হুবহু মিলে যায় এমন অনেক উক্তি রবীন্দ্ররচনায় পাওয়া যাবে। বিশেষ করে কবিতায়। আমি দেখলাম বলেই সুন্দর সুন্দর হল, আমি সুন্দর বললাম বলেই গোলাপ হল সুন্দর, এই ধরণের পঙ্‌ক্তি রবীন্দ্রকাব্যে মোটেই দুর্লভ নয়। তাহলে কি ধরে নেওয়া যায় না যে, রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যভাবনা সাবজেক্‌টিভ সৌন্দর্যতত্ত্বের সমগোত্রীয়?

এ রকম মনে করলে ভুল করব। কারণ যে মত কেবলই বিষয়ীভিত্তিক, তা-ও রবীন্দ্রচিন্তার অনুকূল হতে পারে না। স্মরণ রাখতে হবে, তত্ত্বমীমাংসা আর কবিতা ঠিক এক বস্তু নয়। তত্ত্বমীমাংসার আদালতে কবিতার সাক্ষ্য সব সময় খুব নির্ভরযোগ্য হয় না। সাক্ষ্য দেওয়া কবিতার কাজও নয়। কবিতার কেবল বাচ্যার্থ-টুকুকেই সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায়, ব্যঞ্জনাকে নয়। বাচ্যার্থের সাক্ষ্য ভগ্নাংশের সাক্ষ্য, সমগ্র কবিতার সাক্ষ্য নয়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে কবিতায় নানা সুরের নানান্ রঙের কথা পাব। পক্ষে বিপক্ষে দু রকমই পাওয়া যাবে— বাছাই করা সহজ হবে না। এ সব ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের সামগ্রিক ভাব-পরিমণ্ডলের উপরেই আমাদের বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

সেই ভাব-পরিমণ্ডলের কথা স্মরণ রাখলে— রবীন্দ্রভাবনার আভ্যন্তরীণ সংগতির দিকে দৃষ্টি রাখলে, এ কথা বোঝা মোটেই কঠিন হবে না যে, রবীন্দ্রনাথ এমন কোনো মতকেই সমর্থন করতে পারেন না, যা একা বিষয় বা একা বিষয়ীর উপর জোর দেয়, যার অপরিহার্য পূর্ব-স্বীকৃতি বিষয় এবং বিষয়ীর স্বাতন্ত্র্য। প্রথম মতবাদে কেবল বিষয়েরই স্বীকৃতি, দ্বিতীয় মতবাদে কেবল বিষয়ীরই স্বীকৃতি। দুয়ের কোনোটিই রবীন্দ্রচিন্তার সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে না।

তৃতীয় মতবাদে সৌন্দর্যকে ফ্যাক্‌ট এবং ভ্যালু দুইভাবেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথ এই তৃতীয় মতেরই সমর্থক। কেননা, এই সৌন্দর্যতত্ত্বে বিষয় এবং বিষয়ী উভয়েই সমান অপরিহার্য। উপরন্তু উভয়ের সংযোগও অপরিহার্য।

তবু, এ কথা স্পষ্ট করেই বলা দরকার যে, রবীন্দ্রনাথ এই তৃতীয় মতটিকেও সমর্থন করতে পারেন না। পারেন না তার কারণ, এই তৃতীয় মতেরও এমন কতকগুলি পূর্ব-স্বীকৃতি আছে যা রবীন্দ্র-চিন্তার বিরোধী। প্রথম ও দ্বিতীয় মতবাদের মতো তৃতীয় মতবাদেরও অন্যতম পূর্ব-স্বীকৃতি হল বিষয় এবং বিষয়ীর স্বাতন্ত্র্য। অপর একটি অপরিহার্য পূর্ব-স্বীকৃতি হল এই যে, সৌন্দর্যের সম্ভাবনা বা সৌন্দর্যের বীজ বিষয়বিশেষে আছে, বিষয়বিশেষে নেই। তৃতীয় একটি অনতিপ্রচ্ছন্ন পূর্ব-স্বীকৃতির কথাও এখানে উল্লেখ করা দরকার। তা হল এই যে, সৌন্দর্যবোধ একটি বিশিষ্ট এবং স্বতন্ত্র ধরণের বোধ। তা সত্যবোধ বা মঙ্গলবোধ থেকে আত্যন্তিকভাবে ভিন্ন।

এই তিন পূর্ব-স্বীকৃতির কোনোটিকেই রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করতে পারেন না।

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যভাবনা প্রচলিত তিন গোত্রের ত্রিবিধ সৌন্দর্যসিদ্ধান্তের কোনোটির সঙ্গেই মিলবে না। রবীন্দ্রচিন্তার মৌল প্রকৃতিই এত ভিন্ন ধরণের যে এদের সঙ্গে কোথাও তার কোনো সাধারণ ভূমি নেই। এরা যে-অর্থে সৌন্দর্য-সন্ধানী, সে-অর্থে সৌন্দর্য-সন্ধান রবীন্দ্রচিন্তার স্বভাববিরুদ্ধ।

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যসিদ্ধান্তকে আর-একবার স্মরণ করে নেওয়া যাক।—

প্রথমত, রবীন্দ্রনাথের মতে বিষয় এবং বিষয়ী অচ্ছেদ্য। এরা অযুতসিদ্ধ। সত্য এদের নিত্য-সম্মিলন। একেই তিনি সৌন্দর্য বলেছেন। তা একটা বাড়তি উপাধি ছাড়া আর কিছুই নয়। উপাধিটা অনাবশ্যক। সূক্ষ্মভাবে দেখলে অযৌক্তিক।

দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, সুন্দর-অসুন্দরের ভেদটা সত্য নয়— না সাহিত্যে, না জীবনে। কেউ অসুন্দর নয়, কেউ সুন্দর নয়, সকলেই রূপবান।

তৃতীয়ত, সৌন্দর্যবোধ বলে আলাদা কোনো বোধ নেই। তথাকথিত সৌন্দর্যবোধ সত্যবোধেরই নামান্তর। সৌন্দর্যদৃষ্টি বলে কোনো বিশিষ্ট ধরণের দৃষ্টি নেই। সত্য-দৃষ্টিই, অর্থাৎ আবরণ-মুক্ত দৃষ্টিই সৌন্দর্যদৃষ্টি। চেতনা অর্থই সৌন্দর্য-চেতনা, কেননা চেতনা অর্থই সামঞ্জস্য-চেতনা। চেতনা অর্থই আনন্দ।

৬

পাশ্চাত্যচিন্তায় সৌন্দর্যদর্শন বা সৌন্দর্যতত্ত্ব বলে যেমন একটা মোটামুটিভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ তত্ত্বের সাক্ষাৎ পাই, রবীন্দ্রচিন্তায় তা পাওয়া যাবে না। রবীন্দ্রচিন্তা মুখ্যত তদ্‌মুখী নয়, মুখ্যত অন্তর্মুখী, মুখ্যত উপলব্ধিমুখী। রবীন্দ্রচিন্তার মূল ধাঁচটা ভারতীয়।

আগেই বলেছি, সৌন্দর্য সংক্রান্ত পাশ্চাত্য মতগুলি যে-অর্থে সৌন্দর্যজিজ্ঞাসা বা সৌন্দর্যসিদ্ধান্ত, রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবিষয়ক প্রস্তাব মোটেই সে জাতের বস্তু নয়। রবীন্দ্রচিন্তায় এমন কোনো স্বতন্ত্র— এমনকি আপেক্ষিক অর্থেও স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবনাপ্রবাহ নেই, যাকে পৃথক্ করে সৌন্দর্যভাবনা আখ্যা দেওয়া যায়। সৌন্দর্য সেখানে একটি আনুষঙ্গিক প্রত্যয়, আনুষঙ্গিক প্রস্তাব।

আনন্দের তত্ত্ব, সামঞ্জস্যের তত্ত্ব, এই হল রবীন্দ্রচিন্তার মৌল তত্ত্ব। সৌন্দর্যজিজ্ঞাসার উদ্‌ভব হিসেবে এই তত্ত্বকেই রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট বলে মনে করেন।

অথবা, ইচ্ছা করলে, আরো এক ধাপ পিছিয়ে যেতে পারি। গিয়ে বলতে পারি, যেহেতু আনন্দই প্রথমত উপলব্ধি, সেই হেতু সামঞ্জস্যও নয়— আনন্দই আদিতম তত্ত্ব। রবীন্দ্রনাথের কাছে আনন্দই পরিপূর্ণতম বাস্তব— উপলব্ধিই পরিপূর্ণতম সত্য। সুখ-দুঃখ, কান্না-হাসি, লজ্জা-ভয়— এরই নাম আনন্দ। এখানে সুন্দর-অসুন্দরের স্থান নেই।

দুর্গা। কালীঘাট পট

শিব । কালীঘাট-পট

কালীঘাটের পট

বিমলকুমার দত্ত

শক্তিপূজার একান্নটি কেন্দ্রের মধ্যে কালীঘাট অন্যতম প্রধান। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে আদিগঙ্গার তীরে শ্রীশ্রীকালীমন্দির-নির্মাণের সময় হইতে কলিকাতা নগরীর বিকাশপর্ব শুরু হয় এবং কলিকাতা নগরীর ক্রমোত্থান-ইতিহাসের সঙ্গেসঙ্গে কালীঘাটের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তীর্থক্ষেত্র হিসাবে কালীঘাটের যশ লোকের মুখে মুখে ছড়াইয়া পড়ে এবং তীর্থযাত্রীর আনাগোনায় কালীঘাট ও পার্শ্বস্থ অঞ্চল মুখরিত হইয়া ওঠে।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই এ দেশের ধন জ্ঞান ও কর্মপ্রচেষ্টার উদ্‌ভব বিকাশ ও বিলয় তীর্থস্থানকে কেন্দ্র করিয়া। সে কারণ তীর্থস্থান ব্যবসার অন্যতম কেন্দ্ররূপে পরিণত হয় এবং তীর্থক্ষেত্রে দেবদেবীর মূর্তি ও চিত্রাদি বেচাকেনার স্থযোগ-স্থবিধা স্থায়ী হয়। ১৮২৫-২৬ সাল হইতে কালীঘাট-কেন্দ্রে দেবদেবীর পটচিত্র অঙ্কন ও অতি অল্প দামে তাহা বিক্রয় করা শুরু হয়। পটচিত্রের চাহিদাবৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়া বাংলা-দেশের নানান জেলা হইতে পটুয়ার দল এখানে আসিয়া ভীড় জমাইতে আরম্ভ করেন। এইসকল রেখাসর্বস্ব পটচিত্র কালীঘাটের পট নামে খ্যাত।

কালীঘাটের শিল্পীগোষ্ঠী পটচিত্র ছাড়াও কাঠ ও মাটির খেলনা পুতুল ও দেবদেবীর মূর্তি তৈয়ারী করিতেন।[১] মাটির মূর্তিগুলির রেখা ঢং ও ডৌল পটচিত্রের মধ্যে বিশেষভাবে রূপায়িত। শুধুমাত্র কালীঘাট বা উহার পার্শ্বস্থ অঞ্চল সমূহেরই নয়, সারা বাংলাদেশের বিশেষতঃ দক্ষিণ বাংলার মাটির পুতুল তৈয়ারীর ঢং লক্ষ্য করিলে কালীঘাটের রেখাসর্বস্ব পটচিত্রগুলির জন্ম-ইতিহাসের স্থস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

কালীঘাটের শিল্পীদল পটুয়া নামে খ্যাত। ইহারা স্থত্রধরের ন্যায় মন্দিরনির্মাণ, মাটির পুতুল ও খেলনা তৈয়ারী, নানাপ্রকার দেবদেবীর ও সামাজিক চিত্র রূপায়ণ এবং প্রতিমা ও মন্দিরের অলংকরণের কাজে দক্ষ ছিলেন। কলিকাতা শহরের যে অংশে মূলতঃ তাঁহাদের বসতি ছিল তাহা আজও পটুয়াটোলা নামে খ্যাত।

কালীঘাটের পটুয়াদিগের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত আজিও সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। তবে এই শিল্পধারার প্রথম যুগের শিল্পীদিগের মধ্যে নীলমণি দাস, বলরাম দাস ও গোপাল দাসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে নিবারণচন্দ্র ঘোষ, কালীচরণ ঘোষ ও কানাইলাল ঘোষ পটচিত্র অঙ্কনে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। শেষোক্ত তিনজন শিল্পী দক্ষিণ চব্বিশ-পরগণার গড়িয়া নামক স্থান হইতে আসিয়া কালীঘাটে পাকাপাকিভাবে বসবাস করেন। তাঁহারা ছিলেন জাতিতে সদ্‌গোপ। এই সময়ে বটকৃষ্ণ পাল, পরান দাস ও বলাই বৈরাগী নামে তিনজন শিল্পীরও উল্লেখ পাওয়া যায়।[২]

---

১ *The History of Bengal (1757-1905):* University of Calcutta: p. 537

২ ক ভারতের চিত্রকলা, অশোক মিত্র, পৃ ২৫২

খ *Kalighat Pots Annals and Appraisal:* Prodyot Ghosh: pp. 16-17

কালীঘাটের পটুয়ারা ছিলেন মূলতঃ লোকশিল্পাশ্রয়ী, সে কারণ দেব-দেউলের ভিত্তিচিত্র অঙ্কনের অধিকার তাঁহাদের ছিল না। তদানীন্তন দেব-দেউল ভিত্তিচিত্রের সন্ধান চব্বিশ-পরগণার বহড়ু গ্রামের শ্যামসুন্দর-মন্দিরে, বীরভূমের ইলামবাজার ও দুবরাজপুরের শিবমন্দিরে, হুগলীর গুপ্তিপাড়া বৃন্দাবনচন্দ্র-মন্দিরে, বাজিতপুরের দশভুজা-মন্দিরে পাওয়া যায়। বহড়ুর শ্যামসুন্দর-মন্দির ১২৩২ বঙ্গাব্দে নির্মিত হয় এবং উহার মধ্যস্থ ভিত্তিচিত্র নির্মাণ করেন দুর্গাচরণ ভাস্কর।

১৮২৫-২৬ হইতে ১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কালীঘাটের পটুয়ারা রেখাসর্বস্ব চিত্রকে কেন্দ্র করিয়া নিজেদের পসার জমাইয়াছিলেন। এতদিন তাঁহারা যে সমাজের উপর নির্ভর করিয়া ছিলেন সেই সমাজের কাঠামো ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া দুর্বল হইয়া পড়িল এবং শস্তা বিদেশী ছাপানো পট আসিয়া হাতে-আঁকা পটের চাহিদা পূরণ করিতে লাগিল। ইহা ব্যতীত কলিকাতার নবপ্রতিষ্ঠিত আর্টস্কুলের ছাত্ররা দেবদেবীর লিথোগ্রাফ তৈয়ারী করিয়া স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করিতে শুরু করিলেন। এইসকল কারণে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম হইতেই কালীঘাট-পটের চাহিদা হ্রাস পাইতে লাগিল এবং পটুয়াগোষ্ঠী প্রাণ বাঁচাইবার জন্য কালীঘাট ছাড়িয়া নবদ্বীপ প্রভৃতি তীর্থস্থানে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ত্রিশ বৎসর কালের মধ্যে কালীঘাট-চিত্রশিল্পের ধারা ক্রমশ বিলুপ্ত হইল।

বিষয়বস্তু অনুযায়ী কালীঘাটের পটচিত্র মোটামুটি ছয়ভাগে ভাগ করা যায়—

১ পৌরাণিক চিত্র
২ ঐতিহাসিক চিত্র
৩ সামাজিক চিত্র ও প্রতিকৃতি
৪ পশুপক্ষীর চিত্র
৫ গল্পচিত্র
৬ ব্যঙ্গচিত্র

পৌরাণিক চিত্রগুলির মধ্যে কৃষ্ণলীলা, শিবদুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কালী, জগন্নাথ, রামায়ণের কাহিনী ও লৌকিক দেবদেবীর (যেমন শীতলা) রূপায়ণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

লক্ষ্মীবাঈ, গোরাসৈন্যের চলাচল, আদালতে খুনের বিচার, শ্যামাকান্তের বীরত্ব প্রভৃতি চিত্রগুলি ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

তদানীন্তন সমাজচিত্র, যথা, মোহন্ত-এলোকেশী রহস্য, নরনারীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিভিন্ন প্রকাশ, বহুবিবাহ ও স্ত্রৈণ স্বামী, মদ্যপ স্বামীর অত্যাচার ইত্যাদি কালীঘাট-পটে বিশেষ স্থান লাভ করে।

চতুর্থ গোষ্ঠীর মধ্যে বিড়াল, মাছ, বিড়ালের মাছ বা পাখি শিকার, অথবা সাপের ব্যাঙ শিকার, পায়রা, গাছের ডালে দুইটি টিয়া, সিংহ, শিয়াল, হরিণ প্রভৃতির জীবন্ত চিত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

লোকশিক্ষা-বিস্তারে উপদেশমূলক গল্পকাহিনীর বিভিন্ন ধারাও কালীঘাটের পটে লক্ষ্য করা যায়। ইহা ব্যতীত তদানীন্তন ধর্ম ও সমাজ-জীবনের নানাপ্রকার অনাচার ও কুসংস্কারকে কষাঘাত করার উদ্দেশ্যে কালীঘাটের পটুয়ারা ব্যঙ্গচিত্র আঁকিয়া সমাজ-সংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। এইসকল ব্যঙ্গচিত্র সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করে এবং সাধারণ মানুষকে সচেতন করিয়া দেয়।

এইসকল পটচিত্রে বাঙালী মনের ধর্মবিশ্বাস, লৌকিক সংস্কার, সাধ-আহ্লাদ, আশা-ভরসা ও

কামনা-বাসনার মূর্তি প্রতিফলিত। ইহাদিগের মধ্যে দুইটি মূল ধারা লক্ষ্য করা যায়—একটি ধর্ম-চেতনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও অন্যটি পরিবেশ-চেতনার দ্বারা প্রভাবিত। কালীঘাট-পটে পৌরাণিক চিত্র ব্যতীত অন্য সকল চিত্রই পরিবেশ-চেতনার সক্রিয় বোধ ও প্রয়োজন দ্বারা চালিত।

পটচিত্রের মধ্যে দেবদেবী ও পৌরাণিক চিত্রের সংখ্যাই অধিক। কালীঘাট-শিল্পযুগের প্রথমপর্বে ধর্মস্থানের মাহাত্ম্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ও পসার জমাইবার জন্য পটুয়ারা কেবলমাত্র দেবদেবীর চিত্র ও পৌরাণিক চিত্র আঁকিতেন। তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে যেসব শিশু আসিত তাহাদের জন্য পশুপক্ষীর চিত্রও আঁকা হইত। বাংলার সহজ সরল ধর্মভীরু মানুষ এইসকল পটচিত্র অতি সুলভ মূল্যে কিনিয়া পূজাগৃহে রাখিয়া ধূপধুনা জ্বালাইয়া পূজা করিতেন। এইভাবে কালীঘাটের পটের ধারা ও চাহিদা সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে পর উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল হইতে তাহারা ঐতিহাসিক, সামাজিক, গল্পচিত্র ও ব্যঙ্গচিত্র রূপায়ণে তৎপর হন। এই সময় কালীঘাট-পটের চাহিদা ক্রমশ বাড়িতে আরম্ভ করে এবং বাংলার বিভিন্ন জেলায় প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হইতে থাকে। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম হইতে যখন ইহাদের চাহিদা হ্রাস পাইতে শুরু করিল তখন পটুয়ারা জীবনমরণ-সংগ্রামের মুখোমুখী আসিয়া পটগুলি অধিকতর চটকদার করিবার উদ্দেশ্যে রেখার সহিত রঙের ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়কার পটচিত্রে কালো, হলুদ, নীল ও লাল রঙের ব্যবহার করা হইত। রঙের ব্যবহারে পটচিত্রগুলি রঙীন লিথোগ্রাফের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার অধিকার লাভ করিল সত্য কিন্তু তাহারা পটচিত্রের সারল্য হারাইয়া ফেলিল।

ছন্দময় বলিষ্ঠ রেখার একাত্মবোধ কালীঘাট-পটের বৈশিষ্ট্য। অশিক্ষিত গ্রাম্য পটুয়া সাধারণ তুলির স্পর্শে অবিচ্ছিন্ন গতিতে দেহের অঙ্গভঙ্গি. বলিষ্ঠ ও কমনীয়ভাব এবং মনের ও দেহের ভাবাবেগ কিরূপ সার্থকতার সহিত কাগজের উপর ফুটাইয়া তুলিতেন তাহা অদ্যাবধি আমাদের বিস্ময় ও প্রশংসার উদ্রেক করে। রেখার আভিজাত্য, ছন্দোবোধ ও সহজ ধারা ইহাদিগকে শিল্পসমাজে কৌলীন্যের অধিকার দান করিয়াছে। মন্দিরের আশেপাশে অন্ধকার গলির ছোট ছোট দোকানঘরে বিক্রয় হইত বলিয়াই ইহাদিগকে হেটো ছবি বা Bazar Paintings বলিলে কালীঘাট-পটের মর্যাদা নষ্ট হয় না।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, রেখাসর্বস্ব এই চরিত্র কালীঘাট-পট কোথা হইতে পাইল?

ভারতীয় চিত্রশিল্পের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলেই দেখা যায় যে ভারতীয় চিত্রধারার প্রধান বিশেষত্ব হইতেছে রেখার দক্ষতা, রেখার গতিছন্দ ও রেখার বলিষ্ঠতা। মডেলিং, আলোছায়া, দূরত্বনির্ণয় ও রং—এসব গৌণ। ভারতীয় শিল্পীর সার্থকতা এই রেখার গুণাগুণ আয়ত্ত করা, রেখার মধ্য দিয়া ছন্দ ও ভাব প্রকাশ করা। ভারতীয় শিল্পের এই শক্তি ও তেজ অজন্তা ও বাগ গুহায় সুপ্রতিষ্ঠিত এবং পরবর্তী শিল্পধারায় সম্পূর্ণ বিবর্তিত।

বাংলার চিত্রশিল্পধারা সর্বভারতীয় ধারার অনুক্রম মাত্র। বাংলা দেশের পাল ও পরবর্তী যুগের পুথিচিত্র-শিল্পের ধারান্তর বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, প্রবহমান রেখার এই মণ্ডনায়িত গতিই এই ছবিগুলির মেরুদণ্ড। "রেখাগুলি পূর্ণ মণ্ডনায়িত এবং অপরূপ মাধুর্য ও সংবেদনশীলতায় জীবন্ত; বিন্যাসও নিখুঁত।"[৩] পুঁথিচিত্র ব্যতীত সুন্দরবন ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে তাম্রপটে উৎকীর্ণ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রেখাচিত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। প্রথমটির বৃত্তান্ত ও প্রতিচিত্র আনন্দকুমার কুমারস্বামীর *Portfolios of*

৩ বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, পৃ ৮০৪

Indian Art নামক গ্রন্থে প্রকাশিত। দ্বিতীয় চিত্রটি রাজা ডোম্মনপালের সুন্দরবন তাম্রপট্টে এবং তৃতীয়টি চট্টগ্রাম জেলার মেহার গ্রামে প্রাপ্ত দেবরাজের তাম্রপটে অঙ্কিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামে এগুলি সযত্নে রক্ষিত আছে। এগুলি ত্রয়োদশ শতকের বাংলার চিত্রশিল্প-ধারার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।[৪] ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়ের মতে "উভয় চিত্রেই তীক্ষ্ণ রেখার দ্রুত রূপায়ণ এবং সে রূপায়ণে সজীব প্রবহমানতা অব্যাহত; অবিচ্ছিন্ন গতিও অক্ষুণ্ণ। তবে বেশ বুঝা যায়, যেখানেই সামান্য সুযোগ পাইয়াছেন শিল্পী সেইখানেই চঞ্চল বঙ্কিম রেখাপ্রবাহ সৃষ্টি করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন।···মনে হয়, শিল্পী যেন তীক্ষ্ণ দ্রুত রেখার বিলাসে প্রায় আত্মবিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন, কারণ রঙের মণ্ডনায়িত রূপায়ণ যেখানে নাই সেখানে শিল্পীর হাতে রেখাই বিষয়বস্তুর সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশের একমাত্র অবলম্বন। চঞ্চল দীর্ঘায়ত বঙ্কিম রেখা সৃষ্টির প্রচেষ্টার মধ্যে এই কামনা প্রত্যক্ষ।"[৫]

বাংলাদেশের পরবর্তী পাটাচিত্র, জড়ানো পটচিত্র, বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাস প্রভৃতির বহিঃরেখার সূক্ষ্মতা ও বৈচিত্র্য এবং সাবলীল গতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, প্রবহমান রেখাসৃষ্টির ধারাটি কিছুটা প্রচ্ছন্নভাবে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত প্রবাহিত। এই যুগের উজ্জ্বল বর্ণসমাবেশ রেখার প্রাধান্যকে কিছুটা ক্ষুণ্ণ করিলেও রেখা-বিন্যাসের ঐতিহ্য বর্ণসমাবেশের আড়ম্বরকে অধিকতর সুস্পষ্ট ও আবেগময় করিতে সাহায্য করিয়াছে।[৬]

উনবিংশ শতাব্দীতে নির্মিত বীরভূমে জয়দেব কেন্দুলী ও বর্ধমানে বনকাটীর পিতলের রথের গাত্রে খোদিত চিত্রগুলি বাংলার রেখাচিত্রের গৌরব আবার সুপ্রতিষ্ঠিত করে। এই রথের গাত্রে খোদিত পৌরাণিক চিত্রগুলি অপূর্ব গতিশীল ছন্দময় রেখায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত।[৭] একমাত্র রেখা অবলম্বনে সজীব ও গতিছন্দময় এরূপ সংগীত পূর্বে আর কোথাও শ্রুত হইয়াছে কিনা তাহা জানা নাই। এই সংগীতের মূর্ছনা বাংলার ঢাকা, নোয়াখালি, ময়মনসিংহ, মালদহ, রাজসাহী, বাঁকুড়া, বর্ধমান, নদীয়া ও চব্বিশ-পরগণার পটচিত্র, মাটির পুতুল, লক্ষ্মীসরা, মনসার ঘট প্রভৃতির মাধ্যমে তরঙ্গায়িত। ধর্ম ও অর্থের বিশেষ প্রেরণায় কালীঘাটে এই রেখাচিত্রের এক বিশেষ পরিণত রূপ লক্ষ্য করা যায়।

কালীঘাটের পটুয়া সাধারণ কাগজে সংবেদনশীল তুলির দ্রুতগতির সাহায্যে অতি অল্প সময়ে একান্ত বিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে এক-একটি ছবি সম্পূর্ণ করিতেন। রেখার গতির মধ্যে কোথাও অবিশ্বাস, ক্ষণিকের দুর্বলতা বা শ্রীহীনতা লক্ষ্য করা যায় না। শিল্পী অতি স্বাচ্ছন্দ্যে একই রেখাকে দ্রুত চালনা করিয়া এক-একটি চিত্র সম্পূর্ণ করিতেন কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোথাও ছন্দভঙ্গ হয় নাই, তুলির টানে অপ্রয়োজনে কালি মোটাসরু হয় নাই অথবা রেখার ছন্দ ও গতির মধ্যে কোনোরূপ বাদ-বিসম্বাদ হয় নাই। পরস্পর পরস্পরকে সম্পূর্ণ হইতে সাহায্য করিয়াছে।

এখানে আর-একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়— সেটি হইতেছে রেখার বাস্তবতাবোধ। রেখার মধ্য দিয়া শিল্পী পুরুষ-দেহের গতিশীল শক্তি, নারীর শান্ত ও সুকোমল শ্রী ও কমনীয়তা,

৪ *History of Bengal:* Dacca University (Chapter on Painting). Vol. 1

৫ বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, পৃ ৮০৬

৬ *Old Bengal Painting:* Ajit Ghosh. J.I.S.O.A. July-Oct. 1926 p. 103

৭ *A Brass Chariot from Bengal:* by G. S. Datta. J.I.S.O.A. Vol. IX 1941

মোহান্ত। কালীঘাট-পট

স্ত্রৈণ। কালীঘাট-পট

গজাসুর-বধ। পট

বনকাটি, বর্ধমান

শিয়ালরাজার গল্প। কালীঘাট-পট
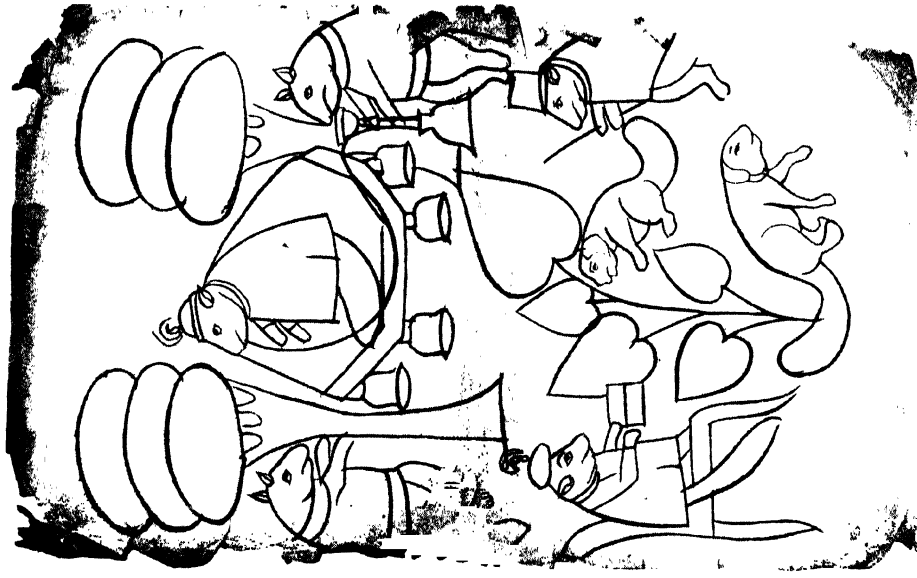
জাগ্রত ও নিদ্রিত অবস্থায় দেহরেখার দ্বিবিধ ভাব; ভক্ত ও সাধকের চোখের ও ঠোঁটের কোলে আত্মতৃপ্তি; শিকারী বিড়ালের গোঁফ ও চোখের মধ্য দিয়া পাওয়া ও না-পাওয়ার আশঙ্কা; সিংহের হিংস্র চক্ষু ও মঠমন্দিরের প্রাণহীন কঠিন সত্তা নিপুণভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। নারীর শ্রীরূপ পরিপূর্ণ রূপায়ণে হাতের ও আঙুলের বাঁক অথবা শাড়ী বা কুন্তলের ভাঁজে রেখার মাধুর্য পরিস্ফুট।

কালীঘাটের রেখাসর্বস্ব পটচিত্র রূপ ও রসে ভরপুর, শ্রী ও শক্তির সার্থক ও পরিণত রূপ। ইহা বাংলার রেখাচিত্র-ধারার পূর্ণতম প্রকাশ এবং সর্বভারতীয় চিত্ররীতির একটি বিশিষ্ট গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

উত্তরবঙ্গের নারীর ভাষা

নির্মল দাশ

সংস্কৃত নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নাট্যকারেরা সংলাপ রচনার ব্যাপারে জাতিভেদপ্রথা স্বীকার করেছেন। এই জাতিভেদ অবশ্য কিছুটা পাত্রপাত্রীর লিঙ্গগত, কিছুটা তাদের সামাজিক পরিচয়-গত। এ সম্পর্কে সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রীরা যে বিধান দিয়েছেন সংক্ষেপে তার মর্মার্থ হচ্ছে[১]: পুরুষ চরিত্র যদি অভিজাত হন তবে তিনি সংস্কৃতে কথা বলবেন, আর যদি অনভিজাত হয় তবে নাটকে তাকে যে অঞ্চলের লোক বলে দেখানো হবে সেই অঞ্চলের প্রাকৃতে তার সংলাপ রচিত হবে। এ ছাড়া স্ত্রী চরিত্রগুলি কয়েকটি ব্যতিক্রমধর্মী ক্ষেত্র ছাড়া প্রায় সব সময়েই প্রাকৃতে কথা বলবে, তবে চরিত্রের সামাজিক পরিস্থিতি অনুসারে প্রাকৃতেরও ইতরবিশেষ ঘটতে পারে। সংলাপ-রচনায় নাট্যকারদের এই ভেদনীতি হয়তো কিছুটা ব্রাহ্মণ্য রক্ষণশীলতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এবং এই ভেদসূত্র পুরোপুরি লিঙ্গগত না হয়ে অনেকটাই সেকালের সামাজিক পরিস্থিতির অনুগামী। তবু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এর মধ্যে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের একটি সূত্র আশ্চর্যভাবে নিহিত রয়েছে। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের অনুশীলনে যেসব পণ্ডিত নৃতত্ত্ব ও সমাজবিদ্যাকে বিশেষভাবে আশ্রয় করেছেন, তাঁরা ভাষাবিশেষের উপভাষা-বিচারে শুধু ভৌগোলিক বৈচিত্র্যই স্বীকার করেন নি, ভাষা-সম্প্রদায়ের নরনারী ভেদে উপভাষার লৈঙ্গিক পার্থক্যও নির্দেশ করেছেন। অর্থাৎ মূলতঃ একই ভাষার বক্তা হলেও পুরুষের ভাষা ও নারীর ভাষার মধ্যে নানাদিক থেকে কতকগুলি প্রভেদ তাঁরা লক্ষ্য করেছেন। এই প্রভেদের কারণ কিছুটা শারীরিক ও মানসিক, কিছুটা স্ত্রীপুরুষের সামাজিক বৈষম্যগত। যে সমাজ যত প্রগতিশীল এবং যে সমাজে নরনারীর সাম্য যত বেশি স্বীকৃত হয়েছে, সে সমাজে এই প্রভেদ তত বেশি দুর্লক্ষ্য। নারীর ভাষা সম্পর্কে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষক Otto Jespersen তাঁর *Language : Its Nature, Development and Origin* গ্রন্থের 'The Woman' শীর্ষক পরিচ্ছেদে সমাজবিদ্যার নানা তথ্যের ভিত্তিতে দেখিয়েছেন যে পৃথিবীর নানা সভ্য সমাজের চেয়ে আফ্রিকা ও আমেরিকার আদিম ও অনুন্নত স্তরের মানবগোষ্ঠীর

---

১ পুরুষাণামনীচানাং সংস্কৃতং স্যাৎ কৃতাত্মনাম্।
শৌরসেনী প্রযোক্তব্যা তাদৃশীনাঞ্চ যোষিতাম্।
আসামেব তু গাথাসু মহারাষ্ট্রীং প্রযোজয়েৎ।
অত্রোক্তা মাগধী ভাষা রাজান্তঃপুরচারিণাম্।...
সংস্কৃতং প্রযোক্তব্যং লিঙ্গিনীষূত্তমাসু চ।
দেবীমন্ত্রিসুতাবেশ্যাস্বপি কৈশ্চিত্তথোদিতম্।
যদ্দেশ্যং নীচপাত্রন্তু তদ্দেশ্যং তস্য ভাষিতম্।
কার্যতশ্চোত্তমাদীনাং কার্যো ভাষাবিপর্যয়ঃ।
যোষিৎ সখীবালবেশ্যাকিতবাপ্সরসাং তথা।
বৈদগ্ধ্যার্থং প্রদাতব্যং সংস্কৃতং চান্তরান্তরা।

—সাহিত্যদর্পণ, ২য় ভাগ ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মধ্যে উপভাষার এই লৈঙ্গিক পার্থক্য অনেক বেশি পরিস্ফুট। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের ব্যবহৃত শব্দভাণ্ডারের প্রকৃতি ও পরিমাণের দিকে নজর রাখলে উপভাষার এই পার্থক্য ধরা পড়ে। মেয়েরা তাদের প্রাকৃতিক সীমাবদ্ধতার জন্য স্বভাবতই কিছুটা রক্ষণশীল, তাই তাদের শব্দভাণ্ডারও অনেকখানি রক্ষণশীল, অর্থাৎ মেয়েদের কথায় এমন অনেক শব্দ ও ইডিয়ম পাওয়া যায় যা সেই সময়কার পুরুষের ভাষায় দুষ্প্রাপ্য ও অপ্রচলিত। সিসেরো-র একটি প্রচলিত উক্তির মধ্যে Jespersen মেয়েলি ভাষার এই রক্ষণশীলতার ইঙ্গিত পেয়েছেন।[২] আবার মেয়েদের ভাষা রক্ষণশীল বলেই পুরুষরা যে পরিমাণে নতুন কথা নিত্য ব্যবহার করে, মেয়েরা নতুন কথা তত আয়ত্ত করে না। তাই মেয়েদের শব্দভাণ্ডার পুরুষের ভাণ্ডারের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কৃশ। আবার শারীরিক-মানসিক উৎকর্ষের জন্যই হোক বা অন্য যে কারণেই হোক প্রগতির আহ্বানে পুরুষেরাই প্রথম সাড়া দেয়, সেজন্য কিছু-কিছু আদিম আচার ও সংস্কার নারীর মনো-জীবনের আশ্রয়েই দীর্ঘস্থায়ী হয়। মেয়েদের এই আপেক্ষিক আদিমতার জন্য প্রায় সব দেশের মেয়েদের বাগ্‌ব্যবহারে কতকগুলি সাধারণ বাচনিক নিষিদ্ধতা (verbal taboo) প্রতিপালিত হয়, যেমন, স্বামী বা গুরুজনের প্রকৃত নামোচ্চারণের পরিবর্তে তার সর্বনাম, প্রতিশব্দ বা রূপকার্থজ্ঞাপক শব্দব্যবহার, অমঙ্গলসূচক শব্দোচ্চারণে ভীতিবোধ ও প্রতিশব্দ-সন্ধান। শুধু অনুন্নত সমাজেই নয়, সভ্য সমাজেও হীনম্মন্যতাবোধ, লজ্জাশীলতা ও শারীরিক-মানসিক কোমলতা হেতু মেয়েরা কিছু-কিছু শব্দের সরাসরি ব্যবহারে সংকোচ বোধ করেন। শব্দভাণ্ডারের এই দারিদ্র্য, লজ্জাতুরতা ও অন্যান্য সীমাবদ্ধতার জন্য মেয়েদের কথায় শ্বাসাঘাত ও স্বরাঘাত প্রাধান্য লাভ করে। এই স্বরাঘাত ও শ্বাসাঘাতের সাহায্যে মেয়েরা কথার অন্তর্নিহিত আবেগ বা ভাবকে একটা নির্দিষ্ট দিকে চালিত করার চেষ্টা করে। এই একই কারণে মেয়েদের ভাষায় তীব্রতাসূচক ও অনুভবদ্যোতক অব্যয় ও বাক্যাংশের আধিক্য। ভাবের তুলনায় শব্দ কম ও শ্বাসাঘাত-স্বরাঘাত বেশি বলে সাধারণ কথোপকথনে পুরুষের চেয়ে মেয়েদের বাক্যই পরিমাণে বেশি অসমাপ্ত থাকে, সুতরাং অসম্পন্ন বাগ্‌ব্যবহার (aposiopesis) নারীর ভাষার আর-একটি আপেক্ষিক বৈশিষ্ট্য। এ ছাড়া মেয়েরা ভাবপ্রকাশ করতে গিয়ে তীব্রতাসূচক ঝোঁক দেওয়া শব্দ বা শব্দগুচ্ছ ব্যবহারের পক্ষপাতী বলে তারা একাধিক বাক্যাংশ-নির্ভর দীর্ঘ মিশ্র বাক্য ব্যবহারে তেমন অভ্যস্ত নয়, কিন্তু পুরুষেরা শব্দভাণ্ডারের আপেক্ষিক সমৃদ্ধির জন্যই হোক অথবা ভাবপ্রকাশের ব্যাপারে কিছুটা চিন্তা বা বুদ্ধিনির্ভর হওয়ার জন্যই হোক একাধিক বাক্যাংশ-নির্মিত একটি জটিল বাক্য (hypotaxis) ব্যবহারে অসুবিধা বোধ করে না। মেয়েদের দীর্ঘবাক্য সেদিক থেকে আসলে সংযোজক অব্যয় দিয়ে জোড়া-দেওয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যের সংকলনবিশেষ (parataxis)।[৩] ভালো করে খুঁটিয়ে দেখলে উভয় ভাষার মধ্যে সাধারণ স্তরে আরো অনেক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রভেদ ধরা পড়বে, তাদের কোনোটি চূড়ান্ত কোনোটি বা দেশকালপাত্রভেদে আপেক্ষিক। সেই বিস্তৃত সাধারণ পর্যবেক্ষণের অবকাশ এখানে নেই।

---

২ ". . . Cicero in an often-quoted passage says that when he hears his mother-in-law Lælia, it is to him as if he heard Plautus or Nævius, for it is more natural for women to keep the old language uncorrupted, as they do not hear many people's way of speaking and thus retain what they have first learnt (De oratore, III 45)."—*Language: Its Nature, Development and Origin,* chapter XIII, 12th impression, p. 242.

৩ "In learned terminology we may say that men are fond of hypotaxis and women of parataxis" *Language: Its Nature, Development and Origin* p. 251. .

বাংলা ভাষার উপভাষা নিয়ে এ পর্যন্ত যেটুকু আলোচনা হয়েছে তার প্রায় সবটাই ভূগোলভিত্তিক। ভূগোল ছাড়াও লিঙ্গের ভিত্তিতে বাংলা ভাষার যে পুনর্বিশ্লেষণ করা চলে সে সম্পর্কে সুধীসমাজের দৃষ্টি তেমন জাগরূক নয়। উনিশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে উইলিয়ম কেরী তাঁর 'কথোপকথন' গ্রন্থে বাংলা মেয়েলি ভাষার কিছু নমুনা সংকলন করেছিলেন, কিন্তু এই সংকলন ভিন্নতর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হওয়ায় এর অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন ভাষাতাত্ত্বিক ইঙ্গিতগুলি পরবর্তী ভাষা-গবেষকদের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। এ ছাড়া, উনিশ শতকের বাংলা নাটকগুলিতে বিশেষতঃ সামাজিক প্রহসনগুলির নারীচরিত্রের সংলাপে আঞ্চলিকতা ও মেয়েলি ভাষণভঙ্গী অনেকখানি রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু এইসব ক্ষেত্রে নাট্যকারদের মূল লক্ষ্য ছিল বাস্তব বাতাবরণসৃষ্টি ও মেয়েলি সংলাপের অ-সাধারণত্বের সাহায্যে প্রহসনের কৌতুকরসবৃদ্ধি। তা ছাড়া সংস্কৃত নাটকে সংলাপরচনার চরিত্রসাপেক্ষ ভেদসূত্রের দ্বারাও আদিপর্বের বাঙালী নাট্যকারেরা অনেকখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিশেষভাবে নাটকের প্রয়োজনে রচিত হওয়ায় এইসব মেয়েলি সংলাপে বাস্তবতার স্থূল স্পর্শ থাকলেও ভাষাতাত্ত্বিক সূক্ষ্মদর্শিতা ও যাথাযথ্যবোধের পরিচয় তেমন পাওয়া যায় না। তা ছাড়া নাটক সৃষ্টিধর্মী রচনা, ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তার কর্তব্য নয়। ১৮৭২ সালে সারদাচরণ মিত্র বাংলা ভাষাবিজ্ঞানবিষয়ক একটি প্রবন্ধে বাংলা মেয়েলি ভাষার রূপস্বাতন্ত্র্যের কথা উল্লেখ করেন, কিন্তু প্রসঙ্গটি তিনি বিস্তারিত ভাবে বিশ্লেষণ করেন নি। এর পর বাঙালী সাহিত্যিকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম বাংলার লোক-সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে 'গৃহচারিণী অকৃতবেশা অসংস্কৃতা' মেয়েলি ভাষার মাধুর্য ও সৌন্দর্য সম্পর্কে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তবে তাঁর আলোচনা মূলতঃ মেয়েলি ছড়ার রসগত সৌন্দর্য নিয়ে, ছড়ার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে নয়। বাংলা তথা নব্যভারতীয় আর্যভাষার লিঙ্গগত রূপান্তর সম্পর্কে গবেষকদের দৃষ্টি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেই আকৃষ্ট হয়েছে। জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ারসন তাঁর 'লিংগুয়িস্টিক সার্ভে অব ইণ্ডিয়া' গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহের সময় পুরুষের ভাষা ও নারীর ভাষার সূক্ষ্ম পার্থক্য সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন, তবে তাঁর 'সার্ভে'র উদ্দেশ্য ঠিক ভাষাবিশেষের লিঙ্গগত বৈচিত্র্যবিচার নয় বলেই তাঁর ভাষাতাত্ত্বিক সমীক্ষায় বিষয়টি অগ্রাধিকার বা স্বতন্ত্র মনোযোগ পায় নি। পৃথক্‌ভাবে শুধু লিঙ্গের ভিত্তিতেই যাঁরা ভাষার রূপবিচার করেছেন তাঁদের মধ্যে ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয়ের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Journal of the Department of Letters (Vol. XXVIII)-এ প্রকাশিত 'Women's Dialect in Indo-Aryan' ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় (১৯২৭) প্রকাশিত 'বাংলায় নারীর ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধ-দুটি এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। 'বাংলায় নারীর ভাষা' প্রবন্ধে ড. সেন জানিয়েছেন, "বাঙলা বলতে কেবল মধ্য-ও-পূর্ব পশ্চিমবঙ্গের অর্থাৎ হাওড়া-হুগলী-বর্ধমান-চব্বিশ পরগণার মুখের ভাষা বুঝোবে।" বাংলা সাহিত্যে এই মধ্য-ও পূর্ব- পশ্চিমবঙ্গের উপভাষাই অল্পবিস্তর পরিবর্তিতভাবে শিষ্ট ভাষা হিসাবে গৃহীত হয়েছে, তা ছাড়া আদিপর্বের বাংলা নাটকে মেয়েলি সংলাপ-বিশিষ্ট যেসব নারীচরিত্রের দেখা পাওয়া যায় তাদের অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গীয়। সুতরাং ড. সেনের আলোচনা একদিক থেকে সাহিত্যে গৃহীত ভাষারূপেরই লিঙ্গগত বিশ্লেষণ।

উত্তরবঙ্গের উপভাষা সাহিত্যিক কৌলীন্য না পেলেও বাংলাভাষার ইতিহাসে এই উপভাষার বিশেষ গুরুত্ব আছে। ভাষাবিজ্ঞানীরা বাংলাদেশের উত্তর-উত্তরপূর্বাঞ্চলের উপভাষাকে 'কামরূপী' নামে চিহ্নিত করে ক্ষান্ত থাকেন; কিন্তু এই সাধারণীকৃত নামকরণে এই অঞ্চলের ভাষাগুলি সম্পর্কে সূক্ষ্মতর

ভাষাতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের পরিচয় অনেকখানি অস্পষ্ট থাকে। এই অঞ্চলের ভাষা-সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে যেমন বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী আছে তেমনি পার্বত্য সীমান্ত জুড়ে ভোটবর্মী ভাষাসম্প্রদায়ও আছে। এই সীমান্তবাসী ভাষাসম্প্রদায় কোথাও কোথাও বাংলা ও ভোটবর্মী ভাষার দুটিকেই পারস্পরিক বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত করে (যেমন, দমনপুরের গারো, রাভা সম্প্রদায়)। ভোটবর্মী ভাষাসম্প্রদায় বাংলাকে বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করায় অনেক ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের বাংলা উপভাষায় প্রতিবেশী ভাষার নানা প্রভাব অনিবার্যভাবে পড়েছে। এই অঞ্চলের বাংলা উপভাষার পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ করতে গেলে এই প্রভাবসূত্রগুলি অতি সন্তর্পণে সন্ধান করা দরকার। এই প্রভাবসূত্রগুলির বিচিত্রতার জন্যই শুধু 'কামরূপী' নামের ছাপ দিয়ে এ অঞ্চলের উপভাষাকে চিহ্নিত করা চলে না। এ ছাড়া, এ অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে যাঁরা শুধু বাংলাভাষা ব্যবহার করেন তাঁদের মুখের ভাষাও ঐতিহাসিক কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা ভাষার মধ্যস্তরের লক্ষণ নির্দেশের ব্যাপারে ভাষাবিজ্ঞানীরা মুখ্যতঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথি ও বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য ও পদাবলীর পুথির উপর নির্ভর করেন, কিন্তু এইসব পুথির প্রাচীনত্ব ও প্রামাণিকতা নিয়ে অনেকক্ষেত্রে সন্দেহের অবকাশ থাকায় পুথির ভাষাবৈশিষ্ট্যের প্রাচীনতা নিয়েও সন্দেহ জাগা অস্বাভাবিক নয়। এদিক থেকে উত্তরবঙ্গের মুখের ভাষা বাংলা ভাষাবিজ্ঞানীদের কাছে অত্যন্ত সহায়ক বলে মনে হবে। কেননা, পুরনো বাংলার যেসব লক্ষণ তাঁরা নির্দেশ করে থাকেন ভালোভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তার অনেকগুলিই এ অঞ্চলের ভাষায় টিকে রয়েছে, যেমন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন তথা আদি-মধ্য বাংলায় আদ্যস্বরে শ্বাসাঘাত পড়ায় আদ্য অ>আ (অসুখ>আসুখ, অনল>আনল, অনুপম>আনুপাম ইত্যাদি)। উত্তরবঙ্গের ভাষারও একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আদ্য অ> (প্রায়শঃ) আ (অবস্থা>আবস্থা, কথা>কাথা, অতি> আতি, গলা>গালা, হতে>হাতে, ঘড়া>ঘারা ইত্যাদি), এর উল্টোটাও অবশ্য দেখা যায়, অর্থাৎ চলিত বাংলায় যেখানে আদি স্বর দীর্ঘ এখানে তা হ্রস্ব, যথা—মাসী>মোসী, পাখী>পখি, গাছ>গছ ইত্যাদি। এ ছাড়া সাধারণভাবে ভাষাবিজ্ঞানের বিচারে বাংলার বিভিন্ন উপভাষাগুলির মধ্যে 'বঙ্গালী' উপভাষা অনেকটা রক্ষণশীল অর্থাৎ ভাষাতাত্ত্বিক প্রাচীনতার লক্ষণ এই উপভাষায় অনেক বেশি পরিমাণে সংরক্ষিত। এদিক থেকে বঙ্গালীর সঙ্গে এ অঞ্চলের উপভাষার অনেক মিল আছে, কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে উত্তর-বঙ্গের উপভাষায় বঙ্গালীর চেয়েও প্রাচীনতর অবস্থার নিদর্শন অনেক বেশি পরিমাণে নিহিত আছে। যেমন, অপিনিহিতি বঙ্গালীর একটি সর্বব্যাপী বৈশিষ্ট্য, কিছু উত্তরবঙ্গের উপভাষায় অপিনিহিতির ব্যবহার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, সেই জায়গায় শব্দের অপিনিহিত রূপের অব্যবহিত প্রাচীনতর রূপটিই ব্যবহৃত হয়, উদাহরণ—

বঙ্গালী	কামরূপী
আইজ	আজি
কাইল	কালি
রাইত	আতি
রাইখ্যা	আখিয়া
কইর‍্যা	করিয়া
জাউল্যা	জালুয়া, ইত্যাদি

অনেক ক্ষেত্রে প্রাচীন বাংলার মতো ইল-ইব-প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদের বিশেষণ হিসাবে ব্যবহারের নজীর

এই উপভাষায় লক্ষ্য করা যায়, যেমন, দেখিলা মান্‌সি—দেখা মানুষ, আসিবা দিন—আগামী দিন, ইত্যাদি। এ ছাড়া, উত্তরবঙ্গের উপভাষায় নঞর্থক বাক্যগঠনে মধ্যবাংলার বাক্যরীতির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। মধ্য বাংলায় নঞর্থক শব্দটি সমাপিকা ক্রিয়াপদের পূর্বে বসে, উত্তরবঙ্গেও তাই ঘটে। এমন কি প্রাচীন সাহিত্যে স্থান পেয়েছে এমন কিছু কিছু প্রবাদ-প্রবচন ও কবিপ্রসিদ্ধি এ অঞ্চলের মুখের ভাষায় খুঁজে পাওয়া যায়, যেমন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের একটি বিখ্যাত শ্লোক 'বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী।/ মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী॥' এর প্রতিধ্বনি শোনা যায় উত্তরবঙ্গের নারীর মুখের প্রবাদোক্তিতে: বন পোড়া যায় সোগ্‌গায় দেখে / মন পোড়া যায় কাঁহয় না জানে। সূক্ষ্ম ও বিস্তৃততর বিশ্লেষণে উত্তরবঙ্গের উপভাষার আপেক্ষিক রক্ষণশীলতার আরও নিদর্শন পাওয়া যেতে পারে। এই রক্ষণশীলতার কারণ উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের মধ্যে অনেক পরিমাণে নিহিত আছে। রাজনীতি-সমাজব্যবস্থা ও সংস্কৃতিচর্চার দিক থেকে যেসব অনুকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রগতির সম্মুখীন হয়েছে উত্তরবঙ্গের ভাগ্যে তা জোটে নি বলেই অন্যান্য অনেক ব্যাপারের মতই ভাষার ব্যাপারেও এ অঞ্চলে মধ্যযুগ দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। কিন্তু মধ্যযুগ কোথায় কিভাবে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে তার বিশদ আলোচনা এখানে অবান্তর। নারীর ভাষার আলোচনায় উপভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্যের আলোচনাও অবান্তর মনে হতে পারে, কিন্তু এই আলোচনা এই কারণেই অপরিহার্য যে, বাংলা উপভাষাগুলির মধ্যে উত্তরবঙ্গের উপভাষার ভূমিকাটি বোঝা গেলে তার পটভূমিকায় এ অঞ্চলের নারীর ভাষার সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যটি অনায়াসে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। নারীর ভাষা স্বভাবতই রক্ষণশীল, অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের উপভাষাও প্রকৃতিগত ভাবে অনেকখানি রক্ষণশীল, সুতরাং এ অঞ্চলের নারীর ভাষা প্রায় দ্বিগুণভাবে রক্ষণশীল। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের নারীর ভাষার তুলনায় এ অঞ্চলের নারীর ভাষার রক্ষণশীলতার মাত্রা নির্ধারণের জন্যই এই প্রসঙ্গের অবতারণা।

এ অঞ্চলের নারীর ভাষার রক্ষণশীলতা শুধু উত্তরবঙ্গীয় উপভাষার সাধারণ প্রকৃতির কাছ থেকেই আনুকূল্য পায় নি, এ অঞ্চলের বৃহত্তর নারীসমাজের রক্ষণশীল পরিস্থিতিও এ ব্যাপারে একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান। কিছুদিন আগে ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল মহাশয় *The Rajbanshis of North Bengal* (Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 1965) নামে যে গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন তাতে দেখা যায় যে এ অঞ্চলের রাজবংশী সমাজে নারীর বহুবিবাহ প্রচলিত থাকলেও বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মেয়েদের মতই এখানকার মেয়েরাও আসলে পুরুষ-নির্ধারিত সামাজিক নিয়মকানুনেরই একান্ত বশবর্তী। বিধবা অবস্থাতে তো বটেই এমনকি সধবা অবস্থাতেও নারীর পুনর্বিবাহে এ সমাজের অনুমোদন আছে, কিন্তু এই বৈবাহিক অবস্থান্তর নারীর ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষাকে অনুসরণ করে না। এ অঞ্চলে কন্যার বিবাহে কন্যার অভিভাবক বরপক্ষের কাছ থেকে কন্যাশুল্ক লাভ করে থাকেন, তাই একই নারীর পৌনঃপুনিক বিবাহের ব্যবস্থা করে সমাজ নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতাকে মর্যাদা দেয় না, নারীকে অর্থলাভের সমাজ-অনুমোদিত মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে। নারীর এই বিচিত্র বিবাহপদ্ধতি ও এইসব বিবাহের মাধ্যমে নারী সম্পর্কে পুরুষের যে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায় তাতে আপেক্ষিক ভাবে পুরুষেরই প্রাধান্য ও সামাজিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়। উত্তরবঙ্গের নারীর ভাষা আলোচনা করতে গেলে নারীর সামাজিক ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে। নারী মূলতঃ সামাজিক শোষণের লক্ষ্যস্থল বলে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের

মত এ অঞ্চলের স্ত্রীশিক্ষার কোনো প্রাচীন দেশজ ঐতিহ্য দেখা যায় না। গৃহস্থালীর কাজকর্মই তাদের প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়। প্রশস্ত শিক্ষার অভাবে সংসারের নানা ব্যাপারে, বিবাহে, দাম্পত্যজীবনযাত্রায় ও সন্তানধারণ-প্রসব-পালনের ক্ষেত্রে মেয়েদের নানা আদিম প্রথা ও সংস্কার পোষণে অভ্যস্ত হতে দেখা যায়। সামাজিক স্তরে পুরুষের এই আপেক্ষিক সুবিধা ভোগের ফলে এই অঞ্চলের শিক্ষিত পুরুষ ও অশিক্ষিত পুরুষের মধ্যে যে পার্থক্য, অশিক্ষিত পুরুষ ও অশিক্ষিতা নারীর মধ্যে পার্থক্য তার তুলনায় অনেক বেশি। সুতরাং এদিক থেকেও এ অঞ্চলের নর ও নারীর ভাষার মধ্যে পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক।

মেয়েদের ভাষার সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী উত্তরবঙ্গের নারীর ভাষাতেও তীব্রতা ও তীক্ষ্ণতাদ্যোতক স্বরাঘাত ও শ্বাসাঘাত লক্ষ্য করা যায়। পুরুষের বাগ্‌ব্যবহারের লয় সে তুলনায় বিলম্বিত। প্রকৃতপক্ষে ধ্বনিপ্রকৃতির দিক থেকে পুরুষ ও নারীর ভাষার মধ্যে তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য নেই। বিষমী-ভবন (জননী > জলনী, সিনান > সিলান), বিস্ফারণ (গান > গাহান, তোর > তোহোর), স্বরভক্তি (লক্ষ্মী > লখমী, গ্রাম > গারাম, বৃষ্টি > বিরিষ্টি), আদ্য ব্যঞ্জনের মহাপ্রাণতা (বেশ > ভেশ, জন > ঝন, বাসা > ভাসা), আদ্যস্বরে শ্বাসাঘাত হেতু পদমধ্যস্থ ধ্বনির বিবিধ পরিবর্তন: (১) পরবর্তী ঘোষবৎ > অঘোষ (জীব > জীপ, খুব > খুপ, ভোগ > ভোক), (২) আদ্য অ > আ (অবস্থা > আবস্থা, অসুখ > আসুখ, অলক > আলক), (৩) মধ্যস্বরলোপ, ফলে দ্বিমাত্রিকতা (কোট্‌কা, কোট্‌কী), আদ্য র লোপ, আদ্য ল > ন (লাউ > নাউ, লাগে > নাগে, লাংগল > নাংগল)— ধ্বনিব্যবহারের এই বৈশিষ্ট্যগুলি পুরুষ ও নারীর ভাষায় মোটামুটি একই রকম। পার্থক্যটা মূলতঃ শব্দভাণ্ডারের দিক থেকে এবং কিছু পরিমাণে রূপতত্ত্ব তথা পদসাধনের দিক থেকে। তৎসম শব্দ তথা সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান অত্যন্ত পরোক্ষ ও সংকীর্ণ হওয়ায় অনুকার ও দ্বিরুক্ত শব্দ ব্যবহারের দিকে এই অঞ্চলের মেয়েদের একটা সাধারণ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এইসব শব্দের অন্তর্নিহিত ধ্বনিব্যঞ্জনা বা ধ্বনিচিত্রের মাধ্যমে এ অঞ্চলের নিরক্ষর মেয়েরা কোনো বিমূর্ত ভাব বা ভাবের প্রতিকৃতি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। যেমন, বেশবাস সম্পর্কে অমনোযোগী ব্যক্তি— ভুলংভাসাং; খুব মোটা স্ত্রীলোক— ঢেমসী; মোটা পুরুষ— চেন্দেলা, ধেদেমা; রোগা পুরুষ— সিটিঙ্গা, খিট্‌মিটা, সিটিংবিটিং; অন্যমনস্ক ব্যক্তি— ঘুং সুং; বোকা লোক— ভ্যাদাং ভ্যাং, ভ্যালট্যাঙা, ভোচোক-চোক; অগোছালো (জিনিস)—ভকর (ভাকর) ভাউল; শূন্যতা দ্যোতনায়—ডং ডং (তুলনীয়: পশ্চিমবঙ্গীয় 'খাঁ খাঁ'); অলস ব্যক্তি—স্যালস্যালা; বাচাল বা অনবরত কথা বলে যে— ভোক ভোকিয়া, চ্যাদাং ব্যাদাং, অস্থির অসহিষ্ণু ব্যক্তি— হোদোকদোকী; রোগা বালক— কেনকেনিয়া, পরদ্রব্যকাতর বালক— টেপেস টুপুস; খুব পাকা (ফল)— -নল্‌ নল্‌, টস টস, ইত্যাদি। এই ধরণের ধ্বনিনির্ভর শব্দ মেয়েদেরই সৃষ্টি, তবে শব্দগুলির ভাবপ্রকাশক অমোঘতার জন্য পুরুষেরাও কখনো কখনো এগুলির সাহায্য নেয়।

পূর্বেই দেখা গেছে যে, ঝোঁক দিয়ে কথা বলা অভ্যাস ব'লে মেয়েরা সাধারণতঃ দীর্ঘ বাক্যের চেয়ে হ্রস্ব বাক্য বেশি ব্যবহার করে এবং বাক্যের অন্তর্গত সংশ্লেষযোগ্য একাধিক পদকে সমাসের মত একটি পদে ঘনীভূত করে নেয়। এদিক থেকে উত্তরবঙ্গের নারীর ভাষায় বহুব্রীহি, তৎপুরুষ, দ্বন্দ্ব ও শব্দদ্বৈতের ব্যবহার খুব বেশি। ব হু ব্রী হি— মুটুককেশী [যে মেয়ের চুল কোঁকড়ানো], চিরলদাঁতী [সূক্ষ্ম ও অসমান দন্ত -বিশিষ্ট মেয়ে], হাসগালাণ্ডী [হাঁসের গলায় মত লম্বা গলা যে মেয়ের], খরমপাই [খড়মপেয়ে], হাতিপাই

[হাতির পায়ের মত বিসদৃশ পা যে-মেয়ের], হটাকোটিয়া [(হটা — ডেঁয়ে পিঁপড়ে) ডেঁয়ে পিঁপড়ের মত উচ্চনিতম্বিনী], কালীচুলী [(কালী-প্রতিমার মত ?) লম্বা চুল যে-মেয়ের], ঢ্যাপরাচোখু [বড় বড় চোখ যার], তিনকোনিয়ার [ত্রিভুজ], মাউরিয়া [মাতৃহীন], মাইয়ামরা-মাগমরা-মোগীমরা [বিপত্নীক], জোঁয়াই-ভাতারী [(জামাইকে যে পতিত্বে বরণ করেছে) এটি গালাগালিতে ব্যবহৃত হয়], হাগরুয়া-নিগরুয়া [গোরু নেই যার (গোরু এ অঞ্চলের কৃষিজীবী সমাজে অন্যতম প্রধান সম্পদ বলে গণ্য, সেজন্য ব্যক্তিবিশেষের গোরু থাকা না-থাকার উপর তার সামাজিক মর্যাদা অনেকটা নির্ভর করে)], ইত্যাদি। তৎপুরুষ— সেজামুতুরি [শয্যায় মূত্রত্যাগে অভ্যস্ত (শিশু বা বালক)], গাবুর-আড়ি [তরুণী বিধবা], ডেক্কুর-আড়ি [গর্ভিণী অবস্থায় বিধবা], চেটুলআড়ি-চিতলআড়ি-ফুলআড়ি [বালবিধবা], ভাতারীমাই-ভাতাত্তীমাই [সধবা মেয়ে], বিহাতীবেটী-বিয়াত্তীমাই [বিবাহিতা মেয়ে], গাবুরবেটী [বিবাহযোগ্যা মেয়ে (তুলনীয় : সোমত্ত মেয়ে)], পাতগাবুর [কিশোর বয়স্ক], জেঠপোইত [(<জ্যেষ্ঠ পতি) বয়োজ্যেষ্ঠ ননদের স্বামী], শালপোইত [ছোট ননদের স্বামী], নাংগাহী [(নাং — উপপতি) অসতী স্ত্রীলোক], সরগোচালী-বাহোমারী [পাড়াবেড়ানী স্ত্রীলোক], মর্দাহী [মর্দ অর্থাৎ পুরুষের মত চালচলন যে স্ত্রীলোকের], ছোয়াভুরকা [ছেলেভুলানো (ছড়া)], ইত্যাদি। দ্বন্দ্ব ও দ্বিরুক্ত পদসমুচ্চয়— ত্যালসুপারি, পানগুয়া, ছামগাইন [ধানকুটবার উদখল], কাপড়লতা, পুছাগোংসা, বাই বাই [এক গুঁয়ে], ন্যাম ন্যাম [বড় বড়], নেসভেস [বন্ধুত্ব, ভাবসাব], খেস-নেস [যন্ত্রণা], হবর-জবর [বাহুল্য বা আতিশয্য বোঝাতে] ইত্যাদি।

এদিককার নারীর ভাষার অপর বৈশিষ্ট্য কতকগুলি বিশেষ উপসর্গ ও প্রত্যয়ের প্রতি পক্ষপাত। উপসর্গ (নঞর্থক) : নি— নিলাজ, নিধনী, নিগরুয়া, হা— হাগরুয়া ; অ, আ— অফুলা (ফুলহীন), আদেখিলা (অদেখা), আড়িম (ডিম্বহীন)। (স্বার্থিক) অ, আ— অকুমারী, আকুয়ারী (কুমারী কন্যা), আছিদ্দোর (ধূর্ত)। বংশগত অধস্তনতা-দ্যোতনায় পা (<প্র), গু— পা-নাতি, পা-নাতিনী গু-নাতি। প্রত্যয়ের মধ্যে : তদ্ধিত— আর, আরী -আল, -ইয়া-ইআর-ইয়াল, উয়া- উয়ার, -তী -লী, যথা, বাঁশিয়ার (বাঁশিওয়ালা), ভুজারী (ভুজাবিক্রেতা), বাঁশিয়াল-গীতাল-মইশাল (বাঁশিওয়ালা-গীতিকার বা গায়ক- মহিষপালক), জাঙ্গালিয়া (বনচর), গাউনিয়ার (গায়ক), কামাইয়াল (শ্রমিক), ধানুয়া (ধান্যবিক্রেতা), পানুয়ার (পানবিক্রেতা), আগতী-পছিমতী-ছোয়াতী-বিহাতী-বিয়াতী, ভাতাত্তী— ভাতারতী, নিকাতী (নিকাহ্ করা বউ), পেটেলী (গর্ভিণী), ফেদেলী, দোন্দোলী (<দ্বন্দ্ব, কলহপ্রবণ স্ত্রীলোক), ইত্যাদি। কৃৎপ্রত্যয়— আ— মুড়িবেচা (মুড়ি— √বেচ্ + আ), ঘাসবেচা। -তী— শুকাতী (শুকনো), বুকাতী (চুয়া— পরিত্যক্ত কূপ),- লা— দেখিলা (মানসি — পরিচিত লোক) উইয়্যা— দেউয়্যা (দানকর্তা), খাউইয়্যা (ভোজনকারী) ইত্যাদি। এ অঞ্চলের মেয়েদের কতকগুলি বহুব্যবহৃত মনোভাব-দ্যোতক অব্যয় ও বাক্যাংশ— (ভয়-যন্ত্রণা-মনঃকষ্টব্যঞ্জক) ওরে বাপ্, মইলুম বাবা, মরনু মাও, আগা বাবা, ওহো ভগবান, হা ভালে তো (হা আমার কপাল) ; (করুণা দ্যোতক) এঃ বাপ্‌রে বাপ্, (বিস্ময় দ্যোতক) আউ আউ ইত্যাদি।

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত এই অঞ্চলের মেয়েদেরও কিছু বাচনিক নিষিদ্ধতা (verbal taboo) আছে। রাত্রে হলুদকে এঁরা নং (<রং) বলেন, দইকে বলেন চুন। আঁতুড় ঘরে আগত স্ত্রী অপদেবতা—

প্যাত্তানী (<প্রেতেনী), পুরুষ অপদেবতা— ভুয়ারী ঠাকুর। আহারের জন্য বয়স্ক পুরুষকে আহ্বান করতে হলে এঁরা সরাসরি খেতে আসবার কথা বলেন না, বলেন 'আইস'। এঁদের সংস্কার, সরাসরি ভাত খেতে আসার কথা বললে সকলেই তা বুঝতে পারে এবং প্রেতাত্মারাও হয়ত সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ভোজনে বিঘ্ন ঘটাতে পারে, এজন্য মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় ঘরণীর কণ্ঠে শুধু 'আইস' শুনেই গৃহস্বামী ভোজনের জন্য তৎপর হন। স্বামী বা গুরুজনের নাম এঁরাও মুখে আনেন না। শুধু তাই নয়, ঐ নামের সাদৃশ্য বা সমোচ্চার-সম্পন্ন শব্দ পর্যন্ত এঁরা উচ্চারণ করেন না। এ ক্ষেত্রে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে একটি ব্যক্তিগত নাম দেওয়া হয়, অথবা প্রকৃত নামের পরিবর্তে নামের প্রতিশব্দ-স্থানীয় কোনো শব্দ বা শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করা হয়। যেমন স্বামীর নাম যদি কালুয়া বা কালাচাঁদ হয় তবে স্ত্রী তার নামকরণে মইলা বা মইলা চাঁদ ব্যবহার করবে, মইলা অর্থে কালো। গুরুজনের বিকল্প নাম হিসাবে অনেক সময় তেল স্থলে 'চিকন', বাটি স্থলে 'মালই', ভাত-স্থলে 'গরম', পান্তাভাত স্থলে 'ভিজা', বিড়াল স্থলে 'নাকাড়' শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়। স্বামীর ক্ষেত্রে সম্বোধনে 'এই' 'গে' 'হে' ব্যবহৃত হয়, ভাসুর অসম্বোধিত, বিশেষ প্রয়োজনে 'দাদা'। ভাসুরের স্ত্রী সম্বোধনে 'বাই' 'দিদি', বড় ননদ (সম্বন্ধ— নোনোদী)— দিদি, বাই ; বড় ননদের স্বামী (সম্বন্ধে— জেঠ পোইত)— দাদা ; শ্বশুর (সম্বন্ধে— সোসুর)— বাহা, বাপু, ঠাকুর (সম্বোধন) ; শাশুড়ী (সম্বন্ধ— সাসুড়ী)— মা, আই ; পিতামহ— ঠাকুরবাবা, মাতামহ— আজু, মাতামহী— আবো।

নারীর ভাষার একটি বিশিষ্ট আশ্রয় শিশুদের ডাকনামগুলি। শৈশবে শিশুরা মেয়েমহলে অর্থাৎ মা-মাসি-দিদিমা-ঠাকুরমার কাছেই বেশি সময় কাটায়, তাই তাদের নামকরণে বিশেষতঃ আটপৌরে ডাকনামগুলিতে মেয়েদেরই কর্তৃত্ব লক্ষ্য করা যায়। বয়ঃপ্রাপ্ত হবার পর বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য তৎসম শব্দ দিয়ে বালকের নতুন পোশাকী নামকরণ করা হয় বটে, কিন্তু বাড়িতে বা ঘরোয়া পরিবেশে সেই আটপৌরে শৈশবকালীন নামগুলিই ব্যবহৃত হয়। এইসব আটপৌরে নামকরণে মেয়েদের বিচিত্র প্রবণতা, দৃষ্টিভঙ্গি, সংস্কার ও পর্যবেক্ষণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বাগর্থবিজ্ঞান বা Semantics-এর দিক থেকে এইসব নামকরণ তাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উত্তরবঙ্গের শিক্ষিত পুরুষ ও নারীর পোশাকী নামের ক্ষেত্রে তৎসম শব্দ প্রচলিত থাকলেও ডাকনামগুলি নিতান্তই দেশজ, তদ্ভব কিংবা ক্বচিৎ অর্ধতৎসম। এই অঞ্চলের মানুষ মুখ্যতঃ কৃষিনির্ভর, তা সত্ত্বেও আধুনিক কলকারখানার যুগে পুরুষের এই কৃষিনির্ভর সামন্ততান্ত্রিক সংস্কার যদি কিছু পরিমাণে শিথিল হয়েও থাকে তবু নারী তার রক্ষণশীল স্বভাবের জন্য এই সংস্কার বহুলাংশেই ত্যাগ করতে পারে নি। এই কারণে পুত্রকন্যার নামকরণে কৃষির প্রসঙ্গ নানাভাবে ঘুরে ফিরে এসেছে। কৃষির সঙ্গে ঋতুচক্র, জলবায়ু, ইতর জীবজন্তু ইত্যাদি নানা নৈসর্গিক উপাদান অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সেজন্য নামকরণে জাতক-জাতিকার জন্মকাল, জন্মবার, জন্মকালীন প্রাকৃতিক পরিস্থিতি, জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ, সন্তানের আকৃতি-প্রকৃতির স্মৃতি রক্ষিত হয়েছে। যেমন, জন্মকাল অনুসারে নাম : দোমাসু [দোমাসী— সংক্রান্তি ; সংক্রান্তিতে জাত], পোহাতু(পুং)-পোহাতী(স্ত্রী) [প্রভাতে জাত], ডুখুরু-আতিয়া [যথাক্রমে দুপুর (>ডুখুর) ও রাত্রে জাত], আন্ধারু-জোনাকু [যথাক্রমে কৃষ্ণ ও শুক্ল পক্ষে জাত], পুনিয়া-অমাশু [যথাক্রমে পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় জাত] ; জন্মবার অনুসারে নাম : রবিবার— দেবারু(পুং)-দেবারী(স্ত্রী), সোমবার— সোমারু(পুং)-সোমারী(স্ত্রী), মঙ্গলবার— মোংলা, মংলু(পুং)-মুংলী(স্ত্রী), বুধবার— বুধারু, বুধু(পুং)-বুধারী(স্ত্রী), বৃহস্পতিবার— বিশাদু, বিশারু(পুং)-বিশাদী(স্ত্রী), শুক্রবার—

শুকুরু(পুং)-শুকুরী (স্ত্রী), শনিবার— শনু(পুং)-শনিয়া(স্ত্রী); জন্মমাস অনুসারে নাম: বৈশাখ— বইশাগু(পুং), জ্যৈষ্ঠ— জেঠিয়া(পুং)-জটিয়া(স্ত্রী), আষাঢ়— আষারু, শ্রাবণ— শাউনা-শামু, ভাদ্র— ভাদরু(পুং)-ভাদো(স্ত্রী), অগ্রহায়ণ— অঘু-অগ্না, পৌষ— পুশু, মাঘ— মাঘু, ফাল্গুন— ফাগু(পুং)-ফাগুনী (স্ত্রী), চৈত্র— চৈতা, চৈতু। জন্মকালীন প্রাকৃতিক পরিস্থিতি অনুযায়ী নাম: ঝড়ু (পুং) [ঝড়ের সময় জন্ম], বানাতু (পুং) [বান বা বন্যার সময় জাত], আকালু (পুং) [আকাল বা দুর্ভিক্ষের সময় জাত], ভুঁইচালু (পুং) [ভুঁইচাল বা ভূমিকম্পের সময় জন্ম]; শিশুর চেহারা-আচরণ ও স্বভাব অনুযায়ী নামকরণ: ঢ্যাপা(পুং)-ঢ্যাপো(স্ত্রী) [হাঁটা-চলার সময় যে ধুপধাপ করে আছাড় খায় ও কাঁদে], ধদা (পুং) [নাদুস নুদুস শরীর-বিশিষ্ট], স্টুটকু (পুং)-স্টুটকী (স্ত্রী) [লিকলিকে রোগা চেহারা], চিমঠু(পুং)-চিমঠি(স্ত্রী) [ঝগড়াটে, হিংসুটে ও খুঁৎখুঁতে], গসাই (পুং) [শান্তশিষ্ট], নিসারু (পুং) [(নি-সাড়া) ডাকলে সাড়া শব্দ দেয় না], পেটপেটিয়া (পুং) [শুধু বিড় বিড় করে বকে], ঘুনপেটারী (পুং) [পেটে পেটে দুষ্টু বুদ্ধি যার], ধ্যারধেরিয়া (পুং) [ছিঁচকাঁদুনে, অতি অল্পেই পেটের গোলমালে ভোগে], বাটু, বাংরু(পুং)-বাংরী(স্ত্রী) [বেঁটে], ঢ্যাঙ্গা(পুং)-ঢ্যাঙ্গো(স্ত্রী) [লম্বা], আদরী, আদুরী (স্ত্রী) [আদর বা সোহাগপ্রিয়], গালো (স্ত্রী) [বয়সে ছোটো হলেও প্রতিকথায় যে মেয়ে জবাব দেয়], কেটমী (স্ত্রী) [স্বভাবে ও চেহারায় আধ-পাগলী ভাব যার], ধরপারু (পুং) [চঞ্চল], কান্দুরা (পুং)-কান্দুরী (স্ত্রী) [রোদনপ্রবণ], ধোউলু, গোরাচান (পুং) [ফর্সা], ইত্যাদি; পশুপাখি-কীটপতঙ্গ-জলচর জীবের নামে নামকরণ: কাউয়া (কাক), খনজোন (খঞ্জনী), পোখি (পাখি), চিলা (চিল, কোচবিহারের এক প্রাচীন রাজপুত্রের ডাকনাম চিলা রায়), ময়না, ব্যাং, চিক্যা (ছুঁচো), সলেয়া (ইঁদুর), চ্যারা (কেঁচো), জোনাকী, ফোরিংগা (ফড়িং), খোলিশা (খলসে মাছ), চেংটিয়া, ছ্যাকা (মাছ), পশুনাথ-পুশু (সিংহ), কাছুয়া (কচ্ছপ), ইত্যাদি। শিশুর আকৃতি-প্রকৃতির কোনো বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইতর প্রাণীর আকার ও আচরণের আংশিক সাদৃশ্য লক্ষ্য করেই খানিকটা কৌতুকমিশ্রিত বাৎসল্যবোধের প্রেরণাতে নামকর্ত্রী ইতর প্রাণীর নামে শিশু সন্তানের নামকরণ করে থাকেন।

বাংলাদেশের মেয়েলি ভাষার আর-একটি বৈশিষ্ট্য কথায়, কথায় প্রবাদ-প্রবচন ও ইডিয়মের প্রচুর ব্যবহার। এগুলি অবশ্য পুরুষের ভাষাতেও আছে, কিন্তু নারীর ভাষাতেই এগুলির বাহুল্য, এবং এই বাহুল্য থেকে মনে হয় অধিকাংশ ইডিয়ম ও প্রবাদের আদি উৎস নারীর রসনা, ক্রমে এগুলির অমোঘতা অনুভব করে পুরুষেরাও অজ্ঞাতসারে এগুলি গ্রহণ করেছেন। তবে আধুনিক শিক্ষার সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে কথায় কথায় প্রবাদ-প্রবচনের এই বহুল ব্যবহার নারীর ভাষাতেও অপ্রচলিত হয়ে আসছে। এর কারণ সম্ভবত: বাগ্‌ব্যবহারে প্রবাদ-প্রবচনগুলি যে প্রয়োজন সিদ্ধ করে সে প্রয়োজন এখন ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছে। ভাষায় প্রবাদের ব্যবহার অনেকটাই আলংকারিক, প্রবাদের প্রয়োগের সঙ্গে প্রতিবস্তূপমা কিংবা দৃষ্টান্ত অলংকারের অনেকটা তুলনা চলতে পারে। তবে কাব্যে ব্যবহৃত অলকংরের সঙ্গে প্রবাদের আলংকারিকতার কিছু সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। কাব্যের অলংকার বাক্যে বা বাক্যের অর্থে কিছু বাড়তি সৌন্দর্য যোজনা করে, কিন্তু প্রবাদ অনেকটা মূল বক্তব্যের পরিপূরক বা অনুপূরক হিসাবে কাজ করে। শব্দভাণ্ডারের সীমাবদ্ধতা, প্রকাশক্ষমতার দৌর্বল্য ইত্যাদি কারণে মেয়েদের বাগ্‌ব্যবহারে যে অপুষ্টি ও অপূর্ণতা থেকে যায়, এইসব পরিপূরক বা অনুপূরক প্রবাদ-প্রবচনের মাধ্যমে মেয়েরা সেই অপূর্ণতা পূরণ

করার চেষ্টা করেন। তাঁদের নিজেদের বাক্য একটি বিশেষোক্তি মাত্র, আর ব্যঞ্জনার দিক থেকে প্রবাদ হচ্ছে সামান্যোক্তি। এই সামান্যোক্তির মধ্যে আশ্রয় তথা সমর্থন লাভ করতে পারলে নিজের বক্তব্যের অভ্রান্ততা সম্পর্কে তাঁরা নিশ্চিন্ত হতে পারেন। আধুনিক কালের শিক্ষাদীক্ষা মেয়েদের প্রকাশক্ষমতাকে নানাভাবে প্রসারিত ও সমৃদ্ধ করেছে, তাই কথায় কথায় তাঁদের আর প্রবাদের আশ্রয় নিতে হয় না। ইডিয়মের ব্যবহার সম্পর্কেও প্রায় সেই একই কথা খাটে। তবে ইডিয়ম প্রবাদের মত মূল বাক্যের অনুপূরক আর-একটি স্বতন্ত্র বাক্য নয়, মূল বাক্যেরই একটি গঠনগত উপাদান। কোথাও সেটি একপদ-বিশিষ্ট বিশেষ্য, কোথাও বহুপদবিশিষ্ট সমানাধিকরণ বিশেষ্য, কোথাও বা একপদ অথবা বহুপদবিশিষ্ট ক্রিয়ামূল। কিন্তু অর্থের দিক থেকে বাক্যের সাধারণ পদের সঙ্গে এর পার্থক্য আছে। ইডিয়মে যেসব বিশেষ্য বা ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয় সেগুলির সার্থকতা বাচ্যার্থে নয়, ব্যঙ্গার্থে। যে শব্দ সচরাচর একটি বিশেষ অর্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেই শব্দ দিয়ে অন্য অর্থ প্রকাশ করলে ভাষার বৈচিত্র্য বাড়ে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভাষার শব্দভাণ্ডারের দীনতাও আভাসিত হয়। মেয়েদের শব্দভাণ্ডার সাধারণভাবেই কম সমৃদ্ধ, তাই শব্দের তির্যক্ ব্যবহার তথা ইডিয়মের উপর মেয়েদেরই ভরসা সবচেয়ে বেশি। উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে আধুনিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ ও সংক্রামক প্রভাব এখনো ভালোমত পড়ে নি, তাই এ অঞ্চলের মেয়েলি ভাষায় প্রবাদ-প্রবচন-ইডিয়মের বহুল ব্যবহার এখনো অক্ষুণ্ণ আছে। পূর্বে উল্লিখিত অনুকার ও দ্বিরুক্ত পদগুলি এ অঞ্চলে প্রায় ইডিয়ম হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। ধাতুর মধ্যে বিশিষ্টার্থক ধাতু হিসাবে এ অঞ্চলে 'খা' (খোয়া <খাওয়া) ধাতুর ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। সংস্কৃত 'কৃ' ধাতুর মতই এর ব্যবহার প্রায় সর্বাত্মক, বিশেষ্য কিংবা ভাববচনের (verbal noun) সহযোগে এই ধাতুটি বিভিন্ন অর্থবোধক ক্রিয়ামূল হিসাবে ব্যবহৃত হয়, যেমন, আগ খোয়া—রাগ করা, হাতাশ বা আটাশ খোয়া—সন্ত্রস্ত হওয়া, ঠ্যালা খোয়া—শাস্তি পাওয়া, যাওয়া খোয়া—যেতে বাধ্য হওয়া (মোর জাওয়া খায়), মনত্ খোয়া—মনে লাগা, কইন্যা বেচি খোয়া—মেয়ের বিয়ে দেওয়া, দিন বা কাল বাচক শব্দের সঙ্গে 'খোয়া' কোথাও কালের ব্যাপ্তি অর্থে, কোথাও কালের অতিবাহন অর্থে ব্যবহৃত হয় (এই কাম একমাস খাবে—এই কাজে একমাস লাগবে, আর কিছুদিন খাক—আর কিছুদিন যাক), পছন (পছন্দ) খোয়া—কারো পছন্দের আস্পদ হওয়া (মুই কার পছন খাম—কে আমাকে পছন্দ করবে ?), ইত্যাদি। অন্যান্য বিশিষ্টার্থক ক্রিয়াবাক্যাংশ : ভাতার ধরা (পতিত্বে বরণ করা), [কোনো পুরুষের] ভাত খোয়া (স্বামী রূপে স্বীকার করা), (ভাত) পারোস (<পরি-বিশ্) করা—ভাত বেড়ে দেওয়া, টিকা ঘচলানা বা গোয়া ঘসা (বৃথা সময় কাটানো), নাক ডেনডেরা দেওয়া (ভর্ৎসনা করা, অপমান করা), কানের পোকা ঝাড়া (সমুচিত দণ্ডবিধান করা), বান্নি দিয়া মুক ঝুরা (ঝেঁটিয়ে বিষ ঝাড়া), বুকত চড়ি জল্লেশ দেখা (জল্লেশ বা জল্লেশ্বর জলপাইগুড়ি জেলার একটি প্রাচীন শৈব পীঠস্থান, কিন্তু শব্দটির বিচ্ছিন্ন বাচ্যার্থ এখানে অভিপ্রেত নয়, উদ্দিষ্ট সামগ্রিক অর্থ—উচিত শিক্ষা দেওয়া), কাজিয়া করা (ঝগড়া করা), ক্যাচাল করা (গোলমাল করা), আংশাং করা (আপত্তি-জনিত দ্বিধা প্রকাশ করা), হাত ধরা পাঁও ধরা (খাতির করা), দিন গাওয়ানো (দিন কাটানো), ধারত্ ঠ্যাকা (ঋণগ্রস্ত হওয়া), ভাল্ পাওয়া (ভালো বাসা, অক সগ্গায় ভাল্ পায়—ওকে সকলে ভালো বাসে বা পছন্দ করে), বারা বানা (ধান কোটা), ধান সিজানো (ধান সিদ্ধ করা), ধান বা পাট মারা (উক্ত ফসল কাটা), চুরকি মারা (উঁকি মেরে দেখা), কইন্যা ব্যাচা (মেয়ের

বিয়ে দেওয়া, কন্যাপক্ষে), কইন্যা জুরা (কনের বিয়ে দেওয়া, বর পক্ষে), ইত্যাদি। এ ছাড়া আরও কতকগুলি শব্দ বা বাক্যাংশ আছে যেগুলির প্রয়োগ অনেকটা ইডিয়মতুল্য, অর্থাৎ যেগুলির প্রকৃতিগত কোনো অর্থ নেই, শুধু প্রথানুসারে অর্থবদ্ধ, অথবা প্রকৃতিগত অর্থ থাকলেও ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত, কিংবা অনেক অর্থের মধ্যে একটি বিশেষ অর্থে সীমাবদ্ধ, যেমন, নাং (উপপতি), সাঙ্গানী, ঢেমনী (উপপত্নী), ভাউসা (চরিত্রহীন), ধাগিরি, নাংগাহী (চরিত্রহীনা, অসতী), মর্দাহী (পুরুষের মত স্বভাববিশিষ্ট স্ত্রীলোক), মইল্যা (মৃতবৎসা নারী), আটকুরা-আটকুরী (নিঃসন্তান পুং ও স্ত্রী), বাঁজি (বন্ধ্যা), টুলস্থংপারা, সরগোচালী, বাহোমারী (পাড়াবেড়ানী, 'কুন্ঠে গেইল্ সে বাহোমারী তোর ছোয়া কান্দেসে), ঢক (রকম-সকম), হাউস (ইচ্ছা বা আশা), হাতাশ, আটাশ (ত্রাস), মুককাটু (মুখরা), দিনকাটু (অলস), মুটুরি (কাজকর্মে ঢিলে প্রকৃতির), হাউরিয়া (লোভী), বাউদিয়া (যাবাবর, ছন্নছাড়া), কাইদারি, কাইজুরি, নিয়াইচুঙ্গি (কলহপ্রবণ), বইলতাহী (গালাগালির শব্দ, যে সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য প্রতিপন্ন করে), চুলচুলি (যার পেটে কথা থাকে না), ভুলটুঙ্গী (অসতর্ক স্ত্রীলোক), কোট্কা, কোট্কী (কৃপণ, পুং ও স্ত্রী) হুল্কা-হুল্কী (অমিতব্যয়ী পুং ও স্ত্রী), কুটুনী-কুট্নী (<কুট্টনী, এর কথা তাকে লাগায় যে স্ত্রীলোক), ছিদ্দোর, আছিদ্দোর (<ছিদ্বর, ধূর্তলোক), ঘরভুন্দরা (ঘরকুনো), মুকভুন্দরা (মুখচোরা), কেলাইদাতী, কোদালকাটী (ঝগড়াটে স্ত্রীলোক), ভাতারছারী-ভাতারধরী (মূলতঃ গালাগালির শব্দ; যে মেয়ে পুনঃপুনঃ স্বামী পরিবর্তন করে), নিরিখিনী (কনে দেখা) আন্ধন (পাকস্পর্শ), ঢাকন ভাত (বৌ-ভাত), আওকারী, কুততুরী (বিবাহযোগ্যা মেয়ে), আওপারী (বাগ্‌দত্তা; রাব>আও=শব্দ, কথা; কথা পাড়া হয়েছে যে মেয়ের জন্য), নোদারী (নববধূ), বৈরাতী (বিবাহ-অনুষ্ঠানের এয়োস্ত্রী); আরহাতী (হলুদকোটায় আমন্ত্রিত স্ত্রীলোক), ভাকুরের ছুয়া (আদরের দুলাল), বুক্কের পাটা (বুকের পাটা), চুনের খুঁটি (খুঁটি=পাত্র, প্রকৃত অর্থ 'বইলতাহী'র অনুরূপ), ত্যালের তাড়ি (তাড়ি=মাটির ভাঁড়, প্রকৃত অর্থ নষ্ট স্ত্রীলোক), হোকোশের ডালি (=শকুনের বাসা, মাথার চুলের দুর্গতি বোঝাতে, তুলনীয় 'বাবুয়ের বাসা'), খোকরা ভাত (বাসি ভাত), ছাচি ত্যাল; মিঠা ত্যাল (সরষের তেল), নরম ভাতার (গোবেচারা স্বামী), দীঘল বা ঘন পাও (মন্থর গতি), বকন্দা ছোয়া (মোটা ছেলে), বিয়াদারী বেটী, গাবুর বেটী (বিবাহযোগ্যা মেয়ে), বিয়াস্তী মাইয়া, বিহাতী বেটী (বিবাহিতা মেয়ে), ইত্যাদি।

প্রবাদবাক্যগুলির শব্দগত বিশ্লেষণ করে লাভ নেই, কেননা এগুলির আবেদন গোটা বাক্যসংস্থান নিয়ে। বাক্যের অন্তর্গত বিভিন্ন পদের স্বতন্ত্র বাচ্যার্থ অবশ্য আছে, কিন্তু সেই বাচ্যার্থ এখানে অভিপ্রেত নয়, সমস্ত পদের পারস্পরিক অন্বয় মিলিয়ে গোটা বাক্য থেকে যে সামগ্রিক অর্থপরিণাম দেখা দেয় সেইটিই প্রবাদের উপজীব্য। প্রবাদ যেহেতু অনেকাংশেই লৌকিক অভিজ্ঞতার সারাৎসার সেজন্য আকারে প্রবাদ খুব একটা বড় হয় না। যে-প্রবাদ যত সংক্ষিপ্ত সে প্রবাদ তত লোকপ্রিয়। যে সব প্রবাদ একাধিক বাক্য বা খণ্ডবাক্যের সমবায়ে গঠিত হয় সেগুলি স্মৃতির সুবিধার্থে সাধারণতঃ ছন্দে গাঁথা থাকে। এই ছন্দ অবশ্যই গ্রাম্য লৌকিক ছন্দ, পর্বের ত্রুটিহীন মাত্রাসাম্যের চেয়ে চরণের অন্ত্যানুপ্রাসের দিকেই তার ঝোঁক বেশি। প্রবাদ আকারে খুব বড় হতে পারে না বলে তাকে নানা দিক থেকে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে হয়, এই প্রত্যক্ষতা আসে প্রধানতঃ শব্দ ব্যবহারের দিক থেকে। এই

কারণে প্রবাদের বিশেষণগুলি খুব ঝাঁঝালো কিংবা জোরালো হয়, ক্রিয়াপদে নামধাতু ও ধ্বন্যাত্মক ধাতুর লক্ষণীয় প্রাধান্য দেখা যায় এবং ক্রিয়াবিশেষণগুলি অনেক ক্ষেত্রে ধ্বন্যাত্মক ও অনুকারধর্মী হয়ে থাকে। এই প্রত্যক্ষতার দাবীতেই প্রবাদের বাচ্যার্থ অনেক সময়েই কিছুটা স্থূল বা অশালীন হয়ে থাকে। উত্তরবঙ্গের নারীর ভাষার একটা বড় পরিচয় নিহিত আছে এ অঞ্চলের মেয়েলি প্রবাদ-বাক্যগুলিতে। বিশ্লেষণের বিশেষ প্রয়োজন নেই, চলিত বাংলায় প্রবাদগুলির রূপান্তর করে দিলে 'সহৃদয়' পাঠক সহজেই এঁদের রসবোধ, কৌতুকপ্রবণতা, পরিহাসপটুতা, সামাজিক নিরীক্ষণভঙ্গি এবং সর্বোপরি এঁদের বাচনভঙ্গির একটা সংহত পরিচয় পাবেন। প্রথমে কিছু সংক্ষিপ্ত প্রবাদবাক্য :

১ হদ্যাক বহু ঘড়া—দিদ্দিরায় বাহিরে।
হদ্যাক (হ+ত্থাখ্)=ঐ ত্থাখ, ঘড়া—ঘোড়া, দিদ্দিরায়—ঘোড়ার মত মাটিতে শব্দ তুলে চলছে।
যে সব বৌয়ের ঘরের কাজে মন বসে না, সুযোগ পেলেই ঘরের বাইরে এসে ছুটে দাঁড়াতে চায় তাদের লক্ষ্য করে বাড়ির শাশুড়ী, ননদ বা বর্ষীয়সী মহিলারা এটি প্রয়োগ করেন।

২ লাটাই গুণে ফেটি, মাও গুণে বেটী।
লাটাই=চরকা বা তকলি, ফেটি=সুতোর গাছি।
চরকার গুণে সুতো ভালো হয়, আর মায়ের গুণে মেয়ে ভালো হয়।

৩ হাড়িক না দেখাই বাড়ি, গুণ্ডীক না দেখাই থাঁড়ি।
হাড়ি=হাড়ি সম্প্রদায় (এখানে বিত্তহীন ব্যক্তি), গুণ্ডী—ধীবর, থাঁড়ি=নদীর মৎস্যবহুল নালা।
না দেখাই—দেখাতে নেই (দেখাই<দেখাইএ, মূলতঃ কর্মবাচ্যে প্রযুক্ত, তবে এখানে কর্তৃবাচ্যের সঙ্গে একীভূত)।
বিত্তহীনকে বিত্তবানের বাড়ি দেখাতে নেই, ধীবরকে দেখাতে নেই মৎস্যবহুল জলাশয়।

৪ গোয়া না হয় যদ্দুর ঠ্যাং ম্যালে তদ্দুর।
অক্ষম ব্যক্তির সাধ্যাতীত কিছু করার চেষ্টা।

৫ সুকটি না ছাড়ে গং (গন্), হলদী না ছাড়ে অং।
শুটকী মাছের গন্ধ যায় না, হলুদের রং ছাড়ে না।

৬ ভাং ভাজিবার খোলা নাই আখা ছয় বুড়ি
ভাং—ভাং পাতা (মাদক দ্রব্য), খোলা—মাটির পাত্র, আখা—উনুন, বুড়ি—সংখ্যাবিশেষ।

৭ ঘরে নাই ভিজা ভাং কাড়া বাজায় ঠাং ঠাং
কাড়া—কড়া
৬-৭ সংখ্যক প্রবাদের অর্থ অন্তঃসারশূন্য বাহ্যাড়ম্বর।

৮ ওদোলের বোদোল, শুকটা দিলে শিদোল
যেমন কর্ম তেমন তেমন ফল

৯ কিরপিনের দুনা ব্যয় পন্থা ভাতত নবনের খয়
পন্থা ভাত—পানতা ভাত
কৃপণের দ্বিগুণের ব্যয়, ভাতের খরচ বাঁচাতে গিয়ে পানতা ভাতে লবণের ব্যয় বাড়ে।

১০ কিষৎ কি কাম করিল্ জোঁয়াই-ভাতারী হইল্
জোঁয়াই-ভাতারী—যে স্ত্রীলোক জামাইকে স্বামী করেছে।
চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতার ক্ষেত্রে তিরস্কার হিসাবে ব্যবহৃত।

১১ গাঁও নষ্ট করে কানা পখোর নষ্ট করে পানা
কানা—অন্ধ, পখোর—পুকুর, পানা—কচুরিপানা, শেওলা
গাঁয়ে কানা থাকলে গাঁয়ের বদনাম, পুকুরে পানা থাকলে পুকুরের ক্ষতি।

১২ ভাগ্যে বাড়ী, ভাগ্যে দাড়ী, ভাগ্যে মিলে নারী
সদ্‌বংশে সবারই জন্ম হয় না, সব পুরুষেরই দাড়ী হয় না, এবং সতী সাধ্বী স্ত্রীলাভ—তাও ভাগ্যের ব্যাপার।

১৩ ইয়্যার ঠেস্‌সা উয়্যার ঠেস্‌সি, তাতকে যাছে কামের কিস্‌সি
তুলনীয়: ভাগের মা গঙ্গা পায় না।

১৪ কালই মোদ্দে মুসুরী সাগাই মোদ্দে শাশুরী
ডালের মধ্যে মসুরী ও আত্মীয়ের মধ্যে শাশুড়ীই শ্রেষ্ঠ।

১৫ ঘড়া চিনা যায় ময়দানত্, কুটুম চিনা যায় নিদানত
ঘড়া—ঘোড়া, নিদানত্—দুঃসময়ে।

১৬ হাল নাই তে বাহে বড়, মাউক নাই তে মারে বড়
হাল না থাকলে হালের বড়াই, বউ না থাকলে পত্নীশাসনের বড়াই।

অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ প্রবাদ:

১৭ অকৎ সকৎ ঘকৎ।
এই তিনটা দিবা পারিলে মাগি থাকে ঠিকৎ॥
অকৎ—খাওয়া, সকৎ—শখের জিনিস, ঘকৎ—প্রেম ভালবাসা, মাগি—বউ, ঠিকৎ—ঠিক, তুষ্ট।

১৮ বেছুয়ার ভাতার মরদ, মরদের ভাতার কড়ি।
কুঠি যাবে তমার দড়ি আর বিড়ি॥
বেছুয়া—নারী, কড়ি—টাকাপয়সা, কুঠি—কোথায়, দড়ি আর বিড়ি—(ইডিয়ম) সাংসারিক সংস্থান।
নারীর ভরসা পুরুষ, পুরুষের ভরসা টাকাপয়সা, টাকাপয়সা থাকলে সংসারে টানাটানি থাকে না।

১৯ মাউগের অধীন, ছোয়ার নেতর।
তায় নি বসিবা পারে সভার ভিতর॥
নেতর (স্নেহ>নেহ+তর)—ছেলে মেয়েকে যে প্রশ্রয় দেয়। নি বসিবা পারে—বসতে পারে না।
স্ত্রীর কথায় যার ওঠাবসা এবং ছেলেমেয়েকে যে প্রশ্রয় দেয় দশজনের সভায় সে অপাঙ্‌ক্তেয়।

২০ পরের ধানে বঝাই হয় না নিজের গলা।
আর পরের ছুয়ায় বঝাই হয় না নিজের কলা॥
বঝাই—বোঝাই, গলা—(ধানের) গোলা, ছুয়ায়—ছেলে দিয়ে, কলা—কোল।

২১ আটে দশে লাঙ্গলত্ খিল।
দুহে চাইরহে মাউগক্ কিল ॥
খিল—লাঙ্গলে ব্যবহৃত বাঁশের পেরেক। দুইহে চাইরহে—দুই চার দিন পর পর।
আট দশ দিন পর পর লাঙ্গলে খিল দিতে হয়, আর দু চার দিন পর পরই বউকে শাসন করতে হয়।

২২ এগিনা নষ্ট করে ছিমছাম পানি।
ঘর নষ্ট করে কান-ভানজানি ॥
এগিনা—আঙ্গিনা, ছিমছাম—গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি, ঘর—সংসার, কানভান্‌জানি—কানভাঙ্গানি।

২৩ অকম্মা ভাতার সেজার দোসর।
সেজাত্ করে খোসর খোসর ॥
অকম্মা—অকর্মণ্য, অলস; সেজার দোসর—শয্যার সঙ্গী, শয়নপ্রিয়; খোসর খোসর করে—এপাশ ওপাশ করে।
স্বামীর অকর্মণ্যতা সম্পর্কে ক্ষুব্ধ স্ত্রীর উক্তি।

২৪ চোপোর দিন গেল্ অ্যালোরে ম্যালোরে জোনাকে শুকাছে ধান।
আন্‌গে বেটী ছাম গাইন লা তোর বাপে কুটুক ধান ॥
চোপোর—চৌপহর অর্থাৎ সমস্ত দিনমান, অ্যালোরে ম্যালোরে—(ক্রিয়া বিশেষণ) বৃথা, জোনাকে—জ্যোৎস্নায়, ছাম গাইন—ধান কুটবার উদখল।
তুলনীয়
'দিন গেল আলে ডালে, ধান শুকাবে জোনার আলে' [প্রবাদ-সংগ্রহ ৪১১৩, বাংলা প্রবাদ—ডঃ সুশীলকুমার দে]

২৫ খরতর নারী ঝর ঝর ঝারি
চোর নফর পর পর ঘর।
তাক্ হাতি দূরত সর ॥
খরতর—মুখরা, ঝর ঝর ঝারি—ছিদ্রবহুল জলপাত্র, পর পর—পড়ো পড়ো, তাক্ হাতি—তার থেকে।

২৬ দেখিলার বান্দিক আনি আদেখিলার গীত্‌তানিকও না আনি।
দই কিনি তার মাঝোত খাল, কইনা আনি যার মাওটা ভাল্ ॥
দেখিলা—দেখা, জানাশোনা, আদেখিলা—অপরিচিত, গীত্‌তানিক—কুলবধূকে, কইনা—কনে, মাও—মা।
জানাশোনা ঘর থেকে দাসীও আনা যায়, কিন্তু অজানা পরিবারের মেয়েকে ঘরে ঠাঁই দেওয়া যায় না।
দই কিনতে তার মাঝখানটা দেখতে হয়, আর কনে আনতে দেখতে হয় তার মায়ের স্বভাব কেমন।

২৭ আশমানের হচে গতিক খারাপ
দুহে চারে হচে দুন।
সংসারের গতিক দেখিলে
মাথাত্ ধরে ধুন ॥

আশমান=আকাশ, হচে=হচ্ছে, গতিক=অবস্থা, দুয়ে-চারে=দুচার দিন পর পর, তুন=ঝড়, মাথাত্=মাথায়, ধরে ধুন=মাথা ঘুরে যায়।

সাংসারিক ও প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা লক্ষ্য করে কৃষকপত্নীর খেদোক্তি। মর্মার্থ: বিপদ কখনো একলা আসে না।

২৮ বিশ বচ্ছরে গুণবিদ্যা চল্লিশে হচে ধন।
পঞ্চাশ-ষাইট বচ্ছর হইলে
আগুরিবা হবে বাড়ির কন।

গুণবিদ্যা=আভিচারিক বিদ্যা, এখানে যাবতীয় বিদ্যা, আগুরিবা=আগলাতে, কন=কোণ।

বিশ বছর বয়স পর্যন্ত বিদ্যা অর্জন করতে হয়, চল্লিশ বছর পর্যন্ত অর্থ, এর পর পঞ্চাশ-ষাটের কোঠায় পৌঁছলে মানুষের স্বাধীনতা থাকে না, সব ব্যাপারেই পরনির্ভর হয়ে ঘরের এক কোণে পড়ে থাকতে হয়।

২৯ সৎমাওর কি কোহি গুণ।
কানচায় খুলির বথুয়া শাক
তাত্ না দেয় নুন॥

কান্চায় খুলির বথুয়া শাক=জঞ্জালের মধ্যে অযত্নে জাত বেথুয়ার শাক।

সৎমার গুণ আর কি বলব। আঁস্তাকুড়ে যে শাক গজায় তাই সিদ্ধ করে খেতে দেয়, তাতেও আবার নুন দেয় না।

বিমাতার হৃদয়হীনতা প্রসঙ্গে একটি সামান্যোক্তি।

৩০ মাউক বড় সনা রে ভাই, মাউক বড় সনা।
মাউগক কিছু না দিবা পারিলে
মাউক হই যাবে বেনা॥
মাউক বড় ধন রে ভাই, মাউক বড় ধন।
মাউগের কথা না ধরিলে আউলাই যাবে মন॥

মাউক=স্ত্রী, সনা=সোনা, না দিবা পারিলে=দিতে না পারলে, হই যাবে বেনা=বীণা হয়ে যাবে, অর্থাৎ বীণার মত সব সময় ঘ্যান ঘ্যান করবে, আউলাই যাবে মন=মন ভেঙে যাবে, বেজার হবে।

স্ত্রৈণ ব্যক্তির প্রতি মেয়েদের বক্রোক্তি।

এই সব প্রবাদ-প্রবচন ছাড়াও বিভিন্ন ধাঁধা, ছড়া ও গানে উত্তরবঙ্গের মেয়েদের রসনার রস তথা বাক্-সৌন্দর্য সঞ্চিত আছে। এই বিচিত্র বাক্‌সিদ্ধি মেয়েদেরই প্রায় একচেটিয়া, কোথাও কোথাও তা অবশ্য পুরুষের উক্তিতে সংক্রামিত হয়েছে। উত্তরবঙ্গের নারীর ভাষার এই রসগত সৌন্দর্য বিশদ বিশ্লেষণ ও পৃথক্ মনোযোগের অপেক্ষা রাখে।

মেঘনাদবধ-কাব্যে ব্যঞ্জনা

জগন্নাথ চক্রবর্তী

মেঘনাদবধ কাব্যের একটি 'রহস্য' এখনো সন্ধান করা হয় নি। এই রহস্যের কথা মাইকেল মধুসূদন নিজেই তাঁর বন্ধুকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন: I had no idea, my dear fellow, that our mother-tongue would place at my disposal such exhaustless materials, and you know I am not a good scholar. The thoughts and *images* bring out words with themselves— words that I never thought I knew. Here is a ***mystery*** for you— 'ভাব ও চিত্রকল্পের সঙ্গে কথা আপনিই জুগিয়ে যায়, এমন সব কথা যা আমি পূর্বে কখনোই জানতাম বলে ভাবি নি।' মধুসূদন আরো লিখেছিলেন: you must weigh every thought, every image, every expression, every line— 'প্রত্যেকটি ভাব, প্রত্যেকটি চিত্রকল্প, প্রত্যেক উক্তি ও পংক্তি অবশ্যই ওজন করে দেখো।' দেখা যাচ্ছে মধুসূদন বারবার তাঁর কাব্যের চিত্রকল্পগুলির কথা উল্লেখ করছেন, চিত্রকল্পের রহস্য সম্বন্ধে তিনি সচেতন এবং ভাবী পাঠক ও সমালোচকদের জন্য এ বিষয়ে নির্দেশও রেখে গেছেন। কিন্তু এক শতাব্দী অতিক্রান্ত হল, মাইকেলের চিত্রকল্পগুলির বিস্তারিত রসবিচার এখনো বাকি। কাব্যে বা নাটকে ব্যবহৃত চিত্রকল্পগুলি যে রহস্যের খনি, এ কথা শেকসপিঅরের চিত্রকল্প বিচার করতে গিয়ে শ্রীমতী ক্যারলাইন স্পারজনও স্বীকার করেছেন: They are studied, either as a whole, or in groups, with a perfectly open mind, to see what information they yield, and the result comes often as a complete *surprise* to the investigator। চিত্রকল্প অনুসন্ধান করতে গিয়ে অনুসন্ধানকারী এমন সব নতুন জিনিস পেয়ে যান যে তিনি বিস্ময়বোধ না করে পারেন না। মধুসূদন যাকে 'রহস্য' বলেছেন স্পারজন তাকেই 'বিস্ময়' বলছেন। শেকসপিঅরের চিত্রকল্প প্রসঙ্গে স্পারজন মন্তব্য করেছেন: My excuse is that up to the present no one has attempted seriously or systematically to assemble or examine it at all। চিত্রকল্পগুলি খুঁটিয়ে দেখার কাজে এ পর্যন্ত কেউই গুরুত্ব দিয়ে এবং সুপরিকল্পিত-ভাবে অগ্রসর হন নি, এ কথা আমরা মাইকেলের মহাকাব্য প্রসঙ্গেও বলতে পারি। বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণাও সেই কারণেই।

চিত্রকল্প বা ইমেজারির শলাকা দিয়ে স্পারজন কবির ব্যক্তিত্বটি উন্মীলিত করতে চেষ্টা করেছেন। কাব্যের মধ্যে কবির প্রকাশ লক্ষ্য করতে হলে চিত্রকল্পই তার উপযুক্ত চক্ষু বা 'ভিউ-ফাইণ্ডার': It enables us to get nearer to Shakespeare himself, to his mind, his tastes, his experiences, and his deeper thought than does any other single way I know of studying him। রচনার মধ্যে রচয়িতার ব্যক্তিত্ব সন্ধান কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারও করেছেন। তিনি বলছেন: "মধুসূদন যে-জাতীয় কাব্য রচনা করিয়াছেন তাহাতে কবির আত্ম-জীবন বা কবি-মানস কোনোটাই প্রতিফলিত হইবার কথা নয়। কিন্তু এই কাব্যেও কবি আপনাকে নানা ছন্দে প্রকাশ করিয়া

ফেলিয়াছেন; তাই আমি তাঁহার কাব্যেও যেমন, তেমনই তাঁহার কবি-হৃদয়ের আকৃতি ও উৎকণ্ঠা তাঁহার সাহিত্যিক আদর্শের অভিমান ও আত্ম-প্রত্যয়, প্রাচীনের বিরুদ্ধে ভ্রূক্ষেপহীন মনোভাব, এবং সর্বোপরি তাঁহার ব্যক্তিগত বাসনা-কামনা, অনুরাগ-বিরাগের— এক কথায়, সেই চরিত্রের— যে একটি সুস্পষ্ট আভাস আছে, তাহাও আমার এই আলোচনার অঙ্গীভূত করিয়াছি।" কবিমানস ও কবির ব্যক্তিত্ব অনুধাবন করা স্পারজন ও মোহিতলাল উভয়েরই উদ্দেশ্য। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, মোহিতলাল স্পারজনের মতো রূপকল্প বিচারের পদ্ধতি একেবারেই গ্রহণ করেন নি, করলে তাঁর উদ্দেশ্য যে আরো বেশি সাধিত হত এতে সন্দেহ নেই। দেখা যাচ্ছে মাইকেলের চিঠিতে উল্লিখিত চিত্রকল্প বিশ্লেষণের ইঙ্গিতটি মোহিতলাল ধরতেই পারেন নি।

অবশ্য স্পারজন বা মোহিতলালের মতো কাব্যের মধ্যে কবিকে অনুসন্ধান করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। স্পারজন-অনুসৃত চিত্রকল্প বিচার অতএব এখানে গ্রহণ করা হয় নি। মধুসূদনের ইমেজ বা চিত্রকল্পগুলি আলাদা আলাদা ভাবে বিচার করা হয়েছে, কিন্তু কাব্যপ্রসঙ্গ বাদ দিয়ে কাহিনী বা চরিত্র থেকে একেবারে অসংলগ্ন, আলাদা, স্বয়ংসম্পূর্ণ হিসাবে তাদের গণ্য করা হয় নি। উপমা, চিত্রকল্প, গূঢ়োপমা এগুলির পূর্ণ তাৎপর্য বুঝতে হলে প্রসঙ্গের সঙ্গে মিলিয়েই বিশ্লেষণ করতে হবে। শেকসপিঅরের নাটকে দেখি কোনো চিত্রকল্প একটি দৃশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দৃশ্যগুলির সঙ্গেও তার সুন্দর শিল্পগত সংযোগ রয়েছে। এই সব অদৃশ্য সংযোগ, সম্পর্ক এবং সূক্ষ্ম ইঙ্গিত কীভাবে পরিস্ফুট করা যায়, কাব্যরস সৃষ্টিতে এদের ভূমিকা কী, বর্তমান প্রবন্ধে আমরা তা দেখাতে চেষ্টা করছি।

সীমিত পরিসরের কথা মনে রেখে, মেঘনাদবধ কাব্যের তৃতীয় সর্গের মধ্যেই আপাতত আমাদের চিত্রকল্পবিচার নিবদ্ধ থাকবে। কিন্তু মহাকাব্যের সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিত আমরা সর্বদাই স্মরণ করব।

দ্বিতীয় সর্গের সমাপ্তিতে রণক্ষেত্রের এক সংক্ষিপ্ত বাতাবরণ সৃষ্টি করে মধুসূদন মহাকাব্যের স্বার্থে বীররসকে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন। কারণ বীররস শুধু বীরত্বব্যঞ্জক নয়, মহত্ত্বব্যঞ্জকও। বীররসের জন্যই বীররস নয়, মহত্ত্বের ব্যঞ্জনা সৃষ্টির জন্যই এর প্রয়োজন। মেঘনাদবধ বীররসের কাব্য, 'সম্মুখ সমর'এর প্রধান পটভূমি এবং জয়পরাজয়ের মধ্যে মৃত্যুবরণ এর প্রধান ঘটনা। মহাকাব্যের আদিতেই কবি বলেছেন, 'গাইব মা, বীররসে ভাসি,/মহাগীত।' এই মহাগীত নূতন করে গাইবার অধিকার অর্বাচীন মহাকবির নিশ্চয়ই আছে। মহাভারতের আদিপর্বে বলা হয়েছে:

আচখ্যুঃ কবয়ঃ কেচিৎ সম্প্রত্যাচক্ষতে পরে।
আখ্যাস্যন্তি তথৈবান্যে ইতিহাসমিমং ভুবি॥

অর্থাৎ, 'এই ইতিহাস পৃথিবীতে কয়েকজন কবি পূর্বে বলে গেছেন, সম্প্রতি অপর কবিরা বলছেন, তেমনি ভবিষ্যতেও আরো অন্য কবিরা এই ইতিহাস বলবেন।' বলা বাহুল্য, মহাকাব্যের কাহিনী যুগে যুগে নতুন করে পরিবেশিত হয়েছে এবং হবে। শুধু মহাভারত নয়, রামায়ণ এবং অন্য আদি-মহাকাব্যগুলি সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য। বাল্মীকির পর কৃত্তিবাস, তুলসীদাস ও অন্যান্য কবি প্রত্যেকে নিজের মতো করে এই রাম-রাবণের কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় সর্গের শেষে মিলনসুখী দম্পতিরা বীরমদে মত্ত পিশাচ ও রাক্ষসদলের হাতে সর্গের শেষ ভার অর্পণ করে বিদায় নিয়েছিলেন। তৃতীয় সর্গে কবি রতিবিলাসিনীদের পুনরায় ডেকে না এনে এমন এক জ্বলন্ত

নারীচরিত্র রচনা করবেন যার মধ্যে মহাকাব্যের বীররস ক্ষুণ্ণ না হয়ে বরং আরো সমৃদ্ধ হবে। কিন্তু সর্গের প্রথমে কবি বীররসের বিপরীত প্রমোদ-উদ্যানের বিরহকাতর আবহাওয়া সৃষ্টি করে কেন্দ্রবিন্দুটি আরো পরিস্ফুট করতে চান। প্রমীলার করুণ বিরহচিত্রটি তিনি ক্রমে রূপান্তরিত করবেন অসামান্য বীরত্ব ও ব্যক্তিত্বের রূপচিত্রে। প্রমীলা চরিত্রের মধ্যে যেন বিপরীত দুই মেরু সমন্বিত— একটি বিরহিণী, অপরটি বীরাঙ্গনা; একটির মধ্যে সীতার ছায়া, অপরটিতে চিত্রাঙ্গদার। সীতার ছায়া বলতে আমরা বুঝি পতিবিরহিণী বন্দিনী সীতার বিষণ্ণ শোকমূর্তির ছায়া যা সমগ্র মেঘনাদবধ কাব্যের শরীরে সম্বাদী সুরের মতো লগ্ন। সর্গের প্রথমেই প্রমীলা ক্রন্দসী :

প্রমোদ উদ্যানে কাঁদে দানব-নন্দিনী
প্রমীলা, পতিবিরহে কাতরা যুবতী।

এখানে 'প্রমোদ উদ্যান'এর পরিবর্তে 'অশোক কানন' এবং 'দানব-নন্দিনী প্রমীলা'র পরিবর্তে 'জনক-নন্দিনী জানকী' হলেও ক্ষতি ছিল না। প্রকৃতপক্ষে চতুর্থ সর্গে সীতার বর্ণনা প্রায় প্রমীলারই পুনরাবৃত্তি :

একাকিনী শোকাকুলা, অশোক-কাননে,
কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা আঁধার কুটীরে
নীরবে!

কিন্তু প্রমোদ উদ্যানের সঙ্গে 'কান্না' কিছুতেই খাপ খায় না। কান্না এখানে একেবারেই অপ্রত্যাশিত, অস্বাভাবিক। মনে হয় 'প্রমোদ' কথাটিকে নস্যাৎ করে দিয়ে এই ক্রন্দসী-চিত্রকল্প। প্রমীলা বিরহকাতরা :

কভু বা মন্দিরে পশি, বাহিরায় পুনঃ
বিরহিণী, শূন্য নীড়ে কপোতী যেমতি
বিবশা!

রামায়ণের ক্রৌঞ্চ-বিরহিণী ক্রৌঞ্চী এবং রাম-বিরহিণী সীতা এই কপোত-বিরহিণী কপোতীর চিত্রকল্পে ফুটে উঠেছে। তাই এই কপোতী শুধু মেঘনাদ-বিরহিণী প্রমীলা নন, তার আড়ালে পতিবিরহিণী সীতাও। চতুর্থ সর্গে সীতা নিজেই নিজেকে কপোতীর সঙ্গে তুলনা করেছেন :

ছিনু মোরা, সুলোচনে, গোদাবরী-তীরে,
কপোত কপোতী যথা উচ্চবৃক্ষচূড়ে
বাঁধি নীড়, থাকে সুখে।

মহাকাব্যের কবি এইভাবে একই চিত্রকল্প চরিত্র থেকে চরিত্রান্তরে নিয়ে গিয়ে রসের ব্যাপকতা ঘটান। শোক তখন আর একটি মাত্র ব্যক্তিতে আবদ্ধ থাকে না, সমব্যথীরা সকলেই এক সঙ্গে একই কান্না কাঁদতে থাকেন, এবং কান্নাভেজা একজোড়া চোখ বিশ্বতশ্চক্ষু হয়ে ওঠে। রসের এই ব্যাপকতা মহাকাব্যের মহত্ত্ব ফুটিয়ে তোলে।

মধুসূদন শুধু এতেই ক্ষান্ত থাকেন নি। তিনি আধুনিক মহাকবি, এবং নাটকীয় বোধ তাঁর প্রখর। ট্রাজেডিতে যে নাটকীয় 'আয়রনি' দেখা যায় তা মধুসূদন মহাকাব্যেও প্রয়োগ করেছেন; এবং এ জন্য

তাঁকে চিত্রকল্পের সাহায্যই নিতে হয়েছে। বিরহিণীর সাময়িক বিষাদের মধ্যেই অলক্ষিতে মৃত্যু ও বৈধব্যের শোক বেজে উঠেছে :

এক দৃষ্টে চাহে বামা দূর লঙ্কা পানে,
অবিরল চক্ষুজল পুঁছিয়া আঁচলে !—
নীরব বাঁশরী, বীণা, মুরজ মন্দিরা,
গীত-ধ্বনি। চারি দিকে সখী-দল যত,
বিরস-বদন, মরি, সুন্দরীর শোকে !

এখানে শোকের কারণ যাই হোক, এর চিত্রকল্পটি একেবারে মৃত্যুশোকের। একেই বলা হয় 'নাটকীয় আয়রনি'; কারণ প্রমীলা অচিরেই স্বামীকে হারাবেন এবং তখন তাঁর যে দশা হবে এখানে যেন নিজের অজ্ঞাতে আগে থাকতেই তার পূর্বাভাস দিয়ে ফেলেছেন। বীরবাহুর মৃত্যুর পর শোকের যে-নীরবতা লঙ্কাপুরীকে গ্রাস করেছিল, এখানেও সেই একই নীরবতা। এমন-কি উভয় ক্ষেত্রে নৈঃশব্দ্যের ধ্বনিও প্রায় এক। প্রথম সর্গে ছিল, 'নীরব রবাব বীণা, মুরজ মুরলী', এখানে 'নীরব বাঁশরী, মুরজ মন্দিরা'। প্রমীলার ভাগ্য যে লঙ্কার ভাগ্যের সঙ্গে একাকার, এ কথাও উপরের চিত্রকল্পে অনুক্ত থাকে নি। কারণ, চিত্রকল্পিতা প্রমীলা একদৃষ্টে 'দূর লঙ্কাপানে'ই চেয়ে আছেন। প্রমীলা না বুঝেও তাঁর বিরহশোকের দর্পণে নিজের ভাবী বৈধব্যশোক এবং লঙ্কার ট্রাজিক নিয়তির প্রতিবিম্ব যুগপৎ দেখতে পাচ্ছেন। কবি একটু পরেই প্রমোদ উদ্যানে দংশক ভুজঙ্গের চিত্রকল্পে ইন্দ্রজিতের আসন্ন অকালমৃত্যুর কথা প্রমীলার নিজের মুখ দিয়েই বলিয়েছেন :

ওই দেখ, আইল লো তিমির যামিনী,
কাল-ভুজঙ্গিনী-রূপে দংশিতে আমারে,
বাসন্তি ! কোথায়, সখি, রক্ষঃকুল-পতি,
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ, এ বিপত্তি-কালে ?

প্রমীলা কাল-ভুজঙ্গিনীর চিত্রকল্পে শুধু বেহুলা লখিন্দরের কাহিনীই স্মরণ করেন নি, অব্যবহিত পরে ইন্দ্রজিতের নামও স্মরণ করেছেন। 'কোথায় সখি, রক্ষঃকুলপতি, অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ?' এই উক্তি যেন মেঘনাদবধের পর শোকাকুলা প্রমীলার সম্ভাব্য উক্তি। এখানে এই প্রচ্ছন্ন নাটকীয় বক্রোক্তির কথা মনে না রাখলে ভুজঙ্গিনীর চিত্রকল্পকে নিছক তিমির রাত্রির উপমা বলে মনে হবে। কিন্তু মধুসূদনের কাব্যকৌশলে নাট্যরসের চতুর ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অতএব ট্রাজিক নিয়তির আভাসন হিসাবেও এই চিত্রকল্পটিকে দেখা দরকার। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রমীলার পরবর্তী অর্ধ-স্বগত উক্তি :

আঁধার সংসার এবে এ পোড়া নয়নে !
এ পরান দহিছে লো বিচ্ছেদ-অনলে !
যে রবির ছবি পানে চাহি বাঁচি আমি
অহরহঃ, অস্তাচলে আচ্ছন্ন লো তিনি !
আর কি পাইব আমি (উষার প্রসাদে
পাইবি যেমতি, সতি, তুই) প্রাণেশ্বরে ?

এই সংশয়োক্তির মধ্যে সম্ভাব্য বৈধব্যের আভাস যে ফুটে উঠেছে তাতে সন্দেহ নেই। ক্ষণবিরহ চির-বিরহের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। নতুবা বিরহবর্ণনায় 'বিচ্ছেদ-অনল' যদিবা প্রত্যাশিত, 'অস্তাচল'এর চিত্রকল্প নিশ্চয়ই নয়।

মধুসূদন চিত্রকল্পসিদ্ধ। তিনি চিত্রকল্প রচনায় পঞ্চেন্দ্রিয়ের সব কটিকেই ব্যবহার করতে জানেন। শব্দ, দৃশ্য, স্পর্শ যুগপৎ মিলিত হয়েছে প্রমোদ উদ্যানের বর্ণনায়:

গাইছে ভ্রমরী;
কুহরিছে পিকবর; কুসুম ফুটিছে;
শোভিছে আনন্দময়ী বনরাজী-ভালে
(মণিময় সিঁথিরূপে) জোনাকের পাঁতি;
বহিছে মলয়ানিল, মর্মরিছে পাতা।

পরে শব্দচিত্রের বিশিষ্ট প্রয়োগ দেখি প্রমীলার যাত্রা বর্ণনায়:

মন্দুরায় হেষে অশ্ব, ঊর্ধ্ব কর্ণে শুনি
নূপুরের ঝন্‌ঝনি, কিঙ্কিণীর বোলী,
ডমরুর রবে যথা নাচে কাল ফণী।
বারীমাঝে নাদে গজ শ্রবণ বিদরি,
গম্ভীর নির্ঘোষে যথা ঘোষে ঘনপতি
দূরে!

কিংবা লঙ্কাপুরীর প্রবেশ পথে:

শুনিলা চমকি
কোদণ্ড-ঘর্ঘর ঘোর, ঘোড়া দড়বড়ি,
হুহুংকার, কোষে বদ্ধ অসির ঝন্‌ঝনি।
সে রোলের সহ মিশি বাজিছে বাজনা,
ঝড় সঙ্গে বহে যেন কাকলী-লহরী!

এবং তারপরই দৃশ্য-চিত্র, 'উড়িছে পতাকা— রত্ন-সংকলিত-আভা।'

প্রমীলার বিরহিণী থেকে বীরাঙ্গনায় রূপান্তর সাধন মাইকেলের অসামান্য কৃতিত্ব। পতি বিরহের অবসানকল্পে প্রমীলা শত্রুবেষ্টিত লঙ্কাপুরে প্রবেশ করতে চান। কবিও বিরহের কোমল বাতাবরণ ঘুচিয়ে রুদ্ররসের আবাহন করতে চান। বিরহ ঘুচাতে গিয়েই প্রমীলা বীরাঙ্গনা হয়ে পড়েন। কবি মহাকাব্যের মূল বীররসটির পুনরুপস্থাপন এইভাবেই সম্পন্ন করেন:

রুষিলা দানব-বালা প্রমীলা রূপসী।

এখানে 'রূপসী' প্রমীলা এক নিমেষেই রোষ-রুষ্টা; 'দানব-বালা' বিশেষণটি তার সহজাত শক্তিরই ইঙ্গিত, কারণ একটু পরেই তিনি 'রোষাবেশে' স্বর্ণ মন্দিরে প্রবেশ করবেন। এখানে 'রূপসী' বিশেষণটি সুপ্রযুক্ত কি না সন্দেহ জাগতে পারে। কিন্তু বরাঙ্গনা থেকে বীরাঙ্গনায় রূপান্তর বুঝাবার জন্যই মাইকেল পাশাপাশি 'রূপসী' ও 'রুষ্টা' শব্দ দুটি প্রয়োগ করেছেন। এই সূক্ষ্ম ইঙ্গিত না থাকলে অবশ্য

এই বিশেষণটি দোষদুষ্ট মনে হতে পারত এবং এতে রসবোধের ব্যাঘাতই ঘটত। যেমন হোমার ঘটিয়েছেন ইলিআদ মহাকাব্যের প্রথম সর্গের সমাপ্তিতে। গ্রীক ইন্দ্রাণী হেরার স্থায়ী এপিক বিশেষণ দুটি— 'তন্বী শ্বেতভুজা' ও 'স্বর্ণরথারূঢ়া'। স্থানকাল বুঝে বিচারবিবেচনা করে এর কোনো একটি প্রয়োগ করা উচিত নিশ্চয়ই। প্রথম সর্গের সমাপ্তিতে স্বর্গে দেবতারা পানভোজনের পর যখন শয়নগৃহে যান তখনকার বর্ণনায় হোমার বলছেন :

'অলিমপাসের জিউস, বিদ্যুতের অধীশ্বর, শয্যাগ্রহণ করলেন, যে-শয্যায় তিনি পুরাকালে সুনিদ্রা এলেই বিশ্রাম করতেন। তিনি সেখানে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন, এবং তাঁর পাশে শয্যা নিলেন স্বর্ণরথারূঢ়া হেরা।'

এখানে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করতে হলে নিশ্চয়ই 'স্বর্ণরথারূঢ়া'র পরিবর্তে 'তন্বী শ্বেতভুজা' বিশেষণটিই প্রয়োগ করা উচিত ছিল। মাইকেলের 'রূপসী' বিশেষণটি কিন্তু এরূপ অনুচিত প্রয়োগ নয়।

লঙ্কার দিকে ধাবিতা প্রমীলার গতি অনিবার্য :

বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি ?

প্রমীলা যেন এই চিত্রকল্পটি কালিদাসের কুমারসম্ভব মহাকাব্যে পতিপ্রাণা তপস্বিনী গৌরীর উক্তি থেকে ধার করেছেন :

ক ঈপ্সিতার্থে স্থির নিশ্চয়ং মনঃ
পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ।

কিন্তু গৌরীর সঙ্গে প্রমীলার মূল পার্থক্য এই যে কুমারসম্ভব মহাকাব্যে গৌরীর কোনো যোদ্ধ-সজ্জা ছিল না, কিন্তু মেঘনাদবধ মহাকাব্যে প্রমীলা বীরাঙ্গনা, বীর নায়ক মেঘনাদের যোগ্য নায়িকা। কাজেই গৌরীর বিখ্যাত উক্তির উদ্ধৃতি দিয়েই প্রমীলার উক্তি শেষ হয়ে যায় নি। গৌরী তপস্বিনী, সংকল্পে স্থির, কিন্তু শান্ত, প্রমীলা দৃপ্ত নায়িকা, তার 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাব ফুটাবার জন্য কবি নদীর চিত্রকল্প ছাড়িয়ে দানব-বালা প্রমীলার ভুজবলের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিতে চান। তাই তেজোদীপ্ত প্রমীলার উক্তি :

দানব-নন্দিনী আমি ; রক্ষঃ-কুল-বধূ,
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী—
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে ?
পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজ-বলে

শিবানী দুর্গার বীরাঙ্গনা দানবসংহারিণী মূর্তির কথাও কবি মনে রেখেছেন ; প্রমীলার সজ্জা বর্ণনা এরূপ :

সাজিলা দানব-বালা, হৈমবতী যথা
নাশিতে মহিষাসুরে ঘোরতর রণে,
কিংবা শুম্ভ নিশুম্ভ, উন্মাদ-বীর মদে।

পরে একই মহিষমর্দিনী চিত্রকল্প পুনরায় উল্লিখিত হয়েছে প্রমীলার বর্ণনায়, 'সিংহপৃষ্ঠে যথা মহিষমর্দিনী দুর্গা।'

প্রমীলা রণরঙ্গিণী। বীরবাহু-জননী চিত্রাঙ্গদার মধ্যে শৌর্যের যে স্তিমিত প্রকাশ প্রথম সর্গে দেখেছি

এখানে প্রমীলার মধ্যে তারই পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে। কবি মহাভারতের চিত্রাঙ্গদার স্মৃতিও এই বীরাঙ্গনা চরিত্রের সঙ্গে চিত্রকল্পের সাহায্যে যুক্ত করেছেন :

যথা যবে পরন্তপ পার্থ মহারথী,
যজ্ঞের তুরঙ্গসঙ্গে আনি, উতরিলা
নারী-দেশে, দেবদত্ত শঙ্খনাদে রুষি
রণ-রঙ্গে বীরাঙ্গনা সাজিল কৌতুকে।

বিরহকাতরা প্রমীলার কথা এখানে একেবারেই ভুলে যেতে হয়। তাঁর পুরুষালি-শৌর্যের উপযুক্ত উপমা বা চিত্রকল্পের জন্য মহাকাব্যের কবি আরেক মহাকাব্যের ভাণ্ডারেই হাত পেতেছেন। মহাকাব্যই মহাকাব্যের তুলনা। রাম রাবণই রাম রাবণের যুদ্ধের তুলনা, 'রাম রাবণয়ো যুর্দ্ধং রাম রাবণয়োরিব'। তেমনি মহাকাব্যের চরিত্র মহাকাব্যের চরিত্রের সঙ্গেই তুলিতব্য। মাইকেলও বীর নায়িকাকে মহাভারতের বীর নায়ক অর্জুনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। নারীকে পুরুষের সঙ্গে তুলনা করা সাধারণত বিসদৃশ, কিন্তু কবি দেখাতে চান যে বীরাঙ্গনা হিসাবে প্রমীলা এমনই অসামান্যা যে লৌকিক জগতে কিংবা এপিক জগতে কোথাও তাঁর সমকক্ষ নারী কেউ নেই। তুলনা দিতে গেলে এপিক জগতেই যেতে হবে, তাও এপিক নায়িকা নয়, শুধু এপিক নায়কের সঙ্গেই তাঁর তুলনা চলতে পারে।

মহাকাব্যের কাহিনী মর্ত্যলোকের, কিন্তু মহাকাব্যের পরিসর স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে বিস্তৃত। লৌকিক-অলৌকিক, দৃষ্ট-অদৃষ্ট সব একই রণাঙ্গনে নীত। একটিমাত্র স্তরে সীমিত জীবনলীলা বিরাট বা মহতের ভাবটি ফোটাতে পারে না। বীররস শুধু বীরত্ব প্রকাশের জন্যই নয়, মহাকাব্যের মহত্ত্ব প্রকাশের জন্যই প্রয়োজন। মহাকাব্যের সব রসই এই মহত্ত্ব ব্যঞ্জনার সহায়ক। 'তেজস্বিনী প্রমীলা' যখন নারী সৈন্য সহ লঙ্কাপুরে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন তখন তা রীতিমতো যুদ্ধযাত্রাই। নারী সৈন্যবাহিনীর অস্ত্রসজ্জা, বিক্রম সবই পুরুষ সৈন্যের মতো, এবং অশ্বহ্রেষা, কলরব ও অস্ত্রের ঝনঝনা— সব মিলিয়ে যুদ্ধযাত্রা পরিপূর্ণ বীররসাত্মক। এখানে শুধু লঙ্কাদ্বারেই এই যুদ্ধকাণ্ড আবদ্ধ নেই, প্রমীলার সমরসজ্জা স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল— তিনভুবনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে :

বাজিল সমরবাদ্য ; চমকিলা দিবে
অমর, পাতালে নাগ, নর নরলোকে।

এইভাবেই মহাকবি মহাকাব্যের পরিধি সমগ্র সৃষ্টিতে ব্যাপ্ত করে দিয়েছেন। স্বরাট থেকে বিরাট, ব্যক্তি থেকে বিশ্ব, এই হচ্ছে মহাকাব্যের ক্রমায়ণ। কবি প্রমীলার শৌর্য শুধু প্রমীলা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হিসাবেই দেখান নি। প্রমীলার রোষ, দম্ভ, শক্তি, আত্মাহঙ্কার, রূপৈশ্বর্য এক হিসাবে লঙ্কারই প্রতিচ্ছবি। যদিও স্পষ্ট উল্লেখ নেই, তবু মধুসূদন বোদ্ধা পাঠকের জন্য সূক্ষ্ম এক ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন চমৎকার এক চিত্রকল্পে :

কিরীট-ছটা কবরী-উপরি,
হায় রে শোভিল যথা কাদম্বিনী-শিরে
ইন্দ্রচাপ ! লেখা ভালে অঞ্জনের রেখা,
ভৈরবীর ভালে যথা নয়নরঞ্জিকা
শশিকলা !

হঠাৎ মনে হবে এ যেন চতুর্থ সর্গে লঙ্কাপুরীর বর্ণনা :

অবিলম্বে লঙ্কাপুরী শোভিল সম্মুখে।
সাগরের ভালে, সখি, এ কনকপুরী
রঞ্জনের রেখা !

প্রথম সর্গে সমুদ্রকে উদ্দেশ করে রাবণের বিখ্যাত উক্তি এখানে স্মরণীয়। এই উক্তিটি কাব্যকাহিনীর পক্ষে মনে হবে অকারণ, প্রায় অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু শুধু রাবণ বা বীরবাহু বা ইন্দ্রজিত নয়, কিংবা শুধু চিত্রাঙ্গদা বা প্রমীলা নয়, লঙ্কার কাহিনীও এই মহাকাব্যের বিষয়ীভূত। লঙ্কা এই কাব্যে শুধু ভূখণ্ড নয়, এক প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব, ট্রাজিক নায়িকার মতোই তার জটিল আত্মা। এজন্য প্রথম সর্গেই মহাকবি লঙ্কাকে পাঠকের চোখের সামনে দৃশ্যমান করে তুলেছেন :

এই যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী,
শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলাম্বুস্বামি,
কৌস্তুভ-রতন যথা মাধবের বুকে,
কেন হে নির্দয় এবে তুমি এর প্রতি ?
উঠ, বলি ; বীরবলে এ জাঙাল ভাঙি
দূর করো অপবাদ।

বীরবলে অবরোধ বা শত্রুবেষ্টনী ভেঙে চুরমার করার প্রয়োজন লঙ্কার, প্রয়োজন প্রমীলারও :

পশিব নগরে
বিকট কটক কাটি, জিনি ভুজবলে
রঘুশ্রেষ্ঠে ;— এ প্রতিজ্ঞা, বীরাঙ্গনা মম।

তাই নারীর মুখে যা অবিশ্বাস্যরূপে বেমানান প্রমীলার মুখে আমরা সেরকম পুরুষালি উক্তি শুনি :

নাগপাশ দিয়া
বাঁধি লব বিভীষণে— রক্ষঃকুলাঙ্গারে !
দলিব বিপক্ষ দলে, মাতঙ্গিনী যথা
নলবন।

লঙ্কা শুধু অবরুদ্ধই নয়, লঙ্কার চারি দিকে অন্ধকার ঘনায়মান— শোক, মৃত্যু, পরাভবের তিমির। তার সম্বল শুধু বীরত্ব। তাই এক-একটি বীর-পতন মানেই আরো ঘনীভূত অন্ধকার। শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণের সাময়িক পরাভব ঘটেছে, কিন্তু লঙ্কার অবরোধ ভাঙতে রাবণও সমর্থ হন নি। একমাত্র এই তৃতীয় সর্গে প্রমীলা তার নারীবাহিনীসহ যে লঙ্কা-অভিযান করেছেন তাকেই সম্পূর্ণ সফল অভিযান বলা চলে। শুধু প্রমীলার পক্ষেই শত্রু-অবরোধ নস্যাৎ করা সম্ভব হয়েছে। বলপ্রয়োগের প্রয়োজন ঘটে নি বটে, কিন্তু অনুনয়-বিনয়ের পরিবর্তে বলপ্রয়োগের হুমকিতেই তিনি অবরোধ অতিক্রম করেছেন। প্রমীলার কথায় ও আচরণে শত্রুঞ্জয় দিগ্‌বিজেত্রী-সুলভ আত্মবিশ্বাস। প্রমীলা যেন অন্ধকার বলয়ের মধ্যে দৃপ্ত অগ্নিশিখা। একাধিক চিত্রকল্পে মধুসূদন প্রমীলার এই স্বরূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন :

ঘনঘনাকারে রেণু উড়িল চৌদিকে ;—

কিন্তু নিশাকালে কবে ধূম-পুঞ্জ পারে
আবরিতে অগ্নি-শিখা ? অগ্নিশিখা-তেজে
চলিলা প্রমীলা দেবী বামা-বল-দলে।

প্রমীলাকে শুধু অগ্নিশিখার সঙ্গে তুলনাই দেওয়া হয় নি, অগ্নিশিখার সঙ্গে তাকে অভিন্ন দেখানো হয়েছে। 'কিন্তু নিশাকালে কবে ধূমপুঞ্জ পারে / আবরিতে অগ্নি-শিখা ?' এই হঠাৎ-উক্তিতে মধুসূদন হোমারের পারাতাকসিস বাক্যরীতি প্রয়োগ করেছেন। গ্রীক ভাষায় বাক্য বিন্যাসের ছুটি রীতি স্বীকৃত, একটি পারাতাকসিস, অপরটি সিনতাকসিস। একাধিক বক্তব্য বা বর্ণনা পরপর ক্রমান্বয়ে বসানো পারাতাকসিস, আর একাধিক বক্তব্য বা বর্ণনাকে মিলিয়ে মিশিয়ে একটিমাত্র বক্তব্যে পরিণত করার রীতি সিনতাকসিস। পারাতাকসিস রীতিতে সংযোজক অব্যয় ব্যবহৃত হয় না, ক্রমান্বয়ী চিত্রে কার্যকারণ সম্বন্ধেরও কোনো উল্লেখ থাকে না। ফলে বর্ণনা একেবারে প্রত্যক্ষ ও বাস্তব হয়ে ওঠে এবং উপমাও আর উপমা থাকে না। 'মাননীয় অতিথি মঞ্চের উপর উঠে এলেন ; সভাগৃহ করতালিতে ভেঙে পড়লো', এটি পারাতাকসিস ; 'মাননীয় অতিথি মঞ্চের উপর উঠে এলে সভাগৃহ করতালিতে ভেঙে পড়লো', এটি সিনতাকসিস। প্রথমটিতে অতিথি এবং সভাগৃহ স্বতন্ত্র, এবং উভয়ের গুরুত্বই সমান। দ্বিতীয়টিতে অতিথির উপর গুরুত্ব অনেক হ্রাস পেয়ে গেছে, সভাগৃহ হয়ে উঠেছে প্রধান। শুধু করতালিমুখর সভাগৃহের মুখরতার কারণ দর্শানোর জন্যই যেন বাক্যে মাননীয় অতিথির আগমন ; তার স্বাধীন স্বনির্ভর কোনো অস্তিত্বই যেন স্বীকৃত নয়। এপিক কবিরা বাস্তব বর্ণনার পক্ষপাতী ; জীবনকে তাঁরা জীবনের মতো করেই দেখেন ; জীবনের কোনো অভিজ্ঞতাকেই অন্য কোনো অভিজ্ঞতার চেয়ে কম মূল্যবান জ্ঞান করেন না। এই সত্যনিষ্ঠার জন্যই হোমার পারাতাকসিস রীতির পক্ষপাতী। তৃতীয় সর্গে পারাতাকসিস রীতির চমৎকার দৃষ্টান্ত এখানে পাই :

কাঁপিল লঙ্কা আতঙ্কে ; কাঁপিল
মাতঙ্গে নিষাদী ; রথে রথী ; তুরঙ্গমে
সাদীবর ; সিংহাসনে রাজা ; অবরোধে
কুলবধূ ; বিহঙ্গম কাঁপিল কুলায়ে ;
পর্বত-গহ্বরে সিংহ, বন-হস্তী বনে ;
ডুবিল অতল জলে জলচর যত !

ঘটনা পরম্পরা যেন রীলের পর রীল চলচ্চিত্র, কেউ কারো অধীন নয়, স্বয়ম্ভর, অথচ সবগুলি মিলিয়ে জলস্থল অন্তরীক্ষে এক ত্রিভুবনকম্প।

উপরে উদ্ধৃত অগ্নিশিখার এই চিত্রকল্পে—'কিন্তু নিশাকালে কবে ধূমপুঞ্জ পারে/আবরিতে অগ্নি-শিখা ?'—আমরা অগ্নিশিখা ও প্রমীলা উভয়কেই যুগপৎ প্রত্যক্ষ করি, মনে হয় অগ্নিশিখাই প্রমীলার মধ্যে জীবন্ত হয়ে জ্বলে উঠেছে। যেমন অন্ধকারের মধ্যে অগ্নি, মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ, উষার তিমিরে সূর্যালোক, তেমনি লঙ্কায় প্রমীলা। বীর হনুমান প্রমীলাকে দেখে ভীত ; প্রমীলার মধ্যে তিনি দেখলেন এক জ্যোতির্ময়ী মূর্তি :

দেখিলা সভয়ে
বীরাঙ্গনা মাঝে রঙ্গে প্রমীলা দানবী।

ক্ষণ-প্রভা-সম বিভা খেলিছে কিরীটে ;
শোভিছে বরাঙ্গে বর্ম, সৌর-অংশু-রাশি,
মণি-আভা সহ মিশি, শোভয়ে যেমনি।

প্রমীলার মধ্যে বিদ্যুৎ ও সূর্যকিরণের সমন্বয় ঘটেছে। তিনি দ্যুতি এবং উত্তাপ দুইই। হনুমান প্রমীলাকে বিদ্যুতের সঙ্গেই তুলনা করেছেন :

ধন্য বীর মেঘনাদ, যে মেঘের পাশে
প্রেম-পাশে বাঁধা সদা হেন সৌদামিনী !

হনুমানের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে প্রমীলা নিজের এবং নিজের সঙ্গিনীদের বর্ণনায় মারক বিদ্যুতের চিত্রকল্পই ব্যবহার করেছেন :

অবলা, কুলের বালা, আমরা সকলে ;
কিন্তু ভেবে দেখ, বীর, যে বিদ্যুৎ-ছটা
রমে আঁখি, মরে নর, তাহার পরশে।

প্রমীলার যোদ্ধ-সঙ্গিনী দূতী নৃমুণ্ডমালিনীর মধ্যেও প্রমীলার অগ্নিতেজই প্রকট :

চমকিলা বীরবৃন্দ হেরিয়া বামারে,
চমকে গৃহস্থ যথা ঘোর নিশা-কালে
হেরি অগ্নি-শিখা ঘরে !

এবং তার মধ্যেও প্রমীলার মতোই 'সৌর-অংশু-রাশি' বিচ্ছুরিত :

নব-মাতঙ্গিনী-গতি চলিলা রঙ্গিনী
আলো করি দশ দিশ কৌমুদী যেমতি,
কুমুদিনী-সখী, ঝলে বিমল সলিলে
কিংবা উষা অংশুময়ী গিরিশৃঙ্গ-মাঝে !

প্রমীলাকে দেখে রাম বলছেন, 'নিশীথে কি উষা আসি উতরিলা হেথা ?' দলবল নিয়ে যখন দর্পিতা প্রমীলা বিজয়-উল্লাসে রামচন্দ্রের বাহিনীর মধ্য দিয়ে লঙ্কাপুরে চলেছেন তখন রাম নারীবাহিনী দেখতে পাচ্ছেন না, দেখছেন দাউ দাউ অগ্নিশিখা :

যথা দূর দাবানল পশিলে কাননে,
অগ্নিময় দশ দিশ ; দেখিলা সম্মুখে
রাঘবেন্দ্র বিভা-রাশি নির্ধূম আকাশে,
সুবর্ণি বারিদ-পুঞ্জে।

পরেও প্রমীলার বর্ণনায় তার দীপ্তিকে বিদ্যুতের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে :

খেলিছে চৌদিকে
রতনসম্ভবা বিভা ক্ষণ-প্রভা সম।

বিভীষণ রামচন্দ্রকে প্রমীলার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন :

মহাশক্তি-অংশে, দেব, জনম বামার,

মহাশক্তি সম তেজে! কার সাধ্য আঁটে
বিক্রমে এ দানবীরে ?

অবশেষে প্রমীলা যখন লঙ্কাপুরে প্রবেশ করলেন তখন :

অগ্নিময় আকাশ পূরিল কোলাহলে
যথা যবে ভূকম্পনে, ঘোর বজ্রনাদে,
উপরে আগ্নেয়গিরি অগ্নি-স্রোতোরাশি
নিশীথে !

এবং লঙ্কার নরনারীর চোখেও প্রমীলা অগ্নিশিখাতুল্য :

যথা অগ্নি-শিখা দেখি পতঙ্গ-আবলী
ধায় রঙ্গে, চারি দিকে আইল ধাইয়া
পৌরজন ;

এবং কবির নিজের ভাষায় :

চলিলা অঙ্গনা
আগ্নেয় তরঙ্গ যথা নিবিড় কাননে।

যেমন তেজ ও প্রাণশক্তির প্রতীক অগ্নি, তেমনি জীবন ও প্রাণপ্রাচুর্যের প্রতীক বীণাবাদ্য। প্রথম সর্গে যখন রাবণ শোক করছেন তখনকার চিত্রকল্পটি স্মরণীয় :

একে একে
শুকাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী ;
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ মুরলী ;

তৃতীয় সর্গের প্রারম্ভেও পতিবিরহিণী প্রমীলার চিত্রে :

নীরব বাঁশরী, বীণা, মুরজ, মন্দিরা,
গীত-ধ্বনি।

কিন্তু এখন প্রমীলার চতুর্দিকে বীণাবাদ্য : 'বাজাইল বীণা, বাঁশী, মুরজ, মন্দিরা/বাদ্যকরী বিদ্যাধরী।' আসন্ন মৃত্যুপুরী লঙ্কায় প্রমীলা ও মেঘনাদ সুখী দম্পতির মতো স্বর্ণাসনে বসলেন :

স্বর্ণাসনে বসিলা দম্পতি।
গাইল গায়ক-দল ; নাচিল নর্তকী।
বিদ্যাধর বিদ্যাধরী ত্রিদশ-আলয়ে
যথা ; ভুলি নিজ দুঃখ, পিঞ্জর-মাঝারে,
গায় পাখী।

এখানেও নাটকীয় ট্রাজিক 'আয়রনি'। জায়া ও পতির যৌথ সত্তা দম্পতি ; এখন তাদের মিলনোৎসব। কিন্তু বর্ণনার মধ্যে কোনো আভাস না দিলেও চিত্রকল্পে কবি বিপরীত ইঙ্গিত দিতে ভোলেন নি। প্রমীলা ও মেঘনাদ মিলিত হয়েছেন। পাখীর গান নিশ্চয়ই এই আনন্দের যোগ্য উপমা। কিন্তু 'ভুলি নিজ দুঃখ' বললে স্বতই প্রশ্ন জাগে 'কীসের দুঃখ ?' পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীকে নিশ্চয়ই মুক্ত, সুখী, গায়ক-বিহঙ্গ

বলা যায় না। এই দুঃখ প্রকৃতপক্ষে লঙ্কার দুঃখ, প্রমীলার আসন্ন পতিবিয়োগের অজ্ঞাত পূর্বাভাস। এই দুঃখে প্রমীলা সীতার দুঃখের অংশভাগিনী। দ্বিতীয় সর্গে পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর চিত্রকল্পে সীতার বর্ণনা এ ক্ষেত্রে স্মরণীয় :

বৈদেহীর দুঃখে, দেবি, কার না বিদরে
হৃদয় ? অশোক-বনে বসি দিবানিশি
(কুঞ্জবন-সখী পাখী পিঞ্জরে যেমতি)
কাঁদেন রূপসী শোকে।

চতুর্থ সর্গে সীতা সরমার কাছে নিজেই বলেছেন—

কিন্তু কারাগার যদি
সুবর্ণগঠিত, তবু বন্দীর নয়নে
কমনীয় কভু কি লো শোভে তার আভা ?
সুবর্ণ পিঞ্জর বলি হয় কি লো সুখী
যে পিঞ্জরে বদ্ধ পাখী ? দুঃখিনী সতত
যে পিঞ্জরে রাখ তুমি কুঞ্জ-বিহারিণী !

তৃতীয় সর্গেও বন্দিনী সীতার দুঃখিনী-চিত্রটি হনুমান স্মরণ করেছেন—

রক্ষঃকুলবালাদলে, রক্ষঃ-কুল-বধূ
(শশিকলা সম রূপে) ঘোর নিশা-কালে,
দেখিনু অশোক-বনে (হায় শোকাকুলা)
রঘু-কুল-কমলেরে।

এইভাবে ট্রাজিক পরিণতির পূর্বাভাস ও ভবিষ্যদ্বাণী চিত্রকল্পের মধ্যে হাজির করার কৌশল মধুসূদনের চমৎকার আয়ত্ত ছিল। এই কৌশল মিলটনও অবলম্বন করেছেন। প্যারাডাইস লস্ট-এর চতুর্থ সর্গে আদম-ঈভের মিলনকুঞ্জের বর্ণনা এরূপ :

এখানে, পুষ্পমাল্য ও সুগন্ধি ভেষজের নিবিড় সান্নিধ্যে, নবপরিণীতা ঈভ প্রথমে তাঁর বাসরশয্যা পাতলেন এবং স্বর্গীয় গায়কদল পরিণয়-সঙ্গীত গাইল, যখন সহৃদয় দেবদূত আদমের কাছে সুন্দরী ঈভকে নিয়ে এল, যে-ঈভ দিগম্বরী হওয়া সত্ত্বেও মনে হত প্যানডোরার চাইতেও অলঙ্কৃতা ও মনোহরা এবং যে-প্যানডোরাকে দেবতারা সর্বগুণে গুণান্বিতা করেছিলেন ; এবং হায়, শোকাবহ সেই ঘটনারই অনুরূপ যখন হেরমেস কর্তৃক জাফেট-এর দুর্মদ পুত্র সমীপে আনীত প্যানডোরা জোভ-এর পূতাগ্নি অপহারক-এর প্রতি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে মানবকুলকে ভ্রাবিভ্রমে মোহমুগ্ধ করেছিলেন।

এখানে ঈভ ও প্যানডোরার মধ্যে তুলনা শুধু সৌন্দর্যের নয়, উভয়ের ট্রাজিক পরিণতিরও। এই ধরণের দূরদর্শী 'আয়রনি'র প্রয়োগে মধুসূদনও মিলটনের মতোই দক্ষ ছিলেন।

জগৎসংসার এক অমোঘ নীতি ও নিয়মের অধীন, এই ক্লাসিক বিশ্বাসের উপর সব মহাকাব্যই প্রতিষ্ঠিত। প্রথম সর্গেই ঘোষণা করা হয়েছে, 'নিজদোষে মজে রাজা লঙ্কা-অধিপতি' এবং 'প্রাক্তনের ফল ত্বরা ফলিবে এ পুরে।' দ্বিতীয় সর্গেও কমলা নিজের উক্তির পুনরুক্তি করে বলেছেন, 'নিজ কর্মদোষে মজিছে

সবংশে পাপী।' দেবরাজ ইন্দ্র শিবানীর কাছে নিবেদন করেছিলেন: 'বিনাশি, দেবি, রক্ষঃকুল, রাখ/ ত্রিভুবন, বৃদ্ধি কর ধর্মের মহিমা; / হ্রাসো বসুধার ভার।' মহাকাব্যের নায়ক কেবলমাত্র আত্মশক্তিতে আস্থাবান নন, বিশ্বজাগতিক ন্যায়বিধান যে অখণ্ডনীয় এই সত্যে তিনি বিশ্বাসী। তৃতীয় সর্গে লক্ষ্মণ রামকে এই অদৃশ্য কিন্তু অমোঘ তৃতীয় শক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন:

অবশ্য হইবে ধ্বংস কালি মোর হাতে
রাবণি। অধর্ম কোথা কবে জয় লাভে?
অধর্ম-আচারী এই রক্ষঃ-কুলপতি;
তার পাপে হত-বল হবে রণ-ভূমে
মেঘনাদ; মরে পুত্র জনকের পাপে।

এবং বিভীষণ এ কথার সমর্থনে বলেন:

যথা ধর্ম জয় তথা।
নিজ পাপে মজে, হায়, রক্ষঃ-কুল-পতি
মরিবে তোমার শরে স্বরীশ্বর-অরি
মেঘনাদ।

প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই দৈবের নিয়ম অলঙ্ঘ্যনীয়। তাই মেঘনাদবধ কাব্যে বিশ্বজগতে যে নিয়মের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন নিসর্গ চিত্রকল্পে সে কথা ব্যক্ত হয়েছে। প্রমীলা যখন আত্মশক্তির ঘোষণা করেছেন তখন তিনিও প্রাকৃতিক নিয়মের রূপকল্পই ব্যবহার করেছেন:

পর্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি;

মেঘনাদবধ কাব্যের সমাপ্তিতে রাবণ স্বয়ং এই নিয়তি-নির্দিষ্ট বিধান মেনে নিয়েছেন। মেঘনাদ ও প্রমীলার উদ্দেশ্যে তাঁর আক্ষেপোক্তি:

পূর্বজন্মফলে
হেরি তোমা দোঁহে আজি এ কাল-আসনে!

তৃতীয় সর্গ শুরু হয়েছিল কুঞ্জ ও কপোতীর চিত্রকল্প দিয়ে। তারপর এল নারীবাহিনীর অভিযান। প্রমীলা প্রথমে গৃহবধূ, পরে রণরঙ্গিণী। তৃতীয় সর্গের শেষে আবার যুদ্ধক্ষেত্রের কোদণ্ডটঙ্কার থেকে দূরে সহজ সরল গ্রাম্যজীবনের পরিবেশ গড়ে তোলা হয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে থেকেও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে থাকার চিত্রকল্প-কলা মধুসূদন হোমারের কাছ থেকেই গ্রহণ করেছিলেন, যেমন করেছিলেন মিলটন। হোমার বা মিলটনের মতো অতি-দীর্ঘ এপিক উপমা মাইকেল মধুসূদন কচিৎ কদাচিৎ ব্যবহার করলেও সচরাচর এপিক উপমার কাজ তিনি জমাট চিত্রকল্পের সাহায্যেই সম্পন্ন করেছেন। চিত্রকল্পের মধ্যে আমরা সাময়িকভাবে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে সরে যাই, এবং জীবনের শান্ত সৃষ্টিশীল অংশে দৃষ্টিপাত করি। রাত্রে সৈন্যরা নগরী পাহারা দিচ্ছে, তার চিত্রকল্প এরূপ:

যথা যবে
বারিদ-প্রসাদে পুষ্ট শস্যকুল বাড়ে
দিন দিন, উচ্চ মঞ্চ গড়ি ক্ষেত্র-পাশে,
তাহার উপরে কৃষি জাগে সাবধানে,
খেদাইয়া মৃগযূথে, ভীষণ মহিষে,
আর তৃণজীবী জীবে।

বিধ্বংসী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে কৃষিক্ষেত্রের শ্যামল পরিবেশের এই চিত্রটি আমাদের দৃষ্টি ও মনকে বেশ কিছুক্ষণের জন্য ভুলিয়ে রাখে। হোমার ও মিলটন থেকে এরূপ ঝুড়ি-ঝুড়ি নিদর্শন দেওয়া যায়। ইলিআদ মহাকাব্যের সপ্তদশ সর্গে মেনেলাওস কর্তৃক এউফরবস বধের দৃশ্যে বলা হয়েছে :

> যেমন জলের ফোয়ারা সিঞ্চিত মুক্ত প্রান্তরে জলপাই গাছের সতেজ চারা লাগালে তা ক্রমে সুন্দর বৃক্ষ হয়ে বেড়ে উঠে, ঝড়-বাতাসের দমকায় কাঁপতে থাকে, কিন্তু তবু সাদা ফুল ফোটায়, তারপর সহসা প্রভঞ্জনের আঘাত তাকে স্থানচ্যুত করে মাটিতে ফেলে দেয়, ঠিক তেমনি পানথোঅস-পুত্র এউফরবস ভূমিতে পড়ে ছিলেন।

বলা বাহুল্য, মৃত্যুশ্মশানে এমন বৃক্ষরোপণ-উৎসব পালন করা কেবলমাত্র চিত্রকল্পেই সম্ভব। মিলটনের প্যারাডাইস লস্ট-এর চতুর্থ সর্গেও অনুরূপ দীর্ঘ উপমায় ভ্রষ্ট এঞ্জেলদের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে :

> দেবদূতের দঙ্গল বর্শা হাতে নিয়ে শয়তানের চারিদিকে ঘিরে এল ঘনবদ্ধ হয়ে, যেমন আন্দোলিত পক্ব ফসলে আবৃত সেরেস-এর মাঠ তার ঘনসন্নিবদ্ধ গোধূমকেশরকে হাওয়ার বেগে নমিত করে; এবং সাবধানী কৃষক, দ্বিধান্বিত, দাঁড়িয়ে থাকে, পাছে মাড়াই-এর চত্বরে তার বহু আশার শস্যগুচ্ছ নিঃসার তুষ বলে প্রতিপন্ন হয়।

বর্শাহাতে ভ্রষ্ট দেবদূতদের সঙ্গে নমিত গোধূমকেশরের তুলনা যতই নিখুঁত হোক, উপমান ও উপমেয় এখানে দুটি আলাদা জগতের পরিচয় বহন করছে। একটিতে সংঘাত, অপরটিতে সৃষ্টি ও শান্তি।

এই ধরণের এপিক উপমা আমাদের কাহিনী-ছুট এক স্বতন্ত্র জগতের ছাড়পত্র দেয়। অথচ মূল কাহিনীর কাব্য ও রচনাশৈলীতে কোনো পার্থক্য নেই। একই ছন্দ, একই রীতি, একই ধ্বনি। তবু উগ্র যুদ্ধবর্ণনার একঘেয়েমি থেকে হোমারের এই সব দীর্ঘ উপমা পাঠক ও শ্রোতাকে অনেকখানি উপশম দেয় এবং কাব্যভূমির বিস্তৃতি ঘটায়। এইভাবে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে অবস্থিত, বহুপরিচিত, সনাতন জীবন ও সংসারের সঙ্গে পাঠকের সংযোগ রক্ষিত হয়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, দীর্ঘ এপিক উপমার মধ্যে প্রায়ই আলাদা আলাদা উপমা খুব বেশি থাকে না। সেজন্য মেটাফর বা লুপ্তোপমায় যে অবাক-করা অনুভূতি তা এই সিমিলি-প্রধান এপিক উপমায় পাওয়া যায় না। উপমা যতই বিস্তৃত হয় ততই তার সূচিমুখ-তীব্রতা ভোঁতা হতে থাকে। মিলটন হোমারিঅ দীর্ঘ উপমাকে দীর্ঘ করতে করতে কখনো কখনো একেবারে সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছেন। কিন্তু এই দৈর্ঘ্য সত্ত্বেও কাব্যের গঠন ও প্রয়োজনের সঙ্গে মিলটন দীর্ঘ উপমা এমন সমন্বিত করেছেন যে এই অতিদৈর্ঘ্য শেষ পর্যন্ত দোষ না হয়ে গুণে পরিণত হয়েছে। প্যারাডাইস লস্ট-এর চতুর্থ সর্গে ইডেনের বর্ণনাটি দেখা যাক :

এন্নার সেই সুদৃশ্য প্রান্তর যেখানে প্রসারপিন, নিজেই সুদৃশ্যতর কুসুম, কুসুম চয়ন করতে গিয়ে কৃতান্ত দিস কর্তৃক অপহৃত হয়েছিলেন, যার ফলে সেরেস পৃথিবীময় প্রসারপিনকে খুঁজে ফিরতে বাধ্য হয়েছিলেন; অথবা অরন্তেস-এর পার্শ্ববর্তী দাফ্‌নের সেই মধুর কুঞ্জ এবং উদ্বেল কাসতালিঅ নির্ঝর; কোনোটিই ইডেনের এই স্বর্গের সঙ্গে তুলিত হতে পারে না; অথবা ক্রাইতন নদী-ঘেরা নাইসিঅ দ্বীপ, যেখানে বৃদ্ধ চাম—জেনতাইলরা যার নাম দিয়েছিল আমন—এবং লিবিআর জোভ তার আমালথিআকে ও তার ফুলসাজে সজ্জিত তরুণ বাথ্‌খাসকে তার সৎমা রেআর দৃষ্টির আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিলেন; অথবা সুদূর আমারা গিরিশৃঙ্গ—কারো কারো মতে এইটিই আসল স্বর্গ—যেখানে আবাসসিন নৃপতিরা তাদের সন্ততিদের রক্ষা করেন, যে-আমারা গিরিশৃঙ্গ চড়াই ভেঙে পুরো একদিনের পথ এবং ইথিওপিয়ার সীমান্তে উজ্জ্বল পাথরঘেরা নীলনদের উৎসে অবস্থিত; এদের কোনোটিই এই আসিরিঅ উদ্যানের সঙ্গে তুলিত হতে পারে না, যে উদ্যানে শয়তান দেখলো সব আনন্দই নিরানন্দ, সব জীবিত প্রাণীই কিম্ভূতকিমাকার, অদ্ভুত।

এই সুদীর্ঘ উপমায় অনেকগুলি পুরাকাহিনী জুড়ে চিত্রকল্পের মালা রচনা করা হয়েছে; কিন্তু কোনো কাহিনীই কেবলমাত্র দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি বা গল্প শোনানোর জন্য আমদানি করা হয় নি; প্রত্যেকটিতেই ঈভ-এর দুরবস্থার কথা চমৎকার ইঙ্গিতে বলা হয়েছে। পেগান কাহিনী বাইবেলিঅ খৃষ্ট কাহিনীর উপমা হিসাবে ব্যবহার করে মিলটন বুঝাতে চেয়েছেন যে আদি মানবমানবীর আদিমতম অভিজ্ঞতার মধ্যেই পেগান ও খৃষ্টীয় সর্বপ্রকার অভিজ্ঞতার বীজ রয়ে গেছে। মহাকাব্যের এপিক মহত্ত্ব ফুটিয়ে তুলবার জন্যই দেশান্তর ও কালান্তরে বিস্তৃত দীর্ঘ উপমা মিল্টন ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করেছেন। এই সব উপমা অতীত থেকে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত দেশকাল ও ইতিহাসে বিস্তৃত হয়ে এক বিশালতার বোধ সৃষ্টি করে।

পুনরুক্ত চিত্রকল্পের প্রয়োগ মাইকেল মধুসূদনের আরেকটি বিশিষ্ট রীতি। একই চিত্রকল্প বিভিন্ন সর্গে বিভিন্ন চরিত্র বা ঘটনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ব্যবহার করেন এবং এইভাবে একই চিত্রকল্পের বারংবার ব্যবহারে একাধিক জগৎ বা পরিমণ্ডল এক অদৃশ্য সূত্রে বাঁধা পড়ে যায় এবং তাদের অন্তর্লীন ঐক্যটি আমরা ধরতে পারি। মহাকাব্যের মহাবিশ্বে আলাদা আলাদা জগৎ এক অভিন্ন মহাজগতের সামগ্রিকতাবোধ সৃষ্টি করে। যেমন নিশা-স্বপ্নের ইমেজারি। প্রথম সর্গে রাবণ, তৃতীয় সর্গে রাম ও বিভীষণ, প্রত্যেকেই এই বিস্ময়বোধক ইমেজারি ব্যবহার করেছেন। রাবণ যথা :

নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা,
রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখরণে! ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?

তৃতীয় সর্গে রামচন্দ্র যথা :

কহিলা রাঘব :—
'কি আশ্চর্য, নৈকষেয়! কভু নাহি দেখি,

কভু নাহি শুনি হেন এ তিন ভুবনে !
নিশার স্বপন আজি দেখিনু কি জাগি !'

এবং উত্তর দিতে গিয়ে বিভীষণও একই ইমেজারি ব্যবহার করেছেন !

উত্তরিলা বিভীষণ : 'নিশার স্বপন
নহে এ, বৈদেহী-নাথ, কহিনু তোমারে।'

আমরা পূর্বেই দেখেছি বিদ্যুৎ ও অগ্নিশিখার চিত্রকল্প প্রমীলার ক্ষেত্রে পুনরুক্ত হয়েছে এবং পিঞ্জর-বদ্ধ বিহঙ্গের চিত্র কবি মহাকাব্যে বারংবার ব্যবহার করে অবরুদ্ধ লঙ্কা থেকে বন্দিনী সীতা পর্যন্ত চিত্রকল্পের বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন।

তৃতীয় সর্গের শেষে কৃষিজীবনের চিত্রকল্পটি পাঠককে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু সেই শান্ত চিত্রের মধ্যেও বিনাশী উপদ্রবের ইঙ্গিত অনুক্ত থাকে নি। সেখানেও 'ভীষণ মহিষ'-এর উৎপাত বর্তমান। মহাকবি পাঠককে এই বিঘ্ন বা উপদ্রব থেকেও সাময়িকভাবে বিশ্রাম দিতে চান; শুধু যুদ্ধোদ্যমের বিরাম নয়, পাঠকের অতি-ক্লান্ত চোখে ঘুমের প্রলেপ ছড়িয়ে দেন:

মৃদুপদে নিদ্রা দেবী আইলা কৈলাসে ;
লভিলা কৈলাস-বাসী কুসুম-শয়নে
বিরাম ; ভবের ভালে দীপি শশি-কলা
উজলিল সুখ-ধাম রজোময় তেজে।

বারট্রাণ্ড রাসেল
১৮৭২ - ১৯৭০

বারট্রাণ্ড রাসেল ১৮৭২-১৯৭০

রাসেলের সাহিত্যকৃতি

> 'It is not enough to mirror the world. It should be mirrored with emotion.'—Russell, *Education and the Social Order.*

কবিকে মনীষী বলা হয়েছে, মনীষীদেরও কবি হতে বাধা নেই। আপাত কবি-বিদ্বেষ সত্ত্বেও প্লেটো এ কথা প্রমাণ ক'রে গেছেন, প্রমাণ ক'রে গেছেন পাস্কাল এবং আরও অনেকে। হয়তো কিছু পরিমাণে প্রমাণ ক'রে গেলেন বার্ট্রাণ্ড রাসেলও। কারণ রাসেল তো কেবল বুদ্ধিমান্ তর্কবাগীশ ছিলেন না, কেবলমাত্র তত্ত্বচিন্তা বা শাস্ত্রচর্চা ক'রেই তিনি জীবন কাটান নি। তিনি জ্ঞানমার্গের পথিক ছিলেন বটে, কিন্তু একদেশদর্শী ছিলেন না কোনোদিনই। বহুধা বিচিত্র ছিল তাঁর মন, আশ্চর্য তার ব্যাপকতা। যা কিছু মানবোচিত তার কিছুই অগ্রাহ্য ছিলনা তাঁর কাছে।

নিজেই তিনি স্বীকার করে গেছেন তাঁর প্রথম উন্মেষের কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের সঙ্গে 'জীবনে প্রথম আমি দেখা পেলাম সেইসব লোকেদের, যাঁদের কাছে মনের কথা বলা চলে। দর্শন অধ্যয়ন করলাম, ম্যাক্‌ট্যাগার্টের প্রভাবে কিছুদিন হেগেলপন্থীও হলাম। এ অবস্থা চলল বছর তিনেক, এবং তার অবসান ঘটল জি. ই. মুর্‌এর সঙ্গে আলোচনার ফলে। কেম্‌ব্রিজ্ ছাড়ার পর নানা বিদ্যাচর্চায় কয়েক বছর কাটল। বার্লিনে ছুটি শীতে প্রধানতঃ অর্থনীতিতে মন দিলাম। ১৮৯৬তে জন্‌স্ হপকিন্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয় এবং ব্রিন মর্‌-এ বক্তৃতা দিলাম নন্-ইউক্লিডীয় জ্যামিতি বিষয়ে। বেশ কিছুদিন ছিলাম ফ্লরেন্সে, শিল্পরসজ্ঞদের মধ্যে, পড়েছিলাম পেটার, ফ্লোবেয়র, এবং সংস্কৃতিবান্ নব্বই দশকের অন্যান্য দেবতাদের।' —আই বিলীভ্, পৃ. ২৬৩।

জীবনের সূচনায় এ হেন মানসিক প্রস্তুতি যাঁর হয়েছিল তিনি আর যাই হোন নিছক বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক পাণ্ডিত্যের বিবিক্ত পরিবেশে সন্তুষ্ট থাকবার লোক ছিলেন না। শুধুই কোনো বিশেষজ্ঞসুলভ বিদ্যার সংকীর্ণ অন্তঃপুরে তাঁকে ধরে রাখা সম্ভব হত না কোনোদিনই। তাঁর মন বিপুল আগ্রহে সংসারের বিচিত্র পথে বিচরণ করেছে, এবং সর্বত্রই কিছু-না-কিছু মহার্ঘ সম্পদের সন্ধান পেয়েছে। এর ফলে শিল্প-সাহিত্যের ফসলেও তাঁর সোনার তরী সমৃদ্ধ। উত্তরজীবনে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে কেবল গণিতবিদ্-দার্শনিক-বিজ্ঞানীরাই ছিলেন না, ছিলেন বার্নার্ড্ শ, এচ্. জি. ওয়েল্‌স্, জোসেফ কনরাড্, ডি. এচ্. লরেন্স, লিটন স্ট্রেচি, টি. এস্. এলিয়ট (যিনি ছাত্র থেকে মিত্রবৎ হয়েছিলেন) প্রমুখ অনেক সাহিত্যিক। এবং এঁদের জগতে তিনি ছিলেন খুবই আপনার জনের মতো, যতটা আপনার হলে ভালোবাসা এবং বিসংবাদ দুইই সম্ভব হয়।

এই মানসিক গঠনের ফলে রাসেলের লেখায় এমন কতকগুলি গুণ আছে, যাকে সাহিত্যিক গুণ বলাই ন্যায্য। তাঁর অন্যান্য দার্শনিক গুরু বা বন্ধুদের লেখার সঙ্গে তুলনা করলেই সে গুণ অনায়াসে স্পষ্ট হয়।

হোয়াইটহেড্ এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, কিন্তু তাঁর রচনায় নেই রাসেলের প্রসাদগুণ। আবার জি. ই. মূরের লেখায় পরিচ্ছন্ন মনের পরিচয় যথেষ্ট মেলে, কিন্তু রাসেলের চিন্তার সেই ব্যাপ্তি, সেই কল্পনার দ্যুতি কোথায়? রাসেল ভারভাত্তিক বিষয়ে লিখতে বসেও নিপুণভাবে সাহিত্য আওড়াতে পারেন, তাতে তাঁর বক্তব্য একটুও ঝাপসা হয় না, বরং আরও শাণিত হয়। তেমনি বিষয় জড় ও চেতনের দ্বন্দ্ব, দর্শনশাস্ত্রের একটি মৌল সমস্যা। তার আলোচনা করতে গিয়ে হ্যাম্লেট বা অ্যালিস্ ইন্ ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড্ থেকে উপমা টেনে আনা রাসেলের পক্ষে কিছুই নয়, যথা: 'মনে হচ্ছে চেশায়ারী বিড়ালের মতো বস্তুজগতের চেহারাটাও আজ ক্রমে সূক্ষ্মতর হয়ে আসছে, শেষে তার হাসিটুকু ছাড়া বোধ হয় আর কিছুই থাকবে না— এবং সে হাসিও হবে এখনও যাঁরা বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন তাঁদের প্রতি কৌতুকসঞ্জাত।… অবস্থাটা আজ অনেকটা হ্যামলেট এবং লেয়ার্টিসএর অসিযুদ্ধের মতন, যাতে বস্তুবিদ্যার ছাত্রেরা হয়ে পড়ছেন ভাববাদী, এবং মনস্তত্ত্ববিদেরা প্রায় জড়বাদী হবার দাখিল।' — 'মন ও বস্তু', 'পোর্ট্রেট্স্ ফ্রম্ মেমরি', পৃ. ১৩৫।

আবার অন্যত্র ইচ্ছাশক্তির মুক্তি এবং বন্ধন আলোচনা প্রসঙ্গে রাসেল ফুর্তির সঙ্গে ছড়া আওড়ান:

'একটি ছেলে ব'লে উঠল: রাম!
এ কী নতুন কথাই-না শুনলাম
আমার হাসাকাঁদা
নাকি আগেই ধরাবাঁধা—
অর্থাৎ কিনা বাস্ নয়কো, ট্রাম!'[১]

আর-এক জায়গায় আজকের বিশ্বরাজনীতির কথা বলতে গিয়ে রাসেল তাঁর অভিমত জানান: 'ডেস্‌ডেমোনাকে মারতে যাবার আগে ওথেলো বলেছিল: এ কী নিদারুণ ইয়াগো, ও ইয়াগো, এ কী নিদারুণ!— আমার সন্দেহ হয়, যেসব রাজনীতিজ্ঞেরা আজ মনুষ্যজাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে প্রস্তুত হচ্ছেন তাঁদের চরিত্রে এ কথা উচ্চারণ করবার মতো দয়াধর্ম আছে কি না।' — 'হিউম্যান সোসায়েটি ইন এথিক্স্ অ্যাণ্ড পলিটিক্স্', পৃ. ২৩৯।

অতএব এ কথা নিঃসন্দেহ যে মনীষী রাসেলের লেখায় সাহিত্যের উপাদান ছিল প্রচুর। এবং মনীষা ও কল্পনার এই অনবদ্য সমন্বয়েই তাঁর সাহিত্যিক সার্থকতা। এরই বলে তিনি বিংশ শতাব্দীর বিবেক, ১৯৫০এর সাহিত্যিক নোবেল পুরস্কারজয়ী।

কারণ তাত্ত্বিক রচনায় মানুষের ধীশক্তিরই পরিচয় প্রথম এবং প্রধান। সাহিত্যিকের প্রতিভা কিন্তু অন্যত্র, যেখানে ব্যক্তিপুরুষের সম্পূর্ণ পরিচয়টি উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে— তার সব দোষগুণ, রহস্য এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাহারের মধ্য দিয়ে। মনে হয় এদিক থেকেও রাসেলের প্রচুর সম্ভাবনা ছিল। আগেই বলা হয়েছে তিনি কেবল জ্ঞানপন্থী হতে চান নি। তাঁর ব্যক্তিত্বে বহু জটিল এবং বিচিত্র ধাতুর সংমিশ্রণ

---

১ There was a youngman who said, 'Damn!
I learn with regret that I am
A creature that moves
In predestinate grooves
In short, not a bus, but a tram. —*Human Knowledge*

ছিল। নানা বিরোধাভাসের অধিকারী ছিলেন তিনি। তাঁকে বলা হয়েছে 'প্যাশনেট্ স্কেপটিক্', কারণ তাঁর অনুরাগ ও অবিশ্বাস উভয়েরই তাড়না ছিল অতীব প্রবল। আবেগশক্তি ছিল অসামান্য, সেই আবেগই তাঁকে জ্ঞানের শিখরে ঠেলে দিয়েছে বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না; এবং এই আবেগের বলেই জীবনে যে পথ তিনি বেছে নিয়েছেন, কোনো বাধা কোনো নিগ্রহই তা থেকে তাঁকে টলাতে পারে নি। একটি বিদেশী ছাত্রের কাছে তিনি স্বীকার করেছেন, 'আমি যখন ছাত্র ছিলাম, আমার চেয়ে বুদ্ধিমান্ অনেকেই ছিল, কিন্তু তাদের আমি ছাড়িয়ে গেলাম, কারণ তারা ছিল নির্লিপ্ত, আর আমার ছিল আবেগ।'— বেদ মেহ্তা: 'ফ্লাই অ্যাণ্ড দি ফ্লাই বট্ল্', পৃ. ৪৪। আজীবন তিনি গণিতচর্চা করেছেন, কিন্তু সে কি শুধু সাধারণ ভালো ছাত্রের মতো? 'পাঁচবছর বয়সে ভেবেছিলাম, যদি আমি সত্তর বছর বাঁচি, তবে কাটিয়েছি মাত্র তার চোদ্দভাগের একভাগ। সামনের দূর-প্রসারিত শূন্যতাকে মনে হয়েছিল সেদিন অসহ্য। কৈশোরেও জীবনের প্রতি ছিল বিদ্বেষ, এবং প্রায়ই আত্মহত্যার ইচ্ছে হত— শুধু আরও অঙ্ক জানার বাসনাই আমাকে তার থেকে নিরস্ত ক'রে রাখত।' — 'দি কংকোয়েস্ট অভ্ হ্যাপিনেস্', প্রথম পরিচ্ছেদ। যৌবনে ডি. এচ্. লরেন্সের প্রখর ব্যক্তিত্ব তাঁকে গভীরভাবে সম্মোহিত করেছিল, যেমন আরও অনেককেই করেছিল। কিন্তু রাসেলের অহিংস ধর্ম সেদিন লরেন্সের জ্বলন্ত চোখে স্বাভাবিক মনে হয় নি। সে কথা স্মরণ করে রাসেল বলেছেন, 'আমি বিশ্বাস করতে চেয়েছিলাম যে তার এমন কোনও অন্তর্দৃষ্টি আছে যা আমার নেই। তাই সে যখন বলল আমার শান্তিপ্রিয়তার গোপন উৎস আমার রক্তলালসারই মধ্যে, আমি ভাবলাম হবেও বা। ঘণ্টা চব্বিশেক ধ'রে ভাবলাম আমার বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই; স্থির করলাম আত্মহত্যাই করব।' — 'পোর্ট্রেট্স্ ফ্রম্ মেমরি', পৃ. ১০৭।

মনীষী রাসেলের আড়ালে রয়েছেন এই জটিল মানুষ রাসেল। অল্পদিন হল তাঁর আত্মজীবনী বেরিয়েছে, অনেক অকপট স্বীকারোক্তি তার নানান পাতায়। পরিণতবয়সে তিনি যে লেডি অটোলিন্ মোরেল্‌কে ভালোবেসেছিলেন, সে কথাও গোপন রাখেন নি। সে ভালোবাসা নিতান্ত কামগন্ধবর্জিতও ছিল না, যদিও তাঁদের পারিবারিক জীবন ছিল ভিন্ন। অটোলিন যেদিন তাঁকে জানিয়েছিলেন রাসেলকে তিনি গভীরভাবে ভালোবাসেন, রাসেল বলেছেন সেদিন তাঁর এক আশ্চর্য নতুন অনুভূতি হয়েছিল। এই সেই রাসেল, যিনি অসংকোচে বলতে পারেন 'মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের বনিয়াদ তার মননশক্তির মধ্যে হলেও তাই তার সবটুকু নয়। বিশ্বকে বিস্মিত করাই যথেষ্ট নয়। তাকে আবেগের সঙ্গে প্রতিফলিত করতে হবে।'

কিন্তু পরিপূর্ণভাবে স্রষ্টা সাহিত্যিকরূপে যখন তিনি কলম ধরেছেন তখন কোথায় সেই জটিল আবেগের সন্ধান? সে লেখায় চাতুর্য আছে, আছে মার্জিত শ্লেষের অনুকম্পা; কিন্তু যেখানে মনে হয়েছিল আমরা খুঁজে পেতে পারি ডি. এচ্. লরেন্সেরই কোনো সগোত্র সাহিত্যিককে, ধমনীতে যাঁর অসামান্য এক উন্মাদনা, সেখানে কি পাই না ভল্‌তেয়রের এক একেলে উত্তরসাধককে, যিনি আপনার অন্তরতম আকুতিগুলিকে চোখ ঠেরে সরিয়ে রেখে উপস্থিত করেছেন শুধু এক বিচক্ষণ ব্যঙ্গরসিককে? সে তো শুধু তাঁর মুখোশ, তাঁর সরকারী চেহারা, তাঁর 'পাবলিক রোল্'। সাহিত্যিকের কাছে আমরা যে একান্ত সত্যটিকে উপলব্ধি করতে চাই, সেটি কোথায়?

রাসেল আমাদের শেষ দাবী মেটান নি। বলা যেতে পারে তিনি তাঁর চিত্তের সিংহদরজাতেই আমাদের

বসিয়ে রেখেছেন, অন্দরমহলে নিয়ে যান নি। ফলে সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর কাছে আমরা পেয়েছি হয় অলংকৃত মনস্বিতা নয় শীলিত ব্যঙ্গ। কখনো একই রচনায় দুটিই পেয়েছি— যেমন তাঁর 'মুক্তমানুষের উপাসনা' —'এ ফ্রী ম্যান্‌স্ ওয়ার্শিপ্' ১৯০৩। কথিকাটিতে ট্র্যাজেডি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রাসেল উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলছেন :

'সকল শিল্পের মধ্যে ট্র্যাজেডি হল দৃপ্ততম, জয়ীশ্রেষ্ঠ ; কারণ সে তার উজ্জ্বল দুর্গ রচনা করেছে শত্রুর আবাসভূমির একেবারে কেন্দ্রস্থলে, তার উচ্চতম পর্বতের চূড়ায় ; তার দুর্ভেদ্য প্রাকার, তার শিবির ও অস্ত্রাগার, তার বূ্যহ ও গড় থেকে সবই দেখা যায়। ওদিকে যখন মৃত্যু এবং বেদনা এবং নিষ্ঠুর ভাগ্যের সশস্ত্র দাসেরা সেই নির্ভীক নাগরিকদের সামনে নতুন নতুন সৌন্দর্যের দৃশ্য মেলে ধরে, তখনও তার প্রাচীরের মধ্যে মুক্ত জীবনের অবাধ গতি। কী আনন্দময় সেই পুণ্য প্রাকার, কী পরম সুখী সেই সর্বদ্রষ্টা মহত্বের অধিকারীরা। প্রণাম জানাই সেই বীর যোদ্ধাদের, যাঁরা অগণিত যুগের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমাদের জন্য রক্ষা করেছেন স্বাধীনতার সেই অমূল্য উত্তরাধিকার, এবং অপরাজিতের আশ্রয়টুকুকে বিধর্মী দস্যুদের থেকে অকলঙ্ক রেখেছেন।'

এ উচ্ছ্বাস অভিনব নয়, তবে মনকে নাড়া দেয়, সার্থক বাগ্মিতার গুণ এখানে আছে। কিন্তু এর চেয়েও বিশেষত্বমণ্ডিত মনে হয় ঐ প্রবন্ধেরই সূচনায় ভল্‌তেয়রীয় কায়দার সেই রূপককাহিনীটি, মেফিস্টোফেলিসের মুখে সৃষ্টির সেই নতুন ভাষ্য, যেখানে ঈশ্বর ভাবছেন :

'দেবদূতদের অনন্ত স্তবগান ক্রমে ক্লান্তিকর হয়ে উঠতে লাগল ; এ প্রশংসা কি তাঁর পাওনাই নয় ? অসীম আনন্দ কি দেন নি তিনি তাঁদের ? এর চেয়ে আরও মজার লাগবে না কি অপ্রাপ্য স্তুতি পেতে, যাদের তিনি পীড়ন করবেন তাদেরই পূজা নিতে ? মনে মনে হাসলেন তিনি, এবং স্থির করলেন সেই বিপুল নাটক অনুষ্ঠিত হোক।

'যুগ যুগ ধ'রে তপ্ত নীহারিকাপুঞ্জ লক্ষ্যহীন ঘুরে চলল মহাকাশ জুড়ে। ক্রমে তা আকৃতি পেল, তার কেন্দ্রপিণ্ড থেকে ছুটে বেরোল গ্রহমণ্ডলী। গ্রহগুলি শীতল হল, ফুটন্ত সমুদ্র আর জ্বলন্ত পর্বতশ্রেণী দুলতে লাগল, কাঁপতে লাগল, কালো কালো মেঘের পুঞ্জ থেকে তপ্ত বৃষ্টির স্রোত প্রায়-কঠিন স্তরটিকে প্লাবিত করে দিল। তখন প্রাণের প্রথম কণিকা জন্ম নিল সমুদ্রের জলে, দ্রুত বেড়ে উঠল বিশাল অরণ্যদ্রুমের ফলদায়ী উত্তাপের মধ্যে, স্যাঁৎসেঁতে পাঁকের মধ্যে গজিয়ে উঠল প্রকাণ্ড ফার্নগাছের দল, সামুদ্রিক দানবেরা জন্ম নিল, লড়াই করল, পরস্পরকে গ্রাস ক'রে লুপ্ত হল। নাটক এগিয়ে চলল। সেই দানবদের থেকে জন্ম নিল মানুষ, তার চিন্তাশক্তি নিয়ে, তার ভালোমন্দের বোধ নিয়ে, তার আরাধনার অশান্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। এবং মানুষ দেখল এই পাগল, বিকট জগতে সবই মিলিয়ে যায়, সবাই সংগ্রাম করে যেভাবে হোক কয়েক মুহূর্ত প্রাণকে আঁকড়ে রাখতে মৃত্যুর অমোঘ বিধানের থেকে। তখন মানুষ বলল, নিশ্চয় এর মধ্যে গোপন কোনো উদ্দেশ্য আছে, তাকে আমাদের জানতে হবে, তাকে মহৎ ব'লে মানতে হবে। আমাদের শ্রদ্ধা শিখতে হবে, অথচ এই দৃশ্যমান জগতে যে কিছুই নেই শ্রদ্ধা করবার মতো। তাই মানুষ এই অশান্ত সংগ্রাম থেকে সরে দাঁড়াল, ভাবল ঈশ্বর চান যে মানুষই আপন প্রয়াসে ধ্বংসের মধ্য থেকে শৃঙ্খলা আনবে। ঈশ্বর তাকে যে প্রবৃত্তিগুলি জন্তুর উত্তরাধিকাররূপে দিয়েছিলেন তাদের সে পাপ নাম দিয়ে দমন করতে চাইল, এবং ঈশ্বরের কাছে মার্জনা চাইল সেই পাপগুলির জন্য। অবশ্য তার সংশয়

রইল যতদিন না সে ঈশ্বরের রোষ প্রশমিত করতে পারছে ততদিন সে তাঁর কৃপা পাবে কিনা। তাই বর্তমানকে খারাপ দেখে সে তাকে করে তুলল আরও খারাপ, যাতে ভবিষ্যতে সে আরও ভালো হতে পারে। এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাল, কারণ তিনি তাকে শক্তি দিয়েছেন তার সম্ভব সুখগুলিকেও পরিহার করবার। ঈশ্বর হাসলেন ; এবং যখন তিনি দেখলেন যে ত্যাগে ও তপস্যায় মানুষ অবশেষে নির্মল হয়েছে, তখন আর-একটি সূর্যকে পাঠালেন আকাশপথে, মানুষের সূর্যকে চৌচির করে দেবার জন্যে। সব কিছু আবার ফিরে গেল সেই প্রথম ছায়াপুঞ্জে।

'মাথা নেড়ে তিনি মৃদু মৃদু বললেন, হ্যাঁ, নাটকটি ভালোই উৎরেছে ; আবার এটিকে অভিনয় করাতে হবে।'

এ লেখায় বাহাদুরি আছে, প্রত্যয় ততটা নেই। বেপরোয়া এই ব্যঙ্গ, তার তির্যক্ কটাক্ষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি অভিমান ও মানুষের প্রতি মমতা দুইই মিশে রয়েছে। কিন্তু তার প্রকাশের মধ্যে কোথায় যেন একটি ফাঁকির, একটি অতিসারল্যের, একটি কৃত্রিমতার সুরও ধরা পড়ছে। এ যেন অন্তরঙ্গ অনুভূতিগুলিকে কোনও অভ্যস্ত ভঙ্গীর আড়ালে গোপন ক'রে রাখবার প্রচ্ছন্ন প্রয়াস। এর কারণ কী? সহজাত কোনও কুণ্ঠা? যেহেতু অন্তরতম অনুভূতিগুলিকে গাণিতিক কোনও ধ্রুবত্ব দেওয়া যায় না, তাই কি তাদের নূতন সৃষ্টিশীলতার পথে ঠেলে দিতে, নূতন কোনো প্রকাশমূর্তি দিতে অনিচ্ছা? তার বদলে ফাঁকি দিয়ে ঈশ্বরের এই কুশপুত্তলিকা নির্মাণ অনেক সহজ, তাতে সন্দেহ নেই। এবং ঠিক এই জিনিসই ঘটেছে রাসেলের শেষবয়সের গল্পের বই দুটিতে। নরকের কথা, শয়তানের কথা সেসব গল্পে নানাভাবে উঠেছে। কিন্তু ঐ ঈশ্বরের মতো এই শয়তানও যেন গল্পলেখকের কল্পনামাত্র, আজগুবি এবং অসত্য। তাকে খতম করাও সেইজন্যে অতি সহজ। 'শহরতলীতে শয়তান' কাহিনীর ডাক্তার ম্যালাকো অকল্যাণের প্রতিরূপ, নানা কুফন্দি দিয়ে নানা লোককে তিনি বিপথে নিয়ে যান ; কিন্তু এ গল্পের নায়কের পক্ষে তাঁকে নিধন করা কিছুই কঠিন নয়, একটি পিস্তলের গুলিতেই তা সম্ভব হয়। তেমনি অনায়াসেই 'প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের দুঃস্বপ্ন' বইয়ের দার্শনিকপ্রবর শয়তানকে নির্মূল করেন। কারণ যেহেতু তিনি জানেন শয়তান আসলে নেতিভাবেরই প্রতীক তাই তিনি সিদ্ধান্ত করেন এবার থেকে সবরকম নেতিবাচক শব্দ এড়িয়ে চলবেন। বাস্, শয়তানের অস্তিত্ব চিরবিলুপ্ত হতে আর বাধা থাকে না। স্বপ্নের শয়তানকে ঠাণ্ডা করতে অবশ্য এসব ফন্দিই যথেষ্ট, কিন্তু সত্যের শয়তান? তার সম্পর্কে এসব গল্পে রাসেল স্পষ্টতঃ কিছু বলতে নারাজ। অবশ্য এ কথা ঠিক যে প্রথমোক্ত গল্পটির নায়ক ডাক্তার ম্যালাকো-কে খুন ক'রেও বিবেকজ্বালায় জ্বলতে থাকে। কিন্তু যেহেতু তার অপরাধের কথা কেউ জানে না, সবাই তাকে পাগল ঠাউরেই ক্ষান্ত থাকে। ঐ পর্যন্তই।

এসব গল্পের চরিত্র আসলে অনেকটা জ্যামিতির চিহ্নগুলির মতো। তাদের হৃদয়াবেগ স্পষ্ট বা সত্য হয়ে ওঠে নি। অর্থাৎ এ গল্পগুলি ঠিক প্রাণের কেন্দ্র থেকে উদ্ভূত হয় নি, হয়েছে আইডিয়ার ভিত্তিভূমি থেকে। রাসেল গল্পগুলিতে সরাসরি অভিজ্ঞতা নিয়ে ততটা লিপ্ত হন নি, যতটা খেলা করেছেন অভিজ্ঞতার প্রতিমূর্তি নিয়ে— আইডিয়া নিয়ে। মালার্মে-র কথাটা এ সময় তিনি মনে রাখলে পারতেন— কবিতা আইডিয়া দিয়ে লেখা হয় না। আর শেক্‌সপিয়রের সেই উক্তিটিও : 'পাগল প্রেমিক আর কবি— কল্পনাই এদের সংহতি ; তাদের সৃষ্টিশীল খেয়ালিপনা অনেক-কিছু ধরতে পারে, শীতল যুক্তির যা অগম্য।'

এ কথা মনে রেখে গল্পকার রাসেল যদি তাঁর উত্তপ্ত অশান্তিগুলিকে শীতল ব্যঙ্গ বা পরিচ্ছন্ন কৌতুকে অনূদিত ক'রে নিতে না চাইতেন তবেই যেন আরও অনেক ভালো হত।

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

রাসেলের জীবন ও সাধনা

আর্ল্ রাসেলের মহাপ্রয়াণকে চিন্তাজগতের শতাব্দীর সূর্যাস্তের সঙ্গেই তুলনা করা চলে। তিনি তাঁর দীর্ঘ ৯৭ বৎসরের জীবনের মধ্যে প্রায় ৮০ বৎসর চিন্তাজগতের দিকে-দিকে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। রাষ্ট্রব্যবস্থা, যুদ্ধ, বিশ্বশান্তি, সমাজ, ধর্ম, নীতিশাস্ত্র, ঈশ্বরবিশ্বাস ও নরনারীর সম্পর্ক প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে তাঁহার চিন্তাধারা ও মতবাদ ধর্মসংস্থায় সমাজে রাষ্ট্রব্যবস্থায় এবং প্রায় সর্বক্ষেত্রে বিপ্লববহ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিল। জীবন ও সমাজের সর্বস্তরে গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন; এবং তজ্জন্য তাঁহাকে প্রভূত নিন্দা অপবাদ ও অবমাননার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। কিন্তু কোনো নিন্দা বা অপমান তাঁহাকে নিজের মত ও পথ হইতে তিলমাত্র বিচ্যুত করিতে পারে নাই। জীবনে তিনি বহু বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নিন্দা ও স্তুতি তাঁহার উপর সমান ভাবেই বর্ষিত হইয়াছে। তিনি সমাজদ্রোহী রাষ্ট্রদ্রোহী এবং ধর্মদ্রোহী বলিয়া ধিক্কৃত হইয়াছেন। আবার দেশে-দেশে পাশ্চাত্যের বিবেকবাণীরূপে তিনি বন্দিতও হইয়াছেন।

বারট্রাণ্ড রাসেল ১৮৭২ খৃস্টাব্দে ১৮ মে বেডফোর্ডের বিখ্যাত রাসেল-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সপ্তদশ শতাব্দী হইতে এই রাসেল-বংশই বেডফোর্ডের ডিউক-বংশ বলিয়া পরিচিতি লাভ করিয়াছিল। তিন বৎসর বয়সে পিতৃমাতৃহীন হইয়া রাসেল পিতামহ লর্ড জন রাসেল কর্তৃক লালিত-পালিত হইয়াছিলেন। লর্ড জন মহারানী ভিক্টোরিয়ার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। রাজভক্ত এবং উদার মতাবলম্বী (liberal) পিতামহের নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে বিদ্রোহী মনের অধিকারী না হইলেও বারট্রাণ্ড সম্ভবতঃ তাঁহার অন্য এক পূর্বপুরুষ লর্ড উইলিয়ম রাসেলের আশীর্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া লর্ড উইলিয়ম রাসেল প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

বাল্যকাল হইতেই রাসেল শিক্ষায় মনোযোগী ছিলেন। গণিতশাস্ত্রের উপর তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাঁহার নিজের উক্তিমত মাত্র একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালেই তিনি গণিতের মূলনীতির পরিচয় পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলেন। পঠদ্দশায় এক সাধারণ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া রাসেল কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজে পাঠ করিবার জন্য বিশেষ বৃত্তিলাভ করেন এবং পরে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের শেষ পরীক্ষায় প্রথমশ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া অনেককেই বিস্মিত করিয়াছিলেন। ১৯০৮ খৃস্টাব্দে মাত্র ৩৬ বৎসর বয়সেই তিনি বিলাতের শিক্ষা ও গবেষণা -বিষয়ক সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি-পরিষদ রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হইয়াছিলেন। প্রথমজীবনে তিনি গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপনা ও গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। প্রায় ঐ সময়েই তিনি বিলাতের সর্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা রয়েল হিউমেন সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত হন।

১৯১০ খৃস্টাব্দে রাসেল তদীয় গণিতের অধ্যাপক হোয়াইটহেডএর সহযোগিতায় তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ ***Principia Mathematica*** রচনা করিয়া বিশ্বের বিদ্বৎসভায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই পুস্তক ব্যতীত তিনি সমাজ রাষ্ট্রনীতি বিশ্বশান্তি দর্শন তর্কশাস্ত্র প্রভৃতি বহু বিষয়ে বহু প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি রচনা করিয়াছেন। তিনি সাহিত্যেও নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

১৯৩১ খৃস্টাব্দে তাঁহার ভ্রাতার মৃত্যুর পরে বারট্রাণ্ড বংশের তৃতীয় আর্ল পদবী লাভ করেন। তিনি বিলাতের প্রসিদ্ধ সমাজবাদীদল ফেবিয়ান সোসাইটির একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। স্ত্রীলোকদিগের ভোটাধিকার এবং পৃথিবীর সর্বত্র অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রচলনের আন্দোলনে তিনি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। ভারতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তাঁহার অবদান ছিল। ভারতে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন উদ্দেশ্যে গঠিত বিলাতের ইণ্ডিয়া লীগ নামক প্রতিষ্ঠানের তিনি চেয়ারম্যান ছিলেন। Civil Disobedience Movement অর্থাৎ গণ-সত্যাগ্রহ আন্দোলনের উপর তাঁহার গভীর বিশ্বাস ছিল।

বিলাতের পার্লিয়ামেন্টের নির্বাচনে তিনি তিন বার অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু নির্বাচনে সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই।

১৯৬৭ খৃস্টাব্দে তিনি আত্মজীবনী রচনা করেন। উক্ত পুস্তকে তিনি নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন যে প্রেমের তৃষ্ণা, জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা এবং সাধারণ মানুষের দুঃখদুর্গতির প্রতি অসহনীয় বেদনাবোধ—এই তিনটি প্রবৃত্তি তাঁহাকে সারাজীবন স্থির থাকিতে দেয় নাই। ***Marriage & Morals*** নামক পুস্তকে তিনি গতানুগতিক বিবাহপ্রথা লোপ এবং নরনারীর স্বাধীন যৌনজীবনের সপক্ষে বহু যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। উক্ত পুস্তক প্রকাশের ফলে তাঁহাকে বিশেষ নিন্দার ভাগী হইতে হইয়াছিল। এমনকি পরে যুক্তরাষ্ট্রে তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত মোকদ্দমায় আদালত তাঁহার বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করায় যুক্তরাষ্ট্রের নানাস্থানে তৎকর্তৃক বক্তৃতা প্রদানের পূর্ব নির্ধারিত ব্যবস্থাগুলি পরিত্যক্ত হয়।

রাসেলের জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে বিরাট গণিতপ্রেমিক করিয়াছিল। গণিতের কঠিন সমস্যার সমাধান -মুহূর্তেও তিনি রোমাঞ্চকর আনন্দ অনুভব করিতেন। গণিতশাস্ত্রে অনুরাগ তাঁহাকে মাত্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ্‌দিগের অন্যতম করিয়াছিল তাহা নহে, Mathematical Logic অর্থাৎ গাণিতিক তর্কশাস্ত্রের গবেষণা করিয়া তিনি চিন্তারাজ্যের এক নূতন দিগন্তে আলোকপাত করিয়াছিলেন। তৎপ্রবর্তিত Symbolic Logic পৃথিবীর সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পাঠ্য-বিষয়ে পরিণত হইয়াছে।

সাধারণ মানুষের দুঃখদুর্গতির প্রতি অসহনীয় বেদনাবোধের জন্যই বোধ হয় বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তিনি অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথমজীবন হইতেই তিনি শান্তিবাদী ও যুদ্ধ-বিরোধী ছিলেন। প্রথম-বিশ্বযুদ্ধে যুদ্ধ-বিরোধী ভূমিকা লইবার ফলে তাঁহাকে কারাবরণ করিতে হইয়াছিল। কারাগারে অবস্থানকালে তিনি ***Introduction to Mathematical Philosophy*** নামক বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। হিটলারের নাৎসি জার্মানীর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত তিনি একান্তভাবে যুদ্ধবিরোধী ছিলেন। কিন্তু হিটলারের কার্যক্রম বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত করিবে এই ধারণার বশবর্তী হইয়া তিনি সৈন্যদলে নাম লিখাইবার বাসনাও ব্যক্ত করিয়াছিলেন। আণবিক অস্ত্রে হিরোশিমা ধ্বংসের ফলে তিনি

অন্তরে বিশেষ আঘাত পাইয়াছিলেন। সেজন্য জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আণবিক অস্ত্র নির্মাণ ও আণবিক অস্ত্র ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। আণবিক অস্ত্র নির্মাণ ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করিবার জন্য একশত জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লইয়া গঠিত জাতীয় সংস্থার (National Committee of 100 for Nuclear Disarmament) তিনি সভাপতি ছিলেন। হাইড্রোজেন বোমা নির্মাণ ও ব্যবহার এবং কিউবার আণবিক ঘাঁটি স্থাপনের ব্যাপারেও তাঁহার প্রতিবাদ সোচ্চার হইয়া উঠিয়াছিল। ভিয়েৎনামে বোমাবর্ষণজনিত লোকক্ষয়ের জন্য আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ৯০ বৎসর বয়সেও তিনি এমন প্রতিবাদ-আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন যে তাঁহাকে সংযত করিবার জন্য কর্তৃপক্ষ দুঃখের সহিত তাঁহাকে বন্দী করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিশ্বশান্তির পূজারী মানবদরদী এই মানুষটিকে সর্বদেশের সর্বকালের মানুষ শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির দর্শন-বিভাগেও তাঁহার বিরাট প্রতিভা ও চিন্তাশীলতার স্বাক্ষর রহিয়াছে। তাঁহার জীবনী এবং জীবনাদর্শের ইতিহাস হয়তো অনেকেরই অজ্ঞাত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বরেণ্য দার্শনিক রূপে তিনি সর্বত্র পূজিত হইয়াছেন।

প্রধানত: Idealism বা ভাববাদী দর্শনের বিরোধিতার জন্যই রাসেল দর্শনের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। যদিও এই অস্থিরমতি মানুষটিকে ইউরোপীয় অনেক মনীষীই প্রভাবান্বিত করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার সহযোগী অধ্যাপক মূর'কে (G. E. Moore) তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং বহুক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক বলা চলে। অবশ্য পরের যুগে উভয়ের দর্শনচিন্তা বিভিন্ন পথে প্রবাহিত হইয়াছিল। এমনকি তাঁহার পূর্বোক্ত সহযোগী এবং অধ্যাপক হোয়াইটহেডের সঙ্গেও মতপার্থক্য দেখা দিয়াছিল। যুক্তরাষ্ট্রে Neo-Realist বা নয়া বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী Perry, Holt প্রভৃতি এবং pragmatist অর্থাৎ প্রয়োগবাদী James প্রভৃতি দার্শনিকগণও তাঁহার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে অবধূত কর্তৃক জগৎ এবং সমাজের সর্বস্তর হইতে অসংখ্য গুরুকরণের কাহিনী প্রচলিত আছে। রাসেলের জীবনেও অবধূতের মত অসংখ্য গুরুকরণের প্রবৃত্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। মনোমত হইলে যে কোনো মত বা পথ গ্রহণ করিতে তিনি দ্বিধা বোধ করিতেন না। সেজন্য তাঁহার বিভিন্ন পর্যায়ে রচিত গ্রন্থাদিতে বিভিন্ন জটিল প্রশ্নের মীমাংসায় বহুক্ষেত্রে তিনি পরস্পরবিরোধী মত প্রকাশেও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। এই কারণে বিদ্বৎসমাজে রাসেল সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে রহস্য ছলে অনেকেই প্রশ্ন করিয়াছেন: Russell of which year ? অর্থাৎ কোন্ সময়ের রাসেল ?

Mathematical Logic বা *Symbolic Logic* রাসেলের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থ বিরাট প্রতিভা এবং চিন্তাশীলতার নিদর্শন। তাঁহার মত চঞ্চলপ্রকৃতির মানুষের পক্ষে এই-জাতীয় গ্রন্থ রচনা সত্যই বিস্ময়কর। অবশ্য, অন্যান্য গ্রন্থেও তাঁহার ক্ষুরধার বুদ্ধি এবং রম্য-রচনাকুশলতার পরিচয় আছে। গণিত ব্যতীত জড়বিজ্ঞানের প্রতিও তাঁহার যথেষ্ট আকর্ষণ ছিল। তিনি গণিতশাস্ত্রকে তর্কশাস্ত্রের পর্যায়ে আনয়ন করিয়া দর্শন আলোচনায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রচলনের চেষ্টা করিয়াছেন, এবং এই কার্যে নূতনভাবে সংগঠিত তর্কশাস্ত্রকেই প্রধান অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়াছেন। দুরূহ দর্শনশাস্ত্রের আলোচনায় রাসেল যে ভাষার প্রচলন করিয়া গিয়াছেন তাহা সত্যই অনবদ্য এবং অনুকরণীয়। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা জটিল Mathematical Philosophy সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়া তৎপরিবর্তে তিনি epistemology

অর্থাৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার মাধ্যমে জাগতিক বস্তুসত্তা ও তাহার সত্যতা সম্বন্ধে যে তত্ত্বান্বেষণের চেষ্টা করিয়াছেন তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা-সম্ভূত দর্শনকে রাসেলের জগদ্দর্শন বলা চলে। এই আলোচনার পূর্বে আমাদের জানিয়া রাখা ভালো যে রাসেলের দার্শনিক মতবাদ Realism বা বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ। এই মতবাদে প্রত্যেক জাগতিক বস্তুর স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তার স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং কোনো বস্তু জ্ঞানের বিষয় না হইলেও তাহার অস্তিত্ব ব্যাহত হয় না। স্বীয় মতবাদ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে রাসেল আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্য লইয়াছেন এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহারের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। সে কারণে তাঁহার দর্শনকে Neo-Realism অর্থাৎ নয়া বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদও বলা হইয়া থাকে।

রাসেলের জগদ্দর্শনের প্রথম সূত্র perception অর্থাৎ প্রত্যক্ষজ্ঞান। এই প্রত্যক্ষদর্শনের আলোচনার মাধ্যমে রাসেলের জগৎ-ব্যাখ্যা পরপর তিনটি স্তরে রূপগ্রহণ করিয়াছে। এবং প্রত্যেক পর্যায়ে জগৎ-ব্যাখ্যার ব্যাপারে তিনি অপ্রয়োজনীয় তত্ত্ব পরিত্যাগের নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার এই আলোচনার তিনটি স্তরের ইঙ্গিত বিভিন্ন যুগে রচিত তিনখানি গ্রন্থে পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে *The Problems of Philosophy* গ্রন্থখানিকে প্রথম মনে করা যাইতে পারে। বস্তুসত্তার পরিচয় আমরা কিরূপে পাইয়া থাকি এই গ্রন্থে সে বিষয়ে বিশেষ আলোচনা আছে। তিনি বলেন আমরা বস্তুকে দুইপ্রকার পদ্ধতিতে জানিতে পারি : প্রথম acquaintance অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সরল ও সহজ পরিচয়ে এবং পরে description বা বিবরণের দ্বারা। এই সহজ ও সরল পরিচয় আমাদের বস্তুর সঙ্গে হয় না। বস্তু সংক্রান্ত সেন্স্-ডেটা কর্তৃক ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মনের উপর ক্রিয়ার ফলে মনের sensation বা সংবেদনের সৃষ্টি হয়। এবং এই সংবেদনের অনুভূতির ফলে বস্তুর আইডিয়া বা ধারণা রূপগ্রহণ করে; acquaintance বা সরল পরিচয়ের মাধ্যমে আমরা universal বা সামান্যেরও পরিচয় পাই। Plato এই universal বা সামান্যকে substantive and adjective অর্থাৎ বিশেষ্য ও বিশেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। কিন্তু রাসেল verb and preposition অর্থাৎ ক্রিয়া এবং অব্যয় পদকেও universal বা সামান্যের পর্যায়ে ফেলিয়াছেন। ক্রিয়া এবং অব্যয় পদগুলিকে তিনি independent relations অর্থাৎ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সম্বন্ধ রূপে গণ্য করিয়াছেন। এইভাবে direct acquaintance বা সহজ পরিচয় হইতে প্রাপ্ত সেন্স্-ডেটা এবং universal বা সামান্যের সমন্বয়ে description বা বিবরণের মাধ্যমে আমরা বস্তু সত্তার পরিচয় পাই। কিন্তু বস্তু পাই না।

এই বিবরণ অনুসারে দেখা যায় রাসেল প্রথম পর্যায়ে চতুর্বিধ তত্ত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন; যথা: ১. মন, ২. acquaintance বা সহজ পরিচয়ের মাধ্যমে সেন্স্-ডেটা, ৩. উক্তরূপ সহজ পরিচয় সূত্রে প্রাপ্ত universal বা সামান্য, এবং ৪. বিবরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত physical object বা বস্তু।

কিন্তু এই ব্যবস্থায় স্বতঃই মনে হইতে পারে যে ক্রিয়া এবং অব্যয় পদকে স্বাধীন স্বতন্ত্র এবং বাহ্যিক সম্বন্ধ গণ্য করিলে physical object বা বস্তুসংগঠন করা দুরূহ হইবে। সেজন্য পরবর্তী পর্যায়ে পুনরায় তৎকর্তৃক process of elimination বা পরিত্যাগনীতি অবলম্বিত হইয়াছে।

রাসেলের জগদ্দর্শনের দ্বিতীয় পর্যায়ের সূত্রপাত হইয়াছে *Our Knowledge of the External World* নামক পুস্তকের মাধ্যমে।

ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে perception বা প্রত্যক্ষ দর্শনের বিবরণ দিয়া আলোচনার সূত্রপাত করিয়া রাসেল বলেন যে, অধিকাংশ দার্শনিকই সর্ব প্রথমেই অপরের মনের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একই physical object বা জাগতিক বস্তু বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট এবং বিভিন্ন সময়ে একটি ব্যক্তির নিকট কেন বিভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয় তাহার সুচারু ব্যাখ্যা করা দার্শনিকের পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে প্রথমতঃ subjective idealist অর্থাৎ আত্মগত ভাববাদী physical object বা বস্তু সত্তাই অস্বীকার করিয়া থাকেন এবং অন্যক্ষেত্রে যেখানে বস্তুসত্তা স্বীকৃত হয় সেখানেও বস্তুসত্তা unknown and unknowable অর্থাৎ অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়ই থাকিয়া যায়, যেমন কাণ্টের thing-in-itself মতবাদে প্রকাশ পাইয়াছে। এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির প্রতিকারকল্পে রাসেল এই পর্যায়ে physical object বা বস্তুকেই পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু বস্তুসত্তা পরিত্যক্ত হইলেও রাসেলের জগৎসত্তার অবলুপ্তি ঘটে নাই। কারণ বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে সেন্‌স-ডেটাগুলির appearance বা অবভাসের লোপ হয় না। এইরূপ বিভিন্ন ভাবে প্রতিফলিত সেন্‌স-ডেটাগুলির সমষ্টির রূপকেই তিনি physical object বা বস্তুরূপে গণ্য করিয়াছেন। এবং তিনি আরও বলিয়াছেন যে এই অসংখ্য pespective হইতে প্রত্যক্ষভূত অসংখ্য sense-data রূপবস্তু-জগতের সত্তা logical construction অর্থাৎ তর্কশাস্ত্রসংগত সংগঠন হইলেও এইগুলি non-mental অর্থাৎ মনের অংশমাত্র নহে।

রাসেলের তৃতীয় পর্যায়ের জগৎ-ব্যাখ্যা আমরা তাঁহার *Analysis of Mind* নামক গ্রন্থে পাই। এই তৃতীয় পর্যায়েও রাসেল পরিত্যাগনীতি প্রয়োগ করিয়া sense-data এবং তৎকর্তৃক মনের মধ্যে উদ্ভূত (অর্থাৎ অনুভূত) sensation বা সংবেদনের পার্থক্যের অবসান ঘটাইয়াছেন।

জড় ও চৈতন্য বা মনের পৃথক্ অস্তিত্ব যুগে যুগে স্বীকৃতি পাইয়াছে এবং এখনও সে পৃথক্ অস্তিত্ব লুপ্ত হয় নাই। কিন্তু জড়বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের প্রভূত গবেষণার ফলে বর্তমানে জড় ও মনের পার্থক্য অনেক দূরীভূত হইয়াছে। জড় প্রায় অজড়ে এবং মন প্রায় অমানসিকতায় পরিণত হইয়াছে। সেজন্য জড় ও মনের পার্থক্য রোধ করিয়া রাসেলের বিজ্ঞানীমন উভয়কে অন্য এক মৌলিক তত্ত্বের particulars অর্থাৎ উপাদান বা স্বতন্ত্র অংশ রূপে গণ্য করিয়াছেন। উক্ত মৌলিক তত্ত্বের তিনি নাম দিয়াছেন Neutral Monism বা নিরপেক্ষ অদ্বৈতবাদ। এই মতানুসারে একই মৌলিক পদার্থের কতকগুলি স্বতন্ত্র অংশের একপ্রকার সমন্বয়ের ফলে জড়জগৎ এবং অন্যপ্রকার সমন্বয়ের ফলে মনোজগতের সৃষ্টি।

রাসেলের জগদ্দর্শনের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এই নিরপেক্ষ অদ্বৈতবাদের ইঙ্গিত রাসেল সম্ভবতঃ আমেরিকার নয়া বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।

এইবার রাসেলের ঈশ্বরদর্শন এবং জীবনদর্শনের কথা।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে তর্কচূড়ামণি রাসেলের তর্কশাস্ত্রে ঈশ্বরের স্থান নাই। বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী রাসেলের পক্ষে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা সম্ভব হয় নাই। কারণ ঈশ্বরকে fact বা স্বতন্ত্র স্বাধীন

বস্তু বা ব্যক্তির পর্যায়ে আনা যায় না। আরও তিনি বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর আমাদের আদর্শ স্থানীয় এক কল্পনারই বস্তু। *Philosophical Essays* নামক গ্রন্থের Freeman's Worship নামক প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে Freeman বা স্বয়ং স্বাধীন মানুষ এক সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীন কাল্পনিক ভগবানেরই পূজারী। পরম মঙ্গলের প্রতি আমাদের আন্তরিক আকর্ষণের জন্য যে ঈশ্বরকে আমরা কল্পনায় সৃষ্টি করি সেই ঈশ্বরকেই যথানিয়মে পূজা করিবার এবং যে কাল্পনিক স্বর্গ আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলি স্মরণ করাইয়া দেয় সেই স্বর্গকে শ্রদ্ধা দেখাইবার স্বাধীনতাই সত্য স্বাধীনতা।

রাসেলের এই বক্তব্যের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই যে তাঁহার ন্যায়-দর্শনের দ্বার ঈশ্বর বা অমরত্বের জন্য চিররুদ্ধ। তিনি আরও বলিয়াছেন— জগৎ একটি magic show অর্থাৎ ইন্দ্রজালিকের মায়ার খেলা। মায়াবীর এই রঙ্গমঞ্চে God has no part and no lot অর্থাৎ ঈশ্বরের কোনো স্থানও নাই কোনো পাঠও নাই। আর এই জগৎও সম্পূর্ণ পচিয়া গিয়াছে— The world is rotton to the core।

উক্ত পুস্তকে মানবজীবন সম্বন্ধে রাসেল বলিয়াছেন—

> অমানিশার নিবিড় অন্ধকারে অদৃশ্য শত্রু পরিবৃত অবস্থায় ব্যথা বেদনা ও ক্লান্তির পীড়নে পীড়িতচিত্তে অনন্তপথের সুদীর্ঘ পদযাত্রাই মানুষের জীবন। এই যাত্রাপথের উদ্দিষ্টস্থানে পৌছান সম্ভব নহে: আর পৌছিলেও সেখানে অপেক্ষা করিবার উপায় নাই। এক নিষ্ঠুর যান্ত্রিক শক্তি ক্রীড়ার ছলে মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছে; আবার ক্রীড়ার ছলেই মানুষকে ধ্বংস করিয়া চলিয়াছে। যেখানে পাশবিক শক্তিই শেষ কথা সেখানে ন্যায় নীতি দয়া আনুগত্য প্রভৃতি একান্তই অর্থহীন।

মানবজীবনের এই করুণ চিত্র এক বিরাট বিদ্রোহী মনীষীর করুণ আর্তনাদেরই প্রতীক।

অবশ্য এই পরিস্থিতি হইতে মুক্তি পাইবার পথনির্দেশও তিনি দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে দুঃখ দুর্দশা ও দুর্বিপাকে ভরা জগৎকে বিস্মৃত হইবার জন্য আমাদিগকে শুদ্ধ ও গভীর চিন্তায় মনোনিবেশ করিতে হইবে এবং এই জগতের পরিবর্তে সেই আনন্দময় জগৎসৃষ্টির চেষ্টা করাই কাম্য হইবে যেখানে কবির কাব্যের অবগুণ্ঠনের আবছায়ার রাজ্যে নিত্য নূতন সৃষ্টি আমাদের অশান্ত হৃদয়ের জ্বালা যন্ত্রণা নিবারণ করিয়া জীবনের নূতন মূল্যমান সৃষ্টির সহায়তা করিবে।

রাসেলের শিক্ষাসংস্কৃতির বিরাট অবদানের কণামাত্র এখানে উপস্থাপিত হইল। সমাজজীবনের বিভিন্ন স্তরের সমস্যার সমাধান-কল্পে এবং দর্শনচিন্তায় তাঁহার অমূল্য অবদান দীর্ঘকাল জিজ্ঞাসুমনের প্রেরণা জোগাইবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

নন্দদুলাল গঙ্গোপাধ্যায়

STUDIES IN WESTERN INFLUENCE ON 19TH CENTURY BENGALI POETRY, 1867-1887, Harendramohan Das Gupta, Semushi, Calcutta, Rs 15/.

স্বর্গত হরেন্দ্রমোহন দাশগুপ্তের এই চিন্তাসমৃদ্ধ গ্রন্থখানা প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৫ সনে। কয়েক বৎসর যাবৎই বইখানা বাজারে আদৌ পাওয়া যাচ্ছিল না। ইদানীং অনেকেই উনিশ শতকী বাংলা সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করছেন, সে আলোচনা প্রসঙ্গে হরেন্দ্রবাবুর প্রতিপাদ্য বিষয় অনিবার্য ভাবে এসে পড়ে। বাংলা সংস্কৃতির ও সাহিত্যের যে আশ্চর্য পুনরুজ্জীবন উনিশ শতকের মধ্যভাগে ভাস্বর হয়ে উঠেছিল তার অন্যতম মুখ্য প্রেরণা এসেছিল ইউরোপের সঙ্গে বাংলার সংস্পর্শ থেকে, অতএব গত শতকের বাংলা কাব্যের প্রকৃতি ও মূল্যের আলোচনায় এই কাব্যের উপরে পাশ্চাত্য কাব্যের প্রভাব বিশ্লেষণ করা একান্ত আবশ্যক। কয়েক জন মনীষী এ ধরণের আলোচনা করেছিলেন গত শতকেই: বরদাচরণ মিত্র, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, প্রমথনাথ বসু। বর্তমান শতাব্দীর চতুর্থ দশকে দু খানা মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল: প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের *Western Influence in Bengali Literature* (১৯৩২) এবং হরেন্দ্রমোহনের গ্রন্থটি।

শিরোনামায় যদিও Western Influence কথাটি প্রযুক্ত হয়েছে, বস্তুত এই প্রভাব ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব বলেই আলোচিত হয়েছে; অন্যান্য আধুনিক ইওরোপীয় সাহিত্যের আলোচনা এখানে নেই— ফরাসী, জার্মান, পোর্তুগীজ ইত্যাদি। এই ইংরেজি-কেন্দ্রিকতা আসলে ঐতিহাসিক তথ্য। উনিশ শতকের বাঙালী লেখক ইওরোপীয় ভাষার মধ্যে ইংরেজি ভাষা, ইওরোপীয় সাহিত্যের মধ্যে ইংরেজি সাহিত্যই জানতেন, অতএব তাঁর সৃজনী জীবনের উপরে যেটুকু ইওরোপীয় প্রভাব পড়েছিল, সেটুকু ইংরেজি সাহিত্যেরই প্রভাব। হরেন্দ্রমোহন সংগত কারণেই বাঙালী কবির কাব্যে ইংরেজি রোমান্টিক কাব্যের ও ভিক্টরীয় কাব্যের প্রভাব দেখতে পেয়েছেন। যে ক্ষেত্রে এই প্রভাব ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের সীমানা ছাড়িয়ে গেছে—মাইকেলের কাব্যে—সেখানে তিনি হোমর, ভার্জিল, দান্তে, তাস্‌সো প্রভৃতি কবির কাব্যের সুষ্ঠু আলোচনা করেছেন।

হরেন্দ্রমোহনের এই মূল্যবান গ্রন্থটি দ্বিতীয় বার পড়ার কালে আমার কয়েকটি কথা মনে হয়েছে। প্রথম কথা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ব্যাপারে প্রভাব নামক নির্বস্তুক সত্তাটি কী ভাবে নিরূপিত হতে পারে। আমি যে কোনও একটা প্রভাব লক্ষ্য করছি সেটা কি আমার সব্‌জেক্টিভ্‌ ধারণা প্রসূত নয়, অথবা কোনো গতানুগতিক মতের শিথিল পুনরাবৃত্তি নয়? ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে প্রভাব মেনে নেওয়া সম্ভব হতে পারে যখন ঋণী কবির রচনায়—তাঁর কাব্যে, চিঠিপত্রে, বা অন্য কোনও রকম নথিপত্রে—মহাজন কবি সম্বন্ধে নিঃসংশয় উল্লেখ পাওয়া যায়। আমার বয়স যদি কম হত তাহলে আমি উনিশ শতকী বাঙালী কবিদের Readingsএর (তাঁদের পঠিত গ্রন্থাবলীর) এক সপ্রমাণ তালিকা প্রস্তুত করতাম, এই তালিকার তুলনায় প্রভাব-আরোপের সদ্বিচার হতে পারত। এই সঙ্গে অবশ্য এ কথাও বলা একান্ত আবশ্যক যে সাহিত্যের শিল্পের আলোচনায় আমরা কখনই শুধুমাত্র তথ্যে আবদ্ধ থাকতে পারি না। কাব্যের ধর্ম তো রসায়নের ধর্ম অথবা ইতিহাসের বা আইনের ধর্ম নয়। কাব্যের রসাস্বাদনে

সংবেদনা নামক অতীন্দ্রিয় মনোবৃত্তির প্রয়োজন। সংস্কৃত কাব্যালোচনা শাস্ত্রে, ইওরোপীয় রেটরিক্‌স্‌ শাস্ত্রে রুচি, taste-এর মান্যতা শত লক্ষ বার উচ্চারিত হয়েছে। সৎ সমালোচকের পরিচয় তাঁর সুরুচিসম্ভারে। এই সুরুচির কোনো বিকলতা আমি লক্ষ্য করি নি হরেন্দ্রমোহনের গ্রন্থে, যদিও তিনি ক-কবির রচনায় খ-কবির প্রভাব সম্পর্কে কোনও ডকুমেণ্টারি এভিডেন্স্‌ পেশ করেন নি, যে-ধরণের এভিডেন্স আধুনিক সমালোচনায় বহুজনমান্য। পক্ষান্তরে, প্রভাব সম্বন্ধে হরেন্দ্রমোহনের একমাত্র প্রমাণ 'প্যারালেল্‌ প্যাসেজ', সমান্তরাল বাক্‌স্তবক। অসংবেদী চিত্তে সমান্তরাল বাক্‌স্তবক প্রায়ই অগ্রাহ্য সিদ্ধান্তের কারণ হয়। হরেন্দ্রমোহনের সূক্ষ্ম কাব্যবোধ তাঁকে নিয়ত নিয়ে গেছে সুসদৃশ সমান্তরালে। যখন তিনি মেঘনাদবধ কাব্যের প্রভঞ্জনের সঙ্গে ঈনীড-কাব্যের ঈওলাসএর তুলনা করেন, যখন প্রমীলার লঙ্কা-নির্গমনে ও তাস্‌সো-রচিত 'জেরুযালেম ডেলিভার্ড' কাব্যে কামিল্লার বীরযাত্রার সাদৃশ্য লক্ষ্য করেন, মেঘনাদবধ কাব্যের অষ্টম সর্গের সঙ্গে ঈনীড-কাব্যের ষষ্ঠ সর্গের ও দান্তে-রচিত ইন্‌ফার্নোর সমান্তরাল বিচার করেন, মেঘনাদবধ কাব্যের নবম সর্গে ইলিয়াডের চতুর্বিংশতি সর্গের ছায়া প্রতিবিম্বিত দেখেন, তখন তাঁর তথ্যাতীত রুচির প্রশংসা না করে পারা যায় না। তবুও যাঁরা সমালোচনার এই ক্ষেত্রে গবেষণা করছেন তাঁদেব কাছে আমার নিবেদন, সমান্তরাল বাক্‌স্তবকের সাদৃশ্য সম্পূর্ণ গ্রাহ্য হয় তখনই যখন সাদৃশ্যের সমর্থনে কিছু নথিপত্রের নজির পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় কথা। কবির রচনায় কার প্রভাব সেটা কিন্তু মস্ত কথা নয়। একই বাতাসে বেড়ে ওঠে বনস্পতি ন্যগ্রোধ আর সর্পিল জলবিছুটি। প্রভাবের উৎস নয়, প্রভাবের সৃজনী বৈচিত্র্য, প্রভাবের গ্রহণশক্তিই কাব্যামোদীর আসল বিচার্য। যিনি ঋণী কবি তিনি ঋণের সম্পদ নিয়ে করলেন কী, সেই সম্পদকে তিনি স্বকীয় সম্পদে রূপায়িত করতে পারলেন কিনা, সেটাই আসল প্রশ্ন। প্রকৃত কবিত্ব-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি প্রাণরস আহরণ করেন চারদিক থেকে, কিন্তু সে রস অচিরে তাঁর আপন অঙ্গীভূত হয়ে যায়, অন্তঃশক্তি হয়ে যায়, আর বহিঃশক্তি থাকে না। এবং এই সাঙ্গীকরণেই কবির আপন বৈশিষ্ট্য। একই বায়রন-কাব্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন রঙ্গলাল হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র, তিন কবির পক্ষেই উৎস ছিল এক, কিন্তু পরিণাম হল বিভিন্ন। বাঙালী সমালোচকের কাছে আমার নিবেদন যে তাঁরা যখন প্রভাব আলোচনা করেন তখন প্রভাবের সাঙ্গীকরণই যেন তাঁদের প্রধান বিচার্য বিষয় হয়, কেননা এই সাঙ্গীকরণের জ্ঞানেই আমরা ঋণী কবির স্বকীয়তা বুঝতে পারব।

বাংলা কাব্যে পাশ্চাত্য কাব্যের প্রভাব সেই যে হিন্দুস্কুল স্থাপনার কালে শুরু হয়েছিল, আজও তা চলেছে অপ্রতিহত বেগে। যতদূর দৃষ্টি প্রসারিত করতে পারি ভবিষ্যতের দিকে এই প্রভাব চলতেই থাকবে। এই প্রভাবের উৎস ও স্বরূপ বদলাচ্ছে, হয়তো প্রভাবের ব্যাপারটি আর নেহাতই একপথপন্থী নেই, আজ আমাদের সাহিত্যও কিছু প্রভাব বিস্তার করছে পাশ্চাত্য সাহিত্যের উপরে, তা ছাড়া পৃথিবীর কোনো সংস্কৃতি ও সাহিত্যই আর দীর্ঘাচরিত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নেই, থাকতেও পারে না। হরেন্দ্রমোহন যে সংবেদনশীল আলোচনা করেছিলেন আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে, সে আলোচনার জন্যে আজ অনেক সমালোচক এগোচ্ছেন, সাহিত্যের সঙ্গে সংস্কৃতির বৃহত্তর আয়তনের সংযোগ হয়েছে, নতুন কালের চিন্তাবিদ্‌গণ এই পূর্বসূরীর কাজের জন্য কৃতজ্ঞ বোধ করবেন।

অমলেন্দু বসু

বাংলাকাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব। উজ্জ্বলকুমার মজুমদার। সংস্কৃতি প্রকাশন, ১০ হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা ১। মূল্য ১২·০০ টাকা।

এই গ্রন্থে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কবিগোষ্ঠীর রচনায় পাশ্চাত্যপ্রভাব নিরূপণের প্রয়াস আছে। বিষয়টি ব্যাপক এবং কৌতূহলোদ্দীপক। উজ্জ্বলবাবু উনবিংশ শতাব্দের প্রতিনিধি স্থানীয় কবিদের কাব্য গ্রহণ করেছেন। বলা বাহুল্য সকলের রচনা আলোচনা করতে গেলে কথা বেড়ে যায়। বস্তুতঃ বাংলাসাহিত্যে আধুনিকতার সূত্রপাত হয় পাশ্চাত্য রুচিকে গ্রহণ করেই। উনিশ শতাব্দের বাংলা ও বাঙালীর চিন্তায় মননে রুচিতে যে মৌলিক পরিবর্তন ঘটল তার মূলে পাশ্চাত্য-ভাবনাই প্রধান এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায় কদাচিৎ এরকম একটা ভাবনা উঁকি দিলেও তিনি বিদেশের ঠাকুরকে ফেলে দিয়ে স্বদেশে কুকুরকেই প্রাণপণ আঁকড়ে ছিলেন। তাঁরই শিষ্য রঙ্গলাল অভিমান প্রকাশ করেছেন বেথুন সোসাইটিতে, সরবে ঘোষণা করেছেন বাংলাসাহিত্যের মর্ম, আর বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করেছেন বিদেশী রুচির প্রতি। অথচ রুচির যে পরিবর্তন ঘটছে সেই সম্বন্ধে রঙ্গলাল যথেষ্ট সচেতন— 'আমি সর্বাপেক্ষা ইংলণ্ডীয় কবিতার সমধিক পর্যালোচনা করিয়াছি এবং সেই বিশুদ্ধ প্রণালীতে বঙ্গীয় কবিতা রচনা করা আমার বহুদিনের অভ্যাস।'

'ভেক মূষিকের যুদ্ধে'র ভূমিকায় লিখেছেন, 'ইউরোপীয় মহাকবিদের কবিত্বচ্ছটার প্রতিবিম্ব এতদ্দেশীয় সাধারণ জনগণের মানসে প্রতিবিম্বিত করাই আমাদিগের মুখ্য অভিপ্রেত।' উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। তবে রঙ্গলালে পাশ্চাত্যপ্রভাব এমন নয় যে তাঁর আধুনিক মানসিকতা তাঁকে মধুসূদনের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। রঙ্গলালে দ্বিধা কাটে নি। বিদেশের ঠাকুর সম্বন্ধে সংশয় ঘোচে নি। গুরুর প্রভাবও তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি।

হিন্দুকলেজের ছাত্র মধুসূদনই কেবল ইউরোপীয় কবিতার অনুসরণ নয়, সে কাব্যের spirit বাংলা-কাব্যে ফুটিয়ে তুললেন। এদিক থেকে মধুসূদনই আধুনিক কাব্যের ভগীরথ। সেকালের ইংরেজি শিক্ষিত আর পাঁচ জনের মতই মধুসূদন ইংরেজিতে স্বপ্ন দেখেছেন। ফল 'ক্যাপটিভ লেডি' এবং কিছু ইংরেজি কবিতা। বেথুন ও গৌরদাসের অনুরোধে মধুসূদনের স্বপ্ন স্বর্ণলঙ্কা-রচনায় স্থিতধী হল এইরকম মনে করি। অন্য দিকে ইংরেজি স্বপ্ন আসলে আধুনিকতার আগমনী। মিল্টনের মতই মধুসূদনের দেশীবিদেশী ক্লাসিক সাহিত্য মন্থন করার সময় ছিল এইটি। আধুনিকতার জন্ম কেবল একটা আকস্মিক ব্যাপার নয়, তার ভূমিকায় আছে আন্তরিকতা ও গ্রহণক্ষমতা, দৃষ্টির মৌল পরিবর্তন, সর্বোপরি শ্রম। মধুসূদনের কাব্যে তার প্রকাশ। উজ্জ্বলবাবুর গৃহীত কবিবৃন্দের মধ্যে বোধ করি মধুসূদনই সর্বাপেক্ষা বেশি বিদেশী বস্তু বাংলা সাহিত্যে রূপান্তরণে আগ্রহী। তিনি যেন ধ্রুব জানতেন তাঁর কাব্যের পাঠকও সহৃদয় এবং সামাজিক। তাঁরই মত ইংরেজিতে স্বপ্ন দেখেন। তিনি লিখছেন for that portion of my countrymen who think as I think— আর যাঁদের মনে পাশ্চাত্য রুচি দৃঢ়মূল। হোমার, ট্যাসো, ভার্জিল, মিল্টন, ওভিদ মধুসূদনের কাব্যে ভীড় করেছেন। সংক্ষেপে উজ্জ্বলবাবু মধুসূদনের চিঠিপত্রে বিধৃত সেইসব বিদেশী লেখকের তালিকা সংগ্রহ করেছেন যাঁরা মধুসূদনের প্রিয় কবি-সাহিত্যিক। বর্ণনায়,

চরিত্রচিত্রণে, দৃশ্যবিন্যাসে, অলংকার-নির্মাণে সবদিক থেকেই মধুসূদন পাশ্চাত্যরীতিকে মান্য করলেন। বাংলারীতির কবিতায় তাকে যথাসাধ্য আত্মসাৎ করলেন।

মধুসূদনকে অনুসরণ করলেন হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র। কিন্তু মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের spirit হেমচন্দ্র ধরতে পারেন নি। এ থেকেই বোঝা যাবে পাশ্চাত্য প্রভাবের কোনো গূঢ় বাসনাকে মধুসূদন অভিব্যক্তি দিয়েছিলেন। মিল্‌টনের ছন্দের প্রভাবে বাংলা কাব্যে গড়ে উঠল মুক্তির দিগন্ত। আমার মনে হয় উনবিংশ শতাব্দের কবি-সাহিত্যিকবৃন্দের কারো কারো মধ্যে পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুসরণ ঘটেছিল একটা অভিমান থেকে। বিদেশের সাহিত্যের বৈচিত্র্য এবং ঐশ্বর্য আমাদের সাহিত্যের অভাবকে বড় বেশি করে স্পষ্ট করে তুলেছিল। এই অভাব মোচনে অগ্রণী ছিলেন মধুসূদন। সেজন্যেই তিনি মহাকাব্য, সনেট, ওড বাংলাতে প্রতিষ্ঠিত করলেন। প্রেরণা এসেছে সেই Albion's distant shore থেকে। উজ্জ্বলবাবু তাঁর আলোচনায় সেসব দেখিয়েছেন। দান্তে, বায়রন এবং কিছু রোমান্টিক কবির প্রভাব হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের কাব্যেও লক্ষ্য করা যায়।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পাশ্চাত্য রুচিতে কিছু অভিনবত্ব লক্ষ্য করা যায়। দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায় স্বকীয়তা রবীন্দ্রনাথ সহজেই বুঝেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের গানে কবিতায় স্বদেশচর্চার একটা দিক ধরা পড়েছে। উজ্জ্বলবাবু সে কথা বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করেছেন। স্কটল্যাণ্ড ও আয়ার্ল্যাণ্ডের কবিবৃন্দের স্বদেশী সংগীতগুলি দ্বিজেন্দ্রলালের কবিচিত্তে সাড়া জাগিয়েছিল। তাঁদের অনেক গান দ্বিজেন্দ্রলাল অনুবাদ করেছেন। ইংরেজি স্বদেশী সংগীত অনুবাদেও তিনি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তিনি এইসব সংগীত থেকে অনুপ্রেরণা নিশ্চয়ই পেয়েছিলেন। 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে' গানটির উৎস যে Rule Britannia এটি ভাবতে অবাক লাগে। ইংরেজি কবিতার মিল বিন্যাসের অভিনবত্বও দ্বিজেন্দ্রলালকে মুগ্ধ করেছিল। তিনিও ব্যবহার করেছেন মোয়া : ধোয়া, বাধা : গাধা, নাটক : আটক, দুর্গেশনন্দিনী : ভাবতেন বসে তিনি ইত্যাদি। অথচ নানা ব্যঙ্গ কবিতায়, প্রহসনে, প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল পাশ্চাত্য অনুকরণকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছেন। আসলে উনিশ শতকে কবি-সাহিত্যিকবৃন্দ যেমন পাশ্চাত্যবিদ্যা ও পাশ্চাত্য সাহিত্যকে অনুসরণ করেছেন তেমনি উচ্চকণ্ঠ হয়েছেন মেকির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণায়। এঁরা অনুসরণ করেছেন ধীরভাবে বাংলাভাষা এবং বাঙালীত্বকে মান্য করে। রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, কামিনী রায় কবিবৃন্দের রচনায় এবং তাঁদের মানস-সমৃদ্ধিতে পাশ্চাত্যপ্রভাব কখনও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, কখনও তা অন্তঃশীলা। নানা দিক থেকে বিচার করে এ কথা বুঝতে পারি বাংলা কাব্য পাশ্চাত্য প্রভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বাংলা কাব্যের দিগন্ত বিস্তৃতিলাভ করেছে। কখনও বাংলা কবিতায় কেবলমাত্র বহিরঙ্গ শিল্প সাধনে পাশ্চাত্য কবিরা আনুকূল্য করেছেন, কখনও পাশ্চাত্য প্রভাব কোনো কোনো কবির কবিতায় রঙ ধরিয়েছে। কখনও সে প্রভাব অন্তর্গূঢ়। উজ্জ্বলবাবু সেই শিল্পপ্রসাধনকলা লক্ষ্য করেছেন।

পাশ্চাত্য প্রভাব রবীন্দ্রকাব্যে গূঢ় এবং তাৎপর্যমণ্ডিত। রবীন্দ্রকাব্যে বিদেশী প্রভাব নির্ণয় দুঃসাধ্য না হলেও দুরূহ। তাঁর কাব্যের পরিধি ব্যাপক, বৈচিত্র্য অসামান্য, ভঙ্গি বহুধা। অন্যান্য কবির রচনায় বিশেষতঃ ভারতী-গোষ্ঠীর কবি-ঔপন্যাসিকদের রচনায় বিদেশী প্রভাব লক্ষ্য করা যায় প্রায়শই

অনুবাদে, সে অনুবাদ ভাবানুবাদ মূলানুবাদ অথবা স্বাধীন অনুবাদ যাই হোক-না কেন। রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ-কবিতা সংখ্যায় বেশি নয়; উপনিষদের মন্ত্রোদ্ধৃতির মতো যত্রতত্র বিদেশী কবির সাক্ষাৎ রবীন্দ্ররচনায় সুলভও নয়। সেই কারণে উজ্জ্বলবাবুর কাজ এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠিন। রবীন্দ্রনাথের আলোচনায় তিনি তিনজন সমালোচকের রচনা সর্বদা স্মরণে রেখেছেন। সে তিনজন সুনীলচন্দ্র সরকার, বুদ্ধদেব বসু, তারকনাথ সেন। বিদেশী প্রভাব রবীন্দ্রকাব্যে কোন্ সূত্রে এসেছে এবং পাশ্চাত্য কবির প্রেরণা কবির চিত্তগহনে কোন্ আকারে অবয়ব নিয়েছে এসব প্রশ্ন গোড়াতেই মনে আসে। 'রবীন্দ্রনাথের ওপর পাশ্চাত্য প্রভাবের সামান্য অংশমাত্র প্রমাণের অপেক্ষা রাখে, কিছু অংশ আভাসে ইঙ্গিতে অনতিস্পষ্ট। আদর্শ কোথাও কোথাও পাশ্চাত্যের হতে পারে। উপকরণ ও উপস্থাপনা কিন্তু প্রায়ই তাঁর নিজস্ব।' বলা বাহুল্য রবীন্দ্র-সমালোচনাতে এরকম সাবধানতা অনিবার্য।

দেবেন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তায় হেগেল-কাণ্ট-রুশোর সমীকরণ কি রূপ নিয়েছিল উজ্জ্বলবাবু সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করে রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রেরণায় পিতার এই নূতন উপলব্ধি কিভাবে সক্রিয় হয়েছিল তা লক্ষ্য করেছেন। এই প্রেরণা যে খণ্ড কবিতার— লিরিক কবিতার— অনুকূল এবং রবীন্দ্রনাথ যে বারবার সে কথা স্মরণ করেছেন তা কবির কৈশোরকের রচনাগুলিই সাক্ষ্য দেয়। ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী প্রবন্ধেই সে উপলব্ধি স্বীকৃতি লাভ করল। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রচণ্ড ঝড়ের এবং প্রাণাবেগের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে এই প্রচণ্ডতা আমাদের নিস্তরঙ্গ নিরুদ্বিগ্ন শান্ত জীবনে আঘাত করেছে অতি সহজে। এর ফলে আমরা জেগে উঠলাম, কিন্তু প্রথম জাগরণে ভোরের পাখির কাকলি এবং উচ্ছ্বাস। এই উচ্ছ্বাস কাটিয়ে উঠতে রবীন্দ্রনাথেরও সময় লেগেছিল। এই জাগরণে রোমান্টিক প্রবণতার উদ্বোধন— বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন নবীনচন্দ্র বিহারীলাল ও অক্ষয় চৌধুরীতে যার সূচনা ও রবীন্দ্রকাব্যে যার পরিণতি।

বিজিতকুমার দত্ত

রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র। নেপালচন্দ্র মজুমদার। সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬ বিধান সরণি, কলকাতা ৬। মূল্য ১০˙০০ টাকা।

আমাদের জাতীয়-আন্দোলনের ইতিহাসে সুভাষচন্দ্র বসু সত্যিই একটি চমকপ্রদ চরিত্র। যাঁরা তাঁর কর্মপন্থা ও রাজনীতিক দর্শনের সঙ্গে একমত নন, তাঁরাও তাঁর আশ্চর্য পৌরুষ এবং অকুতোভয় ব্যক্তিত্বের উচ্চ প্রশংসা করেন। লক্ষণীয় যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত আমরা পাই এই দলে। জীবন-নীতির কিংবা মানসিক গঠনের দিক থেকে দেখলে রবীন্দ্রনাথ গান্ধী-নেহরুর যতটা কাছের ছিলেন, সুভাষচন্দ্রের তা ছিলেন না। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের মত উজ্জ্বল প্রখর ও আত্মস্বাতন্ত্র্যময় ব্যক্তিকে ভালো না বেসেও পারেন নি তিনি। কখনো কখনো হয়তো মতভেদ হয়েছে তাঁর, সে পার্থক্যের কথা ব্যক্তও করেছেন তিনি দ্বিধাহীন স্পষ্টতায়। কিন্তু সব-কিছুর উর্ধ্বে গভীর একটি মমতার্দ্র স্বীকৃতি ছিল তাঁর সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে। রাজনীতিক মঞ্চে সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাব থেকে কবির জীবনান্তকাল পর্যন্তই অব্যাহত ছিল এটা।

এই রবীন্দ্র-সুভাষ সম্পর্কের একটি প্রামাণ্য ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখেছেন নেপাল মজুমদার 'রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র' বইয়ে। শ্রীমজুমদারের লেখার বিশেষত্ব যা, আপন অভিরুচি বা পক্ষপাত আলোচ্য বিষয়ের উপর প্রক্ষেপ না করে তথ্যবস্তুকেই তার আপন বক্তব্য বলতে দেওয়া, এ বইয়েও তার পর্যাপ্ত পরিচয় রয়েছে। এই তথ্যাহরণে তিনি পুরোনা দলিল-দস্তাবেজ, সংবাদপত্রের বকেয়া ফাইল এবং অধুনা দুষ্প্রাপ্য বইপুঁথি প্রচুর ঘেঁটেছেন এবং বহু জনের ভুলে-যাওয়া ও অনেকের না-জানা এমন অনেক প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন, যা একদিন রবীন্দ্রজীবনের তথা বিশ শতকের প্রথমার্ধের ইতিহাস রচনায় অপরিহার্য বলে গণ্য হবে, সুভাষ-জীবনের সামগ্রিক আলোচনায়ও সহায়ক হবে। মানসিক প্রবণতা ও জীবনচর্যায় ভিন্ন ধারানুসারী দুই মহান সমসাময়িক একে অন্যকে কি ভাবে স্পর্শ করেছিলেন, তা জানতে কার না কৌতূহল হবে ?

ঠিক কোন্ সময় সুভাষচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসেছিলেন তা কারো জানা নেই। অনুমান করা যেতে পারে যে ছাত্ররূপে অন্যদের মত তিনিও স্বদেশী আন্দোলনের দিনে কবির গান ও প্রবন্ধপাঠ শুনেছিলেন। তাঁর রচনার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ১৯২১ সালে আই. সি. এস. পরীক্ষা দিয়ে দেশে ফেরার সময় এক জাহাজেও এসেছিলেন তিনি কবির সঙ্গে। কিন্তু সরাসরি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগ হয় তাঁর ১৯৩০-৩১ নাগাদ, রাজনীতিক কর্মক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জন দাশের সহকর্মী রূপে তাঁর আবির্ভাবের এবং নিজস্ব পৌরুষ ব্যক্তিত্ব ও ত্যাগের ঔজ্জ্বল্যে সমসাময়িকদের জনতা ঠেলে সামনের সারিতে এসে দাঁড়ানোর পর। রবীন্দ্রনাথই অগ্রণী হয়ে তাঁকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এই সময় থেকে ১৯৪১ সালের ১৭ই জানুয়ারি বৃটিশ সরকারের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান পর্যন্ত, অর্থাৎ মোট ১০ বছর, রবীন্দ্র-সুভাষ সম্পর্কের ব্যাপ্তি।

এই এক দশকের ইতিহাস কি সবটাই এক তরফে শ্রদ্ধার ও অন্য তরফে স্নেহের উপর প্রতিষ্ঠিত ? বলা বাহুল্য তাই, যদিও সংঘাতও হয়েছে মাঝে মাঝে। গোড়াতেই বলেছি যে মৌল প্রকৃতিতে দুজনের ছিল দুস্তর একটি ব্যবধান, কবি ছিলেন তত্ত্বজ্ঞানে অধিষ্ঠিত ভাবুক, ভাব থেকে বিচ্ছিন্ন করে কর্মকে দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন না তিনি, সুভাষচন্দ্র ছিলেন মূলত কর্মী এবং ভাবাবেগের কুয়াশায় অগ্রযাত্রার পথ আবিল হতে দিতেন না তিনি, তাই অনিবার্য ভাবেই দু-একবার মুখোমুখি সংঘাত হয়েছে দুজনে, কিন্তু সম্পর্কের বনিয়াদ ভেঙে পড়ে নি তার ফলে কোনোদিনই। সুভাষচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মহিমময় প্রতিভার একনিষ্ঠ পূজারীই ছিলেন, আর রবীন্দ্রনাথও সুভাষচন্দ্রকে আদর্শ দেশপ্রেমিক ও ধৃতব্রত স্বাধীনতাযোদ্ধা বলেই ভালবাসতেন। দুটি বৃহৎ চরিত্রের এই সম ও বিষম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার চিত্রটি চমৎকার ফুটিয়েছেন শ্রীমজুমদার।

১৯৩৪ সালে সুভাষচন্দ্র তাঁর ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল বইয়ের সূচনায় বার্নার্ড শ'কে ভূমিকা লেখার জন্যে অনুরোধ করতে বলেন কবিকে, যা করতে কবি স্বীকৃত হন নি। তিনি বলেন বার্নার্ড শ' কারো অনুরোধে কিছু করার পাত্র নন। কাজেই অনুরোধ করলে হয়তো তা রক্ষিত হবে না। সুভাষচন্দ্র এতে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হন। ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথও, কারণ সুভাষচন্দ্র তাঁর চিঠিতে কবিকে গান্ধীজীর অন্ধভক্ত বলে অভিহিত করেছিলেন। এই ক্ষোভের অভিব্যক্তি আছে তাঁর চিঠিতে। তিনি বলেন, এ দেশের রাজনীতি দীর্ঘ দিন শিক্ষিত শহুরেদের মধ্যেই পাক খেয়েছে। গান্ধীজী তাকে নিয়ে গেছেন গ্রামের মাটিতে। তাঁর সেই

সার্বিক দানকে অস্বীকার করাই হবে অন্ধতা। কিন্তু এতেও যায় আসে নি কিছু, কারণ ১৯৩৯ সালে আমরা দেখি সুভাষচন্দ্রের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ মহাজাতি সদনের ভিত্তিস্থাপন করলেন এবং গান্ধী-কংগ্রেসের সঙ্গে বিরোধে প্রকাশ্যেই করলেন সুভাষচন্দ্রের পক্ষাবলম্বন। তাঁকে সম্বর্ধনা জানালেন দেশনায়ক বলে।

১৯৪০ সালে বাংলার রাজনীতিতে দেখা দেয় দারুণ একটা বিশৃঙ্খলার আবহাওয়া। সর্বভারতের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে বাঙালী নেতৃত্ব হঠাৎ সেদিন সংকীর্ণ আত্মম্ভরিতার চর্চায় মেতে ওঠে। শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎ-বিবরণীতে কবি এর বিরোধিতা করে কতকগুলি তীব্র মন্তব্য করেন। তিনি বলেন এ এক ধরণের খোকামি। কোনো কোনো মহলে একে সুভাষচন্দ্রের উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত কটূক্তি বলে বোঝানো হয় এবং তা নিয়ে দেশে শুরু হয়ে যায় নিদারুণ দাপাদাপি। বিরক্ত হয়ে কবি তখন প্রকাশ করেন একটি বিবৃতি এবং তাতে বলেন যে ইঙ্গিতের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রেখে কারোকে কিছু বলা তাঁর স্বভাব নয়। সুভাষচন্দ্রকে তিনি যে নেতারূপে বিশেষ শ্রদ্ধা করেন এবং জাতীয়-পরিকল্পনার যে খসড়া তিনি রচনা করেছেন তা বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যেই যে দেশের সর্বশক্তি নিয়ে তাঁর পিছনে দাঁড়ানো দরকার, এ কথাও অকপটে স্বীকার করেন তিনি।

এর পরই সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান। পলায়নের ঠিক ৬ দিন আগে রথীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের কুশল জানতে চান তিনি এবং তাঁকে প্রণাম জানান। হয়তো সংকল্পের পথে পা দেবার আগে কবির আশীর্বাদই কামনা করেছিলেন তিনি। তাঁর অন্তর্ধানের সংবাদ প্রচারিত হলে উদ্‌বেগ প্রকাশ করে শরৎচন্দ্র বসুকে তার করেছিলেন কবি। আর এখানেই যবনিকা পড়ে যায় রবীন্দ্র-সুভাষ সম্পর্কের উপর, কেননা ছ মাস পরে জীবনান্ত হয় কবির। সুভাষচন্দ্রের উজ্জ্বলতম কীর্তি যে আজাদ হিন্দ, তার কথা জেনে যান নি কবি। এই নাতিবৃহৎ ও বিচিত্র ইতিহাস উপযুক্ত তথ্য-প্রমাণ-সহ নিখুঁত নিষ্ঠায় উপস্থাপিত করেছেন লেখক। প্রসঙ্গত বক্তব্য যে প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়নকালে সুভাষচন্দ্র ও অধ্যাপক ওটেনের মধ্যে যে ঘটনা ঘটেছিল, মনে হচ্ছে তখনকার কোনো লেখায় রবীন্দ্রনাথ সে সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করেছিলেন। সিটি কলেজে সরস্বতী পুজো নিয়ে ছাত্রে-কর্তৃপক্ষে বিরোধ হলে এবং সুভাষচন্দ্র ছাত্রদের পক্ষ নিলেও কিছু লিখেছিলেন। এ দুটিও পরিশিষ্টে থাকলে ভালো হত।

মোটের উপর বইটি অভিনব তার বিষয়বস্তু এবং তথ্যসমাবেশের জন্যেও, নিরপেক্ষ ও অপ্রমত্ত বিচার-শক্তির জন্যেও।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

বাংলা পদাবলীর ছন্দ। আনন্দমোহন বসু। পারমিতা প্রকাশন। বোলপুর। মূল্য ২২.০০ টাকা।

বাংলা ছন্দোনীতির আলোচনা চলছে অর্ধশতাব্দীরও অধিকাল ধরে, কিন্তু ছন্দোবিবর্তনের সুপরিকল্পিত ইতিহাস রচনার প্রয়াস সাম্প্রতিক। মধ্যযুগের কোনো কোনো কাব্যগ্রন্থ বা কাব্যধারা নিয়ে ইতস্তত: কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে সত্য, কিন্তু সামগ্রিক আলোচনায় কেউ অগ্রসর হন নি। সেদিক থেকে বিচারে প্রাচীন বাংলা ছন্দের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার প্রথম সার্থক প্রয়াস হিসাবে অধ্যাপক আনন্দমোহন বসুর 'বাংলা পদাবলীর ছন্দ' গ্রন্থখানি বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। পদাবলী

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা ঐশ্বর্যপুষ্ট ধারা। বেশ কিছুকাল যাবৎ প্রাচীন বাংলা কাব্যের ভাষা ও অলংকার সম্পর্কে অল্পস্বল্প আলোচনা চলছে। ছন্দোবৈশিষ্ট্যের সর্বাঙ্গীণ আলোচনার অভাবে পদাবলী সাহিত্যের পরিচয়টা অপূর্ণ ছিল। 'বাংলা পদাবলীর ছন্দ' সেই পরিচয়ের পূর্ণতা সাধনে অনেকখানি সহায়তা করবে।

রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, প্রবোধচন্দ্র, অমূল্যধন, দিলীপকুমার, মোহিতলাল প্রমুখ বিশিষ্ট ছান্দসিকদের চিন্তা ও চর্চার ফলে এতদিনে বাংলা ছন্দের নীতিগুলি অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং অল্পাধিক মতভেদ সত্ত্বেও প্রবোধচন্দ্র-প্রদত্ত উচ্চারণবৈচিত্র্যগত ছন্দের তিন প্রকৃতির এবং যতিবৈচিত্র্যগত ছন্দের বিভিন্ন গঠনরূপের বিশ্লেষণ ও তার পারিভাষিক নামকরণ ব্যাপক স্বীকৃতি পেয়েছে। বাংলা ছন্দের প্রকৃতি ও আকৃতির বিশ্লেষণের কাজটি যতদিন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন না হচ্ছিল ততদিন ছন্দের ইতিহাস রচনার কাজে হাত দেওয়া সম্ভবপর ছিল না। সেজন্যেই বাংলা ছন্দের ইতিহাস রচনার প্রয়াস বিলম্বিত হয়েছে। তবে এদিকেও যে প্রবীণ ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র প্রথমাবধি দৃষ্টি রেখেছিলেন, তাঁর 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের তথা রামপ্রসাদ, ঈশ্বরগুপ্ত ও দ্বিজেন্দ্রলালের ছন্দশিল্প বিষয়ক মূল্যবান প্রবন্ধাবলী তার সাক্ষ্য বহন করছে। সাম্প্রতিক কালে তাঁরই নির্দেশনায় ছন্দের ইতিহাস রচনার কাজটিও পরিকল্পিত পদ্ধতিতে শুরু হয়েছে। শ্রীআনন্দমোহন বসুর আলোচ্যমান গ্রন্থটি সেই গবেষণাকর্মেরই অন্যতম সার্থক ফসল।

'বাংলা পদাবলীর ছন্দ' গ্রন্থটিতে আছে মোট আটটি অধ্যায়। তা ছাড়া আছে গ্রন্থমুখে লেখকের 'নিবেদন' ও অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনের 'নান্দীবচন' এবং গ্রন্থশেষে 'উৎস-নির্দেশ' ও 'নির্দেশিকা'। প্রথম অধ্যায়ে লেখক সংক্ষেপে বাংলা ছন্দের তিন রীতির অর্থাৎ কলাবৃত্ত (পূর্বতন পরিভাষায় মাত্রাবৃত্ত), মিশ্রকলাবৃত্ত (পূর্বতন অক্ষরবৃত্ত) ও দলবৃত্ত (পূর্বতন স্বরবৃত্ত) রীতির বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। পদাবলীর ছন্দ ইতিহাসে প্রবেশের পূর্বে পাঠকের পক্ষে এই অধ্যায়টি অপরিহার্য বিবেচিত হবে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'কলাবৃত্ত রীতির আদিরূপ'এর পরিচয় প্রসঙ্গে প্রথম দুই পরিচ্ছেদে যথাক্রমে জয়দেবের গীতিপদাবলীর এবং তাঁর অনুবর্তী হিসাবে রূপগোস্বামী থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কবিদের রচিত জয়দেবী পদ্ধতির সংস্কৃত ও বাংলা পদাবলীর ছন্দোবৈশিষ্ট্যের আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে রয়েছে চর্যাগীতি পদাবলীর ছন্দ-স্বাতন্ত্র্যের আলোচনা। তৃতীয় অধ্যায়ে 'কলাবৃত্ত রীতির বিবর্তন' প্রসঙ্গে সাতটি পরিচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে বিদ্যাপতি ও তাঁর সমকালীন মৈথিল কবি এবং বিদ্যাপতির অনুবর্তিগণের ছন্দশিল্পের বিবরণ। 'মিশ্রকলাবৃত্তের আদিরূপ' শীর্ষক চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে 'বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের ছন্দ। তার পরের অধ্যায়ে ছয়টি পরিচ্ছেদে পদকর্তা চণ্ডীদাস ও তাঁর অনুবর্তিগণের রচনায় 'মিশ্রকলাবৃত্ত রীতির বিবর্তন'ধারা আলোচিত হয়েছে। ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে যথাক্রমে 'দলবৃত্ত রীতির আদিরূপ' ও তার বিবর্তনধারা অনুসৃত হয়েছে লোচন-দাসের ধামালি ও রামপ্রসাদের গান এবং তাঁদের অনুবর্তিদের রচনা অবলম্বনে। সর্বশেষে 'উপসংহার' অধ্যায়ে লেখক পূর্ববর্তী বিশদ আলোচনার সার সংকলন করেছেন। লেখক বৌদ্ধ বৈষ্ণব শাক্ত ও বাউল এই চার ধারার গীতিরচনাকে পদাবলী সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করেছেন। সুচিন্তিত অধ্যায়-বিভাগগুলি থেকেই বোঝা যাবে, গ্রন্থ-পরিকল্পনায় লেখক কতটা যত্ন নিয়েছেন।

প্রশ্ন হতে পারে, বাংলা পদাবলীর ছন্দ আলোচনায় জয়দেব এবং তাঁর অনুবর্তীদের সংস্কৃত গীতিপদাবলীর প্রসঙ্গ আনবার প্রয়োজন কি? এ প্রশ্নের পরোক্ষ উত্তর পাওয়া যাবে দ্বিতীয় অধ্যায়ে। গীতগোবিন্দের গানগুলির ভাষা সংস্কৃত হলেও জয়দেব সংস্কৃত মাত্রাবৃত্ত ধারাতেই সমায়তন পর্ব ও পদবিভাগ এবং পদ ও পংক্তি-প্রান্তিক মিল, এই দুই বিশিষ্টতার যোগে বাংলা কলাবৃত্ত রীতির সূত্রপাত করেন। বিদ্যাপতি ও তাঁর অনুবর্তী বৈষ্ণব কবিগোষ্ঠীর গীতিরচনায় এই জয়দেবী ছন্দোরীতির অনুবর্তন লক্ষিত হয়। সুতরাং লেখক যে জয়দেব ও তাঁর অনুবর্তীদের ব্যবহৃত শিষ্ট কলাবৃত্ত রীতির পরিচয় দিয়ে এই রীতির আলোচনা আরম্ভ করেছেন তা সংগতই হয়েছে। চর্যাগীতির ছন্দোরীতি মূলতঃ প্রাচীন কলাবৃত্ত হলেও ঠিক জয়দেবী পর্যায়ভুক্ত নয়। তাই চর্যাকারগণের ছন্দকে একটি পৃথক পরিচ্ছেদে স্থান দেওয়া অনুচিত হয় নি।

বিদ্যাপতি-পদাবলীতে লেখক কলাবৃত্তের বিবর্তন লক্ষ করেছেন। সে যুগে দেশভাষার উচ্চারণে মুক্তস্বরের হ্রস্ব উচ্চারণ-প্রবণতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। বিদ্যাপতির কৃত্রিম 'ব্রজবুলি' পদাবলীর ছন্দও এই উচ্চারণ-শৈথিল্যের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকে নি। তাঁর রচনায় দীর্ঘস্বর কোথাও লঘু কোথাও গুরু রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলী গানে, বিশেষতঃ ব্রজবুলি গানের ধারায় এই উচ্চারণ-স্বৈরতার সুদূরপ্রসারী প্রভাব লক্ষিত হয়। ষোড়শ থেকে উনবিংশ শতক পর্যন্ত বাংলা কাব্যে এই কলাবৃত্ত রীতির প্রবাহ কখনও উদ্বেল ধারায় কখনও বা ক্ষীণস্রোতে বয়ে এসেছে। অধ্যায়টির প্রশস্ত পরিসর বাংলা ছন্দের ক্ষেত্রে কলাবৃত্ত ধারার গুরুত্ব সপ্রমাণ করে।

মিশ্রকলাবৃত্ত বাংলা কাব্যের মুখ্যতম ছন্দোরীতি। গত হাজার বছরে এই রীতিটি বাংলা কাব্যের যোগ্যতম বাহন বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। বড়ু চণ্ডীদাসকে এই রীতির প্রবর্তক বলা যেতে পারে। পদাবলী সাহিত্যে চণ্ডীদাস ও তাঁর অনুসারী শতাধিক কবি এই ছন্দোরীতির পরিপুষ্টি ঘটিয়েছেন। গ্রন্থকার বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ছন্দো-বৈশিষ্ট্যের গুরুত্ব বিবেচনায় একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে তার আলোচনা করেছেন। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ছন্দ' শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধ (সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, বর্ষ ৭০, সংখ্যা ১-৪) থেকে এই গ্রন্থখানির ছন্দসম্পদের পরিচয় মেলে। গ্রন্থকার সে প্রবন্ধটি ব্যবহারের সুযোগ পান নি। সম্ভবতঃ সে কারণে তাঁর পক্ষে এই কাব্যের ছন্দ-পরিচয়ে প্রশস্ত ভূমিকা দেওয়া সম্ভব হয় নি। তবে পদাবলী সাহিত্যে মিশ্রকলাবৃত্তের বিবর্তন ধারার তিনি বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন।

দলবৃত্তের সূচনা লেখক লোচনদাসের ধামালি গানগুলিতে লক্ষ করেছেন। তাঁর অনুবর্তীদের মধ্যে প্রধানতম স্থান দিয়েছেন রামপ্রসাদকে। এই দুই মুখ্যশিল্পী ও তাঁদের অনুগামীদের সবিস্তার পরিচয়ে দেখা যাবে যে, বাংলা ছন্দের এই কক্ষটিও কম ঐশ্বর্যপূর্ণ নয়।

"প্রাচীন বাংলা ছন্দ যে দৈন্যদশাগ্রস্ত ও উপেক্ষণীয় নয়, তার বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি যে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান গৌরবের বস্তু, আশা করি বর্তমান আলোচনা থেকে তা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হবে।"— লেখকের এই উক্তি কিছুমাত্র অতিকৃত নয়। গ্রন্থখানি পড়া শেষ করে পাঠকমাত্রেই অনুভব করবেন, বাংলা সাহিত্যের যে ছন্দসম্পদ নিয়ে আজ আমরা গৌরব বোধ করি তা হঠাৎ-পাওয়া বস্তু নয়, তা

দীর্ঘকালব্যাপী গৌরবময় ঐতিহ্যভাণ্ডার থেকে উত্তরাধিকারসূত্রেই লব্ধ। আধুনিক কালের ছন্দোবিলাসী কবিরা প্রাচীন ছন্দোনিপুণ কবিদেরই উত্তরসাধক।

এই গ্রন্থে লেখক একদিকে যেমন বাংলা পদাবলীর ছন্দ সম্পর্কে সুনিপুণ আলোচনা করে পাঠক-চিত্তে তৃপ্তির খোরাক জুগিয়েছেন, অপরদিকে তেমনি সতর্ক পাঠকের মনে নানা বিষয়ে কৌতূহল ও জিজ্ঞাসাও উদ্রিক্ত করেছেন। এটি বিশেষ ক্ষমতার পরিচায়ক এবং গ্রন্থরচনার অন্যতম সার্থকতাও এইখানে। দু-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।—

গীতগোবিন্দের চব্বিশটি গীতের ছন্দোবিশ্লেষণ অনুসরণ করতে গিয়ে জানতে কৌতূহল হয়, জয়দেব ধ্রুবপদে কি মূলগানের ছন্দই রাখতেন, না পৃথক ছন্দ আনতেন? পরবর্তী অনুসারকরা ব্রজবুলি ও বাংলা পদরচনায় এ বিষয়ে কতকটা অনুসরণ করেছেন।

বিদ্যাপতির একটি পদ এ রকম—

কর কিসলয় শয়ন রচিত গগন মডল পেখী।
জনি সবোরুহ অরুনসুতল বিন্দু বিরোধে উপেখী॥···
তোঁ পুনু সে নারি বিরহে ঝামরি পলটি পরলি বেনী।
সঁসে সমীরন পিবএ ধাউলি জনি সে কারি নগিনী;

—বিদ্যাপতি: মিত্র-মজুমদার, ২৪৬

এটিতে প্রতি পর্বে আছে ছয় কলামাত্রা, অথচ তার দলসংখ্যাও ছয়। এর ছন্দোরীতি কি? সরল বা মিশ্র কলাবৃত্ত, না দলবৃত্ত? দলবৃত্তও বলা চলে না। কারণ তার প্রধান দুটি লক্ষণ, শব্দপ্রান্তিক রুদ্ধদলের সংকোচন এবং প্রতি পর্বে চার দলমাত্রার সমাবেশ। এতে প্রথম লক্ষণটি পরিস্ফুট নয়। দ্বিতীয়টি তো নেইই। সরল বা মিশ্র কলাবৃত্ত যদি হয় তবে প্রতি পর্বে দলসংখ্যার সমতা রক্ষিত হল কেন? এই সমতা আকস্মিক বলেও মনে হয় না। কারণ বিদ্যাপতির রচনায় এরূপ দৃষ্টান্ত আরও পাওয়া যায়। বিদ্যাপতি ছন্দের এই আদর্শ পেলেন কোথায় এবং পরবর্তী কবিদের রচনায় এ আদর্শ অনুসৃত করতে হয়েছে কিনা তা অনুসন্ধানের বিষয়। এক্ষেত্রে আরও গবেষণার অবকাশ রয়েছে।

জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যের প্রায় সবগুলি গানেই চার ও পাঁচ মাত্রার পর্ববিভাগ লক্ষিত হয়। দুটি মাত্র গীতে (৭ এবং ১০ সংখ্যক) যথাক্রমে সাত ও ছয় মাত্রার পর্বরচনার কিছু আভাস পাওয়া যায় বলে মনে করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে বিদ্যাপতির রচনায় চার ছয় এবং সাত মাত্রার পর্বই প্রধান। পাঁচ মাত্রার পর্ব তাঁর রচনায় বিরল, যা পাওয়া যায় তাও তাঁরই রচনা কিনা সে বিষয়ে সংশয়ের কারণ আছে। বস্তুতঃ বৈষ্ণব পদাবলীতেই পাঁচ মাত্রার পর্ব বিরল; এত বিরল যে রবীন্দ্রনাথও পদাবলী সাহিত্যে এ রকম দৃষ্টান্ত খুঁজে পান নি।[1] জয়দেবের রচনায় ছয় ও সাত মাত্রার পর্ব এবং বিদ্যাপতি-প্রমুখ পদকর্তাদের রচনায় পাঁচ মাত্রার পর্ব এত বিরল কেন, এবং বিদ্যাপতি ছয় ও সাত মাত্রার আদর্শ পেলেন কোথায়, এ প্রশ্নের সদুত্তর এখনও মেলেনি। এ সম্পর্কেও অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

---

১ এ বিষয়ে প্রবোধচন্দ্র সেনের মন্তব্য দ্রষ্টব্য: 'ছন্দশিল্পী রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্র', বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৩, পৃ ১৯২।

গ্রন্থপাঠে এরকম নানা প্রশ্নই মনে আসে। লেখক একটি সম্পূর্ণ নতুন ও সুদূরবিস্তৃত ক্ষেত্রে পদচারণা করেছেন। তার সমস্ত দিক প্রকাশ করা দীর্ঘকাল ও বহুজনের প্রচেষ্টা-সাপেক্ষ। তার ফলেই উক্তপ্রকার প্রশ্নের উদ্‌ভব। পাঠকের মনে এই যে জিজ্ঞাসার সঞ্চার, তাতেই লেখকের গবেষণা ও গ্রন্থরচনার অন্যতম সাফল্য। শুধু জিজ্ঞাসা নয়, এই গ্রন্থপাঠে নানা প্রসঙ্গে মনে অল্পাধিক অতৃপ্তি অর্থাৎ আরও প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাও দেখা দেয়। যেমন, চর্যাগীতি, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য ও বিদ্যাপতির পদাবলী— বাংলা ছন্দের এই তিনটি প্রধান উৎসভূমির বিস্তৃততর ও পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনার অভাবে মনে গভীর অতৃপ্তি এবং অধিকতর অনুসন্ধানের প্রবল আগ্রহ জাগে। প্রায় সহস্র বৎসরের ছন্দোবিকাশের পরিচয় দিতে গিয়ে স্বভাবতই লেখককে সংযম অবলম্বন করতে হয়েছে। ফলে অনিবার্যভাবেই পাঠকমনে জিজ্ঞাসা অপরিতৃপ্ত থেকে গেল। এই জিজ্ঞাসা ও অতৃপ্তির প্রবর্তনা নূতন গবেষকের আবির্ভাব ঘটলে সেটি হবে ছান্দসিকদের পক্ষে, বিশেষতঃ এই গ্রন্থের লেখকের পক্ষে, সবচেয়ে অভিনন্দনীয়।

অধুনাপূর্ব যুগে বাংলা ছন্দের তিন রীতিই ছিল তরল অবস্থায়, কোনো রীতিই সুগঠিত ও সুনির্দিষ্ট আকার পায় নি। সেই অনিশ্চয়তার যুগে রচিত অনেক ছন্দেরই যথার্থ রূপ ও রীতি সম্বন্ধে মনে সংশয় জাগা অনিবার্য। এসব ক্ষেত্রে মতভেদ ঘটাও অপরিহার্য। এই সংশয়-সংকুল দুর্গম গহনে অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হলেও গ্রন্থকার সব ক্ষেত্রেই মতভেদের সমস্ত সম্ভাব্যতা বাঁচিয়ে চলতে পেরেছেন এমন কথা অবশ্যই বলা চলে না, তিনিও বোধ করি এমন দাবি করবেন না। সতর্ক পাঠকের মনে নানাস্থানেই কিছু কিছু মতান্তর হওয়া অসম্ভব নয়। এই মতভেদের অবকাশগুলি যদি জিজ্ঞাসু পাঠককে গবেষণার ক্ষেত্রে আকর্ষণ করে আনে তবে সেটাই হবে বাংলা সাহিত্যের একটা বড় লাভ এবং পথিকৃৎ গ্রন্থকারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

গ্রন্থারম্ভে ছান্দসিক অধ্যাপক প্রবোচন্দ্র সেনের 'নান্দীবচন'টি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। উনবিংশ শতক পর্যন্ত সংস্কৃত ও বাংলা ছন্দশাস্ত্র রচনায় বাঙালির দান ও কৃতিত্ব কতখানি এখানে প্রথমে তাই বলা হয়েছে। বাংলা ছন্দ আলোচনায় নবজোয়ার দেখা দেয় বিংশ শতকে। স্বয়ং প্রবোধচন্দ্র সে আলোচনায় মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। স্বভাবতঃই সে প্রসঙ্গের অবতারণা না করেই তিনি গত ছয়-সাত বছরে বাংলা ছন্দ-বিষয়ক যে কয়খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার পরিচয় দিয়েছেন। তৎপরে একটি মূল্যবান সময়োপযোগী প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেন—

> "আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাছে একটি আবেদন আছে। বিদ্যাচর্চায় উৎসাহদান বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। বি.এ. অনার্স এবং গবেষণা-পর্যায়ে ছন্দচর্চার যথেষ্ট অবকাশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ দু-এর মধ্যবর্তী সেতুস্থানীয় এম.এ. পর্যায়ে ছন্দচর্চার অবকাশ নেই অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে।… এম.এ. স্তরে ভাষাতত্ত্বের ন্যায় ছন্দতত্ত্ব শিক্ষার ব্যবস্থা করা খুবই সমীচীন। আমার প্রস্তাব এই, বি.এ. স্তরে ছন্দের ব্যাকরণ শিখিয়ে এম.এ. স্তরে ছন্দের ইতিহাস শেখানো হোক। 'বাংলা পদাবলীর ছন্দ', 'আধুনিক বাংলা ছন্দ' এবং 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ', এই তিনখানি বই-এর সহায়তায় অনায়াসেই ছন্দের ইতিহাস শেখানো শুরু করা যেতে পারে।… আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এ বিষয়ে অবহিত ও উদ্‌যোগী হবেন, এ আশা কি দুরাশা মাত্র ?"

বস্তুতঃ দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পাঠক্রমে ইতিমধ্যেই বি.এ পর্যায়ে ছন্দ-ব্যাকরণ এবং এম.এ. পর্যায়ে ছন্দ-বিবর্তনের তথা ছন্দ-শাস্ত্রের ইতিহাস অধ্যাপনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাংলা দেশের ও বাংলার বাইরের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এ নীতি স্বীকৃত হলে নিয়মিত চর্চার ফলে বাংলা সাহিত্যের এই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গটি দ্রুত পুষ্টিলাভের সুযোগ পাবে। প্রবোধচন্দ্রের এই সুচিন্তিত প্রস্তাবটির প্রতি আমাদের শিক্ষানিয়ামকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই।

নীলরতন সেন

রবিবাসর। প্রফুল্লকুমার-স্মৃতিগ্রন্থ ২। সম্পাদনা শ্রীনরেন্দ্র দেব ও শ্রীসন্তোষকুমার দে। ৪৫ রাজা রামমোহন সরণী, কলিকাতা ৯। মূল্য ৫·০০ টাকা।

রবিবাসর একটি ঐতিহ্যপূর্ণ সাহিত্যপ্রতিষ্ঠান যা শুধু রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের সঙ্গেই যুক্ত ছিল না, বহু মনীষী, সাহিত্যিক, প্রতিষ্ঠাবান সুধীবৃন্দ এর সক্রিয় সহযোগী ছিলেন এবং আজও আছেন। চল্লিশ বছর ধরে এই প্রতিষ্ঠানটি লালিত পালিত হয়েছে জলধর সেন, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্র দেব প্রভৃতি সর্বাধ্যক্ষদের পরিচালনায় ও অমূল্য বিদ্যাভূষণ, নরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসন্তোষকুমার দে প্রভৃতি সুযোগ্য সম্পাদকদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও নিষ্ঠায়।

এই সংখ্যাটির সাহিত্যিক সত্তার সভ্যগণের নানা বিচিত্র অবদানে সমৃদ্ধ। শরৎচন্দ্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী নিয়ে এর যাত্রা। মনে পড়ছে তাঁর কথাগুলি— "শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালীর হৃদয়-রহস্যে। সুখে দুঃখে মিলনে বিচ্ছেদে সংঘটিত বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমন করে পরিচয় দিয়েছেন বাঙালী যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে।" উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথায় পড়ি রবীন্দ্র-শরতের মিলনের এক শুভলগ্নের কাহিনী। খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'রবীন্দ্রনাথের গান' একটি লুপ্ত রসসিক্ত আলোচনাকে নূতন করে আমাদের সম্মুখে এনে দেয়, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি নজরুল ইসলাম' এক নবতম মানসসম্পদের বার্তা সূচিত করে। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, কবি করুণানিধান, শরৎচন্দ্র বা অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের রচনাগুলি সুনির্বাচিত। জীবিত সদস্যদের লেখার উল্লেখ করলাম না। সব মিলিয়ে একটি সুপরিকল্পিত স্মারকগ্রন্থ রবিবাসরকে কেন্দ্র করে রূপপরিগ্রহ করেছে— যাতে গায়কের দৃষ্টিতে, শিল্পীর দৃষ্টিতে, বিগত দিনের দৃষ্টিতে, রাজনীতিজ্ঞের দৃষ্টিতে রবিবাসর উদ্‌ভাসিত সে কথাটি তুচ্ছ বা নগণ্য নয়। এখানে আছে রচনার রীতির কথা, তামিল কাহিনী, পরশুরামের স্মৃতি, সর্বহারার বন্দনা, জীবন ও মৃত্যুর কাহিনী, মনমোহন ঘোষের কবিতার অনুবাদ, কলকাতার কথা, অন্য ভুবন অন্য জীবনের কাহিনী, নানা কবির নানা ধরনের কবিতা।

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙালী মনীষীর শিক্ষাচিন্তা ও সাধনা। শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত। মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। মূল্য ৫.০০ টাকা।

বৈদিক বা পৌরাণিক যুগে আমাদের দেশে বিদ্যাচর্চার মান খুব উন্নত ছিল বলে যতই আত্মপ্রসাদ লাভ করি-না কেন যখন-তখন যেখানে-সেখানে সে কথা বলে কোনো লাভ হয় না। কারণ, সেকালে শিক্ষার লক্ষ্য কি ছিল তা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট নয়। আর যদি বা প্রাচ্যবিদ্যা-গবেষকদের সাহায্যে তা সুপ্রকাশ হয়েও ওঠে তবু তা বিশেষ কাজে লাগবে না, যেহেতু সেদিনকার লক্ষ্য এবং অদ্যকার লক্ষ্য এক হওয়া অসম্ভব। তবু পুরাতনের সঙ্গে আমরা আত্মিক যোগে যুক্ত, আর নূতনের কাছে আমাদের অন্নের প্রত্যাশা— শুধু দেহের নয় মনেরও। সুপ্রাচীন প্রাচ্যকে অস্বীকার করতে বাধে কিন্তু অর্বাচীন প্রতীচ্যকে গ্রহণ না করলে নয়। আমাদের আধুনিক শিক্ষার ইতিহাস দুই বিপরীতধর্মী ভাবনার সংঘাত সংমিশ্রণ এবং সংশ্লেষণের ইতিহাস। তার মধ্যে পাশ্চাত্য উপাদানের অনুপাতটা স্বভাবতই কিছু বেশি।

আধুনিক ভারতবর্ষকে যাঁরা গড়ে তুলেছেন তাঁরা সকলেই ইউরোপীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন না। বর্তমান ভারতের জনক বলে সমগ্র দেশ যাঁর নামে আজও মাথা নত করে সেই রামমোহন রায়ও ইংরেজি পাঠশালায় পড়েন নি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও ছিলেন মূলতঃ টোল-চতুষ্পাঠীর পড়ুয়া। ইংরেজের চাকরি বা অনুগ্রহের প্রত্যাশায় অথবা অন্য কোনো মোহের বশবর্তী হয়ে যাঁরা ইংরেজ ও ইংরেজিআনার দিকে ঝোঁকেন এঁরা সে সম্প্রদায়েরও মানুষ ছিলেন না। স্বদেশ এবং স্বজাতির উন্নয়নই এঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। স্বধর্মের প্রতিও এঁদের অনুরাগ ছিল প্রবল। মূঢ়তার কুজ্ঝটিকা থেকে মুক্ত করে এঁরা স্বধর্মকে তার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, তাকে পরধর্মের হাতে তুলে দেন নি। রামমোহন যে প্রাচীন শাস্ত্র প্রচারে উদ্‌যোগী হয়েছিলেন তার কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন সত্যধর্মের তত্ত্বশাস্ত্রের গুহার মধ্যেই নিহিত আছে। সতীদাহ-নিবারণের মানবিক আবেদনের মূল্য যথেষ্ট ছিল না, শাস্ত্র-বাক্যকেও সেজন্যে সাক্ষী মানতে হয়েছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়েরও একই অবস্থা। জননী ভগবতীদেবীর অশ্রুধারায় যুধ্যমান পণ্ডিতদের হৃদয় গলে নি। সমবেত যুযুৎসুদের সম্মুখে শাস্ত্র ধারণ করেই তাঁকে সেদিনকার কুরুক্ষেত্রে নামতে হয়েছিল। ন্যায় নীতি মানবতার গুরুত্ব স্বীকার করেও ভারতবর্ষের জ্ঞানগুরুদের প্রতি তাঁরা আস্থাবান্ ছিলেন। আশ্চর্য এই যে তা সত্ত্বেও তাঁরা জনশিক্ষার জন্যে টোল- মাদ্রাসার চেয়ে পাশ্চাত্য পদ্ধতির বিদ্যালয় স্থাপনের উপযোগিতা অনেক বেশি বলে অনুভব করেছিলেন। টোল-চতুষ্পাঠী-মাদ্রাসা তাঁরা তুলে দিতে চান নি। কিন্তু পাশ্চাত্যরীতির শিক্ষাকে তাঁরা প্রাধান্য দিতে চেয়েছিলেন কারণ তাঁরা অনুভব করেছিলেন এই শিক্ষা যুগের চাহিদা মেটাতে পারবে। পাশ্চাত্য বিদ্যার সমর্থনে মেকলের সিদ্ধান্ত গ্রহণে রামমোহনের শিক্ষাবিষয়ক আন্দোলন যে অনেক পরিমাণে সহায়তা করেছিল সেটা লক্ষ্য করার বিষয়।

তার পর থেকে দেড় শ বছর হল। সেদিন যে শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন হয়েছিল তার কাঠামোটা আজও সম্পূর্ণ বদলায় নি। তার পক্ষে-বিপক্ষে সমালোচনার অভাব সেদিনও ছিল না আজও নেই। ফলে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে সে ক্রমাগতই অগ্রসর হচ্ছে, নূতন ভাব নূতন বস্তু যেমন অবাধে গ্রহণ করছে তেমনি অনায়াসে বর্জনও করে চলেছে। শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত আলোচ্য গ্রন্থে সেই শিক্ষাধারারই একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে বাঙালি পাঠক-সাধারণের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

এই গ্রন্থে রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীঅরবিন্দ— এই এগারো জন মনীষীর শিক্ষাবিষয়ক বিবিধ ভাবনা চিন্তা ও অভিমত সংকলিত এবং আলোচিত হয়েছে। প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির বিবর্তনের ইতিহাসে এঁদের মধ্যে কার প্রভাব কতখানি ক্রিয়া করেছে লেখক তাও লক্ষ্য করবার চেষ্টা করেছেন। 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগে ও পরে' ও 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ' শীর্ষক প্রবন্ধ দুটির অন্তর্ভুক্তি প্রাসঙ্গিক হয়েছে। অনুরূপভাবে 'বিশ্বভারতী'কে অবলম্বন করে ('রবীন্দ্রনাথ' অধ্যায় থাকা সত্ত্বেও) একটি স্বতঃসম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রবন্ধ দেওয়া চলত। গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় গম্ভীর হলেও লেখকের হাতের গুণে বইটি সুখপাঠ্য হয়েছে।

ছোটখাটো দু-একটি ত্রুটি নজরে পড়ল। পরবর্তী সংস্করণ যাতে সংশোধনের সময়ে অসুবিধা না হয় সেজন্যে উল্লেখ করছি।— চলিত বাংলার ক্রিয়াপদে বিশৃঙ্খলা আছে এ কথা স্বীকার করি কিন্তু একই শব্দের বানান একাধিক রকমে না লেখাই ভাল। এক, হত (<হইত) শব্দের তিন রকম বানান দেখছি 'হোত' 'হ'ত' (পৃ. ২) 'হত' (পৃ. ১৩)। অনুরূপ 'হোল' 'হ'ল' 'হল' (পৃ. ১৬), 'পৌঁচেছে' কিন্তু 'পৌছনো' (পৃ i) 'বসতো' (পৃ. ২) 'থাকতো' (পৃ. ৭), কিন্তু 'যেত' (পৃ. ৮)। চলতি বাংলায় লিখলেও রবিবারকে 'রোব্‌বার' (পৃ. ৭) লেখা সংগত নয়। সাহিত্যিক আদর্শ চলতি ভাষা কথ্যভাষার ষোলো আনা অনুকৃতি নয়।

বাঙালীর পদবী বাংলায় 'মুখার্জি' 'ব্যানার্জি' লেখা উচিত নয়।— সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি (পৃ. ১৩৩), পিয়ারীমোহন মুখার্জি (পৃ. ১৩৩), সতীশ মুখার্জি (পৃ. ১৩৩)।

বাঙালী নামে ইংরেজির আদ্যক্ষর কেন? "পদার্থবিদ্যায় প্রথম ঘোষ অধ্যাপক হলেন ডঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু, রসায়নে পি. সি. মিত্র…" প্রথম নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্যে লেখা উচিত ছিল ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, শুধু পি. সি. মিত্র নয়। এক নামের বিভিন্ন রূপান্তর: সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পৃ. ৩২) সুরেন্দ্রনাথ (পৃ. ৫৬), সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায় (পৃ. ১৩৩), সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি (পৃ. ১৩৩)। প্রথমোক্ত রূপ দুটিই শিষ্টজন-গ্রাহ্য। শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির নাম আমরা পূর্ণরূপেই সাধারণতঃ উল্লেখ করি। যেমন, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল। বিকল্পে হেরম্বচন্দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ সতীশচন্দ্র বিপিনচন্দ্রও চলে। কিন্তু 'হেরম্ব মৈত্র' 'ব্রজেন শীল' 'সতীশ মুখার্জি' 'গিরিশ বসু' (পৃ. ১৩৩) প্রভৃতি লঘু রূপ গুরু প্রবন্ধে ব্যবহার না করাই বাঞ্ছনীয়। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ -প্রণেতার নাম একবার শুদ্ধ (পৃ. ৩৬) ছাপা হয়েছে, অন্যত্র অশুদ্ধ 'ব্যোপদেব' (পৃ. ১৬১)। মৃত্যুঞ্জয়ের উপাধি এক স্থানে 'তর্কালঙ্কার' (পৃ. ৪) অন্যত্র 'বিদ্যালঙ্কার' (পৃ. ১৪)। নির্ঘণ্টেও 'তর্কালঙ্কার' আছে। সর্বত্র বিদ্যালঙ্কার হবে।

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য

সংশোধন

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৬ সংখ্যা ৩: মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬

পৃ ৩১২ ছত্র ২ সুধীরকুমার নাগ স্থলে সুধীরকুমার নান

স্বরলিপি

নৃত্যনাট্য 'মায়ার খেলা'র গান

কোন্ সে ঝড়ের ভুল
ঝরিয়ে দিল ফুল,
প্রথম যেমনি তরুণ মাধুরী মেলেছিল এ মুকুল, হায় রে ॥
নব প্রভাতের তারা
সন্ধ্যাবেলায় হয়েছে পথহারা।
অমরাবতীর সুরযুবতীর এ ছিল কানের দুল, হায় রে ॥
এ যে মুকুটশোভার ধন।
হায় গো দরদী কেহ থাক যদি শিরে দাও পরশন।
এ কি স্রোতে যাবে ভেসে— দূর দয়াহীন দেশে
কোন্‌খানে পাবে কূল, হায় রে ॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন

II	না	-র্সা	র্সা	।	র্সা	র্সা	র্সা	I	র্সা	-া	-া	।	-র্রর্সা	-না	-া
	কো	ন্	সে		ঝ	ড়ে	র		ভু	•	০		••	ল্	০

I	না	না	র্সা	।	-া	র্সা	না	I	ধা	-না	-ধপা	।	-া	-া	-া
	ঝ	রি	য়ে		০	দি	ল		ফু	০	০০		০	০	ল্

I	পা	পদা	দা	।	পা	দা	পা	I	পা	দা	পা	।	পা	দা	পা
	প্র	থ•	ম		যে	ম	নি		ত	রু	ণ		মা	ধু	রী

I	মা	পা	দা	।	পা	দা	পা	I	মা	-গা	-া	।	-া	-া	-া
	মে	লে	ছি		ল	এ	মু		কু	০	০		০	০	ল্

I	গা	-মা	-পা	।	-ধা	-না	-র্সনা	I	ধপা	-া	-া	।	-া	-া	-া
	হা	•	•		০	০	০য়্		রে০	০	০		০	০	০

-া -া -া II { র্সা র্সর্মা র্মা । র্মর্জ্জা র্জ্জা র্জ্জা I র্জ্জা র্রা -া । -র্জ্জর্রা -র্সা -া I
• • ° ন ব• প্র ভা° তে র তা রা ° °° ° °

I র্সা -া র্রা । র্রা র্জ্জা -র্রর্সা I র্সা র্রা র্সা । -না না না I
স ন্ ধ্যা বে লা °য়্ হ য়ে ছে ° প থ

I না না -র্সা । -া -া -া I না -া -া । -ধনা -া -া I
হা রা ° ° ° • হা ° • °° ° °

I -না -র্সা -না । ধপা -া -া } I পা দা পা । পা দা পা I
° ° • রা° ° ° অ ম রা ব তী র

I পা দা পা । দা পা -া I মা পা পা । পা দা পা I
সু র যু ব তী র্ এ ছি ল কা নে র

I মা -গা -া । -া -া -া I গা -মা -পা । -ধা -না -র্সনা I
দু ° ° ° ° ল্ হা ° ° ° • °য়্

I ধপা -া -া । -া -া -া II
রে° ° ° ° ° °

সা সা -া II { সা রা রা । রা গা মা I গা -া -া । -া -া -া I
এ যে ° মু কু ট শো ভা র ধ ° ° ° ° ন্

I গা -মা মা । মা মা মা I মা পা পা । পা পা পদা I
হা য় গো দ র দী কে হ থা ক য দি•

I পা দা দপা । -ণা দা ণা I (দা -পা -া । পা পা -সা)}
শি রে দা৹ ও প র শ ৹ ন্ এ ষে ৹

I দা -পা -া । -া -া -া I { র্সা র্সর্মা র্মা । র্মা র্মা র্মর্জ্ঞা
শ ৹ ৹ ৹ ৹ ন্ এ কি৹ স্রো তে যা বে৹

I র্জ্ঞা র্রা -া । -র্জ্ঞর্রর্সা -া -া I র্সা -র্রা র্রা । র্রর্জ্ঞা র্জ্ঞা -র্রা
ভে সে ৹ ৹৹৹ ৹ ৹ দূ র্ দ ম্না৹ হী ন্

I র্সর্রা র্সা -না । -া -া -া } I না -র্সা র্সা । র্সা র্সা না
দে৹ শে ৹ ৹ ৹ ৹ কো ন্ খা নে পা বে

I না -ধপা -া । -া -া -া I গা -মা -পা । -ধা -না -র্সনা
কূ ৹৹ ৹ ৹ ৹ ল্ হা ৹ ৹ ৹ ৹ ৹য়্

I ধপা -া -া । -া -া -া II II
রে৹ ৹ ৹ ৹ ৹ ৹

বিশ্বভারতী পত্রিকা

সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়

ষড়্‌বিংশ বর্ষ। শ্রাবণ ১৩৭৬ - আষাঢ় ১৩৭৭ · ১৮৯১-৯২ শক

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

আলোকচিত্র

পট

ছোটদের মাঝে বড়দের ছাপ
ইউবিআই-এর সেভিংস ব্যাঙ্ক পাশ বইটা তার একান্তই নিজস্ব—তার গর্বের ধন। কৈশোরে পা দিয়েই সে যে ব্যাঙ্কে টাকাপয়সা জমানোর সুযোগ পেয়েছে, এতে সে রীতিমত গর্বিত।
সত্যি কথা বলতে কি, সঞ্চয় জিনিষটা বড়দেরই কাজ। তবে ছেলেবেলা থেকে তার অভ্যাস তৈরী হওয়াটা নিশ্চয়ই আনন্দের ব্যাপার—তাতে আখেরে কাজও দেবে।
১৩ বছর বয়স হলেই যে কোন ছেলেমেয়ে মাত্র ৫ টাকা দিয়ে ইউবিআই-তে সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট খুলতে পারে।
UNITED BANK OF INDIA
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
হেড অফিস :
৪, নরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত সরণি
কলিকাতা-১
naa/UBI-370

Regd. No. R. N. 2700/57

Registered with the Registrar of Newspapers

সম্পাদক শ্রীসুনীল রায় কর্তৃক প্রকাশিত • বিশ্বভারতী • ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন • কলিকাতা ৭
মুদ্রক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায় • শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড • ৫ চিন্তামণি দাস লেন • কলিকাতা ৯